Recommended by the University of Calcutta as a reference book for the Three-year B. Com. Course Students

ভারতীয় অর্থবিদ্যা

[কলিকাতা, বৰ্দ্ধমান, উত্তরবংগ ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের
বি. এ. ও বি. কম. কোর্সের জন্য]

সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ
অরুণকুমার সেন, এম্. এ. (স্থবর্ণপদকপ্রাপ্ত),
এম্. এস্-সি. (ইকন্. লণ্ডন), ব্যারিষ্টার এ্যাট্-ল
প্রণীত

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
দি সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সীর পক্ষে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, বি. এস্-সি.
১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

পরিমার্জিত সপ্তম সংস্করণ— আগষ্ট, ১৯৩৬

মূল্য দশ টাকা

প্রথম খণ্ড : শ্রীরতিকান্ত ঘোষ, দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস : ১৭।১ বিন্দু পালিত লেন : কলিকাতা-৬ ও শ্রীপিয়ারীরঞ্জন সাহু, দেশবাণী মুদ্রণিকা : ১৪-সি ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট : কলিকাতা-৬ এবং দ্বিতীয় খণ্ড : শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, বিদ্যাসাগর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস : ১৩৫-এ মুক্তরাম বাবু ষ্ট্রীট : কলিকাতা-৭ হইতে মুদ্রিত।

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা

পূর্ববর্তী সংস্করণ ও বর্তমান সংস্করণের মধ্যে এক বৎসর সময়ও অতিক্রান্ত হয় নাই, তবুও ইতিমধ্যে ভারতীয় অর্থবিদ্যা বা ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয়বস্তুর প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার মূলে আছে ১৯৬২ সালের শেষভাগে ঘোষিত আপৎকালীন অবস্থা (emergency)। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই সংস্করণটিতে গ্রন্থখানির আমূল পরিমার্জনা করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থখানির উপযোগিতা কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে-বিচার অবশ্য বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আমার সহকর্মিগণই করিবেন। আমি এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে পরিবর্তনের সংগে সংগতিসাধনের যথাসাধ্য প্রচেষ্টাই করিয়াছি।

বর্তমান সংস্করণটি প্রণয়নে তথ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে আমি ভারত চেম্বার অফ্ কমার্সের কর্মসচিব অধ্যাপক লোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও উমেশচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র সাহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্যলাভ করিয়াছি। এই সুযোগে তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৩
সিটি কলেজ অফ্ কমার্স
এ্যাণ্ড বিজনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন
কলিকাতা-১২

অরুণকুমার সেন

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় অর্থবিদ্যার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র (Nature and Scope of Indian Economics) : ভারতীয় অর্থবিদ্যা না ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা ; ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র ১-৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ (The Physical and Social Environment) : প্রাকৃতিক পরিবেশ ; ভারতের আয়তন ও অবস্থান ; প্রাকৃতিক বিভাগ ; ভারতের মৃত্তিকা ; জলবায়ু ; বৃষ্টিপাত ; মৌসুমী বায়ু ও ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা ; সামাজিক পরিবেশ ; বর্ণভেদ প্রথা ; যৌথ পরিবার প্রথা ; উত্তরাধিকার আইন ; ধর্মের প্রভাব ; সামাজিক প্রথা ৬-১৭

তৃতীয় অধ্যায়

✓অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic Structure) : ভারতের স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার পরিচয় ; ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর—স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় রূপান্তর—স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর ১৮-২৫

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources) : খনিজ সম্পদ ; ভারতের খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ; খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে সরকারী নীতি—পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে নীতি ; শক্তিসম্পদ ; ভারতে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ; আণবিক শক্তি ; বনসম্পদ ; বনভূমির উপযোগিতা ; ভারত সরকারের বননীতি ২৫-৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

✓ভারতের জাতীয় আয় (National Income of India) : জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ; ভারতের জাতীয় আয়—ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাপ ; জাতীয় আয়বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকের প্রকৃতি ৩৯-৪৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতের জনগণ (People of India) : জনসংখ্যার আয়তন; জনবসতির ঘনত্ব ; জনগণের বসবাস-পদ্ধতি ; জনগণের জীবনযাপন প্রণালী ; বয়সের দিক হইতে জনসংখ্যার গঠন ; স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাত ; জনসংখ্যার বৃদ্ধি ; ভারতের জনাধিক্যের সমস্যা ; জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি ; জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উন্নয়ন কার্যাবলীর প্রভাব ; জীবনযাত্রা প্রণালী ও জীবনযাত্রার মানের উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল ; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিত পন্থাসমূহ ; অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ এবং উহাদের সফলতা ; জনসংখ্যার আঞ্চলিক বণ্টন-জনিত সমস্যা ৪৯-৬৭

সপ্তম অধ্যায়

কৃষি—সাধারণ পর্যালোচনা (Agriculture—A General Survey) : ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব ; ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যসমূহ ৬৭-৭০

অষ্টম অধ্যায়

কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্যা (Problems of Agricultural Land) : কৃষি-জমির পরিমাণবৃদ্ধির সমস্যা ; পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ; জলসেচের সমস্যা ; বিভিন্ন ধরনের সেচ-ব্যবস্থা ; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে সেচ-ব্যবস্থা ; মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তিক্ষয়ের সমস্যা ; খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্যা ; খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার পরিমাণ ; খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কারণ ; জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার ফলাফল ; অর্থনৈতিক জোতের ধারণা ; খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে অবলম্বিত ও প্রস্তাবিত প্রতিবিধানসমূহ ; জোতের সংহতিসাধন ; পরিশিষ্ট—প্রধান প্রধান নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা ৭১-৮৮

নবম অধ্যায়

কৃষি-শ্রমিক (Agricultural Labour) : কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের কার্যক্রম ৮৮-৯৩

দশম অধ্যায়

কৃষি-মূলধন (Agricultural Finance) : সমস্যার প্রকৃতি ; কৃষিঋণের সমস্যা ; কৃষিঋণের পরিমাণ ও প্রকৃতি, ঋণগ্রস্ততার কারণ, কৃষিঋণের প্রতি-বিধানকল্পে অবলম্বিত প্রতিবিধান, ঋণ সংক্রান্ত আইনের ফলাফল ; কৃষিঋণ-ব্যবস্থার সমস্যা—কৃষিগত ঋণ সরবরাহের বিভিন্ন সূত্র—অবলম্বনীয় প্রতিবিধান, সুপারিশগুলির মূল্য নির্ধারণ, কার্যক্রমকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে ৯৩-১০৯

একাদশ অধ্যায়

কৃষিগত সংগঠন (Organisation of Agriculture) : কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা—কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি, অবলম্বনীয় প্রতিবিধানসমূহ, অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ ; কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতি ; কৃষির যন্ত্রিকরণ ; যন্ত্রিকরণের অসুবিধা ; কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়াস ; জাপানী পদ্ধতিতে ধান্ত-চাষ ; উন্নততর বীজ উৎপাদন-ব্যবস্থা ও রবিশস্য উৎপাদন অভিযান ; মিশ্র কৃষিকার্য ১০৯-১২২

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন (Cooperative Movement in India) : সমবায়ের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য ; বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি ; ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; স্বাধীন ভারতে সমবায় আন্দোলন ; সমবায় ও পরিকল্পিত উন্নয়ন ; সমবায় সমিতির শ্রেণীবিভাগ ; প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমবায় সমিতি ; পৌর সমবায়িক ঋণ-ব্যবস্থা ; অন্যান্য ধরনের সমবায়—সমবায় ও কৃষিজ উৎপাদন, সমবায় ও শিল্পজ উৎপাদন, সমবায় ও ভোগ্যপণ্যক্রেতা, সমবায়িক বিক্রয়-ব্যবস্থা, সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি, সমবায় বীমা সমিতি প্রভৃতি ; বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি ; জমিবন্ধকী ব্যাংক ; রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন ; সমবায় আন্দোলনের সফলতা ; সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ ; নির্দেশিত প্রতিবিধান ; অবলম্বিত প্রতিবিধান ; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায়ের পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ ; সেবা সমবায় সমিতি ১২৩-১৬১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতে খাদ্য-সমস্যা (Food Problem in India) : ভারতে খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতি—খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিক বা খাদ্য সরবরাহের অপ্রাচুর্য, খাদ্য-সমস্যার গুণগত দিক ; জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য-সমস্যা ; খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ—বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা, অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান ; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খাদ্য-সীমান্তে অভিযান—কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম ; ফলাফল ; খাদ্য-সমস্যা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ; খাদ্য-সমস্যার সাম্প্রতিক দিক ; খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ ; মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট ; উপসংহার ১৬১-১৮২

চতুর্দশ অধ্যায়

ভূমি-সংস্কার (Land Reforms) : ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা ও জমিদারী ব্যবস্থা ; মহালওয়ারি-ব্যবস্থা ; রায়তওয়ারি-ব্যবস্থা ; ভারতে ভূমি-রাজস্বের প্রকৃতি ; ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের সূচনা ; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতি—নীতিকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে ; জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ ; সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য—সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সমর্থন ও বিরোধিতা, ভারতে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সম্ভাবনা ; সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থা, গুণাগুণ ; পরিকল্পিত পদ্ধতিতে জমির ব্যবহার ; পশ্চিমবংগে ভূমি-সংস্কার ; পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন ১৮৩-২০৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন (The State and Agrarian Reconstruction) : স্বল্পোন্নত দেশের কৃষির পুনর্গঠন ; ভারতে কৃষি সম্পর্কে রাষ্ট্র ; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবা; সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবার মূল্যায়ন, পর্যালোচনাকারী দলের সুপারিশ ; সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্গঠন, মূল্যায়নের উপসংহার ২০৬-২২১

ষোড়শ অধ্যায়

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প (Small-scale and Cottage Industries) : ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের কারণ ; ভারতে কুটির শিল্প সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হইবার কারণ ; ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের সংজ্ঞা ; কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের শ্রেণীবিভাগ, গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ; পৌর কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, তুলাতাঁত শিল্প, ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অসুবিধা এবং তাহাদের প্রতিবিধানের উপায় ; রাষ্ট্র এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, প্রথম পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ২২১-২৪৬

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতে শিল্পোন্নয়ন (Industrial Development in India) : ঐতিহাসিক পরিক্রমা ; ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি ২৪৬-২৫২

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প (Important Manufacturing Industries of India) : লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ; তুলাবস্ত্র শিল্প ; পাটকল শিল্প ; চিনি শিল্প ; কয়লাখনি শিল্প ; শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশন ২৫৩-২৭৪

ঊনবিংশ অধ্যায়

সরকারী শিল্পনীতি (Industrial Policy of the Government) : কৃষি বনাম শিল্প ; জাতীয় সরকারের শিল্পনীতি, মূল শিল্পনীতি, মূল শিল্পনীতির মূল্যায়ন, মূল শিল্পনীতিকে কার্যকরকরণ ; পরিমার্জিত শিল্পনীতি, পরিমার্জিত শিল্পনীতির মূল্যায়ন ; শিল্পের জাতীয়করণ ; জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ ২৭৪-২৯৪

বিংশ অধ্যায়

ভারত সরকারের ফিসক্যাল নীতি (Fiscal Policy of the Government of India) : সংরক্ষণের গুরুত্ব, সংরক্ষণ পদ্ধতি, সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি ; বিচারমূলক সংরক্ষণ, বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রকৃতি, বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির ফলাফল ; যুদ্ধকালীন ফিসক্যাল নীতি ; নূতন ফিসক্যাল নীতি ; নূতন ফিসক্যাল নীতির প্রয়োগ ২৯৪-৩০৫

একবিংশ অধ্যায়

বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্যা (Problem of Industrial Finance in the Private Sector) : ভারতীয় শিল্পসমূহের অর্থসংগ্রহের চিরাচরিত সূত্রসমূহ ; শিল্পগত অর্থসংগ্রহের পরম্পরাগত সমস্যা ; ভারতের শিল্প-অর্থ করপোরেশন, রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন ; শিল্পগত মূলধনের সাম্প্রতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা ; জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন ; ভারতের শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন ; শিল্প পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন, ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থসরবরাহ ; ভারতে মূলধন-গঠনের অর্থ, ভারতে মূলধন-গঠনের অবস্থা, ভারতে মূলধন গঠনের প্রতিবন্ধক, অবলম্বনীয় প্রতিবিধানসমূহ ; বৈদেশিক মূলধন, বৈদেশিক মূলধনের সুবিধা ও অসুবিধা ; ভারতে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাপ, বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি ; বর্তমান নীতি ৩০৬-৩৪১

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শিল্পগত পরিচালনা (Industrial Management) : বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পগত পরিচালনা ; ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা—সংগঠন ও কার্যাবলী, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার মূল্যায়ন ; ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার সংস্কার, সমালোচনা ; ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে প্রবর্তিত সংস্কার ; সমালোচনা ; উপসংহার ; ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভবিষ্যৎ ; সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্পগত পরিচালনা ৩৪১-৩৫৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শিল্প-শ্রমিক (Industrial Labour) : ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য ; ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা ; শ্রম-দক্ষতা উন্নয়নের পন্থা ; শিল্প-সম্পর্ক—শিল্প-বিরোধ, ভারতে শিল্প-বিরোধের গতি, শিল্প-বিরোধের কারণ ; শিল্প-বিরোধের প্রতিরোধ এবং মীমাংসা, শিল্প-বিরোধ আইন ; ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইন, ১৯৫৬ সালের শিল্প-বিরোধ সংশোধন আইন ; আবশ্যিক সালিসির ব্যবস্থা কাম্য কি না ? শিল্পে শান্তিরক্ষাকল্পে অবলম্বিত অন্যান্য ব্যবস্থা, শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ, মুনাফার ভাগাভাগি ; নিয়মানুবর্তিতা এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের মধ্যে সম্পর্ক ; শ্রমিক সংঘ, ভারতীয় শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের অসুবিধা, অবলম্বনীয় প্রতিবিধান, শ্রমিক সংঘ সম্পর্কিত আইন, শ্রমিক সংঘ আইনের ত্রুটি ; শ্রমিক সংক্রান্ত আইন, কার্যের সর্তাদি সংক্রান্ত আইন—কারখানা আইন, ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন, কারখানা আইনের ফলাফল, খনি সংক্রান্ত আইন, পরিবহণ সংক্রান্ত আইন, রোপণ শিল্প সংক্রান্ত আইন, দোকান ও আপিস সংক্রান্ত আইন, মজুরি সংক্রান্ত আইন, মজুরি প্রদান, ন্যূনতম মজুরি, ন্যূনতম মজুরি ধার্যের নীতি, ন্যায্য মজুরি ; সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন—শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, প্রসূতি কল্যাণ আইন, শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা-ব্যবস্থা, শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-ব্যবস্থা ; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমনীতি ; শ্রম-কল্যাণ ৩৫৫-৪০৯

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পরিবহণ (Transport): স্বল্পোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় পরিবহণের গুরুত্ব; ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থা; রেলপথ: ভারতে রেলপথ নির্মাণ, ভারতে রেলপথ নির্মাণের অর্থনৈতিক ফলাফল; স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতি-সাধন; প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতিসাধন; রেলপথের পুনর্বিন্যাস; রেলপথের আয়-ব্যয়; রেলপথের মাশুল; রাজপথ; পথ পরিবহণ, রাজপথ বনাম রেলপথ; জলপথ; আভ্যন্তরীণ জলপথ, উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যপথ; বন্দর ও পোতাশ্রয়; আকাশপথ; পরিবহণ-ব্যবস্থার সংহতি-সাধনের সমস্যা ৩-২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের বহির্বাণিজ্য (Foreign Trade of India): প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের বহির্বাণিজ্য, দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে ভারতের বহির্বাণিজ্য; সাম্প্রতিক-কালের ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য; ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্ত; দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে লেনদেন-উদ্বৃত্ত, তৃতীয় পরিকল্পনায় লেনদেন-উদ্বৃত্তের গতি; যুদ্ধোত্তর ও সাম্প্রতিককালের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও লেনদেন-উদ্বৃত্তের কারণের সংক্ষিপ্তসার; লেনদেন-ঘাটতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত প্রতি-বিধান; মুদ্রামান হ্রাস ও ভারতের বহির্বাণিজ্য; স্বাধীন ভারতের বাণিজ্যনীতি; আমদানি নীতি, রপ্তানি নীতি, রপ্তানি প্রসারকল্পে অবলম্বিত সাম্প্রতিক ব্যবস্থাসমূহের সংক্ষিপ্তসার; রপ্তানি ঝুঁকি বীমা; রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য; রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের কার্য; বাণিজ্য-চুক্তি, দ্বি-পক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি; ভারত এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন; শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি; ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজার ও ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ২৫-৭৩

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থা (Indian Currency and Exchange System): ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার বিবর্তন: ১৮০১-৩৫—দ্বি-ধাতুমান, ১৮৩৫-৯৩—একধাতু রৌপ্যমান, রূপান্তরের সময়, ১৮৯৮-১৯১৭—স্বর্ণ-বিনিময় মান, ১৯১৭-২৬—অস্থায়ী বিনিময় হারের যুগ, ১৯২৭-৩১—স্বর্ণপিণ্ড মান, ১৯৩১-৪৭—ষ্টার্লিং-বিনিময় মান; ভারতের বর্তমান মুদ্রামান—আন্তর্জাতিক মান; বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থা, ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থা; কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা; ১৯৩৪

সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইন অনুসারে নোট প্রচলন পদ্ধতি; বর্তমান কাগজী মুদ্রা প্রচলন পদ্ধতি; ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থার পরিবর্তন; মুদ্রার প্রকারে পরিবর্তন, ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত, ষ্টার্লিং পাওনা সংক্রান্ত চুক্তি; আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ভারতীয় বিনিময়-ব্যবস্থা; মুদ্রামানহ্রাস; মুদ্রামানহ্রাসের ফলাফল; ভারতীয় মুদ্রার পুনর্মাননির্ধারণের প্রশ্ন; বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ৭৩-৯৫

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার (Indian Banking and Money Market): ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও আংগিক উপাদান; বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের বিশদ আলোচনা; দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী, টাকাকড়ির অসংগঠিত বাজার ও সংগঠিত বাজারের মধ্যে সংহতিসাধন, ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক; রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের গঠন ও কার্যাবলী; রিজার্ভ ব্যাংক; টাকাকড়ির বাজারের উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ; রিজার্ভ ব্যাংক ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ; পরিকল্পনাধীন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ নীতি; রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ; রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকার মূল্যায়ন; ব্যাংক-পতন এবং ব্যাংকিং আইন; ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন; আমানত-বীমা পরিকল্পনা; বিল বাজার পরিকল্পনা; রিজার্ভ ব্যাংকের পরিকল্পনা; গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার; ভারতীয় টাকার বাজারের ত্রুটি ও অভাবের সংক্ষিপ্তসার ৯৫-১৪২

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে দ্রব্যমূল্য (Prices in India): যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি; প্রথম পরিকল্পনা ও মূল্যের গতি, দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও মূল্যের গতি, তৃতীয় পরিকল্পনায় মূল্য স্থায়িত্বকরণ এবং মূল্যের গতি ১৪৩-১৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেকার-সমস্যা (Unemployment Problem): কৃষিগত বেকার-সমস্যা; শিল্পগত বেকার-সমস্যা; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা; পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নিয়োগ ১৫৩-১৬২

সপ্তম অধ্যায়

সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা (Public Finance): ভারতের সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ; যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার কয়েকটি সাধারণ নীতি; বর্তমান সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থা; ফিনান্স কমিশনসমূহ ও উহাদের সুপারিশ—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফিনান্স কমিশন; কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট; কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান কর-রাজস্ব; আয়কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক: বাণিজ্যশুল্ক, মূলধন-লাভ কর, সম্পদকর, ব্যয়কর, দানকর, অতিরিক্ত মুনাফা কর; কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়: রাজ্য সরকারসমূহের আয়ব্যয়-ব্যবস্থা: রাজস্ব খাতে রাজ্যসমূহের আয় ও ব্যয়; সরকারী ঋণ, রাজ্য সরকারসমূহের ঋণ; ভারতীয় কর-পদ্ধতির ত্রুটি ও প্রতিবিধান; কর তদন্তকারী কমিশনের রিপোর্ট; বিশেষ বিশেষ কর সম্বন্ধে কর তদন্তকারী কমিটির সুপারিশ; কর-পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে ক্যালডোরের রিপোর্ট; সুপারিশ কার্যকরকরণ ১৬৩-২২৩

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning): পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায়; অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা; উন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ; উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান; ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ২২৪-২৩৪

নবম অধ্যায়

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The First Five Year Plan): পরিকল্পনার উদ্দেশ্য; পরিকল্পনার অর্থনৈতিক লক্ষ্য, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা, ব্যয়-বরাদ্দ, উৎপাদনের লক্ষ্য, পরিকল্পনার প্রকৃত ব্যয় ও এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ; প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল ২৩৪-২৪১

দশম অধ্যায়

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The Second Five Year Plan): দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য: উন্নয়নের দ্রুততর গতি, শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি, নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ, সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণ; আর্থিক নীতি ও পদ্ধতি; মূল পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ ও বণ্টন; মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ-ব্যবস্থা; মূল পরিকল্পনায় উৎপাদন

ও উন্নয়নের লক্ষ্য ; জাতীয় আয়, ভোগ ও কর্মের সংস্থান ; পরিকল্পনার জন্য অর্থের সংস্থান ও বিদেশী মুদ্রা ; ঘাটতি ব্যয় ; ঘাটতি ব্যয়ের ক্রটি প্রতিবিধানের জন্য অবলম্বিত পন্থা ; বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ; দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার ; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ; পরিকল্পনার দশ বৎসর ২৪২-২৬৬

একাদশ অধ্যায়

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The Third Five Year Plan) : পরিকল্পনার প্রস্তাবনা ; তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ; বৈশিষ্ট্য ; ব্যয়-বরাদ্দ ও ব্যয় বণ্টন, তিনটি পরিকল্পনার বরাদ্দের মধ্যে তুলনা ; উন্নয়নের গতি ও উৎপাদনের লক্ষ্য ; কর্মসংস্থান, আয় ও ভোগ ; অর্থসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা ; পরিকল্পনার সফলতার সর্তাবলী ; সমালোচনা ; তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসর ২৬৬-২৮৪

পরিশিষ্ট ক : পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহ (Mobilisation of Resources for the Plan and the Defence) : স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ ; বাধ্যতামূলক আমানত বা সঞ্চয় পরিকল্পনা ; বৈদেশিক সাহায্য ২৮৫-২৯৩

পরিশিষ্ট খ : নির্বাচিত পরিসংখ্যান (Selected Statistics) : কৃষিজাত উৎপাদনের সূচকসংখ্যা; ভারতের কৃষির উৎপাদিকাশক্তির সূচকসংখ্যা, শিল্পগত উৎপাদনের সূচকসংখ্যা, শিল্পজ উৎপাদনের হার, পাইকারী মূল্যের সূচকসংখ্যা, জনসাধারণের হাতে টাকাকড়ির যোগান, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, ভারতের সঞ্চয় ও আয়ের গড় অনুপাত, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ ২৯৪-২৯৮

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় অর্থবিদ্যার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র

(Nature and Scope of Indian Economics)

ভারতীয় অর্থবিদ্যা, না ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা? (Indian Economics, or Economic Problems of India ?) :

ভারতীয় অর্থবিদ্যা কথাটির প্রথম ব্যবহার ও প্রচলন

'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বিচারপতি র‍্যাণাডে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার 'ভারতীয় অর্থবিদ্যার উপর রচনা'* নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন হইতে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সংক্রান্ত শাস্ত্র এই নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছিল।

অনেকের কাছে এইরূপ নামকরণ একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভারতীয় অর্থবিদ্যা আবার কি বস্তু? ব্রিটিশ মার্কিন ফরাসী অথবা চৈনিক অর্থবিদ্যা বলিয়া ত কোন শাস্ত্র নাই। অর্থবিদ্যা যখন একটি বিজ্ঞান তখন ইহার মূল সূত্রগুলি সর্বত্রই প্রযোজ্য। উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে অথবা শিল্পোন্নত ও কৃষিপ্রধান সমাজের মধ্যে পার্থক্যের কারণে অর্থবিদ্যার সূত্রগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে বিভিন্নতার সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষের মূল প্রকৃতি অভিন্ন বলিয়া সকল দেশেই ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের সূত্রগুলি মূলত একই হয়। সুতরাং 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিয়া কোন শাস্ত্রকে অভিহিত করা তাঁহাদের নিকট অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। ভারত ত আর সৃষ্টি-বহির্ভূত দেশ নয়!

ইহার উত্তরে র‍্যাণাডে বলিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থবিদ্যার মূল সূত্রগুলি সর্বত্র প্রযোজ্য হইলেও দেশ ও সমাজ-ব্যবস্থা ভেদে অর্থনৈতিক সমস্যার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। ভারতের ন্যায় দেশে এই সমস্যাগুলির বিচার, বিশ্লেষণ ও সমাধানের প্রচেষ্টা অর্থবিদ্যার মূল সূত্রগুলি অনুসারে করিলে ভুল করা হইবে। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে

পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতের সমাজ-জীবনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য-গত পার্থক্য ছিল

গেলে, র‍্যাণাডে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য দেশসমূহ এবং ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সকল দেশের সমাজ-ব্যবস্থার মূলভিত্তি হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিগত ধর্ম-নিরপেক্ষতা (religious indifference)। অপরদিকে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যৌথ পরিবার, প্রথা (custom) এবং একরূপ ধর্মান্ধতা। ভারতে ব্যক্তি নয়—পরিবারই সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্র; প্রতিযোগিতা নয়—প্রথাই এদেশে অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; এবং ধর্ম-

* *Essays on Indian Economics*

নিরপেক্ষতার স্থলে আছে এক অনন্যসাধারণ সমাজ ও ধর্মবোধ (socio-religious outlook)। পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যা যে-যে অনুমানের (hypotheses) উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতে তাহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার সূত্রগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রয়োজনমত তাহাদের পরিবর্তনসাধন করিয়া অর্থবিদ্যার যে-শাস্ত্র চর্চা করা হইবে তাহা 'একান্তভাবেই ভারতীয়' হইবে।

অতএব, ভারতীয় অর্থবিদ্যা কথাটির ব্যবহারই যুক্তিসংগত ছিল

র‍্যাণাডের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যার পর বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আজ আর বলা যায় না যে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতের আর্থিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ গভীর। বর্তমানে যৌথ পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর দৃষ্টিভংগির বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে; প্রথা আজ আর বর্তমানে আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না বলিলেই চলে—তৎপরিবর্তে সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়াছে প্রতিযোগিতা; লোকের ধর্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া দেখা দিয়াছে বস্তুবাদী (materialistic) জীবনদর্শন এবং ব্যক্তিগত ধর্ম-নিরপেক্ষতা। উপরন্তু, এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে-বিরাট নগরিকরণ (urbanisation) ঘটিয়াছে তাহার ফলে পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় সাধিত হইয়াছে অভূতপূর্ব ঐক্য; এবং সাম্প্রতিক পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা (planned economy) ঐক্যসূত্রকে করিয়াছে দৃঢ়তর। সুতরাং বর্তমানে এরূপ কোন ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চার কল্পনা করা যায় না যাহা 'একান্তভাবে ভারতীয়ই' হইবে। বলা যায়, যেমন 'ভারতীয় পদার্থবিদ্যা' বা 'ভারতীয় রসায়ন' বলিয়া কোন নূতন বিজ্ঞান থাকিতে পারে না, তেমনি 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিয়াও কোন বিশেষ শাস্ত্রের কল্পনা করা যায় না। অবশ্য ইহা সত্য যে এখনও অর্থবিদ্যার সূত্রগুলিকে ভারতের বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহা যে-কোন দেশের বেলাতেই সত্য। সকল দেশেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে, র‍্যাণাডেও 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিতে সম্পূর্ণ কোন নূতন শাস্ত্রের চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইংগিত দেন নাই। পরিবর্তিত আকারে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার তত্ত্বগুলিকে ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানোই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ঐ একই উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথকভাবে ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং করিতে বলিয়াছিলেন।*

কিন্তু আজ উহার সপক্ষে যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন

---

* অবশ্য অধ্যাপক ওয়াদিয়া, মার্চেন্ট প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় লেখক মনে করেন যে, 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটি এক নূতন শাস্ত্রের অর্থে ব্যবহার করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। ইঁহাদের মতে, এ্যাডাম স্মিথ ম্যালথাস রিকার্ডো মিল প্রভৃতি অর্থবিদ্যাবিদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে-অর্থবিদ্যার পরিস্ফুটন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যে নূতন অর্থবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে 'সোবিয়েত অর্থবিদ্যা' বলিয়া

এইভাবে র‍্যাণাডে, রমেশ দত্ত প্রভৃতি প্রদর্শিত পথে ভারতীয় অর্থবিদ্যার চর্চা সুরু হয় এবং পরে উহা একরূপ এক পৃথক শাস্ত্রে পরিণত হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করে। এই পৃথক শাস্ত্র হইল জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতের অর্থ-অবস্থা ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা। এই আলোচনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদী, কোনমতেই তত্ত্বগত নহে। ইহাকে ব্যবহারিক অর্থবিদ্যার (applied economics) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যার ন্যায় ভারতীয় অর্থবিদ্যার চর্চাও ফলপ্রদায়ী বা উদ্দেশ্যমূলক (fruit-bearing)। ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপাদান ও অর্থনৈতিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়াই এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য। ইহা অতীতের পটভূমিকায় সমস্যাগুলির উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করে, বর্তমানে সমস্যাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ করে।

বর্তমানে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিতে কি বুঝায়

ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনা প্রধানত ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহকে লইয়া গঠিত এবং একরূপ সম্পূর্ণভাবে সমস্যাসমূহের সমাধানের উদ্দেশ্যে বলিয়া এই পর্যালোচনাকে বর্তমানে অনেকে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা'র পরিবর্তে 'ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা' (Economic Problems of India) বলিয়া অভিহিত করার পক্ষপাতী। দিন দিন এই নূতন নাম যেরূপ প্রচলিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনা একমাত্র এই নামেই অভিহিত হইবে।

ভারতীয় অর্থবিদ্যার নূতন নামকরণ—ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা

ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র (Scope of Indian Economics): ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিতে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই বুঝায়। পূর্বের তুলনায় এই আলোচনাক্ষেত্র বর্তমানে অনেক ব্যাপকতর হইয়াছে। ইহার মূলে আছে পূর্বতন স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থার (*laissez faire* economy) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় (planned economy) রূপান্তর। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে ভারতের প্রায় সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে আনয়ন করা হইতেছে। ফলে অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিকের উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটিতেছে। পদে পদে এই হস্তক্ষেপের অনুসন্ধান করিয়াই ভারতীয় অর্থবিদ্যার ছাত্রকে পর্যালোচনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সংগে সংগে

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা ও পূর্বের তুলনায় ব্যাপকতর আলোচনা-ক্ষেত্র

অভিহিত করিতে কোনই আপত্তি নাই। নয়া চীনের অর্থবিদ্যা আবার এই সোবিয়েত অর্থবিদ্যা হইতে কিছুটা পৃথক। সুতরাং নয়া চীনের নিজস্ব অর্থবিদ্যা আছে। জার্মান অর্থবিদ্যাবিদ লিষ্ট (List) জার্মেনীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন অর্থবিদ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অতএব, 'একান্তভাবে ভারতীয়' কোন অর্থবিদ্যা সম্পূর্ণ সংগতভাবেই থাকিতে পারে।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার (underdeveloped economy) উন্নয়নের জন্যই গ্রহণ করা হইয়াছে স্বাতন্ত্র্য নীতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। বর্তমানে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে এইরূপ উন্নয়ন-প্রচেষ্টা মোটামুটি বিশ্বজনীনভাবে চলিতেছে, বলা যায়। সুতরাং ভারতের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার ফলাফলের তুলনামূলক বিচারের প্রশ্নও রহিয়াছে। 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা'র ছাত্রকে এ-সম্বন্ধেও অবহিত থাকিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature and scope of Indian Economics. (৩-৫ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

(The Physical and Social Environment)

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ (The Physical Environment) :

যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রায় সকল দিকের উপরই প্রাকৃতিক পরিবেশের অল্পবিস্তর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে, ভৌগোলিক পরিবেশই অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। দেশের জলবায়ু শ্রমের দক্ষতা, খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি নিরূপণ করে; বৃষ্টিপাত কোন্ কোন্ শস্যাদি উৎপন্ন হইবে তাহা নির্ধারণ করে; নদী ও সমুদ্রোপকূল বহুল পরিমাণে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে; এবং এইভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা দেশের শিল্প-বাণিজ্য, সরকারী আয়-ব্যয়, সরকারী অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রভৃতি সকলই নিরূপিত, নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

অপরদিকে, আবার ইহাও সত্য যে দিন দিন প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে; এবং ফলে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। সমুদ্র আজ আর অজানা নাই বা থাকিবে না; পর্বতের বাধা আর অলংঘনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না; জলসেচ-ব্যবস্থা বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতাকে অতীতের বিষয় করিয়া তুলিতেছে; অরণ্যের কবল হইতে পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া কৃষি-জমির সীমাবদ্ধতাকে দূর করা হইতেছে; বিভিন্নভাবে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হইতেছে; নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া নৌবহ খাল খনন, বন্যা-নিরোধ প্রভৃতির ব্যবস্থাও করা হইতেছে; ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বোধ হয় কোনদিনই হইবে না। মানুষের কলাকৌশল এড়াইয়া যাইবার অদ্ভুত শক্তি প্রকৃতির আছে। প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্যের ফলে মানুষের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যাইতে পারে। সমুদ্রে বরফ জমিয়া সমুদ্রপোতের পথ রোধ করিতে পারে; ভূমিকম্পে বাঁধ ভাঙিয়া যাইতে পারে বা নদীর গতি পরিবর্তিত হইতে পারে; বরুণ-দেবতার কৃপণতার ফলে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃতির উপর মানুষ যে-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা আংশিক মাত্র; এবং এই কারণেই কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় ঐ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের আলোচনাও করিতে হয়।

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, শক্তিসম্পদ, প্রাণিসম্পদ, অরণ্যসম্পদ প্রভৃতি সকলই ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। নিম্নে এই নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

ভারতের আয়তন ও অবস্থান (Size and Location of India): ভারতের ভূখণ্ডের আয়তন ১২.৬১ লক্ষ বর্গমাইলের উপর।* আয়তনের দিক দিয়া ভারত পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সপ্তম স্থানাধিকারী। জনসমষ্টির দিক দিয়া কিন্তু পৃথিবীতে ভারত দ্বিতীয় বৃহৎ রাষ্ট্র। একমাত্র নয়া চীন ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্র জনসংখ্যায় ভারতকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। রাষ্ট্র বৃহৎ বলিয়া ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহও বৃহৎ।

অবস্থানগত সুবিধা এবং অভগ্ন উপকূল-রেখাজনিত অসুবিধা

ভারত পূর্ব গোলার্ধের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই কারণে ভারতের পক্ষে ইয়োরোপ, মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলি এবং অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য চালানো বিশেষ সুবিধাজনক। ভারতের উপকূলরেখাও বিশেষ দীর্ঘ। পরিমাণ ৩৫০০ মাইলের উপর। কিন্তু ইহা অভগ্ন হওয়ায় স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা বিশেষ কম। ফলে বহু ব্যয়ে নদীমুখে কলিকাতার ন্যায় বন্দর নির্মাণ করিতে হয় এবং উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগ

প্রাকৃতিক বিভাগ (Natural Divisions): ভূ-প্রকৃতি হিসাবে ভারতবর্ষকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল।

(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (The Mountain Zone of the Himalayas): তিনটি সমান্তরাল পর্বতমালা এবং কাশ্মীর ও কুলুর ন্যায় কয়েকটি

* ইহার মধ্যে পণ্ডিচেরিকে ধরা হইয়াছে...Report of the Survey of India, 1962

উপত্যকা লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। পূর্বে এই অঞ্চলকে খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ নয় বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই অঞ্চলে কয়লা পেট্রল জিপসাম পাথুরে লবণ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ প্রভূত পরিমাণে ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে।

ভারতের আর্থিক জীবনেও হিমালয়ের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। হিমালয় ভারতের জলবায়ুর নিয়ামক। হিমালয় দ্বারাই মৌসুমী বায়ুর গতিপথ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। সিন্ধু গংগা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নিত্যবহ নদনদীগুলি হিমালয়ের তুষারগলা জলেই পরিপুষ্ট। ভারতের অন্যতম প্রধান কৃষিজ দ্রব্য চা হিমালয় অঞ্চলেই অধিক উৎপন্ন হয়। জীবজন্তু ও বনসম্পদে হিমালয় অঞ্চল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দূরদূরান্তর হইতে পর্যটককে আহ্বান করিয়া আনে। ভারতের রমণীয় শৈলাবাসগুলি এই অঞ্চলেই অবস্থিত।

(২) সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল (The Indo-Gangetic Plain) : সিন্ধু গংগা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা লইয়া গঠিত এই অঞ্চল দৈর্ঘ্যে ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ১৫০-২০০ মাইল। পলিমাটি দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলের ভূমি বিশেষ উর্বর। কৃষির দিক দিয়া এই অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ।

(৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল (The Deccan Plateau) : দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল উপদ্বীপের মালভূমি অঞ্চল (The Peninsular Plateau) নামেও অভিহিত। সিন্ধু-গাংগেয় অঞ্চল এবং এই মালভূমির মধ্যে আছে আরাবল্লী বিন্ধ্য সাতপুরা প্রভৃতি অসংখ্য পর্বতমালা। নর্মদা তাপ্তী গোদাবরী মহানদী কৃষ্ণা কাবেরী প্রভৃতি নদনদী এই মালভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ধান্য তৈলবীজ জোয়ার বাজরা ভুট্টা প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। লৌহ-আকর অভ্র চুনাপাথর বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পদেও এ-অঞ্চল সমৃদ্ধ।

ভারতের মৃত্তিকা (Soils of India) : ভারতের মৃত্তিকা মোটামুটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত—পলিমৃত্তিকা, কৃষ্ণ মৃত্তিকা, গৈরিক মৃত্তিকা এবং প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা। ইহাদের মধ্যে পলিমৃত্তিকার পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ বর্গমাইল বা মোট ভূখণ্ডের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। পলিমৃত্তিকা নরম ও জলবহ (porous) হইলেও শুষ্ক। সুতরাং ইহাতে জলসেচের প্রয়োজন হয়। আরও জলসেচের প্রয়োজন হয় গৈরিক মৃত্তিকায় ও প্রস্তরীভূত মৃত্তিকায়। শুধু কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা বিশেষ আর্দ্রতা ধারণ করিতে পারে বলিয়া উহাতে জলসেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

ভারতের মৃত্তিকা সংক্রান্ত সমস্যা

এইভাবে চারি প্রকারের মধ্যে তিন প্রকারের মৃত্তিকাতেই জলসেচের প্রয়োজন হয় বলিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীনে ভারতের মৃত্তিকা সম্পর্কিত প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে জলসেচের সমস্যা। অন্যান্য অনেক দেশকে এই সমস্যা লইয়া বিব্রত থাকিতে হয় না : ফলে তাহারা পতিত জমির পুনরুদ্ধার, জমির উর্বরতাবৃদ্ধি প্রভৃতির দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে সমর্থ হয়।

জলবায়ু (Climate) ঃ সামগ্রিকভাবে ভারতের জলবায়ুকে উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী ধরনের (monsoon-tropical) জলবায়ু বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কিন্তু এই বর্ণনা ভারতের জলবায়ুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন ইংগিত দেয় না। কারণ, উপমহাদেশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে শীতল জলবায়ু, কিন্তু সমতলভূমিতে উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু দৃষ্ট হয়। আবার আগ্রা জিলা, পশ্চিম রাজস্থান প্রভৃতির ন্যায় ভারতের বহু স্থানের জলবায়ু হইল চরমভাবাপন্ন।

উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী ধরনের জলবায়ু

জলবায়ুর আঞ্চলিক তারতম্য

বৃষ্টিপাতের বেলাতেও ঐরূপ আঞ্চলিক তারতম্য দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের থর মরুভূমিতে গড়ে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হইল মাত্র ৫ ইঞ্চি; কিন্তু চেরাপুঞ্জিতে ইহা হইল ৪৩০ ইঞ্চি বা ততোধিক

বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্য

জলবায়ুর এইরূপ অনন্যসাধারণ তারতম্যের জন্য ভারতীয়গণের মধ্যে ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উপজীবিকা এবং এমনকি দৃষ্টিভংগির মধ্যেও বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার জন্য আবার কৃষিজ উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ ও অরণ্য সম্পদেরও প্রকার-ভেদ দেখা যায়। উপরন্তু, ডাঃ ভেরা এ্যানস্টী (Dr. Vera Anstey) প্রভৃতির মতে, খনিজ সম্পদের বিভিন্নতার কারণ হইল ইহাই।

জলবায়ু তারতম্যের ফল

জলবায়ু ভারতীয় জনগণের কর্মদক্ষতার উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ইহা লইয়া অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতের মতে, উষ্ণ জলবায়ু প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভবে সহায়তা করিলেও, পরবর্তীকালে ইহার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। উষ্ণ জলবায়ু শারীরিক কর্মদক্ষতাকে হ্রাস করে বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। অপরদিকে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে অধিকতর শারীরিক কর্মদক্ষতা সম্ভব হয় বলিয়া এইরূপ জলবায়ুকে সর্বদাই আর্থিক সমৃদ্ধির সহায়করূপে দেখা গিয়াছে। এই যুক্তিকে বর্তমানে অবশ্য বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। অতীতে ভারত মিশর চীন প্রভৃতি দেশে সভ্যতা উন্নতির যে শিখরে উঠিয়াছিল তাহা হইতে এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, উষ্ণ জলবায়ু সর্বদাই সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী। বর্তমানেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কর্মদক্ষতায় ভারতীয় শ্রমিক ইয়োরোপ বা আমেরিকার শ্রমজীবী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। তবে উষ্ণ জলবায়ু অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা যে সামান্য বৃদ্ধি পায় সে-কথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না।

ভারতীয়গণের কর্ম-দক্ষতার উপর জল-বায়ুর প্রভাব

বৃষ্টিপাত (Rainfall) ঃ বৃষ্টিপাত জলবায়ুর অন্যতম উপাদান হইলেও ভারতীয় অর্থবিদ্যায় বৃষ্টিপাতের ভূমিকার আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করা হয়, কারণ

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর যে-সকল ভৌগোলিক বিষয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাহাদের মধ্যে বৃষ্টিপাতই সর্বপ্রধান। অধ্যাপক জাথার ও বেরীর (Profs. Jather and Beri) ভাষায় বলা যায়, ভারতের ন্যায় পৃথিবীর আর অন্য কোথাও বৃষ্টিপাত অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিককে এরূপভাবে প্রভাবান্বিত করে না।

ভারতের বৃষ্টিপাতের অধিকাংশই সংঘটিত হয় মৌসুমী বায়ুর দ্বারা। এইজন্যই ভারতের জলবায়ুকে 'উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী ধরনের জলবায়ু' বলা হয়। মৌসুমী বায়ু বলিতে বুঝায় আর্দ্রতা বহনকারী বায়ুপ্রবাহ। ভারতে এইরূপ বায়ু দুই দিক দিয়া প্রবাহিত হয়; এবং ফলে ইহা দুই নামে পরিচিত —উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। ইহার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গুরুত্বই অধিক, কারণ ইহাই ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ভারতে মৌসুমী বায়ু

বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতকে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়:

বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতের আঞ্চলিক বিভাগ

(১) **আর্দ্র অঞ্চল**—এই অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হইল ১০০ ইঞ্চির উপর। আসামের উপত্যকা অঞ্চল এবং পশ্চিমবংগের উপকূল ভূমির কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(২) **নাতি-আর্দ্র অঞ্চল**—এই অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৪০ ইঞ্চি হইতে ১০০ ইঞ্চির মধ্যে। পশ্চিমবংগ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(৩) **শুষ্ক অঞ্চল**—এই অঞ্চলে বৎসরে ৪০ ইঞ্চির কম গড় বৃষ্টিপাত হয়। রাজস্থান, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। রাজস্থানের অনেক স্থানে বৎসরে গড়ে ৫ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয়।

শুধু যে আঞ্চলিক বণ্টনেই বৃষ্টিপাতের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, বৃষ্টিপাতের সময়েরও বিশেষ কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণত জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইলেও সময়ে সময়ে ইহার প্রবাহে বিশেষ বিলম্ব ঘটিতে পারে। অনেক সময় আবার কোন কোন অঞ্চলে প্রথমে প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া পরে সে-অঞ্চলে আর দেখা নাও দিতে পারে। এরূপ ঘটিলে কৃষককে একবার শস্যক্ষেত্রের দিকে আর একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইতে হয়।

বৃষ্টিপাতের সময়গত অনিশ্চয়তা

মৌসুমী বায়ু ও ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা (Monsoons and the Indian Economics): শিল্পোন্নত দেশসমূহে ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দার ফলে জাতীয় আয় ও নিয়োগ যে ব্যাহত হয় তাহার সূচনা হয় শিল্পক্ষেত্র হইতে। শিল্পপতিগণ যখন নিরাশার মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়,

তখনই এইরূপ ঘটে। সরকার অবশ্য তাহার ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া এইরূপ মন্দার অনেকটা প্রতিবিধান করিতে পারে।

কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত কৃষিপ্রধান দেশে মন্দার সূচনা হয় কৃষিক্ষেত্র (agricultural sector) হইতে। এইরূপ দেশের কৃষিজীবীদের আয় কমিলেই অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর আয় কমিয়া যায়। ফলে সরকারেরও আয় কমে; অপরদিকে কিন্তু খাদ্য-আমদানি, দুর্ভিক্ষত্রাণ ইত্যাদির দরুন ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে। ফলে সরকারকে বাজেটের রদবদল করিতে হয়, উন্নয়ন কার্যক্রমের ছাঁটকাট করিতে হয়, বিশেষ প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার (reserve of foreign exchange) নিঃশেষ করিয়াও বুভুক্ষা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

স্বল্পোন্নত দেশ বলিয়া মৌসুমী বায়ু এখনও অনেকাংশে অর্থ-ব্যবস্থাব নিয়ামক

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার তৃতীয় পর্যায়েও (third phase of planned economy) ভারতকে ইহা করিতে হইতেছে। কারণ, ভারতের মাটি শুষ্ক বলিয়া শস্যোৎপাদনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন এবং জলের জন্য ভারত এখনও বৃষ্টিপাত বা মৌসুমী বায়ুর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

ভারত যে বৃষ্টিপাত বা মৌসুমী বায়ুর উপর কতটা নির্ভরশীল, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায় জাতীয় আয়ের (National Income) প্রকৃতি ও গতি হইতে। ভারতের জাতীয় আয়ের এখনও প্রায় অর্ধাংশ অর্জিত হয় কৃষি ও অনুরূপ কাজকর্ম হইতে। এই কারণে এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ কমিয়া গেলেই উহা জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণকেও ব্যাহত করে। বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীনে জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিলেও দেখা যায় যে মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালীর ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির গতি মধ্যে মধ্যে কমিয়া যায়। এ-সম্পর্কে পরে জাতীয় আয় প্রসংগে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। এখন অর্থ-ব্যবস্থার উপর মৌসুমী বায়ুর অন্যান্য ফলাফলের বিশ্লেষণ করা হইতেছে। এই অন্যান্য ফলাফলের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল জনবসতির ঘনত্ব (density of population) এবং ভারতবাসীর অদৃষ্টনির্ভরশীলতা।

মৌসুমী বায়ুব এই গুরুত্ব বুঝা যায় জাতীয় আয়েব প্রকৃতি ও গতি হইতে

মৌসুমী বায়ুর অন্যান্য ফলাফল

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব যে-সকল ভৌগোলিক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মৌসুমী বায়ুকে সর্বপ্রধান বলিয়া স্বচ্ছন্দে অভিহিত করিতে পারা যায়। বৃষ্টিপাত প্রচুর পরিমাণে হয় বলিয়াই পশ্চিমবংগ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কতকাংশের লোকবসতি এত ঘন এবং অপ্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্যই রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চল বিশেষভাবে জনবিরল। ভারতের অধিবাসিগণের অদৃষ্ট-নির্ভরশীলতা যে কতকাংশে মৌসুমী বায়ুর জন্য—ইহাও বলা চলে। মৌসুমী বায়ুর আগমন-প্রত্যাগমনের সময়ের পরিবর্তন অথবা ইহার পরিমাণভেদের ফলে কৃষকের সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে তাহার কোন হাত নাই। আবার পর বৎসর যদি সুবৃষ্টি হয় তবে সে আশানুরূপ ফসল ঘরে তুলিতে পারে। তাহার

অদৃষ্ট যখন এরূপভাবে প্রকৃতির খেয়ালের সহিত সংযুক্ত তখন সে অদৃষ্টবাদী হইতে বাধ্য। আবার যখন কৃষকের ভাগ্যের সহিত জনসংখ্যার অপরাপর অংশের ভাগ্য বিজড়িত তখন ইহা বলা যায় যে, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ভারতবাসীকে অতিমাত্রায় অদৃষ্টনির্ভরশীল হইতে শিখাইয়াছে।

উপসংহার: বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ দিন দিন অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাবের পরিমাণকে হ্রাস করিয়া আনিতেছে। পূর্বে যে-সকল ভৌগোলিক বিষয় মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, বর্তমানে তাহাদের মধ্যে অনেককে অর্থনৈতিক জীবনের সমৃদ্ধিসাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতে মৌসুমী বায়ুর বেলায় দেখি যে, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা দূরিকরণের জন্য বহু নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বা হইতেছে। এই সকল নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা (river valley projects) হইতে জলসেচ ছাড়াও বন্যা নিরোধ, আভ্যন্তরীণ জলপথের প্রসার প্রভৃতির ব্যবস্থাও করা হইতেছে। এই দিক দিয়া বহু কিছু করা হইলেও ভারতের বিশাল আয়তনের তুলনায় বিশেষ কিছু করা এখনও সম্ভব হয় নাই। অন্যান্য ভৌগোলিক বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধুমাত্র মৌসুমী বায়ুর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে ভারতের পক্ষে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতেও বহুদিন সময় লাগিবে।

মৌসুমী বায়ুর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে ভারতের পক্ষে বহুদিন লাগিবে

(খ) সামাজিক পরিবেশ (The Social Environment): প্রাকৃতিক পরিবেশের মত না হইলেও, মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সামাজিক পরিবেশ দ্বারাও বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বল্পোন্নত অঞ্চলের অস্তিত্বের একটি প্রধান কারণই হইল রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশ। ভারত অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ বলিয়া ভারতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জীবনের উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অন্যান্য উন্নত দেশ অপেক্ষা অধিক। ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প এবং সাধারণ ভারতবাসীর জীবন এখনও প্রথা ও সামাজিক মর্যাদা (custom and status) দ্বারা বহু পরিমাণে নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগির (materialistic outlook) প্রসার ঘটিলেও অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভারতবাসীর ধর্মবোধ এখনও বিশেষভাবে জাগ্রত। এখনও বিশেষভাবে তাহার জীবনযাত্রার ভিত্তি হিসাবে স্থানাধিকার করিয়া আছে সামাজিক, ধর্মীয় ও প্রথাগত নিয়মশৃংখলা এবং বাধানিষেধ। তাই ভারতের স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার পর্যালোচনায় এই দেশের সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করিলে চলে না।

ভারতের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন সূত্র আছে। ইহাদের সকলই অর্থনৈতিক জীবনকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। বর্ণভেদ প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার, উত্তরাধিকার আইন, ধর্মবোধ, সামাজিক মর্যাদা ও প্রথা, বিবাহের সর্বজনীনতা, স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতা, উৎসব ইত্যাদিতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রভৃতি

ভারতের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক

সকলেরই প্রভাব ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা প্রথম চারিটিকে লইয়াই প্রধানত আলোচনা করিব, কারণ বর্তমানে এইগুলিই ভারতের সমাজ-সংগঠনের প্রধান চারিটি দিক।

বর্ণভেদ প্রথা (The Caste System): বর্ণভেদ প্রথাকে হিন্দু সমাজের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা যায়।

কবে, কিভাবে বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। জেমস্ মিলের (James Mill) মতে, ইহা হইল শ্রমবিভাগের উপযোগিতায় অনুপ্রাণিত কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্য। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তিবিশেষ শ্রমবিভাগের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া কার্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন জীবিকার ভিত্তিতে বর্ণের সৃষ্টি করিয়া। মার্শাল (Alfred Marshall) বলেন, "…প্রাচীন সভ্যতার রথ যে-যে জাতি চালনা করিয়াছিল তাহাদের সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর কঠোর বর্ণভেদ প্রথা দৃষ্ট হয়।"

ভারতে বর্ণভেদ প্রথা প্রথমে ছিল অতি সরল। ইহা নির্ধারিত হইত কর্মের ভিত্তিতে। কিন্তু কালক্রমে বর্ণভেদ প্রথা হইয়া উঠিল জটিল ও কঠোর এবং ইহা নির্ধারিত হইতে লাগিল জন্মের ভিত্তিতে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহাদি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেলে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িল, এবং ক্রমে অস্পৃশ্যতা নামে মহাপাপ সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিল।

গুণ: বর্তমানে আমরা পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ গুণকীর্তন করিয়া থাকি। বর্ণভেদ প্রথার সমর্থকগণ বলেন, ইহার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গ্রামীণ সমাজ ছিল পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থার অনুরূপ। এই সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জন্মানুসারে নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করিয়া যাইত, অপরের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সামাজিক অপচয়ের সৃষ্টি করিত না। বস্তুত, বর্ণভেদ প্রথার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের একপ্রকার ইংগিত পাওয়া যায়। ইহারই অধীনে প্রাচীন ভারতে গ্রামীণ সভ্যতার অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ অর্থনৈতিক সূত্রের দিক দিয়া দেখিলে, বর্ণভেদ প্রথা শ্রম-বিভাগের সৃষ্টি করিয়া অর্থনৈতিক জীবনের অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছিল। অনেকের মতে, প্রাচীন ভারতের শিল্পোন্নতির মূলে ছিল এই শ্রমবিভাগ বা বর্ণভেদ প্রথা।

তৃতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথা সকলের জন্য সহজ ও সরল শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। বর্ণভেদ প্রথার দরুন সকলেই সহজে পৈতৃক পেশা আয়ত্ত করিতে পারিত। ইহাতে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদক্ষতা বংশ-পরম্পরায় সংরক্ষিত হইত।

চতুর্থত, প্রাচীনকালে বর্ণভেদ প্রথা বিভিন্ন পেশাগত বর্ণের শ্রমিক-সংঘের অভাব-পূরণ করিয়াছিল। একই বর্ণভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন অনুভব করিয়া পরস্পরের মংগলসাধনে সচেষ্ট থাকিত, এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। বিভিন্ন বর্ণের এই ভূমিকার জন্য তাহাদিগকে মধ্যযুগের শিল্প-সংঘসমূহের (Trade Guilds) সহিত তুলনা করা হয়।

ত্রুটি ঃ বর্তমানে বর্ণভেদ প্রথা উপরি-উক্ত গুণাবলীর অধিকাংশই হারাইয়াছে। বর্তমানের সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ ও বৃহদায়তনে উৎপাদনের যুগে বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে স্থূল কর্মগত শ্রমবিভাগকে আর বিশেষ মূল্য প্রদান করা হয় না; এই প্রথার ভিত্তিতে পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থাও আজ সম্পূর্ণ অচল; উত্তরাধিকার সূত্রে শিক্ষাপ্রাপ্তির মূল্যও বিশেষ কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রায় প্রত্যেক দিকেই বর্ণভেদ প্রথা বর্তমানের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমান উপযোগ-হীনতা

অতীতেও অবশ্য বর্ণভেদ প্রথা ত্রুটিহীন ছিল না। ইহা প্রতিভার অপচয়ে সহায়তা করিয়াছে। বর্ণভেদ প্রথার জন্য কত প্রতিভাবান ব্যক্তিকে যে সামান্য কর্মে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে ঘটিয়াছে জাতীয় অপচয়। দ্বিতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথা শ্রমের সচলতা (mobility of labour) ব্যাহত করিয়া এই দেশে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে দেয় নাই। তৃতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথা শ্রমের মর্যাদারও পরিপন্থী। ইহাতেও বৃহদায়তনে উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে, কারণ শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিল্প-শ্রমিক পাওয়া যায় নাই। চতুর্থত, বর্ণভেদ প্রথার জন্য সামাজিক সচলতাও (social mobility) ব্যাহত হইয়াছে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং সমাজদেহে অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হওয়ায় জাতীয় সংহতি সাধিত হইতে পারে নাই। পরিশেষে, সাম্যের বিরোধী বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বর্ণভেদ প্রথা কোনমতেই সমর্থিত হইতে পারে না।

অতীত ত্রুটি

বর্তমান গতি ঃ প্রকৃতপক্ষে বহুদিন পূর্ব হইতেই বর্ণভেদ প্রথা গতিশীল সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অচল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ফলে সাম্প্রতিক যুগে ইহার কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ও সমাজ-সংস্কারকগণের প্রচেষ্টার ফলে বিশেষ করিয়া নগরাঞ্চলের অধিবাসীসমূহ উদার দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

তবে বর্ণভেদ প্রথা এখনও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই—কারণ, ভারত এখনও প্রধানত গ্রামীণ ভারত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী এখনও অশিক্ষিত; সুতরাং সংস্কারান্ধ। তাই নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইতেছে বর্ণভেদ প্রথাকে লুপ্ত করিবার জন্য। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, অনুন্নত বর্ণসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে, শিক্ষা বিস্তার করা হইতেছে, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় গ্রামোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে, ইত্যাদি। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সাম্য (social equality) প্রতিষ্ঠিত করিতে বহুদিন লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

এই প্রথা এখনও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই

যৌথ পরিবার প্রথা (The Joint Family System) : যৌথ পরিবার প্রথা ভারতের সামাজিক পরিবেশের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাশ্চাত্য দেশের ধারণা অনুসারে এখানে পরিবার মাত্র স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি লইয়া গঠিত হয় না। ভারতে 'পরিবার' বলিতে বুঝায়, একই পূর্বপুরুষের বিভিন্ন বংশধরের পরিবারসমূহের সমষ্টি। এইরূপ দেখা যায় যে, একই যৌথ পরিবারের অধীনে লোকে কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছে। যৌথ সম্পত্তি, যৌথ ঘরকন্না এবং যৌথ ধর্মাচরণ হইল ভারতের যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের সূচক।

ভারতীয় যৌথ পরিবারের স্বরূপ

গুণ : তত্ত্বগতভাবে দেখিলে যৌথ পরিবার প্রথা উচ্চ সামাজিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষে মানুষে সাম্য, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা, কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি উচ্চাদর্শ যৌথ পরিবার প্রথার ভিত্তি। ইহার ফলে লোকে সামর্থ্যমত কার্য করে এবং প্রয়োজনমত উপকরণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যৌথ পরিবার প্রথা একরূপ সমভোগবাদী সমাজের (communistic society) দ্যোতক।

দ্বিতীয়ত, যখন রাষ্ট্র-প্রবর্তিত সামাজিক নিরাপত্তার (social security) কোন ব্যবস্থা ছিল না তখন যৌথ পরিবারই ব্যক্তির উপার্জনের অনিশ্চয়তার সকল দায়িত্ব বহন করিত। কেহ উপার্জনে অক্ষম হইলে বা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার স্ত্রী-পুত্র না খাইয়া মরিত না।

তৃতীয়ত, বৃহদায়তনে সংসার পরিচালনার জন্য ব্যয়সংক্ষেপও হইত। অতএব অর্থনৈতিক সূত্রের দিক দিয়াও যৌথ পরিবার প্রথা সমর্থনীয় ছিল।

পরিশেষে, যৌথ পরিবার প্রথা ভারতের উত্তরাধিকার আইনের ত্রুটি বহু পরিমাণে দূর করিয়াছিল। ভূ-সম্পত্তি ব্যক্তির পরিবর্তে যৌথ পরিবারের অধীন রাখিয়া ইহা জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার (subdivision and fragmentation of holdings) বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

ত্রুটি : যৌথ পরিবার প্রথা কিন্তু কাম্য জীবনযাত্রার সহায়ক নহে। ইহা নিরুদ্যম ও অলসতাকে প্রশ্রয় দেয় বলিয়া পরিবারের মধ্যে হিংসা, মনোমালিন্য প্রভৃতি অশান্তির সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, যৌথ পরিবার প্রথা অর্থনৈতিক প্রগতিকেও ব্যাহত করে। ইহাতে ব্যক্তি নিজের পরিশ্রমের ফল একা ভোগ করিতে পারে না বলিয়া উদ্যোগ ও পরিশ্রমে উৎসাহিত হয় না।

তৃতীয়ত, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা মূলধন-গঠনেরও (capital formation) পরিপন্থী। এইরূপ পরিবারে প্রত্যেকের উপার্জন ব্যয়িত হয় সকলের জন্য। উপার্জনশীলের আয় দ্বারা অসমর্থের ভরণপোষণ করা হয়। সুতরাং সঞ্চয় বিশেষ কিছু হইতে পারে না; ফলে মূলধনও গঠিত হয় না। অ-পর্যাপ্ত মূলধনের দরুন পর্যাপ্ত পরিমাণ শিল্পোন্নয়নও সম্ভব হয় না বা হইতে পারে না।

পরিশেষে, কতকাংশে যৌথ পরিবার প্রথার জন্য ভারতের জনসংখ্যার অকাম্য

বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগির প্রসার ঘটিয়াছে এবং নিজের সন্তানসন্ততি পরিবার সম্বন্ধে ব্যক্তির দায়িত্বশীলতা গড়িয়া উঠে নাই।

বর্তমান গতি ঃ জাতিভেদ প্রথা অপেক্ষাও একান্নবর্তী পরিবার প্রথা দ্রুত-গতিতে ভাঙিয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসার যৌথ পরিবার প্রথার মূলে প্রথম আঘাত হানে। গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের ধ্বংস ও নগরিকরণের ফলে লোক পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবিকা সংস্থানের জন্য নগরাঞ্চলে বাস করিতে থাকায় পরিবারের সহিত যোগাযোগের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাও একান্নবর্তী পরিবারের সংহতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে সর্বদিকে আক্রান্ত হইয়া যৌথ পরিবার প্রথা একরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলা যায়। সুতরাং ইহা আর বর্ণভেদ প্রথার মতও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের (economic growth) পথে প্রতিবন্ধক নহে।

ইহা বর্তমানে বর্ণভেদ প্রথা অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে ভাঙিয়া পড়িতেছে

উত্তরাধিকার আইন (The Laws of Inheritance) ঃ

ভারতের সকল প্রকার উত্তরাধিকার আইনই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বহুজনের উত্তরাধিকার স্বীকার করে। ইহা পাশ্চাত্য দেশে প্রবর্তিত প্রথার একপ্রকার বিপরীত।

ভারতের উত্তরাধিকার আইনের বৈশিষ্ট্য

গুণ ঃ ভারতীয় এই উত্তরাধিকার আইন সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেই সমান সুযোগসুবিধা লইয়া জীবনযাত্রা সুরু করিবে—ইহাই ত সাম্যের মুলকথা। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন এই মূলনীতির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই সম্পর্কে বর্তমান আইন স্ত্রী-পুরুষে ভেদ করে নাই।

ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের জন্য সকলেই উত্তরাধিকার সূত্রে সামান্য সম্পত্তি পায় বলিয়া সকলেরই কর্মস্পৃহা ও উদ্যোগ অটুট থাকে। ইহাতে ধনোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে ; সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়।

ত্রুটি ঃ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে বৃহদায়তনে উৎপাদনের পরিপন্থী। উত্তরাধিকার আইনের জন্য কৃষি-জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে কৃষি হইয়া উঠে মুনাফাহীন পেশা মাত্র।

উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার আইন প্রতিবন্ধকের কার্য করে। একজনের সঞ্চয় তাহার মৃত্যুর সংগে সংগে বহু অংশে বিভক্ত হইয়া যায় বলিয়া বৃহদায়তনে বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না। সকলেই তাহার সামান্য সম্পত্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া গতানুগতিকভাবে ভোগ করিতে সচেষ্ট হয়।

ইহাও বলা যায় যে, সকলেই কিছু কিছু পায় বলিয়া গোড়া হইতেই সকলে কর্মোদ্যমী ও উদ্যোগী হইয়া উঠে না। সুতরাং উত্তরাধিকার আইন যেরূপ একদিকে কর্মোদ্যম ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করে ; অপরদিকে আবার ইহার প্রতিবন্ধকের কার্যও করে।

ধর্মের প্রভাব (Influence of Religion) : ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ধর্মের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। অনেক ভারতীয় এখনও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অপেক্ষা ধর্মকে এবং ইহলোক অপেক্ষা পরলোককেই বড় করিয়া দেখে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, ভারতে জনসাধারণের অনন্যসাধারণ ধর্মবোধ এবং পারলৌকিক মনোভাবই তাহাদের উদ্যমহীনতা এবং ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই মতকে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া যায় না। পাশ্চাত্য দেশসমূহও এক সময় ধর্মের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহারা অর্থনৈতিক প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। প্রাচীন ভারতে ধর্মের প্রভাব যখন অধিকতর ছিল তখনই ভারতীয়গণ শিল্প-বাণিজ্যে অনন্যসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হইল প্রায় ২০০ বৎসরের পরাধীনতা। বিদেশী শাসন ভারতের নিজস্ব শিল্পকে ধ্বংস করিয়াছিল, নানাভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছিল, শিক্ষাবিস্তারে পরাংমুখ থাকিয়া দেশবাসীকে অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারাই ভারতীয়গণের মধ্যে ধর্মান্ধতার সৃষ্টি করিয়া এবং উহাকে কাজে লাগাইয়া নিজেদের স্বার্থসাধন করিয়াছিল। বর্তমানে পটভূমিকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ফলে ধর্মান্ধতা হইতে বিদায় লইবার দিনও আসিয়াছে।

ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ

সামাজিক প্রথা (Social Customs) : ভারতের পিতৃদায়, মাতৃদায়, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পূজাপার্বণ প্রভৃতি নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিরাট ব্যয় করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এইরূপ ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান পালন না করাই উচিত। অনেক সময় দেখা যায় যে, এ-দেশে লোকে ঋণ করিয়াও এগুলি পালন করিয়া থাকে। ইহা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। ইহার ফলে কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়, সঞ্চয়ের অভাবে মূলধন-গঠন ব্যাহত হয়, ইত্যাদি। অতএব, উদারনৈতিক ও উপযোগিতামূলক শিক্ষাবিস্তারের সাহায্যে এই সকল আড়ম্বরপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানকে সামাজিক পরিবেশ হইতে বিদায় করিতেই হইবে।

ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the extent to which economic life in India has been affected by Geographical features. (৬-১২ পৃষ্ঠা)

2. In what manner do the important social and religious institutions help or hinder the economic progress of the people of India ? Give examples. (B. Com. 1942, '44 ; B. A. 1941) (১২-১৭ পৃষ্ঠা)

3. Examine the socio-economic factors impeding economic growth in India. (C. U. B. Com. 1960)

[ইংগিত : সামাজিক পরিবেশ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, মূলধনের অ-পর্যাপ্তি, শিল্প-শিক্ষার অভাব প্রভৃতি সকলেরই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। (...১২-১৭ পৃষ্ঠা)]

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক কাঠামো

(Economic Structure)

অর্থনৈতিক কাঠামো বলিতে কি বুঝায়

কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ছাড়াও উহার অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, মূলধন ও উহার গঠনের হার, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন, মাথাপিছু আয় ও লোকের জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতি হইতেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রকৃতি বুঝা যায়।

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যে এক ধরনের নয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কতকগুলি দেশে শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; ফলে সেখানে লোকের জীবনযাত্রার মান অতি উচ্চ। আবার কতকগুলি দেশ অর্থনৈতিক প্রসারের দিক হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে; স্বতই সেখানকার লোকের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন। অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে বিচার করিয়া সকল দেশকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, জার্মেনী প্রভৃতি কতকগুলি দেশকে অতি উন্নত (highly developed) দেশ বলা হয়; এই সকল দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় অধিক। দ্বিতীয়ত, ইতালী হাংগেরী অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহাদের অর্থনৈতিক প্রসার অতি উচ্চস্তরে না পৌছাইলেও অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তৃতীয়ত, ভারত পাকিস্তান ব্রহ্মদেশ আফগানিস্তান মালয় প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহারা অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। এই সকল দেশের লোকের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। এই তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলিকে 'অনুন্নত দেশ' বলিয়া অভিহিত করা যায়। কিন্তু 'অনুন্নত' শব্দটির ব্যবহারে অনেকের আপত্তি থাকায় বর্তমানে অর্থবিদ্যাবিদগণ এই সকল দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ (underdeveloped countries) বলিয়া অভিহিত করেন।* পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের উপর লোক এই স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বাস করে বলিয়া উহাদের উন্নয়ন অন্যতম আন্তর্জাতিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে তিন শ্রেণীর দেশ

অতএব, ভারত অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ। ইহার পর সুস্পষ্টভাবে জানার প্রয়োজন হয় যে স্বল্পোন্নত দেশের লক্ষণ কি কি? এই সকল দেশের কাঠামো কি প্রকার এবং

* **Paul A. Samuelson:** ***Economics—An Introductory Analysis***

ইহাদের উন্নয়নসাধনেরই বা পন্থা কি? আমরা এই সকল আলোচনা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেই করিব।

বিভিন্ন লেখক স্বল্পোন্নত দেশের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই তর্ক-বিতর্কের ভিতর না যাইয়া সংক্ষেপে বলা যায়: স্বল্পোন্নত হইল সেই দেশ যাহার বর্তমান মাথাপিছু আয় উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অতি সামান্য এবং যাহার অর্থনৈতিক প্রসারসাধনের (growth) যথেষ্ট সম্ভাবনা (potentiality) রহিয়াছে। জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম ইয়োরোপের মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের তুলনায় যে-সকল দেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় নিম্ন সে-সকল দেশকেই বুঝাইবার জন্য আমরা 'স্বল্পোন্নত দেশ' কথাটি ব্যবহার করি।* ভারতের দৃষ্টান্ত লইলেই এ-সংজ্ঞার অর্থ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ১৯৬০-৬১ সালে (১৯৪৮-৪৯ সালের দামের হিসাবে) ভারতে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ২৯৩·৭ টাকা; অপরদিকে ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০,০০০ এবং ৫০০০ টাকার মত, এবং ক্যানাডায় ৭০০০ টাকার উপর। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভারত কত পিছনে পড়িয়া আছে। অথচ ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এবং জনবলের প্রাচুর্য রহিয়াছে। আমরা এই প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়াও অতি দরিদ্র রহিয়া গিয়াছি। উৎপাদনের উন্নতিসাধন করিয়া এই সকল সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিলে লোকের মাথাপিছু আয় বাড়িয়া যাইবে এবং জীবনযাত্রার মানও উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে। অতএব, বর্তমান মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা এবং সম্প্রসারণের সম্ভাবনা হইল স্বল্পোন্নত দেশের দুইটি প্রধান লক্ষণ।

সংক্ষেপে স্বল্পোন্নত দেশ বলিতে কি বুঝায়

স্বল্পোন্নত দেশের দুইটি প্রধান লক্ষণ

ভারতের স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার পরিচয় (Description of India's Underdeveloped Economy): জাতীয় আয়ের গতি ও প্রকৃতিতে স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার দুইটি প্রধান লক্ষণ—মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। উহা এবং অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়—যথা, বিনিয়োগের হার, নিয়োগাবস্থা (employment situation), ভোগ্য-দ্রব্যের উপর ব্যয় (expenditure pattern), জনসংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি হইতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও নির্দেশ করা যায়।

(ক) জাতীয় ও মাথাপিছু আয় (National and *Per Capita* Incomes): প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন ১০ বৎসরে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় (১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে) যথাক্রমে শতকরা ৪৪ ও ১৮ ভাগের উপর

---

* ***Measures For The Economic Development of Underdeveloped Countries,*** **Report by a Group of Experts (U. N.)**

বৃদ্ধি পায়। তৎসত্বেও আমরা দেখিয়াছি যে, উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতে মাথাপিছু আয় অত্যল্প।

ভারতে মোট জাতীয় আয়ের অর্ধাংশের মত অর্জিত হয় কৃষি হইতে, এবং শিল্প খনি ইত্যাদি হইতে আসে মাত্র শতকরা ১৭-১৮ ভাগের মত।* তুলনামূলকভাবে ইংল্যাণ্ডে মোট জাতীয় আয়ে শিল্পক্ষেত্রের দান হইল প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ এবং কৃষির দান শতকরা ৫ ভাগেরও কম।** সুতরাং কৃষির প্রাধান্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ইহার আরও পরিচয় পাওয়া যায় লোকের জীবিকার্জন পদ্ধতি হইতে। ভারতে জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ কৃষিজীবী—এবং মাত্র ১১-১২ ভাগের মত লোক শিল্পকার্যে নিযুক্ত। কৃষির এইরূপ প্রাধান্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা স্বল্পোন্নত দেশেরই পরিচায়ক।

কৃষির প্রাধান্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা

জাতীয় জীবনে কৃষির ভূমিকা প্রধান হইলেও এইরূপ দেশে কৃষি অনুন্নতই হয়। উৎপাদন-পদ্ধতি অতি প্রাচীন, জমি অসম্বদ্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেচ-ব্যবস্থা অনুন্নত, সার ও বীজ নিকৃষ্ট ধরনের হইতে দেখা যায়। ফলে জমি হইতে ফসল উৎপন্নের হার অতি কম হয়। ইহা ছাড়া দেখা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশে ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থায় জমির মালিকানা কৃষকের থাকে না; থাকে মধ্যস্বত্বভোগীদের। কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দেশে এইরূপ ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থা বর্তমান ছিল।

কৃষির প্রাধান্য সত্বেও অনুন্নত কৃষি-পদ্ধতি

(খ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (Savings and Investment): স্বল্পোন্নত দেশের লোক দারিদ্র্যক্লিষ্ট বলিয়া তাহাদের সঞ্চয়ক্ষমতাও অতি সামান্য। ফলে মূলধন-গঠন (capital formation) বা বিনিয়োগের হারও অতি সামান্য হয়।† ইংল্যাণ্ডে বাৎসরিক বিনিয়োগের হার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১৯ ভাগের মত। আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্বেও মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগের বেশী বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। সাম্প্রতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে উহা কিছু বাড়িয়া শতকরা ১১ ভাগে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

অত্যল্প সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

এইভাবে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পাইলেও সংগতির তুলনায় শিল্পপ্রসারের অনুপাত মোটেই কাম্য হয় নাই। ইহার কারণ হইল সাধারণের সঞ্চয়ের এক মোটা অংশ হয় গহনাপত্র ইত্যাদিতে আটকাইয়া আছে এবং না-হয় ফটকা বাজার, মালমজুত, চোরা কারবার ইত্যাদিতে নিয়োজিত আছে।

সঞ্চয়ের অকাম্য ব্যবহার

---

* Estimates of National Income from 1957-58 to 1961-62

** *Britain—An Official Handbook* 1962 Edition

† "The domestic accumulation of capital in a poor country is bound to be slow". Jacob Viner

স্বল্পোন্নত দেশে এইরূপই হয়—মোট সঞ্চয় ও শিল্পপ্রসারে বিনিয়োগের মধ্যে এইরূপ অসংগতিই দেখা যায়।*

(গ) জাতীয় আয়ের বণ্টন (Distribution of National Income): স্বল্পোন্নত দেশে শুধু জাতীয় ও মাথাপিছু আয় স্বল্পই হয় না, জাতীয় আয়ের বণ্টনও বৈষম্যমূলক হয়। ভারতে জাতীয় আয়ের বণ্টন কতটা বৈষম্যমূলক তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন তথ্য হইতে দেখা যায় যে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতে ধনবৈষম্য বিশেষ প্রকট। রিজার্ভ ব্যাংকের এক সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে নগরাঞ্চলে শতকরা ৮৯টি পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ১২০০ টাকার মত এবং মাত্র শতকরা ১১টি পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৬০০০ টাকার কাছাকাছি।** গ্রামাঞ্চলেও যে অনুরূপ বৈষম্য রহিয়াছে রিজার্ভ ব্যাংকের উক্ত হিসাবে তাহাও দেখানো হইয়াছে।

জাতীয় আয়ের বৈষম্য-মূলক বণ্টন

(ঘ) কর্মসংস্থানের অবস্থা (Employment Situation): স্বল্পোন্নত দেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (disguised unemployment)। ভারতে শিল্পপ্রসারের অভাবে এবং বৈদেশিক যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় কুটির ও গ্রামীণ শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অধিকাংশ জমিতে গিয়া ভিড় করিয়াছে। ফলে জমির উপর চাপ অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। পরিবারভুক্ত ক্ষুদ্র জমি চাষ করিতে যত লোকের প্রয়োজন হয় তাহার অধিক লোক ঐ জমিতে খাটিতেছে। এই অতিরিক্ত লোকদের জমি হইতে সরাইয়া আনিলে জমির উৎপাদন কোনক্রমেই হ্রাস পায় না। সুতরাং এই সকল লোকদের অনাবশ্যক বা বেকারের পর্যায়ে ফেলিতে হয়। কৃষিতে এই ছদ্ম বেকারত্ব ছাড়াও এই দেশে শিল্পগত বেকার-সমস্যা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্ব প্রভৃতি অন্যান্য ধরনের বেকারত্ব রহিয়াছে।

ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের আধিক্য

(ঙ) ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় (Expenditure Pattern): ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় হইতেও স্বল্পোন্নত দেশের অনগ্রসরতার পরিচয় পাওয়া যায়। উন্নত দেশসমূহে জনগণের খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় হইল মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশের মত; ভারতে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে উহা হইল মোটের দুই-তৃতীয়াংশ এবং নগরাঞ্চলে অর্ধেকের উপর।† খাদ্যের পর বস্ত্রের

খাদ্য ও পরিচ্ছদের উপর ব্যয়াধিক্য

* "Mal-investment of savings is an important problem in underdeveloped countries." *Measures for Economic Development of underdeveloped countries* (U. N.) এবং Samuelson, *Economics—An Introductory Analysis*

** Reserve Bank Bulletin Sept. 1962. এ-সম্বন্ধে আরও প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের নেতৃত্বে একটি কমিটি (Committee on Distribution of National Income) নিযুক্ত করা হইয়াছে।

† "With very low living standards the bulk of the...money income of the population is spent on food and relatively primitive items of clothing and household necessities." Paul A. Baran

জন্য যায় মোট ব্যয়ের শতকরা ১০ ভাগের মত। তবুও লোকে ন্যূনতম পুষ্টিকর খাদ্য ও ন্যূনতম পরিচ্ছদ জুটাইতে পারে না। যেখানে প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে ন্যূনতম ৩০০০ ক্যালোরি-মূল্যের খাদ্যগ্রহণ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, সেখানে ভারতে গড় ক্যালোরি গ্রহণ হইল ২১০০। মাথাপিছু বস্ত্র-ব্যবহারও গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহের গড়ের তুলনায় কম—১৯ গজের স্থলে ১৫·৫ গজ মাত্র। খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য এই পরিমাণ ব্যয়ের দরুন অন্যান্য খাতে ব্যয় যে অকিঞ্চিৎকর তাহা সহজেই অনুমেয়।

(চ) জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রসার (Population Growth and Spread of Education) : স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অত্যধিক হয়।

দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি

ভারতে বর্তমানে বৎসরে ৮০ লক্ষের অধিক করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্মমৃত্যুর উচ্চহার, স্বল্প জীবনকাল, শিশুমৃত্যুর আধিক্য প্রভৃতি অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেরও বৈশিষ্ট্য।

ব্যাপক নিরক্ষরতা

স্বল্পোন্নত দেশে নিরক্ষরতার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতে এখনও শতকরা ৭৬ জন নিরক্ষর।* নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান কারণ; আবার জনসংখ্যাবৃদ্ধিও নিরক্ষরতার অন্যতম হেতু।

শিল্প-শিক্ষার অভাব

স্বল্পোন্নত দেশে শুধু ব্যাপক নিরক্ষরতাই দেখা যায় না, যেটুকু শিক্ষার প্রসার ঘটে তাহাও প্রায় সাহিত্য-কলার (Humanities) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বৃত্তিমূলক ও শিল্প-শিক্ষার প্রসার তুলনায় অনেক কম হয়। ফলে কারিগরি দক্ষতার (technical skill) অভাবও শিল্পসম্প্রসারণকে ব্যাহত করিতে থাকে।

(ছ) বহির্বাণিজ্য (Foreign Trade) : স্বল্পোন্নত দেশের বহির্বাণিজ্য ঔপনিবেশিক (colonial) ধরনের হয়। এরূপ বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হইল দেশ হইতে সস্তা দরে শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে কাঁচামাল রপ্তানি করা এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য আমদানি করা। এরূপ হইবার প্রধান কারণ হইল বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণ। ভারতের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। ব্রিটিশ সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিয়াই ভারতের শিল্পপ্রসারে বাধা দিয়াছে এবং নিজ দেশের শিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়াছে। ফলে ভারতকে সেদিন পর্যন্ত কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য রপ্তানি এবং যন্ত্রশিল্প-নির্মিত দ্রব্য আমদানি করিতে হইয়াছে।

ঔপনিবেশিক ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্য

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর (Transition in Indian Economy) : ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা স্বল্পোন্নত হইলেও বর্তমানে উহার রূপান্তর ঘটিতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থাকে উন্নয়নমূলক রূপ দানের প্রচেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের আলোচনা দুই দিক হইতে করা যাইতে

দুই প্রকার রূপান্তর

* ১৯৬১ সালের জনগণনার হিসাব।

পারে—যথা, (ক) স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর, এবং (খ) স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর।

(ক) স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর (Transition from *Laissez Faire* Economy to Planned Economy) : স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ধনতন্ত্রেরই প্রতিফলন। এই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যায়—যথা, (ক) ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিতে অব্যাহত অধিকার, (খ) উদ্যোগের স্বাধীনতা (freedom of enterprise), এবং (গ) ভোগ্যপণ্য-ক্রেতার স্বাধীনতা (sovereignty of the consumer)।

স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্যবাদই ছিল বহু-অনুসৃত অর্থ-ব্যবস্থা। বিভিন্ন অর্থবিদ্যাবিদ নানা দিক দিয়া ইহার গুণগানও করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা দিয়াছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একরূপ বিশ্বব্যাপী প্রবল প্রতিক্রিয়া। অন্যান্যের মধ্যে বলা হয় যে এই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক নহে।

পরিকল্পনা-প্রবণতার কারণ

ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা স্বাতন্ত্র্যবাদী থাকিলেও পরিকল্পনার জল্পনা-কল্পনা বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ইহার মধ্যে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস কর্তৃক 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' (National Planning Committee) গঠন এবং ১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন' (Planning and Development) বিভাগ স্থাপন এবং শিল্পপতিগণ কর্তৃক বোম্বাই পরিকল্পনা (Bombay Plan) রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।*

স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা-প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৮ সালের সরকারী শিল্পনীতি প্রস্তাবে (Industrial Policy Resolution) মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) প্রবর্তনের ঘোষণা করা হয়। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থারই একটি রূপ। এই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাই প্রতিফলিত হয় প্রথম পরিকল্পনার শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রমে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রাক্কালে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকারী শিল্পনীতির পরিমার্জনা করিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ব্যাপকতর এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হয়। ইহার ফলে ভারত পূর্ণ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পথে আরও এক পদ অগ্রসর হয়।

আশা করা যায়, এইভাবে ধীরে ধীরে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সংকোচন ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ দ্বারা একদিন পূর্ণ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাই প্রবর্তন করা হইবে। সেদিন ভারতের

বর্তমান রূপান্তর

* দ্বিতীয় খণ্ডে 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

সমাজ-ব্যবস্থা হইবে সমাজতন্ত্রী ধরনের। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে বলিয়া ইহাকে অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের অন্যতম দিক বলিয়া গণ্য করা হয়।

(খ) স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর (Transition from Underdeveloped Economy to Developmental Economy): ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি—যথা, (ক) স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, (খ) সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য

ভারত যে অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। এখন দেখা প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত অঞ্চলসমূহের অস্তিত্বের কারণ কি? স্বল্পোন্নত অঞ্চল-সমূহের অস্তিত্বের কারণ প্রধানত তিন প্রকার—(ক) রাষ্ট্রনৈতিক, (খ) সামাজিক, এবং (গ) অর্থনৈতিক। রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহ স্বল্পোন্নতই থাকিয়া যায়। কারণ, নিজের স্বার্থবিরুদ্ধ বলিয়া সাম্রাজ্যিক শক্তি উপনিবেশ ও অধীন দেশসমূহের পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাভাবে বাধা প্রদান করে।

স্বল্পোন্নত অঞ্চলসমূহের অস্তিত্বের তিনটি কারণ

স্বল্পোন্নত দেশের সমাজ বিশেষভাবে শ্রেণীবিভক্ত এবং সামন্তপ্রথা সমন্বিত হয়। এখানে ভূস্বামিবর্গ পরগাছার ন্যায় কৃষককুলের স্কন্ধে চাপিয়া থাকে, শিল্পপতিগণ চরম স্বৈরাচারী হয় এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দ দেশের শোষণে বিদেশীয়কে সহায়তা করিতে থাকে। উপরন্তু, বর্ণভেদ প্রথা, যৌথ পরিবার প্রথা প্রভৃতির ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানও উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অস্তিত্বের অন্যতম অর্থনৈতিক কারণ হইল অত্যধিক হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি। জনসংখ্যার আয়তন বিরাট হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন এবং শ্রমের কাম্য সমন্বয়সাধন সম্ভব হয় না—স্বল্প জমি ও মূলধনের সহিত অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকপিছু উৎপাদন স্বল্প হয়।

এই অবস্থা হইতে মুক্তি—অর্থাৎ, স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রবর্তন। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে (ক) অধিক মূলধন-সংগঠনের (capital formation) দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, (খ) শ্রমের অপব্যয় যথাসম্ভব রহিত করিয়া উহাকে উৎপাদন কাজকর্মে নিযুক্ত করিতে হইবে, (গ) মূলধনকে অধিকতর উৎপাদনশীল করিতে হইবে, (ঘ) জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং (ঙ) সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি করিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে স্থাপিত করিতে হইবে।

স্বল্পোন্নত অবস্থা হইতে মুক্তির উপায়

বর্তমান ভারতে ইহাই করা হইতেছে। তাই বলা হয় যে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা আজ আর এক দিক দিয়া রূপান্তরের পথে। এই রূপান্তর হইল স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিস্তৃততর আলোচনার সংগে সংগে এই রূপান্তরের পরিচয়ই প্রদান করা হইবে।

ভারত এখন মুক্তির পথে

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the main features of underdevelopment to be witnessed in India's economy today. (C. U. B. A. 196[illegible] , [illegible] [illegible] [illegible])

2. Discus why India is regarded as an underdeveloped economy. (C. U. B. Com. (P. I) 1962) (১৯-২২ পৃষ্ঠা)

3. Briefly describe the transition in Indian Economy. (২২-২৫ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ
(Natural Resources)

স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন-সম্ভাবনা কতদূর তাহা অনেকাংশে নির্ধারণ করা যায় প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ হইতে। এই কারণে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থার পর্যালোচনায় প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ একপ্রকার অপরিহার্য বিবেচিত হয়। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ, শক্তিসম্পদ ও বনসম্পদ—এই তিনটিই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপাদান হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources): ভারতে এখনও বিস্তারিত-ভাবে খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তবে এ-পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্যাদি ও বিবরণ হইতে বলা যায় যে, ভারতের খনিজ সম্পদ অপর্যাপ্ত নহে, আবার নগণ্যও নহে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনিজ সম্পদের উৎপাদন-ব্যবস্থা এখনও করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই।

খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতি

ভারতীয় ভূতত্ত্বে 'গণ্ডোয়ানা' নামে অভিহিত অঞ্চলই ভারতের খনিজ সম্পদের প্রধান স্থান। গঠনের দিক হইতে দেখিলে ভারতে কয়েকটি খনিজ সম্পদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—যথা, লৌহ-আকর (iron ore), অভ্র, ম্যাংগানীজ, কয়লা,

বক্সাইট প্রভৃতি। ইহার মধ্যে ভারতকে আবার অভ্রের একচেটিয়া উৎপাদক বলিয়াও বর্ণনা করা চলে। কিন্তু আর কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদে ভারত নিঃসন্দেহে দরিদ্র দেশ—যথা, তাম্র দস্তা পারদ টিন স্বর্ণ রৌপ্য চীনামাটি প্রভৃতি।

খনি শিল্পের একটি প্রধান ত্রুটি

ভারতের খনি শিল্পের একটি প্রধান ত্রুটির দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে খনি শিল্প এতদিন প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইয়োরোপীয়দের হস্তে ছিল। তাহারা প্রধানত রপ্তানির জন্যই খনিজ দ্রব্য উৎপাদন করিত। ইহার ফলে বিদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে ভারতের অনেক মূল্যবান খনিজ সম্পদকে একপ্রকার নিঃশেষ করা হইয়াছে। স্বাধীন দেশের পরিকল্পিত শিল্প-ব্যবস্থায় এই নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক কথা বলার প্রয়োজন নাই। তবে এই বিষয়টি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় শিল্পের প্রয়োজনেও খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলিবে না। যাহারা আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে সেই উত্তরপুরুষদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের খনিজ সম্পদের ব্যবহার করিতে হইবে।

ভবিষ্যৎ নীতি সম্বন্ধে নির্দেশ

কয়লা (Coal) : ভারতের জ্বালানি খনিজের (Fuels) মধ্যে কয়লাই প্রধান। উপরন্তু, এখন পর্যন্ত ইহা শক্তিরও (power) সর্বপ্রধান উৎস। যানবাহন, কলকারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন, নিত্য সংসারযাত্রা প্রভৃতিতে এখনও ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া আছে। ভারতের ভূগর্ভে সঞ্চিত মোট উৎকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ ৫০০০ কোটি টনের মত বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।* ভারতের কয়লাখনিগুলির অধিকাংশই পশ্চিমবংগ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রের 'গণ্ডোয়ানা অঞ্চলে' অবস্থিত। ইহার মধ্যে আবার পশ্চিমবংগ ও বিহার রাজ্যের খনি অঞ্চল হইতে মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৯০ ভাগ পাওয়া যায়।

খনিগুলির আঞ্চলিকতা এই শিল্পের প্রধান সমস্যা

ভারতের কয়লাখনিগুলির এই আঞ্চলিকতা শিল্পোন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের জন্য পশ্চিমবংগ ও বিহারের কয়লাখনিগুলি হইতে কয়লা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। ফলে উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে এবং সময়মত কয়লা না পৌছাইলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কয়লার আঞ্চলিক বণ্টনজনিত এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকার আর্কট অঞ্চলে বহু পরিমাণে পিংগলবর্ণের কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে। অন্ধ্র সরকারও ঐ রাজ্যের কয়লাখনিগুলি হইতে আধুনিক উপায়ে অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা রাজস্থান অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও কয়লাখনি উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতের ভূগর্ভে সঞ্চিত মোট কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও উৎকৃষ্ট ধাতুনিষ্কাশক (Metallurgical) এবং 'কোক' কয়লার (cocking coal) পরিমাণ অত্যল্প।

* Third Five Year Plan

কয়লাক্ষেত্র কমিটির (Coalfield Committee) হিসাব অনুসারে আমরা মাত্র ১৬০ কোটি টন কোক কয়লা খনি হইতে উত্তোলন করিতে পারি। ১৯৫০ সালের ধাতুনিষ্কাশক কয়লা সংরক্ষণ কমিটির (Metallurgical Coal Conservation Committee, 1950) রিপোর্ট অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে উপরি-উক্ত অনুমিত উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া অর্ধেক হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধাতুনিষ্কাশক ও কোক কয়লার উত্তোলন ও ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই কারণে ১৯৫২ সালে ধাতুনিষ্কাশক ও কোক কয়লার বাৎসরিক উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কয়লাখনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন [Coal Mining (Conservation and Safety) Act, 1952] নামে একটি আইন পাস করা হয়।

কোক কয়লার অত্যল্পতা আর একটি সমস্যা

বর্তমানে খনি হইতে কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অবলম্বন করা হইতেছে। ইহা ছাড়া উৎকৃষ্ট ধাতুনিষ্কাশক ও কোক কয়লার গুণগত অভিন্নতা বজায় রাখার জন্য যথাসম্ভব এই প্রকার সকল কয়লারই ধৌতকরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে কারগালি (Kargali) প্রভৃতি স্থানে কয়লা ধৌতকরণ কারখানা (coal washeries) এবং দুর্গাপুর প্রভৃতি লৌহ-প্রতিষ্ঠানে কয়লা চুল্লী কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার সুরু (১৯৫১) হইতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই ১১ বৎসরে কয়লার উৎপাদন ৩·২ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬·১ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ৯·৭ লক্ষ টনে পৌঁছাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

তৈল (Oil) : ভারতে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ খুবই সামান্য। আসামের ডিগবয় হইতেই যা-কিছু তৈল পাওয়া যায়। এই সূত্র হইতে ৪ লক্ষ টন বা ভারতের মোট প্রয়োজনের শতকরা ৫ ভাগের কিছু উপর তৈল পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় তৈলের বাকী অংশ বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। সম্প্রতি অবশ্য নবাবিষ্কৃত আসামের নাহারকাটিয়া ও মোরাণের তৈলখনি দুইটি হইতে তৈল উত্তোলনের ও তৈল পরিশোধনের যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে ভারতের মোট প্রয়োজনের শতকরা ২৫-৩০ ভাগ আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে মিটিবে, এবং তখনও অন্তত শতকরা ৭০ ভাগ তৈল বাহির হইতে আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কারণে নূতন নূতন তৈলখনির সন্ধানের দিকে পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়া ইক্ষু অপজাত (by-product) এবং কয়লা হইতে মিশ্র পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করিয়া তৈলের এই অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকারের সহিত দুইটি মার্কিন এবং একটি ব্রিটিশ তৈল কোম্পানীর সহিত তিনটি পৃথক চুক্তি দ্বারা তিনটি তৈল শোধনাগার

স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্ধেক সরকারী মালিকানায় নাহারকাটিয়া ও মোরাণের খনির তৈল শোধন করিবার জন্য গৌহাটীর নিকট নূনমাটিতে এবং বিহারের বারৌণীতে দুইটি শোধনাগার নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে দুইটি শোধনাগার স্থাপনের কার্যই সমাপ্ত হইয়াছে।

তৈল শোধনাগার স্থাপন

লৌহ-আকর (Iron Ore): লৌহ-আকর অন্যতম ধাতব খনিজ (metallic mineral)। এই ধাতব খনিজে ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। ভারতের কোন কোন স্থানের লৌহ-আকর পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের মধ্য হইতে শতকরা ৭০ ভাগের কাছাকাছিও লৌহ পাওয়া যায়। অনেকের মতে, এশিয়ার মধ্যে ভারতেই সর্ববৃহৎ লৌহ-আকরের খনি আছে এবং ইহার পরিমাণ এত অধিক যে হাজার বৎসরেও ইহা নিঃশেষ হইবে না। সরকারী হিসাব অনুসারে আনুমানিক সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল ২১০০ কোটি টন বা সমগ্র পৃথিবীর সঞ্চয়ের এক-চতুর্থাংশ।*

লৌহ-আকরে ভারত সমৃদ্ধ দেশ

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের ইহা অন্যতম সৌভাগ্য যে, যে-সকল অঞ্চলে লৌহ-আকর পাওয়া যায় প্রধানত সেই সকল অঞ্চলেই কয়লার খনিগুলি অবস্থিত। ফলে ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) সুসংগঠিতভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং দিন দিন ইহা ক্রমোন্নতির পথে চলিতেছে। এ-সম্পর্কে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আলোচনা প্রসংগে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

ভারতে কয়লা ও লৌহ কাছাকাছি পাওয়া যায়

ম্যাংগানীজ-আকর (Manganese Ore): ম্যাংগানীজ অন্যতম গঠনকারী ধাতু (Structural Metal)। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের উৎপাদন-ব্যবস্থায় ম্যাংগানীজ ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে ইস্পাত শিল্পই প্রধান। ম্যাংগানীজেও ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। উৎপাদনের দিক দিয়া ইহাতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী। সর্বশেষ তথ্যানুসারে ভারতের ভূগর্ভে সঞ্চিত মোট ম্যাংগানীজ-আকরের পরিমাণ ১৮ কোটি টন বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ম্যাংগানীজের উপযোগিতা

১৯৫০ সালের পূর্বে বৎসরে গড়ে ৬ লক্ষ টন করিয়া ম্যাংগানীজ-আকর উৎপন্ন হইত। বর্তমানে উহা বাড়িয়া ১৫-১৬ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে। উৎপন্ন ম্যাংগানীজের অধিকাংশ পূর্বের মত বিদেশে রপ্তানি না হইয়া দেশীয় শিল্পসমূহে ব্যবহৃত হইতেছে।

বক্সাইট (Bauxite): বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়াম তৈয়ারি হয়। ভারতে সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ ২৫ কোটি টন বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর আকর হইল মাত্র ২·৮ কোটি টন। ১৯৫০ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল

* India—1962

মাত্র ৬০ হাজার টন। বর্তমানে উহা দ্বিগুণের উপর হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় উহা সামান্যই। এতদিন পর্যন্ত সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়াম তৈয়ারির পথে ছিল প্রধান বাধা। ক্রমশ সেই বাধা দূরীভূত হইতেছে।

ইউরেনিয়াম (Uranium): আণবিক শক্তির উপাদান ইউরেনিয়াম কেরল এবং আরও কোন কোন অঞ্চলে পাওয়া যায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

অভ্র (Mica): অভ্র ভারতের সর্বপ্রধান অ-ধাতব খনিজ (non-metallic mineral)। পৃথিবীর মধ্যে ভারতই অভ্রের সর্বপ্রধান উৎপাদক। সমগ্র বিশ্বে বৎসরে যত পরিমাণে অভ্রের পাত (Sheet Mica) উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ আসে ভারত হইতে। বিহারের হাজারিবাগ ও গয়া জিলাই অভ্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। বর্তমানে উৎপাদনের পরিমাণ ৩০-৩৫ হাজার টন।

ভারত অভ্রের সর্বপ্রধান উৎপাদক

অভ্রের প্রধান ব্যবহারক হইল বৈদ্যুতিক শিল্প। ভারতে যে-পরিমাণে বৈদ্যুতিক শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে তাহার তুলনায় অভ্রের উৎপাদন হইল অত্যধিক। সুতরাং অভ্র শিল্পকে বিশেষভাবে রপ্তানির উপর নির্ভর করিতে হয়।

জিপসাম (Gypsum): সিমেণ্ট এবং রাসায়নিক সার তৈয়ারি করিতে বিশেষ পরিমাণে গন্ধকের প্রয়োজন হয়। জিপসামের মধ্যে গন্ধক থাকে। সিন্ধ্রি প্রভৃতিতে সার তৈয়ারির কারখানা স্থাপন এবং অধিকতর সিমেণ্ট উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণের পর ধাতু হিসাবে জিপসামের গুরুত্ব এদেশে বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সঞ্চিত জিপসামের পরিমাণ ১০০ কোটি টনের মত বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

জিপসামের গুরুত্ব বৃদ্ধি

খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে সরকারী নীতি (India's Minerals Policy): ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে খনিজ সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে একটি মাত্র 'নীতি' ছিল—বলা চলে ; এবং ইহা হইল খনিজ মালিকদের স্বার্থে খনিজ দ্রব্যের যথেচ্ছ উত্তোলন ও রপ্তানি। ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা প্রয়োজনমত জাতীয় শিল্পের প্রসার ঘটিতেছিল না।

ব্রিটিশ আমলে সরকারী নীতি

খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন-পদ্ধতিও ছিল বিশেষ প্রাচীন ধরনের। অতি অল্প ক্ষেত্রেই খনিতে আধুনিক যন্ত্রিকরণের (mechanization) নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। এই কারণে বহু পরিমাণে খনিজ সম্পদের অপচয় ঘটিতে থাকে।

ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতে খনিজ দ্রব্য সম্পর্কিত গবেষণার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাও কিছু করা হয় নাই।

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের, বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করিবার পর পরিকল্পনা কমিশনারের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই এ-দিকে পড়ে। ফলে

জাতীয় সরকারের নীতি :

খনিজ সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। গবেষণার দিক দিয়া একটি খনিজ দ্রব্য গবেষণা সংক্রান্ত ব্যুরো (Indian Bureau of Mining Research) এবং একটি জ্বালানি খনিজের গবেষণাগার (National Fuel Research Laboratory) স্থাপিত হইয়াছে।

১। ব্যাপক নীতি গ্রহণ

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে নীতি (Mineral Policy under Planned Economy) : পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ সুরু হইবার পর ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার খনিজ সম্পদের বিস্তারিত অনুসন্ধান, উৎপাদন-পদ্ধতির আধুনিকিকরণ, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যের উন্নয়ন এবং খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে একটি ব্যাপক নীতি গ্রহণ করে।

২। গবেষণার ব্যবস্থা

এই নীতি অনুসারে জিওলজিক্যাল সার্ভে (Geological Survey of India), ভারতীয় খনি সম্পর্কিত ব্যুরো (Indian Bureau of Mines), জাতীয় ধাতু-নিষ্কাশন সম্পর্কিত গবেষণাগার (National Metallurgical Laboratory), কেন্দ্রীয় কাচ এবং মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান (Central Glass and Ceramic Research Institute এবং জ্বালানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Fuel Research Institute) সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাইয়া যাইতেছে।

৩। নূতন খনিজ সম্পদের সন্ধান

ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি তৈল প্রতিষ্ঠানের সহিত এক চুক্তি অনুসারে এবং এককভাবে সোবিয়েত বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় আসাম, পশ্চিমবংগ ও উড়িষ্যার অববাহিকা অঞ্চলে, রাজস্থানের জয়শল্মীরে, পাঞ্জাবের জ্বালামুখীতে এবং বর্তমানে গুজরাট-এর সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে তৈলখনির অনুসন্ধান করিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধানের ফলে নূতন নূতন তৈল, কয়লা, তাম্র ও জিপসামের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

৪। সংরক্ষণ ও আধুনিকিকরণ

১৯৪৮ সালে খনিজ দ্রব্যের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খনি এবং খনিজ দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন) আইন [Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1948] পাস করা হয় এবং ১৯৫৭ সালে উহা সংশোধিত হয়। এই আইন অনুসারে নিয়মাবলীও প্রস্তুত হইয়াছে এবং এগুলিকে কার্যকর করা হইয়াছে। এই নিয়মাবলীর মধ্যে যন্ত্রিকরণের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বোক্ত কয়লাখনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন অনুসারে কয়েক শ্রেণীর কয়লার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে ঘোষণা করা হয় যে, **কতকগুলি খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে।** এই **খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে কয়লা, লৌহ-আকর, খনিজ তৈল, জিপসাম, টিন, সীসা,**

দস্তা, তাম্র হীরক, স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীভুক্ত খনিজ শিল্পগুলি ধীরে ধীরে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (public sector) চলিয়া আসিবে এবং মাত্র সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের অসম্পূর্ণতাই বেসরকারী উদ্যোগ দ্বারা পূরিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই নীতির অনুসরণে স্বর্ণ ও হীরক খনি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং কয়লাখনির ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগে সম্প্রসারিত হইতে থাকে। বর্তমানে অবশ্য সরকার হইতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনি শিল্পের উন্নয়ন পদ্ধতিতে উভয় প্রকার উদ্যোগই পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে—বেসরকারী উদ্যোগকে বিলুপ্ত করা হইবে না।

৫। নূতন শিল্পনীতি ও সরকারী উদ্যোগের প্রসার

ইহার পর আছে খনিজ সম্পদের আঞ্চলিক উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি আঞ্চলিক বোর্ড ও আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিবহণজনিত অসুবিধা দূরিকরণের জন্য খনিজ সম্পদ পরিবহণ উপদেষ্টা কমিটি (Minerals Transport Advisory Committee) গঠিত হইয়াছে। খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সরকারী নীতি কার্যকরকরণের জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি মন্ত্রিদপ্তর (Ministry of Mines and Oil) সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিদপ্তর। ইস্পাত, খনি এবং জ্বালানি মন্ত্রিদপ্তরের (Ministry of Steel, Mines and Fuel) সহিত সহযোগিতায় কার্য করে।

৬। আঞ্চলিক উন্নয়ন

৭। নূতন মন্ত্রিসভা

পরিশেষে, উপরি-উক্ত সরকারী শিল্পনীতিকে কার্যকর করিবার জন্য ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে তৈল, স্বাভাবিক গ্যাস ও কয়লা ব্যতীত অপর সকল খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য একটি জাতীয় খনিজ দ্রব্য উন্নয়ন করপোরেশন (National Mineral Development Corporation) গঠন করা হইয়াছে।

৮। জাতীয় খনিজ দ্রব্য উন্নয়ন করপোরেশন

জাপানী সহযোগিতায় উড়িষ্যার কিরিবুরুতে এবং মহারাষ্ট্রের রেডি অঞ্চলে (Redi Area) লৌহ-আকর উৎপাদনই হইল বর্তমানে করপোরেশনের প্রধান কার্য। এই অঞ্চল হইতে উৎপন্ন লৌহ-আকর বর্তমানে প্রধানত রপ্তানি হইতেছে। তবে তৃতীয় পরিকল্পনায় বোকারোতে প্রস্তাবিত লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে উহাতেও লৌহ-আকর সরবরাহ করা হইবে জাতীয় খনিজ দ্রব্য উন্নয়ন করপোরেশনের অন্যতম কার্য। ইহা ছাড়া এই তৃতীয় পরিকল্পনাতেই ক্ষেত্রী ও দারিবোর নূতন দুইটি খনিতে তাম্র উত্তোলনের কার্যও করপোরেশনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনের উপর সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে মোট ৪৭৮ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হইল ২০০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার উন্নয়ন-কার্যক্রমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়াছে খনি সংক্রান্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গবেষণা।

৯। শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গবেষণা

শক্তি-সম্পদ (Power Resources) : শক্তিসম্পদ বলিতে সাধারণত কয়লা, তৈল এবং জলবিদ্যুৎ—এই তিনটিকেই বুঝায়।

(ক) কয়লা (Coal) : ভারতের খনিজ সম্পদের আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, এখন পর্যন্ত ভারতে কয়লা শক্তির প্রধান উৎস বলিয়া পরিগণিত হইলেও ভারতে ভাল 'কোক' কয়লা ও ধাতু-নিষ্কাশনকারী কয়লার (metallurgical coal) সঞ্চিত পরিমাণ বিশেষ অধিক নহে। সুতরাং সতর্কতার সহিত এই কয়লা ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন আছে।* অপরদিকে অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে আণবিক শক্তির ন্যায় নূতন কোন শক্তির আবিষ্কারে কয়লার ব্যবহার একরূপ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাই বলিয়া এই আশায় বিবেচনাবিহীনভাবে সঞ্চিত উৎকৃষ্ট কয়লার ধ্বংসের সপক্ষে কোনমতেই মত দেওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ একরূপ অফুরন্ত বলিয়া এই কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবার সীমাহীন সুযোগ আছে বলা যায়। বর্তমানের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে এই দিকে দৃষ্টিও দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে সারা বৎসরব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য কয়লা হইতে তাপজ বিদ্যুৎ (thermal power) উৎপাদনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

কয়লার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?

(খ) তৈল (Oil) : ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলে প্রাকৃতিক শক্তিসম্পদের মধ্যে তৈলের স্থান কয়লার পরই। প্রথমে কয়লা শক্তির একমাত্র উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইত ; পরে তৈল ইহাকে কতকটা স্থানচ্যুত করে। শিল্প-বিপ্লবের দিক হইতে দেখিলে বিপ্লব সংঘটিত করে কয়লার ব্যবহার এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে তৈল। শক্তির উৎস হিসাবে তৈল ক্রমে কয়লার স্থানাধিকার করে। ভারতে কিন্তু ভূগর্ভে সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া প্রভূত পরিমাণে কয়লার পরিবর্তে তৈলের ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। তবুও ভারতে নানাভাবে তৈলের যোগানের পরিমাণকে বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে। তৈল শোধনাগার স্থাপন করিয়া, বিভিন্ন স্থানে তৈলখনির সন্ধান করিয়া, নিকৃষ্ট কয়লা হইতে মিশ্র পেট্রোলিয়াম (synthetic petrol) এবং ইক্ষু ভুট্টা বার্লি প্রভৃতির অপজাত হইতে শক্তি সুরাসার (power alcohol) উৎপাদন করিয়া তৈলের অভাব যথাসম্ভব পূরণ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু সংগে সংগে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির চাহিদাও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার সূচনায় চাহিদার পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ টনের কিছু বেশী ; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ১·১ কোটি টনে দাঁড়াইবে অনুমান করা হইয়াছে। ফলে ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় তৈলের আভ্যন্তরীণ সরবরাহ কখনও পর্যাপ্ত হইতে পারিবে না। উপরন্তু, ভারতের ন্যায় দেশে

শক্তির উৎস হিসাবে তৈল ব্যবহারের সীমা

* ২৭ পৃষ্ঠা।

শক্তির উৎস হিসাবে তৈল কখনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিতে পারে না। কারণ, উহা বিশেষ সুলভ নহে। ভারতের গ্রামাঞ্চলের পক্ষে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের উন্নয়ন-ব্যবস্থায়, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অন্য কোনরূপ শক্তির উৎসের প্রয়োজন। এই শক্তি হইল জলবিদ্যুৎ—ভারতে যাহার সীমাহীন সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(গ) জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity) ঃ জলবিদ্যুৎকে বর্তমানে সর্বপ্রধান শক্তিসম্পদ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। আজিকার দিনে শিল্পোৎপাদন, যানবাহন পরিচালনা, কৃষিকার্য, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতি সকল দিকেই জলবিদ্যুৎ একরূপ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের উদাহরণ লইয়া বলা যায় যে, ধাতুনিষ্কাশনমূলক (metallurgical) প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে, রেলপথ প্রভৃতি যানবাহনে, দৈনন্দিন ঘরকন্নার কার্যে বর্তমানে জলবিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে করিবে।

আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থায় জলবিদ্যুতের ভূমিকা

শিল্প-ব্যবস্থায় কয়লা ও জলবিদ্যুতের তুলনামূলক উপকারিতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, জলবিদ্যুৎ শুধু যে সুলভ তাহাই নহে—জলবিদ্যুৎ শিল্পের উপযুক্ত স্থাননির্দেশেও (location) সহায়তা করে। ভারতের কয়লাখনিগুলি একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শক্তি হিসাবে কয়লার উপর নির্ভর করার ফলে ভারতে অকাম্যভাবে শিল্পের আঞ্চলিকতা ঘটিয়াছে। এখন প্রয়োজন হইল শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছড়াইয়া (dispersal) দিয়া আঞ্চলিকতার ত্রুটি দূর করা। এই কার্য জলবিদ্যুতের মাধ্যমেই সাধিত হইতে পারে। জলবিদ্যুতের উৎপাদন-কেন্দ্র একস্থানে অবস্থিত হইলেও বহুদূরে ইহার সরবরাহের ব্যবস্থা করা সহজেই সম্ভব। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারকল্পে প্রতিটি গৃহে ইহা পৌছাইয়া দেওয়াও সম্ভব। জাপান সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা অনন্যসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার মূলে আছে সুলভ জলবিদ্যুতের দান।

কৃষির উন্নয়নেও আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। নলকূপ প্রোথিত করা এবং কূপ ও নলকূপ হইতে জল উত্তোলনের কার্যে বৈদ্যুতিক শক্তিকে লাগাইয়া ভারতের শুষ্ক কৃষি-জমিতে জলসেচের সমস্যার সমাধান কতক পরিমাণে করা যাইতে পারে। কৃষির যন্ত্রিকরণ (mechanization) ব্যবস্থাতেও ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োগ করা যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কৃষি-জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকল্পে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া ভূমির সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

যানবাহনের কার্যে জলবিদ্যুৎকে আরও অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করিলে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়া শিল্প-ব্যবস্থায় উন্নতিসাধন করিবে, গ্রামাঞ্চলের স্বতন্ত্র নির্জন অস্তিত্বের অবসান ঘটাইবে এবং গ্রামীণ জনসাধারণের অন্ধ সংস্কার দূর করিয়া আধুনিক, উন্নত জীবনযাত্রার পথ নির্দেশ করিবে।

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য মাথাপিছু বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যয়কে জীবনযাত্রার মানের অন্যতম সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভারতে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন (Generation of Hydro-electricity in India) : কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশনের শক্তি শাখার [Water and Power Commission (Power Wing)] হিসাব অনুসারে ভারতের বিভিন্ন উৎস হইতে আমরা ৪·১ কোটি কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিতে পারি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কার্য সুরু হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত আমরা মাত্র ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদন-ক্ষমতায় (Generating Capacity) পৌঁছিয়াছিলাম।* ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির ভোগ মোটেই উল্লেখযোগ্য হইতে পারে নাই। ১৯৬০ সালে ভারতে মাথাপিছু বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন (Generation) ছিল ৩৯ কিলোওয়াট মাত্র। তুলনামূলকভাবে ঐ সালে নরওয়েতে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৭৪০ কিলোওয়াট, ক্যানাডায় ৫৭৮০ কিলোওয়াট, ব্রিটেনে ১৯১০ কিলোওয়াট, এবং জাপানে ৮৭৫ কিলোওয়াট।** অতএব দেখা যাইতেছে, বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারে ভারত উন্নত দেশসমূহের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ইহা ভারতের স্বল্পোন্নত অবস্থার আর একটি পরিচায়ক। তবে আশার কথা যে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন দিন দিন বাড়িতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উপরি-উক্ত ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদন-ক্ষমতা তৃতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তিতে ১·৩৪ কোটি কিলোওয়াটে দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হয়।

উৎপাদনের পরিমাণ অত্যল্প

ইহা অনগ্রসরতার লক্ষণ

আণবিক শক্তি (Atomic Power) : ভারতের শক্তিসম্পদের আলোচনায় আর একটি উৎসের নামোল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা হইল সাম্প্রতিক যুগে আবিষ্কৃত আণবিক শক্তি। ভারতে আণবিক শক্তি উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ফলে যে-সকল অঞ্চলে কয়লা বিশেষ পাওয়া যায় না এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেরও বিশেষ সুবিধা নাই, সেই সকল অঞ্চলে আণবিক শক্তি উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত। এ-বিষয়ে কতদূর করা সম্ভব তাহা লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যাপক গবেষণার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বনসম্পদ (Forest Resources) : ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে প্রকৃতি-প্রদত্ত আর একটি মূল্যবান সম্পদ হইল ভারতের অরণ্যভূমি। কিন্তু অরণ্যভূমির পরিমাণ ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। সরকারী হিসাব অনুসারে ভারতে মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ হইল ২·৭৪ লক্ষ বর্গমাইল বা মোট স্থলভূমির শতকরা প্রায় ২২

বনভূমির আয়তন ও পরিমাণ

* Third Five Year Plan
** India—1960

ভাগ মাত্র।* ইহার মধ্যে আবার শতকরা ৫ ভাগ সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল—কারণ ইহা বিশেষভাবে বিক্ষিপ্ত। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মোট স্থলভাগের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যাবৃত থাকিবে। ইন্দোনেশিয়ার স্থলভাগের শতকরা ৬০ ভাগ এবং ব্রহ্মদেশের স্থলভাগের শতকরা ৩০ ভাগ অরণ্য দ্বারা আবৃত। পরিকল্পনা কমিশনের এই অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে বননীতি সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাবের মধ্যে। এই প্রস্তাব অনুসারে ভারতের মোট স্থলভাগের অন্তত শতকরা ৩৩ ভাগ বা এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমি দ্বারা আবৃত থাকিবে; এবং পার্বত্য অঞ্চলে অরণ্যভূমির পরিমাণ হইবে শতকরা ৬০ ভাগ, আর সমভূমিতে উহা হইবে শতকরা ৩০ ভাগ। সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে অরণ্যভূমির অনুপাত যে অত্যল্প তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভারতে বনভূমির অনুপাত অতি অল্প

চিরকালই অবশ্য এইরূপ অত্যল্প অনুপাত ছিল না। কিছুদিন পূর্বেও দেশের বনভূমি ভারতের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগরিকরণ এবং রেলপথের প্রসারের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একরূপ পরিকল্পনাবিহীনভাবেই বনভূমির ধ্বংসসাধন করা হয়। ইহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অরণ্য-ধ্বংস আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ফলে বনভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ হইয়া দাঁড়ায় দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

সংরক্ষণ ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা

ভারতে বনভূমি সংক্রান্ত দ্বিতীয় সমস্যা হইল বণ্টন লইয়া। বণ্টনের দিক দিয়া ভারতের অরণ্যসম্পদ বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। কোন কোন রাজ্যে এরূপ গভীর বনভূমি দৃষ্ট হয় যে তাহাকে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বলিয়াই অভিহিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কেরল ও মধ্যপ্রদেশের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। অপরদিকে রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে এবং গুজরাটের অধিকাংশ অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ এত অল্প যে ইহাকে বিপজ্জনক বলিয়াও বর্ণনা করা যায়।

বনভূমির বণ্টন সংক্রান্ত সমস্যা

অরণ্যভূমির এই বণ্টনজনিত ত্রুটিকে ভারতের বনভূমি সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা বলিয়াও অভিহিত করা চলে। ভারতে মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ আধুনিক নির্ধারিত মানের তুলনায় অল্প হইলেও অত্যল্প নহে; কিন্তু স্থানে স্থানে ইহা এত অল্প যে এই অবস্থা বিপজ্জনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই সকল স্থানে অরণ্যভূমির স্বল্পতার জন্য মরুভূমির প্রসার ঘটিতেছে। সুতরাং এই দিকে দৃষ্টি না দিলে দূর ভবিষ্যতে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণেই বণ্টনজনিত ত্রুটি দূরিকরণকেই অনেকে ভারতে বনসম্পদ সংক্রান্ত সমস্যার প্রধান সমাধানরূপে গণ্য করেন।

অরণ্যভূমির বিপজ্জনক স্বল্পতা

* Third Five Year Plan

বনভূমির উপযোগিতা (Utility of Forests) ঃ বনভূমির উপযোগিতা দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। ভারতের ক্ষেত্রে পরোক্ষ উপযোগিতাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ভারতের ন্যায় দেশে জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির উপর বনভূমির বিপুল প্রভাব রহিয়াছে। বনভূমির প্রভাবে আবহাওয়ার চরম ভাব নষ্ট হয়। বনভূমি আবার আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে বলিয়া ইহার ফলে অধিকতর বৃষ্টিপাত হয়। বনভূমি বায়ুপ্রবাহকেও নিয়ন্ত্রিত করে। মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তির ক্ষয় নিবারণ, কৃষিজমির উর্বরতাবৃদ্ধি, বন্যার সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা, পার্বত্য অঞ্চলে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকার পতন রোধ করা প্রভৃতিও বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতা। বনভূমির অস্তিত্ব মরুভূমির প্রসারও বন্ধ করে। বনভূমির অস্তিত্বের জন্য দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও নয়নাভিরাম হইয়া উঠে। বনভূমি দেশের বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ (flora) এবং জীবজন্তুর (fauna) আশ্রয়স্থল।

বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতা

বনভূমির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা উদ্ভূত হয় বনজাত দ্রব্যাদি হইতে। আসবাব-পত্র ও ঘরবাড়ী তৈয়ারির কাঠ, রেলপথের কাঠ, জ্বালানি কাঠ বনভূমি হইতেই পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, কাগজ দিয়াশলাই ঔষধ ইত্যাদি শিল্পের জন্য কাঁচামালও বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মেনী কাষ্ঠ হইতে চিনি ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন করিয়াছিল। ইহা ভারতেও সম্ভব বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গোচারণক্ষেত্র হিসাবে এবং গবাদি পশুর খাদ্যের যোগানেও বনভূমির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। বনভূমি হইতে এই সকল দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় বলিয়া অনেকের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। বনভূমি হইতে সরকারের সরাসরি প্রচুর আয়ও হয়।

বনভূমির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা

নিয়োগের দিক দিয়া বনভূমির গুরুত্ব

ভারত সরকারের বননীতি (Forest Policy of the Government of India) ঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে ভারতে বননীতি বলিতে কোন কিছু ছিল না; বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসসাধন করা হইত। অরণ্যকে উৎপাদনাভিমুখী (productive) করিবার কোন ব্যবস্থাই তখন পর্যন্ত করা হয় নাই। ধীরে ধীরে সরকার ভারতের বনসম্পদের উপযোগিতা ও ইহার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে থাকে। ক্রমে একজন বনভূমির ইনস্পেক্টার-জেনারেল নিযুক্ত হন, বনভূমি সংক্রান্ত দপ্তর স্থাপিত হয় এবং বনভূমি শ্রেণীবিভক্ত হয়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

ইহার পর বনভূমি সংক্রান্ত শিক্ষাদানের বিদ্যালয় (Forest School) ও বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার (Forest Research Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পূর্বেই এই কার্য সমাধা হইলেও ইহাদিগকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বা সুপরিকল্পিত নীতি বলিয়া মোটেই বর্ণনা করা যায় না। এ-পর্যন্ত সরকারের বননীতি দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত হইতেছিল—(১) বনভূমি হইতে রাজস্ব

সংগ্রহ, এবং (২) জলবায়ুর উপর প্রভাবের জন্য বনভূমির সংরক্ষণ। আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে পরস্পরবিরোধী। সংরক্ষণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায়; এবং অধিকতর রাজস্ব সংগ্রহে মনোযোগী হইলে বনভূমির প্রয়োজনমত সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয় না। যাহা হউক, এই দুই পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যের সমবায়ে গঠিত বননীতিই বিংশ শতাব্দীর প্রায় তৃতীয় দশক অবধি কার্যকর ছিল।

ব্রিটিশ সরকারের বননীতি

১৯২৮ সালে ভারতীয় কৃষি-কমিশন (Royal Commission on Indian Agriculture) কৃষিকার্যের দিক হইতে বনভূমির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বনভূমির সংরক্ষণে অধিকতর মনোযোগী হইতে সুপারিশ করে। ক্রমে ভূমির উৎপাদিকাশক্তির সংরক্ষণ, অরণ্যজাত দ্রব্যাদি হইতে নানাপ্রকার শিল্পের প্রসার প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি পড়ে। দেরাদুনের বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার বিভিন্ন শিল্পে উত্তরোত্তর অরণ্যজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার লইয়া গবেষণা করিতে থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে স্বাধীনতার পূর্বে এ-সকল বিষয়ে বিশেষ কিছু করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসসাধন করা হইয়াছিল।

কৃষি-কমিশন ও পরিবর্তিত বননীতি

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের দৃষ্টি স্বতই এদিকে পড়ে; এবং শ্রী কে. এম. মুন্সী যখন খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রী নিযুক্ত হন তখন তিনি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভিযানের সংগে 'অধিক বৃক্ষ রোপণ কর' অভিযান বা বন মহোৎসব যুক্ত করেন। ১৯৫০ সালের জুলাই-এ প্রথম 'বন মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহা বার্ষিক কার্যসূচীতে পরিণত হইয়াছে। ইতিমধ্যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন কার্য করিতে থাকে, এবং কমিশন বনসম্পদবৃদ্ধিকে কৃষির উন্নয়নের অপরিহার্য পরিপূরক বলিয়া ঘোষণা করে। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এক ব্যাপক বননীতি গ্রহণের জন্যও কমিশন সুপারিশ করে। এই উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় অরণ্যরক্ষক বোর্ড (Central Board of Forestry) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ ও অরণ্যরক্ষক বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫২ সালে একটি ব্যাপক বননীতি গৃহীত হয়। দুইটি প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই নীতিকে পরিচালিত করা হইতেছে। প্রথমত, অরণ্যসম্পদের দীর্ঘকালীন উন্নতিবিধান করা। দ্বিতীয়ত, অদূর ভবিষ্যতে কাঠের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা হইবে তাহা পূরণের ব্যবস্থা করা। সংক্ষেপে ১৯৫২ সালের বননীতির মূল-সূত্রগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে:

জাতীয় সরকারের বননীতি

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও বর্তমান বননীতি

(১) বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে বনভূমির অনুপাত হইবে স্থলভাগের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সমতল ভূমিতে শতকরা ৩০ ভাগ।* (২) সমপরিমাণ নূতন

---

* ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

বনভূমির পত্তন না করিয়া বনভূমির কোন অংশের ধ্বংসসাধন করা যাইবে না। (৩) পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করিয়া বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) দুর্গম বনভূমি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। (৫) চারণভূমি এবং জ্বালানি কাঠ সরবরাহের জন্য গ্রামের সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে সাধারণ বনভূমির পত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৬) বিভিন্ন শিল্পে বনজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য দেরাদুনের বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার এবং শিল্পসমূহের মধ্যে সংযোগসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৭) অরণ্যসম্পর্কিত নীতিকে বিশেষভাবে মৃত্তিকা-সংরক্ষণের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অরণ্যসম্পদ ও তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহের উন্নতিসাধনের জন্য মোট ২৯ কোটি টাকার মত ব্যয় করা হয়। এই ব্যয়ে গবেষণা, অরণ্য সংক্রান্ত শিক্ষা ও বন্য জীবনের সংরক্ষণ ছাড়াও ৫৫ হাজার একরের মত জমিতে দিয়াশলাই শিল্পের জন্য এবং ৩.৩ লক্ষ একর জমিতে কাষ্ঠশিল্পের (timber industry) জন্য বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা হয়। উপরন্তু, অরণ্যপথ নির্মাণ, ধ্বংসপ্রায় অরণ্যের পুনর্বাসন প্রভৃতির দিকেও যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়ন ব্যবস্থা

তৃতীয় পরিকল্পনায় উপরি-উক্ত কার্যক্রমই অনুসরণ করিয়া অরণ্যসম্পদের পরিমাণ ও অরণ্যজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে মোট ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই ব্যয়ে শিল্পসমূহের ও জ্বালানির বর্তমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যাপক বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা হইবে, বৃক্ষরোপণকে সম্প্রসারণ করা (extension work) এবং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যক্রমের অংগীভূত করা হইবে, রেলপথ ও রাজপথের দুইধারে বৃক্ষরোপণের উপর আরও অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইবে। আশা করা হইয়াছে, পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ১০-১১ লক্ষ একর জমিতে বৃক্ষরোপণ সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া দেরাদুনের অরণ্য সংক্রান্ত গবেষণাগারে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে, তিনটি আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপন করা হইবে, নিয়মিত জরিপ কার্য চালাইয়া যাওয়া হইবে এবং অরণ্য সংক্রান্ত শিক্ষার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

প্রশ্নোত্তর

1. Give a brief account of the mineral resources of India and point out their utility for its industrial development. (C. U. B. A. 1957) (২৪-২৯ পৃষ্ঠা)

2. Give a critical estimate of the minerals policy of the Government of India. (২৯-৩১ পৃষ্ঠা)

3. Briefly describe the power resources of India. (C.U.B. Com. 1962) (৩২-৩৪ পৃষ্ঠা)

4. Give an account of the forest policy of the Government of India. (৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের জাতীয় আয়

(National Income of India)

ভারতের জাতীয় আয়ের সামান্য আলোচনা অর্থনৈতিক কাঠামো প্রসংগে পূর্বেই করা হইয়াছে। এখন অর্থনৈতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের (economic growth) গতি সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য জাতীয় আয়ের বিশদ আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হইতেছে। বস্তুত, কোন দেশের অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা উহার জাতীয় আয়ের পরিমাণ, বণ্টন ও হ্রাসবৃদ্ধির আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।* সংক্ষেপে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব এইভাবে দেখানো যাইতে পারে :

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা (The Utility of National Income Analysis) : প্রথমত, জাতীয় আয়ের সাহায্যে দেশের আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ করা যায়। এইভাবে অবশ্য আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ সকল সময় নিরাপদ নহে। উদাহরণস্বরূপ, হীনস্বাস্থ্যসম্পন্ন জাতির পক্ষে জাতীয় আয়ের অধিকাংশ ডাক্তার ও ঔষধপত্রাদিতে ব্যয় করাই স্বাভাবিক ; আবার কোন দেশে বিশৃংখলা বা অরাজকতা অনবরত লাগিয়া থাকিলে নিরাপত্তা ও শৃংখলা রক্ষার জন্য 'পুলিসী ব্যয়' অধিক হইবে। ইহার ফলে জাতীয় আয় জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হইতে পারে না। যাহা হউক, হেবারলারের ভাষায় বলা যায়, "অন্যান্য বিষয় সমান ধরিয়া লইলে জাতীয় আয় অধিক হইলে আর্থিক কল্যাণও অধিক হইবে।" দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় হইতে কোন দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এ-ক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে, মাত্র গড আয়ের দ্বারা জনসাধারণের প্রকৃত জীবনযাত্রার মান সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ কয়েক জনের হাতে গিয়া পড়িতে পারে ; মাত্র সামান্য অংশই সংখ্যাধিক জনসাধারণের ভাগ্যে জুটিতে পারে। অতএব প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার সুবিধার জন্য জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয় পৃথকভাবে দেখানোও প্রয়োজন। তৃতীয়ত, দেশের অর্থনৈতিক প্রসারের গতি কোন্ দিকে এবং উহা কাম্য কি না—তাহা জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যায়। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতেই দেশের অর্থ-ব্যবস্থার দুর্বলতা

১। জাতীয় আয়ের সাহায্যে জাতীয় কল্যাণের পরিমাপ করা যায়

২। জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে জীবন-যাত্রার মান বুঝা যায়

৩। জাতীয় আয় হইতে অর্থনৈতিক প্রসারের গতি বুঝা যায়

* Benham, *Economics*

বা ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং উহাদের অপসারণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। চতুর্থত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি অপরিহার্য। অর্থনৈতিক কার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ কি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার কি, বিভিন্ন শ্রেণীর সঞ্চয় কতটা প্রভৃতি অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করিয়া সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, করনীতি, শুল্কনীতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে। এইজন্য জাতীয় আয় কমিটি (National Income Committee) বলিয়াছে, "জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা এবং উহার বিভিন্ন অংশের ব্যবস্থা ও সম্পর্কের সাধারণ রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে।"

৪। পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব

পরিশেষে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সভ্যতার পর্যায় ও জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক বিচারবিবেচনা করিতে জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান সহায়তা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক তুলনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে অর্থের মাধ্যমে কাজকর্ম কতদূর পরিচালিত হয়, মূল্যের স্তর কি, জীবনযাত্রার প্রণালী কি প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় অনেকে আন্তর্জাতিক তুলনার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। ডাঃ বাউলি (Dr. Bowly) বলেন, "দুই দেশের মধ্যে সংখ্যাসূচক তুলনা নিশ্চিতভাবে করা যায় কি না, এ-সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।"

৫। বিভিন্ন দেশের সহিত তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয় সহায়তা করে

ভারতের জাতীয় আয় (National Income of India): জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি আছে: (১) উৎপাদনশুমারি পদ্ধতি (Census of Production Method), (২) আয়শুমারি পদ্ধতি (Census of Incomes Method), এবং (গ) ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি (Consumption and Investment Method)। প্রথম পদ্ধতিতে বৎসরে দেশে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির নীট অর্থমূল্য (net money value) যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে উৎপাদনের সকল উপাদানের আয়—যথা, খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফা যোগ দিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব দেখানো হয়। তৃতীয় পদ্ধতিতে দেশের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ভোগ ও বিনিয়োগের সমষ্টিকে জাতীয় আয় হিসাবে ধরা হয়।

জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি

এইভাবে জাতীয় আয়ের পরিমাপ তিন দিক হইতে করা গেলেও সাধারণত প্রথম দুইটি পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। উভয় পদ্ধতিতেই জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

ভারতে জাতীয় আয় হিসাবের প্রধান অন্তরায় হইল নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অপ্রতুলতা। ফলে হিসাবে ভুল থাকিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় এবং ভোগকারীর ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পর্কে তথ্যাদি অপ্রচুর। শিল্পের বেলায়ও পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নহে। মূলধন-গঠন সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা দুষ্কর।

ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ ও বিশ্লেষণে অসুবিধা :

১। নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব

দ্বিতীয়ত, উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিকট হইতে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু ভারতে নিরক্ষরতা ব্যাপক হওয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা কঠিন। আবার এই দেশে হিসাবরক্ষার প্রচলন বিশেষ নাই। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক তথ্যাদি সংগ্রহকে জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখে এবং ঐ ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে চায় না।

২। পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা কঠিন

তৃতীয়ত, উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ বাজারে বিক্রয় হয় না। হয় উহা উৎপাদকেরা নিজেরাই ভোগ করে অথবা উহাকে অন্যান্য দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের সহিত সরাসরি বিনিময় করা হয়।* এই অসুবিধার জন্য জাতীয় আয়-কমিটি আর্থিক ও অর্থ-বহির্ভূত (monetary and non-monetary sectors)—এই দুই ক্ষেত্রে ভাগ করিয়া জাতীয় আয় পরিমাপের পরামর্শ দিয়াছে।

৩। উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ বাজারে আসে না

চতুর্থত, শিল্পক্ষেত্রভেদে জাতীয় আয়ের শ্রেণীবিভাগ করাও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়া পড়ে—কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা পারিবারিক ভিত্তিতে (household affairs) চলে এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া অর্থোপার্জন করে।

৪। শিল্পক্ষেত্রভেদে জাতীয় আয়ের শ্রেণীবিভাগ করা কঠিন

পঞ্চমত, শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন বিশেষভাবে অসংগঠিত। ফলে উহার পরিমাপ করা সহজসাধ্য নহে।

৫। অসংগঠিত কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা

ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Estimates of National Income of India) : সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সরকার ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দেয় নাই। অধুনা ১৯৪৯ সালে সরকার রাজস্ব মন্ত্রিদপ্তরে একটি জাতীয় আয়-শাখা (a National Income Unit) গঠন করে। এই শাখার উপর জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য হিসাব প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই শাখাকে পরিচালিত করিবার জন্য ১৯৪৯ সালে একটি জাতীয় আয়-কমিটিও (National Income Committee) নিযুক্ত হয়। জাতীয় আয়-কমিটির হিসাব আলোচনার পূর্বে জাতীয় আয়ের অন্যান্য কয়েকটি হিসাবের সংক্ষেপ বর্ণনা করা যাইতে পারে।

প্রথম সরকারী প্রচেষ্টা

* Papers on National Income and Allied Topics—Introduction by Dr. V. K. R. V. Rao

জাতীয় আয়ের হিসাবের সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন দাদাভাই নওরোজি। তিনি ১৮৬৭-৭০ সালে জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে মাথাপিছু আয়ের একটা আনুমানিক হিসাব প্রদান করেন। তখন হইতে জাতীয় আয়-কমিটি পর্যন্ত এইরূপ মাথাপিছু আয়ের হিসাবগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হইল: *

প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা।

হিসাবপ্রণেতা	বৎসর	মাথাপিছু অ
		টা. আ. পা.
দাদাভাই নওরোজি	১৮৬৭-৭০	২০—০—০
লর্ড ক্রোমার এবং ব্যারবোর (Lord Cromer and Barbour)	১৮৮২	২৭—০—০
লর্ড কার্জন (Lord Curzon)	১৯০০	৩০—০—০
ওয়াদিয়া এবং যোশী	১৯১৩-১৪	৪৪—৫—৬
শাহা এবং খাম্বাটা	১৯১৪-২২	৩৮—০—০
ফিণ্ডলে শিরা (Findlay Shirras)	১৯২২	১১৬—০—০
সাইমন কমিশন রিপোর্ট (Simon Commission Report)	১৯২৯	১১৬—০—০
ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও	১৯৩১-৩২	৬৫—০—০
স্যর জেমস গ্রিগ্ (Sir James Grigg)	১৯৩৭-৩৮	৫৬—০—০
ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট (Eastern Economist)	১৯৩৯-৪০	৭২—০—০

মাথাপিছু আয়ের কতকটা ইংগিত দিলেও এই সমস্ত হিসাবের নানাপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়াছে। বিভিন্ন হিসাবপ্রণেতা বিভিন্ন জিনিস হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আর তাহা ছাড়া তাঁহারা যে-সমস্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও নির্ভুল নয়। তবে ইহাদের মধ্যে ডাঃ রাও-এর হিসাবই অধিক নির্ভরযোগ্য। তিনি জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য আয়-পদ্ধতি এবং উৎপাদন-পদ্ধতি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহার পর ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রিদপ্তর ১৯৪৭-৪৮ সালের এক হিসাব প্রকাশ করে। এই হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭২ টাকা।

পূর্ববর্তী হিসাবের ত্রুটি

ভারত স্বাধীন হইবার পর জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য হিসাব প্রণয়নের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। বাণিজ্য মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত হিসাবে বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন করা হয় না। তখন জাতীয় আয়ের হিসাব রচনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য উল্লিখিত জাতীয় আয়-কমিটি (National Income Committee) নিযুক্ত হয়। কমিটি জাতীয় আয়

জাতীয় আয়-কমিটি

* Papers on National Income and Allied Topics হইতে গৃহীত।

হিসাবের জন্য আয়-পদ্ধতি (Incomes Method) এবং উৎপাদন-পদ্ধতি (Production Method)—উভয় পদ্ধতিরই সাহায্য গ্রহণ করে। কৃষি, পশুপালন, অরণ্যজাত দ্রব্য, মৎস্য চাষ, খনিজ দ্রব্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন-পদ্ধতি নিয়োগ করা হয় আর বাণিজ্য, পরিবহণ, শাসনকার্য, বিভিন্ন পেশা, গৃহভৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে আয়-পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। জাতীয় আয়-কমিটির প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে এবং শেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই রিপোর্ট দুইটি এবং বর্তমানে জাতীয় আয় পরিমাপের ভারপ্রাপ্ত ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন (Central Statistical Organisation) কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য হিসাবের ভিত্তিতে গত কয়েক বৎসরের জাতীয় আয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন

*** জাতীয় আয়ের হিসাব** (চলতি বৎসরের দামের ভিত্তিতে)

(হিসাব কোটি টাকায়)

	১৯৪৮-৪৯ (১)	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬ (৩)	১৯৬০-৬১ (৪)
কৃষি (Agriculture and other allied activities)				
কৃষিকার্য, পশুপালন ও আনুষংগিক কাজকর্ম—	৪১৬০	৪৭৮০	৪৩৯০	৬৬৯০
অরণ্যজাত দ্রব্য উৎপাদন—	৬০	৭০	৭০	১১০
মৎস্য চাষ—	৩০	৪০	৬০	১০০
মোট :	৪২৫০	৪৮৯০	৪৫২০	৬৯০০
খনিজ কার্য, যন্ত্রশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প				
(Mining, manufacturing and small enterprises)				
খনির কায—	৬০	৭০	১০০	১৬০
ফ্যাক্টরী—	৫৫০	৫৫০	৭৮০	১৩২০
ক্ষুদ্র শিল্প—	৮৭০	৯১০	৯৭০	১১২০
মোট :	১৪৮০	১৫৩০	১৮৫০	২৬০০
ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ				
(Commerce, transport and communication)				
সংসরণ—	৩০	৪০	৫০	৬০
রেলপথ—	১৭০	১৮০	২৫০	৩৬০
সংগঠিত ব্যাংক ও বীমা—	৫০	৭০	৯০	১৬০
অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্য ও পরিবহণ—	১৩৫০	১৪০০	১৪৯০	১৭৬০
মোট :	১৬০০	১৬৯০	১৮৮০	২৩৪০

* Estimates of National Income—Published by the Central Statistical Organisation, Government of India ; Reserve Bank Bulletin, March 1968

	১৯৪৮-৪৯	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	
	(১)	(২)	(৩)	(৪)
অন্যান্য সেবামূলক কার্য				
(Other services)				
বিভিন্ন পেশা ও সুকুমার বৃত্তি—	৪৩০	৪৭০	৫৬০	৭৪০
সরকারী চাকরি—	৪০০	৪৩০	৫৭০	৯১০
বাড়ীর চাকরবাকর—	১২০	১৩০	১৪০	১৯০
গৃহসম্পত্তি—	৩৯০	৪১০	৪৬০	৫৩০
মোট :	১৩৪০	১৪৪০	১৭৩০	২৩৭০
উৎপাদন-উপাদানের ব্যয়ের হিসাবে নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন— (Net domestic product at factor cost)	৮৬৭০	৯৫৫০	৯৯৮০	১৪২১০
বিদেশ হইতে উপার্জিত নীট আয়— (Net earned income from abroad)	-২০	-২০	—	—৫০
উৎপাদন-উপাদানের ব্যয়ের হিসাবে নীট জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়— (Net National Output at factor cost or National Income)	৮৬৫০	৯৫৩০	৯৯৮০	১৪১৬০

উপরে চলতি বৎসরের দামের ভিত্তিতে (at current prices) জাতীয় আয়ের হিসাব করা হইয়াছে। কিন্তু মূল্যস্তর অপরিবর্তিত ধরিয়া লইয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতেও জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। নিম্নে দুইটি হিসাব পাশাপাশি দেওয়া হইল :

জাতীয় আয় (হিসাব কোটি টাকায়)

বৎসর	চলতি দামের ভিত্তিতে	১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে
১৯৪৮-৪৯	৮৬৫০	৮৬৫০
১৯৫০-৫১	৯৫৩০	৮৮৫০
১৯৫৫-৫৬	৯৯৮০	১০৪৮০
১৯৬০-৬১	১৪,১৬০	১২,৭৫০
১৯৬১-৬২	১৪,৬৩০	১৩,০২০ *

* ১৯৬১-৬২ সালের জাতীয় আয়ের উক্ত হিসাব প্রাথমিক হিসাব (preliminary estimates) মাত্র।

১৯৪৮-৪৯ সাল বা স্থির দামের ভিত্তিতে (at constant prices) নিম্নে পরিকল্পনাধীন প্রথম ১০ বৎসরে (১৯৫১-৬১) জাতীয় আয়ের বিভিন্ন সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইল :

(হিসাব কোটি টাকায় এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে)

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান সূত্র	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	শতকরা বৃদ্ধি ১৯৫১-৬১
১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৪৩৪০	৫০২০	৫৯১০	
২। খনিজ কার্য ও শিল্প	১৪৮০	১৭৬০	২১১০	
৩। ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১৬৬০	১৯৭০	২৪৬০	
৪। অন্যান্য সেবা-মূলক কার্য	১৩৯০	১৭৩০	২৩২০	
৫। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয়	--২০	—	—৫০	
মোট	৮৮৫০	১০,৪৮০	১২,৭৫০	৪৪

মাথাপিছু আয় (হিসাব টাকায়)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
চলতি বৎসরের দামের ভিত্তিতে (at current prices)	২৬৫	২৬১	৩২৬'২	৩২৯'৭
১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে (at 1948-49 prices)	২৪৭	২৭৪	২৯৩'৭	২৯৩'৪

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অবশ্য ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে যে, পরিকল্পনাধীন প্রথম ১০ বৎসরে (১৯৫১-৬১) জাতীয় আয় ১০,২৪০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৪,৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় বা মোট শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জনসংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় ২৮৪ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩০-এ পরিণত হয় বা মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়।*

তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত হিসাব

* Third Five Year Plan

জাতীয় আয় সংক্রান্ত উপরি-উক্ত হিসাব হইতে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

১। ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণশীল, কারণ জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে

প্রথমত, ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণশীল, কারণ জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। ভারতের জাতীয় আয় পরিকল্পনাধীন প্রথম ১০ বৎসরে (১৯৫১-৬১) ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে ৮৮৫০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২,৭৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় বা মোট শতকরা ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় পৃথক পৃথক ভাবে ধরিলে জাতীয় আয়ের যথাক্রমে শতকরা ১৮ ভাগ ও ২০ ভাগ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল দেখা যায়। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে (১৯৬১-৬২) জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় শতকরা ২.১ ভাগ। সুতরাং দেখা যায় যে, চমকপ্রদভাবে না হইলেও আমাদের জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে।

২। মাথাপিছু আয়ও মোটামুটি বৃদ্ধি পাইতেছে

দ্বিতীয়ত, মাথাপিছু আয়ও নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে অকল্পিত জনসংখ্যা-বৃদ্ধির দরুন উহার হার মোট জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অনেক কম। পরিকল্পনাধীন প্রথম ১০ বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ৪৪ ভাগ, কিন্তু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১৮ ভাগ মাত্র। এই বৃদ্ধি অবশ্য একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। টাকার অংকে প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে (১৯৫১) স্থিরমূল্যের ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় ছিল ২৪৭ টাকা, ১০ বৎসর পরে (১৯৬০-৬১) উহা ২৯৩.৭ টাকায় পরিণত হয়।

তবে জীবনযাত্রার মান বিশেষ উন্নত হয় নাই

মাথাপিছু আয়ের এই বৃদ্ধি কিন্তু জীবনযাত্রার মানে প্রতিফলিত হয় নাই। পরিকল্পনা কমিশনের একটি প্রাথমিক হিসাব অনুসারে পরিকল্পনাধীন প্রথম ১০ বৎসরে (১৯৫১-৬১) মাথাপিছু ভোগ (per capita consumption) বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৬ ভাগ।* এই হিসাবের যাথার্থ্যে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

৩। এখনও মাথাপিছু আয় অত্যল্প

তৃতীয়ত, মাথাপিছু আয় বিগত কয়েক বৎসরে কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও উন্নত দেশসমূহের তুলনায় এখনও উহা অত্যল্প। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে মাথাপিছু আয় ছিল ২৯৩ টাকা; তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে ঐ সালে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ১০,০০০ ও ৬০০০ টাকার কিছু বেশী। উপরন্তু, বার্ষিক আয় ২৯৩ টাকা হইলে মাসিক আয় ২৫ টাকারও কম হয়। বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে, ভারতে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান সম্ভব করিবার জন্য মাসিক মাথাপিছু আয়কে অন্তত ৩৫ টাকায় লইয়া যাওয়া

* **Draft Third Five Year Plan**

প্রয়োজন। ইহা ২০০০ সালে—অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ইহা সম্ভব হইবে কি না, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে।*

চতুর্থত, মাথাপিছু আয়ের দ্বারাই জনসাধারণের দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে না। কারণ, উহা গড় হিসাব মাত্র। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি না থাকিলেও বিভিন্ন বেসরকারী সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে বলা যায় যে, জাতীয় আয়ের বণ্টন-ব্যবস্থা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। উপরের দিকে জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের মত লোক জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ এবং মোট দ্রব্যাদির এক-চতুর্থাংশ ভোগ করে। কিন্তু নীচের দিকে শতকরা ঐ ১০ ভাগ লোক জাতীয় আয় ও ভোগ্যদ্রব্যাদির মাত্র শতকরা ২½ – ৩ ভাগ পাইয়া থাকে। টাকার অংকে জনসংখ্যার এই দরিদ্রতম শতকরা ১০ ভাগের মাথাপিছু মাসিক আয় ৭ টাকারও কম। মোটামুটিভাবে জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগের গড়পড়তা আয় জাতীয় মাথাপিছু আয় অপেক্ষা কম।**

৪। জাতীয় আয় বণ্টন-ব্যবস্থার বৈষম্য

পঞ্চমত, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো যে সুষম নয় তাহা উপরের হিসাব হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৫-৫০ ভাগের মত আসে কৃষি হইতে। সেদিন পর্যন্ত জাতীয় আয়ে সংগঠিত শিল্পসমূহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের অংশই ছিল বেশী। বর্তমানে অবশ্য সংগঠিত শিল্পসমূহ কিছুটা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। তবুও জাতীয় আয়ে কারখানা শিল্পের দান শতকরা ১০ ভাগ অতিক্রম করে নাই। উপরন্তু, শিল্পপ্রসারের হারও অতি মন্থর। খনি হইতে জাতীয় আয়ের অংশ শতকরা ১ ভাগের কিছু উপর; পরিবহণ, ব্যবসাবাণিজ্য ও সংসরণের অংশ হইল শতকরা ১৬ ভাগের মত। অন্যান্য উৎস হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা ঐ ১৬ ভাগের মতই পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ভারত এখনও কৃষিপ্রধান; অর্থ-ব্যবস্থা এখনও কৃষির উপর নির্ভরশীল। যে-কোন বৎসরে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে জাতীয় আয় ১৯৫৭-৫৮ সালের মত হঠাৎ কমিয়া যাইতে পারে।

৫। ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো সুষম নয়

জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, মোট জাতীয় আয়ে সরকারী সূত্রসমূহের দান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে উহা ছিল শতকরা ৭·৫ ভাগ; ১৯৬০-৬১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ১০·৩ ভাগে দাঁড়ায়। ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রের দান শতকরা ৯২·৫ ভাগ হইতে কমিয়া ৮৯·৭ ভাগে

৬। আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য

* Report on the Deliberation of the Planning Commission, Jan. 1968

পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ কর হইতেই সরকারী আয় অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সরকার প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ করের উপর অধিক নির্ভরশীল, এবং মাথাপিছু আয় এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না যাহাতে প্রত্যক্ষ কর হইতে প্রাপ্তি পরোক্ষ কর হইতে প্রাপ্তির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

জাতীয় আয়বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকের প্রকৃতি (Nature of the Obstacles to the Growth of National Income): দেখা গিয়াছে, ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক নয়। এই প্রসংগে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের নির্দেশ করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান হইল প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা। বলা হয়, কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্প, বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও পরিবহণ, নির্মাণকার্য (construction), দ্রব্যবণ্টন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতার দরুন উহাদের আশানুরূপ প্রসার ঘটিতেছে না। এই ধারণা বেশ কিছুটা ভ্রান্ত বলিয়া কয়েকজন অর্থবিদ্যাবিদ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস হয় উপকরণের যোগান, না-হয় বাজারের জন্য পরস্পরের সম্প্রসারণের উপর নির্ভরশীল; এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য যে সকল বিশেষ উপকরণ প্রয়োজন হয় তাহা অনেক সময়ই এক নহে। অতএব, উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে উপকরণ সংগ্রহ ব্যাপারে যে বিরাট সংঘর্ষ আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা ভুল।*

প্রশ্নোত্তর

1. Give in brief the important features of Indian economy as revealed by the study of the National Income of India.

[ইংগিত: (১) প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। (৩) জাতীয় আয়ের বণ্টন-ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক। (৪) ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা সুসমঞ্জস নয়। এখনও জাতীয় আয়ের অর্ধেকের মত কৃষি হইতে আসে। কারখানা-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইল যথাক্রমে শতকরা ৮ ও ৯ ভাগ। (৫) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির হার অধিক। (৬) সরকার প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষ করের উপর অধিকতর নির্ভরশীল...এবং ৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

2. Discuss the importance of National Income estimation in India and consider the difficulties involved (B. U. (M) 1963) (৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)

* W. C. Reddaway, *The Development of the Indian Economy* p. 45-47

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতের জনগণ

(People of India)

ভারতীয় অর্থবিদ্যাচর্চা উদ্দেশ্যমূলক (fruit-bearing)। স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নই ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। ভারতের জনগণকে আলোচনা-ক্ষেত্রে না আনিয়া এই সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যায় না বা সমস্যা সমাধানের জন্য পথ নির্দেশও করিতে পারা যায় না।

জনগণ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা :

প্রকৃতির দানে ভারত অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ হইলেও ভারতে দেখা যায় দারিদ্র্যের ভয়াবহ চক্র (Vicious Circle of Poverty)। প্রকৃতি ভারতকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অধিকাংশ উপাদানই মুক্তহস্তে দান করিয়াছে। অথচ ভারতবাসী দরিদ্র এবং ভারত স্বল্পোন্নত দেশ। বস্তুত, 'সমৃদ্ধ দেশের দরিদ্র অধিবাসী'ই ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু কেন এই দারিদ্র্য, কেন এই স্বল্পোন্নত অবস্থা ? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদেরই বিদেশী শাসকবর্গ বলিতেন, জনাধিক্যই ইহার কারণ। কিন্তু আমরা ভারতীয়রা বলিতাম, বিদেশী শাসনই আমাদের দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা আমাদের সমৃদ্ধ হইতে দেয় নাই। এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তাহা বিচার করিয়া নির্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে ভারতীয় জনগণের পর্যালোচনা করিতে হইবে। উপরন্তু, তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে প্রকৃতি ও মানুষ এই দুইটিই উৎপাদনের মৌলিক উপাদান। প্রকৃতির দানকে ব্যবহার করিয়া মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করে। সুতরাং যে-কোন দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এই সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে শ্রমের যোগান—যাহা প্রধানত জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু জনগণ উৎপাদনের উপাদান মাত্রই নহে, উৎপাদনের লক্ষ্যও বটে। জনগণের ভোগের জন্যই উৎপাদন করা হয়। সুতরাং দেখা প্রয়োজন, উৎপাদন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে কি না। অতএব বাস্তব ও তত্ত্ব—উভয় দিক দিয়াই জনসংখ্যার পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

১। ভারতের দারিদ্র্যের কারণ জনাধিক্য কিনা তাহা নির্ণয় করা

২। তত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

জনসংখ্যার পর্যালোচনা বলিতে জনগণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনাই বুঝায়। ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান : জনসংখ্যার আয়তন, জনবসতির ঘনত্ব, জনসংখ্যার বসবাস-পদ্ধতি বা নগর ও গ্রামের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন, জনগণের জীবনধারণ প্রণালী বা উপজীবিকা অনুসারে জনবসতির বণ্টন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতি। এখন এগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

জনসংখ্যার আয়তন (Size of the Population) : ১৯৬১ সালের জনগণনার চূড়ান্ত হিসাব অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যা ৪৩·৯২ কোটি। ইহার মধ্যে অবশ্য জম্মু ও কাশ্মীরের পাকিস্তান ও চীন অধিকৃত অঞ্চলের জনসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত নহে.

ভারতের মোট জনসংখ্যা

১৯৫১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা (গোয়া দমন ও দিউ, পণ্ডিচেরি প্রভৃতি ধরিয়া) ছিল ৩৬·১১ কোটি। সুতরাং বিগত ১০ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২১·৫ ভাগ। তুলনামূলকভাবে ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১৩·৩ ভাগ।

ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে উত্তরপ্রদেশই সর্বাপেক্ষা জনবহুল। এই রাজ্যেই ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ বাস করে। তাহার পর আছে যথাক্রমে বিহার, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবংগ। পশ্চিমবংগের জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮ ভাগ।

বিভিন্ন রাজ্যে জনসংখ্যার অনুপাত

জনবসতির ঘনত্ব (Density of Population) : জনবসতির ঘনত্ব বলিতে বুঝায় প্রতি বর্গমাইলে গড় লোকবসতি। ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুসারে সমগ্র ভারতে জনবসতির গড় ঘনত্ব ছিল ৩১৬—অর্থাৎ, ভারতে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ৩১৬ জন করিয়া লোক বসবাস করিত।** ১৯৬১ সালের জনগণনার চূড়ান্ত হিসাব অনুসারে জনবসতির ঘনত্ব ৩৭৩-এ আসিয়া পৌছিয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঘনত্ব সর্বাধিক হইল কেরলে এবং সর্বনিম্ন (জম্মু ও কাশ্মীরকে বাদ দিয়া) রাজস্থানে। কেরলে জনবসতির ঘনত্ব ১১২৭ এবং রাজস্থানে মাত্র ১৫৩। কেরলের পরই আছে ১০৩২ ঘনত্ব সমন্বিত পশ্চিমবংগ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে দিল্লীর ৪৬৪০ ঘনত্বই সর্বাধিক।

ভারতের জনবসতির গড় ঘনত্ব

ঘনত্ব সর্বাধিক কেরলে এবং সর্বনিম্ন রাজস্থানে

ভারতের জনবসতির ঘনত্বে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডের এক-চতুর্থাংশের কম অংশে বাস করে। দ্বিতীয়ত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্বের এরূপ তারতম্য আর বিশেষ কোথাও দৃষ্ট হয় না। উচ্চ ও নিম্ন গাংগেয় সমতলভূমির ঘনত্বের সহিত জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের জনবসতির ঘনত্বের যে-বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে তাহা একরূপ সমান্তরালবিহীন। সর্দার পাণিকর প্রভৃতির মতে, জনবসতির আঞ্চলিক বণ্টনজনিত এইরূপ অসমতাই ভারতের জনগণ সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা। এ-সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা হইতেছে।

জনবসতির ঘনত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ

জনবসতির আঞ্চলিক বণ্টনজনিত অসমতার জন্য সমস্যা

* Census of India (1961) Final Population Totals

** কোন কোন ক্ষেত্রে ১৯৫১ সালে জনবসতির ঘনত্বকে ৩১২ বলিয়া দেখানো হইয়াছে; আবার জম্মু ও কাশ্মীর, সিকিম এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের পার্বত্য ক্ষেত্র ধরিয়া গড় ঘনত্ব ২৮৭ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

জনগণের বসবাস-পদ্ধতি (Pattern of Living of the Population) : বসবাস-পদ্ধতি বলিতে বুঝায় নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন। ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতবাসীর শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ (৮২'৬২) ছিল গ্রামবাসী। বাকী শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ লোক মাত্র নগরাঞ্চলে বাস করিত। ১৯৬১ সালের জনগণনায় এই বসবাস-পদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা সামান্য কমিয়া ৮২'১৬ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এখনও গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা হইল নগরাঞ্চলের পাঁচগুণ। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রতি ৬ জন ভারতীয়ের ৫ জন গ্রামাঞ্চলে বাস করে। এই কারণে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির (Committee on Rural Credit Survey) রিপোর্টে বলা হইয়াছিল যে, ভারত হইল বিশেষ মাত্রায় গ্রামীণ ভারত।*

ভারত বিশেষ মাত্রায় গ্রামীণ ভারত

ভারত বিশেষ মাত্রায় গ্রামীণ ভারত হইলেও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় নগরাঞ্চলের জনবসতির বৃদ্ধি নিয়মিত ঘটিতেছে। ১৯২১ সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করিত; বর্তমানে উহা ১৭ ভাগের উপরে দাঁড়াইয়াছে। নগরসমূহের সংখ্যাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে অন্তত ১ লক্ষ জনসংখ্যাসমন্বিত নগরের সংখ্যা ছিল ৫৮; ১৯৬১ সালে উহা ১১১-তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যে-দিক দিয়াই দেখা হউক না কেন ভারতে জনবসতির গতি যে নগরাঞ্চলের দিকে সে-কথা সম্পূর্ণ অনস্বীকার্য।

কিন্তু গ্রামাঞ্চলের তুলনায় ভারতের নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার নিয়মিত বৃদ্ধি ঘটিতেছে

তবুও উল্লেখযোগ্য নগরিকরণ (urbanization) ঘটিতে ভারতের পক্ষে বহুদিন লাগিবে। তুলনামূলকভাবে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডে শতকরা ৮০ ভাগের কাছাকাছি লোক নগরাঞ্চলে এবং ২০ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। ভারতের নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের অনুপাত এখনও শতকরা ২০-তে পৌছায় নাই।

জনগণের জীবনযাপন প্রণালী (Pattern of Livelihood of the Population) : জনগণের জীবনযাপন প্রণালী বলিতে বুঝায় উপজীবিকা অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টন। ১৯৫১ সালের জনগণনার রিপোর্টে উপজীবিকা অনুসারে ভারতীয় জনগণকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল—যথা, কৃষিজীবী (agricultural) এবং অ-কৃষিজীবী (non-agricultural)। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষিজীবী বলিতেই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং অ-কৃষিজীবী বলিতেই নগরাঞ্চলের অধিবাসিগণকে বুঝায় না। নগরাঞ্চলের অনেক অধিবাসী উপজীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল; এবং গ্রামাঞ্চলে অনেক ব্যক্তি কৃষি ছাড়া অন্যান্য উপজীবিকা হইতে অন্নসংস্থান করে।

জীবনযাপন প্রণালী বলিতে কি বুঝায়

যাহা হউক, উক্ত এবং অন্যান্য রিপোর্টে** কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণকে মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭০ (৬৯'৮) ভাগ বলিয়া দেখানো হইয়াছিল। বর্তমানে উহা

* All-India Rural Credit Survey—Vol. II

** Final Report of the National Income Committee, 1954

সামান্য কমিয়া শতকরা ৬৫ ভাগের মত দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এখনও ভারতে প্রতি ১০ জন ব্যক্তির মধ্যে ৬·৫ জনের মত জীবিকার জন্য কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। ইহা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্বের অন্যতম নির্দেশক। ভারতে শিল্পপ্রসার হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে শতকরা ১০ ভাগের কম লোক ঐ সূত্র হইতে জীবিকানির্বাহ করে।

কৃষিজীবীর প্রাধান্য

বয়সের দিক হইতে জনসংখ্যার গঠন (Age Composition of the Population): পাশ্চাত্য দেশে ১৫-৫৫ বৎসর বয়স্ক শ্রমশীল ব্যক্তিগণই সংখ্যায় অধিক হয়; ভারতে কিন্তু শিশুর সংখ্যা বর্তমানে অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু, আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের অনেকে গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকে বলিয়া তাহাদের কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার মধ্যে ধরা হয় না। ফলে ভারতে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকের যোগান পাশ্চাত্য দেশসমূহ অপেক্ষা অনেক কম দেখা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভারতের ন্যায় মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এত পরাবলম্বী ব্যক্তি পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেখা যায় না।

ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে পরাবলম্বীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাত (The Sex Ratio of Population): পরপর ১৯৪১, ১৯৫১ এবং ১৯৬১ সালের জনগণনায় দেখা গিয়াছে যে, ভারতে স্ত্রীলোকের অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী। পুরুষের এই সংখ্যাধিক্য ভারতীয় জনগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় ভারতে কন্যা-সন্তান অপেক্ষা পুত্র-সন্তানই অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে; এবং যে-সময়ে স্ত্রীলোকের সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা থাকে (reproductive age) সেই সময়ে তাহারা এত সংখ্যায় মারা যায় যে, পুরুষের সংখ্যা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে বাধ্য।

স্ত্রীলোকের অনুপাতে পুরুষের সংখ্যাধিক্য

১৯৫১ সালে ভারতে প্রতি ১ হাজার পুরুষপিছু ৯৪৭ জন স্ত্রীলোক ছিল; ১৯৬১ সালে স্ত্রীলোকের আনুপাতিক সংখ্যা আরও কমিয়া ৯৪১-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অল্প হইলেও এবং সন্তানবতী হইবার সময়ে স্ত্রীলোকগণ বহুসংখ্যায় মারা গেলেও ১৯২১ সাল হইতে সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে সন্তানবতী হইবার যোগ্য স্ত্রীলোক সংখ্যায় বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়মিতভাবে ঘটিয়া চলিতেছে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি (Growth of Population): ১৯৪১ সালে এবং ইহার পূর্ববর্তী সময়ে অখণ্ডিত ভারতবর্ষের জনগণনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের জনগণনা হইল ভারতীয় ইউনিয়নের বা খণ্ডিত ভারতবর্ষের। সুতরাং ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অনুরূপ বিষয়ের আলোচনা অখণ্ড ভারতবর্ষের যে-অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়।

১৯৪১-৫১ সাল, এই ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল শতকরা ১৩.৩ ভাগ। কিন্তু বিগত ১০ বৎসরে (১৯৫১-৬১) বৃদ্ধি ঘটিয়াছে মোটামুটি শতকরা ২১.৫ ভাগ। নিম্নে এই শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার দেখানো হইল :

১৯০১	ভিত্তি বৎসর
১৯১১	+ ৫.৮
১৯২১	− ০.৩৫
১৯৩১	+১১.০০
১৯৪১	+১৪.৩
১৯৫১	+১৩.৩
১৯৬১	+২১.৫

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯১১ সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তী দশকে কিন্তু বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা শতকরা ০.৩৫ ভাগ হ্রাস পায়। আবার ১৯২১-৩১ সালে জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এই সময় হইতে বৃদ্ধি অব্যাহতভাবেই চলিয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি অনুসারে ১৯১১ সালে বর্তমান ভারতীয় ইউনিয়ন-ভুক্ত অঞ্চলগুলির জনসংখ্যা ছিল ২৫ কোটি, এবং ফলে বিগত অর্ধ-শতাব্দীতে (১৯১১-৬১) জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হইল শতকরা ৭৪।* বিগত দশকে (১৯৫১-৬১) মোট বৃদ্ধি শতকরা ২১.৫ হইলে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ২.১৫ ভাগে। ইহার তুলনায় ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১.৩৩।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হঠাৎ এরূপ বাড়িয়া যাওয়াতে অনেকেই পরিকল্পনা ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের মতে, এই হার অব্যাহত থাকিলে বা আরও বাড়িলে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা একপ্রকার অসম্ভবই হইয়া উঠিবে; এমনকি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া যাইতে পারে। এই কারণে ভারতে জনসংখ্যার আঞ্চলিক বণ্টন, বসবাস-পদ্ধতি, জীবনযাপন প্রণালী প্রভৃতি স্থিতিশীল দিক (static aspect) অপেক্ষা জনসংখ্যার গতিশীল দিক (dynamic aspect)—অর্থাৎ, ইহার বৃদ্ধির পর্যালোচনাই অধিকতর প্রয়োজনীয়।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির বাৎসরিক হার—ইহা কি অধিক ?

ভারতের জনাধিক্যের সমস্যা (Problem of India's Overpopulation) : ভারতে জনাধিক্যের সমস্যাকেই সাধারণত ভারতীয় জনগণ সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের মধ্যে প্রধানতম বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু ভারতে প্রকৃত জনাধিক্য ঘটিয়াছে কি না এ-বিষয়েই মতবিরোধ রহিয়াছে। সুতরাং জনাধিক্যের লক্ষণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন।

* পার্লামেন্টে ১৯৬১ সালের ২৭শে মার্চ তারিখের বিবৃতি।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, জনাধিক্য সম্বন্ধে দুইটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে—যথা, ম্যালথুসীয় তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (Malthusian Theory) অনুসারে জনসংখ্যার আয়তনকে খাদ্য-যোগানের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়া ইহার প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ, দেখা হয় যে, খাদ্যের যোগান জনসংখ্যার পক্ষে পর্যাপ্ত কি না। যদি পর্যাপ্ত না হয় তবে দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে এইভাবে জনাধিক্য ঘটিলে মহামারী, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি জনসংখ্যার বাড়তিটুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠা করে। মহামারী, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive checks)। জনসংখ্যা অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি করানো যেন একটি পাপ এবং পাপের জন্যই প্রকৃতি এই সকল উপায়ের সাহায্যে মানুষের উপর প্রতিশোধ লয়। ম্যালথাসের মতে, ইহাদের মাধ্যমে মৃত্যুর অত্যধিক হারই হইল জনাধিক্যের লক্ষণ।

জনাধিক্য সম্বন্ধে তত্ত্ব : ক। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের দ্বারা যে-ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা অস্থায়ী ভারসাম্য (temporary equilibrium) মাত্র—কারণ, জনসংখ্যার সর্বদাই ঝোঁক রহিয়াছে খাদ্যের যোগানকে ছাড়াইয়া যাইবার দিকে। স্বতই, অন্য উপায় অবলম্বন না করিলে মানুষকে সর্বদাই মহামারী, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং ম্যালথাসের মতে অন্য উপায়—অর্থাৎ, জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (preventive checks) অবলম্বন করা উচিত। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলিতে ম্যালথাস বিবাহ ব্যাপারে সংযম, জন্মনিরোধ প্রভৃতি বুঝিয়াছিলেন।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে (Theory of Optimum Population) অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারও (Economic Test) বলা হয়। অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারে জনসংখ্যাকে মাত্র খাদ্যের যোগানের সহিত তুলনা না করিয়া দেশের সামগ্রিক ধনোৎপাদনবৃদ্ধির আপেক্ষিক হিসাবেই দেখা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইবার জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন। ইহাকে কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলা হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাথাপিছু আয় (per capita income) সর্বাধিক হইতে পারে না। অপরদিকে, আবার জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে মোট জাতীয় আয় (total national income) বাড়িতে পারে; কিন্তু মাথাপিছু আয় কমিতে থাকে। সুতরাং প্রয়োজন হইল যাহাতে জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। তত্ত্বগতভাবে বলা হয়, এই জনসংখ্যা দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় থাকে।* ইহার সামান্য

খ। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

কাম্য জনসংখ্যা কাহাকে বলে

* Optimum population "remains in technological equilibrium with the productive resources of the country."

বৃদ্ধি বা হ্রাস ভারসাম্যের অবস্থাকে নষ্ট করিয়া দেয়। অতএব দেশের জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে, দেশে জনাধিক্য ঘটিতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে ; ইহার লক্ষণ হইল, মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর কমিয়া যাওয়া। যদি দেশের জনসংখ্যা কাম্য স্তরে না পৌছিয়া থাকে তবে তত্ত্বের দিক হইতে দেশটি জনবিরল (underpopulated) এবং ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু আয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যার অবস্থায় আসিবে। এই অবস্থাকে 'সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা' (point of maximum return) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—কারণ, এই অবস্থায় মাথাপিছু আয় হয় সর্বাধিক। তারপর আর জনসংখ্যার বৃদ্ধি কাম্য নহে ; তখন জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধিকেও জনাধিক্যের সূচক বলিয়া ধরিতে হইবে।

সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা ও জনাধিক্যের লক্ষণ

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই দিক হইতেই এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, পি. কে. ওয়াটাল, অধ্যাপক গিয়ানচাঁদ প্রভৃতি প্রখ্যাত ভারতীয় অর্থবিদ্যাবিদ ভারতকে অতিপ্রজ বা মাত্রাতিরিক্ত-ভাবে জনবহুল দেশ (overpopulated country) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়, জনাধিক্যের লক্ষণ দেশের মুখমণ্ডলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। ১৯৪৩ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ অনেকাংশে বিকৃত শাসননীতির ফল হইলেও, এই সময় হইতেই এই ধারণা দৃঢ়তর হয় যে ভারতে খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে শতকরা ৬-৭ ভাগ খাদ্যশস্য যোগানে ঘাটতি ছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে খাদ্য-ঘাটতি কিছুটা কমিলেও, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই উহা আবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মার্কিন কৃষি-বিশেষজ্ঞ দলের (American Team of Agricultural Specialists) মতে, ১৯৫৯ সালের হারে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি (বাৎসরিক শতকরা ৩.২ ভাগ) ঘটিতে থাকিলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যোৎপাদনে শতকরা ২৫ ভাগ ঘাটতি দেখা দিবে।

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে

প্রমাণ :
১। খাদ্যাভাব

খাদ্য-যোগানের অপ্রতুলতার প্রধান প্রমাণ হইল বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেও (১৯৬১-৬২) ভারতকে প্রায় ৯৭ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে হইয়াছে।* ইহার উপর ভারত নিয়মিতভাবে কিছু খাদ্য সাহায্য হিসাবেও পাইয়াছে। খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) অনুমান করিয়াছিল যে ১৯৫৭ সাল হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন বাকী সময়ে খাদ্য-ঘাটতি মিটাইবার জন্য এবং খাদ্য-মূল্য দমিত রাখিবার জন্য বৎসরে ২০-৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে। এ-অনুমান একরূপ সত্যে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ১৯৪৯ সালে লর্ড বয়েড-ওর (Lord Boyd-Orr) উক্তি করিয়াছিলেন যে চিরন্তন অর্ধাহার এবং নিয়মিতভাবে সাময়িক অনাহার হইল ভারতে অন্যতম নিয়ম—তাহা এখনও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই।

* Report on Currency and Finance, 1961-62

সুতরাং যেদিক হইতেই দেখা হউক না কেন, খাদ্য-যোগানের তুলনায় যে ভারতের জনসংখ্যা দিন দিন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।*

দ্বিতীয়ত, ১৯২১ সাল হইতে জনসংখ্যার যে-নিয়মিত বৃদ্ধি তাহাকেও ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে জনাধিক্যের অন্যতম সূচক বলিয়া গণ্য করা যায়। ১৯১১-৬১ সালের

২। জনসংখ্যার নিয়মিত বৃদ্ধি

মধ্যে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৭৪ ভাগ। শুধু ১৯৫১-৬১ সাল ধরিলে জনসংখ্যা বৎসরে শতকরা ২'১৫ হারে বাড়িয়াছে।** বিগত দশকে বিস্ফোরকের মত এই বৃদ্ধি (explosive growth) সকল অনুমানকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ১৯৬১ সালের জনগণনার পূর্বে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (Central Statistical Organisation) অনুমিত বাৎসরিক শতকরা ১'৯ হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধিকেই পরিকল্পনা কমিশন অত্যধিক বলিয়া মনে করিয়াছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কমিশন শতকরা ২'১৫ হারে বৃদ্ধিতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে।†

৩। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের কার্যকারিতা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের কার্যকারিতাও ভারতে বিশেষমাত্রায় দৃষ্ট হয়। আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ ভারতে লাগিয়াই আছে; সংক্রামক ব্যাধি ও মহামারীর প্রকোপ কমিলেও তাহারা অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই।

সুতরাং ম্যালথুসীয় তত্ত্বের লক্ষণসমূহের দিক হইতে দেখিলে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়াই অভিমত প্রদান করিতে হইবে।

অপরদিকে যাঁহারা ম্যালথুসীয় তত্ত্বের পরিবর্তে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারের পক্ষপাতী তাঁহাদের মতে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই, কারণ:
১। উৎপাদন জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পূর্বে ডাঃ পি. জে. টমাস দেখাইয়াছিলেন যে, ১৯০০ হইতে ১৯৩০—এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কৃষিজ উৎপাদন ও শিল্পজাত উৎপাদন উভয়ই জনসংখ্যার তুলনায় অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরিকল্পনাধীন প্রথম ১০ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ২১ ভাগ কিন্তু খাদ্যশস্য ও শিল্পজাত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ ও ৯৫ ভাগ।

অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারের অপরাপর সমর্থকগণ বিভিন্ন সময়ে জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে ইহা দেখাইয়াছেন যে এই শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে মাথাপিছু আয় বাড়িয়াই

২। মাথাপিছু আয়ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে

চলিয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫ টাকা; ১৯৬১-৬২ সালে ইহা ২৯৩'৭ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। পরিকল্পনাধীন প্রথম ১০ বৎসরে দেখা যায় যে মাথাপিছু আয় (১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে) বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৮ ভাগ।

* এ-সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য 'ভারতের খাদ্য-সমস্যা' সংক্রান্ত অধ্যায়টি দেখ।

** ৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† Third Five Year Plan ২২ পৃষ্ঠা

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে ভারতে এখনও জনাধিক্য ঘটে নাই—অধ্যাপক ক্যান্নান (Cannan) প্রভৃতি কল্পিত 'সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা' (point of maximum return) এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। তবে যে ভারতে অনাহার, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, জীবনযাত্রার নিম্ন মান প্রভৃতি দৃষ্ট হয় ইহার কারণ কি ? কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মতে, ইহা হইল গতানুগতিক উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং অন্যায্য বণ্টন। ভারতে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে যদি আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করা যায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিভিন্ন উপাদানকে যদি অধিকতর উৎপাদনাভিমুখী করা যায় এবং বর্তমান উৎপন্নের যদি ন্যায্য বণ্টন করা হয় তবে ভারতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাই থাকিবে না। উৎপাদন-ব্যবস্থা দক্ষতাহীন এবং বণ্টন-ব্যবস্থা অন্যায্য বলিয়াই ভারতীয়গণ প্রাচুর্যের মাঝখানেও দরিদ্র জীবনযাপন করে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাসীদের এই মতকে অধ্যাপক সেলিগম্যানের (Seligman) ভাষায় এইভাবে বিবৃত করা যায়: ভারতের জনগণ সম্পর্কিত সমস্যা মাত্র সংখ্যার সমস্যা নহে ; ইহা হইল সুদক্ষ উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনের সমস্যা।*

ভারতের সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা এখনও পৌছায় নাই

ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা হইল সুদক্ষ উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনের সমস্যা

ভারতে জনাধিক্য সম্বন্ধে মতামত পোষণকারী আর একদল ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ম্যালথুসীয় তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যপথ দিয়া চলেন। ইঁহাদের মতে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচার বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয় ; ইহা বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র। সুতরাং ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কি না, তাহার বিচার ইহার মাপকাঠিতে করা চলিতে পারে না। জাতীয় আয়-কমিটি প্রদর্শিত মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ইঁহারা বলেন যে প্রকৃত আয়ের (real income) যে-বৃদ্ধি গত ২০ বৎসরে ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে। খাদ্যের উৎপাদন জনসংখ্যাকে সময় সময় ছাড়াইয়া গেলেও ইহা অতিমাত্রায় দৈবনির্ভরশীল। যে-কোন বৎসরে দেশের যে-কোন অংশে সহসা খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা

অপরদিকে, ম্যালথুসীয় তত্ত্ব পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নহে। ইয়োরোপের বেলায় ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইয়াছিল। ইয়োরোপে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে জীবনযাত্রার মানের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল। ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য ম্যালথাসের তত্ত্বের কিছুটা গুরুত্ব আছে—কারণ ভারতে উৎপাদন ও জনসংখ্যা সাধারণত ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। কিন্তু যে-সকল ম্যালথুসীয় লক্ষণ ভারতে পরিদৃষ্ট হয়—যথা, অনাহার অর্ধাহার, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাহা অনেক সময় শাসননীতির অপপ্রয়োগেরই ফল। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৩ সালের বংগীয় দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে জনসংখ্যা

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সমালোচনা

* "The Problem of population is not one of mere number but of efficient production and equitable distribution."

নিয়ন্ত্রণের এই প্রাকৃতিক উপায়গুলির কার্যকারিতাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে এবং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উত্তরোত্তর উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া অবশ্য অযথা আশান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। বর্তমানে ভারতে জনাধিক্যের অবস্থা (state of overpopulation) না ঘটিলেও জনসংখ্যা যে-হারে বাড়িয়া চলিতেছে তাহা হইতে জনসংখ্যার গতি যে জনাধিক্যের দিকে (tendency to overpopulation) সে-বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নাই। জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার এত বেশী যে তৃতীয় পরিকল্পনার (১৯৬১-৬৬) পাঁচ বৎসরে ভারতে যে পরিমাণ জনবৃদ্ধি ঘটিবে মাত্র তাহাই প্রায় গ্রেট ব্রিটেনের মোট জনসংখ্যার সমান হইবে।* এইজন্যই ১৯৫১ সালের জনগণনা কমিশনার বলিয়াছিলেন, "জনসংখ্যা ব্যাপারে ভারত বিশেষ সংকটের সম্মুখীন।"

গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত : ভারতে জনাধিক্য না ঘটিলেও গতি জনাধিক্যের দিকে

বর্তমানে এই মতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় যে, এখনও ভারতে জনাধিক্যের অবস্থা ঘটে নাই, তবে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অপ্রতিহত থাকিলে অদূর ভবিষ্যতেই জনাধিক্য ঘটিবে। ১৯৬১ সালের জনগণনার ফলের ভিত্তিতে এইরূপই মনে হইতেছে যে উত্তরোত্তর বৃহত্তর আকারের পরিকল্পনা সত্ত্বেও উৎপাদনবৃদ্ধি বেশী দিন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না। অতএব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা বেশী সচেতন ও উদ্যোগী হইবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই দেখা দিয়াছে।

জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি (Future Growth of Population) : উপরি-উক্ত উপসংহারের পর জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বর্তমানে কুৎসিনস্‌কির (Kuczinsky) বিখ্যাত প্রণালীকে জনসংখ্যা কি হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই প্রণালী নীট পুনরুৎপাদন হার (Net Reproduction Rate) বলিয়া অভিহিত। প্রণালীটি অনুসারে দেখা হয়, বর্তমান ও ভাবী মাতার মধ্যে অনুপাত কিরূপ। অর্থাৎ, ১০০ জন মাতা কতজন ভাবী মাতা রাখিয়া যাইতেছে। বর্তমান মাতার সংখ্যার তুলনায় ভাবী মাতার সংখ্যার অনুপাত যত বেশী হইবে, অর্থাৎ নীট পুনরুৎপাদনের হার একের যত অধিক হইবে জনসংখ্যাবৃদ্ধিও তত আশংকাজনক রূপ ধারণ করিবে। ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নীট পুনরুৎপাদনের হার ১ অপেক্ষা সামান্য কম; ভারতে কিন্তু এক অপেক্ষা অনেক বেশী।

নীট পুনরুৎপাদনের হার

ভারতে নীট পুনরুৎপাদনের হার একের কতটা অধিক তাহা অবশ্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। জাতীয় আয়-কমিটির জনসংখ্যা সাব-কমিটি এই হারকে ১.৫-এর কাছাকাছি বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। নীট পুনরুৎপাদন হার প্রায় ১.৫ হইলে জনসংখ্যা ১৯৭১ সালের বা ২০ বৎসরের পূর্বে ৫০ কোটিতে পৌছিবে। এই হিসাবকে তখন অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহাকে অত্যল্প বলিয়াই ধরা হইতেছে। ১৯৬১ সালের

---

* W. B. Reddaway, *The Development of the Indian Economy*

জনগণনার পূর্বেই কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (Central Statistical Organisation) অনুমান করিয়াছিল যে ভারতের জনসংখ্যা ১৯৭১ সালে প্রায় ৫৩ কোটিতে এবং ১৯৭৬ সালে প্রায় ৫৭ কোটিতে পৌছিবে। বর্তমানে অনুমান করা হইতেছে যে ১৯৭১ ও ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা যথাক্রমে ৫৫.৫ কোটি এবং ৬২.৫ কোটিতে দাঁড়াইবে।*

জনবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে এরূপ জনবৃদ্ধি যে অত্যন্ত ভীতির কারণ, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং প্রয়োজন হইল বিশেষ প্রতিবিধান অবলম্বনের।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উন্নয়ন কার্যাবলীর প্রভাব

(Effect of Development Planning upon Population Growth): এই প্রসংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উন্নয়ন কার্যাবলীর প্রভাব লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারণের, এমনকি অনেক অর্থবিদ্যাবিদেরও ধারণা যে উন্নয়ন কার্যাবলীর ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। কুৎসিনস্‌কি, ডাঃ চার্লস প্রভৃতি উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছেন যে শিল্পোন্নতির সংগে সংগে ঐ সকল দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়া গিয়াছে। এই ঐতিহাসিক তথ্য হইতে অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে ভারতেও উন্নয়ন কার্যাবলী-জনিত জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হ্রাস পাইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত যে শুধু ১৯৬১ সালের জনগণনার ফলে ভুল প্রমাণিত হইয়াছে তাহা নহে, তত্ত্বের দিক দিয়াও উহা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, যে তত্ত্বের উপর ইহা নির্ভরশীল তাহা আংশিকভাবে সত্য মাত্র। উন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমে অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইলে; তৎপূর্বে জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর হারেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ডাঃ নবগোপাল দাশ বলেন, "অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাথমিক অবস্থায় জনসংখ্যার বৃদ্ধিই ঘটায়, হ্রাস নহে।" প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে—অর্থাৎ, বেশ কিছুটা উন্নয়ন সাধিত হইলে, জনসংখ্যা সমহারে বাড়িতে থাকে। তারপর উন্নয়নের পরিমাণ আরও বাড়িলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিতে সুরু করে। অবশ্য উন্নয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ের শেষদিকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার আবার সামান্যই বাড়িতে পারে; যেমন, বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ দেখা যাইতেছে। অতএব, উন্নয়নকার্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উহার ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় উন্নয়নকার্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়

ভারত এখন পরিকল্পিত উন্নয়নকার্যের প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত। সুতরাং বর্তমানের একপ্রকার অকল্পিত জনবৃদ্ধি উন্নয়নকার্যেরই প্রাথমিক ফল। কিছুদিন পূর্বে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (Princeton University) দুইজন অধ্যাপক—এ্যানস্‌লে কোলে (Ansley Coale) ও এড্‌গার হুভার (Edger Hoover)

* Dr. B. N. Ganguly, Director of Delhi School of Economics, on Census Figures of 1961 and Third Five Year Plan ২২ পৃষ্ঠা

ভারতের জনগণ সম্পর্কিত সমস্যার বিশদ আলোচনা করিয়া যে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকাখানি* প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই অভিমতই সমর্থিত হইয়াছে। অধ্যাপকদ্বয়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় বলিয়া ভারতে জনসংখ্যা স্বতই পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে বাড়িতেছে। সুতরাং উত্তরোত্তর বৃহত্তর পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকর করিতে হইবে, নচেৎ জীবনযাত্রার মান ক্রমশ কমিয়াই আসিবে। কিন্তু ডাঃ চন্দ্রশেখরের মতে, ১৯৫১-৬১ সালে ভারতে যে জনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা প্রধানত জনস্বাস্থ্যোন্নয়নেরই ফল। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। তবে তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ব্যবস্থা অবিলম্বেই গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতেও ইহা ঘটিতেছে

জীবনযাত্রা প্রণালী ও জীবনযাত্রার মানের উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল (Effect of Population Growth on Mode and Standard of Living) : জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টার আলোচনার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালী ও জীবনযাত্রার মানের উপর এই জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল কি হইয়াছে এবং ফল আর কি হওয়া সম্ভব। জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর জনসংখ্যা-বৃদ্ধির প্রথম ফল হইল মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়া। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যে মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ ১১১ সেণ্ট হইতে ৮২ সেণ্টে পরিণত হয়। মাথাপিছু দুই প্রকার শস্য উৎপাদনকারী জমির (double crop area) এবং সেচসমন্বিত জমির (irrigated area) পরিমাণও ঐ সময়ের মধ্যে যথাক্রমে ১৩ সেণ্ট হইতে ১০ সেণ্টেরও কমে এবং ১৮ সেণ্ট হইতে ১৪ সেণ্টে নামিয়া আসে। সুতরাং কোন দিক দিয়াই মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে তাল রাখিতে পারে নাই।**

জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল : ১। মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়া

মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে বহুসংখ্যায় পল্লী অঞ্চল ত্যাগ করিয়া কর্মের অনুসন্ধানে নগরাঞ্চলে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। জনগণনার রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে ১৯২১-৫১ সালের মধ্যে পল্লী অঞ্চলের জনসংখ্যা মোট শতকরা ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে নগরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১২০ ভাগ। অধ্যাপক কোলে ও হুভারের মতে, জনসংখ্যার নগরজীবনের প্রতি এই আকর্ষণ বিশেষ কাম্য নহে। শিল্পোন্নয়নের সূচক হইলেও, ইহা নগরজীবনে ভারসাম্যের অভাব ঘটাইতেছে। সুতরাং এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন এবং সংগে সংগে মূল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে একটি জাতীয়

২। জনসংখ্যার নগরাভিমুখী গতি ও ইহার ফল

* Population Growth and Economic Development in India, 1956-86

** Third Five Year Plan

নগরাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা (a national urban development plan) গ্রহণ করাও অপরিহার্য।*

জনসংখ্যাবৃদ্ধির আর একটি ফল হইল প্রাথমিক জীবিকাসমূহের উপর অতি-মাত্রায় নির্ভরশীলতা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীনে শিল্পোন্নয়নের সবিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও শতকরা ৬৫ ভাগ লোক কৃষি ও অনুরূপ উপ-জীবিকার উপর নির্ভরশীল এবং শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহণ হইতে জীবিকা সংস্থান করে জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ। পরিকল্পনা কমিশন আশংকা প্রকাশ করিয়াছে যে কৃষির উপর নির্ভরশীলতার জনসংখ্যার পরিমাণ কমাইয়া শতকরা ৬০ ভাগে আসিতে পঞ্চম পরিকল্পনাধীন সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে।**

৩। প্রাথমিক জীবিকা-সমূহের উপর নির্ভর-শীলতা

পরিশেষে, ইহাও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে জনসংখ্যার বিশেষ বৃদ্ধি হেতু বর্ধিত জাতীয় আয় মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানে ঠিকমত প্রতিফলিত হইতেছে না। পরিকল্পনাধীন প্রথম ১০ বৎসরে (১৯৫১-৬১) মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ৪৪ কিন্তু মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ। সুতরাং জীবনযাত্রার মানে কতটা উন্নয়ন ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

৪। জীবনযাত্রার মানের স্থিতিশীলতা

অতএব, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে শুধু মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। বর্ধিত জাতীয় আয় যেন কাম্য অনুপাতে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে, সে-দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, আর্থিক উন্নয়নের সংগে সংগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সম্যক ব্যবস্থাও করিতে হইবে।†

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিত পন্থাসমূহ (Suggested Remedies for checking Populational Growth) : ১৯৫১ সালের জনগণনা কমিশনারের (Census Commissioner) মতে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হইল 'অদূরদর্শী মাতৃত্ব'কে (improvident maternity) পরিহার করিবার ব্যবস্থা করা। অদূরদর্শী মাতৃত্ব বলিতে জনগণনা কমিশনার বুঝাইয়াছিলেন, ইতিমধ্যেই তিন বা ততোধিক সন্তানবতী মাতার পুনরায় মাতৃত্ব লাভ করা। সাধারণত ইহাকেই পরিবার পরিকল্পনা (family planning) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই অদূরদর্শী মাতৃত্ব পরিহারকরণ বা পরিবার পরিকল্পনাই যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান প্রতিবিধান, ইহা পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যে-সকল ব্যবস্থার নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সাধারণ ও সামাজিক শিক্ষার প্রসার,

পন্থাসমূহ :
১। অদূরদর্শী মাতৃত্ব পরিহার করা বা পরিবার পরিকল্পনা

* Population Growth and Economic Development in India

** Draft Third Plan

† Third Five Year Plan ২৫ পৃষ্ঠা

লোকের কুসংস্কার দূরিকরণার্থে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য, পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক উপদেশ-কেন্দ্র (family planning clinics) স্থাপন, দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় বা বিনামূল্যে প্রদান, অস্ত্রোপচার দ্বারা প্রজননশক্তি বিনষ্ট করা (sterilisation), প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২। বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আর একটি পদ্ধতি হইল বিবাহের, বিশেষত স্ত্রীলোকের বিবাহের, বয়সকে বাড়াইয়া দেওয়া। স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়সকে বাড়াইয়া দিলে সন্তানবতী হইবার মোট সময়কে কমাইয়া দেওয়া হয় এবং যে-সময় সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে সেই সময় হইতে কিছুটা অংশ বাদ পড়িয়া যায়। সুতরাং জন্মহার কমিয়া যায়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আরও জোরালো পদ্ধতি আছে এবং অনেকে এই সকল জোরালো পদ্ধতি অবলম্বনেরই সুপারিশ করিয়া থাকেন। যথা, বিবাহ ও সন্তান-জন্মের উপর কারধার্য করা, তিনটির অধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে মজুরিহ্রাসের ব্যবস্থা করা, একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর পুরুষ বা নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ আইন দ্বারা রহিত করা, ইত্যাদি।*

এই সকল প্রতিবিধান কতদূর অবলম্বন করা যাইতে পারে সে-প্রশ্নের বিচারের পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে এদেশে কোন্ কোন্ প্রতিবিধান এ-পর্যন্ত অবলম্বিত হইয়াছে, এবং উহারা কতদূরই বা সফল হইয়াছে।

অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ এবং উহাদের সফলতা (Adopted Remedies and their Effectiveness): ব্রিটিশ যুগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই বলা চলে। বস্তুত, জাতীয় সরকার পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণের পর হইতেই এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে; এবং জাতীয় আয়-কমিটির ও ১৯৫১ সালের জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। অবশ্য এ-পর্যন্ত মাত্র পরিবার পরিকল্পনাই মূল প্রতিবিধান হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হইলেও ইহার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণের জন্য বরাদ্দ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন সমস্যার গুরুত্বকে লঘুই করিয়াছিল। উপরন্তু, ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছিল যে, পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল স্বাস্থ্য ও পারিবারিক কল্যাণ। ইহার ফলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক কল্যাণকে পশ্চাতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম

* K. M. Cariappa, *Limit on Children*

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে জন্মনিয়ন্ত্রণের নির্ভরযোগ্য সূত্র লইয়া গবেষণা করা হয়, বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালানো হয়, শতাধিক পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান-বিতরণ কেন্দ্রও খোলা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্যার উপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় মোট পরিবার নিয়ন্ত্রণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ কোটি টাকা। ইহা দ্বারা নগরাঞ্চলে ৫০০ এবং গ্রামাঞ্চলে ২০০০—এই ২৫০০ জ্ঞান-বিতরণ কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব ছিল। কর্মসূচী নির্ধারণ করিবার জন্য কেন্দ্রে এবং কয়েকটি রাজ্যে পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড (Family Planning Boards) স্থাপন করা হয়। ইহা ছাড়া কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পুস্তিকা, প্রদর্শনীর মাধ্যমে এ-বিষয়ে প্রচারকার্য চালানো হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ ৫ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয় ৩ কোটি টাকার মত। ফলে পরিকল্পনার শেষে পরিবার পরিকল্পনা-কেন্দ্রের সংখ্যা মাত্র ১৭৫০-এ আসিয়া দাঁড়ায়।*

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

খসড়া তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য ২৫ কোটি টাকার মত কার্যক্রম গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু পরে—১৯৬১ সালের জনগণনার ফল বাহির হইবার পর উহা অত্যল্প বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত পরিকল্পনায় ৫০ কোটি টাকার মত কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে পরিবার পরিকল্পনা-কেন্দ্র ১৭৫০ হইতে ৮২০০-তে দাড়াইবে আশা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রের সংখ্যা হইবে ৬১০০। পরিবার পরিকল্পনা-কেন্দ্র ছাড়াও গবেষণা ও শিক্ষাবিস্তারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে। অনেকে অবশ্য এই ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। এই অগ্রাধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে গতানুগতিক প্রতিবিধান ছাড়াও পূর্বোক্ত বিশেষ জোরালো ব্যবস্থা—যেমন, তিনটির অধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতার উপর করধার্য ও পিতার মজুরিহ্রাস, ইত্যাদি অবলম্বনের সুপারিশও করা হয়, এবং পরিবার পরিকল্পনার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী ও শ্রমিকদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করার কথা বলা হয়।**

তৃতীয় পরিকল্পনা

উপসংহার: উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় জনসংখ্যাকে স্থিতিশীল অবস্থায় আনয়ন করিতে বহুদিন সময় লাগে। পশ্চিম ইয়োরোপের ক্ষেত্রে ইহা করিতে প্রায় এক শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল। অবশ্য বলা যায়, পশ্চিম ইয়োরোপে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই; ঐ স্থানে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি কতকটা স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। তবুও ভারতে জন্মহারের দ্রুতহ্রাস আশা করা অযৌক্তিক, কারণ অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ব্যাপকতার জন্য এ-দেশের বিপুল গ্রামাঞ্চলে ও শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম

বর্তমানে গৃহীত নীতি

* Third Five Year Plan

** The Battle of Numbers, Yojana, April 16, '61

সফল হইতে একরূপ দীর্ঘদিন সময় লাগিবেই। এই সময়ের মধ্যেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাইতে পারে।

স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি এবং অন্যান্য জোরালো ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহা কতদূর কার্যকর হইবে, বলা কঠিন। কারণ, এক্ষেত্রেও অশিক্ষা ও কুসংস্কার প্রতিবন্ধকের কার্য করিবে। উপরন্তু, গণতান্ত্রিক ভারত-রাষ্ট্রে শাসকগোষ্ঠী এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহসী হইবেন না বলিয়াই মনে হয়; কারণ ইহাতে তাঁহাদের শাসনাসন হইতে চ্যুত হইবার ভয় আছে।

এই সকল কারণে অনেকের মত হইল যে, জনসংখ্যা ও উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন ও সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে গ্রহণীয় পন্থা হইল দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা। এজন্য প্রয়োজন হইলে আরও বৃহত্তর আকারের পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। সংগে সংগে অবশ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নচেৎ ভারসাম্য আনয়ন করা সম্ভব হইলেও উহাকে বজায় রাখা যাইবে না; উহা মাত্র অস্থায়ী ভারসাম্য হইবে।

পরিকল্পনা কমিশন বর্তমানে এই নীতিই গ্রহণ করিয়াছে। পরিকল্পনার আকারবৃদ্ধির সংগে সংগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম মূল কার্যক্রম (key programme) করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

জনসংখ্যার আঞ্চলিক বণ্টনজনিত সমস্যা (Problem relating to the Regional Distribution of Population):

এই সমস্যার গুরুত্ব

জনসংখ্যার ঘনত্ব বা আঞ্চলিক বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে, এক এক অঞ্চল অত্যন্ত জনবহুল এবং এক এক অঞ্চল বিশেষভাবে জনবিরল। আমরা ইহাও দেখিয়াছি, সর্দার পাণিকর প্রভৃতির মতে জনসংখ্যার বণ্টনজনিত এই অসমতাই ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রধান সমস্যা।* সুতরাং ইহার সমাধানের প্রচেষ্টাই সর্বাগ্রে করিতে হইবে। ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া যে-অভিমত প্রকাশ করা হয় তাহা এই শ্রেণীর লেখকগণের মতে হইল আঞ্চলিক বণ্টনজনিত সমস্যা। যদি জনবহুল অঞ্চলসমূহ হইতে বেশ কিছু পরিমাণ জনসংখ্যাকে জনবিরল অঞ্চলসমূহে ছড়াইয়া দেওয়া হয় তবে ভারতে জনাধিক্যের বিশেষ কোন সমস্যাই থাকিবে না। সুতরাং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ (internal migration) হইল জনাধিক্যের সমস্যার প্রধান সমাধান।

আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের মাধ্যমে ভারতে জনাধিক্যের সমস্যার সমাধান করা যাইবে কিনা এই বিচার করিবার জন্য জানা প্রয়োজন যে, কি কি বিষয় দ্বারা জনসংখ্যার আঞ্চলিক ঘনত্ব নির্ধারিত হয়।

---

* ৫০ পৃষ্ঠা।

জনসংখ্যার আঞ্চলিক ঘনত্ব নির্ধারক বিষয়গুলি দেশের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এই দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া যে যে অঞ্চলে কৃষিকার্যের সুবিধা আছে সেই সেই অঞ্চলে জনবসতি বিশেষভাবে ঘন। কৃষিকার্যের সুবিধা বলিতে মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি, ভূমির অবস্থানগত প্রকৃতি (configuration of land), বৃষ্টিপাত, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতিই বুঝায়। নিম্ন ও উচ্চ গাংগেয় সমতলভূমিতে (Lower and Upper Gangetic Plains) এই উপাদানগুলির অস্তিত্ব অধিকমাত্রায় বর্তমান বলিয়া এই অঞ্চলই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ভারতীয় ইউনিয়নের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয় ভূখণ্ডের এই অংশেই বাস করে।

কি কি বিষয় দ্বারা আঞ্চলিক ঘনত্ব নির্ধারিত হয়

কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য জনবসতির ঘনত্ব একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঘটিতে পারে। এই সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেই কৃষিকার্য জনবসতির ঘনত্বের পরিমাণ আর বৃদ্ধি করিতে পারে না। ভারতের ক্ষেত্রে ইহাই ঘটিয়াছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য বর্তমানে আর জনবসতির আকর্ষক নহে। সুতরাং লোক গ্রামাঞ্চল হইতে নগরাভিমুখী হইয়াছে। যে-সকল ব্যবসাবাণিজ্য ও উৎপাদন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা বিশেষমাত্রায় জনসংখ্যাকে আকর্ষণ করিতেছে। বলা যায়, ভারতে কৃষির দ্বারা জনসংখ্যার বণ্টন নির্ধারণের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া শিল্পবাণিজ্যের দ্বারা নির্ধারণের যুগ আসিয়াছে। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের পরিবর্তে জলসেচ-ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ শক্তি, বন্যানিরোধ-ব্যবস্থা প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবদানই বর্তমানে জনবসতির ঘনত্বের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমান ভারতে শিল্পবাণিজ্য জনসংখ্যার ঘনত্বকে নির্ধারণ করিতেছে

এখন ভারতের আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের দ্বারা জনগণ-সম্পর্কিত সমস্যার কতদূর সমাধান করা যায়, তাহা দেখা যাউক। অধিকাংশ উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতে জনবসতির গড় ঘনত্ব মোটেই অধিক নহে; বরং বিশেষ কম। বিগত দশ বৎসরে ঘনত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইলেও উহা ৪০০ ছাড়াইয়া যায় নাই।* তুলনায় ইংল্যাণ্ড, জাপান, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে জনবসতির ঘনত্ব ৬০০-র অধিক। সুতরাং জনবসতির গড় ঘনত্বকে সূচক হিসাবে ধরিলে ভারতে জনাধিক্য ঘটিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। যাহা হউক, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও জনাধিক্যের আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতে বর্তমানেই জনাধিক্য ঘটিয়াছে কি না সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিবার জন্য যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। জনসংখ্যার আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের দ্বারা কতদূর কি ব্যবস্থা করা সম্ভব ইহাই হইল প্রশ্ন।

ভারতের জনবসতির গড় ঘনত্ব অধিক নহে

* ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে উহা ছিল ৩৭৩।

জনসংখ্যার আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ করার জন্য প্রয়োজন জনবিরল অঞ্চলসমূহে সেচকার্যের ও জমির উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি এবং শিল্পবাণিজ্যের প্রসার। কিন্তু সেচকার্যের ও জমির উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি কতকটা সহজভাবে করা গেলেও জনবিরল অঞ্চলে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। শিল্পবাণিজ্য অনেক পরিমাণে ভৌগোলিক বিষয়সমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রাকৃতিক কারণসমূহও শিল্পের আঞ্চলিকতা বহু পরিমাণে নির্ধারণ করে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যেখানে কয়লা ও লৌহ নাই সেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা স্থাপন করা কতদূর সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত সে-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে। জমির উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি কতকটা সহজসাধ্য হইলেও সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ, রাজস্থানের অনুর্বর অঞ্চলকে কৃষিকার্যের উপযোগী করার কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বনবেষ্টনী রোপণ, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা করা সম্ভব হইলেও, করিতে বহু দিন সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা অকাম্যভাবে বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর না করিয়া জনাধিক্য সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানকল্পে অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজন। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদনবৃদ্ধি, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের হ্রাসের সংগে সংগে আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের ব্যবস্থাও কিছুমাত্রায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। এইরূপ বিভিন্নমুখী প্রতিবিধানের মাধ্যমেই ভারতের জনসংখ্যা-সম্পর্কিত সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব।

আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের সম্ভাবনা কতদূর

একমাত্র আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ পর্যাপ্ত সমাধান হইতে পারে না

প্রশ্নোত্তর

1. Examine some of the salient features of the Indian population as revealed by the last census.

[ইংগিত: ভারতে জনসংখ্যার আয়তন, বৃদ্ধি, আঞ্চলিক বণ্টন, বসবাস পদ্ধতি, জীবনযাত্রা প্রণালী প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া জনাধিক্যের প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা।...(৫০-৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।)]

2. Is India overpopulated? Give reasons for your answer.

(C. U. B. A. 1940, '43, '50; B. Com. 1955)

[ইংগিত: জনসংখ্যার আয়তন সকল সময়ই দেশের আর্থিক সম্পদের আপেক্ষিক। আর্থিক সম্পদ পর্যাপ্ত হইলে ক্ষুদ্রায়তন দেশেও বৃহৎ জনসংখ্যার পক্ষে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে। আবার আর্থিক সম্পদ অপ্রতুল হইলে বৃহদায়তন দেশেও ক্ষুদ্র জনসংখ্যা অধিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং কোন দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কি না তাহা বিচার করিতে হইবে ঐ দেশের আর্থিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে।

আর্থিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত দুইটি তত্ত্ব—ম্যালথুসীয় ও কাম্য জনসংখ্যা অনুসারে কোন দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কি না তাহা বিচার করা হয়। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব আর্থিক সম্পদ বলিতে মাত্র খাদ্য-যোগানই ধরিয়া লয়। সুতরাং এই তত্ত্ব অনুসারে মাত্র খাদ্য যোগাইবার তুলনায় জনসংখ্যার

বৃদ্ধিকে বিচার করা হয়। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারে কিন্তু দেশের সামগ্রিক সম্পদ উৎপাদনের সহিত জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনা করা হয়। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে, অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচার অনুসারে ঘটে নাই। বর্তমানে এই দুই তত্ত্বের কোনটাকেই সম্পূর্ণ প্রযোজ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। তাই ভারতে একদল মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আছেন যাঁহাদের মতে, ভারতে বর্তমানে জনাধিক্য না ঘটিলেও জনসংখ্যাবৃদ্ধি বর্তমান হারে চলিলে অদূর ভবিষ্যতেই জনাধিক্য ঘটিবে—উৎপাদনবৃদ্ধি ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না। ১৯৬১ সালের জনগণনার ফল বাহির হইবার পর হইতে এই মতই দৃঢ়তর হইয়াছে। এই মধ্যপন্থীদেরই অনুসরণে উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে, ভারতে বর্তমানে জনাধিক্য হয়ত ঘটে নাই, কিন্তু সুস্পষ্ট গতি যে জনাধিক্যের দিকে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এখনই করিতে হইবে।......(৫৩-৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।)]

3. Discuss the effect of development planning upon the growth of population in India. (C. U. B. Com. 1958) (৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

4. What are the factors that determine the density of population in India? How far can internal migration solve India's population problem? (৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the effects of increase of population on the mode and standard of living. (৬০-৬২ পৃষ্ঠা)

6. Is the growth of population in India the main obstacle to the economic progress of the country? Give reasons for your answer. (C. U. B. Com. (P. I) 1962) (৫৩, ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা এবং ২য় খণ্ডে তৃতীয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।)

7. Discuss the growth of population in the context of planned economic development. (C. U. B. Com. 1962) (৫২-৫৩ এবং ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

সপ্তম অধ্যায়

কৃষি—সাধারণ পর্যালোচনা

(Agriculture—A General Survey)

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব (Importance of Agriculture in the Economic Life of India):

শিল্পোন্নয়ন সত্ত্বেও ভারতে কৃষির গুরুত্ব কমে নাই

কৃষিকার্য প্রাচীনতম উপজীবিকা হইলেও শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং দিন দিন আরও কমিয়া যাইতেছে। ভারতে কিন্তু শিল্পোন্নয়ন সত্ত্বেও এই গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে এই গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যাইবে।

ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ কৃষিকার্যের সহিত জড়িত। ইহার উপর যদি ব্যাপক অর্থে কৃষির সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিগণকে ধরা হয় তবে কৃষির উপর

নির্ভরশীল জনসংখ্যার শতকরা ভাগ মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশকেও ছাড়াইয়া যাইবে। পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শিল্প-উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনগণের জীবনযাত্রাপ্রণালী গত তিন-চার দশক ধরিয়া অপরিবর্তিতই আছে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় ভারতে কৃষির উপর এইরূপ অত্যধিক নির্ভরশীলতা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। ইংল্যাণ্ডের এইরূপ ব্যক্তিগণের শতকরা ভাগ কমিতে কমিতে ৫-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শতকরা ভাগ হইল ১২।

১। কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তির শতকরা ভাগ অপরিবর্তিতই আছে

১৯৬১-৬২ সালের জাতীয় আয়ের প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায় যে, মোট নীট ১৪,৬৩০ কোটি টাকার মধ্যে শতকরা ৪৭ ভাগের কাছাকাছি কৃষিকার্য ও অনুরূপ উপজীবিকাসমূহ হইতে উপার্জিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, কৃষি ভারতের জাতীয় আয়ের অন্যতম সূত্র।

২। কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধাংশ অর্জিত হয়

তৃতীয়ত, খাদ্য-সমস্যার জন্য কৃষির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের রিপোর্ট অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট ১১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, (১৯৫৮-৫৯ সালের উৎপাদন ৭ কোটি টন ধরা হইয়াছিল) নচেৎ খাদ্যসংকট ঐ পরিকল্পনাকেই বানচাল করিয়া দিবে। সুতরাং কৃষির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেই হইবে। এই কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে আবার অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

৩। খাদ্য-সমস্যার জন্য কৃষির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে

কৃষিজ দ্রব্যসমূহকে ভারতীয় শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসাবে গণ্য করা চলে। এই কাঁচামালের উপর বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, পাটকল শিল্প, তৈল ও বনস্পতি শিল্প নির্ভরশীল। সুতরাং এই শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এবং এগুলির উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিতে হইলে উপরি-উক্ত কৃষিজ দ্রব্যাদির পরিমাণবৃদ্ধি ও গুণগত উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

৪। শিল্পে কাঁচামাল যোগানের দিক দিয়া কৃষির গুরুত্ব

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যেও কৃষিজ দ্রব্যাদির ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা কঠিন। প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য ঔপনিবেশিক ধরনেরই (colonial type) ছিল—অর্থাৎ, ভারত তখন প্রধানত কাঁচামাল রপ্তানি ও নির্মিত দ্রব্যসমূহ (manufactured articles) আমদানি করিত। যে কাঁচামাল রপ্তানি করিত তাহার মধ্যে কৃষিজ দ্রব্যাদিই ছিল প্রধান। এখনও চা, তৈলবীজ, তামাক, কফি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়। ১৯৬১-৬২ সালে মোট প্রায় ৬৬২ কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে একমাত্র চা-এরই রপ্তানি-মূল্য ছিল প্রায় ১২১ কোটি টাকা।*

৫। বহির্বাণিজ্যের দিক দিয়া কৃষির গুরুত্ব

* Report on Currency and Finance, 1961-62

১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশন (Fiscal Commission) ভারতের সামগ্রিক সমাজজীবনেও কৃষির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নির্দেশ দিয়াছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের সামগ্রিক জীবন ও অর্থনীতিতে কৃষির সম্যক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। উপরন্তু, ভারতের ক্ষেত্রে "কৃষিকার্য উপজীবিকা মাত্র নহে। ইহা অন্যতম জীবনযাপনপ্রণালী যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কোটি কোটি জনগণের চিন্তা ও দৃষ্টিভংগিকে রূপদান করিয়া আসিতেছে।" সুতরাং ভারতীয় কৃষির আধুনিকিকরণ এবং ইহার সহিত শিল্পপ্রসারের সমন্বয়সাধন করিয়া কৃষিকে সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বলা যায়, আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে ইহাই করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে; এবং এই কারণেই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিগত ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

কৃষির গুরুত্ব সম্বন্ধে ১৯৪৯-৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশন

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Indian Agriculture): ভারতে অন্যান্য উপজীবিকার উপর কৃষির যে অনন্যসাধারণ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই ভারতীয় কৃষির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়। উপজীবিকা হিসাবে ভারতে কৃষিকার্য বিশেষভাবে জনবহুল। ইহা ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের অনগ্রসরতারই লক্ষণ। যদি আমরা দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে না চাই, তবে ইহার পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেই ব্যবস্থারই সূচনা করা হয়। ঐ পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে মূল শিল্প গঠনের উপর। তৃতীয় পরিকল্পনায় আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) জন্য এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণে কৃষিকে আবার অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

বৈশিষ্ট্য:
১। উপজীবিকা হিসাবে কৃষির ভারাধিক্য ভারতীয় কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য

উপজীবিকা হিসাবে কৃষিকার্যের বিশেষ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হইলেও ভারতীয় কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত—ইহা হইতে লোকে কোনমতে মাত্র দিন গুজরান করিতে পারে। সুতরাং ইহাকে উপজীবিকা বা পেশা বলিয়া বর্ণনা করা একরূপ ভুল। ইহা হইল ভারতীয়গণের প্রধান জীবনধারণপ্রণালী। অনন্যোপায় হইয়াই শতকরা ৬৫ ভাগের মত ভারতীয় এই প্রণালী পুরুষানুক্রমে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

২। ভারতীয় কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত

তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য দেশসমূহে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সাধারণ নীতি হইলেও ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন করা হয়। ইহার প্রধান কারণ হইল ভারতে কৃষিজমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা। যৌথ পরিবার প্রথার বিলুপ্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগির প্রসার, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পসমূহের ধ্বংস প্রভৃতির ফলে বিশেষ

৩। ভারতে ক্ষুদ্রায়তনে কৃষিকার্যই হইল রীতি

করিয়া এই বিংশ শতাব্দীতে কৃষিজমির একক (unit of cultivation) ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে।

৪। কৃষিকার্যের পদ্ধতি অতি প্রাচীন

চতুর্থত, কৃষিকার্যের পদ্ধতিও বিশেষ পুরাতন। ভারতীয় কৃষক আজও আদিম যুগের সেই লাঙল এবং একজোড়া বলদ দিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ, জলসেচ, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি পদ্ধতি আজও অধিকাংশ ভারতীয় কৃষকের নিকট অজ্ঞাত বা আয়ত্তের বাহিরে।

৫। উৎপাদনের স্বল্পতা

পঞ্চমত, উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্যই ভারতীয় কৃষির আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলে; তাহা হইল কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্বল্পতা। ভারতে প্রতি একরপিছু জমিতে ধান্য গম তুলা ইক্ষু প্রভৃতি শস্য ঐ সকল শস্য-উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম উৎপন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, জাপানে গড়ে প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন হয় প্রায় ১৭০০ পাউণ্ড ধান্য, কিন্তু ভারতে উৎপন্ন হয় মাত্র ৮১৬ পাউণ্ড। পূর্বে ভারতে ধান্য উৎপাদনের হার আরও কম ছিল। বর্তমানে জাপানী প্রথায় ধান্য চাষ কতকটা ব্যাপক হওয়ার ফলেই ঐরূপ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।*

সিদ্ধান্ত: ভারতীয় কৃষি অতিমাত্রায় অনগ্রসর

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনার পর একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া পারা যায় না। ইহা হইল ভারতের প্রাচীনতম ও মূল জাতীয় শিল্পের (National Key Industry) অনগ্রসরতা। বস্তুত, ভারতীয় কৃষি বিশেষভাবে পশ্চাদ্‌পদ। প্রধান জাতীয় শিল্প বলিয়া ইহার উন্নয়নের প্রশ্নই সর্বাগ্রে আসিয়া পড়ে। সাম্প্রতিক যুগের ধ্বনি যে শিল্পোন্নয়ন ব্যতিরেকে আমরা বাঁচিতেই পারিব না তাহা ভারতের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সত্য মাত্র। ভারতের ন্যায় দেশে শিল্পোন্নয়নের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে কৃষির পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও আধুনিকিকরণের প্রশ্ন। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এ-প্রসংগেই আলোচনা করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the importance of agriculture in the economic life of India. (৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা)

2. Describe the characteristics of Indian agriculture. (৬৯-৭০ পৃষ্ঠা)

3. Explain the causes of the low productivity of Indian agriculture, and suggest measures by which the level of productivity may be raised. (B. U. B.A. 1961)

[ইংগিত: ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যগত ত্রুটির জন্যই উৎপাদন এরূপ স্বল্প। এই বৈশিষ্ট্যগত ত্রুটিগুলি দূর করিলেই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এইভাবে গড় ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ৬৯-৭০ পৃষ্ঠা দেখ।]

* খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রি-দপ্তর প্রচারিত তথ্য।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্যা

(Problems of Agricultural Land)

দেখা গিয়াছে যে কৃষি ভারতের মূল জাতীয় শিল্প হওয়া সত্ত্বেও ইহা অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ, কারণ ইহা নানা সমস্যা বিজড়িত। এই সমস্যাসমূহের কতকগুলি কৃষিজমির সহিত সম্পর্কিত।

কৃষিজমি সংক্রান্ত চারিটি সমস্যা

ভারতে কৃষিজমি সংক্রান্ত সমস্যা প্রধানত চারিটি: (১) কৃষিজমির পরিমাণ-বৃদ্ধির সমস্যা, (২) জলসেচের সমস্যা, (৩) কৃষিজমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সমস্যা, এবং (৪) খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের (holdings) সমস্যা।

কৃষিজমির পরিমাণবৃদ্ধির সমস্যা (Problem of Extending the Area of Cultivation):

জমির ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন হইল ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইল বা ৮০·৬৩ কোটি একর।* ইহার মধ্যে ৭২·১০ কোটি একর জমি বা মোট ভূখণ্ডের শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগের ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (land utilisation statistics) পাওয়া গিয়াছে। এই ৭২·১০ কোটি একর জমির মধ্যে কৃষিজমি ও কৃষিকার্যের উপযুক্ত পরিমাণ হইল নিম্নলিখিত রূপ :

		কোটি একর
১।	নীট কর্ষিত জমি	৩২·৭০
২।	বর্তমানে অনাবাদী জমি	২·৮০
৩।	চাষযোগ্য অপচয়	৪·৭০
৪।	তৃণভূমি, ফলের বাগান ইত্যাদি	৪·৬০
৫।	অন্যান্য (বন, মরুসদৃশ জমি, বাড়িঘর ইত্যাদি দ্বারা অধিকৃত জমি)	২৭·৩০
	মোট	৭২·১০

চাষের জমির পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে

দেখা যাইতেছে, মোট কৃষিজমির পরিমাণ হইল ৩৫·৫০ কোটি (৩২·৭০ কোটি + ২·৮০ কোটি) একর। ইহার মধ্যে ২·৮০ কোটি একর জমিতে বর্তমানে চাষ হয় না, কিন্তু একসময় হইত। সুতরাং এই সকল 'বর্তমানে অনাবাদী জমি'তে (current fallows) পুনরায় কৃষির ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং সহজও। উপরন্তু, প্রায় ৪·৭০ কোটি একর জমি চাষযোগ্য অপচয় (cultivable waste) হিসাবে পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে কতটা পরিমাণ জমিতে লাভজনকভাবে কৃষিকার্য সম্পাদন করা যাইতে পারে

* India—1962

তাহা নির্ধারণের জন্য ১৯৫০ সালে উপ্পল কমিটি (Uppal Committee) নিযুক্ত হয়। উপ্পল কমিটির মতে, এরূপ ১ কোটি একরের মত জমিতে লাভজনকভাবে কৃষিকার্য সম্পাদন করা যায়।* সুতরাং মোট কৃষিজমির পরিমাণ ৩·৮০ কোটি (২·৮০ কোটি+১ কোটি) একরের মত বাড়ানো সহজেই সম্ভব।

এখন প্রশ্ন, ইহা যদি সহজসাধ্যই তবে কৃষিজমির জন্য এত বুভুক্ষা সত্ত্বেও এই সকল জমি বর্তমানে পতিত হইয়া রহিয়াছে কেন? উত্তরের সন্ধানে অবশ্য বেশীদূর যাইতে হয় না। এই সকল জমি সাম্প্রতিককালে পতিত হইয়া থাকিবার কারণ হইল ম্যালেরিয়া, নগরিকরণ (urbanization) অথচ পরিবহণের অবন্দোবস্ত এবং জমির উৎপাদিকাশক্তি ক্ষয়ের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া। সুতরাং বর্তমানে অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করিতে হইলে সমস্যাটিকে তিন দিক দিয়া আক্রমণ করিতে হইবে—অর্থাৎ, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, পরিবহণের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার মধ্যে ম্যালেরিয়া ইতিমধ্যেই একপ্রকার নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে; সুতরাং অপর দুইটি বিষয়ের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা (Land Reclamation in India) ঃ অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা বা পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৯৪৭ সালে। ঐ বৎসর মার্কিন সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত ২০০ ট্রাক্টর লইয়া কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫১ সালে বিশ্ব ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development) হইতে ঋণ করিয়া ভারত সরকার আরও ২৪০টি নূতন ট্রাক্টর ক্রয় করে। ইহার পর কতকগুলি রাজ্য সরকার তাহাদের নিজস্ব ট্রাক্টর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। ইহা ছাড়া সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষকরাও জমির পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হয়। এই তিন প্রকার প্রচেষ্টার ফলে পরিকল্পনাধীন প্রথম ১০ বৎসরে (১৯৫১-৬১) ৪০ লক্ষ একর পতিত জমির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। ইহা ব্যতীত অন্যান্য পদ্ধতিতে প্রায় ৫০ লক্ষ একর জমি কৃষির অধীনে আসে। ফলে মোট কৃষিজমির পরিমাণ ৩১·৮ কোটি একর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩২·৭ কোটি একরে দাঁড়ায়।**

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ট্রাক্টর সংগঠন

প্রথম দুই পরিকল্পনায় কৃষিজমির পরিমাণ-বৃদ্ধি

তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ একরের মত কৃষিজমির পরিমাণবৃদ্ধির আশা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে পুনরুদ্ধৃত জমির পরিমাণ হইবে ২৫ লক্ষ একর। ইহা ছাড়া ২ কোটি একর জমিতে জলসেচবিহীন কৃষিকার্য (dry farming practices) লইয়াও পরীক্ষা করা হইবে।† কিভাবে পতিত জমি পুনরুদ্ধার করা যায় সে-সম্বন্ধে কৃষকগণকে ব্যাপক শিক্ষা দেওয়া হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

* Uppal Committee's First Report

** Third Five Year Plan

† Third Five Year Plan

জলসেচের সমস্যা (Problem of Irrigation) : মৌসুমী বায়ুর আলোচনা প্রসংগে ভারতে জলসেচের গুরুত্ব সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, ভারতের মৃত্তিকা বিশেষ শুষ্ক বলিয়া এখানে কৃষিকার্যের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভারত মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এখানে সকল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে প্রয়োজন হয় জলসেচের। দ্বিতীয়ত, সুজলা অঞ্চলেও সারা বৎসর সমান বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে সেচ-ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অনাবৃষ্টির বৎসরে শস্যহানি হইয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। ধান্য ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত জলসরবরাহের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল, এবং এই নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত জলসরবরাহ একমাত্র সেচের মাধ্যমেই সম্ভব। তৃতীয়ত, মৌসুমী বায়ুর ফলে বৃষ্টিপাত হয় প্রধানত বর্ষাকালে। কিন্তু আমাদের দেশে নানাপ্রকার শীতকালীন ফসলও উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই সকল ফসলের জন্যও সেচের সুবন্দোবস্তের প্রয়োজন। পরিশেষে, বর্তমানে যে পতিত জমির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহার জন্যও সেচকার্যের প্রয়োজন। এই সকল জমি সেচ-সমন্বিত হইলে তবেই উৎপাদনশীল চাষের জমিতে পরিণত হইতে পারে। সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলিতে পারা যায়, কৃষিকার্যের নিশ্চয়তা, প্রসার এবং সমৃদ্ধির জন্য ভারতের ন্যায় দেশে সেচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এইজন্যই স্যর চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান (Sir Charles Trevelyan) বলিয়াছেন, "ভারতে সেচই সব; এখানে জল স্বর্ণ অপেক্ষাও মূল্যবান।"

সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্ব

গুরুত্বের সংক্ষিপ্তসার

বর্তমানে ভারতে মোট কর্ষিত জমির মাত্র শতকরা ২১ ভাগের কাছাকাছি (৩২ কোটি একরের মধ্যে ৭ কোটি একর) সেচ-সমন্বিত।* ইহা যে মোটেই পর্যাপ্ত নহে সে-ধারণা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই করা যাইবে। তাই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে বিশেষভাবে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণবৃদ্ধির বিশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে।

বিভিন্ন ধরনের সেচ-ব্যবস্থা (Types of Irrigation Works) : বর্তমানে ভারতের সেচ-ব্যবস্থাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়: (১) ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা, (২) মাঝারি সেচ-ব্যবস্থা, এবং (৩) বৃহৎ সেচ-ব্যবস্থা। প্রধানত কূপ নলকূপ পুষ্করিণী ও ছোট ছোট খাল হইতে সেচ-ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা (minor irrigation works) বলা হয়। ইহাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির ব্যয় ১০ লক্ষ টাকার কম। ব্যয় ১০ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ৫ কোটি টাকার কম হইলে উহা মাঝারি সেচ-ব্যবস্থা (medium irrigation works) বলিয়া অভিহিত হয়। নদীতে মাঝারি ধরনের বাঁধ বাঁধিয়া সেচ-ব্যবস্থা করা হইলে তাহা এই পর্যায়ভুক্ত হয়। আর বড় বড় বাঁধ যাহাদের প্রত্যেকটির ব্যয় ৫ কোটি টাকার অধিক তাহারা বৃহৎ সেচ-ব্যবস্থা নামে অভিহিত হয়।

তিন প্রকারের সেচ-ব্যবস্থা—ছোটখাট, মাঝারি ও বৃহৎ

* Reserve Bank Bulletin, March 1963

বৃহৎ ও মাঝারি সেচ-ব্যবস্থার মধ্যে অধিকাংশ হইল বহুমুখী পরিকল্পনা। অর্থাৎ, এই সকল ব্যবস্থা হইতে একই সংগে সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে আবার বন্যানিরোধ ও নৌবাহ্য খাল খননের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই বহুমুখী পরিকল্পনাগুলির বর্ণনা পরিশিষ্টে করা হইতেছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে সেচ-ব্যবস্থা (Irrigation under Planned Economy): প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ভারতে ৫·১৫ কোটি একর বা মোট কর্ষিত জমির শতকরা ১৮ ভাগ সেচ-সমন্বিত ছিল। ইহার মধ্যে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা হইতে প্রায় ৩ কোটি একর এবং বৃহৎ ও মাঝারি সেচ-ব্যবস্থা হইতে ২ কোটি একরের কিছু অধিক জমিতে সেচকার্য সম্পাদিত হইত। তৃতীয় পরিকল্পনার সূচনায় সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ কোটি একরে বা মোট কর্ষিত জমির শতকরা ২১ ভাগে দাঁড়ায়, তাহার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে।

প্রথম দুই পরিকল্পনায় সেচ সম্প্রসারণ

যে-সকল সেচ-পরিকল্পনা প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় তাহাদের মোট আনুমানিক ব্যয় হইল ১৪০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ঐ দুই পরিকল্পনায় ৭৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। বাকী ৬৩০ কোটি টাকার মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়িত হইবে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা। ইহার উপর সকল প্রকার নূতন কার্যক্রমের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ২১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সুতরাং এই পরিকল্পনায় সেচের খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হইল ৬৫০ কোটি টাকা।*

আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সেচ-সম্প্রসারণের ব্যবস্থা যে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে করা হইয়াছে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই করা যাইবে। এই দীর্ঘকালীন কার্যক্রম অনুসারে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে (১৯৭৫-৭৬) মাত্র বৃহৎ ও মাঝারি সেচ-ব্যবস্থা হইতেই ৮·৫ কোটি একর এবং ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা হইতে ৭·৫ কোটি একর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইবে। ইহার মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বৃহৎ ও মাঝারি সেচ-ব্যবস্থা হইতে ৪·২৫ কোটি একর জমিতে এবং ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা হইতে ৪·৭৫ কোটি একর জমি সেচ-সমন্বিত করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হইলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ ৯ কোটি একরে (৪·২৫ + ৪·৭৫ কোটি একর) পৌছিবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে যে-সব সেচ-ব্যবস্থাগুলি নির্মাণ করা হইতেছে উহাদের পূর্ণ ব্যবহার (full utilisation) করা সম্ভব হইতেছে না। অবশ্য গত কয়েক বৎসরের মধ্যে উহাদের ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে বৃহৎ ও মাঝারি সেচ-ব্যবস্থাসমূহের মোট সম্ভাব্য ক্ষমতার (potential capacity) শতকরা মাত্র ৪৭ ভাগ প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করা হয়। ১৯৬১-৬২ সালের

সেচ-ব্যবস্থার ব্যবহারের হার

* Third Five Year Plan

শেষে ঐ ব্যবহারের হার হয় শতকরা ৭১ ভাগ। সুতরাং ভারতের কৃষকরা যাহাতে সেচ-ব্যবস্থাগুলি হইতে আরও অধিক সুযোগ গ্রহণ করে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তিক্ষয়ের সমস্যা (Problem of Declining Fertility of the Soil): মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি বা উর্বরতা নানাভাবে ক্ষয় হয়। প্রথমত, ভারতের ন্যায় পুরাতন দেশে কৃষিকাযর্ বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসার দরুন মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির সকল দানের মত মৃত্তিকারও উৎপাদিকাশক্তির একটি সীমা আছে বলিয়া এরূপ ঘটে। সুতরাং মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষাকল্পে মানুষের কর্তব্য হইল ক্রমাগত এই ক্ষয়পূরণ করিয়া যাওয়া। এই উদ্দেশ্যে ক্রমাগত সার (manures) এবং উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি (fertilizers) প্রয়োগ করিতে হয়।

ক। সাধারণ কৃষি-কার্যের পদ্ধতিতে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষয়

• এখন প্রশ্ন, অতি প্রাচীনকাল হইতে কৃষিকার্য করিয়া আসার ফলে ভারতে মৃত্তিকার উর্বরতা কতটা হ্রাস পাইয়াছে এবং কতটাই বা ইহার পূরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে?

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, ভারতে মৃত্তিকার উর্বরতা যে-পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে তাহা পূরণ করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা এখনও অবলম্বিত হয় নাই। কৃষির উপর রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Indian Agriculture) বলিয়াছিল যে, যদিও ভারতের মৃত্তিকা বিপজ্জনকভাবে উৎপাদিকাশক্তি হীন হইয়া পড়ে নাই, তথাপি ইহার বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে বিশেষ প্রতিবিধান অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

ভারতের মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাসের প্রতি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা

ভারতে কিন্তু এ-সম্পর্কে সেদিন পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। গোময়, নগর ও পল্লীঅঞ্চলের ময়লা ও আবর্জনা, সরিষা ইত্যাদির খইল, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি সুলভ সার মৃত্তিকায় ব্যবহার না করিয়া অপচয় করা হইয়াছে। অপরদিকে রাসায়নিক উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং আমদানির কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। সুতরাং ভারতে কৃষকরা ব্যবহারের দ্বারা মৃত্তিকার ক্ষয়সাধন করিয়াছে কিন্তু ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা করে নাই।

প্রতিবিধানকল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ

ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে মাত্র ১৯৫১ সাল হইতে। এই সালে সিন্ধ্রির রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম কারখানা। এই কারখানায় বৎসরে ৩ লক্ষ টনের কাছাকাছি এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট উৎপন্ন হয়। ১৯৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এক চুক্তি অনুসারে ঐ দেশ হইতে রাসায়নিক সার আমদানির ব্যবস্থাও করা হয়। প্রথমে সিন্ধ্রিতে উৎপন্ন রাসায়নিক সারেরই যথেষ্ট চাহিদা হয় না, কিন্তু বর্তমানে, বিশেষ করিয়া জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য চাষ সুরু করিবার পর হইতে, রাসায়নিক উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে বাৎসরিক উৎপাদন ও আমদানি হইল ১০ লক্ষ টনের মত, কিন্তু চাহিদা হইল ২৩ লক্ষ টনের কাছাকাছি।

১। সিন্ধ্রির কারখানা

Reserve Bank Bulletin, March 1963

ফলে সিন্ধ্রির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি ও নূতন নূতন কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই সকল নূতন কারখানার মধ্যে ৩টি দ্বিতীয় পরিকল্পনা এবং ৫টি তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। তবে সকল কারখানাই উৎপাদন সুরু করিতে তৃতীয় পরিকল্পনা প্রায় অতিক্রান্ত হইবে। তখন নাইট্রোজেন ও ফসফেট সারের মোট উৎপাদন ১২ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।*

আরও নূতন কারখানা স্থাপন

এইভাবে রাসায়নিক সারের যোগানবৃদ্ধি ছাড়াও গোময়, আবর্জনা প্রভৃতির ন্যায় সহজলভ্য সারও যাহাতে অপচিত না হইয়া ব্যবহৃত হয় তাহার জন্যও প্রচারকার্য চালানো হইতেছে। অন্যান্য প্রকার সুলভ সার উৎপাদনও করা হইতেছে। ইহাতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ব্লকগুলিকে অনেকটা কাজে লাগানো হইয়াছে। এই সকলের ফলে সহজলভ্য সারসমূহের ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

২। সহজলভ্য সারের যথাযোগ্য ব্যবহার

৩। প্রচারকার্য ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাতে এদিকে দৃষ্টি

ভূপৃষ্ঠের সাধারণ ক্ষয়ের দ্বারাও মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস ঘটে। ইহাকে মৃত্তিকার ক্ষয় (soil erosion) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মৃত্তিকার ক্ষয় দ্বারা মৃত্তিকার রাসায়নিক গুণসমন্বিত উপরের ত্বকটি নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই স্থানে এরূপভাবে বালুকা আসিয়া জমা হয় যে, ঐ কৃষিজমি চাষের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। মৃত্তিকার ক্ষয়ের প্রধান কারণ হইল যথেচ্ছভাবে অরণ্যভূমি এবং পত্রগুল্মাদির ধ্বংসসাধন। বৃক্ষ এবং পত্রগুল্মাদির ধ্বংসসাধন করা হইলে মৃত্তিকার উপরিস্থিত ত্বকটিকে বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত সহজেই নষ্ট করিয়া ফেলে। উপরন্তু, অরণ্যভূমি বায়ুপ্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রিত করে এবং অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। সুতরাং বনভূমি ধ্বংস করা হইলে একদিকে যেমন বায়ুপ্রবাহের বেগ সৃষ্টি হয়, অপরদিকে তেমনি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া যায়। যে-অঞ্চলে এইরূপ ঘটে তাহা যদি মরুভূমির সমীপবর্তী হয় তবে মরুভূমির প্রসার ঘটিতে থাকে। রাজস্থানের মরুভূমির প্রসার এইভাবেই ঘটিয়াছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই মরুভূমি বৎসরে গড়ে আধ মাইল করিয়া উর্বর ভূমিকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। দ্বিতীয়ত, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণও মৃত্তিকার ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। গবাদি পশু স্বাভাবিক তৃণগুল্মাদি ধ্বংস করিয়া মৃত্তিকাকে বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের হাতে ছাড়িয়া দেয়। তৃতীয়ত, জমির ব্যবহারের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিও মৃত্তিকার ক্ষয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী। অনেক সময় পার্বত্য ও ঢালু জমিতে বাঁধের ব্যবস্থা না করিয়াই চাষ করা হয়। ফলে মৃত্তিকার উপরের ত্বক বায়ুপ্রবাহ দ্বারা চালিত হইয়া অথবা বৃষ্টির জলে ধুইয়া নীচে নামিয়া আসে।

খ। মৃত্তিকার ক্ষয় ও ইহার কারণ

মৃত্তিকার ক্ষয় যে ঠিক কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। তবে কতিপয় অঞ্চল ইহার দ্বারা যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং মৃত্তিকার ক্ষয়ের জন্য সামগ্রিকভাবে যে ফসল উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে তাহা নিশ্চিত। বিজাপুর জিলা, যাহাকে এক সময় 'দাক্ষিণাত্যের শস্যভাণ্ডার' (Granary of the Deccan) বলিয়া বর্ণনা করা

মৃত্তিকার ক্ষয়ের পরিমাণ

* Third Five Year Plan

হইত, আজ সম্পূর্ণ অনুর্বর হইয়া বারবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতেছে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে প্রায় ২০ কোটি একর জমিতে—অর্থাৎ, মোট জমির এক-চতুর্থাংশে মৃত্তিকার ক্ষয় হইতেছে। কমিশন আরও বলিয়াছে, সেচ-ব্যবস্থার প্রসারের যতই ব্যবস্থা করা হউক না কেন, বহুদিন যাবৎ ১৪-১৫ কোটি একর কৃষিজমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণ, বাঁধ দেওয়া এবং শুষ্ক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের (dry farming techniques) ব্যবস্থা করিয়াই উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে হইবে।*

প্রতিবিধান: মৃত্তিকার ক্ষয়ের প্রতিবিধানের জন্য সম্যক না হইলেও আঞ্চলিক ভিত্তিতে কিছু কিছু ব্যবস্থা অনেক দিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। কিন্তু জাতীয় ভিত্তিতে প্রথম ব্যবস্থা করা হয় প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে। ঐ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কর্মসূচী অবলম্বন করা হয়:

প্রথম পরিকল্পনায় মৃত্তিকা সংরক্ষণ

(ক) সমগ্র ভারতে মৃত্তিকার ক্ষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা; (খ) দেরাদুনের অরণ্যসংক্রান্ত গবেষণাগারের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষক শাখা (Soil Conservation Wing) সংযুক্ত করা; (গ) সমবায়ের ভিত্তিতে মৃত্তিকা সংরক্ষক সমিতিসমূহ সংগঠনে সহায়তা করা; (ঘ) সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা; (ঙ) রাজস্থানের মরুভূমির পশ্চিম সীমায় প্রস্থে ৫ মাইল ব্যাপী এক বনবেষ্টনী রোপণ করিয়া উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লী রাজ্যের দিকে এই মরুভূমির অগ্রগতিকে রোধ করা; (চ) এই কর্মসূচীকে কার্যকর করিবার জন্য কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে প্রয়োজনীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা; (ছ) নূতন বনভূমির পত্তনসংক্রান্ত এক গবেষণাগার স্থাপন।

কর্মসূচী অনুসারে একটি কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষক বোর্ড (Central Soil Conservation Board) ও কতকগুলি রাজ্য মৃত্তিকা সংরক্ষক বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় বোর্ড মৃত্তিকা সংরক্ষক কার্যে শিক্ষাদানের জন্য ছয়টি শিক্ষালয় স্থাপন করে। যোধপুরে নূতন বনভূমির পত্তনসংক্রান্ত গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেরাদুনের অরণ্যসংক্রান্ত শিক্ষালয়ের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষক শাখাও (Soil Conservation Wing) সংযুক্ত হয়। ঐ পরিকল্পনায় মোট ৭ লক্ষ একর কৃষিজমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০ লক্ষ একরের মত কৃষিজমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। ঐ পরিকল্পনায় মৃত্তিকা সংরক্ষণকে জনসাধারণের দায়িত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া কৃষিজীবীদের সহায়তায় উহাকে কার্যকর করিবার প্রচেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতে ৪০টি দৃষ্টান্ত পরিকল্পনা (Demonstration Projects) গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনায় ১১ কোটি একর কৃষিজমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের আশা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া নদী-উপত্যকা, মরুময় অঞ্চল প্রভৃতিতে প্রায় ১১ কোটি একরের মত জমিতে বনভূমির পত্তন, ক্ষয় নিবারণ প্রভৃতির লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা

* Third Five Year Plan ৩৬৭-৮ পৃঃ

খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্যা (Problem of Sub-divided and Fragmented Agricultural Holdings): খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্যা হইল কৃষিকার্যের একক (Unit of Cultivation) সম্পর্কিত সমস্যা। উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় কৃষিকার্যের বেলাতেও উৎপাদনের একটি বিশেষ আয়তন ব্যয়ের দিক দিয়া কাম্য বিবেচিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ আয়তনে উৎপাদন করিলে তবেই সর্বাধিক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার দরুন কৃষিকার্যের একক এই কাম্য আয়তন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র।

খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্যা হইতে কৃষির একক সংক্রান্ত সমস্যা

খণ্ডিকরণ বলিতে বুঝায় উত্তরাধিকারের আইনের অধীনে পুরুষানুক্রমে সম্পত্তির বণ্টনের ফলে ব্যক্তিগত কৃষি-খামারের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যাওয়া; এবং অসম্বদ্ধতা বলিতে বুঝায় ব্যক্তিগত জোত (holding) বহুদূর ব্যাপিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা। ভারতে উত্তরাধিকার আইন কৃষি-খামারকে উত্তরোত্তর খণ্ডীকৃত করিয়া কৃষিকার্যের এককের আয়তন দিন দিন কমাইয়া আনিতেছে। কৃষকের মৃত্যু হইলে তাহার জমিগুলি পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে সমান অংশে বণ্টিত হয়।* ফলে একটি কৃষি-খামার বহু অংশে বিভক্ত হয়। এইভাবে বিভক্ত কৃষি-খামার আরও এক পুরুষ পরে পুনর্বিভক্ত হয়। সুতরাং উত্তরোত্তর খণ্ডিকরণের ফলে কৃষি-খামারের আয়তন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেই থাকে। কৃষিজমি যখন উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টিত হয়—অর্থাৎ, প্রত্যেক উত্তরাধিকারী প্রত্যেক জমির এক অংশ পাইয়া থাকে, তখন প্রত্যেকের জোত (holding) ছোট ছোট খণ্ড হিসাবে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকে। ইহাকেই অসম্বদ্ধতা বলে।

খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতা কাহাকে বলে

খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার পরিমাণ (Extent of Subdivision and Fragmentation): বিভিন্ন সময় সরকারী ও বেসরকারীভাবে জোতের খণ্ডিকরণের পরিমাণ নির্ধারণের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

খণ্ডিকরণের পরিমাণ

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে কয়েকটি রাজ্যে গড় জোতের পরিমাণ ছিল এইরূপ: বোম্বাই ১৩.৩ একর, পাঞ্জাব ১০ একর, মহীশূর ৬.২ একর, উড়িষ্যা ৪.৯ একর, আসাম ৪.৮ একর, মাদ্রাজ ৪.৫ একর, পশ্চিমবংগ ৪.৪ একর এবং উত্তরপ্রদেশ ২.৫ একর।

জোতের উপরি-উক্ত গড় আয়তন হইতে সাধারণ জোতের আয়তন সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে, কারণ এই গড় নির্ণীত হইয়াছিল সকল ছোটবড় জোত লইয়া। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা হয়। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছিল যে মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে শতকরা ৬০ ভাগেরও

সর্ব-ভারতীয় গড় দুই একরেরও কম

* হিন্দু সংহিতা আইন পাস হইবার পূর্বে হিন্দু কৃষকগণের জমি শুধু তাহাদের পুত্রদের মধ্যেই বণ্টিত হইত।

অধিক কৃষক-পরিবারের ৫ একর অপেক্ষা কম কৃষিজমি ছিল।* তখন সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে গড়ে প্রত্যেক কৃষকের ২ একরেরও কম জমি ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। বর্তমানে কৃষিজীবীর সংখ্যা বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই গড় কমিয়া ১ একরের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। উপরন্তু, এই সকল তথ্য হইল কৃষিজমির মালিকানা (land holding) সম্বন্ধে। প্রকৃত

কার্যক্ষেত্রে খণ্ডিকরণের রূপ আরও ব্যাপক

কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে জোতের খণ্ডীকৃত রূপ আরও প্রকট, কারণ কৃষকের জীবিত অবস্থাতেই অনেক সময় তাহার উত্তরাধিকারিগণ নিজেদের মধ্যে আপোষে কৃষি-খামার বণ্টন করিয়া লইয়া পৃথকভাবে চাষ করিতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মালিকানার দিক দিয়া কোন কৃষিজমি একটি একক হিসাবে পরিগণিত হইলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা নানা অংশে বিভক্ত হয়।

অধিকাংশ রাজ্যে জোতের অসম্বদ্ধতা সম্বন্ধে এখনও প্রামাণ্য পরিসংখ্যান কোন সূত্র হইতেই পাওয়া যায় না। যে-সকল রাজ্য সম্বন্ধে এই পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাহাও দু'একটি গ্রামের ভিত্তিতে বেসরকারী বা পুরাতন সরকারী অনুসন্ধানের

অসম্বদ্ধতার পরিমাণ

ফল। এইরূপ এক অনুসন্ধানের ফলে বর্তমান মহারাষ্ট্রের একটি গ্রামে দেখা গিয়াছিল যে, গড়ে 'অর্ধ' একর জমি ২০ খণ্ডে বিভক্ত। তৎকালীন বোম্বাই-এর কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর ডাঃ হ্যারল্ড ম্যান (Dr. Harold Mann) আর একটি গ্রামে দেখিয়াছিলেন যে, ১৫৬ জন কৃষকের ৭২৯ খণ্ড কৃষিজমি আছে এবং ইহার মধ্যে ২১১ খণ্ডের আয়তন এক একরের এক-চতুর্থাংশেরও কম। আসামে একটি হিসাব হইতে জানা যায় যে, গড়ে প্রত্যেকটি জোত ৪'৫ খণ্ডে বিভক্ত।

খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কারণ (Causes of Subdivision and Fragmentation) : জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা—উভয়ের কারণ সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। খণ্ডিকরণ সম্বন্ধে ডাঃ রাধাকমল

খণ্ডিকরণের কারণ

মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিগত কয়েক দশকে জোতের খণ্ডিকরণের দিকে যে-গতি পরিলক্ষিত হয় তাহা ইংরাজ বিচারকগণ কর্তৃক ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইনের ব্যাখ্যার ফল।" এই ইংরাজ বিচারকগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া সকল সময় তাঁহারা ব্যক্তিগত মালিকানার অনুকূলেই ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলে কৃষিজমির মালিকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, জোতের খণ্ডীকৃত রূপও তত প্রকট হইয়াছে।

জমির খণ্ডিকরণ ব্যাপারে উত্তরাধিকার আইনকে সহায়তা করিয়াছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ধ্বংস এবং ফলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ। ফ্লাউড কমিশন তাহার রিপোর্টে বলিয়াছে, "জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমাগতই কমিয়া গিয়াছে।" জনসংখ্যা যে-হারে বাড়িয়াছে সেই

---

* Second Five Year Plan ২৮১-৭ পৃষ্ঠা

হারে যদি শিল্পোন্নয়ন ঘটিত তাহা হইলে লোকে কৃষিজমি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিত না। জমির মালিকানা ভোগ করিলেও নিজে চাষ না করিয়া জমি ভাড়া দিত। ফলে কৃষিজমির একক ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে পারিত না। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি বাঁচিয়া থাকিলেও জোতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া এত কাড়াকাড়ি পড়িত না। যে উপজীবিকা দ্বারা কোনমতে মাত্র অন্নসংস্থান করা যায়, যাহা মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত—কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি বজায় থাকিলে তাহার প্রতি লোকের বিশেষ আকর্ষণ থাকিত না। সুতরাং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ধ্বংস হইল খণ্ডিকরণের একটি প্রধান কারণ।

ইহা ছাড়া, পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসার এবং পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে যৌথ পরিবারের ধ্বংসও অনেকাংশে জোতের খণ্ডিকরণের পথ প্রস্তুত করিয়াছে। যতদিন একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা বজায় ছিল ততদিন কৃষি-সম্পত্তির বণ্টন প্রকট রূপ ধারণ করে নাই। ইহার ধ্বংস খণ্ডিকরণের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

সর্বশেষে আছে গ্রামীণ মহাজনের ভূমিকা। একটি সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "হিন্দু উত্তরাধিকার আইন……কুটির শিল্পের ধ্বংস ছাড়াও আর একটি কারণ আছে যাহা এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে…। ইহা হইল মর্টগেজ, বিক্রয় প্রভৃতির দ্বারা কৃষিজমি মহাজনের নিকট হস্তান্তরিত হওয়া। ফলে প্রকৃত কৃষকের জমির পরিমাণ ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে এবং এই উত্তরোত্তর হ্রাসপ্রাপ্ত জমিই তাহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টিত হইতেছে।"

অসম্বদ্ধতার কারণ মাত্র একটি। সামাজিক প্রথা অনুসারে জোত বণ্টনের সময় সকল কৃষিজমিই (piece of land) বণ্টিত হয়। এইরূপ প্রথার মূলে আছে অবশ্য বিভিন্ন কৃষিজমির মধ্যে উৎপাদিকা-শক্তির পার্থক্য। সকল জমি যদি সমান উর্বর হইত এবং সকল ক্ষেতে যদি একই ফসল ফলানো যাইত তাহা হইলে বোধ হয় এইরূপ প্রথার উদ্ভব হইত না।

অসম্বদ্ধতার কারণ—সামাজিক প্রথা

জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার ফলাফল (Effects of Subdivision and Fragmentation of Agricultural Holdings): প্রধানত জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার দরুনই ভারতে কৃষিকার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে মুনাফাহীন। খণ্ডীকৃত কৃষি-খামারের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে উৎপাদনের নিম্নতম এককেরও (unit) পূর্ণ নিয়োগ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। একজন শ্রমিক, একজোড়া বলদ এবং একটি লাঙলকে কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের নিম্নতম উপাদান হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র জমিতে ইহারও পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ফলে উৎপাদন-উপাদানের অপচয়ের দরুন উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে। ব্যয়বৃদ্ধির আরও কারণ আছে। যে-কোন উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকারীকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যয় (fixed cost) বহন করিতে হয়। উৎপাদনের আয়তন যতই বিস্তৃত হয় এই

খণ্ডিকরণের কুফল:
১। উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি

নির্দিষ্ট ব্যয় ছড়াইয়া গিয়া উৎপাদনের এককপিছু ব্যয়কে ততই হ্রাস করে। ভারতীয় কৃষির বেলায় ইহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। জমির খণ্ডিকরণের দরুন উৎপাদনের আয়তন অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং সমগ্র নির্দিষ্ট ব্যয়ই সামান্য পরিমাণ উৎপাদনের উপর পড়ে বলিয়া স্বতই উৎপাদনের ব্যয় বিশেষ অধিক হয়।

অর্থবিদ্যায় যাহাদিগকে উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable costs) বলা হয় তাহা উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির সংগে অধিকাংশ সময় কমিয়া আসে। উদাহরণ-স্বরূপ, কৃষির ক্ষেত্রে বেড়া দেওয়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি ক্ষুদ্র ক্ষেতকে বেড়া বা আইল দিয়া ঘিরিতে যে-ব্যয় হয় একটি অপেক্ষাকৃত বড় জমিতে বেড়া বা আইল দিতে সেই অনুপাতে কম ব্যয়ই হয়। এই কারণেও ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে।

অনেক সময় আবার জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র হয় যে, কয়েকপ্রকার পরিবর্তনশীল ব্যয় না করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানে জলসেচের উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। জোত অতি ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া কূপ খনন ইত্যাদি দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করিতে কৃষক মোটেই উৎসাহিত হয় না।

সংক্ষেপে বলা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদনের দিক হইতে খণ্ডিকরণ কোনমতেই সমর্থিত হইতে পারে না। বর্তমান যুগ হইল বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগ। কৃষিকার্যেও ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম নাই। বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয়: মোট উৎপাদনবৃদ্ধি এবং নানারূপ ব্যয়সংক্ষেপের ফলে এককপিছু উৎপাদনের ব্যয়হ্রাস। ভারতীয় কৃষির পক্ষে উভয়ই অপরিহার্য। ভারতের উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং শিল্পসমূহের চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ভারতীয় কৃষককে বর্তমানে পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে বলিয়া উৎপাদনের ব্যয়হ্রাসও আবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু খণ্ডীকৃত জোতের দরুন যান্ত্রিক কৃষি (mechanised farming) প্রভৃতির মাধ্যমে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিয়া এই দুইটি লক্ষ্যের কোনটির অভিমুখেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

খণ্ডিকরণ বৃহদায়তন উৎপাদনের পরিপন্থী

জোতের খণ্ডিকরণের জন্য অনেক কৃষিজমিরও অপচয় ঘটে। বেড়া বা আইল দিয়া এত জমি নষ্ট করা হয় যে, ভারতের ন্যায় কৃষিজমি বুভুক্ষুর দেশে ইহা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

২। কৃষিজমির অপচয়

অবশ্য জোতের খণ্ডিকরণ শুধু সমালোচিতই হয় নাই; অর্থবিদ্যার সূত্রের দিক হইতে না হইলেও সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ হইতে উহা সমর্থিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, খণ্ডিকরণ ব্যবস্থা সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে। ইহা কৃষিজমিকে মাত্র কয়েকজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত না করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত করিয়া দেয় এবং জমিতে বহুজনের মালিকানা রাখিয়াও বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়। এই পদ্ধতিটি হইল সমবায়

খণ্ডিকরণের সুফল

যৌথ কৃষি (cooperative farming) পদ্ধতি। অতএব, জোতের খণ্ডীকৃত মালিকানা থাকিলেও ক্ষতি নাই, খণ্ডীকৃত রূপ না থাকিলেই হইল। যাহা হউক, জোতের খণ্ডীকৃত রূপ যে রাখা চলিতে পারে না, সে-সম্বন্ধে দ্বিমত নাই।

উপসংহার

অসম্বদ্ধতার কুফল

জোতের অসম্বদ্ধতার ফলে যে-সকল কুফলের উদ্ভব হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় ডাঃ হ্যারল্ড ম্যানের উক্তিতে। ম্যানের ভাষায়, অসম্বদ্ধতা "উদ্যোগের বিনাশসাধন করে, শ্রমের বিরাট অপচয় ঘটায়, সীমানা নির্ধারণের জন্য বহু জমি নষ্ট করে এবং প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদন সম্পূর্ণ অসম্ভব করিয়া তুলে।"

উক্তিটি বিশ্লেষণ করিয়া প্রথমত বলা যায় যে, অসম্বদ্ধতার কারণে কৃষকের উদ্যোগ বিশেষ ব্যাহত হয়। তাহার জোত বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ছড়ানো থাকে বলিয়া ইচ্ছা এবং সংগতি থাকিলেও তাহার পক্ষে উদ্যোগী হইয়া কৃষির উন্নতিসাধন করার প্রশ্ন উঠে না, কারণ এরূপ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়ত, খণ্ডিকরণের মতই অসম্বদ্ধতার জন্য বহু জমি নষ্ট হয়। অসম্বদ্ধ জোতের বিভিন্ন অংশের নির্দেশকল্পে কৃষককে আইল নির্মাণ করিতে হয়, বেড়া দিতে হয়।

তৃতীয়ত, কৃষককে বলদ লইয়া খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত জমিতে যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া তাহার শ্রম ও সময় এবং পশুশক্তির অপচয় ঘটে।

চতুর্থত, অনেক সময় পথ ও সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য অপরের জমির উপর দিয়া যাতায়াত করা হয় বলিয়া বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। ইহার উপর সীমানা নির্ধারণ লইয়াও কৃষক ব্যয়বহুল মামলায় জড়িত হইয়া পড়ে।

পঞ্চমত, উপরি-উক্ত অপচয় ছাড়াও উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কারণ, কৃষককে উৎপন্ন ফসল বিভিন্ন খণ্ডীকৃত জমি হইতে বহন করিয়া একস্থানে লইয়া আসিতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে এইভাবে শতকরা ১৫-৩২ ভাগ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে।

পরিশেষে, প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদন করিবার জন্য কৃষকের পক্ষে জোতের সন্নিকটে বসবাস করা উচিত। কিন্তু তাহার জোত যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ব্যাপক ভূখণ্ডের উপর ছড়ানো রহিয়াছে তখন সে জোতের সন্নিকটে বসবাস করিবে কিরূপে?

সুফল

অসম্বদ্ধতার সুফলের দিকেও অবশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই প্রকার স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা (system of natural insurance) জোত বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় ছড়ানো থাকে বলিয়া ক্ষেতে একই ফসল উৎপন্ন হয় না। কোন কারণে একটি ফসল নষ্ট হইলে বা কোন ফসলের বাজার-দাম বিশেষ কমিয়া গেলে অপর এক ক্ষেত হইতে আর এক ফসলের আশানুরূপ বাজার-দাম সামগ্রিক ক্ষতির হাত হইতে বাঁচাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, অসম্বদ্ধতার দরুন বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয় বলিয়া পালটি শস্য উৎপাদন (rotation of crops) সম্ভবপর হয়।

ইহার ফলে কৃষককে বৎসরের অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকিতে হয় না; অধিকাংশ সময়েই সে কোন-না-কোন ফসলের উৎপাদনকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। অসম্বদ্ধতা আবার কতকটা সাম্যের নীতিরও সূচক। খণ্ডিকরণের দরুন প্রত্যেকেই কিছু কিছু জমি পাইয়া থাকে; অসম্বদ্ধতার জন্য সকলে বিভিন্ন উৎপাদিকাশক্তির কৃষিজমি পাইয়া থাকে। ফলে সাম্যের নীতি আরও প্রসারিত হয়।

খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিলোপ-সাধন অপরিহার্য

তবুও বলা যাইতে পারে, ত্রুটির তুলনায় অসম্বদ্ধতার গুণ অতি সামান্য—উপেক্ষণীয় বলিয়া অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সুতরাং খণ্ডিকরণের মত অসম্বদ্ধতারও আশু বিলোপসাধন প্রয়োজন। বস্তুত, ইহা ব্যতিরেকে কৃষির উন্নয়ন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অর্থনৈতিক জোতের ধারণা (Concept of Economic Holding): জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিলোপসাধনের প্রশ্নের সহিত বিশেষভাবে জড়িত আছে অর্থনৈতিক জোতের ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনৈতিক জোত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক জোতের ধারণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাচীন ধারণা

অর্থনৈতিক জোত বলিতে ঠিক কি বুঝায় এ-সম্বন্ধে অর্থবিদ্যাবিদগণ একমত নহেন। ফলে ধারণাটিতে কিছুটা অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। পূর্বে কৃষকের জীবনযাত্রার দিক হইতে অর্থনৈতিক জোতের ধারণা করা হইত। এই দিক হইতে কীটিঞ্জের (Keatinge) মতে, অর্থনৈতিক জোত হইল সেইরূপ কৃষিজোত যাহার উৎপাদন হইতে কৃষক সমস্ত খরচপত্র মিটানোর পর যুক্তিসংগত স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। অপরদিকে ডাঃ ম্যানের ধারণায় কৃষিজোত যদি গড় আয়তনের কৃষক পরিবারকে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ যোগাইতে পারে তবে তাহাই অর্থনৈতিক জোত। অধ্যাপক জেভন্সের (Prof. Stanley Jevons) মতে, অর্থনৈতিক জোত উন্নত জীবনযাত্রার মানকে নিশ্চিত করিবে।

বর্তমান ধারণা

বর্তমানে কিন্তু উৎপাদন-ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থনৈতিক জোতের বিচার করা হয়, কৃষকের জীবনযাত্রার দিক হইতে নহে। এই ধারণা অনুসারে অর্থনৈতিক জোত হইল সেই জোত যাহা হইতে সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভবপর হয়।

ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধারণা

যে-দেশে কৃষির উন্নয়ন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে মাত্র সেইখানেই এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভংগি বা উৎপাদন-ব্যয়ের দিক হইতে অর্থনৈতিক জোতের আয়তন নির্ধারণ করা সম্ভব। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের কৃষির পক্ষে এই অবস্থায় পৌছিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। তাই ভারতে আর্থিক জোতের আয়তন নির্ধারণ করা হয় প্রথম দৃষ্টভংগি বা কৃষকের দিক হইতে। 'অর্থনৈতিক জোত' কথাটির দ্ব্যর্থবোধকতার জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ইহার পরিবর্তে 'পারিবারিক জোত' (Family Holding) কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছিল।

পারিবারিক জোত বলিতে চিরাচরিত প্রথায় কৃষিকার্য সম্পাদনকারী গড় আয়তনের কৃষক পরিবারের জন্য যতটা জমি প্রয়োজন হয় তাহাকে বুঝায়। বর্তমানে অবশ্য আবার অর্থনৈতিক জোত কথাটি ব্যবহার করা হইতেছে।

পারিবারিক জোত

এখন প্রশ্ন, এই পারিবারিক জোত বা অর্থনৈতিক জোতের আয়তন কি হইবে? বলা যায়, অর্থনৈতিক জোতের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন অথবা অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন হইতে পারে। ক্ষুদ্রায়তনই হউক অথবা বৃহদায়তনই হউক যদি তাহা নির্দিষ্ট মাঝারি আকারের কৃষক পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার উপযোগী হয় তবে তাহাই অর্থনৈতিক বা পারিবারিক জোত। ইহা হইবে কি না তাহা নির্ভর করে, জোতের আয়তন ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর—যথা, জমির অবস্থান, জমির উৎপাদিকাশক্তি বা উর্বরতা, জলসেচের বন্দোবস্ত, কৃষিকার্যের পদ্ধতি ইত্যাদি। এই প্রসংগে মার্কিন বিশেষজ্ঞ হাউটষ্টনের (Howard E. Houtston)* একটি অভিমত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। হাউটষ্টনের মতে, কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বৃহদায়তনের জোত অপেক্ষা উন্নত ধরনের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহারই অধিক প্রয়োজনীয়। জাপানেও জোতের একক অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু সেখানে এই সকল পদ্ধতি দ্বারা অধিক উৎপাদন সংঘটিত করা হয়। ভারতেও ইহা অবলম্বন করিলে মুনাফাহীন কৃষিজোত অর্থনৈতিক জোতে পরিণত হইবে।

অর্থনৈতিক জোত কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে

হাউটষ্টনের উক্ত অভিমত স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে হয় যে জোতের আয়তনবৃদ্ধি ব্যতিরেকে কৃষির সংস্কারসাধন কোনমতেই সম্ভব নহে, কারণ পদ্ধতিগত উন্নয়নেরও একটা সীমা আছে যে-সীমা অতিক্রম করিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns) ক্রিয়া সুরু করিবেই।

খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে অবলম্বিত ও প্রস্তাবিত প্রতিবিধানসমূহ (Remedies adopted and proposed against Subdivision and Fragmentation) : খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের বিরুদ্ধে যে-সকল প্রতিবিধান অবলম্বিত বা প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহাদিগকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: জোতের সংহতিসাধন, যৌথ খামার প্রথা, সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য এবং সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা।

চারি প্রকারের ব্যবস্থা

জোতের সংহতিসাধন (Consolidation of Holdings) : জোতের সংহতিসাধন বলিতে বুঝায় বিক্ষিপ্ত জোতকে একত্রিত করিয়া সুসম্বদ্ধ জোতে পরিণত করা। পুনর্গঠনের জন্য কৃষক তাহার জোতের অংশ অপরের সহিত বিনিময় করিবে। বিনিময়কার্য সমবায়িক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হইতে পারে, আবার আইন পাস করিয়া ইহাকে বাধ্যতামূলকও করা যাইতে পারে। জোতের সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা বহুদিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। ১৯২১ সালে ক্যাল্‌ভার্ট (Calvert) সমবায়িক

সংহতিসাধন ও ইহার পদ্ধতি :
ক। সমবায়িক,
খ। বাধ্যতামূলক

* হাউটষ্টন মার্কিন কারিগরি সহযোগিতা দলের (U. S. Technical Mission) পরিচালক ছিলেন। তিনি ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে ভারতে আসিয়াছিলেন।

পদ্ধতিতে পাঞ্জাবে জোতের সংহতিসাধনের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেন। পরে অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশ পাঞ্জাবের অনুবর্তী হয়।

এই সমবায়িক পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ না হওয়ায় বাধ্যতামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। বাধ্যতামূলক পদ্ধতির ফলও বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই, জনসাধারণ সংহতিসাধনকে সুনজরে দেখে নাই বলিয়া আইনকে বিশেষ কার্যকর করিতে পারা যায় নাই। উপরন্তু, একদিকে যেমন খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোত সংহত হইতেছিল, অপরদিকে তেমনি আবার সময়ের সংগে সংগে খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতাও স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল। সুতরাং সংহতিসাধনের প্রচেষ্টায় নীট ফল বিশেষ কিছুই থাকে নাই। ফলে খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার প্রতিরোধের ব্যবস্থা (preventive measures) প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে এবং এইদিকে পথিকৃতের কার্য করে তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশ।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

১৯৪৭ সালে তৎকালীন বোম্বাই সরকার অসম্বদ্ধতা প্রতিরোধ এবং জোতের সংহতিসাধন আইন (Prevention and Consolidation of Holdings Act, 1947) পাস করে। এই আইন দ্বারা সরকারী উদ্যোগেই জোতের সংহতিসাধনের ব্যবস্থা করা হয়। ক্রমে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি অনুরূপ আইন পাস করে। ইহার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোতের সংহতিসাধনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাজ্যসমূহকে এই কার্যে অধিকতর উদ্যোগের সহিত অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেওয়ার ফলে পাঞ্জাব, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে সংহতিসাধনকার্য উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয়। অন্যান্য রাজ্য অবশ্য এ-বিষয়ে কতকটা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেখা যায় যে মোট ৩·৬ কোটি একর জোতের সংহতিসাধনকার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার উপর তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩ কোটি একরের মত জমির সংহতিসাধনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে।*

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সংহতিসাধন

খণ্ডিকরণ প্রতিরোধের জন্য যে-সকল রাজ্যে আইন পাস বা ধারা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশের দ্বারা জোতের ন্যূনতম আয়তন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন প্রকার খণ্ডিকরণ বা হস্তান্তরকরণ দ্বারা এই আয়তনকে হ্রাস করিতে দেওয়া হয় না। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জন্য বিশেষ বিশেষ আয়তন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরপ্রদেশে জোতের ন্যূনতম আয়তন ৬·৫ একর কিন্তু মধ্যপ্রদেশে ৫ একর।

জোতের ন্যূনতম আয়তন নির্ধারণ

তবুও জোতের সংহতিসাধনের জন্য এবং খণ্ডিকরণ প্রতিরোধকল্পে আজ পর্যন্ত যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সমস্যার তুলনায় তাহা সামান্যই। পরিকল্পনা কমিশনও একথা স্বীকার করিয়াছে। উপরন্তু, জোতের সংহতিসাধন করা হইলেই কৃষিকার্যের পর্যাপ্ত উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। যতদিন না কৃষক জমিকে নিজস্ব বলিয়া গণ্য করিবে ততদিন সে ইহাতে যত্নবান হইবে না। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষিজমি সংক্রান্ত এই মৌলিক ত্রুটি দূর করিবারই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহাতে ভূমিস্বত্বের সংস্কারের দ্বারা কৃষককে

৪ * Third Five Year Plan ২৩৩ পৃষ্ঠা।

জমির মালিক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া ইহাতে সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। নূতন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিক হইতে পারিবে মাত্র। ইহা দ্বারা মৌলিক উদ্দেশ্য—যথা, বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন—সাধন করা সম্ভব হইবে না। তাই প্রয়োজন হইল জমিতে 'খণ্ডীকৃত মালিকানা', ক্ষুদ্র জোতের মালিকানা বজায় রাখিয়া কোন পদ্ধতিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করা। যে-সকল পদ্ধতিতে ইহা করা সম্ভব তাহা হইল যৌথ খামার প্রথা (collective farming), সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য (cooperative farming) এবং সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা (cooperative village management)। ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা ভূমিসংস্কার ও কৃষির পুনর্গঠন অধ্যায়ে পরে করা হইবে।

পরিশিষ্ট—প্রধান প্রধান নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা (Appendix—Main River-Valley Projects) : নিম্নে প্রধান প্রধান সেচ-পরিকল্পনাগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইতেছে। সংগে সংগে যেগুলি বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা তাহাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিবরণও দেওয়া হইতেছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (Damodar Valley Project) : দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল চারিটি—যথা, বন্যানিরোধ, জলসেচ, শক্তি-উৎপাদন এবং কলিকাতা ও রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের যাতায়াতের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য নাব্য খাল খনন। যাহা হউক, জলসেচকেই দামোদর পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

দামোদর হইতে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবংগ ও বিহারের ১০'৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইবে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই ৬ লক্ষ একরের উপর জমি সেচ-সমন্বিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

দামোদর পরিকল্পনার বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা হইল মোট ৬'২৫ লক্ষ কিলোওয়াট। ইহার মধ্যে জলবিদ্যুতের পরিমাণ ১'২৫ লক্ষ কিলোওয়াট এবং তাপজ বিদ্যুতের পরিমাণ ৫ লক্ষ কিলোওয়াট। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া শেষ পর্যন্ত ২'৫০ লক্ষ কিলোওয়াটে দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

ভাক্‌রা-নাংগল পরিকল্পনা (Bhakra-Nangal Project) : ভাক্‌রা-নাংগল পরিকল্পনা হইতে আরও অধিক জমিতে জলসেচের অনুমান করা হইয়াছে। সমাপ্ত হইলে এই পরিকল্পনা হইতে পাঞ্জাব ও রাজস্থানের মোট ৩৬ লক্ষ একর জমিকে সেচ-সমন্বিত করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।*

ইহা জলসেচের বৃহত্তম পরিকল্পনা

ভাক্‌রা-নাংগল পরিকল্পনার মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা হইলে ৬ লক্ষ কিলোওয়াটের উপর।

মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা (Mahanadi Valley Project) : মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা হইতে শেষ পর্যন্ত ১৭ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের

---

* India—1962

ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একমাত্র হীরাকুঁদ বাঁধ হইতেই ৬·৭০ লক্ষ একর জমি সেচ-সমন্বিত হইবে। মহানদীর ব-দ্বীপে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে যে নূতন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইতে ১৯ লক্ষ একর জমিতে নিয়মিত জলসেচ করা যাইবে। ইহার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনশক্তি হইল ১·২৩ লক্ষ কিলোওয়াট।

কুশী পরিকল্পনা (Kosi Project): কুশী পরিকল্পনা লইয়া বহুদিন ধরিয়া জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। অবশেষে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করিয়া কুশী পরিকল্পনার কার্য পুরাদমে স্বরু করা হইয়াছে। কুশী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য বন্যানিরোধ হইলেও ইহা হইতে বিহার রাজ্যের ১৪ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও করা যাইবে।

চম্বল পরিকল্পনা (Chambal Project): মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে চম্বল নদীর উপর তিনটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং জলসেচ-ব্যবস্থার যে-পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাই চম্বল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। চম্বল পরিকল্পনার কার্য ১৯৫৪ সাল হইতে স্বরু হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৯২ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইবে।

তুংগভদ্রা পরিকল্পনা (The Tungabhadra Project): ইহা মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের সম্মিলিত চেষ্টায় নির্মিত হইতেছে। সমাপ্ত হইলে পরিকল্পনাটি হইতে প্রায় ৮·২৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৪৫ হাজার কিলোওয়াট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইবে।

নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনা (Nagarjunasagar Project): ইহা অন্ধ্ররাজ্যের বৃহত্তম জলসেচ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা ১৯৫৭ সালে গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হইলে মোট ২১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে।

ইহা অন্যতম বৃহৎ জলসেচ পরিকল্পনা

অন্যান্য পরিকল্পনা: ইহার পর আছে গুজরাটের 'কাক্‌রাপাড়া পরিকল্পনা' (Kakrapara Project), মহীশূরের 'ভদ্র জল সঞ্চয়স্থান' (Bhadra Reservoir), মাদ্রাজের 'নিম্ন-ভবানী পরিকল্পনা' (Lower-Bhabani Project), উত্তরপ্রদেশের 'রাইহান্দ পরিকল্পনা' (Rihand Project) প্রভৃতি। ইহারা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সংগে অল্পবিস্তর জলসেচেরও ব্যবস্থা করিবে। তবে কাক্‌রাপাড়া পবিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইল জলসেচ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনেকগুলি নূতন নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার কার্য স্বরু করা হয়। ইহাদের মধ্যে জলসেচের দিক দিয়া গুজরাটের নর্মদা ও উকাই (Ukai) পরিকল্পনা, অন্ধ্রের পূর্ণা পরিকল্পনা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গ্যাণ্ডক পরিকল্পনা, রাজস্থানের খাল পরিকল্পনা এবং পশ্চিমবংগের কংশাবতী পরিকল্পনাই প্রধান। অপরদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক দিয়া কেরলের নারীয়ামংগলম কেন্দ্র, জম্মু ও কাশ্মীরের গান্দারবাল ও

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নূতন নির্মাণকার্য

মোহরা কেন্দ্র এবং মহারাষ্ট্রের খাপারখেদা কেন্দ্রই প্রধান। এগুলির অধিকাংশ তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে। তবে উকাই, নর্মদা প্রভৃতি কয়েকটির কার্য শেষ হইতে চতুর্থ পরিকল্পনার সময় আসিয়া যাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়েই এগুলির অধিকাংশের আসল নির্মাণকার্য সুরু হইবে বলিয়া ইহাদিগকে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম বলিয়া গ্রহণ করা চলে। তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য মহীশূরের মণিপ্রভা, উড়িষ্যার বীরগোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েকটি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the scope of extending the area of cultivation in India. (৭২-৭৩ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the problem of declining fertility of the soil. Indicate the steps that have been taken to tackle the problem.

[ইংগিত: মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তির ক্ষয় দুইভাবে হয়: (ক) সাধারণ কৃষিকার্যের পদ্ধতিতে, এবং (খ) ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়ের দ্বারা।...(৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা)]

3. 'One of the principal handicaps of Indian agriculture is the endless subdivision and fragmentation of holdings.' Discuss the statement and suggest remedies.

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর সম্বন্ধে ইংগিত: খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে দুই প্রকার প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে হইবে: প্রথমত, সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষিজোতকে আর্থিক জোতে পরিণত করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত, এই আর্থিক জোত যাহাতে আবার খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ না হইয়া পড়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ৭৮, ৮০-৮২ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় অংশের উত্তরের জন্য ৮৪-৮৬ পৃষ্ঠা।]

4. Discuss the concept of an economic holding. Indicate the factors upon which the size of an economic holding depends. (৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)

নবম অধ্যায়

কৃষি-শ্রমিক

(Agricultural Labour)

কৃষি-শ্রমিক বলিতে কৃষকের নিকট মজুরি বা মাহিনাতে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে বুঝায়। সংজ্ঞা অনুসারে, যে-ব্যক্তি বৎসরের অর্ধেক দিনের উপর অপরের নিকট কৃষিকার্যে মজুরিতে কাজ করে, সেই কৃষি-শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত।* এই কৃষি-শ্রমিকগণকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয়—সাময়িক শ্রমিক (casual workers) এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক (attached workers)। সাময়িক শ্রমিক হইল তাহারা যাহাদের নিয়োগের কোনরূপ নিশ্চয়তা

* Report of the First Agricultural Labour Enquiry

নাই। সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা অন্তত কিছু দিন ধরিয়া নিযুক্ত থাকে। সাময়িক কৃষি-শ্রমিক মোট কৃষি-শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ হইবে। ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ ভূমিহীন কৃষক ছাড়াও কৃষিজমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিক, রায়ত এবং গ্রামীণ কারিগরগণও আছে। নিজেদের জমি বা উপজীবিকা হইতে জীবনযাপনের ব্যয় সংকুলান হয় না বলিয়াই এই সকল ব্যক্তি সাময়িকভাবে কৃষি-শ্রমিকের কার্য করিতে বাধ্য হয়।

এ-পর্যন্ত কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা লইয়া সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে দুইবার বিশদ তথ্যানুসন্ধান (All-India Agricultural Labour Enquiry) করা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অনুসন্ধান করা হয় যথাক্রমে ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের ভিত্তিতে। এই দুইটি অনুসন্ধানের রিপোর্ট হইতে কৃষকদের জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

কৃষি-শ্রমিকদের কঠোর জীবনযাত্রাপ্রণালী :
১। বহুসংখ্যকের ভূমিহীনতা

প্রথমত, দেখা যায় যে ভারতের মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ২৫ ভাগের মত হইল কৃষি-শ্রমিক পরিবার এবং ইহার অর্ধেকের উপর মোটামুটি কৃষিজমিবিহীন।

২। মজুরির অত্যল্প হার

দ্বিতীয়ত, ভারতের কৃষি-শ্রমিকের মজুরির হার অত্যন্ত অল্প। অল্পক্ষেত্রেই শ্রমিককে তাহার জীবনধারণোপযোগী মজুরি (living wage) দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে বয়স্ক কৃষি-শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরি ছিল ৯৬ নয়া পয়সা মাত্র এবং স্ত্রী ও শিশু শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরি ছিল যথাক্রমে ৫৯ ও ৫৩ নয়া পয়সা করিয়া।

২। মজুরিপ্রদানের আপত্তিজনক পদ্ধতি

মজুরিপ্রদানের পদ্ধতিও অত্যন্ত আপত্তিজনক। ১৯৫৬-৫৭ সালে শতকরা ৫১ ভাগ মজুরি হয় সম্পূর্ণভাবে জিনিসপত্রে, না-হয় একাংশ জিনিসপত্রে এবং অপরাংশ নগদে প্রদান করা হইত।

৪। নিয়োগের পরিমাণের অত্যল্পতা

ভারতের কৃষি-শ্রমিকের নিয়োগকালের পরিমাণও অত্যল্প। ১৯৫০-৫১ সালে সাময়িক শ্রমিকরা গড়ে বৎসরে ২০০ দিন করিয়া নিযুক্ত থাকিত; ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা কমিয়া ১৯৭ দিনে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের নিয়োগের পরিমাণও ৩২৬ দিন হইতে ২৮১ দিনে কমিয়া আসে।* সুতরাং দেখা যাইতেছে, অর্ধ-বেকারত্ব ভারতের কৃষি-শ্রমিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

৫। ঋণগ্রস্ততার পরিমাণবৃদ্ধি

মজুরির হার ও নিয়োগের পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া আজকালকার দুর্মূল্যের দিনে ভারতীয় কৃষি-শ্রমিক পরিবার ব্যয়-সংকুলান করিতে পারে না। ১৯৫৬-৫৭ সালে এইরূপ পরিবারের গড় আয় ও ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৪৩৭ ও ৬১৭ টাকা। সুতরাং গড়ে কৃষি-শ্রমিক পরিবারের ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের ভয়ংকর অবস্থার আরও পরিচায়ক হইল আর একটি বিষয়ের অস্তিত্ব, যাহাকে কৃষিগত ভূমিদাস প্রথা (agricultural serfdom) বলিয়া অভিহিত

* Report of the Second Agricultural Labour Enquiry

করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে এক একটি করিয়া কৃষি-শ্রমিকশ্রেণী আছে যাহারা সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়া সর্বনিম্ন স্থানাধিকার করে এবং যাহারা ভূমির সহিত একরূপ দাসত্বসূত্রে আবদ্ধ। ভূমির মালিক সাধারণত প্রয়োজনের সময় তাহাদের এককালীন ঋণপ্রদান করিয়া একরূপ ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া লয়। ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় তাহাদের নাই; ফলে প্রভুর আয়ত্তাধীনের বাহিরে যাইবার কথাও তাহারা চিন্তা করিতে পারে না। প্রভুই তাহাদের বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া দেয় ও খাদ্য সরবরাহ করে। তাহাদের জন্য প্রভু যে-ব্যয় করে তাহার সহিত তাহাদের শ্রমের বাজার-দামের কোনই সংগতি নাই। "কোনমতে জীবনধারণোপযোগী খাদ্য তাহাকে সরবরাহ করা হয় মাত্র এবং প্রকৃতপক্ষে তাহার অবস্থা হইল মধ্য যুগের ভূমিদাসের মত।"*

৬। ভূমিদাস প্রথা

ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের অদক্ষতা তাহার কঠোর জীবনযাত্রার কারণ কি না? ইহা লইয়া এ-পর্যন্ত বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশের মতে, ভারতীয় কৃষক ইয়োরোপীয় বা মার্কিন কৃষকের সমান দক্ষ না হইলেও বিশেষ অদক্ষ নহে। ডাঃ ভোয়েলকার (Dr. Voelcker) বলেন, ভারতীয় কৃষক কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী, কঠোর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী এবং অন্যান্য গুণসম্পন্ন। কিন্তু এ-সকলই অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, গতানুগতিকতা এবং কুসংস্কারের ফলে ব্যর্থ হইয়া যায়। ফলে কৃষকের স্বাভাবিক দক্ষতা তাহাকে জীবনযাত্রার পথে বিশেষ সহায়তা করে না; সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকের ফলে সকলই অকার্যকর হইয়া পড়ে।

কৃষি-শ্রমিকের দক্ষতা

যাহা হউক, ভারতীয় কৃষি-শ্রমিককে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় রাখিয়া কৃষির সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করিলে তাহা যে ফলবতী হইতে পারে না এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন কমিশন, কমিটি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি একমত। পরিকল্পনা কমিশন উক্তি করিয়াছিল, অব্যাহত নিয়োগের অভাব এবং নানারূপ সামাজিক প্রতিবন্ধক যাহাদের বৈশিষ্ট্য এরূপ বহুসংখ্যক কৃষি-শ্রমিকের অস্তিত্বকে বর্তমান কৃষি-পদ্ধতির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা এমনকি অনিশ্চয়তারও সূত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।** উপরন্তু, কৃষি-শ্রমিকের অবস্থার উন্নয়ন ব্যতিরেকে ভারতের গ্রামীণ জনসম্পদের (rural manpower) সম্যক ব্যবহার সম্ভব হইবে না, এবং ইহা সম্ভব না হইলে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টাও বিফল হইবে।†

কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

কারণ (Causes): এই অবস্থা উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহার আলোচনার পূর্বে বর্তমান অবস্থার কারণানুসন্ধান করা প্রয়োজন। কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, গ্রামীণ শিল্পের বিনাশের ফলে বহু শিল্পী আংশিকভাবে কৃষি-শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে; জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার

কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ

* Wadia and Merchant, *Our Economic Problem*

** First Five Year Plan

† Draft Third Five Year Plan

প্রসার বহু কৃষককে সাময়িক কৃষি-শ্রমিকে পরিণত করিয়াছে; এবং বৃহৎ বৃহৎ খামারের আয়তনহ্রাস-সমস্যাকে গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, "গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থায় সাধারণ অধিকারের বিনাশ, যৌথ উদ্যোগের অব্যবহার, জোতের খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতা, বাধাবিহীনভাবে মর্টগেজ প্রথায় কৃষিজমি হস্তান্তরকরণ এবং কুটির শিল্পের অবনতিই হইল ভূমিহীন বা প্রায়-ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের অসম্ভব সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ।" দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধানের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে প্রজাস্বত্ব সংস্কারের ফলে ভূতপূর্ব জমিদার, জায়গিরদার, তালুকদার প্রভৃতি নিজেরা কৃষিকার্য স্বরু করাতেও ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।*

কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মজুরির হার অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া গিয়াছে এবং পুরাতন ভূমিদাস প্রথা প্রবর্তিত রাখা সম্ভব হইয়াছে। জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার জন্য কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে শ্রমিকের মজুরি আরও হ্রাস পাইয়াছে। পূর্বে গ্রামীণ ও কুটির শিল্প হইতে কৃষকের যে-আয় হইত তাহার পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অপরদিকে শ্রমিকের দক্ষতাবৃদ্ধির পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা করা হয় নাই, তাহার অজ্ঞতা কুসংস্কার দূর করিবার যোগ্য ব্যবস্থাও করা হয় নাই।

কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধিই তাহাদের দুর্দশার কারণ

কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের কার্যক্রম (Programme for Amelioration of the Condition of Agricultural Workers): অনেকদিন ধরিয়া কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন-প্রচেষ্টা করিয়া আসা হইলেও প্রথম ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় প্রথম পরিকল্পনায়। ঐ পরিকল্পনার কার্যক্রম ছিল নিম্নলিখিত রূপ:

প্রথম পরিকল্পনার কার্যক্রম

(ক) শ্রমিককে বাসগৃহে দখলিকার স্বত্বপ্রদান এবং যেখানে যেখানে সম্ভব সেইখানেই তাহাকে বাসগৃহের সহিত একটি ছোট তরিতরকারির ক্ষেতের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করা; (খ) ভূদানযজ্ঞের সমর্থন দ্বারা ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের জমির ব্যবস্থা এবং ভূদানকে গ্রামোন্নয়নের কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা; (গ) পর্যাপ্তসংখ্যক শ্রমিক-সমবায় সমিতি (labour cooperatives) গঠন এবং এই সকল সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণ ও অনুরূপ অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা; (ঘ) যেখানে সম্ভব সেইখানেই পুনরুদ্ধৃত পতিত ও নূতন আবাদীকৃত জমিকে এই সকল সমবায় সমিতির হস্তে সমর্পণ করিয়া ভূমিহীন ও প্রায়-ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; (ঙ) গৃহনির্মাণ এবং কৃষির সহিত সংগতিপূর্ণ শিল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় ইত্যাদি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা; (চ) শিক্ষামূলক বৃত্তি ও অন্যান্য উপায়ে তাহাদের শিক্ষাপ্রসারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া; (ছ) গ্রাম-পঞ্চায়েৎগুলির উপর কৃষি-শ্রমিকগণের কল্যাণের বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা; (জ) কৃষির ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন (Minimum Wages Act, 1948) কার্যকর করা; (ঝ) অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

---

* Report of the Second Agricultural Labour Enquiry

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনারই অনুরূপ কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়। এই কার্যক্রমের মধ্যে ছিল শ্রমিক সমবায় সমিতি (labour cooperatives) গঠন, কৃষি-শ্রমিকদের পুনর্বাসন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও কার্যকরকরণ ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও কৃষির উন্নততর সংগঠন, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের প্রসার, অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের কল্যাণ, কৃষিজমির পুনর্বণ্টন প্রভৃতি কৃষি-শ্রমিককে নানাপ্রকার সুবিধা দান করিবে, এইরূপ ধারণা করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

এখন উপরি-বর্ণিত কার্যক্রমকে কতদূর অনুসরণ করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫১-৬১) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি পুনর্বাসন উপনিবেশ এবং ভূপালে একটি যান্ত্রিক কৃষি-খামার (mechanised farm) স্থাপন করা হয়। ভূদান, কৃষি-জমির ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ এবং পতিত জমির পুনরুদ্ধারের ফলে যে অতিরিক্ত জমি পাওয়া যাইতেছে তাহা প্রধানত ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের পুনর্বাসনের কার্যেই নিয়োগ করা হইতেছে। শ্রমিক-উপনিবেশসমূহে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য চালু করা হইয়াছে এবং শ্রমিক সমবায় সমিতি (labour cooperatives) গঠন করা হইয়াছে। ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইহা পরিকল্পনার অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নয়নকার্যের অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি রাজ্যে কৃষি-শ্রমিকের বাসগৃহের জন্য জমির ব্যবস্থা করিয়া আইনও পাস করা হইয়াছে। ন্যূনতম মজুরি-নির্ধারণ কার্যও বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কেরল, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উড়িষ্যা, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ ও ত্রিপুরা—এই কয়টি রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের সমগ্রে এবং আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি রাজ্যের স্বল্প মজুরি অঞ্চলে (low wage areas) কৃষি-শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করা হইয়াছে। তবে কৃষি-শ্রমিকের মজুরি কৃষিজ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া সকল সময় ন্যূনতম মজুরি প্রদান নিশ্চিত করিতে পারা যায় নাই।*

কার্যক্রমকে কতদূর অনুসরণ করা হইয়াছে

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম প্রস্তুত হইয়াছে দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধানের রিপোর্ট এবং সমাজোন্নয়ন সংগঠন (Programme Evaluation Organisation) কর্তৃক গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে। এই কার্যক্রমের মধ্যে পূর্বোক্ত সকল বিষয়ই আছে, তবে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে দুইটি বিষয়ের উপর—যথা, (১) কৃষি-শ্রমিকদের নিয়োগের পরিমাণবৃদ্ধি করা এবং (২) গ্রামীণ জনসম্পদকে যথাসম্ভব কাজে লাগাইয়া কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি করা ও সাম্প্রদায়িক সম্পদ (community asset) সৃষ্টি করা। আশা করা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ২৫ লক্ষ কৃষি-শ্রমিককে বৎসরে ১০০ দিনের মতন করিয়া অতিরিক্ত কাজ দেওয়া এবং ৭ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবারের বসতির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া অনুন্নত শ্রেণীসমূহের জন্য কার্যক্রম, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, গ্রামীণ বাসগৃহের কর্মসূচী ইত্যাদি হইতেও কৃষি-শ্রমিকরা বিশেষ উপকৃত হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

* India—1962 and Third Five Year Plan

উপসংহার ঃ কৃষি-শ্রমিকের অবস্থান্তর হইল দীর্ঘকাল উন্নয়নের প্রশ্ন। এই সমস্যা জটিলও বটে। সমস্যাটির বিশ্লেষণকালে ও সমাধানের প্রচেষ্টায় দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে—যথা, (১) গ্রামাঞ্চলে বেকারাবস্থা (unemployment) এবং অর্ধ-নিয়োগের (underemployment) মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এবং (২) প্রধানত জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলেই সমস্যাটি সাম্প্রতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং শুধু যে বর্তমান বেকারাবস্থার পরিমাণই কমাইতে হইবে তাহা নহে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দরুন ভবিষ্যতেও নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। সমস্যার এই প্রকার সমাধান হইল দীর্ঘকালীন এবং সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রশ্ন। সুতরাং আমাদিগকে দীর্ঘকালের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the present condition of agricultural labourers in India. What measures would you recommend to improve their lot? (৮৯-৯০ এবং ৯১-৯২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the measures that have been adopted to improve the lot of the agricultural worker in India. (৯১-৯৩ পৃষ্ঠা)

দশম অধ্যায়

কৃষি-মূলধন

(Agricultural Finance)

সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the Problem) ঃ বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঋণ হইতেই অধিকাংশ মূলধন সংগৃহীত হয়। কৃষিকার্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন করা হয় বলিয়া ভারতের কৃষিকার্য ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অনেক সময় মালিকের নিজস্ব মূলধন হইতে পরিচালিত হয়। ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে ইহা কাম্য হইলেও সম্ভব হয় নাই। বরং ভারতীয় কৃষকের পক্ষে ঋণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা উন্নত দেশসমূহের কৃষকগণ অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহার মূলে আছে ভারতীয় কৃষির প্রকৃতি। ভারতে কৃষিকার্য মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত। এখানে কৃষক খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের কৃষিকার্য সম্পাদন করিয়া কোনমতে দিন গুজরান করে। সাধারণ বৎসরেই জীবিকানির্বাহের ব্যয়ের পর তাহার হাতে উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না বলিলেই চলে। ইহার পর যদি কোন কারণে অজন্মা ঘটে—জলসেচ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাবে যাহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে—তবে কৃষকের পক্ষে ঋণের পন্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কৃষিকার্য পরিচালনা ছাড়াও সামাজিক কর্তব্যসম্পাদন এবং ব্যাধি ইত্যাদির ন্যায় অনিয়মিত ব্যয়নির্বাহের জন্যও কৃষককে ঋণগ্রাহী হিসাবে অবতীর্ণ হইতে হয়, কারণ তাহার হস্তে সঞ্চিত অর্থ কিছুই থাকে না। এ-প্রসংগে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা হইল, ঋণগ্রাহী হিসাবে কৃষকের ভূমিকা অত্যন্ত দুর্বল। তাহার জামিন দিবার কিছুই থাকে না; কৃষির অনিশ্চয়তার

জন্য ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার মাত্রাও অত্যধিক। উপরন্তু, ঋণের পরিমাণ সামান্য বলিয়া ঋণগ্রহণের ধার্য বা উপরিস্থ ব্যয়ের (overhead costs) পরিমাণ অত্যধিক হইতে বাধ্য।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে কৃষিগত মূলধন-সমস্যার প্রকৃতিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা চলে: (ক) ভারতীয় কৃষির সংগঠনগত দুর্বলতা কৃষককে ঋণগত মূলধনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছে; (খ) ভারতীয় কৃষক পুরাতন ঋণভারে প্রপীড়িত; (গ) ঋণ সরবরাহের সূত্রগুলি পর্যাপ্ত বা কৃষকের পক্ষে কাম্য—কোনটাই নহে। সুতরাং কৃষিগত মূলধনের এই তিনটি দুর্বলতাই দূর করিতে হইবে। প্রথমত, কৃষির সংগঠনগত দুর্বলতা দূর করিয়া কৃষকের আয়বৃদ্ধির এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে ঋণগত মূলধনের উপর তাহার নির্ভরশীলতার পরিমাণ যেন দিন দিন হ্রাস এবং তাহার ঋণগ্রহণযোগ্যতা (creditworthiness) যেন দিন দিন বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, অনুৎপাদনশীল পুরাতন ঋণের পরিমাণকে এরূপভাবে কমাইতে হইবে যেন ইহা পরিশোধ করা কৃষকের সংগতিতে কুলায়। তৃতীয়ত, কাম্য পন্থায় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিঋণ সরবরাহেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষিগত মূলধন-সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ

ইহার মধ্যে প্রথম করণীয় বা আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইল কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রশ্ন, যাহার আলোচনা কৃষিকার্য সংক্রান্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে করা হইতেছে। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যা—অর্থাৎ, কৃষিঋণের সমস্যা (Problem of Agricultural Debt) ও কৃষিঋণ-ব্যবস্থার সমস্যা (Problem of Agricultural Credit) এবং ইহাদের সমাধান সম্পর্কেই আলোচনা করা হইবে।

দুই প্রকার সমস্যা

কৃষিঋণের সমস্যা (Problem of Agricultural Debt): ভারতের কৃষকশ্রেণীর ঋণ পুরুষানুক্রমিক বলা হয়, ভারতীয় কৃষক ঋণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, ঋণ লইয়া জীবন অতিবাহিত করে এবং ঋণগ্রস্ত হইয়াই মারা যায়। মহাজনের নিকট হইতে একবার ঋণ করিলে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিশোধ করা কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না; সুদ দিতে দিতেই তাহার জীবন কাটিয়া যায়। অনেক সময় আবার সুদও সে মিটাইয়া দিতে পারে না। ফলে ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেই থাকে। তারপর একদিন ঋণভার পুত্রের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া ভারতীয় কৃষক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

পুরুষানুক্রমে ব্যক্তিগত ঋণভার

কৃষিঋণের পরিমাণ ও প্রকৃতি (Volume and Nature of Agricultural Debt): ঐতিহাসিক পরিক্রমায় দেখিলে ভারতের গ্রামাঞ্চলের ঋণের ক্রমবর্ধমান প্রকৃতিতে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। দেখা যায় যে, ১৯১১ সাল হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতে গ্রামাঞ্চলের ঋণের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ১৮০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল বা ছয়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৯১১-১৯৩৭ সালের মধ্যে কৃষি-ঋণের বৃদ্ধি

বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতীয় ইউনিয়নের কৃষিঋণের পরিমাণ কত তাহা হিসাব করা হয় নাই।* ১৯৫১ সালে নিযুক্ত সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি (All-India Rural Credit Survey Committee) মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে জরিপকার্য সমাধা করে। সুতরাং ইহার পক্ষে কৃষিঋণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা সম্ভব হইলেও, সমগ্র ভারতে মোট ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। উক্ত কমিটি কিন্তু ভারতীয় কৃষকগণের মোট বাৎসরিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা (total annual requirement) সম্বন্ধে একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহা হইল ৭৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ জরিপ কমিটির হিসাব অনুসারে গড়ে ভারতীয় কৃষকের পক্ষে বৎসরে মোট ৭৫০ কোটি টাকার মত ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হইত।**

বর্তমানে কৃষিঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন হিসাব নাই

সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে বর্তমান গ্রামীণ ঋণের নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, যুদ্ধের সময়ে কৃষিজ দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকের অবস্থার উন্নতির দরুন কৃষিঋণের পরিমাণ কতকটা কমিয়াছিল। আঞ্চলিক ভিত্তিতে যে-সকল হিসাব করা হইয়াছে তাহা এই অভিমতকেই সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৬ সালের বোম্বাই-এর সারাইয়া কমিটি (Saraiya Committee) দেখিয়াছিল যে, তৎকালীন বোম্বাই রাজ্যে বড় বড় কৃষকদের ঋণ ৫০ ভাগ কমিয়াছে। গ্রামীণ ঋণের শেষ জরিপের ফলে দেখা গিয়াছিল যে নির্বাচিত অঞ্চলসমূহে ঋণের পরিমাণ হয় কমিয়াছে, না-হয় অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। উপরন্তু, ঋণের আসল ভার (real burden) যে কমিয়াছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।† এই কারণে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি অভিমত প্রদান করিয়াছিল যে, ভারতীয় কৃষক তাহার ঋণ পূর্বাপেক্ষা সহজে বহন করিতে সমর্থ।

মূল্যবৃদ্ধির দরুন ঋণের পরিমাণ ও আসল ভার হ্রাস

ভারতের কৃষিঋণ কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হইলে ইহার পরিমাণ লইয়া এত আলোচনার প্রয়োজন মোটেই হইত না। প্রত্যেক দেশেই কৃষককে ঋণ করিতে হয়। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই; আপাত-দৃষ্টিতে ইহা কোন সমস্যাও নহে। কৃষিজীবিগণের সংখ্যার তুলনায় ভারতে কৃষিঋণের পরিমাণও অত্যধিক নহে। তবে ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ তুলনাবিহীন বলা চলে। ভারতীয় কৃষক সকল সময় কৃষিকার্য সম্পাদনের জন্য ঋণ গ্রহণ করে না; দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং মামলা-মকদ্দমা, আচার-অনুষ্ঠান

কৃষিঋণের প্রকৃতি

* এ-সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে ১৯৬২ সাল হইতে অনুসন্ধানকার্য চলিতেছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানকার্য শেষ হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। তবে রিপোর্ট. বাহির হইতে এখনও (জুন, ১৯৬৩) বিলম্ব আছে।

** All-India Rural Credit Survey Committee—Report Vol. II

† Rural Credit—Third Follow-up Survey

প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক কারণেও ঋণগ্রস্ত হয়। ফলে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে এই সকল ঋণ পরিশোধের উপায় থাকে না। কোন উদ্বৃত্তও তাহার থাকে না বলিয়া ঋণভার ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে তাহার বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসে।

ঋণগ্রস্ততার কারণ (Causes of Indebtedness)ঃ ভারতে কৃষিঋণের প্রাথমিক কারণানুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হয় না। ভারতীয় কৃষকের চরম দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলের ঋণের বিপুলতার কারণ। ভারতে কৃষিকার্য অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা, মূলধনের অভাব, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়ের অব্যবস্থা, অন্যান্য উপজীবিকার অভাব, মধ্যস্বত্বভোগিগণের অস্তিত্ব প্রভৃতি ভারতীয় কৃষিকে মুনাফাবিহীন করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রসংগে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলেন, "যে-দেশে কৃষিকার্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা লইয়া জুয়াখেলা মাত্র এবং যেখানে প্রতি চার অথবা পাঁচ বৎসরের মধ্যে এক বৎসর অজন্মা হইবেই সেখানে কৃষক, যে স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎসরে কোনমতে দিন গুজরান করে, অজন্মার বৎসরে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেই।"* ১৯৫১ সালের গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্টে দেখানো হইয়াছিল যে, ছোট ছোট কৃষকের ঋণের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হইল পরিবারের ব্যয়নির্বাহ করিবার জন্য। তৃতীয় জরিপ রিপোর্টেও (১৯৬১) দেখা যায় যে এ-অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই।**

১। কৃষকের চরম দারিদ্র্য

একদিক দিয়া কৃষকের দারিদ্র্য যেরূপ তাহার ঋণগ্রস্ততার কারণ অন্যদিক দিয়া ঋণগ্রস্ততাও আবার তাহার দারিদ্র্যের কারণ। পুরুষানুক্রমে যে-ঋণ কৃষকের স্কন্ধে চাপানো আছে তাহা তাহাকে অনেকাংশে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষানুক্রমিক ঋণের সুদ প্রদান করিবার জন্যই কৃষককে অনেক সময় ঋণ করিতে হয়; এবং একবার ঋণ করিলে অধিকাংশ সময় সারাজীবনেও ইহা পরিশোধ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯২৯ সালের ৯০০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার উপর ছিল পুরুষানুক্রমিক ঋণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রামাঞ্চলের ঋণ সম্পর্কে একটি দুরতিক্রম্য চক্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষক দরিদ্র বলিয়াই সে ঋণগ্রস্ত, এবং ঋণগ্রস্ত বলিয়াই সে দরিদ্র।

২। পুরুষানুক্রমিক ঋণ

তৃতীয়ত, ব্যয়বাহুল্যকেও কৃষিগত ঋণের অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। সাধারণত মামলা-মকদ্দমা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে ভারতীয় কৃষক অবিবেচকের ন্যায় ব্যয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত কমিটি দেখাইয়াছিল যে, মাত্র কতিপয় ক্ষেত্রেই কৃষক কৃষিজমি উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর

৩। কৃষকের ব্যয়-বাহুল্য

* Wadia and Merchant, *Our Economic Problem*, Ch. 12

** Rural Credit—Third Follow-up Survey

সাম্প্রতিক রিপোর্টেও* সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে কৃষক যে ঋণ করিয়াও অপব্যয় করে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

৪। ভূমি-রাজস্বের অত্যধিক হার ও ইহার আদায়ের সময়

চতুর্থত, ভারতে ভূমি-রাজস্বের অত্যধিক হার এবং ইহার আদায়ের সময় কৃষি-ঋণের আর একটি কারণ। অবশ্য কর-তদন্তকারী কমিশন প্রভৃতির মতে, কৃষিজ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির দরুন ভূমি-রাজস্বকে আর কৃষিঋণের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে নির্দেশ করা যায় না। কিন্তু তবুও বলা যায়, ভূমি-রাজস্বের হার পুরুষানুক্রমিক ঋণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ অতীতে ভূমি-রাজস্ব পরিশোধের জন্য তাহাকে অনেক সময়ই মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে এবং সেই ঋণভার আজও মিটাইতে পারে নাই।

৫। গ্রামীণ মহাজনের ভূমিকা

পরিশেষে আছে উক্ত গ্রামীণ মহাজনের ভূমিকা। দারিদ্র্য এবং অন্যান্য কারণে কৃষকের ঋণের প্রয়োজনীয়তা যে-চক্রের সূচনা করিয়াছে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে ঋণদাতা হিসাবে গ্রামীণ মহাজন দ্বারা। গ্রামীণ মহাজনের অস্তিত্ব যদি না থাকিত তবে কৃষকের পক্ষে ঋণপ্রাপ্তির সুবিধাও থাকিত না।

পূর্বে গ্রামীণ মহাজনকে নিয়ন্ত্রণ করিত সামাজিক প্রথা। এইরূপ প্রথা ছিল যে, মহাজন যে-টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করিত সুদসমেত কোনমতেই তাহার দ্বিগুণের অধিক আদায় করিতে পারিত না। কালক্রমে এই সকল প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যায়; গ্রামীণ সমাজের অনুশাসনও শিথিল হইয়া পড়ে। ফলে মহাজনের পক্ষে নীতি-বিগর্হিত ব্যবহারের পথ ক্রমে সুগম হইয়া উঠে; হিসাবের সুকৌশল পরিবর্তনসাধন (manipulation of accounts) এবং অন্যান্য উপায়ে প্রবঞ্চনার পন্থাও সে ক্রমশ অবলম্বন করিতে থাকে এবং গ্রামীণ কৃষককে শোষণ করিতে থাকে।

উপসংহার—কৃষিঋণের দুইটি প্রধান কারণ

কৃষিঋণের কারণের উপসংহার হিসাবে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলেন, "গ্রামীণ ঋণের কারণ হিসাবে অমিতব্যয়িতা ও কলহস্পৃহাকে নির্দেশ করিয়া হতভাগ্য কৃষককে অপরিণামদর্শী বলিয়া অকারণে অপরাধী করিলে সুস্পষ্ট অনুধাবনের অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে।" কৃষিঋণের প্রধান কারণ মুনাফাহীন কৃষিকর্ম। যে অসম্বদ্ধ জোতে কৃষক ঋণভার বহন করিয়া চলিতেছে তাহা হইতে মুনাফা লাভ করা বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সম্ভব নয়—এমনকি ইহা হইতে দৈনন্দিন অন্নসংস্থানও করা কঠিন ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, কৃষিগত অর্থ-ব্যবস্থা অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া সম্পূর্ণ স্থিতিশীল থাকিলেও ইহাকে বিশ্বের বাজারের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। "কিন্তু ভারতীয় কৃষককে যখন বিশ্বের বাজার-দামের ঘূর্ণাবর্তে টানিয়া আনা হইয়াছে তখন তাহার

১। মুনাফাহীন কৃষিকর্ম

২। ঋণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাব

---

* Certain Aspects of Cooperative Movement in India, 1958

জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা ডেনমার্ক জার্মেনী প্রভৃতি দেশের কৃষকশ্রেণীর ন্যায় সংগঠন বা ঋণ-ব্যবস্থার কোন সুবন্দোবস্ত করা হয় নাই।"*

অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট প্রদর্শিত দ্বিতীয় কারণটি ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে, ভারতীয় কৃষক আজ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বিশ্বের বাজারে কৃষিজ পণ্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত তাহার ভাগ্য বিজড়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাসের দরুন কাঁচা পাটের দাম সহসা যদি কমিয়া যায় তবে ইহা ভারতীয় কৃষককে আঘাত করিবে। কিন্তু আঘাত সহ্য করিবার জন্য, প্রতিযোগী হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য যে সংগঠনগত শক্তির প্রয়োজন, যে সহজপ্রাপ্য ঋণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা ভারতীয় কৃষকের আয়ত্তাধীন নহে। ফলে কোন কিছু ঘটিলেই তাহাকে মূর্তিমান অকল্যাণ গ্রামীণ মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয় এবং তাহার ঋণভার ক্রমশই বাড়িতে থাকে।

কৃষিঋণের প্রতিবিধানকল্পে অবলম্বিত প্রতিবিধান (Measures adopted to tackle the Problem of Rural Indebtedness) : ভারতে কৃষিঋণের সমস্যা সম্বন্ধে সরকার প্রথম সচেতন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ইহার ফলে ১৮৭৯ সালে দাক্ষিণাত্য কৃষিজীবী পরিত্রাণ আইন (Deccan Agriculturists Relief Act, 1879), ১৮৮৩ সালে ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন (Land Improvement Loans Act, 1883), ১৮৮৪ সালে কৃষিজীবী ঋণ আইন (Agriculturists Loans Act, 1884) প্রভৃতি পাস করা হয়। এই সকল আইন দ্বারা সুদের হার হ্রাস করা, কৃষিজমি উন্নয়নের জন্য কৃষিজীবিগণকে দীর্ঘকালীন ঋণ দিবার এবং চলতি খরচ মিটানোর জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি করা হইয়াছিল। ইহার পর ১৯০১ সালে পাঞ্জাবের জমি হস্তান্তরকরণ আইন (The Punjab Land Alienation Act, 1901) দ্বারা অ-কৃষিজীবিগণের নিকট কৃষিজমি হস্তান্তরকরণ এবং ২০ বৎসরের অধিক জমিকে দায়াবদ্ধ রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমবায় আন্দোলনের প্রচেষ্টাই হইল গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততার বিরুদ্ধে অবলম্বিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান। সমবায় সমিতি ঋণদান আইন পাস হয় ১৯০৪ সালে এবং ইহাকে ব্যাপকতর করিয়া তোলা হয় ১৯১২ সালে।

ঐতিহাসিক পরিকল্পনা

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের (worldwide trade depression) ফলে ঋণগ্রস্ত হিসাবে ভারতীয় কৃষকের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। ফলে বিভিন্ন প্রদেশে ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আইন দ্বারা ঋণের পরিমাণ কমানো, ঋণসালিসির ব্যবস্থা করা, মহাজনদিগকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রভৃতি হইল অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ।

---

* Wadia and Merchant, *Our Economic Problem*, Ch. 12

স্যর এডওয়ার্ড ম্যাক্‌ল্যাগ্যানের (Sir Edward Maclagan) অনুসরণে কৃষিঋণের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়:

অবলম্বিত ব্যবস্থা-সমূহের শ্রেণীবিভাগ

(ক) অনর্থক ঋণগ্রহণ রহিত করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা-সমূহ; (খ) দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাসমূহ; (গ) জমি হস্তান্তরকরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা-সমূহ; (ঘ) ঋণ সরবরাহের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ; (ঙ) ঋণসালিসি এবং ঋণভার হ্রাসের ব্যবস্থাসমূহ; এবং (চ) কৃষককে সাহায্য এবং কৃষির উন্নতির জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ।

(ক) অনর্থক ঋণগ্রহণ রহিত করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ (Measures adopted to encourage the avoidance of unnecessary debts):

শিক্ষার প্রসার, প্রচার ইত্যাদি

এই শ্রেণীভুক্ত ব্যবস্থাসমূহের শিক্ষার প্রসারই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার প্রসারের দ্বারা গ্রামবাসীদিগের অজ্ঞতা দূর করিয়া অনেকাংশে তাহাদিগকে অনর্থক ঋণগ্রহণের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও সমবায় সমিতিগুলি এদিকে কিছু কিছু কার্য করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী প্রচারকার্যও চালানো হইয়াছে। তবে গ্রামীণ ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই এখনও এই শিক্ষাবিস্তার, প্রচারকার্য বা সমবায় সমিতির সংস্রবে আসে নাই। অতএব, এই দিকে কিছু কিছু কার্য করা হইলেও বিশেষ কিছু করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই।

(খ) দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাসমূহ (Measures for the improvement of civil law): কৃষিঋণ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধির সংগে সংগেই সরকার দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ না করিলে যে কারারুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা ছিল তাহা রহিত করা হয়, জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়, সুদখোরী আইন (Usurious Loans Act) দ্বারা সুদের হার হ্রাস করা হয়, মহাজনী ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য মহাজনী আইন পাস করা হয়, ইত্যাদি।

(গ) জমি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যবস্থাসমূহ (Measures for restricting alienation of land): কৃষিজীবিগণের নিকট হইতে কৃষিজমি অ-কৃষিজীবিগণের নিকট হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় ১৯০১ সালে পাঞ্জাবে। ইহার পর বিভিন্ন প্রদেশে প্রণীত মহাজনী আইনে (Money-lenders Acts) জোতের একটি ন্যূনতম মাত্রা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়, যাহা কোনমতেই ঋণ-পরিশোধের জন্য হস্তান্তর করা যাইবে না। জমি হস্তান্তর

এই ব্যবস্থার কুফল

নিষিদ্ধকরণ আইনসমূহ কিন্তু সকল সময় কৃষকের নিকট হইতে কৃষিজীবী মহাজনদের (agriculturist moneylenders) নিকট জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে নাই। ইহার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ভূমিহীন হইতে থাকে, কিন্তু কৃষিজীবী মহাজনগণের জোতের আয়তন দিন দিন বাড়িতে থাকে।

(ঘ) ঋণ সরবরাহ করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ (Measures undertaken with the object of providing credit to agriculturists) : জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ, মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সংগে সংগে কম সুদে ঋণপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়। স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে তাকাভি ঋণ আইন (Taccavi Loans Act) পাস করা হয়। সাধারণত অজন্মার বৎসরে এবং কৃষিকার্যের জন্য মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই ঋণ প্রদান করা হইত। জটিল অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ এবং প্রয়োজনের তুলনায় অত্যল্প ছিল বলিয়া তাকাভি ঋণ জনপ্রিয় হইতে পারে নাই।

তাকাভি ঋণ

তাকাভি ঋণ ছাড়া ভূমি উন্নয়নের জন্য দীর্ঘকালীন ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষকগণ ভূমি উন্নয়ন ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত না হওয়ায় এই ব্যবস্থাও বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

ভূমি উন্নয়ন ঋণ

সরকারী ঋণ যে কখনই পর্যাপ্ত হইতে পারে না ইহা উপলব্ধি করিয়া সরকার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমবায় আন্দোলনের সূচনা করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে প্রথম এবং ১৯১২ সালে দ্বিতীয় আইন পাস করা হয়। সমবায়ের ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাংকেরও প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু সমবায় আন্দোলনও বিশেষ সার্থক না হওয়ায় গ্রামীণ মহাজনের উপর কৃষিজীবীর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে অব্যাহতই থাকে।

সমবায়িক ঋণ

(ঙ) ঋণসালিসি এবং ঋণভার হ্রাসের ব্যবস্থাসমূহ (Measures for debt conciliation and liquidation) : উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ এই শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার সংঘটিত হইবার পূর্বে অবলম্বিত হইয়াছিল। মন্দাবাজারের ফলে দেখা গেল যে কৃষিজীবিগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ইহার প্রতিকারার্থে অন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবিলম্বেই প্রয়োজন। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং অনুসন্ধান কমিটির (Central Banking Enquiry Committee) সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে ঋণসালিসি ও ঋণভার হ্রাসের (liquidation) জন্য আইন পাস করা হয়। কৃষকের ঋণভার হ্রাস করিবার জন্য আপোষ-মীমাংসার পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসৃত হইলেও কয়েক স্থানে ইহা বাধ্যতামূলক করা হয়।

(চ) কৃষককে সাহায্য ও কৃষির উন্নতির জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ (Measures to help the agriculturists and to effect improvement in agriculture) : কৃষির উন্নতির মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিই হইল কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার শ্রেষ্ঠ প্রতিকার। বলা চলে, এই উদ্দেশ্যে সরকার ১৮৮৪ সাল হইতেই প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ঐ সালে প্রথম কৃষি-বিভাগ (Department of Agriculture) স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ভারত যে খাদ্য-সংকটের সম্মুখীন হয় তাহার ফলে কৃষিগত উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়। ইহার পর পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ইহার প্রথম পর্যায়ে কৃষির উন্নতির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় উহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

ঋণ সংক্রান্ত আইনের ফলাফল (Effects of Debt Legislation) : ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি দ্বারা কৃষিঋণের সমস্যাকে দুই দিক দিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রথমত, ঋণের পরিমাণকে সালিসির মাধ্যমে বা বাধ্যতামূলকভাবে কমাইয়া ইহাকে কৃষিজীবীর পরিশোধের ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, মহাজনগণের অপপদ্ধতি এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যাহাতে ভবিষ্যতে আর ঋণভারের বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে। বলা যায়, এই উভয় দিক দিয়াই ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি কার্যক্ষেত্রে একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে।

ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে

সালিসির মাধ্যমে ঋণভার হ্রাস করিবার যে-ব্যবস্থা তাহা সালিসি-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ত্রুটির দ্বারা অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে। অশিক্ষিত কৃষকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সালিসির সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে নাই। শক্তিশালী মহাজনগণ বার বার অন্যায় ও বেআইনীভাবে সালিসিকে কার্যকর করিবার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দিলেও দারিদ্র্য হেতু তাহা পরিশোধ করিয়া উঠা অধিকাংশ কৃষিজীবীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে চুক্তিভংগের অজুহাতে সালিসি ব্যর্থ হইয়াছে।

বাধ্যতামূলকভাবে ঋণভার হ্রাস এবং মহাজনগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রচেষ্টা গ্রামাঞ্চলের ঋণগ্রস্ততার সমস্যাকে (problem of rural indebtedness) কিছুটা সরল করিলেও ঋণ সরবরাহের সমস্যাকে (problem of supply of credit) আরও জটিল ও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। মহাজনগণ এখন আর তাহাদের বিশ্বস্ত খাতক ছাড়া কাহাকেও ঋণদান করিতে চাহে না। বিশ্বস্ত খাতকগণের বেলাতেও তাহারা নানারূপ নূতন অপপদ্ধতি অবলম্বন করে—যথা, অল্প ঋণ দিয়া অধিক টাকার খত লিখাইয়া লয়, ঋণপ্রদানের সময়ই ঋণের টাকা হইতে সুদ কাটিয়া লয়, বিক্রয় কবালা লিখাইয়া লইয়া জমি বন্ধক হিসাবে রাখে, ইত্যাদি।

ঋণ সংক্রান্ত আইন ঋণ সরবরাহের সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে

বলা হয়, ঋণ সংক্রান্ত আইন এইভাবে গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহের সূত্রকে সংকুচিত করিয়া এক দিক দিয়া ভালই করিয়াছে, কারণ ইহাতে অনুৎপাদনশীল ঋণের সম্ভাবনা বিশেষ মাত্রায় কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্য দিক দিয়া ইহা যে কৃষকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ঋণের সূত্র সংকুচিত করিয়াছে তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। গুণাগুণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন, "ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি মাত্র এ্যাম্বুলেন্সের কার্যই করিয়াছে।" ইহারা আহত স্থানকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া প্রতিষেধকও প্রদান করিয়াছে যাহাতে ক্ষতের আর বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে, কিন্তু রোগের উৎসকে নির্মূল করিতে পারে নাই। বস্তুত, বর্তমান গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থায় গ্রামীণ মহাজনের

উপসংহার

ভূমিকাকে কোনমতে অস্বীকার করা যায় না। গ্রামীণ মহাজন থাকিলেই তাহার সংগে তাহার অপপদ্ধতি থাকিবেই। সুতরাং প্রয়োজন হইল গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থাকে নূতনভাবে সংগঠিত করিবার। আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এই প্রচেষ্টাই করা হইতেছে; এবং এখন এই সম্পর্কেই আলোচনা করা হইবে।

কৃষিঋণ-ব্যবস্থার সমস্যা (Problem of Agricultural Credit): মোটামুটিভাবে ভারতীয় কৃষকের পক্ষে দুই প্রকার ঋণের প্রয়োজন হয়—(১) কৃষিকার্য পরিচালনা করিবার জন্য, এবং (২) মামলা-মকদ্দমা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য। শস্যরোপণ ইত্যাদির সময়ে সংসারনির্বাহের ব্যয়ও কৃষিকর্ম পরিচালনা করিবার ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণকেও কৃষিকর্মের জন্য ঋণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কৃষিকর্মের জন্য ঋণকে উৎপাদনশীল ঋণ এবং অন্যান্য কারণে গৃহীত ঋণকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলা হয়।

প্রয়োজনীয় কৃষি-ঋণের প্রকৃতি

কৃষিগত ঋণ সরবরাহের বিভিন্ন সূত্র (Different Agencies for Supply of Agricultural Credit): ভারতে কৃষিজীবী নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে তাহার প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহ করে—যথা, পেশাদার মহাজন, কৃষিজীবী মহাজন, আত্মীয়স্বজন, ব্যবসাদার, সরকার, সমবায় সমিতি প্রভৃতি। ইহার উপর অবশ্য জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিও কিছু কিছু দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদান করিয়া থাকে।

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির (All-India Rural Credit Survey Committee) রিপোর্ট অনুসারে (১৯৫১-৫২ সালে) উপরি-উক্ত বিভিন্ন সূত্র হইতে নিম্নলিখিত অনুপাতে গ্রামাঞ্চলের ঋণ সংগৃহীত হইত:

ঋণ সরবরাহের বিভিন্ন সূত্র	ঋণ সরবরাহের অনুপাত: শতকরা ভাগ
১। পেশাদার মহাজনগণ	৪৪.৮
২। কৃষিজীবী মহাজনগণ	২৪.৯
৩। আত্মীয়স্বজন	১৪.২
৪। ব্যবসায়িগণ ও তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ	৫.৫
৫। সরকার	৩.৩
৬। সমবায় সমিতিসমূহ	৩.১
৭। জমিদারগণ	১.৫
৮। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	০.৯
৯। অন্যান্য	১.৮
	১০০.০

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিত পেশাদার ও কৃষিজীবী মহাজনগণ; মোট গ্রামাঞ্চলের ঋণের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ইহারাই সরবরাহ করিত।* ১৯৫৯-৬০ (জুলাই-জুন) সালের ভিত্তিতে গৃহীত ঋণ-জরিপ হইতে জানা যায় যে এই পরিমাণ কিছুটা কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে কমে নাই। এখনও মহাজনগণ গ্রামাঞ্চলের ঋণ সরবরাহের সর্বপ্রধান সূত্র।**

মহাজনগণ এখনও প্রধান সূত্র

কৃষিঋণের যোগানে গ্রামীণ মহাজনের এইরূপ ভূমিকা যে কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে তাহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। এ-সম্পর্কে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি (১৯৫৪) বলিয়াছিল, "যদিও বা গ্রামীণ মহাজনগণ বিশেষভাবে অনুভূত অন্যতম অভাব পূরণ করে, তবুও তাহারা বৃহদায়তনে উৎপাদন এবং গ্রামাঞ্চলের সম্পদের যোগ্য বণ্টনের কোনরূপ সহায়ক নহে।" গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থার এই সূত্রের প্রধান ত্রুটি হইল যে, মহাজনগণের সুদের হার অত্যন্ত বেশী। উপরন্তু, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা আবার মহাজনী কারবারের সহিত কৃষিজ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় বাণিজ্যও করিয়া থাকে। ফলে তাহারা সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয়।

মহাজনের এই ভূমিকা অবাঞ্ছনীয়

গ্রামাঞ্চলের ঋণ সরবরাহের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হইল ব্যবসায়িগণ ও তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ। মহাজনশ্রেণী হইতে ইহাদের পার্থক্য এইখানে যে, ঋণ দেওয়া মহাজনদের প্রধান ব্যবসায় এবং ক্রয়বিক্রয়-বাণিজ্য গৌণ মাত্র; কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর বেলায় ক্রয়বিক্রয়ই মুখ্য ব্যবসায় এবং এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া দাদন দিতে হয় বলিয়া মহাজনী কারবার করিতে হয়। দাদন দিয়া ফসল অগ্রিম ক্রয় করিয়া লয় বলিয়া কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার উপর তাহাদের নিয়ন্ত্রণও ব্যাপক। এই দিক দিয়া তাহারা গ্রামীণ মহাজনগণের প্রতিদ্বন্দ্বী।

ব্যবসায়ীদের ভূমিকা

উক্ত গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার যে-ভূমিকায় গ্রামীণ মহাজনগণ অবতীর্ণ হইয়াছে সেই ভূমিকা সরকারের পক্ষেই গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকার ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মোট প্রয়োজনীয় ঋণের সামান্য এক অংশ—মাত্র শতকরা ৩.৩ ভাগ সরবরাহ করিত। উপরন্তু, অন্যান্য কারণেও সরকারী ঋণ বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। কমিটির মতে, তাকাভি ঋণের (Taccavi Loans) ন্যায় সরকারী ঋণকে অকাম্যতা ও অ-পর্যাপ্তির চরম দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। পরিমাণে ইহা অপ্রচুর, বণ্টনে ইহা অন্যায্য এবং নিরাপত্তার দিক দিয়া অনুপযুক্ত; এবং ঋণপ্রদান ও আদায়ের দিক হইতে ইহা অসুবিধাজনক

সরকারের ভূমিকা

* All-India Rural Credit Survey—General Report (Vol. II)

** Rural Credit—Fourth Follow-up Survey Report—Published in November, 1962

এবং আনুষংগিক ও অন্য নানাপ্রকার ব্যয়ভারাক্রান্ত। তাকাভি ঋণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি একটি কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে, তাকাভি ঋণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।*

সমবায় সমিতিগুলির ঋণ সরবরাহের পরিমাণ ছিল আরও স্বল্প। তাহারা মোট ঋণের মাত্র শতকরা ৩.১ ভাগ সরবরাহ করিত। এই শতকরা ৩.১ ভাগ ঋণেরও অধিকাংশ বড় বড় কৃষিজীবীর হস্তগত হইত এবং সামান্য অংশমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের ভাগ্যে জুটিত। ঋণ জরিপ কমিটি বলিয়াছিল যে, গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থায় সমবায় সমিতিগুলির এইরূপ অবিশ্বাস্য লঘু ভূমিকা অনুধাবনের পর একটিমাত্র অভিমত প্রদান করা যাইতে পারে—এবং ইহা হইল "অর্ধ শতাব্দী (১৯০৪-৫৪) অভিযানের পর ভারতে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা।" অবশ্য গত কয়েক বৎসরে সমবায় ঋণের কিছু প্রসার ঘটিয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালের ঋণ-জরিপে জানা যায় যে, কতকগুলি অঞ্চলে সমবায়ের কাজ খুবই 'প্রশংসনীয়', কতকগুলি অঞ্চলে উহাদের কাজ মোটামুটি 'সন্তোষজনক' এবং অবশিষ্ট অঞ্চলে উহাদের কাজ 'অসন্তোষজনক' ছিল।**

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা

অবলম্বনীয় প্রতিবিধান (Remedial Measures): গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির মতে, ভারতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইলেও ইহাকেই এখন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে এবং ইহার ভিত্তিতেই গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার নূতন কাঠামো প্রস্তুত করিতে হইবে। কমিটি এই নূতন কাঠামো বা ব্যবস্থার নাম দিয়াছে গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (Integrated Scheme of Rural Credit)।

গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা

গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনায় সমবায়কেই ভিত্তি করা হইয়াছে। কারণ, সরকারী ঋণ বিশেষভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং মহাজনগণ দ্বারা সংগঠিত ব্যক্তিগত ঋণ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে অকাম্য। সুতরাং প্রয়োজন হইল সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগত ঋণ-ব্যবস্থার (System of Institutional Credit)।

সমবায়ই পরিকল্পনার ভিত্তি

গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি-অনুমোদিত গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার প্রতি স্তরে আছে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ (State Partnership)। অর্থাৎ, রাজ্য সরকারগুলিকে বিভিন্ন স্তরে সমবায় সমিতির অংশীদার হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সমবায় ঋণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে হইবে—বিশেষ করিয়া ঋণপ্রদানের সহিত শস্য বিক্রয়করণ ও বিক্রয়যোগ্যকরণ (marketing and processing) ব্যবস্থা সংযুক্ত করিতে হইবে। তৃতীয়ত, প্রাথমিক সমিতিগুলিকে

পরিকল্পনার বিভিন্ন অংগ

* Report of the Committee on Takavi Loans and Cooperative Credit

** Rural Credit Follow-up Survey, 1959-60

বৃহদাকার করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। চতুর্থত, কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য দেশের সর্বত্র পণ্য সংরক্ষণের (warehousing) ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিশেষে, সর্বস্তরে সমবায় কর্মীদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আর একটি অংগ

গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার আর একটি অংগ হিসাবে জরিপ কমিটি রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত এমন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সৃষ্টি করিতে বলে যাহার শাখাপ্রশাখা দেশের সর্বত্র থাকিবে এবং যাহার উপর পরোক্ষ অথচ সুস্পষ্টভাবে গ্রামীণ ঋণ ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়ন-দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে। কমিটি ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ এবং ইহার সহিত হায়দরাবাদ ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক প্রভৃতি রাজ্য সরকার সম্পর্কিত ব্যাংকগুলিকে (State-associated) সংযুক্ত করিয়াই এই বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠনের সুপারিশ করিয়াছিল।

দুইটি তহবিল

উক্ত পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য জরিপ কমিটি রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে একটি 'জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' [National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund] নামে একটি তহবিল গঠন করিতে নির্দেশ দেয়। এই তহবিল হইতেই রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সরকারগুলিকে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদার হইবার জন্য ঋণপ্রদান করিবে। ইহা ছাড়া কমিটি রাজ্যসমবায় ব্যাংকসমূহকে মধ্যমেয়াদী ঋণ-প্রদানের জন্য একটি 'জাতীয় কৃষিঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল' [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] সৃষ্টির সুপারিশ করে। দুর্ভিক্ষ অজন্মা ইত্যাদির বৎসরে স্বল্পমেয়াদী ঋণকে মধ্যমেয়াদী ঋণে পরিণত করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্যসমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণপ্রদান করিবে।

সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড

জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল হইতে ঋণ লইয়া প্রত্যেক রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে একটি করিয়া সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে। এইভাবে প্রণীত সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবার জন্য এবং কৃষিজ পণ্য সংরক্ষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য কমিটি একটি 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড' (National Cooperative Development and Warehousing Board) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। উপরন্তু কমিটির মতে, প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (State Warehousing Corporation) স্থাপিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

সুপারিশগুলির মূল্য নির্ধারণ (Evaluation of the Recommendations): গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি গতানুগতিক নহে। ইহার মূলে আছে পটভূমিকার পরিবর্তন। পূর্বের স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থার (laissez faire economy) স্থলে প্রবর্তিত হইয়াছে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা

(planned economy)। এই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় গৃহীত হইয়াছে কৃষিজ উন্নয়নের জন্য গতিশীল কার্যক্রম (dynamic programme of agriculture)।

কৃষির উন্নয়নের গতিশীল কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন গতিশীল কৃষিঋণ-ব্যবস্থা

ভারতের দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিবার জন্য কৃষির উন্নয়নের এই গতিশীল কার্যক্রম অপরিহার্য। উক্ত জরিপ কমিটির মতে, এই গতিশীল কার্যক্রমকে সফল করিবার জন্য আবার অপরিহার্য হইল একটি গতিশীল কৃষিঋণ-ব্যবস্থার (dynamic programme of agricultural credit)।

এই ঋণ-ব্যবস্থাকে গতিশীল বলা হইয়াছে, কারণ ইহাকে উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান কৃষিঋণের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে হইবে। ইহা অবশ্য গ্রামীণ মহাজনকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করিতে পারিবে না; তাহার প্রয়োজনও নাই।

ঋণ-ব্যবস্থাকে গতিশীল বলা হইয়াছে কেন

গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থায় মহাজনের ভূমিকা এখনও কিছুদিন বর্তমান থাকিবে। নব-পরিকল্পিত ঋণ-ব্যবস্থা গ্রামীণ মহাজনের কাম্য বিকল্প সূত্র হিসাবে বর্তমান থাকিয়া মহাজনগণকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে; ফলে সার্থক গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। এইরূপ আশাই গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি পোষণ করিয়াছিল এবং সেদিন পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশনও মানিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু ইহার পর ১৯৫৮ সালে ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট * প্রকাশিত হইলে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গতিশীল কৃষিঋণ-ব্যবস্থা গঠনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ প্রকাশ করা হয় এবং রিজার্ভ ব্যাংকের পরবর্তী অনুসন্ধানসমূহের (Follow-up Surveys) ফলে বিষয়টির উপর নূতন আলোকসম্পাত ঘটে।

সুপারিশগুলির সাম্প্রতিক সমালোচনা

ফলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ণাংগ ঋণ-পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তনসাধন করা হয়। এখন এই মূল ও পরিবর্তিত পরিকল্পনাকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে।

কার্যক্রমকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে (Plan Implemented So Far): গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির নির্দেশানুযায়ী ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের (State Bank of India) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠন

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সহিত বিভিন্ন রাজ্য সরকার সম্পর্কিত ব্যাংক (State-associated Banks)—যথা, হায়দরাবাদ রাজ্য ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক, বরোদা ব্যাংক প্রভৃতিও সংযুক্ত করিবার সুপারিশ কমিটি করিয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সংযুক্তিকরণ সম্ভব হয় নাই, তবে ১৯৫৯ সাল হইতে উহাদিগকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীন ব্যাংকে (Subsidiaries of the State Bank) পরিণত করা হইয়াছে।

* "Certain Aspects of Cooperative Movement in India."
Malcolm Darling, 1958

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের উপর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে, ৪০০টি শাখা স্থাপন করিবার ভার ন্যস্ত ছিল। ১৯৬০ সালের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ঐ লক্ষ্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। শাখাবিস্তারের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৬৫ সালের জুন মাসের মধ্যে আরও ৩০০টি নূতন শাখা খোলা হইবে।* এই সকল শাখার মাধ্যমে স্থানান্তরে অর্থপ্রেরণের সুবিধা (remittance facilities) প্রদান, গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় সংগ্রহ, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার করা হইল রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যের অংগীভূত।

নবগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম

সমবায় সমিতির মালিকানায় রাজ্য সরকারের অংশগ্রহণে সহায়তা করিবার জন্য ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে ১০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া একটি 'জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' সৃষ্টি করা হয়। ১৯৬১ সালের জুন মাসে ইহার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এই তহবিল হইতে রাজ্য সরকারগুলিকে বৎসরে গড়ে ৪-৫ কোটি টাকার মত ঋণ দেওয়া হইতেছে। তৃতীয়ত, ঐ সালেই ১ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া জাতীয় কৃষিঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের মধ্যভাগ অবধি এই তহবিলের মূলধন ৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চতুর্থত, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৫৬ সালে 'কৃষিজ পণ্য (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) করপোরেশন আইন' [Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act, 1956] পাস করা হয়। এই আইনের বলে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড (National Cooperative Development and Warehousing Board) এবং কেন্দ্রীয় পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (Central Warehousing Corporation) প্রতিষ্ঠিত হয়। সমবায়িক বৎসর (cooperative year) ১৯৬০-৬১ বা ১৯৬১ সালের জুন মাস পর্যন্ত করপোরেশন ৪০টি পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন করে এবং বিভিন্ন 'রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন' প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশনগুলি কর্তৃক স্থাপিত পণ্য সংরক্ষণাগারের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৬-তে।** পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়করণ, আমদানি-রপ্তানির উন্নয়নের ব্যবস্থা প্রভৃতি হইল পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশনের কার্য।

২। জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল

৩। কৃষিঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল

৪। কেন্দ্রীয় সমবায় উন্নয়ন বোর্ড ও পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন

রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন

গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন কার্যও বহুদূর অগ্রসর

* Reserve Bank Bulletin, November, 1962 ; ২য় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

** Report on Currency and Finance, 1961-62

হয়। সমবায় কর্মীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, ১০ হাজারের উপর বৃহদায়তন সমিতি এবং ১৮০০-এর মত পণ্য বিক্রয়করণ সমিতি গঠন, মোট ২২৫ কোটি টাকা ঋণপ্রদান ইত্যাদি লইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় সম্প্রসারণের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর উল্লিখিত রিপোর্ট প্রকাশের ফলে ইহার গতিতে বাধা পড়ে। স্যর ম্যালকমের মতে, সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত বিশেষ বিচার-বিবেচনার পরই গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি সমবায় সমিতিগুলিকে বৃহদায়তনে সংগঠিত করিবার সুপারিশ করিয়াছিল তাহাও বিবেচনা-সাপেক্ষ। সমবায় আন্দোলনের সহিত ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সম্পর্ক বর্তমানে যতটা ঘনিষ্ঠ ততটা হওয়া উচিত নয় বলিয়াও স্যর ম্যালকম অভিমত প্রকাশ করেন।

৫। সমবায়ের পুনর্গঠন

স্যর ম্যালকমের এই অভিমতের ফলে গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার রূপদান কিছুটা মন্থরগতি হয়, এবং ফলে লক্ষ্য পড়ে ক্ষুদ্রায়তন সেবা সমবায় সমিতি (service cooperatives) গঠনের প্রতি। পরে সমবায়িক ঋণদান কমিটির (Committee on Cooperative Credit or Mehta Committee) সুপারিশ অনুসারে ১৯৬০ সালে ঠিক হয় যে, নীতি হিসাবে এক একটি গ্রামীণ সম্প্রদায় (village community) লইয়াই ক্ষুদ্রায়তন ঋণদান সমিতি গঠন করা হইবে, তবে আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক গ্রামের ভিত্তিতে সমিতি গঠন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক সমিতির শেয়ার-মূলধনে সরকারের অংশগ্রহণ বিভিন্ন সর্তাধীন হইবে। তবে রাজ্য সরকার সমিতিগুলিকে অনাদায়ী মূলধন প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে অর্থসাহায্য করিবে। তৃতীয়ত, সমবায় উন্নয়নের প্রচেষ্টা তীব্রতর করা হইবে। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থাকেই তৃতীয় পরিকল্পনায় রূপ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে এই পরিবর্তিত ব্যবস্থা সফল হইতে পারে তাহার জন্য একটি জাতীয় সমবায়িক উন্নয়ন করপোরেশন (National Cooperative Development Corporation) গঠন করা হইয়াছে। এই করপোরেশনের নিকট জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ডের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্য হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সম্প্রতি ভারত সরকার একটি 'কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ করপোরেশন' (Agricultural Refinance Corporation) গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার অনুমোদিত মূলধন হইবে ২৫ কোটি টাকা এবং প্রারম্ভিক মূলধন ৫ কোটি টাকা। কৃষিঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনঃ অর্থসরবরাহ করা ছাড়াও এই করপোরেশন সমবায় সমিতিগুলিকে ২৫ বৎসরের অনধিক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিবে ও জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির ২৫ বৎসরের অনধিক মেয়াদী ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবে। কৃষিজমি ও কৃষির সর্বাংগীণ উন্নতির জন্য এই ঋণ দেওয়া হইবে।*

সাম্প্রতিক গতি

কৃষি পুনঃ অর্থ-সরবরাহ করপোরেশন

* Reserve Bank Bulletin, Feb. 1963

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature and extent of Agricultural Indebtedness in India and review the measure that have been adopted to tackle the problem.

(৯৪-৯৬ এবং ৯৮-১০২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the causes of Agricultural Indebtedness in India. Review the measures that have been adopted to tackle the problem.

[প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের ইংগিত : বাস্তব কৃষকের ঋণগ্রস্ততার কারণ হিসাবে ছয়টি বিষয়ের অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ করা যায়—যথা, (১) কৃষকের আয়ের স্বল্পতা, (২) পুরুষানুক্রমিক ঋণ, (৩) ব্যয়বাহুল্য, (৪) ভূমি-রাজস্বের হার ও আদায়ের সময়, (৫) মধ্যস্বত্বভোগিগণের অস্তিত্ব, এবং (৬) গ্রামীণ মহাজনের ভূমিকা। কিন্তু অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্টকে অনুসরণ করিয়া বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখিলে বলা যায় যে, কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার প্রধান কারণ হইল মাত্র দুইটি : মুনাফাহীন কৃষিকর্ম এবং ঋণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাব। (৯৬-১০২ পৃষ্ঠা)]

3. Discuss fully the main problems in the field of agricultural credit in India.

• (B. U. (O) 1962) (১০২-১৪০ পৃষ্ঠা)

4. Give your own evaluation of the scheme of integrated structure of rural credit recommended by the All-India Rural Credit Survey Committee.

(C. U. B. Com. 1959) (১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা)

একাদশ অধ্যায়

কৃষিগত সংগঠন

(Organisation of Agriculture)

ভারতের কৃষিগত সংগঠনের ত্রুটি প্রধানত দুই প্রকারের—(ক) কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি, এবং (খ) কৃষিকার্যে অবলম্বিত পদ্ধতির ত্রুটি। প্রথমে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি লইয়া আলোচনা করা হইতেছে।

কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা (Marketing of Agricultural Produce) : ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থাতেও রূপান্তর ঘটিয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় কৃষক জাতীয় এবং বিশ্বের বাজারের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়

ভারতে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা নানা অংশে বিভক্ত। প্রথম হইল সামান্য সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন দ্রব্য কৃষকগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া এক বা একাধিক স্থানে জমায়েত করা (assembling)। তাহার পর আছে পণ্যের গুণের তারতম্য অনুসারে ইহাকে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করা (grading)।

নমুনা পাঠানো (sampling), বাজারে প্রেরণ করা, মূল্যবৃদ্ধির আশায় শস্য মজুত রাখা প্রভৃতি হইল বিক্রয়-ব্যবস্থার অন্যান্য পর্যায়।*

কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of the System of Agricultural Marketing)ঃ সাধারণভাবে বলা যায়, অন্যান্য দেশেও কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই সকল কার্য কৃষকেরা নহে, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরাই সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ, ভারতে কৃষিকার্য অতি ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন করা হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যক্তিগত-ভাবে কৃষকের পক্ষে সামান্য উৎপন্ন লইয়া বাহিরের বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হইয়া উঠে না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ক্ষেতে উৎপন্ন একই ফসলে এরূপ গুণগত তারতম্য দৃষ্ট হয় যে তাহাকে পর্যায়ভুক্ত না করিয়া বাহিরের বাজারে লইয়া গেলে উচিত মূল্য কোনদিনই পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের দুরবস্থার জন্য ফসল বাহিরের বাজারে লইয়া যাওয়াও কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। চতুর্থত, কৃষকের দারিদ্র্যও তাহাকে মহাজন ও ব্যাপারীদের নিকট দায়াবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া সে তাহাদিগকেই ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত কারণে ভারতে কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যাপারী, ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন প্রভৃতি 'বিশেষজ্ঞদের' হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই সকল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর সংখ্যা এত অধিক ও ইহাদের প্রভাব এত ব্যাপক যে, ইহারা অনেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্যক্রেতা প্রদত্ত মূল্যের একটা মোটা অংশ, কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধাংশ, গ্রাস করিয়া থাকে। ইহার উপরও কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার অন্যান্য ত্রুটি আছে—যথা, উপযুক্ত সংখ্যায় সুসংগঠিত বা নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাব, বাজারে ওজন ও পরিমাণের তারতম্যজনিত এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অপপদ্ধতির প্রচলন, বাজার-দাম সম্বন্ধে কৃষকের অজ্ঞতা, গুদামঘরের অভাব ইত্যাদি।

১। বিক্রয়-ব্যবস্থা মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের হস্তেই ন্যস্ত

ইহার কারণ

২। অন্যান্য ত্রুটি

নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাবের জন্যই অনেক ক্ষেত্রে কৃষক গ্রামে ফড়িয়া, ব্যাপারী ও আড়তদারের নিকট অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়; সামান্য পণ্য লইয়া সে দূরবর্তী নিয়ন্ত্রিত বাজারে যাইতে পারে না। ইহার উপর আবার পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কৃষকের নিকট হইতে চুংগি (octroi) আদায় করে বলিয়া সে সহরের বাজারে পণ্য লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেও চাহে না।

নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাবের কুফল

কৃষক তাহার পণ্য গ্রামে বিক্রয় করুক বা সহরের অনিয়ন্ত্রিত বাজারে লইয়া গিয়াই বিক্রয় করুক ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়তদার ও মহাজনগণের অপপদ্ধতির হাত হইতে সে সচরাচর রেহাই পায় না। গুণগত তারতম্যের দোহাই দিয়া, বেআইনীভাবে

বাজারে প্রচলিত নানা অপপদ্ধতি

* First Five Year Plan ২৪২ পৃষ্ঠা

ওজন ও পরিমাপ ব্যবহার করিয়া, নানা অজুহাতে ফাউ কাটিয়া লইয়া, প্রকৃত বাজার-দাম গোপন রাখিয়া কৃষককে ন্যায্য মূল্য হইতে অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত করা হয়।

শস্যসঞ্চয়ে অসুবিধা ও অক্ষমতা

সময়গত উপযোগী (time utility) সৃষ্টি করিয়া কৃষক যে পণ্যের অধিক মূল্য আদায় করিবে তাহার অন্তরায় হইল শস্য মজুত রাখিবার মত স্থানের অভাব। ফলে সে মহাজন বা আড়তদারের নিকট দায়াবদ্ধ না থাকিলেও শস্য কর্তনের অব্যবহিত পরেই, যখন কৃষিজ পণ্যের দাম সর্বাপেক্ষা কম থাকে, তখনই ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

অবলম্বনীয় প্রতিবিধানসমূহ (Remedial Measures)ঃ কৃষিজ পণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারকে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়করণ সমস্যার প্রধান প্রতিবিধান হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। বিক্রয়করণ সমস্যার সমাধানকল্পে দুইটি প্রধান প্রতিবিধান নির্দেশ করা যাইতে পারে—(ক) পর্যাপ্ত সংখ্যায় নিয়ন্ত্রিত বাজারের (regulated markets) প্রতিষ্ঠা, এবং (খ) সমবায় বিক্রয়করণের সমিতির (cooperative marketing societies) প্রসার। এই দুই প্রকারের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার অধিকাংশ ত্রুটি দূর করা যায়। ইহা ছাড়াও অবশ্য অপচয় নিবারণ ও বিক্রয়করণ-ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (ware-housing) স্থাপন, পথঘাটের উন্নতিসাধন, গ্রেড বা নির্ধারিত মান চালু করা প্রভৃতি ব্যবস্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজন।

দুইটি প্রধান প্রতিবিধান

অন্যান্য ব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রিত বাজারে প্রকাশ্যভাবে নিলামের মাধ্যমে অথবা সরাসরি পণ্য বিক্রয় করা হয়, এবং এক একটি কমিটির হস্তে এই সকল বাজারের পরিচালনার ভার থাকে। বাজারে ওজন, পরিমাপ, দর, বাজারের দরুন প্রাপ্য (market charges) প্রভৃতিও নির্দিষ্ট থাকে। পরিচালকমণ্ডলীতে বিক্রেতাদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকে বলিয়া কৃষককে ঠকানো ক্রেতাদের পক্ষে বড় একটা সম্ভব হইয়া উঠে না। অনেক সময় আবার নিয়ন্ত্রিত বাজারের পরিচালনার ভার সমবায় সমিতির হস্তে অর্পণ করা হয়। মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র ও গুজরাট-এর কিয়দংশে এইভাবে সমবায় সমিতিগুলির হস্তে তুলার বাজার পরিচালনার ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

১। নিয়ন্ত্রিত বাজার

সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ

সমবায় বিক্রয় সমিতিকে নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিযোগী হিসাবে নয়—পরিপূরক হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির অভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজার সফল হইতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত বাজারে ব্যাপারীদের অপপদ্ধতি দূর করা হয়; কিন্তু কৃষকের পক্ষে যদি নিয়ন্ত্রিত বাজারে পণ্য লইয়া আসা সম্ভবই না হয় তবে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সার্থকতা কোথায়? ইহার জন্য প্রয়োজন গ্রামাঞ্চল হইতে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অপসারণ এবং কৃষককে প্রয়োজনমত ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা করা। এই দুইটি কার্যের সম্যক

২। সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি

সম্পাদন যে একমাত্র সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির দ্বারাই সম্ভব, সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। সমবায় বিক্রয়করণ সমিতিগুলি নামমাত্র কমিশন লইয়া উপযুক্ত সময়ে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের হস্ত হইতে কৃষককে রক্ষা করে, শস্য গুদামজাত করে ও যানবাহনের ব্যবস্থা করে এবং পণ্যের গুণগত উন্নয়নে সহায়তা করে। এইভাবে সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিতে পারে।

শস্য সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর নির্মাণ সকল সময় সমবায় সমিতির সংগতিতে কুলায় না বলিয়া সরকারের পক্ষেও এইদিকে সচেষ্ট হইবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।

৩। সরকারী সাহায্যে বহুসংখ্যক গুদামঘর নির্মাণ করা

১৯৫৪ সালের গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির মতে, পর্যাপ্ত সংখ্যায় গুদামঘর নির্মাণ কৃষিগত ঋণ-ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত; এই উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পণ্য সংরক্ষণ উন্নয়ন তহবিলের (National Warehousing Development Fund) সৃষ্টি এবং একটি সর্ব-ভারতীয় পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (All-India Warehousing Corporation) স্থাপন করা প্রয়োজন। গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি এই সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পণ্য সংরক্ষণ কোম্পানী* (State Warehousing Company) স্থাপনের সুপারিশ করে। এই দুই প্রকার প্রতিষ্ঠান গুদামঘর স্থাপন করিয়া শস্য গুদামজাত করিবার ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিবে।

তারপর আছে গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের উন্নয়ন। বহু কমিটি ও কমিশন ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমাজ উন্নয়ন পদ্ধতিতে পথঘাটের সাধারণ উন্নয়ন ছাড়াও জিলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই বিষয় সম্পর্কে অধিকতর যত্নবান হইতে হইবে।

৪। গ্রামাঞ্চলের পথ-ঘাটের উন্নয়ন করা

ইহার পর আছে গুণগত বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত স্তর বা মান (grading) চালু করা এবং বিশেষ করিয়া রপ্তানি দ্রব্যসমূহের বেলায় নমুনা পাঠানোর বন্দোবস্ত করা। পরিকল্পনা কমিশন পশম, লোমশচর্ম, লাক্ষা, মেষ ও ছাগচর্ম, বনস্পতি, তৈলবীজ, কয়েক প্রকারের প্রয়োজনীয় তৈল, কাজু বাদাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মান নির্ধারণ ও প্রচলন করার জন্য সুপারিশ করিয়াছে। অনেকের মতে, মান নির্ধারণ করিবার ভার সমবায় বিক্রয় সমিতির হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে যাহাতে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, সে-দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৫। নির্ধারিত স্তর বা মান চালু করা

* বর্তমানে ইহাদিগকে 'রাজ্য পণ্যসংরক্ষণ করপোরেশন' বলা হইতেছে।

কৃষিজ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষ অধিক। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে ১৯৩৯ সালে এবং পরে ১৯৫৬ সালে আইন পাস করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের আইন দ্বারা মেট্রিক ব্যবস্থায় ওজন ও মাপ (metric weights and measures) চালু হইয়াছে। এই ব্যবস্থা যাহাতে কার্যকর হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬। ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করা

পরিশেষে আছে গবেষণা। পরিকল্পনা কমিশন সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছে যে, কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার অর্থগত, সংগঠনগত এবং পরিচালনাগত সকল সমস্যাই বিরতিবিহীন গবেষণার দাবি করে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বিশেষজ্ঞগণ লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটি রাজ্য সরকার এবং সমবায় সংগঠনগুলিকে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুতিতে সহায়তা করিবে এবং বিশেষ সময়ান্তরে সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থার গুণাগুণের পর্যালোচনা করিবে।*

৭। গবেষণা

অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ (Measures Adopted): ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক কৃষিজ পণ্য বিক্রয়করণ ও পরিদর্শন সংস্থার (Directorate of Marketing and Inspection) সৃষ্টিকে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি দূরিকরণার্থে অবলম্বিত সর্বপ্রথম প্রতিবিধান বলিয়া উল্লেখ করা যায়। বিক্রয়-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের তথ্যানুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন উপায়ে বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা ইহার কার্য। সংস্থা এ-পর্যন্ত শতাধিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা:

১। গবেষণা

কেন্দ্রীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণে বিভিন্ন রাজ্যও এইরূপ সংগঠন স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গবেষণার কার্য রীতিমত সুরু হইয়াছে।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান হইল কৃষিজ পণ্যের নির্দিষ্ট স্তর বা মান নির্ধারণ ও প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করা; এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে কৃষিজ পণ্য (নির্দিষ্ট মান এবং বিক্রয়) আইন [Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937] পাস করা হয়। এই আইনের ফলে কেন্দ্রীয় কৃষিজ পণ্য বাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থা ১৫০-এর মত পণ্যের মান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। আইনে 'আগ মার্কা' (Ag Mark) শব্দটি গুণ ও বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আগ মার্কা' কৃষিজ পণ্য গুণ ও বিশুদ্ধতায় নির্দিষ্ট মানের বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বাজারে ইহাদের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। বর্তমানে ৮০০-র মত মান-নির্ধারণ-কেন্দ্র (grading stations) দেশের বিভিন্ন অংশে কার্য করিতেছে এবং মান-নির্ধারণের কার্য সহজ করিবার জন্য নাগপুরে একটি কেন্দ্রীয় এবং কোচিনে একটি

২। কৃষিজ পণ্যের নির্দিষ্ট মান-নির্ধারণ

* AICC Economic Review, June 1959

আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপন করা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় মান-নির্ধারণ ব্যবস্থা ব্যাপকতর করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার পথে কিন্তু বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য সমবায়িক বিক্রয়করণ সমিতির উপর অধিক আস্থাস্থাপন করা হয়। যাহা হউক, নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে আইন প্রণীত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতের মোট ২৫০০ মণ্ডি বা পাইকারী বাজারের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা ৭২৫-এ দাঁড়াইয়াছে, দেখা যায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় বাকিগুলিকেও নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।*

৩। নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনের জন্য কৃষিজ পণ্য বাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থার অধীনে একটি উপদেষ্টা শাখা (an Advisory Wing) গঠন করা হইয়াছে এবং এইরূপ বাজারের সম্পাদকদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যার স্বল্পতাজনিত ত্রুটি দূর করিবার একটি চেষ্টা করা হইতেছে বেতারের মাধ্যমে প্রচারকার্যের দ্বারা। ভারতীয় বেতার বিভাগ হইতে নিয়মিতভাবে কৃষিজ পণ্যের দাম, মজুতের অবস্থা, বিভিন্ন অঞ্চলাভিমুখে পণ্যের গতি সম্বন্ধে তথ্য প্রচার করা হয়। ইহার ফলে অনিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহও কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়ে।

৪। বেতারের মাধ্যমে প্রচারকার্য

বর্তমানে সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং ইহার মূলভার অর্পণ করা হইয়াছে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ বোর্ডের (National Cooperative Development and Warehousing Board) উপর। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন বোর্ড ১৯০০-র মত প্রাথমিক সমিতি বিক্রয়করণে ও বিক্রয়যোগ্যকরণে (marketing and processing) অর্থ ও অন্যপ্রকার সাহায্য করে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও ৬০০-র মত বিক্রয়করণ সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া প্রত্যেক মণ্ডিতে বা মণ্ডির নিকটে একটি করিয়া সমিতির ব্যবস্থা করার কথা আছে। ইহা ছাড়া কৃষিজ পণ্য বিক্রয়করণের কার্য সেবা সমবায় সমিতির (Service Co-operative) উপরও অর্পিত হইয়াছে। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত মোট ২'১৩ লক্ষ প্রাথমিক কৃষি সমিতির মধ্যে এক-চতুর্থাংশের উপর ছিল এইরূপ সেবা সমিতি। ইহাদের প্রকৃতি অনেকটা বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির (Multi-purpose Society) ন্যায়। ইহারা কৃষির উন্নতিসাধনকল্পে নানাভাবে কৃষকের সেবা করিতে চায়।

৫। সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয়-ব্যবস্থার সংগঠন

---

* Third Five Year Plan ৩২১ পৃষ্ঠা

১৯৫২ সালে আগাম বাজার (নিয়ন্ত্রণ) আইন [The Forward Markets (Regulation) Act, 1952] পাস এবং পরবর্তী বৎসরে আগাম বাজার কমিশন (Forward Markets Commission) প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করা হয়। এই কমিশন কৃষিজ পণ্যে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য ও আগাম বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিম ঘাটতি দূরিকরণের প্রচেষ্টা করে।

৬। অন্যান্য অবলম্বিত প্রতিবিধান

কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি দূরিকরণার্থে অন্যান্য যে-সকল উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নির্ধারিত ওজন ও মাপ কার্যকর করিবার প্রচেষ্টা, গুদামঘর নির্মাণ, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যাপারে শিক্ষার প্রসার প্রভৃতিই হইল বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৯৫৬ সালের 'নির্ধারিত ওজন ও মাপ আইন' (Standard Weights and Measures Act, 1956) দ্বারা ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাস হইতে দেশের সর্বত্রই মেট্রিক প্রথায় ওজন ও মাপ চালু করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা যাহাতে কার্যকর হয় তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর নির্মাণের ব্যবস্থা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই করা হইয়াছে।* ইহা ছাড়া, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে 'শস্য-ব্যাংক' (Grain Banks) সংগঠিত হইয়াছে। শস্য-ঋণ দেওয়া ছাড়াও এই ব্যাংকগুলি সমবায় বাজারের প্রসারের জন্য শস্য মজুত রাখে।**

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার কার্যক্রম

ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের কার্যক্রম উপরি-উক্ত প্রতিবিধানসমূহ লইয়াই রচিত। নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিষ্ঠা, নির্দিষ্ট মান চালু করা, ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করা, সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি স্থাপন করা প্রভৃতি ব্যবস্থার সমন্বয়ে যে-কার্যক্রম প্রথম পরিকল্পনায় প্রণয়ন করা হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় তাহাকেই অনুসরণ করা হইয়াছিল ও হইতেছে। গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে কৃষিঋণ ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থাকে পরস্পরের অংগীভূত হিসাবে দেখা যাইতেছে। এই দিক দিয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়িক বিক্রয়করণ সমিতি ও সেবা সমবায় সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়াও গুদামঘর নির্মাণ, ঋণ ও বিক্রয়ের মধ্যে সংযোগসাধন প্রভৃতির ব্যাপকতর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।†

কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতি (Existing Method of Agriculture): কৃষিকার্যের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা

* ১০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

** Reserve Bank Bulletin, February 1963

† Third Five Year Plan

হইয়াছে। ভারতে কৃষিকার্যের পদ্ধতি অতি পুরাতন। ভারতীয় কৃষক আজও আদিম যুগের সেই লাঙল এবং একজোড়া বলদ দিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করে।

কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটিসমূহের সংক্ষিপ্তসার

জলসেচ, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি আজও অধিকাংশ ভারতীয় কৃষকের নিকট অজ্ঞাত বা আয়ত্তের বাহিরে। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকেও কৃষিকার্যের পদ্ধতির একটি দিক হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। তবে এ-সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া বর্তমানে কৃষি-পদ্ধতির অন্যান্য দিক সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

১। কৃষিকার্যে পশু-শক্তির বিশেষ ভূমিকা পদ্ধতির অন্যতম ত্রুটি

এই অন্যান্য দিকের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হইল কৃষিকার্যে পশুশক্তির বিশেষ ভূমিকা। হলকর্ষণ, সেচের জন্য জল উত্তোলন, উৎপন্ন শস্যের পরিবহণ প্রভৃতি সকল কার্যই পশুশক্তি বা গো-মহিষাদি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। গো-মহিষাদি আবার কৃষিজমিতে সাধারণ ব্যবহার্য সারও সরবরাহ করিয়া থাকে। এইজন্য এই উক্তি করা হইয়াছে যে, ভারতে গো-জাতি তাহার স্কন্ধে সমগ্র কৃষিকার্যের ভার বহন করিয়া আছে।

২। কৃষিজমির ব্যবহারজনিত ত্রুটি

কৃষিকার্যের পদ্ধতির আর একটি ত্রুটিপূর্ণ বিষয় হইল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতে কৃষিজমির সম্যক ব্যবহার করা যায় না। এখানে বৎসরের কয়েক মাস কৃষি-জমি অকর্ষিত রাখা যেন একটা রীতি। উন্নত দেশসমূহে কৃষিজমি কোন সময়ে অকর্ষিত রাখা হয় না। এই সকল দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পালটি শস্য উৎপাদন (rotation of crops) দ্বারা কৃষিজমির পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। ইহা সম্ভব না হইলে পশুখাদ্য (fodder crops) উৎপাদন করিয়া জমিকে কাজে লাগানো হয়।

৩। বীজ, সার ও কৃষি-জমিকে চাষোপযোগী করিবার ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ

বীজ সার এবং কৃষিজমিকে চাষোপযোগী করিবার ব্যবস্থাও ভারতে বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। উন্নত বীজ ব্যবহারের প্রচেষ্টা, নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ এখনও ভারতে ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের মতে, সার প্রয়োগের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে না পারিলে জলসেচ, উন্নত বীজ প্রভৃতির পূর্ণ সুবিধা ভোগ করিতে পারা যাইবে না।

৪। যন্ত্রিকরণ পদ্ধতি এখনও বিশেষ অবলম্বিত হয় নাই

পরিশেষে আছে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রশ্ন। বস্তুত, যন্ত্রিকরণ (mechanisation) কৃষিকার্যের পদ্ধতির উপরি-উক্ত সকল দিকের সহিতই বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যন্ত্রিকরণ সম্ভব হইলে স্বাভাবিকভাবেই বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করিতে হইবে, কৃষিকার্যে পশুশক্তির ভূমিকার গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইবে, জমির পূর্ণ নিয়োগ সম্ভব হইবে এবং স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে উন্নত বীজ সার ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইবে। এখন এ-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

কৃষির যন্ত্রিকরণ (Mechanisation of Agriculture) : কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে বুঝায় কৃষিকার্যের সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মানব ও পশুশক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার করা, অথবা যন্ত্রশক্তি দ্বারা মানব ও পশুশক্তিকে সহায়তা করা। উদাহরণস্বরূপ, কর্ষণ ব্যাপারে ট্রাক্টর নিয়োগ করিলে পশুশক্তির ব্যবহার পরিহার করা যায় এবং মানবশ্রমকে বিশেষ পরিমাণে সহায়তা করা হয়। আবার 'কম্বাইন ড্রিল' (combine drill) দ্বারা একই সংগে শস্য বপন ও সার প্রোথিত করার কার্য সমাধা করা যায়; অথচ ইহাতে পশুশক্তির ব্যবহারের প্রয়োজন মোটেই হয় না। বর্তমানে অন্যান্য এরূপ সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, জমি চাষোপযোগী করা হইতে ফসল কর্তন অবধি সকল পর্যায়েই পশুশক্তির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিহার এবং মানবশ্রমের পরিমাণকে বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করা যায়। ব্যাপক অর্থে যন্ত্রিকরণ বলিতে ইহাই বুঝায়।

যন্ত্রিকরণের অর্থ

ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না। যে-দেশে কৃষিকার্য শতকরা ৬৫ ভাগ লোকের জীবিকা, যে-দেশে বিশেষ করিয়া পদ্ধতিজনিত ত্রুটির জন্য কৃষিকার্য অনগ্রসর সে-দেশের কৃষির উন্নয়নের জন্য যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা লইয়া সাফাই গাহিতে হয় না। উপরন্তু, বর্তমান ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় কৃষির ক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটিয়াছে। ভারতীয় কৃষককে আজ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইল পণ্যের গুণবৃদ্ধি ও উৎপাদনের ব্যয়হ্রাস। এই দুইটিই কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। পণ্ডিত নেহরুর ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, সাম্প্রতিক আবিষ্কার অনুযায়ীই আমাদের উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে; পুরাতন পদ্ধতিতে চলিলে আমরা কোনমতেই বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারিব না। পরিশেষে, কৃষিকার্যের সহিত সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয় আছে—যথা, মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি, যাহা যান্ত্রিক কৃষি ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না।

যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা

যন্ত্রিকরণের অসুবিধা (Difficulties of Mechanisation) : ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে উপরি-উক্তভাবে ওকালতি করা গেলেও ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, দেখা প্রয়োজন যে ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণ বিশেষ কাম্য হইলে বর্তমানে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব কি না?

অন্তরায় :
১। কৃষি-জোতের ক্ষুদ্রতা

ব্যাপক প্রয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হইল কৃষি-জোতের ক্ষুদ্রতা ও অসম্বদ্ধতা। সুতরাং জোতের সংহতিসাধনের ব্যবস্থা প্রথমে না করিয়া যন্ত্রিকরণের কথা চিন্তা করা যাইতে পারে না। এইজন্য অনেকে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, বর্তমানে

যন্ত্রিকরণ-ব্যবস্থা মাত্র সমবায়িক খামার এবং সরকারী মালিকানাভুক্ত পুনরুদ্ধৃত পতিত জমিগুলিতেই প্রবর্তিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যখন সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের (cooperative farming) প্রসারের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি-জোত বৃহদায়তন হইবে তখন ব্যাপক যন্ত্রিকরণের পথে অন্তরায় হিসাবে দেখা দিবে মূলধনের সমস্যা। যন্ত্রিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দেওয়া সমবায় সমিতির পক্ষে বর্তমানেই সম্ভব হইবে না; স্বাভাবিকভাবে ঐ ভূমিকা সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার ফলে সরকারী নিয়ন্ত্রণও ব্যাপক হইয়া উঠিবে। ব্যাপক সরকারী নিয়ন্ত্রণ সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সহিত কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াই এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

২। মূলধনের সমস্যা

তৃতীয়ত, কৃষির যন্ত্রিকরণের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত আছে কৃষি-শ্রমিকের বেকারত্বের প্রশ্ন। বর্তমানে ভূমিহীন কৃষক পরিবার হইল মোট কৃষি-শ্রমিক পরিবারের শতকরা ৫৭ ভাগ।* যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের ফলে ইহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিবে, কারণ অনেক কৃষি-শ্রমিকেরই আর নিয়োগের প্রয়োজন থাকিবে না। সুতরাং অনেকের মতে, বৃহদায়তন এবং কৃষিগত শিল্পের (agro-industries) সম্যক উন্নয়নের মাধ্যমে বা অন্যান্য উপায়ে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া যান্ত্রিক কৃষির ব্যাপক রূপ দেওয়া উচিত নয়।

৩। কৃষি-শ্রমিকের বেকারত্বের প্রশ্ন

চতুর্থত, যন্ত্রিকরণ-পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইলে বহুসংখ্যক অপ্রয়োজনীয় গো-মহিষাদির অপসারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের ন্যায় ধর্মান্ধ ও ভাবপ্রবণতার দেশে ইহা মোটেই সহজসাধ্য কার্য নহে।

৪। অপ্রয়োজনীয় গো-মহিষাদির সমস্যা

পঞ্চমত, যান্ত্রিক কৃষিকার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজন যন্ত্র-ব্যবহার শিক্ষার। কিন্তু যে-দেশে সাধারণ কৃষকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষারই অভাব রহিয়াছে সে-দেশে তাহারা রাতারাতি যন্ত্র-ব্যবহার করিতে শিখিয়া ফেলিবে এরূপ কল্পনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সুতরাং কৃষির যন্ত্রিকরণের জন্য আমাদিগকে ভাবীকালের কৃষকগণের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে।

৫। যন্ত্র-ব্যবহার শিক্ষার ব্যাপক রূপ দেওয়ার প্রশ্ন

ষষ্ঠত, কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে একরূপ ফসল উৎপাদনের বিশেষিকরণ (specialisation of crops) বুঝায়। কিন্তু ভারতীয় কৃষক বিশেষিকরণের সহিত পরিচিত নহে; বিশেষিকরণ তাহার আয়ত্তাধীনও নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে, সনাতন পদ্ধতিতে এবং অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সে কোনক্রমে কৃষিকর্ম সম্পাদন করিয়া চলে। সুতরাং, কৃষি-পদ্ধতির সর্বাংগীণ সংস্কারসাধনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের

৬। ফসল উৎপাদনের বিশেষিকরণের প্রশ্ন

---

* Report of the Second Agricultural Labour Enquiry

বিশেষিকরণের ব্যবস্থা না করিয়া যন্ত্রিকরণের আহ্বানে সাড়া দেওয়া যাইতে পারে না।

পরিশেষে, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শক্তি সরবরাহের প্রসার প্রভৃতিও যান্ত্রিক কৃষির পক্ষে অপরিহার্য। কৃষিতে যন্ত্রনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া আর অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করা চলে না। সুতরাং যন্ত্রিকরণের পূর্বেই সেচ-ব্যবস্থার পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতিসাধন করিতে হইবে। অপরদিকে আবার যন্ত্র-ব্যবহারের জন্য শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন। এই শক্তি প্রধানত তৈল হইতে উদ্ভূত। সুতরাং তৈলের উৎপাদন ও সরবরাহ বিশেষভাবে না বাড়িলে কৃষির যন্ত্রিকরণের ব্যাপক রূপদানের প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে না।

৭। সেচ-ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির অপরিহার্যতা

উপসংহার ঃ উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, বর্তমান ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইলেও উহার অনুসরণের পথে বহু প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যন্ত্রিকরণকে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিয়া কার্য সুরু করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রবর্তনের দিক দিয়া প্রথম সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বা সমবায়িক খামারগুলিকে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে, যন্ত্র প্রয়োগের দিক দিয়া হাল্‌কা ধরনের ট্রাক্টর প্রভৃতির প্রয়োগ নির্দেশ করা যাইতে পারে, ইত্যাদি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষির যন্ত্রিকরণ দীর্ঘকালীন কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র; সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতেই ইহার উপলব্ধি সম্ভবপর।

কৃষির যন্ত্রিকরণ দীর্ঘকালীন কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অংশ

কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়াস (Steps taken towards Mechanisation of Agriculture) ঃ ভারতে যন্ত্রিকরণের প্রথম প্রয়াস হিসাবে ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর-সংগঠনের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিতে হয়।* এই সংগঠন বর্তমানে এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর কতকগুলি রাজ্য সরকারও তাহাদের নিজস্ব ট্রাক্টর-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পতিত জমির পুনরুদ্ধার করা ট্রাক্টর-সংগঠনগুলির প্রধান কার্য হইলেও, সাধারণ কৃষিকার্য বা ভূমিকর্ষণের কার্যেও ইহাদিগকে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় কৃষকগণকে ইহা আবার ভাড়াও দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর-সংগঠন ও যান্ত্রিক কৃষির সূচনা

রাজ্য সরকারসমূহের ট্রাক্টর-সংগঠন

কিছুদিন পূর্বে অনেক শিক্ষিত ও উৎসাহী ভূস্বামিগণ ট্রাক্টরের সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে—অর্থাৎ, সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই কৃষিকার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু বর্তমানে কৃষি-জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের (fixation of ceiling) জন্য ভূস্বামিবর্গের মধ্যে এ-বিষয়ে উৎসাহ হ্রাস পাইয়াছে। তাহা হইলেও বৈদেশিক মুদ্রাসংকটহেতু দেশের মধ্যে ট্রাক্টর নির্মাণের কার্য সুরু হইয়াছে। মাদ্রাজের একটি

প্রতিষ্ঠান একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত সহযোগিতায় ট্রাক্টরের বিভিন্ন অংশ আমদানি করিয়া ট্রাক্টর নির্মাণকার্য করিতেছে। একটি জার্মান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উড়িষ্যায় আর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানও এই কার্য সুরু করিয়াছে। ট্রাক্টর চালনা-কার্যে শিক্ষাদানের জন্য ভূপালে একটি যান্ত্রিক কৃষিখামার স্থাপন করা হইয়াছে; এবং তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে আরও একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা আছে।

অবশ্য, কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে শুধু ট্রাক্টর নিয়োগই বুঝায় না, কৃষিকার্যে মানব ও পশুশ্রমলাঘবকারী অন্যান্য যন্ত্রের ব্যবহারও বুঝায়। এইদিকেও কার্য সুরু হইয়াছে বলা চলে। কিছু দিন হইতে কৃষিকার্যে ইলেক্‌ট্রিক মোটর, ডিজেল ইঞ্জিন প্রভৃতি অন্যান্য শক্তিচালিত যন্ত্রসমূহের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে আমাদের দেশে এই সকল যন্ত্রপাতি নির্মিত হইতেছে। 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া সরকার এইদিকেও নানাভাবে আর্থিক সাহায্য করিতেছে। অনেক সময় কৃষকগণকে যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য দীর্ঘকালীন ঋণদান করা হয়; অনেক সময় আবার যন্ত্রাদি ভাড়াও দেওয়া হয়।

কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে শুধু ট্রাক্টর নিয়োগই বুঝায় না

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩০ লক্ষ একরের মত জমিকে যান্ত্রিক কৃষির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও পুনরুদ্ধৃত জমির একাংশে যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও উহা করা হইবে।

জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ (Japanese Method of Paddy Cultivation): আত্যন্তিক পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ—যাহাকে সাধারণত জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ বলিয়া অভিহিত করা হয়, কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়নের আর একটি দিক। প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে ২১ লক্ষ একর জমিতে এই উন্নত পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ করা হয়। ১৯৬১ সালের শেষ পর্যন্ত মোট ১ কোটি একরের উপর ধান্যের জমি এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

উন্নততর বীজ উৎপাদন-ব্যবস্থা ও রবিশস্য উৎপাদন অভিযান (Production of Improved Seeds and Rabi Production Campaign): পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায়, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময় হইতে উন্নততর বীজ উৎপাদনের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪০০০ বীজ উৎপাদনের খামার (seed farms) স্থাপন করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথমেই এইরূপ আরও ৮০০ খামার স্থাপন করা হইয়াছে।*

অন্ধ্রপ্রদেশে, বিহার প্রভৃতি ৯টি রাজ্যে রবিশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য এক আত্যন্তিক অভিযান চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। মূলত ইহার ফলেই গম বার্লি ছোলা ও জোয়ার এই চারিটি রবিশস্যের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* Third Five Year Plan ৩১২ পৃষ্ঠা

মিশ্র কৃষিকার্য (Mixed Farming) : মিশ্র কৃষিকার্যও কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়নের সহিত সম্পর্কিত। মিশ্র কৃষিকার্য বলিতে বুঝায় একই কৃষিগত সংগঠন হইতে এক বা একাধিক ফসল ও নানাপ্রকার প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদন করা। অর্থাৎ, কৃষক যদি নানাবিধ ফসল উৎপাদনের সহিত গো-মহিষ, হাঁস-মুরগী, মৌমাছি প্রভৃতি পালন করে, শাকসব্জির বাগান ইত্যাদি করে, তবে এইরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থাকে মিশ্র কৃষিকার্য বলা হয়। ১৯৫০ সালের দ্বিতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশন ভারতে মিশ্র কৃষিকার্য ব্যাপকভাবে গ্রহণের সুপারিশ করার পর হইতে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে এইরূপ ব্যবস্থার গুণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই গুণ বা সুবিধাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়।

মিশ্র কৃষিকার্য কাহাকে বলে

এই ব্যবস্থার গুণ

প্রথমত, মিশ্র কৃষিকার্য কৃষিক্ষেত্রে অর্ধ-নিয়োগের (underemployment) সমস্যার অনেকাংশে সমাধান করিবে। দ্বিতীয়ত, পূর্ণ নিয়োগের ফলে তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়া জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে। তৃতীয়ত, মিশ্র কৃষিকার্য একরূপ স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা (a system of natural insurance)। অন্যান্য পার্শ্বজীবিকা হইতে আয়ের জন্য কৃষককে একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিতে হইবে না, বৃষ্টিপাতের আশায় আকাশের দিকেও তাকাইয়া থাকিতে হইবে না। চতুর্থত, মিশ্র কৃষিকার্য কৃষককে খাদ্যে অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলে। গো-মহিষ, হাঁস-মুরগী, মৎস্য ইত্যাদি হইতে প্রাণিজ খাদ্য পাইলে তাহার আহার্য দ্রব্যের খাদ্য-মূল্য (food value) বাড়িয়া যাইবে। পরিশেষে, ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের মতে, ভারতের খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য অন্যান্য প্রতিবিধানের সহিত মিশ্র কৃষিকার্যও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; এক একটি ক্ষেত হইতে মাত্র এক একটি ফসল তুলিয়া ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য যোগানো সম্ভব হইবে না।*

কিন্তু মিশ্র কৃষিকার্যের ব্যাপক রূপদানের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইল জোতের ক্ষুদ্রতা ও কৃষকের আর্থিক সংগতির অভাব। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন হইল জোতের সংহতিসাধন ও কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের। দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তনে মিশ্র কৃষিকার্য কৃষকের নিকট হইতে পরিবর্তিত এবং উন্নততর দক্ষতা ও কৌশল দাবি করে। ইহা হইল শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্ন। সুতরাং ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের পূর্বে মিশ্র কৃষিকার্যের ব্যাপক রূপের কল্পনা করা একরূপ অযৌক্তিক। তৃতীয়ত, ভারতীয় কৃষকের ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারও মিশ্র কৃষিকার্যের পক্ষে অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কৃষকগণ শূকর পালন করিতে চাহিতেছে না অথবা যে-পদ্ধতিতে গো-পালন করা উচিত সে-পদ্ধতিতে গো-পালন করিতে অস্বীকার করিতেছে। পরিশেষে বলা যায়,

প্রতিবন্ধক

* Report on India's Food Crisis and Steps to meet it

কৃষিজ দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়ন না করিয়া ব্যাপকভাবে মিশ্র কৃষিকার্য প্রবর্তন করিতে বলা অর্থহীন। বিক্রয়-ব্যবস্থার সংস্কার ব্যতিরেকে অনেক সময় হয়ত মিশ্র কৃষিকার্যের ব্যয়ই সংকুলান হইবে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কৃষক আবার সাধারণ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইবে।

উপসংহার

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মিশ্র কৃষিকার্য কৃষির অন্যান্য দিকের সংস্কারের প্রশ্নের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। কৃষির ভূমিগত, মূলধনগত এবং সংগঠনগত অধিকাংশ সমস্যার সমাধান না করিয়া মিশ্র কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হওয়া চলিতে পারে না। অনেকে তাই এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, কৃষির দীর্ঘকালীন উন্নয়নের পরিকল্পনার অন্যতম অংগ হিসাবেই মিশ্র কৃষিকার্যকে গ্রহণ করা উচিত—এককভাবে নহে।

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the main defects of the present system of Agricultural Marketing. Suggest remedies which you consider desirable. (C. U. B. A. 1952) (১১০-১১১ এবং ১১১-১১৫ পৃষ্ঠা)

2. Review the measures that have been adopted to improve the system of agricultural marketing in India.

[ইংগিত: পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা ও গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থাকে পরস্পরের অংগীভূত করিয়া উভয়ের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই উন্নয়নের ভিত্তি হইল সমবায় পদ্ধতি। ১১১-১১৫ পৃষ্ঠা এবং সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত অধ্যায় দেখ।]

3. Point out the main defects in the existing method of agriculture. How would you remedy them ?

[প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ১১৫-১১৬ পৃষ্ঠা দেখ। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত: কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ দূরিকরণার্থে যে-সকল প্রতিবিধানের নির্দেশ করা হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান: (ক) কৃষিকার্যে পশুশক্তির ভূমিকাকে লঘু করা, (খ) কৃষিজমির পর্যাপ্ত ব্যবহার করা, (গ) উন্নততর বীজ, সার সরবরাহ এবং কৃষিজমিতে জলসেচ করা, এবং (ঘ) যথাসম্ভব যন্ত্রিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা।

ভারতে যন্ত্রিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে কৃষিকার্য বৃহদায়তনে সম্পন্ন করিতে হইবে। বস্তুত,ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদন বর্তমান ভারতীয় কৃষির অন্যতম প্রধান ত্রুটি। সুতরাং যন্ত্রিকরণ এবং অন্যান্য ব্যয়সংক্ষেপের (economies) প্রয়োজনে বৃহদায়তন কৃষির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু যন্ত্রিকরণের পথে বহু প্রতিবন্ধক থাকার দরুন এ-পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। স্বাভাবিকভাবেই কৃষিকার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন হইল দীর্ঘকালীন উন্নয়নের প্রশ্ন এবং ১১৭-১২২ পৃষ্ঠা দেখ।]

4. Discuss the possibilities and limitations of Mechanised Farming in India. (C. U. B. A. 1951, '55)

[ইংগিত: যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা কর।......(১১৭-১১৯ পৃষ্ঠা)]

5. Discuss the merits and possibilities of Mixed Farming in this country. What are the obstacles in its way ? (C. U. B. Com. 1950) (১২১-১২২ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন

(Cooperative Movement in India)

সমবায়ের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য (Meaning and Features of Cooperation) : 'সমবায়' ব্যবসায়-সংগঠনের অন্যতম রূপ। ইহার নানারূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্যালভার্ট (Calvert) প্রদত্ত সংজ্ঞা হইল এইরূপ : কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন কোন অর্থনৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে সাম্যের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছায় পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখন তাহাকে সমবায় আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯১৪ সালের ভারতের ম্যাকলাগান কমিটির (Maclagan Committee) রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে সমবায়ের মাধ্যমেই দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসমুদয় ধনীদের ন্যায় অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ভোগ করিতে পারে; ফলে, তাহারা নিরবলম্ব হইয়াও নিজেদের বিকশিত করিতে সমর্থ হয়। দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্য, প্রকৃষ্টতর ব্যবসায় এবং প্রকৃষ্টতর জীবনযাত্রা (better farming, better business and better living) সম্ভব করিয়া তোলাই সমবায়ের আদর্শ।

সমবায়ের সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞা দুইটি বিশ্লেষণ করিলে সমবায়ের কয়েকটি নীতি বা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, সমবায় সূচনা হয় দারিদ্র্যের পীড়নে। আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণই সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইয়া অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে চায়। দরিদ্রের বিশেষ কোন মূলধন থাকিতে পারে না। মূলধন তাহাদের সংগঠনের ভিত্তিও হইতে পারে না। অতএব. সমবায় সমিতির সদস্যগণ মূলধন-মালিক হিসাবে নয়, সাধারণ মানুষ হিসাবেই সম্মিলিত হয়।

সমবায়ের নীতি বা বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়ত, সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সাম্যের সম্পর্ক। একই স্বার্থের ভিত্তিতে সদস্যগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হয় বলিয়া প্রত্যেকেই একাধারে শ্রমিক ও মালিক, একাধারে পরিচালক ও কর্মচারী।

তৃতীয়ত, সমবায় সমিতিতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে এবং ইচ্ছামত উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে। প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য কার্য করিবে ইহাই সমবায়ের নীতি। সদস্যপদ স্বেচ্ছামূলক না হইলে এই নীতি কার্যকর হয় না।

পরিশেষে, সমবায় সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার করা। সুতরাং, সদস্যগণ ছাড়া অন্য কাহারও স্বার্থের প্রতি এবং সদস্যগণের বেলাতেও অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনপ্রকার স্বার্থের প্রতি সমিতি দৃষ্টি দেয় না।

দেখা যাইতেছে, সমবায় মানুষকে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে অবস্থার উন্নতিসাধনের পথনির্দেশ করে। সুতরাং, যাহারা দরিদ্র, যাহাদের সম্বল অতি সামান্য, যাহারা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিয়া যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী।

যে যে ক্ষেত্রে সমবায় বিশেষ উপযোগী

ভারতের ন্যায় দেশে কৃষির ক্ষেত্রে ইহাকে অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এরূপ দেশে কৃষকই সর্বাপেক্ষা নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। তাহার ক্ষুদ্র জোত খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ বলিয়া, কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা বিশেষ ত্রুটিসম্পন্ন বলিয়া, ঋণ-ব্যবস্থা অসংগঠিত বলিয়া কৃষি হইতে সে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলে। এই অবস্থার অবসানকল্পে সমবায় আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই বলিলেই হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পেও সমবায়-ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হইতে পারে। কারণ, এইরূপ শিল্পে অধিক মূলধন বা বিশেষ পরিচালনার দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী। নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করা হইলে দামে সুবিধা হয় এবং ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে সমিতির যে লাভ হয় তাহাও সভ্যগণের মধ্যে বণ্টিত হয়। অবশ্য সমবায়িক কার্যকলাপের মধ্যে সুবিধাজনক সর্তে ঋণদান করাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। মাত্র কৃষকের নহে, মধ্যবিত্তদেরও স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ভারতে সমবায় আন্দোলন সুরু করা হইয়াছিল।

বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি (Different Types of Cooperative Societies) : জার্মেনী সমবায় আন্দোলনের জন্মভূমি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম ঐ দেশে দুই ধরনের সমবায় সমিতি প্রবর্তন করা হয়—যথা, গ্রামীণ (rural), এবং পৌর (urban)। গ্রামীণ সমিতিগুলি কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দান করেন রাইফিজেন (Raiffeisen) নামক একজন সমাজ-সংস্কারক। রাইফিজেন দেখিয়াছিলেন যে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখদৈন্যের মূলে রহিয়াছে সামান্য সুদে সহজলভ্য ঋণের অভাব এবং শোষণকারী মহাজনদের নিকট চিরস্থায়ীভাবে ঋণগ্রস্ততা। এই অবস্থার অবসানকল্পে তিনি যে-প্রকার সমিত প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে 'রাইফিজেন ধরনের সমিতি' (Raiffeisen Type of Societies) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভারতের ন্যায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গ্রামাঞ্চলের সমিতিগুলি এই রাইফিজেন ধরনের সমিতির অনুকরণে গঠিত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ : (১) সমিতির কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে এবং ফলে

গ্রামীণ ও পৌর সমিতি

গ্রামীণ সমিতিকে 'রাইফিজেন ধরনের সমিতি' বলা হয়

সমিতি মাত্র পরিচিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়; (২) সদস্যদের দায় বা দায়িত্ব অসীম (unlimited) হয়; (৩) মাত্র উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে (productive purposes) বা বিশেষ বিশেষ কারণে ঋণদান করা হয় —যথা, নূতন জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরাতন জমির উন্নয়ন, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ইত্যাদি।

ইহার বৈশিষ্ট্য

জার্মেনীর নগরাঞ্চলে দরিদ্র কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমবায় নীতি প্রবর্তন করেন সমাজসেবী স্যুলজ-ডেলিতস্ (Schultze-Delitsch)। সুতরাং, এই ধরনের সমিতি 'স্যুলজ-ডেলিতস্ ধরনের সমিতি' বলিয়া পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই পৌর সমবায় সমিতিগুলি এই স্যুলজ-ডেলিতস্ ধরনের। এই প্রকার সমিতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়: (১) সমিতি অপরিচিত ব্যক্তিদের লইয়াও গঠিত হয় এবং ইহার কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না; (২) সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (limited) থাকে; (৩) সদস্য কোন্ উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ করিতেছে তাহার বিচার বিশেষ করা হয় না।

১। পৌর সমিতি স্যুলজ-ডেলিতস্ ধরনের বলিয়া অভিহিত

ইহার বৈশিষ্ট্য

রাইফিজেন এবং স্যুলজ-ডেলিতস্ উভয় ধরনের সমবায় সমিতিই 'প্রধানত' ঋণদান সমিতি (credit society)।* কিন্তু ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনের কার্যকারিতা রহিয়াছে—যথা, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন, যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, বিক্রয়-ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ, বীমাকার্য ইত্যাদি কার্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়া অতি সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া শহরাঞ্চলে ভোগকারীরা সমবায় গঠন করে; এই সব 'ভোগকারীর সমবায়' (Consumers' Cooperatives) সরাসরি উৎপাদকের নিকট হইতে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় করে। ভারতে সমবায়ের এই বিভিন্ন রূপের প্রত্যেকটির অল্পবিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া হয়।

২। ঋণদান ও অন্যান্য প্রকার সমিতি

উপরি-উক্ত সকল ধরনের সমবায় সমিতি অবশ্য এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়—যথা, হয় তাহারা ঋণদান করে, না-হয় ভোগ্যদ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করে, অথবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। এ-ধরনের সমিতিকে এক-উদ্দেশ্যসাধক (single-purpose) সমিতি বলা হয়। কিন্তু সমবায় সমিতি বহু-উদ্দেশ্যসাধক (multi-purpose) হইতে পারে। অর্থাৎ, সমিতি একই সংগে ঋণদান, বিক্রয়-ব্যবস্থা, ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ, উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। ১৯৪৫ সালে সমবায় পরিকল্পনা কমিটির (Cooperative Planning

৩। এক-উদ্দেশ্য-সাধক এবং বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি

* ঋণদান ছাড়াও ইহারা অন্যান্য কার্য করিতে পারে; তবে সাধারণত ইহারা ঋণদানেই ইহাদের কার্যকে সীমাবদ্ধ রাখে।

Committee) রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর ভারতে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি স্থাপনের হিড়িক পড়িয়া যায়। কিন্তু ১৯৫৪ সালে সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহাতে ভাঁটা পড়িয়াছে। অপরদিকে ইহারই একপ্রকার পরিবর্তিত রূপ সেবা সমবায় সমিতি (service cooperatives) গঠনের ঝোঁক দেখা দিয়াছে।

সেবা সমবায়

ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Short History of the Cooperative Movement in India) :

ভারতে সমবায় আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে নাই, ইহা সরকার কর্তৃক সূচিত হইয়াছে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে মহাজনদের কবলে পড়িয়া কৃষকদের দুর্দশা চরমে পৌছায়। তাহাদের ঋণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সমবায় আন্দোলন প্রবর্তনের পরিকল্পনা করিয়া সরকার সিভিলিয়ান ফ্রেডারিক নিকলসনকে জার্মেনীর গ্রামীণ সমবায় সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য ঐ দেশে প্রেরণ করে। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত তাঁহার রিপোর্টে নিকলসন ভারতে জার্মেনীর রাইফিজেন ধরনের ঋণদান সমবায় সমিতি প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। মূলত এই সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৯০৪ সালের সমবায় ঋণদান সমিতি আইন (Cooperative Credit Societies Act, 1904) পাস হয়।

নিকলসনের রিপোর্ট

আইনটির উদ্দেশ্য ছিল "কৃষক, কারিগর ও স্বল্পসহায়সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, আত্মনির্ভরতা এবং সমবায় নীতির প্রসারসাধন।" এই আইন দ্বারা কেবলমাত্র প্রাথমিক ঋণদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতিগুলিকে গ্রামীণ ও পৌর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। গ্রামীণ সমিতিগুলি রাইফিজেন ধরনকে অনুসরণ করে।

১৯০৪ সালের আইন ও ঋণদান সমিতি

কিছুদিনের মধ্যেই ১৯০৪ সালের আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে ১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইন পাস হয়। এই আইন দ্বারা—(১) ঋণদান সমিতি ছাড়া ক্রয়বিক্রয়, উৎপাদন প্রভৃতি অন্যান্য প্রকারের সমিতিগুলি স্বীকৃত হয়। (২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।* (৩) সমিতিগুলিকে গ্রামীণ এবং পৌর এইভাবে বিভক্ত করার পরিবর্তে সসীম ও অসীম দায়যুক্ত (Limited and Unlimited Liability Societies)—এইভাবে বিভক্ত করা হয়।

১৯১২ সালের আইন—ইহার বৈশিষ্ট্য

১৯১২ সালের পর সমবায় আন্দোলন দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে। সমিতি-সংখ্যা, সদস্যসংখ্যা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দুগ্ধ

* প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯১৫ সালের ম্যাক্‌লাগান কমিটির সুপারিশের পর।

সরবরাহ, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, গবাদি পশু-বীমা, সূতা ও সা রক্রয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নূতন নূতন ধরনের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিচারবিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য ১৯১৪ সালে সরকার ম্যাক্‌লাগান (Maclagan) কমিটি নিযুক্ত করে। এই কমিটি যে-রিপোর্ট দাখিল করে তাহাতে সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রসার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সরকার কমিটির প্রস্তাবসমূহকে কার্যকর করিতে পারে নাই। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইনে সমবায় বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের হস্তান্তরিত ক্ষমতাভুক্ত হইলে বিভিন্ন প্রদেশ আপনাপন প্রয়োজন অনুসারে নিজস্ব সমবায় আইন প্রবর্তন করিতে থাকে এবং আন্দোলনও আশাতীতভাবে প্রসারিত হইতে থাকে। কিন্তু ১৯২৯ সাল হইতে বিশ্বব্যাপী মন্দা-বাজারের (Worldwide Trade Depression) ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় সমবায় আন্দোলন এক মহাসংকটের সম্মুখীন হয়। সমিতিগুলির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বহু কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। তখন সরকারকে সমবায় আন্দোলনের সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার সহিত কৃষিঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) সংযুক্ত করা হয়। ইহা সমবায় আন্দোলনকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে থাকে।

ম্যাক্‌লাগান কমিটি

১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইন ও সমবায়

মন্দাবাজার ও সমবায়ের সংকট

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয় তখনও সমবায় আন্দোলন আপন অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য সমবায় আন্দোলন পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত কৃষিজ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে; ফলে সমিতিগুলির অবস্থাতেও উন্নতি দেখা দেয়। দীর্ঘকালীন অনাদায়ী ঋণ কমিয়া গিয়া প্রায় অর্ধেকে দাঁড়ায়; সমিতি এবং তাহাদের সদস্যসংখ্যাও যথাক্রমে ৪১ এবং ৭০ ভাগের মত বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত একাধিক প্রদেশে ভোগকারীদের সমবায় সমিতি এবং সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি (Marketing Societies) গঠিত হয়। ছোটখাট শিল্পগুলিকেও সরকারী সমবায় দপ্তর নানাভাবে সাহায্যদান করিতে থাকে। এই সকলের ফলে সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলন পায় এক নূতন প্রেরণা। তবুও সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থায় সমবায় আন্দোলন যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা যুদ্ধোত্তর স্বাভাবিক অবস্থায় স্থায়ী হইবে কি না?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সমবায় আন্দোলনের প্রসার

১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই সরকার সমবায় পরিকল্পনা কমিটি নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। কমিটি সুপারিশ করে যে প্রাথমিক

এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলিকে যথাসম্ভব বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিতে পরিণত করিতে হইবে এবং ১০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ গ্রাম ও শতকরা ৩০ ভাগ জনসংখ্যাকে এই প্রকার বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির অভ্যন্তরে আনয়ন করিতে হইবে। কমিটির সুপারিশ মত কার্য সুরু হইবার পূর্বেই আসিল দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা।

সমবায় পরিকল্পনা কমিটি

স্বাধীন ভারতে সমবায় আন্দোলন (Cooperative Movement in Free India)ঃ স্বাধীনতা ভারতের সমবায় আন্দোলনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। স্বাধীনতালাভের পর আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতিতে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

প্রথমত, সমিতি ও সদস্যসংখ্যা এবং কার্যকরী মূলধনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ অবিচ্ছিন্নভাবেই হইয়া চলিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে সকল প্রকার সমিতির সংখ্যা ১·৩৯ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৩·১৪ লক্ষে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণও ১৫৬ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০৮৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়। সদস্যসংখ্যাও এরূপ বৃদ্ধি পায় যে ১৫ কোটি লোক বা জনসংখ্যার শতকরা ৩৮ ভাগ সমবায় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে।*

বৈশিষ্ট্য : ১। আন্দোলনের প্রভূত প্রসার

দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের বিভিন্ন দিকে শাখা বিস্তার করিবার প্রবণতা দেখা দিলেও এবং বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিলেও কৃষিঋণদান সমিতিগুলির প্রাধান্য এখনও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ১৯৬১ সালের জুন মাসে এই প্রকার সমিতির সংখ্যাই ছিল ২·১৩ লক্ষ বা মোট সমিতিসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।**

২। কৃষিঋণদান সমিতিগুলির অপরিবর্তিত প্রাধান্য

তৃতীয়ত, বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির প্রবর্তন সমবায় আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৫ সালের সমবায় পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্ট অনুসারে স্বাধীন ভারতে এ-বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ফলে এইরূপ সমিতির সংখ্যা ও সদস্যসংখ্যা বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১-৫২ সালে এইরূপ সমিতি ও উহাদের সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪০ হাজার এবং ২১·৫ লক্ষ। ১৯৫৪ সালে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে অবশ্য এই গতিতে বাধা পড়ে, কারণ জরিপ কমিটি বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির পরিবর্তে প্রধানত ঋণ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করিতেই উপদেশ দেয়।

৩। বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির প্রবর্তন আর একটি বৈশিষ্ট্য

* Statistical Statements relating to the Cooperative Movement in India for the year 1959-60

** Annual Report of the Ministry of Community Development and Cooperation for 1961-62

চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে রিজার্ভ ব্যাংক আন্দোলনকে সাহায্য করিতেছে। সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে কৃষি সংক্রান্ত কাজ-কারবার, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অধিকমাত্রায় অর্থসাহায্য করিতেছে; ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় ঋণদান-ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও প্রসারসাধন কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতেছে।

৪। রিজার্ভ ব্যাংক ও সমবায় আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

পঞ্চমত, সমবায় আন্দোলনকে অধিকমাত্রায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির অনুগামী করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের সহিত আন্দোলনের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশ যে-সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহার সমাধানে সমবায় আন্দোলনকে নিয়োজিত করা হয়। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, দুষ্প্রাপ্য নিয়ন্ত্রিত খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের বণ্টনের ভার সমবায়ের উপর পড়ে। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে-প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতেও সমবায় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সমবায় কৃষি-সমিতি, সেচ-সমিতি প্রভৃতি ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠানও কৃষিজ উৎপাদনকে বৃদ্ধি করিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতেছে। জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি তাহাদের ঋণদানের নীতিকে পরিবর্তিত করিয়া পূর্বের তুলনায় জমি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে ঋণদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

৫। সমবায় আন্দোলনকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির অনুগামিকরণ

শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন এবং নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সমবায় পন্থার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের সংগঠন ও প্রসারসাধনের জন্য সমবায় পন্থাই প্রকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

সমবায় ও পরিকল্পিত উন্নয়ন (Cooperation and Planned Development): গণতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সমাজতন্ত্র অভিমুখে প্রসারিত ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় স্বতই সমবায়ের জন্য এক বিশিষ্ট এবং উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়; স্বতই ঐ পরিকল্পনায় সমবায়ের উপর এক গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। শুধু কৃষি কেন, অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিসাধনের ও কাম্য বিকেন্দ্রিকরণের জন্য সমবায় পন্থাকে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের প্রসারের জন্যও পরিকল্পনায় সমবায় গঠনের উপর

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায় পন্থার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ

* Third Five Year Plan ২০০ পৃষ্ঠা

অনেকাংশে নির্ভর করা হয়। এমনকি মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প, পরিবহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমবায় প্রয়োগ করিয়া উহাদের দ্রুত উন্নতি ঘটানো যায়। উপরন্তু, সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতির অন্যান্য বিভাগে বিকেন্দ্রিকরণের ব্যবস্থা করিতে হয়। সমবায়ের মাধ্যমেই ইহা করা সম্ভব। ইহা ছাড়া সমবায় পন্থায় পল্লী সংগঠন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতের ন্যায় পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রথম পরিকল্পনার ন্যায় পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও সমবায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ (১৯৫৪ সাল) অনুসারে গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থার যে পূর্ণাংগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় তাহা পুনর্গঠিত সমবায় সংগঠনের উপর ভিত্তি করিয়াই করা হয়। ঐ পরিকল্পনাতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং নিয়োগের সংস্থান করিবার দায়িত্ব বহুলাংশে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উপর ন্যস্ত হয়। ফলে পূর্ণাংগ গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থা কার্যকর করা, কৃষি ও পল্লী সংগঠন করা ছাড়াও রাষ্ট্রকে শিল্পক্ষেত্রে সমবায়ের সম্প্রসারণে অধিকমাত্রায় সচেষ্ট হইতে হয়। ১৯৫৮ সালে পূর্বোল্লিখিত স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে অবশ্য এই গতিতে কিছুটা বাধা পড়ে।* এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সমবায়িক নীতির উপর প্রস্তাব (Resolution on Cooperative Policy) গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায় সমিতি গঠনের নীতি গৃহীত হয় এবং সমবায় ও পঞ্চায়েতের উপর গ্রামোন্নয়নের প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পণের কথা বলা হয়। ১৯৫৯ সালের নাগপুর কংগ্রেসে ঐ নীতিরই পুনরুল্লেখ করিয়া সেবা-সমবায় সমিতি (Service Cooperatives) এবং সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা সুরু হয়।** মোটামুটি এই নীতির ভিত্তিতে সমবায়িক ঋণ-কমিটির (Committee on Cooperative Credit) সুপারিশ অনুসারে ব্যাপকতর তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়ের জন্য ব্যাপকতর কার্যক্রমই গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ের তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়ের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ৮০ কোটি টাকা। এই সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

সমবায় সমিতির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Cooperative Societies) : ভারতের সমবায় সমিতিগুলিকে প্রথমত প্রাথমিক এবং কেন্দ্রীয়—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক সমিতিগুলি (Primary Societies) সদস্যদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, আর কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সহিত সম্পর্কিত। প্রাথমিক সমিতিগুলিকে আবার ঋণদান সমিতি ও অ-ঋণদান সমিতি

* ৩৬ এবং ১০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

** Implementation of Nagpur Resolution—AICC Economic Review, May 1959

এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই দুই শ্রেণীর প্রত্যেকটির মধ্যেই কৃষি ও অ-কৃষি এই দুই প্রকারের সমিতি আছে। বীজ সার ও কৃষি-যন্ত্রপাতি সরবরাহ, জোতের সংহতিসাধন (consolidation of holdings), গৃহপালিত পশুর উন্নতিসাধন, সেচ, বীমা, বাজারিকরণ প্রভৃতি কার্য অ-ঋণদান কৃষি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়, গৃহনির্মাণ, সুলভে কারিগরদের উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত হইল অ-ঋণদান অ-কৃষি সমবায় সমিতি।

১। প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয়
২। ঋণদান ও অ-ঋণদান
৩। কৃষি ও অ-কৃষি সমিতি

প্রাথমিক সমিতিগুলিই সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি। ইহাদের মধ্যে আবার কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলিই সংখ্যায় সর্বাধিক। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ১৯৬১ সালের জুন মাসে কৃষি-ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল ২·১৩ লক্ষ বা সমগ্রের দুই-তৃতীয়াংশ।* প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতির এইরূপ গুরুত্বের জন্য ইহাদের সম্পর্কে সামান্য বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

কৃষি-ঋণদান সমিতির প্রাধান্য

প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমবায় সমিতি (Primary Agricultural Credit Societies): অনধিক ১০ জন সদস্য লইয়া এইরূপ সমিতি গঠিত হইতে পারে। প্রত্যেকটি সমিতির কার্যক্ষেত্র সাধারণত এক একটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; ইহার উদ্দেশ্য হইল পারস্পরিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যেই সমবায় এইরূপ সমিতিগুলি সাধারণত অসীম দায়ের (unlimited liability) ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া থাকে। মধ্যে অবশ্য গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সসীম দায়ের ভিত্তিতে বৃহদায়তন প্রাথমিক কৃষি সমিতির গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। পরে কিন্তু ১৯৫৮ সাল হইতে স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্টের ফলে সসীম দায়সম্পন্ন সমিতি গঠনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে।

গঠন

প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধন শেয়ার-বিক্রয়, সভ্যদের ভর্তি ফী, সংরক্ষিত তহবিল, সদস্যদের আমানত প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সূত্র এবং সরকারী ঋণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণ, সদস্য নয় এমন সমস্ত ব্যক্তির আমানত প্রভৃতি বহিঃসূত্র হইতে সংগৃহীত হয়।

সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধনের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারের উপর অধিক নির্ভরশীল। ১৯৫৯-৬০ সালে মোট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩৪ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে নিজস্ব তহবিল ও আমানতের পরিমাণ ৭৫ কোটি টাকারও কম ছিল। স্বতই বাকী অংশ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছিল।

বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা :

* Statistical Statements relating to the Cooperative Movement in India for the year 1959-60

আমানতের অপ্রতুলতা এবং ঋণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে সমবায় কৃষিঋণ আন্দোলন বিশেষ সফল হয় নাই—ইহা কৃষকগণকে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের শিক্ষা দিতে পারে নাই।*

১। আমানতের অপ্রতুলতা

সমিতিগুলির ঋণপ্রদান নীতি বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। উৎপাদন, অনুৎপাদনশীল কাজকর্ম এবং পূর্বতন ঋণ পরিশোধ, এই তিন বিশেষ উদ্দেশ্যে ঋণপ্রদান করা হইলে প্রদত্ত ঋণ ঠিকমত ব্যয়িত হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধান করা হয় না। উপরন্তু, কৃষির স্থায়ী উন্নতিসাধনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপও করা হয় না। সুদ সম্পর্কে নীতি হইল যে উহা যাহাতে কৃষকদের সামর্থ্যের বাহিরে না যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবুও দেখা যায়, কতিপয় রাজ্যে সুদের হার শতকরা ১২-র উপর। সম্প্রতি একটি কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে, সাধারণভাবে স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী ঋণের সুদের হার শতকরা ৭½-৮ এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদের হার শতকরা ৬½-এর অধিক না হওয়া উচিত।**

২। ঋণপ্রদান নীতি ত্রুটিপূর্ণ

৩। সুদের হারও অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক

ঋণদান বিষয়ে সমিতিগুলির বর্তমান অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে বাৎসরিক ঋণপ্রদানের পরিমাণ প্রায় ৯৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণও ৯৭ কোটি টাকা হইতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৮ কোটি টাকায় পরিণত হয়। এই অনাদায়ী ঋণের একটা মোটা অংশ হইল মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণ (overdues)।

৪। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণের ক্রমবৃদ্ধি

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোনদিক দিয়াই প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতিগুলির অবস্থা সন্তোষজনক নহে, অথচ ইহারাই ভারতের সমবায় সংগঠনের ভিত্তি। সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির মতে, এই ভিত্তির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে গ্রামীণ ঋণের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকে রূপদান করা সম্ভব হইবে না। এই উদ্দেশ্যে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতিগুলির কর্মক্ষেত্র বিস্তৃততর করিবার, সদস্যসংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য একাধিক গ্রাম লইয়া সমিতি গঠন করিবার, বৃহদাকারের সমিতিগুলিকে সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করিবার এবং পর্যাপ্ত শেয়ার-মূলধন নিশ্চিত করিবার জন্য সরকারকে অংশীদার হইবার সুপারিশ করে।

সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

১৯৫৪-৫৫ সাল হইতেই এই সকল সুপারিশ অনুসারে কৃষিঋণদান সমিতিগুলিকে পুনর্গঠিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বৃহদায়তন ও সসীম দায়ের ভিত্তিতে

* ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

** Report of the Committee on Takavi Loans and Cooperative Credit (1962)

গঠিত প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতির সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। পরে ১৯৫৮ সালে স্যর ম্যালকম ডার্লিং এই গতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে বিশেষ বিচারবিবেচনার সহিত অগ্রসর হইবার পরামর্শ দিলে এই গতি কিছুটা ব্যাহত হয়। কৃষিঋণদান সমিতিগুলিকে বৃহদায়তনে ও সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করার অর্থ হইল রাইফিজেন আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লওয়া। স্যর ম্যালকমের মতে, ইহা করিবার পূর্বে বিশেষ পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে কার্যকরী পরিষদ (Working Group) এই পরীক্ষানিরীক্ষার কার্য শেষ করিলে ১৯৫৯ সালের মে মাস হইতে ক্ষুদ্রায়তন সেবা-সমবায় (Service Cooperatives) সমিতি গঠনের নীতি অনুসৃত হইতে থাকে। এই সকল সেবা-সমবায় সমিতি সাধারণত এক একটি গ্রাম লইয়া অসীম দায়ের ভিত্তিতেই গঠিত হয়, কিন্তু যেখানে গ্রামের আয়তন অতি ক্ষুদ্র সেখানে সমিতির কার্যক্ষেত্র কিছুটা বিস্তৃততর করা হয়।* বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ভবিষ্যতে এইরূপ সেবা সমিতিগুলিই প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতির স্থানাধিকার করিবে, তবে রিজার্ভ ব্যাংকের পরবর্তী ঋণ জরিপকার্য (Second and Third Follow-up Surveys) যে বৃহদায়তন সমিতির সফলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার ফলে এই নীতি কিছুটা পরিবর্তিত হইতে পারে।

স্যর ম্যালকমের সমালোচনা

কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান (Central Cooperative Societies) : কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন তিন ধরনের হয়—যথা, তত্ত্বাবধানকারী ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়ন।

(১) তত্ত্বাবধানকারী ইউনিয়ন (Supervising Unions) : প্রত্যেক সমবায় ইউনিয়ন একাধিক প্রাথমিক সমিতি লইয়া গঠিত হয়। ইউনিয়নের কাজকর্মের ভার সভ্য-সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ইউনিয়ন কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। ইহাদের কার্যের মধ্যে অন্যতম হইল প্রাথমিক সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান করা এবং উহাদের সহিত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির সংযোগ স্থাপন করা। তত্ত্বাবধানকারী ইউনিয়নগুলির অধিকাংশই মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও অন্ধ্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যায় নিতান্ত স্বল্প না হইলেও ইউনিয়নগুলি বিশেষ সফলতা অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই।

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়ন (Central Banks and Banking Unions) : ভারতে প্রাথমিক সমিতিগুলির মূলধন পর্যাপ্ত নহে, এইজন্যই প্রয়োজন হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং রাজ্য ব্যাংকের মত কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের। ইহাদের সাহায্যে প্রাথমিক সমিতিগুলি নিজেদের কাজকর্মের জন্য বাহির হইতে অর্থের সংস্থান করিতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি প্রাথমিক সমিতিগুলির মূলধনের ঘাটতি বা

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির বৈশিষ্ট্য

* AICC Economic Review, May 1959

বাড়তির সমন্বয়সাধনের কেন্দ্র (balancing centre) হিসাবে কার্য করে। অর্থাৎ, যে-সমস্ত প্রাথমিক সমিতির হাতে বাড়তি মূলধন পড়িয়া থাকে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করিয়া যে-সমস্ত সমিতিতে অর্থের অভাব দেখা দেয় তাহাদের সাহায্য করে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির এইভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা অপেক্ষা মূলধন সংগ্রহ করিয়া প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থসাহায্য প্রদান করাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

অসন্তোষজনক অবস্থা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়নগুলির অবস্থাও বিশেষ সন্তোষজনক নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় সংগঠনের পক্ষে কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশ আসিবে নিজস্ব তহবিল (owned funds)—যথা, শেয়ার হইতে প্রাপ্ত অর্থ ও সংরক্ষিত তহবিল হইতে। কিন্তু দেখা যায়, অধিকাংশ মূলধন সংগৃহীত হয় ঋণ ও আমানতের মাধ্যমে। এ-অবস্থার পরিবর্তন বিশেষ প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রেও অনাদায়ী ঋণ ও মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। ইহাও সম্পূর্ণ অকাম্য ও সমবায়িক ঋণদান-ব্যবস্থার দুর্বলতার সূচক।

গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবস্থার উন্নতিকল্পে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি সাধারণ ক্ষেত্রে প্রত্যেক জেলায় মাত্র একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠন করিবার, রাজ্য সরকারকে শেয়ার-মূলধনের অন্তত শতকরা ৫১ ভাগ যোগান দিবার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাণিজ্যিক কাজকর্ম বন্ধ করিবার এবং মাত্র সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দিবার সুপারিশ করে।

উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি কিছু কিছু কার্যকর করার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির সংখ্যাহ্রাস ঘটিলেও অবস্থার কিছু কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। উহাদের মুনাফার পরিমাণ বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, কার্যকরী মূলধনের পরিমাণও সম্প্রসারিত হইয়াছে।*

রাজ্য সমবায় ব্যাংক (State Cooperative Banks): রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক সমবায় আন্দোলনের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। ১৯১৫ সালের ম্যাক্লাগান কমিটির সুপারিশ অনুসারে তৎপরবর্তী কালে বৃহৎ প্রদেশগুলিতে একটি করিয়া প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়।** কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে অর্থ-সাহায্য, তাহাদের কার্যের শৃংখলাসাধন ও তাহাদের কার্যকরী মূলধনের ঘাটতি-বাড়তির সমন্বয়সাধন করাই রাজ্য সমবায় ব্যাংকের কাজ। রাজ্য সমবায় ব্যাংক টাকার বাজারের সহিত সমবায় আন্দোলনের যোগসূত্র। রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্কও রাজ্য ব্যাংকের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। প্রয়োজন হইলে

* Report of the Ministry of Community Development and Cooperation for the year 1961-62

** পূর্বে ইহাদিগকে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক (Provincial Cooperative Bank) বলা হইত।

রাজ্য ব্যাংক সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে ঋণপ্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি আবার প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণদান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজ্য ব্যাংক পরোক্ষভাবে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণ পাইতে সাহায্য করিয়া থাকে।

কার্যাবলী

রাজ্য ব্যাংকগুলির গঠন সম্পর্কে বিভিন্নতা দেখা যায়। পশ্চিমবংগ ও পাঞ্জাবের সমবায় সমিতিগুলিই কেবল রাজ্য ব্যাংকের সদস্য হইতে পারে। অন্যান্য রাজ্যে রাজ্য সমবায় ব্যাংকে সমিতি ও ব্যক্তিবিশেষ উভয় শ্রেণীর সদস্যই আছে।

গঠন

দেখা যায়, মোটের উপর রাজ্য ব্যাংকগুলির অবস্থা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির তুলনায় অনেক ভাল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি অপেক্ষা উহাদের নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ বেশী, কিন্তু অনাদায়ী ও মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ কম। উপরন্তু, সদস্যসংখ্যা এবং শেয়ার-মূলধনও নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

রাজ্য সমবায় ব্যাংকের উন্নতিসাধনের জন্য সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে: (১) সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও রাজ্য ব্যাংকের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এমন অন্যান্য ব্যাংককেই রাজ্য ব্যাংকের সভ্যপদভুক্ত করা হইবে। ব্যক্তিবিশেষকে অতি অল্প সংখ্যায় সদস্যপদ দেওয়া যাইতে পারে। (২) রাজ্য সরকার শেয়ার-মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ যোগাইবে। (৩) ঋণদান বিষয়ে রাজ্য ব্যাংক কৃষি-ঋণদানকে প্রথম স্থান দিবে; ব্যবসায়িগণকে ঋণদান ক্রমশ কমাইয়া দিতে হইবে। (৪) রাজ্য ব্যাংককে সমবায় ব্যাংকের বাড়তি অর্থের জিম্মাদার করিতে হইবে; এইজন্য যাহাতে সমস্ত সমবায়িক কেন্দ্রীয় অর্থপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তাহাদের বাড়তি অর্থ রাজ্য ব্যাংকে বিনিয়োগ করে তাহার ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করিতে হইবে।

গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

সমবায়ের পুনর্গঠন কার্যে উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহকে কার্যকর করা হইতেছে। রাজ্য সরকারসমূহ উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান হারে রাজ্য ও অন্যান্য সমবায় ব্যাংকের শেয়ার-মূলধন যোগাইতেছে।

পৌর সমবায়িক ঋণ-ব্যবস্থা (Urban Credit): পৌর সমবায় ঋণদান আন্দোলনও উল্লেখযোগ্য। পৌর ঋণদান সমিতিগুলি নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের অথবা অফিসের কর্মচারী কিংবা কারখানার শ্রমিকদের মত নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদের ঋণদান করে। গ্রামীণ ও পৌর ঋণদান সমিতির মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রহিয়াছে। পৌর সমিতির সদস্যসংখ্যা অধিক হইতে পারে, সদস্যদের দায়িত্ব সাধারণত সীমাবদ্ধ এবং উচ্চ হারে লভ্যাংশ বণ্টন করিবার ব্যবস্থা থাকে। পৌর সমিতিগুলিকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—যথা (১) পৌর ব্যাংক (Urban Banks); (২) বেতনভুক কর্মচারীদের সমিতি, মিল-কর্মচারীদের সমিতি প্রভৃতি ধরনের সহরাঞ্চলের অন্যান্য ঋণদান সমিতি।

অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক সংক্রান্ত সকল রকমের কাজকর্মই পৌর সমবায়িক ব্যাংকগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহারা শুধু আমানত গ্রহণ ও ঋণদান করিয়াই থাকে। মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ রাজ্যেই পৌর ঋণদান সমিতিগুলি অধিক প্রসারলাভ করিয়াছে।

অন্যান্য ধরনের সমবায় (Other Aspects of Cooperation): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমবায়ের বিভিন্নমুখী প্রসার ঘটে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণের পর হইতে ইহা আরও ব্যাপক হয়। বর্তমানে শুধু ঋণদান নহে, বিভিন্ন উৎপাদন ও বিনিময় ক্ষেত্রেও সমবায়ের ভূমিকা রহিয়াছে। এখন প্রথমে উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করা হইতেছে।

(ক) সমবায় ও কৃষিজ উৎপাদন (Cooperation and Agricultural Production): কৃষির ক্ষেত্রে অধিক খাদ্য উৎপাদন, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি-জমির পরিমাণবৃদ্ধি, জমির ক্ষয় নিবারণ, জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা প্রতিরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কার্যের সহিত সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত আছে। ইহাদের মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালনা (Cooperative Farming) অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা।

কৃষিজ উৎপাদনের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকারের সমবায় সমিতির মধ্যে উপনিবেশন (Land Colonisation), পতিত জমির পুনরুদ্ধার (Land Reclamation), জমির জোতের সংহতিসাধন (Consolidation of Holdings) প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত সমবায় সমিতিসমূহই প্রধান। ইহারা সকল রাজ্যে সমভাবে প্রসারলাভ না করিলেও বর্তমানে মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে ইহাদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সমবায় নীতি বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়া আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায় পন্থায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ও যোগানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

(খ) সমবায় ও শিল্পজ উৎপাদন (Cooperation and Industrial Production): কৃষির ন্যায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় পন্থা বিশেষ উপযোগী। বস্তুত কৃষকদের মতই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট বলিয়া তাহাদিগকেও মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদির শরণাপন্নও হইতে হয়। ইহারাও কারিগরদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে স্বল্পমূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের জন্য নিয়মিতভাবে উৎকৃষ্ট

কুটিরশিল্পীদের সমস্যা

কাঁচামাল সরবরাহের অভাব কুটির শিল্পের একটি প্রধান দুর্বলতা। কুটিরশিল্পী বিচ্ছিন্নভাবে অল্প পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করে বলিয়া জিনিসও ভাল হয় না এবং দামও বেশী পড়ে। তৃতীয়ত, কুটির শিল্পের উপযোগী উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করাও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু

ইহা সহায়সম্বলহীন কুটিরশিল্পীদের আয়ত্তের বাহিরে এবং ফলে তাহাদের চিরাচরিত যন্ত্রপাতি লইয়াই কোন রকমে কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। চতুর্থত, দ্রব্যের বিক্রয়করণ-ব্যবস্থা না থাকায় নিঃসহায় ও অজ্ঞ কারিগরদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

এই সকল অসুবিধা দূরিকরণের প্রকৃষ্ট পন্থা হইল সমবায়। উৎপাদন, কাঁচামাল ক্রয়, অধিক মূল্যের আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, উৎপাদিত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় ইত্যাদি সমস্তই সমবায় সংগঠনের দ্বারা সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। পশ্চিমী দেশগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকে সমবায় সংগঠনই সংরক্ষিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায়ও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসারসাধনের জন্য সমবায় সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এ-সম্পর্কে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসংগে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

কিভাবে সমবায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সহায়তা করিতে পারে

বর্তমানে ভারতে যে-সমস্ত দিকে শিল্প-সমবায় আন্দোলন প্রসারলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে বয়নশিল্পই প্রধান। ১৯৬০-৬১ সালে মোট ২৮ হাজার শিল্প-সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তন্তুবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১১ হাজারের উপর। তন্তুবায় সমিতি সমবায়িক আন্দোলনে মাদ্রাজই প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। পশ্চিমবংগ, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও কেরল রাজ্যেও তন্তুবায় সমিতিগুলিও মোটামুটিভাবে সক্রিয়।

শিল্প-সমবায়ের মধ্যে তন্তুবায় সমিতির প্রাধান্য

(গ) সমবায় ও ভোগ্যপণ্যক্রেতা (Cooperation and the Consumer): ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের মধ্যে সমবায় বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে। ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হইল ব্যবহার্য দ্রব্য সুবিধা দামে ক্রয় করিয়া সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় করা। ইহাতে খাঁটি দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং প্রতারণার হাত এড়ানো যায়।

ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভোগ্যপণ্যক্রেতা সমিতি অতি সামান্যই প্রসারলাভ করিয়াছিল। যুদ্ধাবস্থায় নিত্যব্যবহার্য বহু দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া পড়ে; কালোবাজার আশংকাজনক রূপ ধারণ করে। এমতাবস্থায় সরকার এই সমস্ত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সমবায় সমিতির হাতে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদির বণ্টনভার অর্পণ করে। ফলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী সমবায় সমিতি ও সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা এবং উহাদের ব্যবসায় আশাতীতভাবে প্রসারলাভ করিতে থাকে। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালের পর হইতে ধীরে ধীরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী সমবায় আন্দোলনে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়। সমিতিগুলিকে তখন সংগঠিত ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতে হয়। জিনিসপত্রের দাম পড়িয়া যাওয়ায় অসুবিধা আরও প্রকট হইয়া উঠে।

অনেক সমিতিই এই নূতন অবস্থার চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া বিলুপ্ত হয়। ১৯৬০ সালের জুন মাসে ৪২৫৫টি ক্রেতার সমবায় ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার মধ্যে ১৩৮৩টি সমিতি কাজ করিতেছিল। সম্প্রতি একটি কমিটি* এইরূপ সমবায়ের পুনর্গঠনের নির্দেশ দেয়। কমিটির মতে সহরাঞ্চলে একটি শীর্ষস্থানীয় পাইকারী ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি প্রাথমিক ভাণ্ডারের কাজ পরিচালনা করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে সেবামূলক সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বন্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় এই প্রকারের সমবায়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইলেও এ-সম্পর্কে কোন কার্যসূচী গৃহীত হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। বর্তমান জরুরী অবস্থায় ইহার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভোগ্যপণ্যক্রেতার সমবায়

কিন্তু আসাম ও মাদ্রাজেই ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন সুসংগঠিত। ঐ দুই রাজ্যে আন্দোলন গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত হইয়াছে। তবে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন সফল হয় নাই বলা যায়।

ক্রেতা সমবায় আন্দোলন সফল হয় নাই

(ঘ) সমবায়িক বিক্রয়-ব্যবস্থা (Cooperative Marketing) : ভারতে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি এবং এই সকল ত্রুটি দূরিকরণে সমবায়ের কার্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে, উপযোগিতা সত্ত্বেও সমবায়িক কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা এখনও বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। তবে সম্প্রতি এ-দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সমবায়িক বিক্রয়করণ সমিতি মোটামুটি দুই রকমের হয়—(১) প্রাথমিক সমিতি, এবং (২) বিক্রয়করণ ইউনিয়ন ও ফেডারেশন। ইহা ছাড়া অধিকাংশ রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য বিক্রয়করণ সমিতিও (State Marketing Society) আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উল্লেখযোগ্য সকল প্রকার বিক্রয়করণ সমিতির সংখ্যা ১৯০০-র মত ছিল; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫০০তে দাঁড়াইবে আশা করা হইয়াছে।** সমবায়িক বিক্রয়করণ-ব্যবস্থা মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে বেশ কতকটা প্রসারলাভ করিয়াছে।

সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থার সামান্য প্রসার

মাদ্রাজের সমবায়িক বিক্রয়করণ আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল 'নিয়ন্ত্রিত ঋণ পরিকল্পনা' (Controlled Credit Scheme)। এই পরিকল্পনা অনুসারে কৃষকদের প্রয়োজনমত কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণদান করা হয়।

---

* Committee on Consumers' Cooperative (1961)

** এখানে শুধু সম্পূর্ণ বিক্রয়করণ সমিতির সংখ্যা ধরা হইয়াছে। বিক্রয়করণ কার্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রকার সমিতির কথা ধরিলে সংখ্যা বহুগুণ অধিক হইবে।

ঋণ গ্রহণের সময় কৃষককে এই চুক্তি করিতে হয় যে, স্থানীয় প্রাথমিক ঋণদান সমিতি বা সংশ্লিষ্ট বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে তাহাকে পণ্য বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে। পণ্য বিক্রয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সমিতির পাওনা কাটিয়া রাখিয়া বাকী অর্থ কৃষককে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা যে বিশেষ সফলতা অর্জন করিয়াছে ইহা বলা যায় না।

মাদ্রাজের নিয়ন্ত্রিত ঋণ পরিকল্পনা ও বিক্রয়করণ

সমবায় বিক্রয়করণ আন্দোলন প্রসার না হইবার কতকগুলি সুস্পষ্ট কারণ রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কচ্যুতভাবে বিক্রয়করণ আন্দোলনকে সফল করিয়া তোলা যায় না। উৎপাদকের হাত হইতে ভোক্তার হাতে পণ্য পৌঁছানো পর্যন্ত যে-সমস্ত সমস্যা রহিয়াছে ইহাদের সমস্তগুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পূর্বে যে-সমস্ত প্রক্রিয়ার (processing) প্রয়োজন তাহা সমবায় পন্থায় সংগঠিত করা, সুদক্ষ পরিচালনার ব্যবস্থা প্রভৃতি সমবায়িক বিক্রয়-করণকে সফল করিয়া তুলিবার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সরকারকেও আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তত্ত্বাবধান, সুদক্ষ পরিচালনার ব্যবস্থা, সমিতির মূলধনের যোগান প্রভৃতির সাহায্যে সরকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে।

অসফলতার কারণ

১৯৫৪ সালের সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি সমবায় বিক্রয়করণ সম্পর্কে বিস্তৃত সুপারিশ করে। কমিটির মতে, (১) প্রাথমিক ও অন্যান্য পর্যায়ের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য সমবায়িক বিক্রয়করণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা বা উহাদের পুনর্গঠন করিতে হইবে। (২) প্রাথমিক ঋণদান সমিতি ও বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকিবে। (৩) সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির মাধ্যমেই পণ্য বিক্রয় করিতে হইবে এই সর্তে ঋণদান করা হইবে। (৪) সমস্ত প্রকারের বিক্রয়করণ সমিতির শেয়ার-মূলধনের অন্তত শতকরা ৫১ ভাগ সরকারকে যোগান দিতে হইবে।

সমবায় বিক্রয়করণ সম্পর্কে সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

কমিটি আরও সুপারিশ করে যে বিভিন্ন সমবায়িক কাজকর্মের, বিশেষত বিক্রয়-করণ-ব্যবস্থার, সুপরিকল্পিত প্রসারসাধনের জন্য একটি 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড' (a National Cooperative Development and Warehousing Board) থাকিবে। ইহা ব্যতীত পণ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণের ও নিয়ন্ত্রিত বাজার পরিচালনার জন্য একটি 'সর্ব-ভারতীয় পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান' (an All-India Warehousing Corporation) এবং রাজ্যগুলিতে 'রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ কোম্পানী' (State Warehousing Company) থাকিবে। বড় বড় গ্রামগুলিতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুদাম নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে উৎসাহিত করিতে হইবে। জাতীয় সমবায়িক উন্নয়ন ও গুদামঘর বোর্ডের পরিচালনাধীন 'জাতীয়

সমবায় উন্নয়ন তহবিল' (National Cooperative Development Fund) এবং 'জাতীয় গুদামঘর উন্নয়ন তহবিল' (National Warehousing Development Fund) নামে দুইটি তহবিল সৃষ্টি করিতে হইবে। রাজ্য সরকারগুলি যাহাতে বিক্রয়করণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মে লিপ্ত সমবায় সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধনের যোগান দিতে পারে তাহার জন্য বোর্ড জাতীয় সমবায়িক তহবিল হইতে উহাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করিবে। আর জাতীয় গুদামঘর উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে বোর্ড সর্ব-ভারতীয় গুদামঘর প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য গুদামঘর কোম্পানীগুলিকে অর্থ-সাহায্য করিবে। ইহা ছাড়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (The State Bank of India) বিক্রয়করণ সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিবে।

সাধারণভাবে উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়। সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থাকে অংগীভূত করিয়া গ্রামীণ ঋণের পূর্ণাংগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল এবং জাতীয় কৃষিঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল গঠন করা হয়; কৃষিজ পণ্য (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) করপোরেশন আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বিভিন্ন রাজ্যও পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপনের দ্বারা কার্যে অগ্রসর হয়।* ইহা ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের (State Trading) নীতি অনুসারে ক্রয়বিক্রয়-ব্যবস্থায় সমবায় সমিতিসমূহের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে।** প্রাথমিক কৃষি সমিতি বা সেবা সমবায় সমিতিসমূহ অন্যান্যের সংগে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিবে।

সমবায়িক বিক্রয়-করণের নূতন ব্যবস্থা

(৬) সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি, সমবায় বীমা সমিতি প্রভৃতি (Cooperative Housing Societies, Cooperative Insurance Societies) : উপরি-উক্ত ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ভারতে কিছু কিছু সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি, সমবায় বীমা সমিতি প্রভৃতি আছে। গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি বাস্তুহারাদের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু বর্তমানে ইহারা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারলাভ করিতেছে।

সমবায় বীমা আন্দোলন এ পর্যন্ত যতটুকু প্রসারলাভ করিয়াছে তাহা জীবন ও অগ্নিবীমাতেই সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি অবশ্য কয়েকটি রাজ্যে শস্যবীমা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সমবায় সংগঠনের অন্যান্য রূপের প্রকাশ হিসাবে উন্নততর জীবনযাপন সমিতি (Better Living Societies), স্বাস্থ্য সমিতি এবং চিকিৎসা-সাহায্য সমিতি (Health Societies and Medical Aid Societies), শিক্ষা সমিতি (Educational Societies) প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। এই সকল সমিতিও অল্প সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অন্যান্য ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান

---

* ১০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

** Third Five Year Plan ১৩১ পৃষ্ঠা

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি (Multi-purpose Cooperative Societies) : কিছুদিন পূর্বে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির দিকে এই প্রবণতার মূলে মতবাদ ও প্রয়োজনীয়তা—উভয়েরই প্রভাব ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, গ্রামীণ জীবনের সমস্যা একমাত্র ঋণপ্রদানের সাহায্যেই সমাধান করা যায় না – কারণ, গ্রামবাসীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক অংগাংগিভাবে জড়িত। সুতরাং সমবায় সমিতিকে এমনভাবে সংগঠিত করিতে হইবে যাহাতে সমিতি গ্রামবাসীর আর্থিক জীবনের সমস্ত দিক ত বটেই, সম্ভব হইলে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকেরও উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই মতবাদের সহিত যোগ হয় যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বণ্টন-ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা।

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির সপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান : (১) গ্রামীণ মহাজন কেবল ঋণের কার্যই করে না ; সে ব্যবসায় পরিচালনাও করে। ঋণগ্রহণ ব্যতীত কৃষক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি ক্রয় এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের জন্য তাহার নিকট যায়। সুতরাং মহাজন বা সাহুকারের হাত হইতে কৃষকদের রক্ষা করিতে হইলে সমবায় সমিতিকে ঋণদান ব্যতীত ক্রয়বিক্রয়াদি সংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করিতে হইবে। (২) এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি তাহার সভ্যদের নিকট হইতে আনুগত্য ও সহযোগিতা পাইতে পারে না, কারণ যতদিন পর্যন্ত ঋণ পাইবার আশা থাকে ততদিন পর্যন্তই তাহারা সমিতিতে থাকে। অপরপক্ষে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি সভ্যদের সহিত প্রতিনিয়ত সম্পর্ক স্থাপন এবং বিভিন্ন দিকে তাহাদের উপকারসাধন করে বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে অধিকমাত্রায় আনুগত্য পাইতে সমর্থ হয়। সুতরাং সমিতিগুলিকে বহু-উদ্দেশ্যমুখী করিয়া তোলা প্রয়োজন। (৩) বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হয় বলিয়া বেতনভুক দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতির সাহায্যে ব্যয়সংক্ষেপ এবং সুদক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করা যায়। (৪) কৃষকের সর্বাংগীণ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সাধারণ কৃষকের শিক্ষাদীক্ষা নাই, তাহার দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিবার প্রেরণা সে কোথাও হইতে পায় না। এই অবস্থায় তাহাকে বিভিন্ন ধরনের সমিতির সদস্য হইবার জন্য উৎসাহিত করা বিশেষ কঠিন। অতএব, বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি গঠন করিয়াই কৃষকের একাধিক প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। (৫) বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির বিভিন্ন প্রকারের কার্য থাকায় কোন এক দিকে ক্ষতি হইলে তাহা অন্যান্য দিকের লাভের সাহায্যে পূরণ করা সম্ভব হয়। (৬) বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির আর একটি সুবিধা হইল যে, ইহার

সপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তি :

শক্তি ও সামর্থ্য অধিক হওয়ায় ইহা স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সর্বোপরি বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিই হইল গ্রামীণ জীবনে সংস্কারসাধনের উপযুক্ত সংস্থা।

বিপক্ষে যুক্তি :

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রবর্তনের বিপক্ষেও অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ১৯২৮ সালের কৃষি সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশন (Royal Commission of Indian Agriculture) তাহার রিপোর্টে এইরূপ মত প্রকাশ করে : "নীতির দিক হইতে এক-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমিতিই হইল শ্রেষ্ঠ; এক একটি করিয়া কার্য করাই সমীচীন পন্থা।" ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিরও অবতারণা করা হইয়া থাকে : (১) ঋণদান সমিতির কার্য পরিচালনা করা যত সহজ এবং উহার নীতিগুলি যত সহজবোধ্য বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির কার্য তত সহজসাধ্য নয়; নীতিও গ্রামবাসীদের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। উপরন্তু, সুদক্ষ পরিচালকের অভাবও রহিয়াছে। (২) একই সমিতির পক্ষে একাধিক কার্য সম্পাদন করিবার বিপদও আছে। এক দিকের ব্যর্থতা অন্যান্য দিকের কার্যে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। (৩) আবার বলা হয় যে, ঋণদান সমিতির অর্থ যোগানো এবং সভ্যদের পারস্পরিক তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজন হয় অসীম দায়িত্ব, কিন্তু অ-ঋণদান কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় সসীম দায়িত্ব। বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিতে এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলা কঠিন। (৪) বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির কর্মক্ষেত্র একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। ফলে সদস্যরা একে অপরের খবরাখবর জানিবে সমবায়ের এই নীতি পালন করা সম্ভব হয় না।

সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির অভিমত

এই প্রসংগে সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি যে-মতামত প্রকাশ করিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। কমিটির মতে, সমবায়-ব্যবস্থা যদি কেবল ঋণদান কার্য লইয়াই পড়িয়া থাকে তাহা হইলে ইহার কোন সম্ভাবনা নাই; এমনকি উহা ঋণদান কার্যেও সফলতা অর্জন করিতে পারিবে না। সুতরাং সমবায় আন্দোলনকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে। কিন্তু উহার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকটি সমবায়িক প্রতিষ্ঠানকে একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত করিতে হইবে। বিশেষ ধরনের কার্যের জন্য অবশ্যই বিশেষ ধরনের সমিতি থাকিবে। তবে যথাসম্ভব ঋণদান এবং অন্যান্য কার্যের মধ্যে যথোপযুক্ত সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে-সমস্ত অ-ঋণদান কার্যে যথেষ্ট আর্থিক ঝুঁকি রহিয়াছে তাহার দায়িত্ব প্রাথমিক সমিতিগুলির পক্ষে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। যে-সকল অ-ঋণদান কার্য প্রাথমিক সমিতি অতি সহজেই দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে তাহার দায়িত্বই শুধু সমিতি গ্রহণ করিবে। উদাহরণস্বরূপ বীজ সার কৃষি-যন্ত্রপাতি কেরোসিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের বণ্টনভার সহজেই প্রাথমিক সমিতিগুলি গ্রহণ করিতে পারে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যেখানে কোন সমিতি একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে দক্ষতা দেখাইয়াছে সেখানে

উহার সম্ভাবনা অপরিমেয়। কিন্তু কমিটির মতে, সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলনকে একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেকটি সমিতিকে নয়। এখানেও সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, স্থানীয় কর্মিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং বিপক্ষ ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রভৃতি বিষয় বিচারবিবেচনা না করিয়া ঋণদান ছাড়া বাজারিকরণ, সমবায়িক চাষ প্রভৃতি সমবায়িক কাজকর্ম আরম্ভ করা সমীচীন হইবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার যে সাড়া পড়ে যুদ্ধোত্তর যুগেও তাহা অব্যাহত থাকে। ১৯৫১-৫২ সালে উহাদের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজারে দাঁড়ায়। তাহার পর হইতে অবশ্য বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি স্থাপনে মন্দার সূচনা দেখা যায়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির উপরি-উক্ত সুপারিশ অনুসারে সরকার সমবায় ঋণদানকার্যের সহিত বিক্রয়করণ প্রভৃতি সংযুক্ত করিলেও ঠিক বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠায় বিরত থাকে। ফলে এই প্রকার সমিতির আর বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটিতে দেখা যায় না।

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির প্রসার

গতি পরিবর্তন

যাহা হউক, বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা কোন ক্ষেত্রেই সফল হয় নাই বলা চলে। স্যর ম্যালকম ডার্লিং বিভিন্ন বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে রাজস্থানের মাত্র কয়েকটি সমিতি ছাড়া অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে বহু-উদ্দেশ্যসাধক নহে।* সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনাকারী দলও (Study Team) এই উক্তি করিয়াছে যে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলি প্রকৃত ক্ষেত্রে ঋণদান ছাড়া আর কোন বিশেষ কার্যই সম্পাদন করে না।

এই আন্দোলন একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চাশা পোষণ করা যায় না। তবে বর্তমানে যে সমবায় সেবা সমিতি (Service Cooperative) গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা এই বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতিরই ন্যায়। সুতরাং পরিবর্তিত আকারে যে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি অন্তত কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভবিষ্যৎ

জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Bank): কৃষকের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী ঋণদান বা মধ্যমেয়াদী ঋণপ্রদানের (medium-term loan) ব্যবস্থা করিলেই চলে না; তাহার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদানের সুব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলির পক্ষে এই ঋণদান সম্ভব নয়, কারণ উহাদের কার্যকরী মূলধন সংগৃহীত হয় স্বল্পমেয়াদী আমানত বা মোটামুটি স্বল্পমেয়াদী ঋণ হইতে। উপরন্তু, জমিজমার

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও জমিবন্ধকী ব্যাংকের প্রয়োজনীতা

* Sir Malcolm Darling, Certain Aspects of Cooperative Movement in India, 1958

ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদান করিতে হইলে জমির মূল্য বা মালিকানাস্বত্ব নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হয়। স্বল্প সংগতিসম্পন্ন প্রাথমিক সমিতির পক্ষে ইহার ব্যবস্থা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য জমিবন্ধকী ব্যাংকের মত বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠান (specialised institution) অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

তিন প্রকার জমিবন্ধকী ব্যাংক

জমিবন্ধক। ব্যাংক পুরা সমবায়িক না হইয়া আধা-সমবায়িক (quasi-cooperative) বা বাণিজ্যিক ও (commercial) হইতে পারে। ভারতে আধা-সমবায়িক ব্যাংকের সংখ্যা অধিক। ইহাতে ঋণ গ্রহণেচ্ছু ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিও যোগদান করিতে পারে। ফলে অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

বর্তমান অবস্থা (Present Position): জমিবন্ধকী ব্যাংক প্রথমে পাঞ্জাবে সংগঠিত হইলেও সার্থকভাবে প্রথম প্রবর্তিত হয় মাদ্রাজে। যাহা হউক, ভারতে

জমিবন্ধকী ব্যাংকের অতি সামান্য প্রসার ও আঞ্চলিকতা অত্যধিক

জমিবন্ধকী ব্যাংক সামান্যই প্রসারলাভ করিয়াছে। ১৯৬০ সালের জুন মাস পর্যন্ত মাত্র কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল ১৬টি এবং প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল মাত্র ৪০৮টি।* প্রাথমিক ব্যাংকগুলির শতকরা ৭৩ ভাগের মত অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও মহীশূর—এই তিনটি রাজ্যে অবস্থিত। তবে দিন দিন জমিবন্ধকী ব্যাংক-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিতেছে; অন্যান্য রাজ্যও ঐরূপ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছে।

ত্রুটি:
১। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণশোধের উদ্দেশ্যে ঋণদান

পূর্বতন ঋণ পরিশোধ, জমির উন্নয়ন, নূতন জমি ক্রয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি ঋণপ্রদান করিলেও প্রধানত প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যেই ঋণ দেওয়া হয়। অবশ্য সম্প্রতি কতিপয় রাজ্যে জমির উন্নতি-সাধন, কূপ খনন, ট্রাক্টর যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদির দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

২। ব্যাংকগুলির সুদের হার অত্যধিক

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির ঋণপ্রদানের সুদের হার অত্যধিক। প্রাথমিক ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে সুদের হার শতকরা ৫.৫ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। তবে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে কতিপয় ক্ষেত্রে উহা অপেক্ষা কম সুদেও ঋণপ্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক-প্রদত্ত ঋণের সুদ উচ্চ এবং ইহার উপর প্রাথমিক ব্যাংকগুলি ঋণদানের সময় সুদের হার আরও চড়াইয়া দেয় বলিয়াই সুদের হার এইরূপ অত্যধিক হয়। ইহা ব্যতীত ব্যাংকগুলির পরিচালনার ব্যয় যথেষ্ট বলিয়া সুদের হার অধিক করিতে হয়।

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির কার্যকরী মূলধনের মধ্যে নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। সুতরাং ব্যাংকগুলিকে ডিবেঞ্চার বিক্রয় এবং সরকার ও অন্যান্য সূত্র

* Report of the Ministry of Community Development and Cooperation for the year 1961-62, and India 1962

হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াই মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার মধ্যে ডিবেঞ্চারই মূলধন সংগ্রহের সর্বপ্রধান সূত্র। ১৯৫৯-৬০ সালে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির মোট কার্যকরী মূলধন ৩৭ কোটি টাকার মধ্যে ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি টাকা। ঐ সালে প্রাথমিক ব্যাংকগুলির কাযকরী মূলধন ২০ কোটি টাকার মধ্যে ডিবেঞ্চার ও কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮ কোটি টাকার মত।

৩। নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ অত্যল্প

যাহাতে জমিবন্ধকী ব্যাংকের ডিবেঞ্চার অধিক বিক্রয় হইতে পারে তাহার জন্য সরকার সুদ এবং আসল টাকা সম্পর্কে গ্যারাণ্টি প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ডিবেঞ্চার হইতে এইভাবে যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব হইতে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মোট ডিবেঞ্চারের শতকরা ২০ ভাগ করিয়া ক্রয় করিয়া সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছে।

এই ত্রুটির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা

সব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সম্প্রতি আবার 'গ্রামীণ ডিবেঞ্চার' (rural debentures) বিক্রয় করিয়া গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয়কে গ্রামোন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত করিবার ব্যবস্থাও অনুসৃত হইতেছে। সাধারণ লোক ছাড়া রিজার্ভ ব্যাংকও এইরূপ ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া দীর্ঘকালীন সমবায়িক ঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৯৬০-৬১ সাল অবধি অন্ধ্র, গুজরাট, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও মহীশূরের কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক ১ কোটি টাকার মত গ্রামীণ ডিবেঞ্চার জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়।*

গ্রামীণ ডিবেঞ্চার পরিকল্পনা

ঋণদান সম্পর্কে জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির কতকগুলি ত্রুটি রহিয়াছে। প্রথমত, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি ঋণ মঞ্জুর করিতে অযথা বিলম্ব করে। অবশ্য জমির মূল্য নির্ধারণ এবং স্বত্ব পরীক্ষার জন্য ঋণদানে কতকটা দেরী হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু চেষ্টা করিলে বেশ কিছু পরিমাণে সময় সংক্ষেপ করা যায়। দ্বিতীয়ত, স্বল্প পরিমাণ ঋণদানে জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে অনিচ্ছুক দেখা যায়। ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষক এইরূপ ব্যাংকের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়। পরিশেষে, জমিবন্ধকী ব্যাংক এবং রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকের কার্যের মধ্যে কোনরূপ সংহতিসাধনের ব্যবস্থা নাই।

৪। ঋণদান সম্পর্কে ত্রুটি

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির উন্নয়নের জন্য সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে: (১) প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক থাকিবে। (২) ব্যাংকের শেয়ার-মূলধনের কমপক্ষে শতকরা ৫১ ভাগ সরকারকে যোগান দিতে হইবে। (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহাতে

* Report on Currency and Finance for the year 1960-61

প্রাথমিক ব্যাংকগুলির শেয়ার-মূলধন সরবরাহ করিতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল জমির উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার, কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্য উৎপাদন সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে ঋণদান করা। (৫) বিভিন্ন মেয়াদের ঋণদানের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদী ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিবে। যাহাতে এইগুলির বিক্রয়ের পথ সুগম হয় তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে (The State Bank of India) ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (৬) রিজার্ভ ব্যাংক নিজেও নির্দিষ্ট ধরনের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া জমিবন্ধকী ব্যাংক-গুলিকে সাহায্য করিবে। (৭) সরকার ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদের টাকা সম্বন্ধে গ্যারান্টি প্রদান করিয়া, জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য কর্মচারীর ব্যবস্থা করিয়া, ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও রেজিষ্ট্রি করিবার ফী হইতে অব্যাহতি দিয়া জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করিবে।

জমিবন্ধকী ব্যাংক সম্পর্কে সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

উক্ত ব্যবস্থাগুলির অধিকাংশই অবলম্বিত হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংকসমূহকে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার মত শেয়ার-মূলধন যোগান দিয়াছে।

রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন (The State and Cooperation): ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তন ও প্রসার উভয়ই হইয়াছে সক্রিয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। অনেকে সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকাকে সুনজরে দেখেন না। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও পরিচালনা ব্যতীত ভারতের ন্যায় দেশে সমবায় আন্দোলনের সফলতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই প্রসংগে সমবায়িক পরিকল্পনা কমিটির (Cooperative Planning Committee) অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমিটির মতে, ভারতে সমবায় আন্দোলন যে প্রসারলাভ করিতে পারে নাই, তাহার একটি প্রধান কারণ হইল রাষ্ট্রের 'নিষ্ক্রিয় নীতি'। বর্তমানে যখন রাষ্ট্র পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করিয়াছে তখন ইহা স্বাভাবিক যে, রাষ্ট্র গ্রামীণ জীবনকে পুনর্গঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় সমবায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবে। এইজন্যই রাষ্ট্র রিজার্ভ ব্যাংকের সহযোগিতায় আন্দোলনের সংস্কার ও প্রসারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই সমবায় আন্দোলন প্রবর্তিত ও প্রসারিত হইয়াছে

বিভিন্ন দিক দিয়া সরকার হয় সরাসরি, না-হয় রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে আন্দোলনকে সাহায্য ও পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রথমত, সমবায় সমিতিগুলিকে পরিচালনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে সমবায় দপ্তরের অধীনে বহু কর্মচারীর ব্যবস্থা এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকার সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বল্প সুদে ঋণদান করিয়া সাহায্য করে।

রাষ্ট্র কিভাবে সহায়তা করে

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সমবায়িক ব্যাংকের শেয়ার-মূলধনের জন্য অর্থপ্রদান করিয়াছে। গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই উদ্দেশ্যেই 'জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' সৃষ্ট করা হইয়াছে।

চতুর্থত, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের জন্য রাজ্য সরকার অর্থসাহায্য (subsidies and grants-in-aid) করিয়া থাকে।

পঞ্চমত, যাহাতে অর্থসংগ্রহ বা ঋণসংগ্রহ সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য সরকার ঋণ সম্পর্কে গ্যারান্টি প্রদান করিয়া নির্দিষ্ট ধরনের সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে। যেমন, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির ডিবেঞ্চার বিক্রয় ব্যাপারে সরকার সুদ ও আসল টাকা সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়া থাকে।

ষষ্ঠত, সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নানা ধরনের আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনকে সংশোধন করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাংককে কৃষিঋণ ও সমবায়ের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য উহার আইনের (Reserve Bank of India Act) বিভিন্ন সংশোধন, রাজ্য সরকারসমূহকে সমবায় সমিতির শেয়ার-মূলধনে অর্থ নিয়োগের অনুমতি হইল এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ইহা ব্যতীত সমবায়িক আন্দোলন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কার্য করিতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঋণ পরিশোধ সাহায্য আইন (Debt Relief Acts) প্রবর্তন করা হয়; ঋণ পরিশোধ ব্যাপারে সমবায় সমিতির দাবিকে অগ্রগণ্য করা হয়।

সপ্তমত, সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য বিশেষ সুযোগসুবিধাও প্রদান করিয়া থাকে। যেমন, সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয়-কর, ষ্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিষ্ট্রি করিবার ফী প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি দান করিয়া থাকে।

অষ্টমত, রাজ্য সরকারগুলি সর্বক্ষণই সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। এই কার্যের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এবং বিশেষজ্ঞদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া রাজ্য সরকারগুলির নিকট সংস্কার-পরিকল্পনা পেশ করে; এবং রাজ্য সরকারসমূহ এককভাবে বা সম্মেলনের মাধ্যমে ঐ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া সমবায় আন্দোলনের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

সমবায়িক কর্মী শিক্ষাদানেও সরকার সাহায্য কবিয়া আসিতেছে। এই উদ্দেশ্যে পুণায় সমবায়িক শিক্ষাদান কলেজ, আঞ্চলিক সমবায়িক শিক্ষাকেন্দ্র, বিশেষ শিক্ষা-কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করা হইয়াছে।

এই প্রসংগে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি

সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রামীণ ঋণ জরিপ পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ অনুধাবনযোগ্য। কমিটির মতে, সমবায় আন্দোলনকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে সফল করিয়া তুলিতে হইলে রাষ্ট্রকে পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে। এই সহযোগিতার দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে

হইবে যাহাতে সমবায় আন্দোলন গ্রামীণ উৎপাদন ও গ্রামীণ উৎপাদকের স্বার্থে অব্যাহতভাবে কার্য করিতে পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন সরকারকে অংশীদার করিয়া (১) সমবায়িক ঋণ, (২) বিক্রয়করণ প্রভৃতি সমবায়িক অর্থনৈতিক কাজকর্ম, (৩) গুদামঘর নির্মাণ এবং রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র শেয়ার-মূলধন যোগানে রাজ্য ব্যাংকগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক ব্যাংকগুলিতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির বেলায় সাধারণত সরকার মোট শেয়ার-মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ অর্থ যোগান দিবে। সুপারিশগুলিকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে তাহার কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। ইহার উপর এখন বলা যাইতে পারে যে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত রাজ্যগুলি বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতির শেয়ার-মূলধনের দরুন ৪০ কোটি টাকার মত যোগান দিয়াছিল।

গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সমবায় আন্দোলনের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিবিড়তরই হইত। কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্টের ফলে এই গতিতে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। সম্প্রতি আবার সমবায় আন্দোলনের সহিত রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে। পরিকল্পিত সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা (Cooperative Farming) এবং সেবা সমবায় সমিতির (Service Cooperatives) ভিত্তিই হইল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা।

বর্তমান গতি

সমবায় আন্দোলনের সফলতা (Achievements of the Cooperative Movement): প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া ভারতে সমবায় আন্দোলন প্রবর্তিত হইয়াছে। স্বতই প্রশ্ন করা হয়, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আন্দোলন কতখানি সফলতা অর্জন করিয়াছে, কতদূর দেশের উপকারসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং কতদূরই বা সমবায় নীতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছে?

যাঁহারা আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে গুণকীর্তন করিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে, নৈতিক ও শিক্ষার দিক দিয়া আন্দোলন বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছে। আর্থিক দিক সম্পর্কে বলা হয় যে গ্রামাঞ্চলে ঋণ সহজলভ্য হইয়াছে। কৃষক বা সমবায় সমিতিগুলির নিকট হইতে স্বল্প সুদে ঋণ পায় বলিয়া গ্রামীণ মহাজনও সুদের হার হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইভাবে গ্রামীণ মহাজনের একচেটিয়া ব্যবসায়কে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং গ্রামবাসীরাও মহাজনের শোষণের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কৃষকদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অভ্যাস প্রসারলাভ করিয়াছে। পূর্বতন ঋণের ভারও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। পূর্বের তুলনায় কৃষকদের ভোগের জন্য ঋণগ্রহণ কমিয়া গিয়া উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমবায় আন্দোলনের ফলে তাহারা স্বল্প দামে যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্টতর বীজ ও সার ক্রয় করিতে

আন্দোলনের কৃতকার্যতার কথা

সমর্থ হইয়াছে। সমবায় পন্থায় সেচ-ব্যবস্থা, জমির সংহতিসাধন, কৃষিকার্য সম্পাদন, গো-প্রজনন প্রভৃতির ফলে চাষের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। সমবায় আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হইল সমবায়িক বিক্রয়করণ। ইহার ফলে কৃষকরা মধ্যজীবীদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে এবং উপযুক্ত বাজার-দামে পণ্যবিক্রয় করিতে পারিতেছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ইক্ষু বিক্রয়করণ সমিতি, গুজরাটের তুলা বিক্রয়করণ সমিতি এবং মাদ্রাজের ধান্য ও তামাক বিক্রয়করণ সমিতি বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য পরিচালনা করিতেছে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা একেবারে উপেক্ষা করিবার নয়। হস্তবয়ন শিল্পে সমবায় আন্দোলন অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে। নৈতিক ও শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে বলা হয় যে, সমবায় আন্দোলনের ফলে মামলা, মদ্যপান, জুয়াখেলা, অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি হ্রাস পাইয়া কৃষকদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি প্রসারলাভ করিয়াছে। হিসাবপত্র রাখা এবং প্রমিসরি নোটে সাহি প্রদান ইত্যাদির প্রয়োজন হওয়ায় শিক্ষার বিস্তারও কিছু ঘটিয়াছে।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে আন্দোলন সফল হয় নাই

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে মনে হইবে সমবায় আন্দোলন যেন ভারতে আশাতীত-ভাবে সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা সমবায় সংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্যাদির দিকে নজর দিলেই বুঝা যাইবে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য দেশের কোন কোন অংশে সমবায় আন্দোলন কিছুটা প্রসারলাভ এবং বিভিন্ন দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে সামগ্রিকভাবে দেখিলে সমবায় আন্দোলন উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারে নাই।

অসফলতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সমবায়িক ঋণদান আন্দোলনের ব্যর্থতা তিন দিক হইতে পরিলক্ষিত হয়। (১) দেশের বহুস্থানেই সমবায় আন্দোলন প্রসারিত হয় নাই। (২) যে-সমস্ত স্থানে আন্দোলন প্রসারলাভ করিয়াছে সেখানেও বহুসংখ্যক কৃষক আন্দোলনের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। (৩) যাহারা সমবায় ঋণদান সমিতির সদস্যভুক্ত তাহাদের প্রয়োজনীয় ঋণের অধিকাংশই আসে সমবায় সমিতির বাহির হইতে—অর্থাৎ মহাজন, ব্যক্তিগত ব্যবসাদারের নিকট হইতে।

অসফলতার বিশ্লেষণ: ১। সমবায়ের সামান্য প্রসার

ব্যাখ্যা করিয়া সমবায় আন্দোলনের অসন্তোষজনক অবস্থা এইভাবে দেখানো যাইতে পারে: (১) সমবায় সম্প্রসারণের সবিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যায় যে ১৯৬০ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোটামুটি ১৫ কোটি লোক বা জন-সংখ্যার শতকরা ৩৮ ভাগ সমবায় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে।* সমাজোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিদপ্তরের বার্ষিক বিবরণী হইতে দেখা যায় যে ১৯৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মাত্র শতকরা ৩০

* Statistical Statement relating to the Cooperative Movement for the year 1959-60

ভাগ প্রাথমিক সমিতিভুক্ত ছিল।* (২) ১৯৫৪ সালে ঋণ জরিপ কমিটি দেখাইয়াছিল যে, কৃষকদের মোট ঋণের মধ্যে সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩.১ ভাগ মাত্র; এবং ঋণের শতকরা ৭০ ভাগ আসিত মহাজন প্রভৃতির নিকট হইতে। গ্রামীণ ঋণের পরবর্তী অনুসন্ধানেও দেখা যায় যে অধিকাংশ রাজ্যে এ-অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই।** সুতরাং কৃষকরা গ্রামীণ মহাজনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে এই ধারণা করা ভুল। (৩) সমবায় আন্দোলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল, কৃষিঋণের সুদের হার হ্রাস করা। এই বিষয়েও সমবায় আন্দোলন বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। এখনও সুদের হার অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ১২ টাকারও অধিক। (৪) আবার সমবায় সমিতিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অকার্যকর। সমাজোন্নয়নের সপ্তম মূল্যায়ন রিপোর্টে (Seventh Evaluation) বলা হইয়াছে যে, অ-ঋণদান সমিতির অধিকাংশ এবং ঋণদান সমিতির শতকরা ১৫-১৬ ভাগ অকার্যকর। (৫) সমবায়ের নীতি অনুসারে ঋণদানের ভিত্তি হইল কিন্তু কৃষকের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা। কিন্তু ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণ-দান করা হয় অস্থাবর সম্পত্তির জামিনে। সম্পত্তিকে ভিত্তি করার ফল দাঁড়াইয়াছে যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কৃষকের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী কৃষকরাই সমবায় সমিতিগুলি দ্বারা উপকৃত হয়। (৬) এইজন্যই আবার ঋণ উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োগ করা হইতেছে কি না তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। ফলে কৃষকদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা উপেক্ষিতই থাকিয়া যায়। (৭) সমিতিগুলির নিজস্ব তহবিলের অপ্রতুলতা, অনাদায়ী এবং দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের আধিক্য প্রমাণ করে যে সভ্যদের মধ্যে মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়ের প্রসারসাধন করা সম্ভব হয় নাই এবং সমিতিগুলিতে তত্ত্বাবধানের যথেষ্ট শিথিলতা রহিয়া গিয়াছে।†

সামান্য পরিমাণ ঋণ সরবরাহ

অত্যধিক সুদের হার

অকার্যকর সমিতির সংখ্যাধিক্য

ঋণদানের ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তি

ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বাবধান

(৮) 'প্রকৃষ্টতর ব্যবসা' (better business) নিশ্চিত করা সমবায় আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে কৃষকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুইটি: (ক) ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ, এবং (খ) শস্য গুদামজাতকরণ, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয়করণের সুব্যবস্থা। ১৯৫৪ সালে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট অনুসারে এই সমস্ত কার্যে মহাজন, ব্যবসাদার বা

মহাজনের প্রাধান্য

* Annual Report of the Ministry of Community Development and Cooperation, 1961-62

** Rural Credit (Third) Follow-up Survey

† Annual Report of the Ministry of Community Development and Cooperation, 1961-62

কারখানাদারের তুলনায় সমবায় সমিতিগুলি এক-দশমাংশ উপকারও করিতে সমর্থ হইত না। অবশ্য সম্প্রতি, বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে বিক্রয়করণ সমিতির প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে।

উপসংহার: সমবায়ের কোন লক্ষ্যই সাধিত হয় নাই

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতে সমবায় আন্দোলন 'প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্য, প্রকৃষ্টতর ব্যবসা, প্রকৃষ্টতর জীবনযাপন' ('Better Farming, Better Business, Better Living') সমবায়ের এই তিনটি লক্ষ্যের একটিকেও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই। অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে বিশেষ প্রতিকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার, বিশেষত শক্তিশালী স্বার্থসমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমবায় আন্দোলন যতটুকু কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছে ততটুকুই প্রশংসনীয়। তবে সমবায়ের সম্ভাবনার দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে।

ব্যর্থতার কারণের শ্রেণীবিভাগ:
ক। অর্থনৈতিক কারণ
খ। অন্যান্য কারণ

***সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ (Causes of Failure of the Cooperative Movement)**: উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলিকে মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক (economic) এবং অন্যান্য (non-economic) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অন্যান্য—অর্থাৎ, অর্থনৈতিক নহে এরূপ কারণের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করা হয়: (১) প্রাথমিক সমিতিগুলি অকাম্যভাবে ক্ষুদ্রাকারের এবং ইহাদের কর্মপরিধিও সংকীর্ণ। ফলে সমিতির কাজকর্ম সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির আকারও ক্ষুদ্র। সুতরাং তাহাদের ব্যবসায় লাভজনক হয় না এবং সুদের হারও অধিক হয়। (২) কৃষি ঋণদান সমিতির অসীম দায় সমবায় আন্দোলনের প্রসারকে ব্যাহত করিয়াছে। (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতিগুলি বহু-উদ্দেশ্যসাধক না হওয়ায়, বিশেষ করিয়া ঋণ ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ না থাকায়, কৃষকের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের সামগ্রিক উন্নতি-সাধন করা সম্ভব হয় নাই। (৪) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং প্রাথমিক সমিতি-গুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব সমবায় আন্দোলনের আর একটি দুর্বলতা। অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি গ্রামীণ প্রাথমিক সমিতিগুলির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয় এবং তাহাদের সহিত কার্য পরিচালনা অকাম্য ও বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে; অপরপক্ষে কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীকে ঋণদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। আবার রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের মধ্যে অনেক রাজ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। (৫) শিক্ষার অভাব এবং সমবায় নীতির শিক্ষাদানের অব্যবস্থাও সমবায় আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। (৬) অনেকের মতে, সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন ও প্রসারে সরকারী উদ্যোগ ও হস্তক্ষেপ বর্তমান থাকায় পশ্চিমী দেশের মত ভারতে সমবায় আন্দোলন প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। অপরপক্ষে সমবায় পরিকল্পনা কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে,

সমবায় আন্দোলনের প্রসারে মন্দ গতির অন্যতম কারণ হইল রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয় নীতি। (৭) অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাব, সমবায় সমিতির কর্মচারীদের অসাধুতা, মিথ্যা হিসাব প্রদর্শন এবং হিসাব-পরীক্ষার সুব্যবস্থার অভাব, সমিতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, ঋণ আদায় সম্পর্কে শিথিলতা প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ: উপরি-উক্ত কারণগুলি সমবায় আন্দোলনের প্রসার ব্যাহত করিলেও ব্যাধির মূলে রহিয়াছে আসলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ।

(১) প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্যের জন্য সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার সংহতিসাধন, উন্নত ধরনের বীজ সার ও যন্ত্রপতি, জমির মালিকানা-স্বত্বের পরিবর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থার দরকার হয়। এই সমস্ত কার্য সমিতির শক্তি বা আর্থিক সংগতির বাহিরে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং অর্থসাহায্য ব্যতীত কোনটাই সম্পাদিত হইতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র সমবায় সংগঠনকে যথোপযুক্তভাবে আর্থিক বা অন্যভাবে সাহায্য করে নাই। (২) দ্বিতীয়ত, প্রকৃষ্টতর ব্যবসায় সম্ভব করিতে হইলে একদিকে যেমন ঋণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি আবার পণ্য বিক্রয়যোগ্যকরণ (processing), বিক্রয় ও গুদামজাত করিবার সুব্যবস্থাও থাকা দরকার। এই দুইটি কার্যে মহাজন ও ব্যবসাদারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে সমবায় সমিতিগুলি দাঁড়াইতে পারে না। এই দুর্বলতার অন্যতম কারণ হইল সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক সামর্থ্যের অভাব। (৩) পূর্বেই বলা হইয়াছে, জমি ঋণগ্রহণযোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি হওয়ায় ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত চাষী সমবায় সমিতির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় না এবং সমৃদ্ধ কৃষকশ্রেণীই সমবায় সমিতিগুলিতে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া থাকে। (৪) কুটির ও সমবায় শিল্প সংগঠন ব্যাপারেও ব্যবসায়ী ও মহাজনের অপ্রতিহত প্রতিকূলতা বর্তমান রহিয়াছে। (৫) অনেক সময় পরিচালকবর্গ নিজেদের স্বার্থে সমিতিগুলিকে পরিচালিত করে। পরিচালনা আবার অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিপত্তিশালী ধনী কৃষক অথবা মহাজনদের হাতে থাকে। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানেই বর্ণবৈষম্য থাকায় বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে সমিতি পরিচালিত হয়। (৬) নগরাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানীগুলির নিকট সমবায় ব্যাংকগুলি অর্থসাহায্য চাহিয়া পায় না বলিয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষিকার্যকে লাভজনক ব্যবসায় বলিয়া মনে করে না।

নির্দেশিত প্রতিবিধান (Suggested Remedies): সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার এই আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমেয় যে, যাহাতে সমবায়িক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ উৎপাদন ও গ্রামীণ উৎপাদকের স্বার্থে যথাযথভাবে কার্য করিতে পারে সেইরূপ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা ভিন্ন অন্য কোন পন্থায় সমবায় আন্দোলনকে সফল করা যাইবে না। এতদিন ধরিয়া সমবায়ের পুনর্গঠনের যে-সমস্ত চেষ্টা হইয়াছে তাহা কেবল ঋণদান-

গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় নাই

ব্যবস্থার কাঠামোর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে ঘিরিয়াই করা হইয়াছে। ব্যাপকভাবে গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা বা সহরাঞ্চলের ব্যবসায় ও অর্থযোগানের ব্যবস্থার সহিত সমবায়ের অসামঞ্জস্য দূরিকরণের চেষ্টা করা হয় নাই। ফলে সমবায় গ্রামীণ জীবনের কোন প্রকৃত উপকারসাধন করিতে পারে নাই।

ফলে সমবায় আন্দোলনও সফল হইতে পারে নাই

সমবায় পন্থায় কৃষক ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর উন্নতি করিতে হইলে ব্যাপক দৃষ্টিভংগি লইয়া পুনর্গঠন কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সামগ্রিকভাবে ঋণদান, বিক্রয়করণ, পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। তৎপূর্বে অবশ্য প্রয়োজন হইবে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বিশেষ শক্তিশালী করিয়া গঠন করিবার। স্যর ম্যালকম তাঁহার রিপোর্টে এই বিষয়টির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।* তারপর প্রচুর অর্থ ও ব্যবসায়ী কৌশলের ব্যবস্থা করিয়া সমবায় আন্দোলনে এমন শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে যাহা ব্যক্তিগত ব্যবসায় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিকূলতাকে সহজেই অতিক্রম করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে সক্রিয় হইতে হইবে সমবায় আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য। পূর্বের ন্যায় রাষ্ট্রীয় সাহায্য কেবল পরামর্শপ্রদান, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনাতেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। অর্থ, সুদক্ষ কর্মচারী প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও একান্তভাবে প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার সমবায়িক প্রতিষ্ঠানের সংগঠনগত ত্রুটি দূর করাও আবশ্যক।

অবলম্বনীয় পন্থা

সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি একরূপ এই দৃষ্টিভংগি লইয়াই সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিতে গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (Integrated Scheme of Rural Credit) গ্রহণের এবং সমবায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠনগত ত্রুটি দূরিকরণের সুপারিশ করিয়াছিল। এই পরিকল্পনার আলোচনা পূর্বে করা হইলেও এখানে উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে: পরিকল্পনা অনুযায়ী (১) গ্রামীণ ঋণদান, বিক্রয়করণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকারবার সমবায় পন্থায় সংগঠিত ও সম্পাদন এবং শস্যভাণ্ডার ও গুদামঘরের ব্যবস্থা করিবার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। (২) রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির মূলধনের শতকরা অন্তত ৫১ ভাগ যোগান দিবে সরকার। (৩) কেন্দ্রীয় ও বৃহদাকারের প্রাথমিক সংস্থাগুলিতেও সরকার রাজ্য ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার-মূলধনের অর্থ যোগান দিয়া অংশগ্রহণ করিবে। (৪) যাহাতে রাজ্য সরকার এইভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিতে

গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ: ১। সমবায়ের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা

এই পূর্ণাংগ পরিকল্পনার বিশ্লেষণ

* Sir Malcolm Darling, Certain Aspects of the Cooperative Movement in India

পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল নামে স্বষ্ট তহবিল হইতে সরকারগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদান করিবে। এই তহবিল হইতেই আবার রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে এবং উহাদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা সমিতিগুলিকে মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিবে। জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকেও রিজার্ভ ব্যাংক এই তহবিল হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিবে। (৫) সমবায়িক বিক্রয়করণ, বাজারের জন্য শস্য প্রস্তুতকরণ, শস্যভাণ্ডার, গুদামঘর প্রভৃতি সংগঠনের জন্য সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিবে। (৬) গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হইল একটি ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। এই ব্যাংকের শাখা জেলায় এবং এমনকি মহকুমায় পর্যন্ত থাকিবে। ব্যাংক সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থপ্রেরণ এবং ঋণদানের সুযোগ-সুবিধা দিয়া সাহায্য করিবে। ঋণ ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগসাধন গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির আর একটি সুপারিশ। কমিটি সমবায়িক শিক্ষাদান-ব্যবস্থার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া এ-বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের সহযোগিতায় সরকারকে অধিকতর সচেষ্ট হইতে পরামর্শ দেয়।

২। সমবায়িক শিক্ষাদান

অন্যান্য নির্দেশিত সংস্কারের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। বলা হয় যে, ভবিষ্যতে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বৃহদাকার ও সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান কার্যের মধ্যে অধিকমাত্রায় সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। তৃতীয়ত, শস্যের ভিত্তিতে ঋণদান করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি মাদ্রাজের একটি কমিটি* সুপারিশ করিয়াছে যে, কৃষকের সম্পত্তিকে ভিত্তি না করিয়া কৃষিজমির পরিমাণ, উৎপাদিত শস্যের প্রকৃতি ও উৎপাদন-ব্যয়কে ভিত্তি করিয়া কৃষকের ঋণ-প্রয়োজনীয়তা বিচার করা উচিত এবং কৃষকের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতাকে ভিত্তি করিয়া ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। চতুর্থত, ঋণ অর্থের আকারে না দিয়া যতদূর সম্ভব জিনিসপত্রের আকারে প্রদান করাই বাঞ্ছনীয়। পঞ্চমত, জীবিকাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষককে ঋণদান করিতে হইবে। ষষ্ঠত, ঋণদান সমিতি ও বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। সপ্তমত, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে উৎপাদনবৃদ্ধি ও জমির স্থায়ী উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। অষ্টমত, গ্রামাঞ্চলে হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণদান করিতে হইবে। নবমত, উপযুক্ত তত্ত্বাবধান, ঋণ আদায়ের সুব্যবস্থা ও সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টির দিকে অধিক যত্নবান হইতে হইবে। সমিতিগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকিবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সমবায়িক ব্যাংকগুলির

৩। অন্যান্য অবলম্বনীয় প্রতিবিধান

* Report of the 'Full Finance Scheme' Committee, Reserve Bank Bulletin, Feb. 1963

উপর এবং হিসাব পরীক্ষা ও পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে রাজ্য সরকার। পরিশেষে, রাজ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যক্তিবিশেষকে ঋণদান বন্ধ করিয়া ঋণদান সমিতিগুলির চাহিদাকে অগ্রগণ্য করিতে হইবে।

অবলম্বিত প্রতিবিধান (Remedies Adopted): ১৯৫৭ সালের সুরুতে স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পূর্বে উক্ত নির্দেশিত প্রতিবিধানগুলি অনেকদূর পর্যন্ত অবলম্বিত হয়।

পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরকরণ

প্রথমত, গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থায় পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উহা কার্যকরকরণের ব্যবস্থা করা হয়। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং উহার উপর ৪০০ শাখা খুলিবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যের ব্যাংকগুলিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিলেরও সৃষ্টি করা হয়। ১৯৬১ সালের জুন মাসে ঐ তহবিলের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সমবায় সম্প্রসারণের জন্য যে 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন করপোরেশন' গঠন করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। রাজ্যসমূহও সমবায় উন্নয়নের জন্য পর্যায়সমন্বিত কার্যক্রম প্রস্তুত করে।

ঋণ ও বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন

দ্বিতীয়ত, ঋণদান ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি সমবায় সমিতিকে মিলাইয়া বৃহদাকার সমিতিতে পরিণত করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। আবার, মাদ্রাজ সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানকে 'উৎপাদন ও বিক্রয়করণ কৃষিঋণে'র অন্যতম যোগানকারী করিয়া তুলিবার জন্য 'সম্পূর্ণ ঋণ পরিকল্পনা' (Full Finance Scheme) প্রবর্তন করিয়াছে। ইহার দ্বারা ঋণদান ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হইবে। তৃতীয়ত, সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য শস্য ও গুদামজাতকরণের উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ইহা অবশ্য গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনারই এক অংশ।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবায়কে গুরুত্ব প্রদান

চতুর্থত, উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সমবায়ের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্ধারিত হয় এবং তুলাতাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যও নির্দিষ্ট হয়। কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও সমবায় গ্রামীণ ব্যবস্থার পথে চলিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

শিক্ষাদান-ব্যবস্থা

পঞ্চমত, সমবায় ব্যাপারে শিক্ষাদানেরও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩৬ হাজারের উপর সমবায় কর্মীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে পুণার সমবায় শিক্ষাদান কলেজ, পুণা রাঁচি মীরাট মাদ্রাজ ও ইন্দোরের আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্র পাঁচটি এবং আটটি বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র (Special Training Centres) ছাড়াও রাজ্যসমূহে মোট ৬০টি শিক্ষাদানকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায়ের পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ (Reconstruction and Development of Co-operation under Planned Economy): আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় হইতেই সমবায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত সমবায়কে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একরূপ ভিত্তিস্থলে স্থাপিত করিবার নীতি ঘোষিত হয়। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, পরিকল্পিত উন্নয়নে সমবায়িক ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ হইল জাতীয় নীতির অন্যতম মূল লক্ষ্য। কৃষির প্রায় সমগ্র ক্ষেত্রেই ভারতের ন্যায় দেশে সমবায়ের অপরিমেয় সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্ভাবনাকেই প্রাথমিক রূপদানের নীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে গৃহীত হয়।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

পরিকল্পিত উন্নয়নকার্য অবশ্য ঋণ হইতেই শুরু হইবে। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইবে। প্রতিটি দিকের ব্যাপারে কিভাবে এবং কতদূর অগ্রসর হইতে হইবে তাহা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। প্রথমে স্থির ছিল যে (ক) প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারকে অন্তত একটি সমবায় সমিতির সদস্যপদভুক্ত করিতে হইবে; (খ) প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারকে ঋণগ্রহণযোগ্য (creditworthy) করিয়া তুলিতে হইবে; (গ) দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতির সদস্যসংখ্যা ৬২ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৫ কোটিতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব ছিল।

সম্প্রসারণের পদ্ধতি ও লক্ষ্য

নগরাঞ্চলেও সমবায়ের প্রসার পরিকল্পনা হইতে বাদ যায় নাই। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, ব্যাংকিং, গৃহনির্মাণ, পরিবহণ, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ প্রভৃতি হইল এই অঞ্চলে সমবায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্র।

নগরাঞ্চলে সমবায়

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে বিকেন্দ্রীকৃত (decentralised) একক প্রতিষ্ঠার নির্দেশ রহিয়াছে তাহা মূলত সমবায়ের মাধ্যমেই প্রতিপালিত হইবে—ইহাই আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নীতি।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারণের এই ব্যাপক নীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেন স্যর ম্যালকম ডার্লিং। তাহার ফলে সম্প্রসারণের গতি কতকটা প্রতিহত এবং কার্যক্রম কতকটা পরিবর্তিত হয়।

কলম্বো পরিকল্পনার পরামর্শদাতা (Colombo Plan Consultant) হিসাবে স্যর ম্যালকম ডার্লিংকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত কার্যক্রমের পর্যালোচনা করিয়া আন্দোলনের সংহতিসাধন সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে অনুরোধ করা হয়।

ডার্লিং-এর রিপোর্ট

কৃষি সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে স্যর ম্যালকম এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন: "দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার যেরূপ দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। বর্তমানে সমবায় সংগঠন অতিশয় দুর্বল। ইহার সহিত উৎপাদন,

বিক্রয়করণ ও বিক্রয়যোগ্যকরণ সমিতি (manufacturing, marketing and processing societies) সংযোজন করা হইলে আন্দোলন আংশিকভাবে এবং কতকগুলি অঞ্চলে সম্পূর্ণভাবে ভাঙিয়া পড়িতে পারে।" স্যর ম্যালকম দেখিয়াছিলেন যে নূতন পুরাতন সকল প্রকার সমিতিই উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান হারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে তিনি সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধির দিকেই লক্ষ্য নিবদ্ধ করা অনুচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন।

অভিমত ও সুপারিশ : ১। বিভিন্ন প্রকার ও বহুসংখ্যক সমিতি গঠন অযৌক্তিক

দ্বিতীয়ত, স্যর ম্যালকমের মতে, সমবায় ঋণদান আন্দোলনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়। ইহাতে আন্দোলনের আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়। এই দুইটি সমবায়ের সফলতার অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকার ভুল করিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পথ যদি গ্রহণ করিতেই হয় তবে ইহার দ্বারা সমিতিগুলির স্বাতন্ত্র্য যত স্বল্প ব্যাহত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়ত, স্যর ম্যালকম বৃহদায়তন সমিতি গঠনের বিরুদ্ধেও অভিমত প্রকাশ করেন। কারণ, ইহার অর্থ হইল রাইফিজেন আদর্শ (Raiffeisen Model) হইতে বিদায় লওয়া। রাইফিজেন আদর্শ সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক জানাশুনা এবং অসীম দায়িত্ব—বিশেষভাবে এই দুই বিষয়ই নির্দেশ করে এবং এই দুইটি বিষয়ই সমবায়বোধ (cooperative spirit) সম্প্রসারিত করে। সুতরাং পারস্পরিক জানাশুনার অভাব থাকিলে এবং সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইলে সমবায়বোধ ব্যাহত হইয়া সমবায় সমিতি মুনাফাকারী যন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। মোটকথা স্যর ম্যালকম বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, কৃষককে প্রধানত সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াই সার্থক গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে—বাহির হইতে অর্থসংগ্রহের দ্বারা নয়।

২। রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বিতর্কমূলক পন্থা

৩। বৃহদায়তন সমিতি গঠনও বিবেচনাযোগ্য বিষয়

অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর স্বল্পকালীন, মধ্যকালীন এবং দীর্ঘকালীন কৃষিঋণ সরবরাহের প্রয়োজন স্যর ম্যালকম স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সংগে সংগে অনাদায়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ, ঋণদান সমিতিগুলির অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়াই ঋণের পরিমাণবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যে-সকল স্থানে সমবায় আন্দোলন অপেক্ষাকৃত দুর্বল সেখানে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পৌঁছিবার সময়কে ৫ হইতে ১০ বৎসর পিছাইয়া দিবার—অর্থাৎ, তৃতীয় বা চতুর্থ পরিকল্পনায় লইয়া যাইবার সুপারিশ স্যর ম্যালকম করিয়াছিলেন।

৪। সংখ্যাবৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছিবার সময় পিছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন

স্যর ম্যালকম আরও বলিয়াছিলেন যে সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধির লক্ষ্য (target) অপেক্ষা অনাদায়ী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যই নির্ধারণ করা উচিত। ইহার জন্য অবশ্য বলপ্রয়োগ করা চলিবে না ; করিলে আন্দোলন সর্বনাশের সম্মুখীন হইতে পারে।

আন্দোলনের পুনর্গঠনে বর্তমানে যে পুরাতন অপেক্ষা নূতন সমিতির প্রতি অধিক লক্ষ্য দেওয়া হইতেছে সেদিকে স্যর ম্যালকম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে পুনরুক্তি করা যাইতে পারে যে মিতব্যয়িতার প্রসারসাধনের দ্বারাই সমবায় আন্দোলনকে সুগঠিত করিতে হইবে—ইহাই স্যর ম্যালকমের সুদৃঢ় অভিমত। তিনি এই মিতব্যয়িতার শিক্ষাপ্রদান বিদ্যালয় হইতে সুরু করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

৫। পরিদর্শন, হিসাব-পরীক্ষা প্রভৃতি

তারপর ছিল পরিদর্শন, হিসাব-পরীক্ষা, সংরক্ষিত তহবিলের বিনিয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ। এগুলির উন্নতিসাধনও যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা স্যর ম্যালকম তাঁহার রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন।

সমবায়িক শিক্ষারও পুনর্গঠন দরকার। সারা ভারতে যখন সমাজোন্নয়নের পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং সমাজোন্নয়নের মধ্যে যখন সমবায়ের এক বিশেষ ক্ষেত্র রহিয়াছে তখন ব্লক উন্নয়ন কর্মচারীর (B. D. O.) উপর সমবায় সম্প্রসারণের বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হইতে বাধ্য। এই কারণে অন্যান্য কর্মীর সংগে ইহাদেরও শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। সমবায়িক শিক্ষার পুনর্গঠন

স্যর ম্যালকমের রিপোর্ট দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমবায় সম্পর্কিত কার্যক্রমের ভিত্তি ধরিয়া নাড়া দেয়। সরকার হইতে ঘোষণা করা হয় যে, গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ পূর্ণভাবে গ্রহণ করা ভুল হইয়াছিল এবং এখন হইতে প্রধানত স্যর ম্যালকম প্রদর্শিত পথেই চলা হইবে। ফলে সুরু হয় সমবায় সম্পর্কিত কার্যক্রমের পরিবর্তনসাধন।

পরিবর্তনসাধনের প্রচেষ্টায় ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) সমবায় নীতি সম্পর্কে এক প্রস্তাব (Resolution on Cooperative Policy) গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, সমবায়কে জনগণের আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে গ্রামীণ সমাজকে প্রাথমিক সংস্থা হিসাবে ভিত্তি করিয়া সমবায় আন্দোলনকে সংগঠিত করিতে হইবে; গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব ও উদ্যোগ গ্রামীণ সমবায় ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে; গ্রামীণ কৃষি-পরিকল্পনাকেই সমবায় উন্নয়নের ভিত্তি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; এবং যথাসম্ভব সমবায় সমিতিগুলিকে এক একটি গ্রামের ভিত্তিতে শেয়ার-মূলধনে সরকারী অংশগ্রহণ ছাড়াই সংগঠিত করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রাথমিকভাবে সমবায়ের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়। ইহার পর সমবায়িক ঋণ-কমিটির (Committee on Cooperative Credit) সুপারিশ অনুসারে সিদ্ধান্ত করা হয় যে এক একটি গ্রামীণ সমাজ লইয়া সমিতি গঠন নীতি হিসাবে সাধারণত অনুসৃত হইলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক গ্রাম লইয়া সমিতি গঠন করিতে দেওয়া

সমবায় নীতির পরিবর্তনসাধন: তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

হইবে, এবং সরকার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শেয়ার-মূলধনের একাংশ যোগান দিবে। সমিতিগুলি মূলত সেবা সমিতির রূপ গ্রহণ করিবে।

এই নীতির ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৬০ ভাগকে সমবায়ের অধীনে আনয়নের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং সমবায়ের উন্নয়নের জন্য ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সেবা সমবায় সমিতি (Service Cooperatives): সেবা সমবায় সমিতি সম্বন্ধে ধারণা একেবারে নূতন নহে। তবে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস দলের 'নাগপুর প্রস্তাবে'র (Nagpur Resolution) পর হইতে। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ২'৩০ লক্ষে লইয়া যাওয়া হইবে এবং ইহাদের অধিকাংশকে সেবা সমবায়ের রূপ দেওয়া হইবে। পুনর্গঠিত সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিই হইবে এই সেবা সমবায় সমিতিগুলি। সেবা সমবায় সমিতি স্থাপনের সংগে সংগে অবশ্য সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে আলোচনা 'ভূমি সংস্কার' অধ্যায়ে করা হইতেছে।

নাগপুর প্রস্তাব

সেবা সমিতিগুলির-রূপ হইবে বহু-উদ্দেশ্যসাধক (multi-purpose) সমিতির ন্যায়। বহু-উদ্দেশ্যসাধক বলিতে বুঝানো হইয়াছে, সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষককে ঋণদান ছাড়াও কৃষি-যন্ত্রপাতি, ধান, সার প্রভৃতি সরবরাহ করিবে; প্রয়োজনমত জলসেচ ও জমি উন্নয়নে সহায়তা করিবে; কৃষিকার্যের অনুপূরক হিসাবে ক্ষুদ্র শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিবে; ইত্যাদি। মোটকথা সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষিশিল্পের সর্বতোমুখী সেবা করিবে। সেবা সমবায় সমিতি ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি গঠন করা যাইতে পারে। যেমন, গ্রামীণ শিল্প-সমবায় সমিতি, মৃত্তিকা সংরক্ষণ সমবায় সমিতি, প্রভৃতি। সকল ক্ষেত্রেই সমিতির আত্মনির্ভরশীলতার সহিত সংযুক্ত করা হইবে সরকারী সহযোগিতা। কৃষির উন্নয়নে সরকারী সাহায্য প্রধানত সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমেই বণ্টিত হইবে। ১৯৬১ সালের জুন মাস পর্যন্ত এইরূপ সেবা সমিতির সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার।*

সেবা সমিতির গঠন

উপসংহার: দেখা যাইতেছে, স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর অভিমত যে সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। পরিকল্পনা মহলের ধারণা হইল যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ব্যতিরেকে সমবায়ের ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল হইতে পারে না। তবে সমবায় আন্দোলন প্রধানত জনগণেরই আন্দোলন। সুতরাং ব্যাপক বেসরকারী উদ্যোগও কম প্রয়োজনীয় নহে; বরং উহাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সেবা সমিতি গঠন ও সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণে প্রধানত জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্যোগের

* Report of the Ministry of Community Development and Cooperation, 1961-62

উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে হইবে। মাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকার অর্থ সরবরাহ ও সংগঠনে সহায়তা করিবে।

সমাজোন্নয়ন ও সমবায়ের সংযোগসাধন

সমবায় সংগঠনের আর একটি দিক হইল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সমবায়ের সংযোগ সংস্থাপন। এই উদ্দেশ্যে সমবায়কে সমাজোন্নয়নের মন্ত্রিদপ্তরের অধান করা হইয়াছে এবং উহারই উপর সমবায় সম্প্রসারণের মূল দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you understand by a Multi-purpose Cooperative Society? Discuss its advantages and disadvantages. Should such societies be established in large numbers?

[ইংগিত: বহুসংখ্যক বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত কিনা এ-সম্পর্কে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ, স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর অভিমত ও সেবা সমবায় সমিতির সম্প্রসারণ দেখ।...১৪১-১৪৩, ১৫৬-১৫৭ এবং ১৫৯ পৃষ্ঠা]

2. Show the aim and scope of the Land Mortgage Banks in India How far have they been successful? (C. U. B. Com. 1953) (১৪৩-১৪৬ পৃষ্ঠা)

3. What is and should be the relation of the State to the Cooperative Movement in a country like India?

[ইংগিত: যে সম্পর্ক হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি, স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর অভিমত এবং পরিকল্পনা মহলের বর্তমান ধারণা।...(১৪৬-১৪৮, ১৫৭ এবং ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা)]

4. In the opinion of the All-India Rural Credit Survey Committee Cooperative Movement in India has failed. Account for this failure and suggest measures to remedy it.

[ইংগিত: সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটিকে অনুসরণ করিয়া সমবায় আন্দোলনের অসফলতাকে এইভাবে দেখানো যাইতে পারে: (১) জনসংখ্যার মাত্র সামান্য অংশ সমবায় আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত; (২) সমবায় সমিতি কৃষিঋণের মাত্র শতকরা ৩-৪ ভাগ যোগান দেয়; (৩) সমবায় সমিতির সুদের হার অত্যধিক; (৪) অনেক সমিতি অকার্যকর; (৫) সমবায় সভ্যদের মধ্যে মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়ের প্রসারসাধন করিতে পারে নাই। অল্প কথায় প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্য প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থা এবং প্রকৃষ্টতর জীবনযাপন—এই তিনটি উদ্দেশ্যের একটিকেও ভারতীয় সমবায় আন্দোলন সার্থক করিতে পারে নাই।... (১৫১-১৫৫ পৃষ্ঠা)]

5. Discuss the causes of the inadequate development of the Cooperative Credit Movement in India. (B. U. B. A. 1961) (১৪৯-১৫২ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the causes of the slow progress of the cooperative movement in India. (C. U. B. A. (P. II) 1963) (১৪৯-১৫২পৃষ্ঠা)

7. Briefly describe the steps that are being adopted to reorganise Cooperative Movement in India.

[ইংগিত: প্রথমত, গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি নির্দেশিত গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত এবং উহাকে কার্যকর করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ঋণ ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিকে বৃহদাকারে পরিণত করা হইতেছিল। তৃতীয়ত, কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই সমবায়কে

অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দান করিয়া উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছিল। চতুর্থত, সমবায়িক শিক্ষাপ্রসারের বন্দোবস্তও করা হইতেছিল। বর্তমানে স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্টের ফলে পদ্ধতিগুলির কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে এবং এখনও ঐ বিষয়ে বিচারবিবেচনা চলিতেছে।...(১৫৫-১৫৯ পৃষ্ঠা)]

8. Give a critical review of the progress of the cooperative movement in India. What role has been assigned to Cooperation in India's Five Year Plans.

(C. U. B. A. 1962) (১৪৮-১৫১ এবং ১৫৬ পৃষ্ঠা)

9. Write a note on Service Cooperatives. (১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতে খাদ্য-সমস্যা

(Food Problem in India)

খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিক

বর্তমানে খাদ্য-সমস্যা বলিতে বুঝায় খাদ্যের অপ্রাচুর্য বা পরিমাণগত দিক (quantitative aspect)। ভারতে এই সমস্যার উদ্ভব হয় এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তাহার বহু পূর্ব হইতেই অবশ্য গুণগত দিক (qualitative aspect) দিয়া খাদ্য সমস্যা বর্তমান ছিল। অর্থাৎ, তখন ভারতীয় জনগণের জন্য মোট খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকিলেও, এই খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকারক ছিল না। এখনও অবশ্য নাই।

পরিমাণের দিক দিয়া খাদ্য-সমস্যা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উদ্ভূত হইলেও ইহা প্রকটরূপ ধারণ করে বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধের পর সমস্যা সংকটরূপে দেখা যায়। সমাধানকল্পে সরকারকে নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া খাদ্যের ক্ষেত্রে একরূপ পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থার (controlled economy) প্রবর্তন করিতে হয়। ফলে আপামরসাধারণের জীবনের একটা দিক হইয়া উঠে যান্ত্রিক। এই নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থা ও শৃংখলিত যান্ত্রিক জীবন হইতে আমরা বর্তমানে কতকটা মুক্তি পাইলেও ভারতে খাদ্য-সমস্যা অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই। এখনও গুণগত দিক দিয়া খাদ্য-সমস্যার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই; এত অল্প সময়ের মধ্যে হইতেও পারে না। পর্যাপ্তির দিক দিয়াও এই ভয় সর্বদাই রহিয়াছে যে যে-কোন সময় আমাদিগকে বর্তমানের খাদ্য-ঘাটতি হইতে প্রকৃত খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হইতে পারে। খাদ্য-ঘাটতির জন্য এখনও আমাদিগকে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত কৃষিকার্যের

জন্য যতদিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের উপর বিশেষ মাত্রায় নির্ভরশীল থাকিবে ততদিন খাদ্য সংকটের আশংকা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং ভারতে খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই রহিয়াছে। উপরন্তু, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এরূপ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, খাদ্য সরবরাহ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা বিশেষ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক দিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, ভারতের খাদ্য-সমস্যার বিচার সকল সময়ই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে করিতে হইবে। ১৯৫৯ সালের মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, খাদ্য-সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে।* তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) জন্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অপরিহার্য। অন্যভাবে বলিতে গেলে, খাদ্যের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল হইয়া থাকিলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িবে। সুতরাং খাদ্য-সমস্যা সকল দিক দিয়াই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, এবং ইহার সমাধান ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সম্প্রসারণের আশা প্রভৃতি সকলই বানচাল হইবার সম্ভাবনা।

খাদ্য সরবরাহ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের সমস্যা

ভারতে খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the Food Problem in India)ঃ ভারতে খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। যথা, খাদ্য-ঘাটতি ত রহিয়াছেই, উপরন্তু আশংকা রহিয়াছে খাদ্য-সংকটের এবং যে-খাদ্য ভারতীয় জনগণ সাধারণত গ্রহণ করে, পুষ্টিকারিতার দিক দিয়া তাহা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। এই দুইটি দিককে বলা হয় খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত ও গুণগত দিক। নিম্নে ইহাদেরই পর্যালোচনা করা হইতেছেঃ

ক। খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিক বা খাদ্য সরবরাহের অপ্রাচুর্য (Quantitative Aspect of the Food Problem)ঃ বলা হইয়াছে, বিগত দ্বিতীয় দশকে ভারতে প্রথম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ইহার পূর্বে ভারত খাদ্য রপ্তানিই করিত; কিন্তু এখন আমদানি করে। ১৯৩৬ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ভারতে ১৩ লক্ষ টনের মত খাদ্য-ঘাটতি পড়ে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ভারত হইতে বিচ্যুত হইলে খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ আরও ৭ লক্ষ টনের উপর বাড়িয়া যায়। কারণ, অবিভক্ত ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তুলনায় অধিক চাষের জমি পাকিস্তানের অংশে পড়ে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

১৯৩৮ সালের ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার '৪০ কোটি লোকের জন্য খাদ্য-পরিকল্পনা' নামক গ্রন্থে** হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সময়

* India's food crisis and steps to meet it

** Food Planning for Four Hundred Millions

স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎসরেও ভারতে আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে মাত্র শতকরা ৮৮ জনের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হইত। বাকী শতকরা ১২ জনের জন্য খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানি করিতে হইত। ১৯৪৮ সাল হইতে এই আমদানির পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত ভারতকে বৎসরে গড়ে ৩০ লক্ষ টন করিয়া খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল। বর্তমানেও মোটামুটি ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে।

দেশবিভাগের পূর্বে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের হিসাব

টাকার হিসাবে দেশবিভাগের পর হইতে এ-পর্যন্ত আমাদিগকে খাদ্য-আমদানিতে যে-পরিমাণ ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবারই কথা। মোটামুটিভাবে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত এই ব্যয়ের পরিমাণ হইল ১৭০০ কোটি টাকার মত। এই শেষোক্ত বৎসরেই (১৯৬০-৬১) প্রায় ১৮২ কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্য (cereals and cereal preparations) আমদানি করা হয়।* যখন আমরা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির (reserve of foreign exchange) ক্ষুদ্রতম অংশও উন্নয়নমূলক কার্যে নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছি তখনই আমাদিগকে বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। ইহা সহজেই অনুমেয়, যদি ভারতে খাদ্য-সমস্যা না থাকিত তবে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপকতর রূপ দেওয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির সাহায্যে মূলধন-দ্রব্যাদি (capital goods) আমদানি করিয়া উহাদিগকে কার্যকর করা সহজেই সম্ভব হইত।

আমদানির দৃষ্টিকোণ হইতে খাদ্য সমস্যার গুরুত্ব

খ। খাদ্য-সমস্যার গুণগত দিক (Qualitative Aspect of the Food Problem)ঃ পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক অন্তত ৩০০০ ক্যালোরি মূল্যের (caloric value) খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। ভারতে গড়ে ইহা হইল ২১০০ ক্যালোরি মাত্র। এই গড় হিসাব প্রকৃত অবস্থার ইংগিত দেয় না, কারণ বেশীর ভাগ লোক ১২০০-১৫০০ ক্যালোরি মূল্যের অধিক খাদ্য গ্রহণ করিতেও সমর্থ নয়।** সুতরাং দেখা যাইতেছে, শুধু পরিমাণ নহে গুণগত দিক দিয়াও খাদ্যগ্রহণে ভারত ন্যূনতম মাত্রায় পৌছিতে পারে নাই। উপরন্তু, দুগ্ধ এবং অন্যান্য সংরক্ষণমূলক খাদ্য (protective food) গ্রহণের পরিমাণও ভারতে অতি অল্প। ভারতের নিরামিষাশী জনগণ তাহাদের খাদ্যের স্বাভাবিক অপুষ্টিকারিতা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে না। অনেক সময় আবার অজ্ঞতা হেতু যেটুকু খাদ্যগুণ আছে তাহাও তাহারা অনেকাংশে নষ্ট করিয়া ফেলে। ফলে সুষম খাদ্যের (balanced diet) অভাবে জাতীয় স্বাস্থ্যের হানি ঘটে।

* Report on Currency and Finance, 1961-62

** Foodgrains Enquiry Committee Report, 1957 8০

একদিক দিয়া এই পরিমাণগত ও বণ্টনগত সমস্যাকে মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা বলিয়াই গণ্য করা যায়। ভারতীয় কৃষি অনগ্রসর, ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থা অনুন্নত এবং ভারতে মাথাপিছু আয় অত্যল্প বলিয়াই আমরা খাদ্য-সমস্যার দিকে আতংকগ্রস্ত দৃষ্টি লইয়া তাকাইয়া আছি। অতএব, খাদ্য-সমস্যার সমাধানের পথ হইল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। সংগে সংগে অবশ্য খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নও করিতে হইবে। নচেৎ, স্বল্প ক্রয়শক্তিসম্পন্ন জনগণের বুভুক্ষা চিরন্তন সমস্যা থাকিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকেই ব্যাহত করিবে।

সমস্যা দুইটি অর্থনৈতিক সমস্যারই প্রকাশ

জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য-সমস্যা (Food Problem in relation to the Growth of Population): জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য-সমস্যা বলিতে খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিকই বুঝায়। এই পরিমাণগত দিকের আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। এই শতাব্দীর গোড়া হইতে সুরু করিলে দেখা যায় যে, ১৯০১-৫১ সাল—অর্থাৎ, বিগত অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে অবিভক্ত ভারতের যে-অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়াছে, সেই অঞ্চলের জনসংখ্যা ১২·৪০ কোটির মত বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী বা বিগত দশকে (১৯৫১-৬১) জনসংখ্যা-বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭·৭৩ কোটিতে। বর্তমান দশকে (১৯৬১-৭১) বৃদ্ধির পরিমাণ আরও ৩·৮৪ কোটির মত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। শুধু তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের কথা ধরিলেই বৃদ্ধির পরিমাণ গ্রেট ব্রিটেনের জনসংখ্যার প্রায় সমান হইবে।*

জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ

এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য যোগানোই আমাদের পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বলা চলে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইতে পারিলে, অন্তত খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে সকল উন্নয়ন-প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ব্যবধানের বিভিন্ন হিসাব : ১। ১৯৫১ সালের জনগণনা কমিশনার

ভবিষ্যতে এই ব্যবধানের পরিমাণ কি হইবে—অর্থাৎ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য কি পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন হইবে, বিভিন্ন সময়ে তাহার হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালের জনগণনা কমিশনার (Census Commissioner) মোট কৃষিজ উৎপাদনের (total agricultural production) নিম্নলিখিত হিসাবটি করিয়াছিলেন :

* W. B. Reddaway, *The Development of the Indian Economy* p. 20

সাল	জনসংখ্যা (ভগ্নাংশ বাদ দিয়া কোটিতে)	প্রয়োজনীয় কৃষিজ উৎপাদন (বাৎসরিক কোটি টন)
১৯৫১	৩৬	৭.৫
১৯৬১	৪১	৮.৫
১৯৭১	৪৬	৯.৬
১৯৮১	৫২	১০.৮

১৯৫১ সালে মোট কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭.৫ কোটি টন। সুতরাং ঐ সালের জনগণনা কমিশনারের মতে, ১৯৬১ সালের মধ্যে ১ কোটি টন এবং ১৯৭১ সালের মধ্যে ২০.১০ কোটি টন কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই জনসংখ্যার ভরণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এই হিসাব যে ভুল তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই খাদ্য-সমস্যা সংকটে পরিণত হওয়ায়।

১৯৫৭ সালে যে খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা অভিমত প্রকাশ করিল যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার জনগণনা কমিশনারের অনুমান অপেক্ষা অধিক হইবে। বস্তুত, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে এইরূপই ঘটে।

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি

এই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও লোকের আয়বৃদ্ধির দরুন পরিকল্পনা সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্যের চাহিদা শতকরা ১৫ ভাগের মত বাড়িয়া যাইবে এবং ১৯৬০-৬১ সালে মাত্র খাদ্যশস্যেরই (মোট কৃষিজ উৎপাদনের নহে) মোট চাহিদা দাঁড়াইবে ৭.৯ কোটি টনে। অপরদিকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৭ ৭৫ কোটি টনের মত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। সুতরাং খাদ্য অনুসন্ধান কমিটির মতে, ১৫ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্যের ঘাটতির আশংকা ছিল। ইহার উপর মজুত রাখিবার জন্যও ১৫ লক্ষ টনের মত খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। অতএব, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও ভারতের পক্ষে বৎসরে মোটামুটি ৩০ লক্ষ টনের মত খাদ্য আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কৃষি বিশেষজ্ঞের দলকে (The American Team of Agricultural Specialists) ভারতে আনয়ন করা হয়। এই দল

মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দল

অভিমত প্রকাশ করে যে, জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ১৯৬৬ সালের মধ্যে—অর্থাৎ, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ৪৮ কোটি হইয়া দাঁড়াইবে। মাথাপিছু ১৮ আউন্স প্রয়োজনীয়তার হিসাবে এই পরিমাণ জনসংখ্যাকে মাত্র বাঁচাইয়া রাখার জন্যই ৮.৮ কোটি টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে; ইহা ব্যতীত বীজ, মজুত প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন হইবে ২২ কোটি টন খাদ্যশস্য। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১১ কোটি টনে স্থির

* ৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

করিতে হইবে। ১৯৫৮-৫৯ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭ কোটি টনের কিছু অধিক ছিল। খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ঐ হারে চলিতে থাকিলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ২.৮ কোটি টনের মত খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দিবে। সুতরাং বিশেষজ্ঞ দল সুপারিশ করে যে উৎপাদনবৃদ্ধির হারকে শতকরা ৩.২ ভাগ হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৮.২ ভাগে লইয়া যাইতে হইবে।*

পরিকল্পনা কমিশন এই অভিমতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে পুনরায় অগ্রাধিকার প্রদান করে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি গ্রহণ করে। তবে কমিশন মনে করিয়াছিল যে ১০.৫ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে পারিলেই তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। ১৯৬১ সালের জনগণনার হিসাব বাহির হইলে দেখা গেল যে এ-হিসাবও ভুল—১০.৫ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিলেও ভারত ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব, আরও উৎপাদনবৃদ্ধি প্রয়োজন এবং উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হইল তৃতীয় পরিকল্পনাকে বৃহত্তর করিয়া রচনা করা। ফলে সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার মত বর্ধিত হয়।**

তৃতীয় পরিকল্পনা

খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে অবলম্বিত প্রতিবিধান-সমূহ (Measures adopted to solve the Food Problem):

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পূর্বে অবলম্বিত প্রতিবিধান

খাদ্য-সমস্যার প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা করিয়া আসা হইতেছে ১৯৪২ সাল হইতে। ঐ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি খাদ্য বিভাগ (Food Department) গঠন করা হয়। ইহার পর ১৯৪৩ সালে বিখ্যাত বংগীয় দুর্ভিক্ষের পর সরকার খাদ্য-সমস্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইহার সমাধানকল্পে সচেষ্ট হয়।

এই সময় হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সূচনার পূর্ব পর্যন্ত খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে যে-সকল প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয় মোটামুটিভাবে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, (ক) বাহির হইতে খাদ্য আমদানি, (খ) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা, এবং (গ) অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান।

(ক) বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি (Import of Foodgrains): জনসাধারণের বুভুক্ষা মিটাইবার জন্য স্বাধীনতার পর হইতে সরকারকে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে তাহাকে সমান্তরালবিহীন বলিয়াও বর্ণনা করা চলে। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে এই আমদানির পরিমাণ ছিল গড়ে বৎসরে ৩০ লক্ষ টন করিয়া। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে আমদানির পরিমাণ

খাদ্য আমদানির পরিমাণ

* *India's food crisis and steps to meet it*

** পরিকল্পনা সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

বিশেষ হ্রাস পাইলেও উহার পরবর্তী সময়ে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়াই চলে এবং ১৯৬০-৬১ সালেও ১৮১ কোটি টাকার মত খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে হয়। অবশ্য ১৯৬১-৬২ সালে খাদ্যদ্রব্য আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া হয় ৯৭ কোটি টাকা।*

খাদ্যশস্য আমদানিতে অসুবিধা

খাদ্যশস্য অতি সহজে আমদানি করা যায় নাই। সহজে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য হয় অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত, না-হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় (reserve of foreign currency) থাকার প্রয়োজন ছিল। দুঃখের বিষয় ভারতের কোনটিই ছিল না, এবং বর্তমানেও নাই। ফলে ভারতকে মূল্যবান যন্ত্রপাতি আমদানি পরিহার করিয়া খাদ্য আমদানি করিতে হইয়াছে, খাদ্য ঋণ ও দান ভিক্ষা করিতে হইয়াছে।

(খ) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা (Food Control and Rationing): খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থার সুরু হয় ১৯৪৩ সালের বংগীয় দুর্ভিক্ষের পর হইতেই। স্বাধীনতার সময় দেখা যায়, প্রায় ১৫ কোটি লোক ইহার আওতায় আসিয়াছে।

নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা

নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থার পরিচালনা কখনও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। উপরন্তু, স্বল্প দামে কৃষকদের নিকট হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হইত বলিয়া ইহা উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সকল কারণে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর হইতেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার সপক্ষে একরূপ আন্দোলন চলিতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। ফলে, ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বেই ইহার ফল দাঁড়ায় ভয়াবহ। চারিদিকেই খাদ্য-মজুতের হিড়িক পড়িয়া যায়; ব্যবসায়িগণ এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া অকল্পনীয়ভাবে দাম বৃদ্ধি করিতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কয়েক মাসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত এবং পরিচালনা দৃঢ়তর করিতে হয়; এবং এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে সুরু হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগ।

নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল চাউলের উপর। কারণ, চাউলের ঘাটতির পরিমাণই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। দেশের যে যে অঞ্চলের অধিবাসিগণের নিকট চাউলই প্রধান খাদ্য তাহাদিগকে গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া ও অনুরোধ করা হইয়াছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল, "জনগণের খাদ্য-স্বভাবের পরিবর্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয়।"

* Report on Currency and Finance, 1961-62

১৯৫২ সাল হইতে খাদ্য সীমান্তে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং এই বৎসরের জুন মাসে মাদ্রাজ সরকার খাদ্য-বিনিয়ন্ত্রণ লইয়া পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষায় মাদ্রাজ সফল হওয়ায় ধীরে ধীরে বিনিয়ন্ত্রণ ভারতের অন্যান্য অংশে প্রসারলাভ করে। অবশেষে, ১৯৫৪ সালের ১০ই জুলাই সারা ভারতব্যাপী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিলোপসাধন করা হয়।

১৯৫২ সাল হইতে খাদ্যের ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণ

(গ) অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান (Grow More Food Campaign): পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানকে মোটামুটিভাবে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে: (ক) অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান (১৯৪৩-৪৮) এবং (খ) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা (১৯৪৯-৫২)। ইহার পর ১৯৫২ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইলে দেখা যায় যে, অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানকে নূতন ও ব্যাপকতর রূপদান করিয়া ইহাকে কৃষির উন্নতির জন্য গতিশীল কার্যক্রমের (Dynamic Programme of Agricultural Production) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

অভিযানের দুই পর্যায়: ক। অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান

১৯৪৩-৪৮ সালের মধ্যে অধিক খাদ্য ফলানোর জন্য অভিযান পরিচালিত হয় তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারগুলির মাধ্যমে। অভিযান পরিচালনার জন্য যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: গঠনমূলক কার্যাবলী (work schemes) এবং সরবরাহমূলক কার্যাবলী (supply schemes)। কূপ নলকূপ পুষ্করিণী বাঁধ খাল প্রভৃতির নির্মাণ ও সংস্কার, জল উত্তোলনের ব্যবস্থা, পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সরবরাহমূলক কার্যাবলী বলিতে উন্নত ধরনের বীজ, সার ইত্যাদির বণ্টন বুঝাইত।* প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, কৃষির উন্নয়নের জন্য অবলম্বিত বর্তমান ব্যবস্থাসমূহকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়।

অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের ব্যর্থতা ঢাকিয়া রাখা যায় নাই। এই অভিযানে অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক শস্যের জমিকে খাদ্যশস্যের অধীনে আনয়ন করার দরুন তুলা ও পাটের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন সেইমত বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার মূলে ছিল কার্যক্রমের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংহতি এবং জনগণের মধ্যে উৎসাহের অভাব। এই দুইটি কারণেই অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের ব্যর্থ রূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের (১৯৪৩-৪৮) ব্যর্থতা

অধিক খাদ্য ফলানোর এই অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইলে ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার বিশ্ববিশ্রুত বিশেষজ্ঞ লর্ড বয়েড ওরকে (Lord Boyd-Orr) এ-বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করে। লর্ড বয়েড ওরের এবং ১৯৪৭ সালে পুরষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের অধীনে নিযুক্ত দ্বিতীয় খাদ্যশস্য নীতি কমিটির (The

---

* India—1955

Second Foodgrains Policy Committee)* সুপারিশসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া সরকার একটি খাদ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনার মূল কথা ছিল ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতকে খাদ্যে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' করা। এইজন্যই ইহাকে 'খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা' (Food Self-sufficiency Drive) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

খ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা

এই নূতন অভিযানে পূর্বের কার্যক্রমের সকল প্রকার বিশৃংখলাকে পরিহার করিবার এবং কার্যক্রমের মধ্যে সংহতি আনয়ন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়, এবং নূতন জমি খাদ্যশস্যের আনয়নের ব্যবস্থা না করিয়া পুরাতন জমিতেই উন্নততর প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা অধিক পরিমাণে করা হয়।

সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করিবার জন্য কেন্দ্রে একজন খাদ্যোৎপাদন কমিশনার (Food Production Commissioner) নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য ছিল বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যের যথোচিত বণ্টনের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক রাজ্যে এই কার্যের জন্য একজন করিয়া খাদ্যোৎপাদন পরিচালক (Director of Food Production) নিযুক্ত হন। অনেক ক্ষেত্রে আবার কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ছোট 'খাদ্য কমিটি'ও নিযুক্ত হয়।

এইভাবে খাদ্যোৎপাদনের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে 'যুদ্ধের ভিত্তিতে' স্থাপন করা হয়। তৎকালীন খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীর ভাষায় বলা হয় যে, ইহার উদ্দেশ্য ছিল, "বৈদেশিক অন্ন হইতে ভারতের মুক্তি" (freedom from foreign bread)।

'বৈদেশিক অন্ন হইতে ভারতের মুক্তি'

বৈদেশিক অন্নের উপর নির্ভরশীলতা হইতে এই মুক্তি নির্দিষ্ট তারিখ—১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আসে নাই। ইহার কারণানুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি (Krishnamachari Committee) নিযুক্ত করা হয়। কমিটির মতে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টার এই ব্যর্থতার কারণ ছিল অনেকাংশে প্রাকৃতিক। আসামে ভূমিকম্প, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনাবৃষ্টি ১৯৫১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে হ্রাস ঘটায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া, এই অভিযানের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল ইহার সংকীর্ণ পরিধি। ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনের পর কৃষ্ণমাচারী কমিটি এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছে যে, কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে খাদ্য-সীমান্তে সংকট দূরিকরণ ভারতের ন্যায় দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিলেই চলে।

এই প্রচেষ্টারও ব্যর্থতা ও ইহার কারণ

কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টাও অবশ্য ইতিমধ্যে করা হইয়াছিল—কিন্তু হইয়াছিল পরিকল্পনাবিহীনভাবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা চলিতে

* প্রথম খাদ্যশস্য নীতি কমিটি ১৯৪৩ সালে নিযুক্ত হয়। ইহারই সুপারিশ অনুসারে 'অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান' সুরু করা হয়।

থাকাকালীন ১৯৫০-৫১ সালে তুলা, পাট ও চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কৃষিজ উৎপাদনের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (The Integrated Production Programme) গ্রহণ করিয়া কার্যকর করা হয়। ইহাতে অনেকের দৃষ্টি খাদ্যশস্য হইতে বাণিজ্যিক শস্যের উপর পড়ে। ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি সহসা বিশেষ ব্যাহত হয়। পরিশেষে, ইহাও উল্লেখযোগ্য যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়নের যে-কার্যক্রম তাহার অধীনে মোট কর্ষিত জমির শতকরা ৫ ভাগও আসে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ অল্প সময়ের স্বয়ংসম্পূর্ণতা যে অসম্ভব ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খাদ্য-সীমান্তে অভিযান—কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম (Movement on the Food Front—Dynamic Programme of Agricultural Production): ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত চূড়ান্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান বা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টাকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কৃষির উন্নয়নের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকেই সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ইহাকে ভূমির রূপান্তরের কার্যক্রম (Programme of Land Transformation) বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কার্যক্রমের কার্যকাল ছিল ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত—এই দশ বৎসর বা সমগ্র প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়। তবে বর্তমানে তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহাকেই টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, দেখা যায়।

ভূমির রূপান্তরের কার্যক্রম

প্রথম পরিকল্পনা (First Plan): পরিকল্পনাকারিগণ এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন যে, ভারতীয় কৃষকের জীবন এক পূর্ণাংগ জীবন। ইহাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া দেখার দরুন এ-পর্যন্ত কৃষিগত উন্নয়ন বা খাদ্য-সমস্যার সমাধান কোনটাই সম্ভব হয় নাই; রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থার অধীনে, গ্রামীণ মহাজন ও ভূস্বামিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে অশিক্ষিত, দরিদ্র কৃষকদের দ্বারা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য যোগানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা নিরর্থক না হইয়া পারে না। সুতরাং ব্যাধিগ্রস্ত কৃষিকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং এই উদ্দেশ্যে কৃষকের জীবনের পূর্ণ রূপান্তর ঘটাইতে হইবে। প্রধানত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Service)* দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার প্রচেষ্টা করা হইলেও জলসেচ-ব্যবস্থা, কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, কৃষিকার্যে উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও গবেষণার ফলের প্রয়োগ, নূতন ভূমিনীতি

অনুসৃত পদ্ধতি ও ব্যবস্থাসমূহ

* সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন (State and Agricultural Reconstruction) সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

প্রভৃতি পন্থাগুলি অবলম্বিত হইবে। অবশ্য এই কার্যক্রমকে মূলত খাদ্য-সংকটের সমাধানাভিমুখীই করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনায় কৃষি, সমাজোন্নয়ন ও জলসেচ খাতে মোট বরাদ্দ করা হয় মোট পরিকল্পনার শতকরা ২৭ ভাগ। ইহার দ্বারা কৃষির উন্নয়নের কার্যক্রমকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, তৎকালীন ঘাটতি ও মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে এরূপ করা সম্পূর্ণই যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল।*

পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়ন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান

ফলাফল: অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান বা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা প্রথম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হইবার পর বৎসরেই—অর্থাৎ, ১৯৫৩-৫৪ সালে কৃষিজ উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রথম পরিকল্পনার নির্দিষ্ট অংককে (৭৬ লক্ষ টন) ছাড়াইয়া যায়। ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ডের সৃষ্টি হয়।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড

খাদ্যশস্যের মধ্যে আবার ধান্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে সর্বাধিক। ধান্যের এই অভাবনীয় উৎপাদনবৃদ্ধির কারণ ছিল প্রধানত দুইটি: ধান্য উৎপাদনে অধিকতর কৃষিজমি নিয়োগ, এবং জাপানী পদ্ধতিতে ধান্যের চাষ। অবশ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে মুক্তির কথাও এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন এইরূপভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাহির হইতে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ কমিয়া যায়। পূর্ববর্তী বৎসরে ২০ লক্ষ টনের তুলনায় ১৯৫৪ সালে আমদানি করা হয় মাত্র ৫ লক্ষ টনের মত; এবং ইহা আবার করা হয় মজুত রাখার উদ্দেশ্যে—ঘাটতি মিটাইবার জন্য নহে। ১৯৫৫ সালে ১৬ লক্ষ টনের মত চাউল উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। নষ্ট হইবার আশংকায় কিছু রপ্তানিরও ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিকের বা খাদ্য-ঘাটতির একরূপ অবসান ঘটিয়াছে, এইরূপ বিবেচিত হয়।

আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি সুরু

প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন পুনরায় কমিয়া গিয়া ৬.৫০ কোটি টনে দাঁড়ায়। তাহা হইলেও ইহা ছিল পরিকল্পনার নির্দিষ্ট উৎপাদন-লক্ষ্য হইতে ৩৪ লক্ষ টন অধিক। সুতরাং ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে খাদ্য-সমস্যা বা খাদ্য-ঘাটতি আর মাথা উঁচু করিতে পারে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই সমস্যা আবার মাথা উঁচু করে বণ্টনগত ও মূল্যের দিক দিয়া।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা (Second Plan): দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল শিল্পগুলিকে (basic industries) অগ্রাধিকার প্রদান করা হইলেও কৃষিকে মোটেই উপেক্ষা করা হয় নাই; বরং প্রথম পরিকল্পনার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রমের দ্বিতীয় দফাকে কার্যকর করিবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাই করা হয়।

---

* Second Five Year Plan

খাদ্যশস্যের দিক দিয়া এই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে ১ কোটি টন উৎপাদন-বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। ইহা করা হইয়াছিল নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়া : (১) মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি, (২) নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, (৩) মাথাপিছু খাদ্য-ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, (৪) দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়ের জন্য সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা, এবং (৫) খাদ্য-ব্যবহারের উপর জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও বণ্টনগত পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

পরে প্রধানত মূল্যবৃদ্ধির ফলে উৎপাদনবৃদ্ধির এই লক্ষ্য যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় উহাকে বাড়াইয়া ২ কোটি টন বা মোট ৮·৫০ কোটি টনে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌছানো যাইবে কি না, সে-বিষয়ে খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) প্রভৃতি সন্দেহ প্রকাশ করে।*

প্রকৃতপক্ষে এই লক্ষ্যে পৌছানো যায় নাই। পরিকল্পনা-শেষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন রেকর্ড সৃষ্টি করিলেও চূড়ান্ত হিসাবে উৎপাদন হয় ৭·৯০ কোটি টন বা নির্দিষ্ট লক্ষ্য হইতে ৬০ লক্ষ টন কম।**

তৃতীয় পরিকল্পনায় সম্ভাবনা (Prospect during the Third Plan) : তৃতীয় পরিকল্পনায় এই ৭·৯০ কোটি টনকে ১০ কোটি টনে লইয়া যাওয়ার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই লক্ষ্যে পৌছানো যাইবে কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, এবং ঐ লক্ষ্যে পৌছানো গেলেও উহা পর্যাপ্ত বিবেচিত হইবে কি না, সে-বিষয়েও নিশ্চিত অভিমত প্রদান করা কঠিন। বস্তুত তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে (১৯৬১-৬৩) খাদ্যোৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই। যাহা হউক তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতেই হইবে ; নচেৎ আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) প্রচেষ্টা বিফল হইবে। এই কারণে এই পরিকল্পনায় কৃষির সংগঠনগত দুর্বলতাসমূহকে দূর করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধিকেই প্রধান লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করাই যথেষ্ট নয়, যাহাতে লক্ষ্যে পৌছানো যায় সেদিকে পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্য

খাদ্য-সমস্যা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Food Problem and Economic Planning) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের যোগানবৃদ্ধির গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। উন্নয়নমূলক কার্যাদিতে যে-সকল লোকদের নিয়োগ করা হইবে তাহাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্য বিশেষত খাদ্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না হইলে পরিকল্পনার কার্যাদি ব্যাহত হইতে বাধ্য। বিশেষত আমাদের দেশে ছদ্ম বেকারের সংখ্যা অনেক।

---

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee, 1957 ৬৯ পৃষ্ঠা

** Third Five Year Plan ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা

ইহাদের জমি হইতে সরাইয়া আনিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নকার্যে নিয়োগ করিতে হইলে খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে বেশীর ভাগ লোক অর্ধভুক্ত, সুতরাং উন্নয়নমূলক কার্যাদিতে নিয়োগের ফলে যখন সাধারণ লোকের হাতে টাকাপয়সা যাইবে তখন খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। এই চাহিদা পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ব্যাপক আকারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃংখলা টানিয়া আনিবে। আবার ভারতের মত দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারও অধিক এবং উন্নয়নমূলক কার্যপ্রসারের সংগে সংগে এই বৃদ্ধির হার আরও অধিক হইবে।* সুতরাং বর্ধিত জনসংখ্যার জন্যও খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া ভারতের ন্যায় দেশে মূলধনের সংগতি খুব সামান্য। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধন-দ্রব্য আমদানি করা প্রয়োজন। কিন্তু দেশে যদি খাদ্যাভাব থাকে তবে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করা ছাড়া উপায় থাকে না। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে ব্যয় হইয়া যায়; মূলধন-দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি করা সম্ভব হয় না। পূর্বোক্ত মার্কিন বিশেষজ্ঞ দলের মতে, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্যই জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুত, ইহাই পরিকল্পনার সফলতার প্রাথমিক সর্ত।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় খাদ্যের গুরুত্ব

খাদ্য-সমস্যার সাম্প্রতিক দিক (Recent Aspect of Food Problem): খাদ্য-সমস্যার সাম্প্রতিক দিক বলিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে খাদ্যশস্যের অকল্পিত মূল্যবৃদ্ধিকেই বুঝায়। মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় ১৯৫৫ সালের জুন মাস হইতে। উহা ১৯৫৬-৫৭ সালে অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কতকটা স্থির থাকিলেও ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় শতকরা ১১ ভাগের উপর বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতে উহা শতকরা আরও পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ১২০-তে (ভিত্তি বৎসর ১৯৫৫-৫৬=৮৭) আসিয়া দাঁড়ায়। এই পরিকল্পনার সমগ্র প্রথম বৎসরে অবশ্য খাদ্যমূল্যের সূচক (food index) ঐ ১২০-র কাছাকাছিই থাকে।** আমরা দেখিয়াছি, খাদ্যমূল্যে এইরূপ স্থায়িত্ব ১৯৫৭-৫৮ সালেও দেখা গিয়াছিল। অতএব, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের (১৯৬১-৬২) স্থায়িত্বে আশান্বিত হইবার কারণ নাই। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে, খাদ্যমূল্য নিয়মিতভাবেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরের (১৯৬২-৬৩) ও তৃতীয় বৎসরের (১৯৬৩-৬৪) প্রথম কয়েক মাসের সূচক

সাম্প্রতিক দিক বলিতে কি বুঝায়

মূল্যবৃদ্ধির কারণ

*৫৯-৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

**India—1962

এই অভিমতকেই সমর্থন করে।* খাদ্যশস্যের এই সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিরই একটা দিক। তবে পৃথকভাবে ইহার কারণসমূহকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

১। দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস পাইলেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৭-৫৮, ১৯৫৯-৬০ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছিল। সংগে সংগে খাদ্যমূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরবর্তী বৎসরসমূহে উৎপাদন আবার বৃদ্ধি পাইলে খাদ্যমূল্যে স্থিরতা আসে।

২। পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য লোকের আর্থিক আয়ের বেশ কিছুটা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে; ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত আয়বৃদ্ধির ফলে লোকের খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস কতকটা পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহারা পূর্বে জোয়ার বাজরা মিষ্টি আলু প্রভৃতি খাইত তাহারা এখন চাউল ও গমের দিকে ঝুঁকিয়াছে।

৩। ১৯৫৪ সালে খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ করার পর হইতে লোকের মাথাপিছু খাদ্য-গ্রহণের পরিমাণও বাড়িয়া ১৪ আউন্স হইতে ১৮ আউন্সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪। যুদ্ধকালীন ও পরবর্তী সময়ের মুনাফা-শিকার ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে মজুত করার ঝোঁক আনিয়া দিয়াছে। যখনই কোন কারণে তাহারা দামবৃদ্ধির আশা করে তখন মজুত করার দিকে দৃষ্টি দেয়। ফলে দাম বাড়িবার সংগত কারণ থাকুক আর না-থাকুক দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

৫। পরিবহণের অ-ব্যবস্থার জন্য অনেক স্থলে আঞ্চলিক বণ্টনেও বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়।

৬। সরকারের ঘাটতি ব্যয় ও ব্যাংক কর্তৃক ঋণদানের পরিমাণের বৃদ্ধিও মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

৭। পরিশেষে আছে দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা যাহার সহিত উৎপাদনবৃদ্ধি কোনমতেই তাল রাখিতে পারিতেছে না।

খাদ্যশস্যের পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির সূচনাতেই সরকার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। প্রথমত, খাদ্যশস্যের যে রপ্তানিকায ১৯৫৪ সালে

অবলম্বিত প্রতিবিধান

আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া পুনরায় আমদানি সুরু করা হয়। ১৯৫৬-৬১ সাল বা মোটামুটি দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ২ কোটি টনের উপর খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়।**

দ্বিতীয়ত, বণ্টনগত ত্রুটি দূরিকরণের ব্যবস্থাও যথাসম্ভব অবলম্বন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সরকার কৃষকদের নিকট হইতে খাদ্যশস্যসংগ্রহ (procurement) এবং বাজার হইতে খাদ্যশস্যের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ন্যায্যমূল্যের দোকানের

* Reserve Bank Bulletin, April 1963

** India—1962

মাধ্যমে এইভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্যশস্য সংগ্রহকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনমত খাদ্যশস্যের উচ্চতম দাম বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, আঞ্চলিক ঘাটতি দূরিকরণের জন্য সম্প্রতি খাদ্য-জোন (Food Zone) সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে পশ্চিমবংগ ও উড়িষ্যাকে মিলাইয়া একটি এবং মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশকে মিলাইয়া আর একটি খাদ্য-জোনের সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে জোনগুলির আয়তন বৃহদাকার করা হইতেছে। জোনের মধ্যে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য সহজে আনয়ন করা যায়। ইহা ছাড়া সমগ্র দেশের মধ্যে গমের চলাচলে পূর্বে যে বাধানিষেধ ছিল ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস হইতে তাহার বিলোপসাধন করা হইয়াছে। এখন শুধু ধান্য চলাচলের ক্ষেত্রে ঐরূপ বাধানিষেধ প্রবর্তিত আছে।

চতুর্থত, অনেক রাজ্যেই খাদ্যদ্রব্যের অপচয়মূলক ভোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছে। পূর্বে বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অতিথি নিয়ন্ত্রণের যে-ব্যবস্থা (guest control system) ছিল, পরিবর্তিত আকারে তাহার পুন-প্রবর্তন করা হইয়াছে।

পঞ্চমত, রাজস্ব ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত সরকারী নীতিকে (fiscal and monetary policy) দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাংক তাহার প্রত্যক্ষ ও নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে নিয়মিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

ষষ্ঠত, যাহাতে মূল্য নিয়ন্ত্রিত এবং মালমজুত বন্ধ হয় তাহার জন্য উপযুক্ত আইন প্রয়োগ করা হইতেছে। বিভিন্ন রাজ্যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী আইন (Essential Commodities Act) প্রযুক্ত হইয়াছে। এই আইনের বলে সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে মজুত খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ধান্য ও চাউল, ডাইল এবং কয়েকটি নিকৃষ্ট খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে আগাম ও চুক্তির কারবার (forward and specific delivery contract) বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আমদানিকৃত খাদ্যশস্য যাহাতে অধিক মূল্যে বিক্রয় না হয় তাহার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করিয়াছে। নির্দেশানুসারে মাত্র অনুমোদিত ব্যবসায়ীরাই আমদানিকৃত খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে পারে।

সপ্তমত, দীর্ঘকালীন নীতি হিসাবে সরকার ১৯৫৮ সালে নভেম্বর মাসে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ১৯৫৯ সালে এপ্রিল মাসে উহা ঘোষণা করে। পরিকল্পনাটির মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি: (ক) যাহাতে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের দিক দিয়াই ন্যায্য বিবেচিত হয় এরূপভাবে খাদ্যশস্যের দাম নির্ধারণ করা ও বজায় রাখা, এবং (খ) যাহাতে ভোক্তা-প্রদত্ত মূল্যের সর্বাধিক অংশ উৎপাদকের হস্তগত হয় তাহা দেখা—অর্থাৎ, মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের মুনাফার

বিলোপসাধন করা। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম উড়িষ্যাই ধান্য ও চাউল লইয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সুরু করে। পরে খাদ্য-সীমান্তে উন্নতির দরুন খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সাময়িকভাবে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষিত হয়।

দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণ (price stabilisation) তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের অন্যতম সর্ত বলিয়া এই পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত (P. L. 480 Agreement) খাদ্যশস্য হইতে ৫০ লক্ষ টন মজুত রাখা হইতেছে। খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পাইলেই এই মজুত হইতে খাদ্যশস্য খোলাবাজারে বিক্রয় করা হইবে। ইহা ছাড়া প্রয়োজনমত খাদ্যশস্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থার সম্প্রসারণও করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।* পরিশেষে, আমদানির প্রয়োজনীয়তাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যাইবে না। এইদিক হইতে ১৯৬১ সালে মিশর হইতে চাউল এবং ক্যানাডা হইতে গম আমদানির চুক্তির উল্লেখ করা যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিকরণ

বর্তমান জরুরী অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, কিছু নূতন ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাইকারী ও খুচরা দামের গতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইতেছে, এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি সংস্থাও গঠন করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও সমবায়-ব্যবস্থার প্রসারের প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ (Recommendations of the Foodgrains Enquiry Committee): দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনা হইতে খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণানুসন্ধান ও ইহার প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্য শ্রীঅশোক মেহতার সভাপতিত্বে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে 'খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি' নিযুক্ত হয়। কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

রিপোর্টে ১৯৫৬ সালের শেষ হইতে খাদ্যশস্যের মূল্যের উর্ধ্বগতিকে চাহিদার শক্তির (strength of the demand factor) পরিচায়ক বলিয়াই নির্দেশ করা হয়। কারণ, উৎপাদনবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই গতি রুদ্ধ হয় নাই। ইহার পর কমিটি অভিমত প্রকাশ করে যে, শুধু মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিলেই চলিবে না, খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্বও আনয়ন করিতে হইবে। নচেৎ, অনিশ্চিত দামের দরুন উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যাহত হইবে।

খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিকরণের গুরুত্ব

কমিটি বণ্টন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী খাদ্যনীতির অনির্দিষ্টতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৫১-৫৭ সালের মধ্যে খাদ্যনীতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণে যাইয়া আবার আংশিক নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়া আসে।

* Third Five Year Plan ১৩১ পৃষ্ঠা

উৎপাদন কার্যক্রমের প্রসংগে 'অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান' হইতে সুরু করিয়া খাদ্য উৎপাদনের পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ইতিহাস আলোচনা করিয়া কমিটি বলে যে ভারতের ন্যায় অর্ধভুক্ত জনগণের দেশে আপেক্ষিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শ 'চলমান লক্ষ্য' (moving target) হইতে বাধ্য, কারণ জনসাধারণের আয় সামান্য বাড়িলেই ভোগের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। প্রথম পরিকল্পনায় ১'১ কোটি টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় সত্য ; কিন্তু ঐ পরিকল্পনায় প্রথমে খাদ্য উৎপাদনের উপর দৃষ্টি দিয়া পরে গ্রামোন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রসমূহেও ১৯৫৪ সালের পর (বিনিয়ন্ত্রণের পর) কৃষিজ উৎপাদনের পরিবর্তে অন্যান্য বিষয়ের উপর অধিক লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল। ফলে প্রথম পরিকল্পনায় যত অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতে পারিত ততটা সম্ভব হয় নাই। ইহার ফলেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাতে খাদ্য-পরিস্থিতি অতটা সংকট-জনক হইয়া উঠিয়াছিল।

সরকারী নীতির ত্রুটি

চলমান লক্ষ্য

তবুও কমিটির অনুসরণে বলা যায়, এই খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিরই একটা দিক। এই সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে প্রধানত ঘাটতি বাজেট পদ্ধতিতে বিনিয়োগবৃদ্ধির দরুন। সাধারণের আয় নিয়মিত বৃদ্ধির ফলে খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ও খাদ্যস্বভাব (food habits) উভয়ই পরিবর্তিত হইয়াছিল। অর্ধভুক্ত জনগণ অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিতেছিল, এবং যাহারা পূর্বে জোয়ার বাজরা প্রভৃতি খাইত তাহারা চাউল ও আটার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। ইহার উপর মজুত রাখিবার ইচ্ছাও (propensity to stock) বাড়িয়া গিয়াছিল। শুধু যে ব্যবসায়ীরা মজুত করিতেছিল তাহা নহে, সাধারণ কৃষকও মজুতের দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়াছিল। ফলে অ-কৃষিজীবী জনসাধারণের পক্ষে খাদ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছিল।

খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিরই একটি দিক

কমিটির পরবর্তী বক্তব্য ছিল যে, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে খাদ্য-সমস্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কারণ, যে-যে বিষয়ের উপর এই ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভর করে—যথা, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, পরিকল্পনার ব্যয়, ভোগের ইচ্ছা, মজুত রাখিবার ইচ্ছা ইত্যাদি—তাহারা অতিমাত্রায় পরিবর্তনশীল। তবে কমিটি ধরিয়া লইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে যে সামান্য খাদ্য-ঘাটতি (১৫ লক্ষ টনের মত) হইবে তাহা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হইবে।

খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়

অতএব পরিমাণগত দিক দিয়া খাদ্য-সমস্যা আশংকাজনক ছিল না ; কিন্তু মূল্যের দিক দিয়া নিশ্চয়ই আশংকাজনক ছিল। যাহাতে মূল্যবৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাই না বানচাল হইয়া যায় তাহার জন্য কমিটি মূল্য স্থিতিকরণের পরামর্শ দিয়াছিল। স্থিতিকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে কমিটি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং অবাধ বাণিজ্যের মধ্যপন্থা

মূল্যনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছিল। অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ; কিন্তু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিষিদ্ধকরণ না হইয়া হইবে নিয়মিতকরণ (Controls should be of regulatory rather than of restrictive type)।

এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা বাজারে নিয়মিত খাদ্যশস্য ক্রয়বিক্রয় পাইকারী ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে খুচরা ক্রয়বিক্রয়, উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ও গম মজুত রাখা, প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্য গ্রহণের জন্য প্রচারকার্য চালাইয়া যাওয়া প্রভৃতি সাধারণ ব্যবস্থা বা মোটামুটি 'রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য' অবলম্বন করিলেই চলিবে। প্রয়োজনবোধে অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ও পন্থা

খাদ্যশস্যের মূল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে ভোক্তা (consumers) এবং উৎপাদক কাহারও অসুবিধা বা স্বার্থহানি না হয়। উপরন্তু, সাধারণ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত না করিয়া খাদ্যমূল্য দমিত রাখা যাইবে না। এই দুই কারণে প্রয়োজন হইবে এমন একটি সংগঠনের যাহা বিভিন্ন সময়ে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

কমিটির মতে, এইরূপ সংগঠন দুই অংশে বিভক্ত হইবে—(১) একটি মূল্য স্থিতিকরণ বোর্ড (a Price Stabilisation Board), এবং (২) একটি খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন (a Foodgrains Stabilisation Organisation)। ইহার মধ্যে প্রথমটি সাধারণ মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য নীতি নির্ধারণ করিবে ; এবং দ্বিতীয়টি এইভাবে নির্ধারিত নীতির যে-অংশ খাদ্যশস্যের মূল্যের সহিত সম্পর্কিত তাহাকে কার্যকর করিবে।

দুইটি সংগঠন স্থাপন প্রয়োজন

খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন হইবে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে সর্বপ্রধান কার্যকরী সংস্থা। দেশের সর্বত্র ইহার শাখাপ্রশাখা ও গুদামঘর থাকিবে ; এবং একমাত্র ইহার নিকট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরাই খাদ্যশস্যের কারবার করিতে পারিবে। সংগঠনের প্রধান কার্য হইবে আশংকা দূরিকরণমূলক কারবার করা (buffer stock operations)—অর্থাৎ, মূল্যহ্রাসের সময় ক্রয় করা এবং মূল্যবৃদ্ধির সময় বিক্রয় করা। ইহা ছাড়াও সংগঠনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত রাখিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণের স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কমিটি বলে যে খাদ্য বণ্টন প্রধানত ন্যায্য মূল্যের দোকান (fair price shops), সমবায় বিক্রয়-কেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে করিতে হইবে। গম সরবরাহের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখা চলিলেও আঞ্চলিক ভিত্তিতে চাউল সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। ন্যায্যমূল্যের দোকান হইতে বিনা মুনাফায় বিক্রয় করিতে হইবে ; এবং বিশেষ কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত কম দামে (at subsidised prices) খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে হইবে। উৎপাদন বা আমদানি হ্রাসের ফলে

স্বল্পকালীন ব্যবস্থা

যোগান কমিয়া গেলেই বড় বড় শহরকে গণ্ডি দিয়া এমনভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে এই সকল শহরের চাহিদা অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি না করে।

উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে যাহাতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ না হয় তাহার জন্য 'খাদ্য-জোনে'র সৃষ্টি করিতে হইবে। এইরূপ জোন সৃষ্ট হইলে সরকারের পক্ষে শুধু ঘাটতি অঞ্চলকে সরবরাহ করিলেই চলিবে; সমগ্র দেশকে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে না।

স্থানীয় সাহায্যেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সর্বদা স্থানীয় ঘাটতি (local deficits) খুঁজিয়া বাহির করিয়া সত্বর প্রতিবিধান অবলম্বন করিবে। কমিটি সুপারিশ করিয়াছিল যে গ্রাম-পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি প্রভৃতিকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে শস্যগোলা স্থাপন করিবার জন্য অর্থসাহায্য করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় স্থলেই খাদ্য পরিচালনা (food administration) স্থায়ী ভিত্তিতে করিতে হইবে।

স্থানীয় ঘাটতি

কমিটির মতে, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের ন্যায় কয়েকটি অঞ্চলে নিয়োগ ও আয়ের স্বল্পতাহেতু চিরন্তন ঘাটতি থাকিবে। সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে প্রধানত ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে নিয়োগ ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

ঘাটতি অঞ্চল

পরিশেষে আছে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা। বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হারকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। নচেৎ, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সকল প্রচেষ্টাই বিফল হইবে।

উৎপাদনবৃদ্ধি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট (Report of the American Team of Agricultural Specialists): ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় একদল মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞকে এ-দেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। ঐ কৃষি বিশেষজ্ঞ দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া এবং ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করে।

রিপোর্টে কৃষি বিশেষজ্ঞ দল প্রথমেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধির হার যে তাল রাখিতে পারিতেছে না তাহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেয় যে, পর্যাপ্ত খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা সমাজ-কল্যাণ ও গণতন্ত্রের আদর্শ কোনটাই সফল হইবে না।

খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধির গুরুত্ব

ঐ বিশেষজ্ঞ দল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে (১৯৬৫-৬৬) ভারতের জনসংখ্যা ৪৮ কোটিতে পৌছিবে বলিয়া ধরিয়া লইয়া* ঐ সময় খাদ্যশস্যের

* ১৯৬১ সালের জনগণনার পূর্বে এই হিসাব করা হইয়াছিল ; বর্তমানে অনুমান করা হইতেছে যে উহা ৪৯ কোটিরও উপরে দাঁড়াইবে।

প্রয়োজনীয়তা ৭ কোটি টন হইতে (১৯৫৮-৫৯) বৃদ্ধি পাইয়া ১১ কোটি টনে দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। এই ১১ কোটি টনের মধ্যে ভোগের (consumption) জন্য প্রয়োজন হইবে ৮.৮ কোটি টন এবং বাকী ২.২ কোটি টন প্রয়োজন হইবে বীজ, মজুত রাখা ইত্যাদির জন্য। মোটকথা, কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ১১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। কিন্তু ঐ সময় খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৮.২ কোটি টনের অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। অতএব, বাৎসরিক উৎপাদনবৃদ্ধির তৎকালীন হার শতকরা ৩.২-কে শতকরা ৮.২-এ লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ দলের মতে, সুচিন্তিত খাদ্যোৎপাদন কার্যক্রমের অনুসরণ দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌছানো মোটেই অসম্ভব নহে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয়তা

তারপর বিশেষজ্ঞ দল যে যে বিষয় ভারতে খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধি ব্যাহত করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ও জল-সংরক্ষণের অপ্রচুর ব্যবস্থা, কৃষিকার্যের আদিম পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি, অসম্বদ্ধ জোত, ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা, অপ্রচুর ও দুর্মূল্য কৃষিঋণ, কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব এবং বিভিন্ন খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনার মধ্যে সংহতির অনুপস্থিতিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞ দলের মতে, এই সকল প্রতিবন্ধকের সবগুলিই অপসারণযোগ্য।

উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক

প্রতিবন্ধকগুলি অপসারণ করার সংগে সংগে খাদ্যোৎপাদনের যে-সকল উপকরণ রহিয়াছে, তাহাদেরও পর্যাপ্ত ব্যবহার করিতে হইবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে যে বিপুলসংখ্যক বেকার ও অর্ধ-বেকার রহিয়াছে তাহা উৎপাদন-সম্ভাবনার একটা বিরাট অংশের অপচয়ই নির্দেশ করে। এই অপচয় বন্ধ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বেকার ও অর্ধ-বেকারদের কর্মসংস্থানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদের বাঁধ দেওয়া, জমি সমান করা, জল নিষ্কাশন, জলসেচ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ইহা যে শুধু প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনবৃদ্ধিতেই সহায়তা করিবে তাহা নহে, ইহাতে নিম্ন আয়বিশিষ্ট গ্রামবাসীদের আয়বৃদ্ধিও ঘটিবে। উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে বলিয়া এইরূপ নিয়োগের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে না।

উৎপাদনবৃদ্ধির পদ্ধতি ও পন্থা

বিশেষজ্ঞ দলের পরবর্তী সুপারিশ ছিল যে বীজ সার ইত্যাদি সরবরাহ, ঋণদান, জলসেচ প্রভৃতি কার্যের সংহতিসাধনের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব (a high level centralised authority) থাকা প্রয়োজন। এই কর্তৃত্বের উপর খাদ্যোৎ-পাদনবৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পিত হইবে।

কৃষি বিশেষজ্ঞ দল খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করে। কৃষককে উন্নততর বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবহারে

উৎসাহিত করিবার জন্যই সরকার হইতে খাদ্যশস্যের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। শুধু নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিলেই চলিবে না, কৃষক যাহাতে ঐ মূল্যে নিকটবর্তী বাজারে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বিক্রয় না করিয়া সে যদি মূল্যবৃদ্ধির আশায় শস্য মজুত রাখিতে চায় তাহার জন্য গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্তসংখ্যক শস্যগোলাও স্থাপন করিতে হইবে। দলটির মতে, খাদ্যশস্যের দাম সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ এবং উহাকে কার্যকর করার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা (a permanent agency) গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

মূল্য স্থায়িত্বকরণ

ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার স্থায়িত্ব, ন্যায্য খাজনা-ব্যবস্থা, কৃষিঋণের ব্যাপক ব্যবস্থা, অসম্বদ্ধ জোতের সংহতিসাধন ইত্যাদি খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বলিয়া কৃষি বিশেষজ্ঞ দল জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (ceiling fixation) এবং অন্যান্য ভূমি-সংস্কার কার্য অতি দ্রুত শেষ করিতে সুপারিশ করে।

অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবস্থা

পরিশেষে আছে উন্নততর বীজ ও সার উৎপাদন এবং বণ্টনের কথা, জলসেচ-ব্যবস্থার প্রসার ও সুপরিচালনার নির্দেশ এবং মিশ্র কৃষিকার্য (mixed farming), কৃষিকার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ। দলটির মতে, বৃহৎ বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনা অপেক্ষা জলসেচের সুযোগের সদ্ব্যবহার দ্বারাই বর্তমানে খাদ্যোৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

জলসেচের সুযোগের সদ্ব্যবহার

রিপোর্টটির এই বলিয়া উপসংহার করা হয় যে তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুসরণের জন্য সর্ব-ব্যবস্থা সমন্বিত কোন প্রস্তাব করা যাইতে পারে না। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে আরও নূতন ব্যবস্থার কথা উঠিবে। তবে বর্তমানে নির্বাচনমূলক এবং আত্যন্তিক (selective and intensive) কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। ধান্য ও গম প্রধান খাদ্যশস্য বলিয়া কতকগুলি নির্বাচিত অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহাদিগের উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্তমানে খাদ্যোৎপাদনের যে-কার্যক্রম অনুসরণ করা হইতেছে তাহার কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসাধন করিবার পূর্বে উহার ফলাফল বিচার করিবার জন্য কতকগুলি পরীক্ষামূলক কেন্দ্র (experimental projects) স্থাপন করিতে হইবে। ইহা না করিলে খাদ্য-সংকট দূরীভূত না হইয়া চরম অবস্থায় উপনীত হইতে পারে।

রিপোর্টটির উপসংহার

উপসংহার : ভারতের খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতি যে অস্থায়ী নয়, একবার অনুমিত কৃষিজ উৎপাদন ঘটিলেই যে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয় না—ইহাই খাদ্য অনুসন্ধান-কারী কমিটি ও মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। সুতরাং খাদ্যোৎপাদনের চলমান লক্ষ্য (moving target) নির্দিষ্ট করিতে হইবে। এই চলমান লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইবে ভোগ ও মজুত রাখার প্রয়োজনীয়তা উভয়ের ভিত্তিতে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত না রাখিতে পারিলে ভারতকে সর্বদাই খাদ্য-সংকটের সম্মুখীন থাকিতে হইবে, কারণ কৃষিজ উৎপাদন প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল বলিয়া উহার হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মূল্য স্থিতিকরণ যে অপরিহার্য তাহা উভয় দলই ঘোষণা করিয়াছে। মূল্যে স্থায়িত্ব না আসিলে শুধু যে জনসাধারণ প্রপীড়িত হইবে তাহা নহে, কৃষকও উৎপাদনবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া যে সাধারণ দ্রব্যমূল্য ও খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিকরণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং জরুরী অবস্থার দরুন এই গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির নূতন তথ্যের ভিত্তিতে মোট ১০ কোটি টন উৎপাদন যে কিভাবে পর্যাপ্ত বিবেচিত হইল তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে মার্কিন বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্টের অনুসরণে আশা করা যাইতে পারে যে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজনমত উৎপাদনের এই লক্ষ্যের পরিবর্তন সাধন করা হইবে। বর্তমান জরুরী অবস্থার দরুন এই অবস্থা পরিবর্তনের দিনই আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature of Food Problem in India. (১৬২-১৬৪ পৃষ্ঠা)

2. Indicate the nature of our Food Problem in relation to the growth of population. (১৬৪-১৬৬ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the measures that have been adopted by the Government of India in recent times to meet the food situation. (C. U. B. Com. (P.I) 1963)

[ইংগিত: সামগ্রিকভাবে খাদ্য-সমস্যার সমাধান বলিতে খাদ্য-সমস্যার সাম্প্রতিক দিককেও বুঝায়। সুতরাং উহার প্রতিবিধানকল্পে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে। ......১৬৬-১৭২, ১৭৩-১৭৬ পৃষ্ঠা]

4. Discuss in brief the recommendations of the Foodgrains Enquiry Committee, 1957. (১৭৬-১৭৯ পৃষ্ঠা)

5. Briefly dicuss the Report on India's food crisis by the American Team of Agricultural Specialists. (১৭৯-১৮২ পৃষ্ঠা)

6. Examine the importance of increasing the production of foodgrains in a developing country like India. (C. U. B. Com. 1958)

[ইংগিত: ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির গুরুত্বকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। অপরিহার্য ভোগ্যপণ্যের মধ্যে খাদ্যশস্য প্রধানতম। পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়া উন্নয়নমূলক কার্যে বিনিয়োগ করিয়া গেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়া সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল করিয়া দিতে পারে। উপরন্তু, দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতিকে যথাসম্ভব উন্নয়ন-মূলক কার্যে নিয়োগ করিবার জন্যও খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রয়োজনীয়। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি ও মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দল এই কথাই বলিয়াছে। ...১৭২-১৭৩ এবং ১৭৯ পৃষ্ঠা]

7. Indicate the causes of rising prices of foodgrains in India in recent years and suggest measures for dealing with them. (B.U. (O)1963) (১৭৩-১৭৬ পৃষ্ঠা)

চতুর্দশ অধ্যায়

ভূমি-সংস্কার

(Land Reforms)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, কৃষিজমি ও কৃষির মালিকানাই বোধ হয় জাতীয় উন্নয়নের সর্বপ্রধান সমস্যা। যেভাবে কৃষিজমি সম্পর্কিত এই সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহার উপরই ভবিষ্যতের আর্থিক ও সামাজিক সংগঠন বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে।* দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও এই উক্তির একপ্রকার প্রতিধ্বনি করা হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছিল, ভূমি-সংস্কারের সহিত সম্পর্কিত ব্যবস্থাসমূহের গুরুত্বগুলি অত্যধিক। কারণ, প্রথমত ইহারা কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিষ্ঠানগত পটভূমিকার সৃষ্টি করে; এবং দ্বিতীয়ত, ইহারা সংখ্যাধিক গ্রামবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।**

কৃষিজমির মালিকানা সম্পর্কিত এই সমস্যার উদ্ভব হয় ব্রিটিশ আমলের বিশেষ ধরনের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার জন্য। বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে যে ভূমি-সংস্কার কার্য চলিতেছে তাহা অনুধাবন করিবার জন্য এই ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার প্রকৃতির সামান্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা (Different Systems of Land Tenure during the British Period):

ব্রিটিশ আমলে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা প্রথমত জমিদারী, মহালওয়ারি ও রায়তওয়ারি—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। জমিদারী ব্যবস্থা আবার ছিল স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় প্রকারের। নিম্নে উহাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হইতেছে:

ক। জমিদারী ব্যবস্থা (The Zamindary System): বলা যায় যে, জমিদারী ব্যবস্থা স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয়ই হইতে পারে। প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে ভারতের মোট জমির প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ ছিল অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার অধীনে, এবং বাকী ৭০ ভাগ ছিল চিরস্থায়ী জমিদারী বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই ছিল ভারতের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি। কৃষিজীবীর অধিকাংশ দুঃখদুর্দশা, আর্থিক ও সামাজিক অধোগতি প্রভৃতি ছিল মূলত ইহারই দান।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (The Permanent Settlement): ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ। স্যর রিচার্ড টেম্পলের (Sir Richard Temple) মতে, ইহার ফলে বংগদেশে ব্রিটিশ ভূমি-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

* First Five Year Plan ১৮৪ পৃষ্ঠা

** Second Five Year Plan ১৭৭ পৃষ্ঠা

এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদারগণকে কৃষকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজস্বের দশ-একাদশাংশ সরকারকে প্রদান করিতে হইত। বাকী এক-একাদশাংশ তাঁহারা তাঁহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে ভোগ করিতেন। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে সরকারকে দেয়-রাজস্বের পরিমাণ মোটেই বাড়ে নাই। ফলে ক্রমে বংগদেশে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন 'জমিদার' নামে এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

বংগদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল

যে-সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বংগদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কোনটিই সাধিত হয় নাই বলা চলে। প্রথমত, সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি-রাজস্ব আদায় সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু সরকারের প্রাপ্য ভূমি-রাজস্বের কোনও বৃদ্ধি ঘটে নাই। অপরদিকে কিন্তু সাধারণ কৃষক খাজনার ভারে ক্রমশ প্রপীড়িত হইতে থাকে। দ্বিতীয়ত, কর্ণওয়ালিশ আশা করিয়াছিলেন যে, জমিদারগণ সমাজের স্বাভাবিক নেতৃস্থান অধিকার করিয়া সকল প্রকার সামাজিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিবেন। তাঁহার এই আশা পরিপূর্ণ না করিয়া জমিদারগণ শুধু খাজনা আদায় করিয়াছেন এবং শহরে থাকিয়া বিলাসী জীবনযাপন করিয়াছেন। জমির উন্নতির কোনও বিশেস চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। ফলে, কৃষি ও কৃষিজীবীর অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইয়া উঠিতে থাকে। উপরন্তু, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ছাড়াও অন্যান্য প্রকার মধ্যস্বত্বের উদ্ভব হয়। জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের পূর্বে প্রকৃত কৃষক ও জমিদারের মধ্যে বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। সমাজ তাহাদের নিকট হইতে কিছুই পাইত না, কিন্তু তাঁহারা পরভোজীর ন্যায় কৃষকশ্রেণীর স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া থাকিত। ফলে, "একদিকে সামন্তপ্রথা (feudal system) এবং অপরদিকে ভূমিদাসের (serfs) অস্তিত্ব বংগদেশের ভূমি-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়।" এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষিজীবিগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া এবং জমিদারগণের স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া বংগদেশের গ্রামীণ সমাজের ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটায়।

অন্যান্য অঞ্চল

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল হইতে এই ব্যবস্থাভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলও বাদ যায় নাই। অন্যতম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চল বিহারে কৃষক ছিল ভূমি-রাজস্বভারে সর্বাধিক প্রপীড়িত।

খ। মহালওয়ারি-ব্যবস্থা (The Mahalwari System): মহালওয়ারি-ব্যবস্থা বলিতে 'মহালে'র যৌথ মালিকানা বুঝাইত। এই ব্যবস্থা বর্তমান উত্তরপ্রদেশের কতকাংশে এবং পাঞ্জাবে প্রবর্তিত ছিল। প্রথমে ইহাতে একটি বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত একটি 'মহালে'র সহিত জমি ব্যবহারের বন্দোবস্ত করা হইত। পরে অবশ্য সমগ্র মহালের পরিবর্তে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক

রায়তের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের নীতি গৃহীত হওয়ায় মহালওয়ারি-ব্যবস্থা ক্রমে রায়তওয়ারি-ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

প্রকৃত মহালওয়ারি-ব্যবস্থাকে আদর্শ ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা চলে। ইহাতে অন্যতম সমবায়িক নীতির স্বাভাবিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; কৃষকগণ যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি স্বীকৃত হওয়ায়, মহালওয়ারি-বন্দোবস্তের অধীনে কৃষি-জোত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেই থাকে। ফলে স্বাভাবিক সমবায়িক নীতি অন্তর্হিত হয় এবং প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় সরাসরি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিকার্যকে নূতন করিয়া সংগঠিত করিবার।

এই ব্যবস্থার গুণাগুণ

গ। রায়তওয়ারি-ব্যবস্থা (The Ryotwari System): রায়তওয়ারি-ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় রায়ত ও সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। মোটামুটি বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজের কিছু অংশ ছাড়া দেশের অপরাপর অঞ্চলে এই রায়তওয়ারি-ব্যবস্থাই প্রবর্তিত ছিল। ইহার অধীনে রাষ্ট্রকে জমির একমাত্র মালিক এবং রায়ত বা কৃষক দখলিকার হিসাবে গণ্য করা হইত। যতদিন পর্যন্ত রায়ত নিয়মিতভাবে ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিত ততদিন পর্যন্তই সে দখলি-স্বত্ব ভোগ করিত। ভূমি-রাজস্ব উৎপন্ন শস্যের উপর দেয় হিসাবে ধার্য করা হইত। সময়ান্তরে জরিপ করিয়া ধার্য খাজনার হ্রাসবৃদ্ধি করা হইত।

সরকার ও রায়তের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দরুন রায়তওয়ারি-ব্যবস্থায় কোন মধ্যবর্তী মালিকের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু রায়তগণের জমি-হস্তান্তরের ক্ষমতা ছিল বলিয়া কার্যক্ষেত্রে রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার এই সুফল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল। রায়তের দখলিকৃত জমির উত্তরোত্তর দরপত্তনি (sub-letting) শুধু কৃষি-জোতের খণ্ডিকরণের পথই প্রশস্ত করে নাই, সরকার ও কৃষিজীবিগণের মধ্যে ব্যবধানেরও সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ব্যবস্থার অধীনে কৃষক ও কৃষি-জোতের অবস্থা কখনও জমিদারী ব্যবস্থার মত অত মন্দ হইয়া উঠে নাই। অনেকের মতে অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নূতন করিয়া জরিপের সময় ভূমি-রাজস্বের এরূপ বৃদ্ধি করা হইত যে খাজনার ভারের দিক দিয়া ইহার সহিত জমিদারী ব্যবস্থার কোন পার্থক্যই ছিল না। উপরন্তু, এই ব্যবস্থা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগিরও প্রসার ঘটাইয়াছিল।*

এই ব্যবস্থার গুণাগুণ

ভারতে ভূমি-রাজস্বের প্রকৃতি (Nature of Land Revenue in India): অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় সাময়িকভাবে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করা হইত। ভূমি-রাজস্বের নির্ধারণের সাধারণ নীতি ছিল নীট আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশকে রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা। সাধারণত জমি হইতে নীট আয় অনুমান করিয়াই লওয়া হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় প্রত্যেক জমিতে এইরূপ নীট

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের সাধারণ নীতি

* R. C. Dutt, *Economic History of India in the Victorian Age*

আয় অনুমান করিয়াই লওয়া হইয়াছিল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমানের পরিবর্তে পরীক্ষা দ্বারা নীট আয় নির্ধারণ করা হইত।

ক। ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ প্রথার ভূমিকা

নীট আয়ের কত অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে গণ্য হইত? প্রাচীনকালে একমাত্র প্রথাই (custom) এই প্রশ্নের মীমাংসা করিত।।হিন্দু যুগে 'মোট' উৎপন্নের (gross produce) মধ্যে রাজার অংশ ছিল এক-ষষ্ঠাংশ। মুসলমান যুগে উহা বৃদ্ধি করিয়া মোট উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ করা হয়।

খ। প্রতিযোগিতার প্রবর্তন

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ-দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে হিন্দু ও মুসলমান শাসকগণের অনুকরণে প্রথানুযায়ীই ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করিত; কিন্তু ক্রমশ সুযোগ বুঝিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার নীতি 'প্রতিযোগিতা'রও (competition) প্রবর্তন করে।

এখানে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার এই নীতি বা প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। রিকার্ডো প্রবর্তিত পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার নীতি অনুসারে ভূমি-রাজস্ব বা খাজনা* নির্ধারিত হয় জমি ইজারা বা ভাড়া লইতে ইচ্ছুক এমন প্রজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা। যে-জমির উর্বরতা যত অধিক লোকে সেই জমি চাষ করিতে বেশী আগ্রহান্বিত হয়। কারণ, এরূপ জমিতে উৎপাদনের ব্যয়-সংকুলান হইয়া অধিক উদ্বৃত্ত (surplus) থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা যদি বিশেষ তীব্র হয় তবে উদ্বৃত্তের সমগ্রটাই ভূম্যধিকারী আদায় করিয়া লইতে পারে।

প্রথম প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এইরূপ চেষ্টাই করিয়াছিল। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, কুটির শিল্পের ধ্বংস, কৃষিজ কাঁচামাল রপ্তানির পরিমাণবৃদ্ধি প্রভৃতি কৃষিজমির জন্য প্রতিযোগিতাকে ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলে। ইহার সুযোগ লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চলে প্রতিবার বন্দোবস্তের সময় পূর্বাপেক্ষা উচ্চ হারে ভূমি-রাজস্ব দাবি করিতে থাকে। কোম্পানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারিগণও প্রতিযোগিতার সুযোগ লইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর হারে খাজনা আদায় করিয়া লইতে থাকে।

প্রথা ও প্রতিযোগিতার সহ-অস্তিত্ব

খাজনা ও ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণে প্রতিযোগিতা এরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেও ইহা কখনও ভূমি-রাজস্বের একমাত্র নির্ধারক হইয়া উঠে নাই। কারণ, সকল ক্ষেত্রে প্রথার প্রভাব কাটাইয়া উঠা কোম্পানীর পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। সুতরাং উভয় নীতিকেই পাশাপাশি বা একসংগে কার্য করিতে দেখা যায়।

প্রথা হইতে প্রতিযোগিতার পরিবর্তন (from custom to competition) সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত না হইলেও, প্রতিযোগিতাই ক্রমে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের

* সাধারণত সরকারের প্রাপ্যকে 'ভূমি-রাজস্ব' (Land Revenue) ও ভূম্যধিকারীর প্রাপ্যকে 'খাজনা' (Rent) বলা হয়।

মুখ্য নীতি হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, কৃষিজীবী ক্রমশ হইয়া উঠে রাজস্ব-ভারে প্রপীড়িত। কুটির শিল্পাদির ধ্বংস এবং ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থার ক্রমশ ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে কৃষিজীবীর পক্ষে কৃষিকার্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার উপায়ও থাকে না। ক্রমবর্ধমান রাজস্ব যোগাইয়া সে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতে থাকে।

প্রতিযোগিতার মুখ্য স্থানাধিকার ও ইহার কুফল

বিভিন্ন ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের অর্ধ-শতাব্দীরও পরে সরকার প্রতিযোগিতার দ্বারা ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের এই কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে আইন প্রণয়নের দ্বারা। খাজনাবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সম্ভাব্যক্ষেত্রে পরিমিত করাই ছিল এইরূপ আইন পাসের উদ্দেশ্য।

গ। আইন দ্বারা প্রতিযোগিতার কুফলের প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা

আইন পাসের পর ভূমি-রাজস্ব বা খাজনা উপরি-উক্ত তিনটি নীতি—যথা, প্রথা (custom), প্রতিযোগিতা (competition) এবং আইন (legislation)—দ্বারাই নির্ধারিত হইতে থাকে। বর্তমানেও ভূমি-রাজস্ব এইভাবে নির্ধারিত হইতেছে। ভূমি-রাজস্বের হার অত্যধিক কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখা হইতেছে। অত্যধিক হইলে আইন প্রণয়নের দ্বারা খাজনা হ্রাসের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

পূর্বে ভূমি রাজস্ব প্রথা, প্রতিযোগিতা ও আইন দ্বারা নির্ধারিত হইত

ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের সূচনা (Beginning of Land Reforms): ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রবর্তিত ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা, কুটির শিল্পসমূহের অবনতি এবং বিভিন্ন উত্তরাধিকার আইনের ফলে কৃষি অর্থ-ব্যবস্থা দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইলেও বহুদিন পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজনীয়তা বিদেশী শাসকেরা বোধ করেন নাই। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন পাসের দ্বারা খাজনাবৃদ্ধি, উৎখাত প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে কৃষিজীবীর অবস্থার সামান্য উন্নতি সাধিত হইলেও, ভূমি-সংগঠনের মূল প্রকৃতি অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। বলা যায়, ১৯৪০ সালে বংগীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশন (Bengal Land Revenue Commission) রিপোর্ট দাখিল করার পূর্ব পর্যন্ত সরকার ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা একরূপ উপলব্ধিই করে নাই; ফলে, কোন ভূমিনীতিও নির্ধারিত হয় নাই।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের প্রথম প্রচেষ্টা

বংগীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশনের অনুসন্ধানের ফলে ভূমিনীতি নির্ধারণ ও ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে শুধু বংগদেশের নহে, সকল প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টিই আকর্ষিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর একটি ভয়ানক সত্য প্রকটভাবে প্রতিভাত করে। ইহা হইল ভারত খাদ্যশস্যে কোনমতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্তে

খাদ্য-সমস্যা ও ভূমি-সংস্কারের গুরুত্ব

পৌছানো হয় যে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ব্যতিরেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব নহে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এই পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু কয়েক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত কার্যক্রম ভূমি-স্বত্ব সংস্কারের প্রচেষ্টাকে মন্থরগতি করিয়া তুলে। মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত কার্যক্রমের অন্যতম নীতি ছিল যে, জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপসাধন প্রভৃতির ন্যায় 'আপাত অনুৎপাদনশীল' কার্যে কোন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য পাইবে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার নিজস্ব সংগতির উপর নির্ভর করিয়াই এই পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ফলে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইবার সময় দেখা যায় যে ইতিমধ্যেই বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হায়দরাবাদ এবং পেপ্সু মধ্যবর্তী ভূমিজীবিগণের বিলোপসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়াছে।

স্বাধীনতার পর সংস্কারের প্রচেষ্টা

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সূত্রপাতে ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য এইরূপ বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া সর্বপ্রথম এক সর্ব-ভারতব্যাপী ভূমি-সংস্কারের জন্য কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয় এবং সর্বাংগীণ ভূমিনীতি নির্ধারণ করা হয়। এখন এই নীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতি (Land Policy under Planned Economy): প্রথম পরিকল্পনার ভূমিনীতি অধ্যায়ের সূচনাতেই বলা হইয়াছিল, "জাতীয় উন্নয়নে জমি ও কৃষিকার্যের মালিকানার সমস্যাই মৌলিকতম সমস্যা।" ভবিষ্যতে আর্থিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি ভূমি-সমস্যার সমাধানের পদ্ধতির উপরই নির্ভর করিবে। একদিকে যেমন পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির যে যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে তাহাতে পৌছানো প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সংগে সংগে ভূমিনীতির মাধ্যমে যাহাতে সম্পদ ও উপার্জনে বৈষম্য ক্রমশ তিরোহিত হয়, শোষণ অপসারিত হয়, প্রজা ও শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয় এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণ সমমর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাহাও দেখা প্রয়োজন। "এই সকল লক্ষ্যেই পৌছানো হইল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের অন্যতম অপরিহার্য অংগ।"*

ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, "প্রকৃতপক্ষে ভূমি-সংস্কারের ফলাফল গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার বাহিরেও প্রভাব বিস্তার করে।"** জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগর ও শিল্প-

* First Five Year Plan ৮৯ পৃষ্ঠা

** Second Five Year Plan ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠা

কেন্দ্রসমূহের প্রসার এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ফলে খাদ্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বৈচিত্র্যময় হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চাকাংক্ষাপূর্ণ শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রম ও সাফল্যের জন্য কৃষিক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, (ক) কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষিগত সংগঠনে সকল প্রতিবন্ধকের অপসারণ করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব কৃষিগত অর্থ-ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত দক্ষতা ও উৎপাদনশক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে, এবং (খ) কৃষি-ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার শোষণ ও সামাজিক অন্যায়ের অবসান ঘটাইয়া কৃষকদের নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ করিতে হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই নীতিই গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় আরও বলা হইয়াছে যে. ভূমি -সংস্কারের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে যে-সকল আইন পাস করা হইয়াছে তাহা যেন দ্রুত কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়, এবং ভূমি-সংস্কার যে বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ তাহা যেন সুস্পষ্টভাবে স্মরণ রাখা হয়।*

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ভূমিনীতি

উপরি-উক্ত লক্ষ্যসমূহের সব কয়টিই একরূপ ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ-মূলক নীতি (Directive Principles), মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। শোষণের সমাপ্তি, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানের সংকোচন, সকলের সমান মর্যাদা ও একই প্রকারের সুযোগসুবিধা এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষির সংগঠন হইল এই সকল নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার (Socialist Pattern of Society) ধারণাও এই দিকে পথনির্দেশ করে। বস্তুত, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে আর্থিক উন্নয়ন সংবিধানভুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শসমূহের সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে বাধ্য। সুতরাং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতি নির্ধারণ ঠিকমতই করা হইয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতির ভিত্তি

এই সকল মৌলিক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ভূমিনীতি নির্ধারণ করা হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, ভূমিনীতি প্রধানত পারিপার্শ্বিক অবস্থারই আপেক্ষিক হইবে। অর্থাৎ, স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইহা নির্ধারণ করিতে হইবে। তবুও পরিকল্পনা কমিশন ভূমি-সংস্কারের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য এক কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। এই সাধারণ কার্যক্রমের মূল নীতিগুলি হইল নিম্নলিখিতরূপ :

পরিকল্পিতঅর্থ-ব্যবস্থার ভূমি-সংস্কারের কার্যক্রম

* Third Five Year Plan ২২০-২২২ পৃষ্ঠা

(ক) ১। রাষ্ট্র এবং কৃষিজীবিগণের মধ্যে সকল প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর অপসারণ;

২। কৃষিজীবিগণকে জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং খাজনা-হ্রাসের জন্য প্রজাস্বত্ব সংস্কার;

৩। জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (fixation of ceiling on holdings) এবং ইহার মাধ্যমে জমির পুনর্বণ্টন;

(খ) ১। জোতের সংহতিসাধনের দ্বারা কৃষির পুনর্বাসন;

২। ভবিষ্যতে অধিকতর অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন;

৩। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার প্রসার।

কার্যক্রমের দুইটি লক্ষ্য

প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রতিবিধান তিনটির উদ্দেশ্য হইল জমির মালিকানায় বৈষম্য দূর করিয়া কৃষিগত সংগঠনকে সুদৃঢ় করা; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বিষয় তিনটির লক্ষ্য হইল সাধারণভাবে গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার এবং কৃষির উন্নতিসাধন করা। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত ভূমি-সংস্কার সম্পর্কিত প্যানেল (Panel on Land Reforms) তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে এই উভয় শ্রেণীর কার্যক্রমকেই যথাসম্ভব দ্রুত সম্পাদন করিবার পরামর্শ দিয়াছে।

ভূমি-সংস্কার কার্যের বিভিন্ন সংস্থা:

নীতিকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে (Policy Implemented So Far): ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার প্রধানত রাজ্য সরকারের কার্য। কিন্তু রাজ্য সরকার সংস্কারকার্যে যাহাতে উপরি-উক্ত নীতি পালন করিয়া চলে তাহা দেখিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন একটি ভূমি-সংস্কার শাখা (a Land Reform Wing) গঠন করে। ইহা ছাড়া প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভূমি-সংস্কারের বিভিন্ন দিকের বিচারবিবেচনার জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় একটি করিয়া ভূমি-সংস্কার সম্পর্কিত প্যানেল (Panel on Land Reform) গঠিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মত তৃতীয় পরিকল্পনার প্যানেলও প্রজাস্বত্ব সংস্কার কমিটি, জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়া কাজ করিতেছে।

১। মধ্যস্বত্ববিলোপ

প্রথম পরিকল্পনার পূর্বেই কয়েকটি রাজ্য মধ্যস্বত্ব বিলোপসাধনের কার্য সুরু করিয়াছিল। এই কার্য মোটামুটি সমাপ্ত হয় ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে। বর্তমানে ২ কোটির উপর প্রজাস্বত্বাধীন জোতের সহিত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, এবং কয়েক স্থানে 'ইনাম' ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে।*

একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া প্রত্যেক স্থলেই মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। মোট দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৬৪০ কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে নগদ ও বণ্ডে ইতিমধ্যেই প্রদান করা হইয়াছে ২২০ কোটি টাকার মত।

* India—1962

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ভূমিনীতিতে প্রজাস্বত্ব সংস্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে প্রজাস্বত্ব সংস্কারের উদ্দেশ্য মোটামুটি দ্বিবিধ—যথা, (১) খাজনাহ্রাস; এবং (২) প্রজাকে জমির মালিকানা-অধিকার প্রদান। খাজনাহ্রাস সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দেয় যে খাজনা কোন ক্ষেত্রেই মোট উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশের অধিক এবং এক-পঞ্চমাংশের কম হইবে না। অনেক রাজ্যেই খাজনা এই দুই সীমার মধ্যে থাকায় ইহাদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় নাই। বাকিগুলিতে খাজনাহ্রাস এবং উহার ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই (বর্তমান মহারাষ্ট্র ও গুজরাট), উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, মহীশূর, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবংগে এই উদ্দেশ্যে আইন ইতিমধ্যেই পাস করা হইয়াছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ মানা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও মহীশূরের কুর্গ অঞ্চলে এক-তৃতীয়াংশ, মহীশূরের অন্যান্য অঞ্চলে এক-পঞ্চমাংশ এবং রাজস্থানে এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা বলিয়া ধরা হইয়াছে। ফলে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ব্যাপারে সমগ্র ভারতের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব হয় নাই। তবে রাজ্যগুলিকে এই সামঞ্জস্যবিধান করিতে পরিকল্পনা কমিশন হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২। প্রজাস্বত্ব সংস্কার

ক। খাজনাহ্রাসের ব্যবস্থা

কৃষিজীবীকে জমিতে মালিকানা-অধিকার প্রদান করার কার্য অধিকাংশ রাজ্যই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমত প্রজাকে স্বত্বের স্থায়িত্ব প্রদান করিয়া তাহাকে উৎখাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে; এবং দ্বিতীয়ত, তাহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রজাবিলি জমির সম্পূর্ণটা বা একাংশ ক্রয় করিয়া লইবার অধিকারও প্রদান করা হইয়াছে।

খ। কৃষিজীবীকে জমির চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান

স্বত্বের স্থায়িত্বপ্রদানের আলোচনা প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধ্যস্বত্বের বিলোপের ফলে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা মাত্র দুই শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—(ক) যাহারা রাষ্ট্রের নিকট হইতে জমি সরাসরি বন্দোবস্ত লয়, (খ) যাহারা মালিকদের নিকট হইতে প্রজা হিসাবে বন্দোবস্ত লয়। বিভিন্ন রাজ্যে এই দুই শ্রেণীর স্বত্বের ক্ষেত্রেই প্রজাকে স্বত্বের স্থায়িত্বপ্রদানের জন্য আইন পাস করা হইয়াছে। আইনে মূলত 'জমি শ্রমজীবী কৃষকের' (land to the tiller) এই নীতিকে মূল লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে আইন পাস হইলেও ইহা সকল স্থানে ঠিকমত কার্যকর হইতেছে না। দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় কৃষি-জোতের মালিক প্রজাদের নিকট হইতে 'স্বেচ্ছাকৃত স্বত্বত্যাগের' (voluntary surrender) দলিল লিখাইয়া লইতেছে। এদিকে কিছু কিছু ব্যবস্থা ইতিমধ্যে অবলম্বন করা হইলেও আরও দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

ভূমি-সংস্কারের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হইতেছে জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা। এই সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া নিম্নে ইহার বিশদ আলোচনা করা হইল।

৩। জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ

জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (Fixation of Ceiling on Land Holdings)ঃ জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা ভূম্যধিকারী ও কৃষক উভয়ের বেলাতেই নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ক্ষেত্রে জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা কত হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য চা, কফি ইত্যাদির বাগিচা, সুসম্বদ্ধ বৃহৎ ফলের বাগান, উন্নত পদ্ধতিতে সংগঠিত কৃষি-জোত ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই বিধি প্রয়োগ করা হইবে না। জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের দুইটি দিক আছে—(ক) ভবিষ্যৎ ভূমিসংগ্রহের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (ceiling on future acquisition), এবং (খ) বর্তমান জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (ceiling on existing holdings)।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও ভূমিসংগ্রহের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারিত হয় নাই। তারপর অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবংগ এবং দিল্লী জোতের ভবিষ্যৎ মাত্রা নির্ধারণকল্পে প্রয়োজনীয় আইন পাস করে। স্বাভাবিকভাবেই এ-ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, পশ্চিমবংগে জোতের ভবিষ্যৎ মাত্রার পরিমাণ ২৫ একর; কিন্তু মহারাষ্ট্রে ইহা ১৮ হইতে ১২৬ একর, দিল্লীতে ৩০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর, আসামে ৫০ একর, উড়িষ্যায় ২৫ হইতে ১০০ একর, ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ মাত্রা

জোতের বর্তমান মাত্রা নির্ধারণ করিতে আরও একটু বিলম্ব হয়। তবে ১৯৬১ সালের মধ্যেই মোটামুটি সকল রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে জোতের বর্তমান মাত্রা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাস হয়, এবং কয়েক ক্ষেত্রে আবার আইনের পরিবর্তনসাধন করা হয়। এখানেও রাজ্যগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, পশ্চিমবংগে জোতের বর্তমান মাত্রার পরিমাণ ২৫ একর। কিন্তু আসামে ইহা ৫০ একর, উড়িষ্যায় ২৫ হইতে ১০০ একর, গুজরাটে ১৯ হইতে ১৩২ একর, ইত্যাদি।

বর্তমান মাত্রা

জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে কৃষকদের মধ্যে কৃষি-জমির সুষম বণ্টন করা। ইহার স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেখানো হয়। (১) কৃষিজীবীদের মধ্যে জমির ব্যাপক ও সুষম বণ্টন হইলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ কার্যে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে, এবং গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। (২) এই ব্যবস্থার ফলে ভূমিহীন কৃষকরা জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিতে পারিবে এবং ইহাতে তাহাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। (৩) জমির

ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করিয়া পরে উদ্বৃত্ত জমি পুনর্বণ্টন করা হইলে ক্ষুদ্র জোতের মালিকরা কাম্য আয়তনের চাষযোগ্য জমি পাইবে। ফলে, তাহাদের জমি হইতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং কৃষি-কার্যেই তাহাদের পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। (৪) জমির সুষম বণ্টন হইলে প্রত্যেকেরই প্রায় সম-পরিমাণ কৃষিজমি থাকিবে; ফলে, জমির সংহতিসাধন অতি দ্রুত করা সম্ভব হইবে। (৫) জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করার পর সরকার যে-সব উদ্বৃত্ত জমি পাইবে উহা সমবায়ের ভিত্তিতে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারিবে; সুতরাং পরোক্ষভাবে সমবায় চাষের পথ সুগম হইবে। অবশ্য ইহার বিপক্ষেও কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করা হয়। বলা হয় যে, জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করিয়া ভূমিহীন কৃষিজীবীর জোতের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি করা যাইবে না। কারণ, উদ্বৃত্ত জমি যাহা পাওয়া যাইবে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত হইবে না। উপরন্তু, ইহার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হইতে পারে। কারণ, জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা হইলে জোতের পরিমাণ ক্ষুদ্রাকার হইবে এবং উহাতে আধুনিক কৃষি-পদ্ধতি দক্ষতার সহিত নিয়োগ করা যাইবে না। ইহা ছাড়া আরও বলা হয় যে, কৃষিজমির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা হইলে অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রেও এইরূপ মাত্রা স্থির করার প্রয়োজন দেখা দিবে। আবার, অর্থনৈতিক জোতের আয়তন কি পরিমাণ হইবে সে-সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা নাই। সুতরাং জমির ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয় এবং ইহার সংগে নানাবিধ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে।

জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলিই হইল জোতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মাত্রা নির্ধারণে বিলম্বের কারণ। জোতের মাত্রা নির্ধারণের নীতি কি হইবে সে-সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য নিযুক্ত কুমারাপ্পা কমিটি (Kumarappa Committee) অভিমত প্রকাশ করে যে, অর্থনৈতিক জোতের কোন নির্দিষ্ট আয়তন নাই, তবে উহাকে দুইটি সর্ত পূরণ করিতে হইবে: (ক) উহা কৃষকের যুক্তিসংগত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করিবে, এবং (খ) উহা হইতে অন্তত একজোড়া বলদ সমেত একটি স্বাভাবিক আয়তনের কৃষক-পরিবারের পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। এই অভিমতের ভিত্তিতেই জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা হইতেছে। এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে যে ঊর্ধ্বতন মাত্রা যেন উপরি-উক্ত অর্থে অর্থনৈতিক জোত অপেক্ষা কম এবং 'কাম্য জোত' (optimum holding) অপেক্ষা অধিক না হয়। কাম্য জোত আয়তনে অর্থনৈতিক জোতের (যাহাকে পারিবারিক জোতও বলা হয়*) মোটামুটি তিনগুণ হয়।

ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণে বিলম্বের কারণ

* ৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা দেখ।

জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে যে-জমি পাওয়া গিয়াছে বা যাইতেছে প্রধানত ভূমিহীন কৃষিজীবিগণের মধ্যেই তাহাদের পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

জমির পুনর্বণ্টন

পশ্চিমবংগে ১৯৬১ সালের শেষ পর্যন্ত ২·৭ লক্ষ একরের উপর জমি পুনর্বণ্টিত হইয়াছে· ভূদান ও গ্রামদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জমির সম্পর্কেও এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের নীতি সর্ববাদিসম্মত নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা বৃহদায়তন কৃষিকার্যের, যাহা বর্তমানে কৃষি-সংস্কার ও খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য অপরিহার্য, প্রতিবন্ধকতাই করা হইবে। ইহা ছাড়া দেখা গিয়াছে যে, নির্ধারিত মাত্রা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলবৎ করা যাইতেছে না। অতএব, সমবায় কৃষির প্রসারের সম্যক ব্যবস্থা না করিয়া এ-পথে বিশেষ অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

এই সমবায়িক কৃষিই ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থার দ্বিতীয় দিকের অন্তর্ভুক্ত। উহার সহিত জড়িত আছে সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থা। এখন এ-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে। অপর দুইটি আনুষংগিক বিষয়—যথা, জোতের সংহতিসাধন ও ভবিষ্যৎ অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে।*

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য (Cooperative Farming) : ভারতে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে ধারণা প্রসারলাভ করে ১৯৪৯ সালে লক্ষ্ণৌ-এ

এ-সম্বন্ধে ধারণার প্রসার

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কলাকৌশল সংক্রান্ত অধিবেশনের (Technical Meeting of the FAO) পর হইতে। ঐ অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে কৃষির পুনর্বাসনের জন্য সমবায় পদ্ধতিই অবলম্বনীয় পন্থা ; এই সমস্ত পদ্ধতির প্রসারকল্পে বিভিন্ন দেশের সরকারকে সকল সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য ও কৌশলগত উপদেশ প্রদান করিবার সুপারিশ করা হয়।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্বন্ধে ধারণা অবশ্য নূতন নয়। ১৯৫৯ সালের বহুপূর্বেই বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন আকারে ও পরিমাণে ইহা লইয়া পরীক্ষা শেষ করিয়াছিল এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন ও উহার গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, ইস্‌রায়েল, মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, সুইডেন এবং নয়া চীনে এই পদ্ধতির সাফল্য বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

উপরি-উক্ত সুপারিশের ফলে এবং বিভিন্ন দেশের আদর্শের অনুপ্রেরণায় ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের উপর

প্রথম পরিকল্পনায় সমবায়িক কৃষিকার্য

বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ইহার মাধ্যমেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে বা সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থার (Cooperative Village Management) পৌঁছিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

---

* ৮৪-৮৬ পৃষ্ঠা।

ইহার বেশীর ভাগই কিন্তু ব্যয়িত হয় নাই। যাহা হউক, ঐ পরিকল্পনার শেষে ভারতে সমবায়িক কৃষি-সমিতির সংখ্যা ১৩৯৭-তে পৌছায়।

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের জন্য ১'৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং ৩০০০-এর উপর সমবায়ী কৃষি-সমিতি স্থাপন করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৫৬ সালে একদল ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে সমবায় কৃষি-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য নয়া চীনে প্রেরণ করা হয়। পাতিল কমিটি (Patil Committee) এই দলের রিপোর্টের পর্যালোচনা করিয়া ভারতে ব্যাপকভাবে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য প্রবর্তনের সুপারিশ করে এবং সুপারিশমত কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। ফল কিন্তু বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায়িক কৃষিকার্য

১৯৬০ সাল পর্যন্ত সকল ধরনের সমবায়িক কৃষি-সমিতির সংখ্যা ৫৫০০-এর উপর পৌছিলেও প্রকৃত সমবায়িক সমিতির সংখ্যা ছিল ১৬০০-এর মত।* সুতরাং স্যর ম্যালকম ডার্লিংকে উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, "সমবায়িক কৃষিকার্য কৃষকগণকে মোটেই উৎসাহিত করিতে পারে নাই। এই ধরনের সমিতি যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির জন্যই হইয়াছে, সমবায়িক আদর্শের অনুপ্রেরণায় নহে।" স্বতই স্যর ম্যালকম এই বিষয়ে অতি সতর্কতার সহিত চলিবার পরামর্শ দেন।

১৯৫৯ সালে কৃষির পুনর্গঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাবে (Nagpur Resolution) কিন্তু স্যর ম্যালকমের উক্ত সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই। প্রস্তাবে তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশকে সেবা-সমবায় সমিতি (Service Cooperatives) দ্বারা ছাইয়া ফেলিবার এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যৌথ সমবায়ী কৃষি-সমিতি (Joint Cooperative Farms) স্থাপন করিবার কথা বলা হয়। ইহার উপর পুনর্বণ্টিত যে-সকল জমিতে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে সেখানেও সমবায় কৃষি-সমিতি গঠনের নীতি ঘোষণা করা হয়। মোটকথা, কৃষির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যকে এক বিশিষ্ট স্থান প্রদান করা হয়।

কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাব ও পরবর্তী অধ্যায়

এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়িক কৃষি প্রসারের কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়। ইহাতে মোট ৫'৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২০টি সমবায়িক কৃষি পথপ্রদর্শক পরিকল্পনা (pilot projects) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পরিকল্পনা-কেন্দ্রে ১০টি করিয়া বা মোট ৩২০০টি সমবায়িক কৃষি-সমিতি থাকিবে, এবং ইহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরিকল্পনা অঞ্চলের (project area) বাহিরে

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়িক কৃষিকার্য

* Statistical Statements relating to the Cooperative Movement in India for the year 1959-60

আরও ৪০০০ সমিতি গড়িয়া উঠিবে। অবশ্য সমবায়িক কৃষি-ব্যবস্থায় সংখ্যা অপেক্ষা উৎকর্ষের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই কার্যক্রমকে সফল করিবার জন্য একটি জাতীয় সমবায়িক কৃষি-উপদেষ্টা বোর্ড (National Cooperative Farming Advisory Board) স্থাপন করা হইয়াছে। কেন্দ্রের অনুসরণে ১৯৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৩টি রাজ্যেও অনুরূপ বোর্ড স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৪টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া কর্মীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এইভাবে সমবায়িক কৃষির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইলেও এই পন্থার যৌক্তিকতা লইয়া বিতর্কের অবসান ঘটে নাই। এই বিতর্কের দরুন সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের বিভিন্ন রূপের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য মোটামুটি চারি প্রকার রূপ গ্রহণ করিতে পারে—যথা, (ক) সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিকার্য (cooperative joint farming), (খ) সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য (cooperative tenant farming), (গ) সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের কৃষিকার্য (cooperative better farming), এবং (ঘ) সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক কৃষিকার্য (cooperative collective farming)।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের বিভিন্ন রূপ :

প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে কতিপয় কৃষকের জোতের খণ্ডীকৃত (এবং অসম্বদ্ধও) অংশ সমবায় সমিতির অধীনে একত্রিত করিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করা হয়। প্রত্যেক কৃষক তাহার ব্যক্তিগত জমির মালিক হিসাবে উৎপন্নের কিছু অংশ পায়, কৃষি-শ্রমিক হিসাবে সে তাহার মজুরি পায় এবং মুনাফারও অংশ পায়। এই প্রকার সমবায় কৃষি-সমিতিকেই প্রকৃত সমবায়িক কৃষি-সমিতি বলিয়া গণ্য করা হয়। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া ইহা সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থার (cooperative village management) অনুরূপ।

ক। যৌথ পদ্ধতিতে কৃষিকার্য

দ্বিতীয় বা 'কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য' পদ্ধতিতে সমবায় সমিতি কৃষিকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। ইহা ইহার মালিকানায় যে-জমি থাকে তাহা কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া কৃষকগণকে ভাড়া দেয়। সংগে সংগে আবার কৃষকগণকে বীজ সার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করে। কৃষকগণ সমবায় সমিতির প্রজা হিসাবে নির্দিষ্ট প্রণালীতে সুচারুভাবে কৃষিকার্য করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তরাই বা দণ্ডকারণ্যের ন্যায় যেখানে অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত বা পতিত জমির পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে বা হইতেছে সেখানেই এই প্রকার সমবায় পদ্ধতি কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু যেখানে কৃষকই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের মালিক সেখানে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্ন উঠে না।

খ। কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য

তৃতীয় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের আদর্শ হইল উন্নততর কৃষিকার্য, বৃহদায়তনে কৃষিকার্য নয়। ইহাতে সমবায় সমিতি উৎকৃষ্ট বীজ সার প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ সম্বন্ধে অবহিত করিয়া কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। এই প্রকার সমবায় পদ্ধতিতে কলাকৌশলের উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া উন্নত ধরনের কৃষিকার্যের পথ সুগম করা হয়। কলাকৌশলের উন্নয়ন দরিদ্র কৃষকের একার পক্ষে সম্ভব হয় না বলিয়া সমবায়ের পথে অগ্রসর হইতে হয়।

গ। উন্নত ধরনের কৃষিকার্য

সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক কৃষিকার্য সম্পর্কে ধারণা সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে আসিয়াছে। সামগ্রিক খামার প্রথা সমবায় পদ্ধতিরই একটি রূপ। তবে কৃষি-জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বীকার করা হয় না। সামগ্রিক খামার প্রথায় কৃষিজমির মালিকানা থাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের; কিন্তু সামগ্রিক খামারকে ইহা চিরকালের জন্য অর্পণ করা হয়। সামগ্রিক খামারের অন্য সকল উপকরণ এবং ইহা হইতে উৎপন্ন ফসল সামগ্রিক খামার সংগঠনকারী কৃষকগণের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রকে দেয় কর ইত্যাদি মিটাইয়া যে নীট লভ্যাংশ থাকে তাহা শ্রমের ভিত্তিতে সামগ্রিক খামারের অংশীদারগণের মধ্যে শ্রমের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে বণ্টিত হয়।*

ঘ। সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক কৃষিকার্য

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সমর্থন (Case for Cooperative Farming): কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির, বিশেষ করিয়া খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং কৃষিকে লাভজনক ভিত্তিতে সংগঠিত করিবার অপরিহার্যতা সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের দিকে পথ নির্দেশ করে। আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শতকরা ৩০-৩৩ ভাগ কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির এবং শতকরা ৩৩ ভাগ খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছে। কৃষিজমির দুষ্প্রাপ্যতাহেতু ব্যাপক কৃষিকার্যের সুযোগ নাই বলিয়া আত্যন্তিক ও বৃহদায়তন (intensive and large-scale) কৃষিকার্যই হইল উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছিবার একমাত্র পন্থা, এবং বর্তমান অবস্থায় একমাত্র সমবায় পদ্ধতিতেই আত্যন্তিক ও বৃহদায়তন কৃষিকর্ম সম্পাদনের আশা করা যায়।

১। উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদায়তন ও আত্যন্তিক কৃষিকার্য শুধু যে উৎপাদন-বৃদ্ধিরই ব্যবস্থা করে তাহা নহে, ইহা উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস করে। অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিকার্যকে (subsistence farming) লাভজনক পেশায় পরিণত করিতে হইলে সমবায় পদ্ধতিতে সম্পাদন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সমবায়িক পদ্ধতিতে

২। উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা

* Karpinsky, The Social and State Structure of the USSR। ভারতে যে-সকল সমবায়িক সামগ্রিক কৃষি-সমিতি (Cooperative Collective Farms) আছে তাহাদের প্রকৃতি সোবিয়েত ইউনিয়ন বা নয়া চীনের সামগ্রিক খামারের মত নয়। সমিতির উপ-আইনে (bye-law) ঐরূপ নামকরণ করা হইয়াছে বলিয়াই উহারা ঐভাবে অভিহিত হইয়াছে।

কৃষিকার্য কৌশলগত (technical) এবং পরিচালনাগত (managerial) উভয় প্রকার ব্যয়সংক্ষেপই সম্ভব করে।

তৃতীয়ত, ভূমি সংস্কারের অন্যতম উপাদান জোতের সংহতিসাধনের দ্বারা মূলত সমবায়িক কৃষির মাধ্যমেই করা যাইতে পারে। জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ এবং অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের ফলে জোতের পরিমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র হইতে এবং পূর্বের ন্যায় অসম্বদ্ধ থাকিতে বাধ্য। এই সকল ক্ষুদ্র ও অসম্বদ্ধ জোতে মাত্র সমবায়িক পদ্ধতিতেই বৃহদায়তন কৃষিকার্য কাম্যভাবে সম্পাদিত হইতে পারে।

৩। ভূমি-সংস্কার ও ক্ষুদ্র জোত সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অংগীভূত সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ গঠনের নীতিও এই নির্দেশ দেয়। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ গঠন দুইভাবে করা যাইতে পারে: (ক) উৎপাদনের সমগ্র উপকরণ সামাজিক মালিকানার অধীনে আনয়ন করিয়া, অথবা (খ) সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের সমন্বয়ের ব্যবস্থা করিয়া। আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় কৃষির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। জমির মালিকানা ভারতীয় কৃষকের অন্যতম প্রধান আকাংক্ষিত বস্তু, অথচ অর্থ-নৈতিক প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের অস্তিত্ব বজায় রাখা যাইতে পারে না। সমবায়িক কৃষি পরস্পরবিরোধী এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে। সুতরাং বর্তমানে এই পদ্ধতিই একমাত্র অবলম্বনীয় পন্থা বলিয়া মনে হয়। ইহা উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শোষণের বিলুপ্তিসাধন উভয়েরই অনুপন্থী; এবং এই দুইটিই হইল সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূলকথা।

৪। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিফলন

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের বিরোধিতা (Opposition to Cooperative Farming): উপরি-বর্ণিত প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সত্ত্বেও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের তীব্র বিরোধিতা করা হইয়াছে। এই বিরোধিতাকে প্রধানত তিনদিক হইতে দেখা যাইতে পারে: (ক) রাষ্ট্র-নৈতিক, (খ) অর্থনৈতিক এবং (গ) সামাজিক। রাষ্ট্রনৈতিক বিরোধিতা আসিয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল হইতে। ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য প্রসারের সুযোগ লইয়া কংগ্রেস দল কৃষকদের উপর অতিমাত্রায় প্রভাবপ্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছে। কারণ, বর্তমান অবস্থায় যে-সকল সমবায় কৃষি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির আশাতেই হইতেছে, সমবায়িক আদর্শের অনুপ্রেরণায় নহে। কিছুদিন পূর্বে পার্লা-মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত একটি সর্বদলীয় কমিটি এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছে। কমিটি আরও বলিয়াছে যে, সমবায়িক কৃষি-সমিতিসমূহে পূর্বতন জমিদার জোতদার প্রভৃতির প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সাধারণ কৃষক বিশেষ উপকৃত হয় নাই বা সমবায়ী মনোভাবও সম্প্রসারিত হয় নাই।

তিনদিক হইতে বিরোধিতা

১। রাষ্ট্রনৈতিক বিরোধিতা

এই সমবায়ী মনোভাবের অভাব সমবায় পদ্ধতিতে কৃষির প্রসারের বিরুদ্ধে অন্যতম অর্থনৈতিক যুক্তিও বটে। বলা হয়, যেখানে সমবায়ী আদর্শের অভাবে সমবায় কৃষিঋণ ব্যবস্থাই সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই সেখানে সমবায় কৃষি-পদ্ধতি যে সফলতা লাভ করিবে এরূপ আশা করা অযৌক্তিক।

২। অর্থনৈতিক বিরোধিতা

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় কৃষকগণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগিও সমবায় পদ্ধতির পরিপন্থী। প্রাচীনকালে পঞ্চায়েত, যৌথ পরিবার প্রভৃতি যে-সকল ঐক্য এবং সমষ্টি সাধক প্রতিষ্ঠান ছিল আজ তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগির প্রসারের ফলে ভারতীয়গণ আজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। এরূপ ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিকার্যের প্রসার ঘটিতে পারে না। তৃতীয়ত, সমবায় কৃষি-সমিতি সংগঠন ও পরিচালনা করিবার যোগ্য লোকেরও ভারতে বিশেষ অভাব। চতুর্থত, সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সংগঠিত করা হইলে উৎপাদিত পণ্য সদস্যদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করা হইবে তাহা লইয়া নানারূপ জটিলতা দেখা দিবে। জমির উৎপাদিকাশক্তির বিভিন্নতার দরুন জমির মালিকানাকে ভিত্তি করিয়া উৎপাদন বণ্টন করা অযৌক্তিক ও অসুবিধাজনক হইবে। পঞ্চমত, সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য করা হয় বলিয়া ইহা অল্পবিস্তর যান্ত্রিক রূপ ধারণ করিবেই। বস্তুত, কৃষির যন্ত্রিকরণের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই সমবায় পদ্ধতির পথে অগ্রসরের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু যন্ত্রিকরণের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা সাধারণ সমবায় সমিতির সাধ্যাতীত। পরিশেষে, কৃষির যন্ত্রিকরণের ফলে যে বহুসংখ্যক কৃষক বেকার হইয়া পড়িবে তাহাদের পুনর্নিয়োগের সমস্যা হইল এই পদ্ধতির আর একটি প্রধান অসুবিধা।

সামাজিক দিক হইতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে, সমবায় পদ্ধতির ফলে দেশের কৃষি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া সামগ্রিক আকার (collective form) ধারণ করিবে; কৃষিজীবিগণের স্বাতন্ত্র্য বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। সমাজতন্ত্রের আদর্শ নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হইলেও আমাদের দেশ এখনও যৌথ সম্পত্তির ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই। সুতরাং কৃষির ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যবস্থা জোর করিয়া চাপানো উচিত নহে; চাপাইতে গেলে বিপ্লব ঘটিতে পারে।

৩। সামাজিক দিক হইতে বিরোধিতা

ভারতে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সম্ভাবনা (Prospects of Co-operative Farming in India): উপরি-বর্ণিত সমর্থন ও বিরোধিতার ভিত্তিতেই ভারতে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের প্রসারের সম্ভাবনা বিচার করিতে হইবে। এই প্রসংগে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য সোবিয়েত ইউনিয়ন, নয়া চীন, ইস্রায়েল বা অন্য কোন দেশের অন্ধ অনুসরণ করা চলিতে পারে না। আমাদের কৃষকগণের অজ্ঞতা, সংস্কারান্ধতা এবং বিশেষ সামাজিক অবস্থার জন্য সমবায় কৃষি-পদ্ধতির সম্প্রসারণের কার্যক্রমকে

এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যে তাহা যেন দেশের সর্বত্র প্রবর্তনযোগ্য হয়। অর্থাৎ, উহা যেন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল (flexible) হয়। যে-সকল অঞ্চলে সমবায়িক কৃষি সুরু করা যাইতে পারে তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই সকল 'পথপ্রদর্শক পরিকল্পনাগুলির' (pilot projects) উপরই সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সফলতা নির্ভর করিবে। সুতরাং স্থান-নির্বাচন ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় এইভাবেই সমবায়িক কৃষির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পরিবর্তনশীল কার্যক্রমে সমবায়িক কৃষির পূর্ব-বর্ণিত চারিটি রূপের মধ্যে কোন একটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা চলিবে না। ভারত একটি বিশাল দেশ; উহার অঞ্চলগত পার্থক্যও অতি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং একই প্রকার সমবায় কৃষি-পদ্ধতি চলিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, যে-সকল অঞ্চলে পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসন করা হইতেছে যে সামগ্রিক পদ্ধতিতে সমবায়িক কৃষির (cooperative collective farming) প্রবর্তন করা যাইতে পারে এবং অন্যান্য স্থানে সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিকার্য বা উন্নততর কৃষিকার্য বা কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য লইয়া পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো যাইতে পারে। যাহা হউক, অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে এবং বর্তমান অবস্থাকে যথাসম্ভব বজায় রাখিয়াই সমবায়িক কৃষির সম্প্রসারণে অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতে সমবায়িক কৃষি-পদ্ধতির প্রসারের জন্য জার্মান বিশেষজ্ঞ ডক্টর অটো শিলার্‌ও (Dr. Otto Schiller) অনুরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, অভিজ্ঞতাকে সংগী করিয়া সমবায় কৃষিকার্যের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-কার্যের সম্প্রসারণে অনুসরণীয় দুইটি নীতি

এই পথে বিভিন্ন পর্যায়

অতএব, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণে দুইটি নীতিকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হইবে—(ক) কার্যক্রমের পরিবর্তনশীলতা (flexibility), এবং (খ) উহার প্রবর্তন ব্যাপারে সতর্কতা। অবশ্য সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক কৃষিকার্যই হইবে চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিতে হইবে। শ্রীনেহরু এইরূপ চারিটি পর্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, সমবায়িক ঋণ, সমবায়িক সেবা, সমবায়িক যৌথ কৃষিকার্য এবং সমবায়িক সামগ্রিক কৃষিকার্য।

বর্তমানে এই মতই কার্য করা হইতেছে। সমবায়িক ঋণ (cooperative credit), সমবায়িক সেবা (cooperative service) এবং সমবায়িক যৌথ কৃষিকার্য (cooperative joint farming) সুগঠিত করিয়া তবেই সমবায়িক সামগ্রিক খামার গঠনে দৃষ্টি দেওয়া হইবে এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত লক্ষ্য সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থায় পৌছিবার প্রচেষ্টা করা হইবে। সমবায়িক কৃষিতে যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে যাহাতে কৃষি-শ্রমিকগণ কর্মচ্যুত না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হইতেছে।

সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থা (Cooperative Village Management) : সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়াই প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভূমি-সংস্কারের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়, এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় এই লক্ষ্যাভিমুখেই চলা হইতেছে।

শ্রীতারলোক সিং (Tarlok Singh) সর্বপ্রথম তাঁহার 'দারিদ্র্য এবং সামাজিক পরিবর্তন' * নামক গ্রন্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, জমির উপর সাম্প্রদায়িক মালিকানা ব্যতীত কৃষির উন্নয়নের কাম্য পটভূমিকা গঠন করা সম্ভব হইবে না। ভারতে কৃষিজমি সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা বহুদিন হইতেই সরকার ও অর্থবিদ্যাবিদগণকে বিব্রত করিয়া আসিতেছিল। খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের প্রতিবিধানকল্পে সকলেই বৃহদায়তনে কৃষিকার্যের নির্দেশ করিলেও কোন্ পদ্ধতিতে ইহা কার্যকর করা সম্ভব হইবে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল। কেহ বা সোবিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে সামগ্রিক খামার প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কেহ বা চিরাচরিত প্রথায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সুপারিশ করিয়াছিলেন। মধ্যপন্থা অনুসরণ করিয়া তারলোক সিং বলিলেন, ভারতের পক্ষে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হইল সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থা। ইহাতে সোবিয়েত দেশের মত কৃষকের জীবনের সমগ্র স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিবার প্রয়োজন হয় না; আবার ইহা সাধারণ সমবায় পদ্ধতির মত অসংহত ব্যবস্থাও নয়।

পদ্ধতিটির প্রথম প্রচার করেন শ্রীতারলোক সিং

বহু বিচারবিবেচনার পর পরিকল্পনা কমিশন তারলোক সিং-এর অভিমতকেই সমর্থন করে এবং ঘোষণা করে যে, ভারতের পক্ষে ইহাই হইল প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। কমিশনের মতে, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের দ্বারা কৃষির উন্নতি করা সম্ভব হইলেও গ্রামীণ পুনর্গঠনের (rural reconstruction) প্রশ্ন ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ও বিচার করিতে হইবে। গ্রামপর্যায়ে এরূপ একটি সংগঠন অবশ্যই থাকিবে যাহা সমগ্র সম্প্রদায় হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া গ্রামোন্নয়নের দায়িত্বকে বহন ও কার্যকর করিবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতই হইল এই সংগঠন। ইহার অধীনে গ্রামের কৃষিজমি ন্যস্ত করা হইবে এবং ইহা সকল প্রকার কৃষিগত ও অ-কৃষিগত কার্য সম্পাদন করিয়া গ্রামের সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবে।** কিন্তু এই সংস্থা বা গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রাথমিক লক্ষ্য হইবে বৃহদায়তন কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করিয়া গ্রামের কৃষিজমি ও অন্যান্য সম্পদের সম্যক ও পূর্ণ ব্যবহার করা।

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার স্বরূপ

বৃহদায়তন কৃষির দিক হইতে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই পদ্ধতি পরিচালনাকারী সংস্থা বা গ্রাম-পঞ্চায়েতের নির্দেশেই সুরু হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত কৃষি সম্পর্কিত সকল কার্য সম্পাদিত হয়। সংস্থা নির্দেশ দেয় কিভাবে

---

* Poverty and Social Change

** First Five Year Plan ১৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা

এবং কি কি ফসল উৎপন্ন করা হইবে, বিশেষ বিশেষ খামারের আয়তন কি হইবে, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া উন্নত বীজের যোগান, সারের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা, প্রয়োজনমত যন্ত্রাদির সরবরাহ, কৃষির পরিপূরক শিল্পের সংগঠন প্রভৃতিও হইল এইরূপ গ্রাম-পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। পরিশেষে আছে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রশ্ন। বস্তুত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্ত্রিক কৃষিকার্যই (mechanized agriculture) সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য প্রয়োজন হইলে ইহা গ্রামের সমগ্র কৃষিজমি একত্রিত করিয়া একটিমাত্র জোতে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারে; আবার কাম্য বিবেচনা করিলে এই একত্রিত জমিকে কয়েক খণ্ডে (blocks) বিভক্ত করিয়া তাহাতেও কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে পারে। জোতের সংহতিসাধন ছাড়াও ইহা পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে।

কৃষির যন্ত্রিকরণ এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সহিত সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থার প্রধান পার্থক্য হইল এইখানে যে, প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সমবায়ী কৃষক ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পর সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কৃষকের জমি চিরকালের জন্য গ্রামীণ সংস্থার পরিচালনাধীনে ন্যস্ত হয়। জমি গ্রামীণ সংস্থার পরিচালনাধীনে থাকিলেও যৌথ খামারের মত কৃষকের মালিকানা বিলুপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বীকৃত থাকে যদিও বা কোন নির্দিষ্ট খণ্ডের উপর তাহার মালিকানা স্বীকার করা হয় না।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-কার্যের সহিত ইহার পার্থক্য

সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থাকে যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানের (joint stock company) সহিত তুলনা করা চলে। যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক অংশীদারেরই মালিকানা তাহার অংশ (share) অনুসারে নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু কাহারও প্রতিষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর দাবি থাকে না। সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাতে তেমনি কৃষকের অংশ নির্দিষ্ট থাকিলেও জমির কোন নির্দিষ্ট অংশের উপর তাহার দাবি থাকে না। কৃষকের মালিকানা নির্দিষ্ট বলিয়া সে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ (ownership dividend) পাইয়া থাকে এবং সে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিলে শ্রমের জন্য অপর সকলের মত মজুরিও পাইয়া থাকে।

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা যৌথ মূলধনী প্রতি-ষ্ঠানের সহিত তুলনীয়

গুণাগুণ: আদর্শের দিক দিয়া সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থাকে কাম্যতম বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাতে কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের সর্বাধিক সম্ভাবনাই রহিয়াছে, কারণ ইহাতে বৃহদায়তনে ও আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষির মাধ্যমে উৎপাদনবৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয়হ্রাস উভয়ই সম্ভব হইতে পারে। ইহা ছাড়াও এই পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণ সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার অধীনে সকলে একই সংস্থার সমমর্যাদাসম্পন্ন সভ্য

গুণ

হিসাবে পরিগণিত হয় এবং উৎপাদনক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সকলে একই সুযোগ পায়। প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, ইহার ফলে সম্পত্তি বর্ণ ও সামাজিক মর্যাদাজনিত সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তিরোহিত হইবে। উপরন্তু, গ্রামস্থ সকলেই একই সংস্থার সভ্য বলিয়া গ্রামের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ দূর হইবে। ইহাতে অর্থ ও শ্রমের বহু অপচয় রহিত হইবে এবং গ্রামবাসিগণ গঠনমূলককার্যে নিজেদের নিয়োগ করিতে পারিবে।

এইভাবে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হইলেও ইহাকে প্রকৃষ্ট রূপ দান করিবার জন্য পদে পদে বিচারবিবেচনা ও পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে;

প্রতিবন্ধক

ভারতের গ্রামাঞ্চল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের আবাস। যাহা কিছু ভাল তাহাকেই গ্রহণ করিবার জন্য গ্রামবাসীরা প্রস্তুত নহে। সুতরাং গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থার এই ধরনের পুনর্গঠনের কার্যে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতকে একত্রিত করিয়া বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করিলে শ্রমের দিক দিয়া ব্যয়সংক্ষেপের (economy of labour) জন্য বহুসংখ্যক কৃষক পূর্ণ বা অর্ধ-বেকার হইয়া পড়িবে। তাহাদের নিয়োগের সমস্যা হইল সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি। এইজন্য অনেকে বলেন, এই উদ্বৃত্ত কৃষি-শ্রমিকদের জন্য বিকল্প নিয়োগের যথোচিত ব্যবস্থা না করিয়া সমবায় গ্রাম-পদ্ধতির পথে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। বামপন্থিগণ আবার এই ব্যবস্থায় জমির ব্যক্তিগত মালিকানার কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজিয়া পান না। ইঁহাদের মতে, কেবলমাত্র শ্রমের জন্যই এবং শ্রমের অনুপাতে কৃষি হইতে লভ্যাংশ বণ্টিত হওয়া উচিত, মালিকানার জন্য এবং মালিকানার অনুপাতে নহে। পরিশেষে, সাধারণ সমবায় পদ্ধতি অবলম্বনের বিরুদ্ধে চিরাচরিত যুক্তিগুলিও সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবতারণা করা হয়—যথা, পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপযুক্ত লোকের অভাব, যৌথ উদ্যোগের ত্রুটি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের উৎকর্ষ, ইত্যাদি।

পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াই এ-সম্বন্ধে পরিকল্পনা করিয়াছে। ফলে, কমিশন সহসা কিছু না করিয়া ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়াছে। প্রথমে সমবায়িক কৃষির প্রসারসাধন করিতে হইবে। এই সময় কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে কিছু জমিতে কৃষিকার্য সম্পাদন করিতে পারে। ক্রমশ ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে জমির পরিমাণ কমাইয়া সমবায়িক সমিতির অধীন জমির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে; এবং পরিশেষে সকল সমবায়িক কৃষি-সমিতি একত্রিত করিয়া গ্রামস্থ সকল কৃষিজমিই সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থার দায়িত্বে অর্পণ করিতে হইবে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিত সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থা সার্থকতায় রূপান্তরিত হইবে। ৩

পরিকল্পিত পদ্ধতিতে জমির ব্যবহার (Planned Land Use): পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে ভূমি-সংস্কার কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ব-বর্ণিত পদ্ধতিতে ভূমি-সংস্কারই এ-বিষয়ে শেষ কথা নয়। যাহাতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনে জমি ঠিকমত ব্যবহৃত হয় তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নচেৎ, বাজারের পরিবর্তনশীলতা অনুসারে জমি এক ব্যবহার হইতে অন্য ব্যবহারে হস্তান্তরিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে একটি জমির ব্যবহার সংক্রান্ত কমিশন (Land Use Commission) গঠন করা হইয়াছে। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে জমির ব্যবহার বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

জমির ব্যবহার সংক্রান্ত কমিশন

পশ্চিমবংগে ভূমি-সংস্কার (Land Reforms in West Bengal) ঃ ভারতে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার ব্যাপারে বাংলাদেশকে পথিকৃৎ হিসাবে নিশ্চয় গণ্য করিতে হইবে। অবিভক্ত বাংলা প্রথমে ভূমি-রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করিয়া এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীন ভারতে যখন বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্য ভূমি-সংস্কার কার্যে অগ্রসর হইল, পশ্চিমবংগ তখন এ-বিষয়ে পশ্চাতেই পড়িয়া রহিল। এমনকি পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার পরও পশ্চিমবংগ বেশ কিছুদিন একপ্রকার নিশ্চেষ্ট রহিল। অবশেষে যখন অবশিষ্ট রাজ্যসমূহও ভূমি-সংস্কারের পথে পদসঞ্চার করিল এবং কেন্দ্রীয় ভূমি-সংস্কার কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইল তখন পশ্চিমবংগকে সংস্কারক রাজ্যগুলির অনুবর্তী হইতে দেখা গেল। জমিদারীর বিলোপসাধনের জন্য ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবংগের বিধানসভায় উত্থাপিত বিল ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আইনে পরিণত হইল। এই আইন ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবংগ ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ আইন (The West Bengal Estates Acquisition Act, 1953) নামে পরিচিত।

পশ্চিমবংগে ১৯৫৩ সালের ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ আইন ও ইহার প্রবর্তন

আইনটির মূল বিষয় হইল এইরূপ ঃ উক্ত তারিখ হইতে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবংগে রাষ্ট্র এবং রায়ত অথবা ভূমির অন্যান্য প্রকার ব্যবহারকারীর মধ্যে সকল প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপসাধন করা হইবে। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী জমি হইতে তাঁহাদের নীট আয় অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাইবেন। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ব্যাপারে গতিশীলতার নীতি (principle of progression) অনুসরণ করা হইবে। অর্থাৎ, নীট আয় যত অধিক হইবে, ক্ষতিপূরণের হারও তত কমিয়া যাইবে। মধ্যস্বত্বভোগীরা সর্বাধিক ২৫ একর জমি নিজ নিজ দখলে রাখিতে পারিবে।*

আইনটির মূলকথা

পশ্চিমবংগে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা ছিল যে, বিলোপসাধনের জন্য আইন ভূমি-সংস্কারের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য—ভূমির

---

* মূল আইনে ৩৩ একর নির্ধারণ করা হইয়াছিল। পরে ইহাকে সংশোধন করিয়া ২৫ একর করা হয়।

পুনর্বণ্টন এবং কৃষিজীবীদের খাজনার ভার হ্রাস—কোনটিরই ব্যবস্থা করে নাই। সুতরাং জমিদারী বিলোপের ফলে জমিদারশ্রেণীর পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্বভোগী হইয়া দাঁড়ায় সরকার।

পশ্চিমবংগ ভূমিগ্রহণ আইনের সমালোচনা

যাহা হউক, ১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে (বাংলা ১লা বৈশাখ, ১৩৬২) ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশিত ভূমির বণ্টনকার্য সমাধা হয় নাই, রায়তদের পক্ষে প্রদেয় রাজস্বের লাঘব ঘটে নাই এবং কলিকাতায় মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনায় এই সকল কার্য সমাধার জন্য পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন পাস করা হয়।

পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন (West Bengal Land Reforms Act, 1956): পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন পাস হয় ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে। এই আইনের উদ্দেশ্য ভূমি-সংস্কারের তিনটি প্রধান নীতিকে কার্যকর করা—যথা, (১) ভূমির পুনর্বণ্টন, (২) ভূমির স্বত্বভোগ বা জমি দখলের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ, এবং (৩) রায়তদের রাজস্বভারের লাঘব। ভূমি-স্বত্বভোগের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছে পূর্বতন মধ্যস্বত্বভোগীদেরই মত। অর্থাৎ, প্রত্যেক রায়ত এবং অন্যান্য ভূমির প্রত্যক্ষ ভোগকারিগণ সর্বসমেত অনধিক ২৫ একর করিয়া জমি নিজ নিজ দখলে রাখিতে পারিবে। এইভাবে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাইবে তাহা অন্যান্য কৃষিজীবীর মধ্যে পুনর্বণ্টিত করা হইবে।

ভূমি-সংস্কার আইনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ব্যাপারে পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। ইহা হইল গতিশীলতা (progression)। ভারতের কোন রাজ্য এখনও পর্যন্ত গতিশীল হারে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের পথে অগ্রসর হয় নাই। পশ্চিমবংগে ভূমি-রাজস্বকে নিম্নলিখিতভাবে গতিশীল করার ব্যবস্থা আইনে পরিণত করা হইয়াছে:

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণে গতিশীলতার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা

	রাজস্বের পরিমাণ
প্রথম ২ একর	রাজস্বের হারের শতকরা ১০ ভাগ
পরবর্তী ৩ "	" " " ১৫ "
" ৫ "	" " " ২০ "
" ৫ "	" " " ২৫ "
অবশিষ্টাংশের	" " " ৩০ "

এখন 'রাজস্বের হার' (revenue rate) বলিতে কি বুঝায় বলা প্রয়োজন। রাজস্বের হার বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হইবে। প্রধানত ইহা জমির উৎপাদিকাশক্তি, গড় উৎপাদন, উৎপন্ন শস্যের বাজার-দাম, জমির বাজার-দাম প্রভৃতি অনুসারে নির্ধারিত হইবে। সাধারণত উৎপন্নের ১০-ই অংশ এবং জমির বাজার-দামের শতকরা ২ ভাগ রাজস্বের হার বলিয়া ধরা হইবে।

আইনে ভাগচাষী বা বর্গাদার এবং জোতের মালিকের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের বণ্টন সূত্রও নির্ধারিত হইয়াছে। মালিক যদি কৃষিকার্যের ব্যয় (শ্রম ছাড়া) বহন করে তবে ফসলের শতকরা ৫০ ভাগ এবং ব্যয় বহন না করিলে শতকরা ৪০ ভাগ পাইবে। ১৯৬২ সালের ভূমি-রাজস্ব আইনের সংশোধন দ্বারা পশ্চিমবংগে স্বল্প কৃষি-জমির মালিকদের ভিটাবাড়ী সংলগ্ন জমির উপর খাজনা বিলোপের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the Land Policy under our Planned Economy. To what extent has the policy been implemented so far ? (১৮৮-১৯৪ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the different aspects of the question of fixing ceilings on agricultural holdings in India. (C. U. B. Com. 1959) (১৯২-১৯৪ পৃষ্ঠা)

3. Write a short note on the ceiling on land holdings. (C. U. B. Com. 1961, '63) (১৯২-১৯৪ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the case for and against Cooperative Farming in India. What methods would you suggestfor the development of Cooperative Farming in this country ? (C. U. B. A. 1959, '61 ; B. Com. 1961) (১৯৭-২০০ পৃষ্ঠা)

5. Distinguish between Collective and Cooperative Farming. Would you recommend cooperative farming for India ? (B. U. (O) 1962) (১৯৬-২০০ পৃষ্ঠা)

6. Examine the case for and against the introduction of Cooperative Farming in India. (C. U. B. A. (P. II) 1963) (১৯৭-২০০ পৃষ্ঠা)

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন

(The State and Agrarian Reconstruction)

কৃষির উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে ভারতে রাষ্ট্র যে-ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে প্রধানত তাহার আলোচনা করা হইলেও নিম্নে উহার একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া গেল।

স্বল্পোন্নত দেশের কৃষির পুনর্গঠন (Agricultural Reconstruction in Underdeveloped Countries) : শিল্পের অনগ্রসরতা ও কৃষির প্রাধান্য ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষিই এই সকল দেশের প্রধান জাতীয় শিল্প। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ কৃষিজীবী এবং মাত্র শতকরা ১০ ভাগ শিল্প হইতে জীবিকার্জন করে। বাকী অংশ চাকরি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। মোটামুটি মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেকের মত অর্জিত হয় কৃষি

কৃষির গুরুত্ব

ও অনুরূপ কার্যসমূহ হইতে। সংগঠিত কারখানা শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে সংগৃহীত হয় যথাক্রমে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ও ১০ ভাগ। বাকিটা অন্যান্য সূত্র হইতে পাওয়া যায়।

স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির ভূমিকা এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও কৃষিই সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোত, জমিদারী প্রথা ও বহুসংখ্যক কৃষকের ভূমিহীনতা, কৃষিকার্যের আদিম পদ্ধতি, কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়ের অব্যবস্থা, জলসেচ বীজ সার প্রভৃতির অভাব, ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে মহাজন ও ব্যবসায়দারের প্রাদুর্ভাব, প্রভৃতি এই সকল দেশের কৃষি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

কৃষির অনগ্রসরতা

এই সমস্ত সমস্যার সমাধান ভিন্ন কৃষির এবং স্বতই ইহার উপর নির্ভরশীল জাতীয় অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করার কথা চিন্তা করা যায় না। এই কার্য যে রাষ্ট্রকেই সম্পাদন করিতে হইবে ইহাও বর্তমানের অন্যতম স্বীকৃত নীতি। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কৃষির সুসংগঠন স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক উপাদান (primary factor of development) বলিয়া পরিগণিত হয়। সোবিয়েত ইউনিয়নই এই দিকে পথিকৃতের কার্য করে। জারের সময় রাশিয়ায় কৃষি ও কৃষকের অবস্থা ছিল ভারতেরই মত। সোবিয়েত আমলে কৃষকগণকে রাষ্ট্রাধীন যৌথ খামারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃষির অভাবনীয় উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইয়াছে। নয়া চীন এই দিকে আর একটি দৃষ্টান্ত। অবশ্য একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন কৃষিনীতি সফলতা অর্জন করিতে পারে না। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া কৃষির উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করা হইলে তবেই কৃষির উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয়। সোবিয়েত ইউনিয়ন ও নয়া চীনে ইহাই করা হইয়াছে, এবং বর্তমানে সকল স্বল্পোন্নত দেশই এই পথে অল্পবিস্তর পদসঞ্চার করিয়াছে বলা যায়।

কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

স্বল্পোন্নত দেশে কৃষির সুসংগঠনের জন্য সরকারকে যে-যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার ইংগিত কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটি হইতে সহজেই পাওয়া যায়। প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ কৃষি-জোতকে একত্রিত করিয়া জলসেচ বীজ সার প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া কৃষককে জমিতে চিরস্থায়ী অধিকারপ্রদান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাজনা হ্রাস করিতে হইবে। ঋণের জন্য কৃষককে গ্রামীণ মহাজনের উপর নির্ভরশীল রাখা চলিবে না। যাহাতে কৃষক সহজে এবং স্বল্প সুদে ঋণ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সমবায় সমিতি গঠন, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। তারপর কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। সমবায় সমিতি এ-বিষয়েও শ্রেষ্ঠ পন্থা। পর্যাপ্ত সংখ্যায়

কৃষির সুসংগঠনের জন্য অবলম্বনীয় ব্যবস্থাসমূহ

সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা হইলে ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়তদার, মহাজন প্রভৃতির মত মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের পক্ষে আর মোট শস্যমূল্যের মোটা অংশ হস্তগত করা সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া হাটবাজারের ওজন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং শস্য মজুত রাখার জন্য গুদামঘর স্থাপন করা প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ কিন্তু বিশেষ কার্যকর হইবে না যদি-না কৃষকের মধ্যে নূতন পদ্ধতি এবং নূতন জীবন সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করা যায়। এইজন্য একটি সম্প্রসারণ সেবা (extension service) গঠন করা প্রয়োজন।* এই সেবায় একদল কর্মী থাকিবে যাহারা গ্রামাঞ্চলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নবজীবনের বার্তা বহন করিয়া বেড়াইবে। সংগে সংগে অবশ্য অন্যান্যভাবেও প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। পরিশেষে, কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সর্বাংগীণ গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া নূতন জীবনের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামবাসীদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। প্রধানত এই দুই উদ্দেশ্যেই ভারতে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলি খোলা হয়। বর্তমানে অবশ্য জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য অপসারণ করিয়া উভয়কে একই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

ভারতে কৃষি সম্পর্কে রাষ্ট্র (The State in relation to Agriculture in India):

বহুদিন পর্যন্ত কৃষি সম্পর্কে ভারতে বিদেশী সরকারের নীতি ছিল নিষ্ক্রিয় স্বাতন্ত্র্যবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*laissez faire* policy)। ইংরাজরা এ-দেশে আসিবার পর ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশে যে-শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হয় তাহা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিশেষ আঘাত হানে। প্রথা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবনের নীতির উপর ভিত্তিশীল কৃষি-ব্যবস্থাকে হঠাৎ আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। এই নূতন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধানের জন্য বিদেশী সরকার কৃষি-উন্নয়নের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা করে নাই। তবে নিজ স্বার্থে ও অবস্থার চাপে বিদেশী শাসক বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কার্য করিয়াছে, একথা অনস্বীকার্য। ইহাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের কল-গুলির স্বার্থে ভারতে তুলা উৎপাদনের প্রচেষ্টা, দুর্ভিক্ষত্রাণের জন্য কৃষিদপ্তর সৃষ্টি, ইত্যাদিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল উন্নয়ন-প্রচেষ্টা করা হয় উনবিংশ শতাব্দীতে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা: বিদেশী সরকারের নিষ্ক্রিয়তার নীতি

উন্নয়নমূলক কার্যে কিছু মনোনিবেশ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সরকার উন্নয়নমূলক কার্যে আরও অগ্রসর হয়। ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাস করা এবং ১৯০৬ সালে সর্ব-ভারতীয়

* ভারতে এই ধরনের কর্মী গ্রামসেবক এবং তাহাদের কার্য 'জাতীয়' বা 'কৃষি সম্প্রসারণ' (National or Agricultural Extension) বলিয়া অভিহিত।

কৃষি কৃত্যকের (All-India Agricultural Service) সৃষ্টি করা হয়। পুসাতে (Pusa) একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানও খোলা হয়। ইহার সহিত সংযুক্ত করা হয় একটি কৃষি-খামার এবং একটি কৃষি-কলেজ। স্থানে স্থানে প্রাদেশিক গবেষণাগার ও পরীক্ষামূলক কৃষি-খামারও প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা

১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কারের দ্বারা কৃষির উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হয় প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য হয় কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা এবং গাছপালা ও পশুরোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা। তবে প্রদেশগুলিতে অর্থের অভাবে কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নাই।

১৯২৬ সালে ভারতীয় কৃষির উন্নয়নের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Indian Agriculture) নিযুক্ত করা হয়। কমিশন তাহার রিপোর্টে কৃষির উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের কৃষিনীতি সম্পর্কে বহু সুপারিশ করে। সুপারিশের অধিকাংশই গৃহীত হয়, কিন্তু ১৯২৯ সাল হইতে সুরু করিয়া বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের দরুন উহাদিগকে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই।

কৃষির উপর রাজকীয় কমিশন

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পর সরকার কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অধিক যত্নবান হয়। কিন্তু ভূমি-স্বত্ব আইন বা ঋণ বিষয়ে সংস্কার ভিন্ন আর বিশেষ কিছু করা হয় না। ইহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে ভারতীয় কৃষির দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে। খাদ্যোৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। অবস্থার চাপে সরকার ১৯৪৩ সালে 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযান সুরু করে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন সুফল ফলে না।

পরবর্তী যুগ সুরু হয় দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা হইতে। স্বাধীনতালাভের পর সরকারী কৃষিনীতিও পরিবর্তিত হয়। সরকার সক্রিয়ভাবে কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়। উপরন্তু, দেশবিভাগের ফলে বিভিন্ন কৃষি অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের অভাব দেখা দেয়। ফলে সরকারকে এ-বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হইতে হয়। সরকার খাদ্য ব্যাপারে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য নূতনভাবে আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করে।*

খাদ্য-ঘাটতির বিরুদ্ধে অভিযান

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি (Agriculture under Planned Economy): মোটামুটিভাবে দেশবিভাগের তিন বৎসর পরে, ১৯৫০-৫১ সাল হইতে সুরু হয় পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আসিয়া আমরা দেখিতে পাই অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য দিকের সহিত কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি অনুসারে প্রথম

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি

* ১৬৮-১৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিকল্পনায় কৃষিকে সর্বপ্রধান স্থান নির্দেশ করা হয়। পরিকল্পনায় কৃষি, সমাজোন্নয়ন ও জলসেচ খাতে বরাদ্দ করা হয় মোট বরাদ্দের শতকরা ৩২ ভাগ। কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদানের সপক্ষে যুক্তি ছিল যে, অধিক খাদ্য ও শিল্পদ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যতিরেকে অন্যান্য দিকের প্রসারসাধন সম্ভব নয়।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল

পরিকল্পনার ফলাফল আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ এবং কৃষিজ পণ্যের সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদনবৃদ্ধি অনুমান-মত না ঘটিলেও মোট কৃষিজ উৎপাদনের সূচকসংখ্যা (index of agricultural production) পরিকল্পনাপূর্ব সময়ের তুলনায় শতকরা ১৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মোট কর্ষিত জমির মধ্যে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮ ভাগের উপর আসিয়া দাঁড়ায়। পতিত জমির পুনরুদ্ধারের ফলে নীট কর্ষিত জমির পরিমাণ (net area sown) ২'৫ কোটি একরের উপর বৃদ্ধি পায়।* ইহা ছাড়া প্রায় ৮ কোটি জনসংখ্যা সমন্বিত ১'৪০ লক্ষ গ্রাম সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে আসে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলাফল

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমে ঠিক করা হয় যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ এবং সামগ্রিক কৃষিজ উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইবে। পরে খাদ্যসংকট হেতু খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে শতকরা ২৫ ভাগে এবং মোট কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে শতকরা ২৮ ভাগে লইয়া যাওয়া হয়। ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন-লক্ষ্য দাঁড়ায় ৮'০৫ কোটি টনে। সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লক্ষ্য ছিল ২'১ কোটি নূতন একর জমিকে সেচসমন্বিত করা। ইহা ছাড়া অধিকতর সার ব্যবহার, সংরক্ষণকারী খাদ্য (protective food) উৎপাদনের গুরুত্ব প্রদান এবং সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে সমগ্র গ্রামবাসীকে আনয়ন করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। পরে অবশ্য সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার গঠন-পদ্ধতি ও লক্ষ্যের কিছু পরিবর্তন করা হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রাসংকটজনিত কারণে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনার যে ছাঁটকাট ও রদবদল করা হয় তাহাতে কৃষি ও সমাজোন্নয়ন খাতে কিছু ব্যয় হ্রাস করা হয়। ব্যয়হ্রাস সত্ত্বেও খাদ্যোৎপাদন ও সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যের কোন পরিবর্তনসাধন করা হয় নাই। অবশ্য ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। শেষ বৎসরে দেখা যায় যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন-লক্ষ্য ৮'০৫ কোটি টন থাকিলেও শেষ পর্যন্ত উৎপাদন হয় ৭'৯৩ কোটি টন। তবে ইহা অবশ্য স্বাধীন ভারতে খাদ্যশস্যের রেকর্ড উৎপাদন।

* Review of the First Five Year Plan

তৃতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। পরিকল্পনায় মোটামুটি ৩২% খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির এবং ৩০% সামগ্রিক কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার বিবেচনা করিলে এই লক্ষ্যই পর্যাপ্ত হইবে কি না, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

তিনটি পরিকল্পনায় কৃষির পুনর্গঠনের জন্য অবলম্বিত পদ্ধতিসমূহ মোটামুটি একই। ইহাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যাইতে পারে: (১) সেচ-ব্যবস্থা ও সার প্রয়োগের প্রসার; (২) গো-পশ্বাদির জাতের উন্নয়ন; (৩) পতিত জমির পুনরুদ্ধার; (৪) বনভূমি ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ; (৫) জোতের সংহতিসাধন, ভূমি-সংস্কার, সমবায়িক কৃষিকার্য, সমবায়িক গ্রাম-ব্যবস্থা প্রভৃতি; (৬) কৃষিঋণের সুব্যবস্থা; (৭) উন্নততর বীজ ব্যবহার, জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য চাষ এবং অন্যান্য পদ্ধতিগত উন্নয়ন; (৮) সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন; এবং (৯) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা।

কৃষির উন্নয়নের জন্য অবলম্বিত পন্থা

ইহাদের মধ্যে প্রথম আটটি পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন অধ্যায়ে ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। এখন সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবার পর্যালোচনা করা হইতেছে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবা (Community Development Projects and (National) Extension Service): 'সমাজোন্নয়ন' শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কাল হইতে। পূর্বে ইহার পরিবর্তে 'গ্রামোন্নয়ন' 'সংগঠনমূলক কার্য' ইত্যাদি শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হইত। ইংরাজী শব্দ 'কমিউনিটি বলিতে আবার পূর্বে ধর্মীয় বর্ণগত বা অর্থনৈতিক সম্প্রদায় বুঝাইত। বর্তমানে কমিউনিটি শব্দটি দ্বারা সমগ্র গ্রামীণ সমাজকে বুঝানো হয়। গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে জাতিধর্ম ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলেরই স্বার্থ যে এক—সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ইহাই হইল প্রতিপাদ্য বিষয়।* সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি: (১) গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা; (২) গ্রামীণ জীবনের সর্বাংগীণ ত্রুটি দূর করা। উদ্দেশ্যদ্বয়ের ব্যাখ্যা এইভাবে করা হইয়াছে: সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা "সমগ্র সমাজের সহায়তায়, এবং সম্ভব হইলে সমাজেরই উদ্যোগে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নসাধন করিতে চায়; সমাজের পক্ষে উদ্যোগ সম্ভব না হইলেও উহাকে অন্তত সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে।"**

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

* Report of the U. N. Study Team

** *Community Development Programmes in India, Pakistan and Philippines*

এখানে 'সমাজ' (Community) বলিতে গ্রামীণ সমাজকেই বুঝাইতেছে। অতএব, গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও গ্রামীণ সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলাই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

গ্রামোন্নয়নের পূর্বতন প্রচেষ্টা

ভারতে গ্রাম ও কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা মোটেই নূতন নহে। গুরগাঁও-এ সমাজসেবী ব্রায়নে, বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবংগের সিংগুরে সর্ব-ভারতীয় স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিদ্যার (All-India Institute of Health and Hygiene) প্রতিষ্ঠাতৃগণ গ্রামোন্নয়নের এবং সরকার বিক্ষিপ্ত-ভাবে কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও 'গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার' আদর্শকে তাঁহার গঠনমূলক কার্যক্রমের অংগীভূত করিয়াছিলেন। ইহাদের ফল কিন্তু বিশেষ কিছু হয় নাই।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাতের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালে। ঐ বৎসর সংযুক্তপ্রদেশের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) সেবাগ্রাম, গোরক্ষপুর ও এটাওয়াতে, বোম্বাই-এর সর্বোদয় কেন্দ্রসমূহে এবং মাদ্রাজের ফরাক্কা উন্নয়ন পরিকল্পনায় আত্যন্তিক (intensive) গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল প্রচেষ্টার সফলতায় উৎসাহিত হইয়া পরিকল্পনা কমিশন সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে উহার প্রবর্তন করে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ

আত্যন্তিক গ্রামোন্নয়নের এই সকল প্রচেষ্টার সফলতা এবং পূর্বতন গ্রাম ও কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টার বিফলতার ফলে পরিকল্পনা কমিশন এ-বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছিল যে, কৃষকের জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পরের সহিত অংগাংগি-ভাবে জড়িত ; সুতরাং বিক্ষিপ্তভাবে এই দিক বা ঐ দিকের উন্নয়নের প্রচেষ্টা বিফল হইতে বাধ্য। গ্রামীণ জীবনের যদি কাম্য সংস্কারসাধন করিতে হয়, কৃষিকে যদি সার্থকভাবে পুনর্গঠিত করিতে হয় তবে সকল দিক দিয়াই সমস্যাসমূহকে আক্রমণ করিতে হইবে, গ্রামীণ জীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইতে হইবে। উপরন্তু, জনসাধারণের সমবায়িক সহযোগিতার ভিত্তিতে এইরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত না করিলে, কৃষকগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে না পারিলে ইহা সার্থক হইতে পারে না। ইহার জন্য গ্রামবাসিগণকে বুঝাইতে হইবে যে, এইরূপ প্রচেষ্টা তাহাদেরই বৃহত্তর কল্যাণের জন্য। সমবায়িক ভিত্তিতে গ্রামবাসিগণের সহযোগিতা এবং উৎসাহই অবশ্য পর্যাপ্ত নহে। ইহার উপর চাই সংগঠন এবং প্রয়োজনমত অর্থসাহায্য। এই দুইটি হইল সরকারের কার্য। সরকার অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে এবং কার্যক্রম গড়িয়া তুলিয়া প্রচেষ্টাকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করিবে।* পরিশেষে আছে গ্রাম-পর্যায়ের

* The Community Development Programme in India, Reserve Bank Bulletin January 1961

কর্মীর (village-level worker) ভূমিকা। কৃষককে গ্রামোন্নয়নের কার্যে উৎসাহিত করিবে, কৃষির উন্নয়নের জন্য তাহার গৃহের দ্বারদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের বার্তা পৌছাইয়া দিবে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নহে—গ্রাম-পর্যায়ের কর্মী। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রাম-পর্যায়ের কর্মীই হইল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা সংগঠনের প্রথম ও প্রধান সোপান।

গ্রাম-পর্যায়ের কর্মীর ভূমিকা

বলা হইয়াছে, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হইল সর্বতোভাবে গ্রামীণ জীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়ন। এই সর্বাংগীণ উন্নয়ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল: (১) সকল প্রকার সম্ভাব্য প্রচেষ্টার দ্বারা কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি; (২) গ্রামীণ পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতিসাধন; (৩) গ্রামাঞ্চলে বেকার ও অর্ধ-নিয়োগ (under-employment) সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা; (৪) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার; (৫) জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন; (৬) আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা; (৭) উন্নততর গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা; (৮) হস্তচালিত ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পুনর্বাসন; এবং (৯) সমবায়ের প্রসার। ইহাদের অবশ্য পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে ১৯৫৬ সাল হইতে কৃষিজ উৎপাদন-বৃদ্ধির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

বর্তমানে সমাজোন্নয়নের কার্যক্রমকে রূপদানের প্রচেষ্টা করা হয় বিভিন্ন 'উন্নয়ন ব্লকের' মাধ্যমে। ৬০-৭০ হাজার জনসংখ্যাসমন্বিত ১৫০-২০০ বর্গমাইল আয়তনের ১০০-র মত গ্রাম লইয়া এক-একটি উন্নয়ন ব্লক গঠিত হয়। প্রত্যেক উন্নয়ন ব্লকে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত 'গ্রামসেবক' বা গ্রাম-পর্যায়ের কর্মী নিযুক্ত আছে। সে-ই দ্বারে দ্বারে গ্রামোন্নয়নের বার্তা বহন করিয়া বেড়ায়, গ্রামবাসিগণকে সমবায়িক সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, মহিলা মহল প্রভৃতি গঠনে উৎসাহ প্রদান করে, ইত্যাদি। পূর্বে উপর হইতে নির্দেশ প্রদান করা হইলেও বর্তমানে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করার ভার পঞ্চায়েত সমিতি বা জনসাধারণের সংগঠনের (people's organisation) উপর ন্যস্ত। গ্রামীণ পঞ্চায়েত সমিতিগুলি ছাড়াও প্রত্যেক ব্লকে একটি করিয়া ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি আছে। পঞ্চায়েত সমিতির সহিত সহযোগিতা করেন মহিলা মহল, সমবায় সমিতি, গ্রামীণ শিক্ষক (the village teacher) ইত্যাদি। গ্রামসেবক এবং অন্যান্য সমাজোন্নয়ন কর্মচারী পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগেই কাজ করে। সমাজোন্নয়ন কার্যে পঞ্চায়েতের এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার প্রসার এবং পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে নূতন প্রাণসঞ্চারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পঞ্চায়েতের এই সম্প্রসারণকে 'পঞ্চায়েতী রাজ' প্রতিষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সংগঠন

সরকারের পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধান অর্থসাহায্য বণ্টন এবং পরামর্শদানের জন্য প্রত্যেক ব্লকে একজন করিয়া ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী (Block Development Officer) আছেন। তাঁহাকে এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে পরামর্শ দিবার জন্য

প্রত্যেক জিলায় একটি করিয়া 'জিলা পরিষদ' এবং প্রত্যেক ব্লকে একটি করিয়া 'ব্লক উন্নয়ন কমিটি' (Block Development Committee) আছে। প্রত্যেক রাজ্যে জিলা পরিষদের উপরে আছে একটি করিয়া রাজ্য উন্নয়ন কমিটি (State Development Committee)। এই কমিটি নীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এবং বিভিন্ন পরিকল্পনাকেন্দ্রের কার্যে সমন্বয়-সাধনের দায়িত্ব বহন করে। দৈনন্দিন তত্ত্বাবধান ও নির্দেশের ভার অবশ্য রাজ্যের উন্নয়ন কমিশনারের (Development Commissioner) হস্তে ন্যস্ত। উন্নয়ন কমিশনারকে সহায়তা করিবার এবং পরামর্শ দিবার জন্য কৃষিবিদ্যা, পশুপালন ও পশু-চিকিৎসা, সমবায় ও পঞ্চায়েত, সামাজিক শিক্ষা, পথনির্মাণ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি উপদেষ্টা কমিটিও (Technical Advisory Committee) আছে।

সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল নীতি নির্ধারিত হয় সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে। এই কার্য সম্পাদনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee) আছে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ, কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রভৃতি লইয়া এই কমিটি গঠিত। পরিকল্পনা কার্যকর করিবার দায়িত্ব অবশ্য ১৯৫৬ সালে গঠিত সমাজোন্নয়ন মন্ত্রিদপ্তরের (Ministry of Community Development) উপর ন্যস্ত। ১৯৫৯ সালে সমবায় দপ্তরের সমাজোন্নয়ন মন্ত্রিদপ্তরের (Ministry of Community Development and Cooperation) অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমবায় ও সমাজোন্নয়নকে একই কার্যক্রমভুক্ত করা হইয়াছে।

প্রবর্তন ও প্রসার

বলা হইয়াছে, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে প্রবর্তিত হয়। ২রা অক্টোবর হইল মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। গান্ধীজীর অন্যতম প্রধান আদর্শ ছিল ভারতের অগণিত গ্রামের উন্নয়ন। সুতরাং শুভদিনেই কার্যারম্ভ হয়। মাত্র ২৭,৩৮৮টি গ্রাম ও ১'৬৭ কোটি জনসংখ্যাসমন্বিত ৫৫টি উন্নয়ন ব্লক লইয়া সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য সুরু করা হয়। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে দেখা যায় যে এই পরিকল্পনা ৫'৫৬ লক্ষ গ্রাম এবং ৩২'৯১ কোটি জনসংখ্যাসমন্বিত ৫১৪৯টি ব্লকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ফলে ভারতের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৯৯ ভাগ এই পরিকল্পনার অধীনে আসিয়াছে। আর মাত্র ৭৬টি ব্লক খুলিলেই ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চল পরিকল্পনাটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।* আশা করা যায়, নির্দিষ্ট সময়ের (অক্টোবর, ১৯৬৩) মধ্যেই ইহা সম্ভব হইবে।

জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Service)ঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণকে গ্রামসমূহের সামাজিক ও আর্থিক সংগঠনের রূপান্তরের যথাক্রমে পদ্ধতি (method) এবং এজেন্সী

* Review of the Ministry of Community Development for 1962-63

(agency) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।* এই এজেন্সী বা মাধ্যমের সূত্রপাত হয় 'অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান' সম্পর্কিত কৃষ্ণমাচারী কমিটির (১৯৫২) সুপারিশের ফলে। কৃষ্ণমাচারী কমিটি গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে পল্লীবাসিগণকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি সেবামূলক সংগঠন সৃষ্টি করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই সংগঠনের কার্য বা সেবার উদ্দেশ্য হইবে গ্রামবাসিগণকে গ্রামোন্নয়নে পরামর্শ দেওয়া ও উদ্বুদ্ধ করা। এই সুপারিশ অনুসারে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকার্য সুরু করা হয় সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্তনের ঠিক এক বৎসর পরে—১৯৫৩ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে।

উদ্দেশ্য

১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ছিল গ্রামাঞ্চলের উন্নতিসাধনে (intensive development) নিযুক্ত, কিন্তু জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যপ্রকৃতি ছিল অপেক্ষাকৃত অগভীর (less intensive)। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় পরামর্শ দেওয়া হইত, বীজ সার যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দ্বারা অথবা সরাসরি আর্থিক সাহায্য করা হইত; কিন্তু জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও পরামর্শই ছিল প্রধান। উৎসাহ ও পরামর্শের ফলে সেবাকেন্দ্রের বেশ কিছুটা উন্নতিসাধন হইলে পর ইহাকে পুরাপুরি সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রে পরিণত করা হইত। এইভাবে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ছিল একই উন্নয়ন কার্যক্রমের দুইটি পর্যায়।** সুতরাং সমাজোন্নয়নের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা দ্বারা পথ প্রস্তুত করা হইত।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মধ্যে পূর্বতন পার্থক্য

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই পার্থক্য দূর করিয়া জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকে সমাজোন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এখন জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা দ্বারা সমাজোন্নয়নের পথ প্রস্তুত করা হয় না, কোন অঞ্চলে সমাজোন্নয়ন কেন্দ্র খুলিবার পূর্বে ঐ স্থানকে এক বৎসর ধরিয়া প্রাক্-উন্নয়ন পর্যায়ে (pre-extension phase) রাখা হয় মাত্র। তারপর প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৫ বৎসর করিয়া দুই পর্যায়ে যথাক্রমে আত্যন্তিক ও ব্যাপক উন্নয়ন প্রচেষ্টা করিয়া যাওয়া হয়।

বর্তমানে পার্থক্য অপসারিত হইয়াছে

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন (জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা সহ) খাতে বরাদ্দ করা হয় মোট ২৯০ কোটি টাকা এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যয় হয় ২৪০ কোটি টাকার মত। ইহা দ্বারা ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পরিকল্পনা ৩·৭০ লক্ষ গ্রামসমন্বিত ৩১০০ ব্লকে পরিব্যাপ্ত হয়।

বর্তমান লক্ষ্য অনুসারে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই দেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন

* First Five Year Plan ২২৩ পৃষ্ঠা

** Second Five Year Plan ২৩৭ পৃষ্ঠা

খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২৯৪ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া পঞ্চায়েত খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২৮ কোটি টাকা।**

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবার মূল্যায়ন (Evaluation of Community Projects and (National) Extension Service): সমাজোন্নয়ন, পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, গ্রামবাসীরা ইহার দ্বারা কতদূর উপকৃত হইয়াছে—ইত্যাদি বিষয় নিয়মিত বিচারবিবেচনা করিয়া দেখা হয়। ইহার জন্য সমাজোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিদপ্তরের সহিত সম্পর্কিত একটি কার্যক্রম মূল্যায়ন সংগঠন (Programme Evaluation Organisation) আছে।

প্রথম পরিকল্পনায় চূড়ান্ত মূল্যায়ন

প্রথম পরিকল্পনার চূড়ান্ত বা তৃতীয় মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হইয়াছিল যে, সমাজোন্নয়ন কার্যক্রম গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে ততটা সার্থক হয় নাই, যতটা সার্থক হইয়াছিল জনগণ ও সরকারী কর্মচারীদিগের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনের। "সমাজোন্নয়ন ব্লকের জনসাধারণ সমাজোন্নয়ন পদ্ধতির কার্যকারিতায় আজ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে।"

প্রথম পরিকল্পনার ত্রুটি

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনের প্রচেষ্টা অপেক্ষা পথঘাট বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন জলসরবরাহ প্রভৃতির দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। রিপোর্ট অনুসারে ইহা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। ভবিষ্যতের সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীর দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনসাধনের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে, এইরূপ সুপারিশই করা হয়। কারণ, এই কার্য অপেক্ষাকৃত স্বল্প দৃষ্টি-আকর্ষক হইলেও ইহার ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী।

দ্বিতীয়ত, সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টার ফল সকল উন্নয়ন ব্লকের সকল গ্রামে সমান হয় নাই। উক্ত রিপোর্টে এই উক্তি করা হইয়াছিল যে, পরিকল্পনা পরিচালকগণ দৃষ্টি-আকর্ষক বাহ্যিক উন্নয়ন দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া যে-সকল গ্রাম হইতে সহজেই সমাজোন্নয়নের ডাকে সাড়া পাইয়াছিলেন, সেই সকল গ্রামেই অধিকতর অর্থ ও কর্মশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ব্লকভুক্ত অন্যান্য গ্রামের মধ্যে একটা হতাশার সঞ্চার হইয়াছিল। ভবিষ্যতে এইরূপ কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রিপোর্টে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তৃতীয়ত, ঐ মূল্যায়নের রিপোর্ট অনুসারে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার ক্ষেত্রে সফলতার পরিমাণ ছিল অতি সামান্যই।

ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশ

ভবিষ্যতে যাহাতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য আরও কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়—যথা, (১) টেকনিক্যাল বিভাগসমূহকে (technica ldepartments) শক্তিশালী করা, (২) জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের

* Third Five Year Plan ৩৩২ পৃষ্ঠা

(popular institutions) সংগঠন এবং (৩) সম্প্রসারণ এজেন্সী, টেকনিক্যাল বিভাগসমূহ ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

পর্যালোচনাকারী দলের সুপারিশ (Recommendations of the Study Team): প্রধানত এই সকল সুপারিশের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকরকরণের অসুবিধার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের পর্যালোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ফলে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার সংগঠনগত সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫৭ সালে শ্রীবলবন্ত্রে রাও মেহতার নেতৃত্বে একটি পর্যালোচনাকারী দল (a Study Team) নিযুক্ত হয়। ইহা সংক্ষেপে বলবন্ত্রে মেহতা কমিটি (Balwantray Mehta Committee) নামে পরিচিত। বলবন্ত্রে মেহতা কমিটির রিপোর্টে যে-সকল সুপারিশ করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(১) প্রতি সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে সামাজিক কল্যাণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে; (২) কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়ন করিতে হইবে; (৩) জিলা-সংগঠনে পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে।

প্রথমটি সম্পর্কে বলা হয় যে এ-পর্যন্ত সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে প্রধানত পথঘাট নির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর বিষয়ের উপরই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে, কারণ এগুলিই বিশেষ জনপ্রিয়, সহজসাধনযোগ্য এবং চমকপ্রদ। কিন্তু এগুলি অপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইল কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধিসাধন। আর্থিক সমৃদ্ধি সাধিত হইলে সমাজ-কল্যাণকর কার্যাবলী সহজেই এবং একরূপ আপনা হইতেই সম্পাদিত হইবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য ছিল যে যেখানেই জলসেচের সুবিধা আছে সেখানেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; চাউল ও গম উৎপাদনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে; এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমবায়িক পদ্ধতিতে উন্নত কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে জিলার সংগঠনের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের (democratic decentralisation) কথা বলা হয়। প্রতি ৮০ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করিয়া 'পঞ্চায়েত সমিতি' থাকিবে। এই পঞ্চায়েত সমিতির হস্তে কৃষির উন্নয়ন, ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণ, স্থানীয় শিল্প সংগঠন, প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা প্রভৃতির ভার থাকিবে। রাজ্য সরকার মাত্র বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে সংহতিসাধনের কার্য করিয়া যাইবে, সমিতির দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

ইহা ছাড়াও পর্যালোচনাকারী দল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত করিবার সময় ৩ বৎসর বর্ধিত করিবার—অর্থাৎ, তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে লইয়া যাইবার সুপারিশ করে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে 'মূল্যায়ন সংগঠন' (Evaluation Organisation) দ্বারা চারিবার এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দল (Evaluation Mission) দ্বারা একবার সমাজোন্নয়নের পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হয়।

বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি ও সুপারিশ

এই সকল রিপোর্টে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার যে-সকল ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করা এবং উহাদের প্রতিবিধানের জন্য যে-সকল সুপারিশ করা হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল: পঞ্চম মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হয় যে ব্লকগুলির আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়ার জন্য উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত এবং ফলে ব্যাহত হইতেছে। সুতরাং ব্লকগুলিকে ক্ষুদ্রতর আকারে পরিণত করা প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর স্বল্পতাও উন্নয়ন কেন্দ্রগুলির সফলতার পথে আর একটি বিশেষ অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয়। দেখা গিয়াছিল, ব্লক উন্নয়ন অফিসার (Block Development Officer) শতকরা ৪০ ভাগ কেন্দ্রেই ছিলেন না; আবার যেখানে ছিলেন সেখানে তাঁহাদের শিক্ষা পর্যাপ্ত ছিল না। বিশেষজ্ঞদের অনুপাত ছিল আরও কম। সুতরাং ব্লক উন্নয়ন অফিসার ও বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়।

তৃতীয়ত, মাথাপিছু ৩·৬০ টাকা করিয়া ব্যয়ের কথা থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে ব্যয় করা হয় মাথাপিছু ২ টাকা করিয়া। চতুর্থত, জনগণের অংশগ্রহণের পরিমাণও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে জনগণ শ্রম ও অন্যান্য দানের মূল্য ছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ৪১ ভাগ। ১৯৫৯-৬০ সালে উহা কমিয়া শতকরা ২৮ ভাগে দাঁড়ায়।*

কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্লক উন্নয়ন অফিসারগণ পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতি গঠন অপেক্ষা কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি ও নির্মাণকার্যের (constructional items) উপরই অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে-যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা ধানচাষের ক্ষেত্রে জাপানী পদ্ধতি অনুসরণই প্রধান। নির্মাণকার্যের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে পথ সেতু প্রভৃতি নির্মাণ; কূপ খনন, বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির দিকেও কিছু কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু উন্নততর বীজ ও সার সরবরাহ কার্য ঠিকমত করা হয় নাই। প্রয়োজন-মত বীজ-উৎপাদন কেন্দ্রও (seed farms) স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। উন্নততর বীজ যোগানের ত্রুটি ছিল প্রধানত বীজের অপ্রতুলতার জন্য; অপরদিকে

* Seventh Evaluation Report, 1960

সারের যোগান ঠিক সময়মত আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া উহা বণ্টন করিতে পারা যায় নাই।

মোটামুটিভাবে দেখা গিয়াছে, যে-সকল স্থানে বৃষ্টিপাত প্রচুর বা সেচ-ব্যবস্থা ভালভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে মাত্র সেই সকল কেন্দ্রগুলিতেই কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রম সফল হইয়াছে! প্রধানত এই সকল কেন্দ্রের জন্যই ১৯৫১-৫৭ সালের মধ্যে সমাজোন্নয়নভুক্ত অঞ্চলসমূহে খাদ্যোৎপাদন শতকরা প্রায় ১১ ভাগ বৃদ্ধি পায়।*

গ্রামসেবক, বিশেষজ্ঞ এবং ব্লক উন্নয়ন অফিসারদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগের অভাবের উল্লেখও কয়েকটি রিপোর্টে করা হয় এবং এ-বিষয়ে আশু প্রতিবিধানের প্রয়োজনীয়তার দিকে নির্দেশ করা হয়। পরিশেষে, পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণহ্রাস এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়।

• মোটামুটিভাবে প্রত্যেক মূল্যায়ন রিপোর্টেই স্বীকার করা হইয়াছিল যে সমাজোন্নয়ন সম্প্রসারণের গতি অতি মন্থর এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থাও সকল সময় কাম্য পথে চলে নাই। ১৯৫৯ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দলের রিপোর্টে বলা হয় যে ১৯১৫-৫৬ সালের পর হইতে ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যে ও প্রসারে বিশেষ মন্দা দেখা দিয়াছে। ১৯৬০ সালে সপ্তম মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "সমাজোন্নয়ন কার্যের মূল্যায়ন হইতে এই ধারণাই করা যাইবে যে, ইহা হইল এক অপ্রচুর ও অসংহত উন্নয়ন প্রচেষ্টা। ইহাতে জনগণের উৎসাহ অপেক্ষা সরকারী ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ; এবং সফলতা অপেক্ষা সফলতার আশাই ইহার বৈশিষ্ট্য।"

উপসংহার

সফলতার জন্য প্রয়োজন হইল পুনর্গঠনের। "পুনর্গঠিত সমাজোন্নয়ন ব্যবস্থা ভারতের ন্যায় দেশে অপরিমেয় সম্ভাবনাপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে।"**

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্গঠন (Reorganisation of Community Development) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে বলবন্ত্রে রাও মেহতা কমিটির সুপারিশ ও বিভিন্ন মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুসারে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু কিছু পুনর্গঠন করা হয়। যেমন, সমবায়কে সমাজোন্নয়ন মন্ত্রিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, উন্নয়ন কর্মচারীদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়, ইত্যাদি। উপরন্তু, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের কার্যও সুরু হয়। এই সকল কার্য সমাপ্ত হইবে তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে। সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে, অল্প সময়ের মধ্যেই পশ্চিমবংগ ও কেরল ছাড়া সকল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চায়েতী রাজ সমাজোন্নয়নকে সফল করার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। উপরন্তু, এই পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন ও সমবায় সহ কৃষির পুনর্গঠনের সকল কার্যক্রমকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করা

* Balwantray Mehta Committee's Report, 1957

** Report of the U. N. Study Team, 1959

হইয়াছে। আশা করা হইতেছে, এই নূতন সর্বাংগীণ কার্যক্রমের মধ্যে সমাজোন্নয়নের সফলতার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

মূল্যায়নের উপসংহার: গ্রামীণ ভারতকে এক বিরাট মরুভূমির সহিত তুলনা করা চলে। ইহার উপর সামান্য জলসিঞ্চন করা হইলে কিছু দিন পরে তাহার আর চিহ্ন পাওয়া যায় না। অতীতে গ্রামীণ ও কৃষির উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টার পরিণতি এইরূপই হইয়াছে। অনেকের মতে, বর্তমানে সমাজোন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিয়াছে বলা চলে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ব্যাপক হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারা গ্রামীণ জীবনে গভীর দাগ কাটিতে পারে নাই—গ্রামবাসীদিগকে আত্মনির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রয়োজনমত পুনর্গঠন না করিতে পারিলে এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মোটেই বর্ণনা করা যায় না।

আন্দোলন ব্যাপক হইলেও গভীর হয় নাই

প্রথম পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়নকে গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠন পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।* একবার এই পদ্ধতি কার্য সুরু করিলে ভবিষ্যতের কার্যক্রম ইহার গতিবেগ ও অভিজ্ঞতা হইতে একরূপ আপনা-আপনিই প্রস্তুত হয়। "ইহা যতই সম্প্রসারণের পথে চলে ততই পুরাতন অভাব পূরণ ও নূতন অভাব সৃষ্টি হইতে থাকে।" কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, আন্দোলন যে-যে স্থানে সুরু হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেই ইহা নিশ্চল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংগঠনগত ত্রুটির দিক হইতে দেখা যায় যে সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাত্রাধিক্য, চমকপ্রদ কার্যে সরকারী কর্মচারীদের আগ্রহ, গ্রামসেবকদের উপর মাত্রাতিরিক্ত ভারার্পণ, সমাজোন্নয়ন শিক্ষা-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি বিশেষ সুস্পষ্ট। ইহার উপর বর্ণগত ও অস্পৃশ্যতাজনিত বাধা, সম্পদ ও দারিদ্র্যের সহ-অস্তিত্ব সমাজোন্নয়নের সফলতার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। এইরূপ ব্যাপক প্রতিবন্ধকের পটভূমিকায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দলের সুপারিশ মত ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে সমাজোন্নয়নের অধীনে আনয়ন করিবার সময়কে ১৯৬৩ সালের পরিবর্তে ১৯৬৭ সালে লইয়া যাইবার কথা পুনরায় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the problems of India's Agriculture? What, in your opinion, should be the main lines of reorganisation of agriculture in a country like India?

(C. U. B. A. 1946, '48, '54) (২০৬-২০৮ পৃষ্ঠা)

2. Briefly indicate the role played by the State in India in relation to agriculture.

[ইংগিত: প্রথমে সংক্ষেপে ঐতিহাসিক পরিক্রমায় রাষ্ট্রের ভূমিকা বর্ণনা কর। তারপর

First Five Year Plan ২১০ পৃষ্ঠা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষির উন্নয়ন-ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার পর্যালোচনা কর ।...এবং ২০৮-২২০ পৃষ্ঠা]

3. Indicate the main features of Community Development Projects and National Extension Service launched in this country. Explain their usefulness as instruments of rural reconstruction. (C. U. B. A. 1957) (২১১-২১৫ পৃষ্ঠা)

4. Give your own views on the achievements and prospects of Community Projects and National Extension Service in India. (C.U.B. Com. 1959) (২১৬-২২০ পৃষ্ঠা)

5. Point out the role of Community Development Projects and Industrial Estates in the growth of the Indian Economy. (B. U. (O) 1961) (২১১-২১৩ এবং শিল্প-উপনিবেশের (Industrial Estates) জন্য পরবর্তী অধ্যায় দেখ ।)

6. Write a note on Community Development Projects. (C. U. B. Com. 1963) (২১১-২১৩ পৃষ্ঠা)

ষোড়শ অধ্যায়

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প

(Small-scale and Cottage Industries)

অতীত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়

ভারতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, অতীতে কুটির শিল্প এক গৌরবময় স্থানাধিকার করিত। দেশবিদেশে তাহার শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার সমাদৃত হইত। বিদেশী পর্যটকগণ ভারতীয় শিল্পীদের কলা-কৌশল ও কারুকার্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন এবং ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই গৌরবময় ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিয়াই ১৯১৮ সালের শিল্প কমিশন (The Industrial Commission) মন্তব্য করে: "আধুনিক শিল্প-পদ্ধতির জন্মভূমি পশ্চিম ইয়োরোপ যখন অসভ্য উপজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত, ভারত তখন তাহার শাসকগণের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য এবং শিল্পীদের কলাকৌশলের জন্য খ্যাতি অর্জন করে; এবং এমনকি পরবর্তী সময়ে যখন পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভাগ্যান্বেষী বণিকগণ ভারতে প্রথম পদার্পণ করে তখনও পশ্চিমের অধিক উন্নত জাতিগুলির তুলনায় ভারতের শিল্পপ্রসার কোনক্রমেই নিকৃষ্ট ছিল না।" প্রাচীনকালে রোম পারস্য সিরিয়া আরব প্রভৃতি দেশে ভারতের শিল্পজাত বহু দ্রব্য চালান যাইত। নিপুণ কুটির শিল্পিগণ বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করিত। প্রাচীন ভারতের তুলা পশম রেশমের বস্ত্র, পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, ইস্পাত, কাগজ, সুগন্ধি দ্রব্য, কাঁচের সামগ্রী, অলংকার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ

করিয়াছিল। ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। দিল্লীর অশোক স্তম্ভ লৌহশিল্পের এক গৌরবময় ইতিহাসের বার্তা যুগ যুগ ধরিয়া বহন করিয়া চলিয়াছে। বয়ন শিল্প সম্পর্কে রমেশ দত্ত মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, "জনসাধারণের জাতীয় শিল্প ছিল বয়ন শিল্প এবং অসংখ্য স্ত্রীলোক সুতাকাটায় নিযুক্ত থাকিত।"

ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের কারণ (Causes of Decline of Cottage Industries): ভারতের কুটির শিল্পের ধ্বংস সুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। যে-যে কারণে ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হইল প্রধান:

(১) রাজদরবারের বিলুপ্তি: বিত্তশালী রাজসভাসদগণ ও অভিজাত সম্প্রদায় কুটির শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইঁহাদের বহু সৌখিন দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করিত বিভিন্ন কুটির শিল্প। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার হইবার পর দেশীয় রাজা ও নবাবগণ ক্রমশ অন্তর্হিত হইতে থাকায় কুটির শিল্পেরও অবনতি ঘটিতে থাকে।

(২) প্রতিকূল বৈদেশিক প্রভাব: ব্রিটিশ শাসনের বিস্তারের পর ভারতের নূতন ধনিকশ্রেণী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশী শাসকের সব কিছুকে অনুকরণ করিতে এবং বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে সুরু করেন। ইহার ফলেও কুটির শিল্পের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৩) বিদেশী শাসকের নীতি: ইংরাজরা বণিক সম্প্রদায় হিসাবে ভারতে আসে। বাণিজ্য প্রসারের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহিত করে; কিন্তু শীঘ্রই কায়েমী ব্রিটিশ স্বার্থ কোম্পানীকে তাহার নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য করে। অষ্টাদশ শতাব্দী, বিশেষ করিয়া ঐ শতাব্দীর শেষ-ভাগ, এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পের দমন ও ইংল্যাণ্ডের শিল্পের প্রসারসাধনের নীতি দ্বিধাহীনভাবে প্রয়োগ করিতে থাকে। যাহাতে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি ইংল্যাণ্ডের বাজারে প্রবেশ না করিতে পারে তাহার জন্য উচ্চ হারে শুল্ক বসানো হয়। এই অত্যধিক শুল্কের সাহায্যেই ভারতীয় তুলা ও রেশম জাত দ্রব্য ইংল্যাণ্ডের বাজার হইতে বিতাড়িত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার ইংল্যাণ্ড আইন করিয়া ভারত হইতে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। অপরদিকে ইংল্যাণ্ড হইতে আমদানিকৃত পণ্য বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করিতে পারিত। এই প্রসংগে অধ্যাপক হোরেস উইল্সন (Prof. Horace Wilson) যে-মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "এই প্রকারের উচ্চ হারে শুল্ক ও নিষিদ্ধকারী আইনকানুন না থাকিলে পেইজলী (Paisley) এবং ম্যানচেষ্টারের (Manchester) মিলগুলি প্রারম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং বাষ্পশক্তির সাহায্য সত্ত্বেও ইহাদের চালনা করা সম্ভব হইত না।" এইভাবে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসসাধনের সাহায্যে যে

যন্ত্রচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার দ্বারা উৎপাদিত তুলাজাত দ্রব্যে অচিরেই ভারতের বাজার ছাইয়া গেল। ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ড হইতে বিদেশে কাপড় রপ্তানির মোট পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ ভারতীয় বাজারেই বিক্রীত হইতে লাগিল।

(৪) যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা: ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের (১৭৭৬-১৮২০) ফলে শিল্পজগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বৃহদাকারের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ, অধিক মূলধন নিয়োগ, উন্নততর সংগঠন, বৃহদায়তনে উৎপাদন প্রভৃতির ফলে অভূতপূর্বভাবে উৎপাদনক্ষমতা সম্প্রসারিত হয় এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদি ভারতীয় বাজারে অবাধে আমদানি হইতে থাকে। প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া দেশীয় শিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। পথঘাটের উন্নতি ও রেলপথ নির্মাণের ফলে স্বল্প মূল্যের বিদেশী দ্রব্য সুদূর পল্লী অঞ্চলে গিয়া পৌছায়। ভারতীয় শিল্পিগণ নিজেদের পেশা হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃষিতে যাইয়া ভিড় করিতে বাধ্য হয়। ভারত কাঁচামাল ক্রয়ের এবং বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয়।

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ইংল্যাণ্ডের মত দেশেও শিল্প-বিপ্লবের ফলে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হাজার হাজার তন্তুবায় ও অন্যান্য কারিগর চিরাচরিত বৃত্তি হারাইয়া পরিবর্তনের মুখে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতের সহিত ঐ সমস্ত দেশের একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ঐ সমস্ত দেশে শিল্পবিপ্লবের ফলে বৃহদায়তনের কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি দেখা দেয়। দুর্দশাগ্রস্ত কারিগরগণ অচিরেই নূতন কলকারখানায় স্থান পায় এবং সহরাঞ্চলে আসিয়া ভিড় জমায়। ভারতের দুর্ভাগ্য হইল যে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল অথচ বৃহৎ যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিল না। সুতরাং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পিগণ নিজেদের পেশা হারাইয়া কৃষি ভিন্ন জীবনধারণের অন্য কোন অবলম্বন খুঁজিয়া পাইল না। স্বাভাবিকভাবেই তাহারা গ্রামাঞ্চলের দিকে ধাবিত হইল।

ভারতে কুটির শিল্পের ধ্বংস ও কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপবৃদ্ধি

ভারতে কুটির শিল্প সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হইবার কারণ (Causes of the Survival of the Cottage Industries in India):

উপরি-উক্ত ধ্বংসাত্মক শক্তির মুখে পতিত হইয়াও কতকগুলি কুটির শিল্প দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কতকগুলি কারণ বর্তমান থাকার দরুনই ইহা সম্ভব হইয়াছে। প্রথমত, কারখানার শ্রমিকের তুলনায় কুটির শিল্পী অধিকতর সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কাজ করিয়া থাকে। পরিবারবর্গের সাহচর্যে স্বাধীনভাবে নিজ বৃত্তি অনুসরণের আকর্ষণ সে সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব গৃহের আকর্ষণ এবং নিয়োগের সুযোগসুবিধার অভাবও কুটির শিল্পকে তাহার চিরাচরিত পেশাতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তৃতীয়ত, প্রথার প্রভাবের ফলেও অনেকে বর্ণগত পেশায়

স্বল্পোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় এইরূপ শিল্পের গুরুত্ব

ব্যাপৃত থাকে। চতুর্থত জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ লোক কৃষিজীবী। কিন্তু কৃষিকার্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৎসরে ৭-৮ মাসের অধিক চলে না। সুতরাং অবসর সময়ে অনেক কৃষকই তাহাদের সামান্য আয়কে বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্পকে অনুপূরক বা পার্শ্বজীবিকা হিসাবে অবলম্বন করে। পঞ্চমত, গমনাগমনের সুব্যবস্থা না থাকায় অনেক অঞ্চল আবার এখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। এই সকল অঞ্চলে যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা তীব্র না হওয়ায় অনেক কুটির শিল্প এখনও টিকিয়া আছে। ষষ্ঠত, অনেকের মধ্যেই প্রচলিত ধারণা আছে যে, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি যন্ত্রোৎপাদিত সামগ্রী অপেক্ষা অধিক টেকসই। এই কারণেও অনেক ক্ষেত্রে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দেখা যায়। সপ্তমত, কুটির শিল্পীরা অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যবহার করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ, তন্তুবায়গণ মিলজাত সূতা ও উন্নত ধরনের মাকু, রঞ্জকগণ উন্নত ধরনের রং করিবার দ্রব্যাদি, এবং দরজীরা সেলাই-এর কল প্রবর্তন করিয়া উৎপাদনের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেছে। অষ্টমত, এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা কলকারখানায় প্রস্তুত করা অসম্ভব বা অসুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ যে-সমস্ত দ্রব্য কারুকার্যখচিত অথবা যাহা কেবল স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে সেই সমস্ত দ্রব্যাদি হস্ত শিল্প বা কুটির শিল্পের সাহায্যেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। উপরন্তু, এখনও বহু শিল্পরসিক আছেন যাঁহারা পূর্বেকার শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রচারকার্যের ফলে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কতকটা বাড়িয়াছে। পরিশেষে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি নানাভাবে কুটির শিল্পকে সাহায্য করিতেছে। এ-বিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

এইরূপ শিল্পের সুবিধা

পরিবর্তিত সরকারী দৃষ্টিভংগি

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের সংজ্ঞা (Definitions of Small-scale and Cottage Industries): সকল প্রকারের শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, (১) বৃহদায়তন শিল্প (Large-scale Industries), (২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industries), এবং (৩) কুটির শিল্প (Cottage Industries)। ব্যাংককে অনুষ্ঠিত 'ইকাফে'র (ECAFE) তৃতীয় অধিবেশনে কুটির শিল্পের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। আংশিক বা পূর্ণ বৃত্তি হিসাবে যে-শিল্প কারিগর সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত পরিবারের অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় পরিচালিত করে তাহাকেই কুটির শিল্প বলা হয়: ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশন এই সংজ্ঞা অনুমোদন করে। অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে কমিশন বলে যে সম্পূর্ণ এরূপ শিল্প প্রধানত ভাড়াটিয়া শ্রমিকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদনকার্য স্বল্পায়তন কারখানায়

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংজ্ঞা

শ্রমিকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। বর্তমানে 'স্বল্লায়তন' বলিতে ৫ লক্ষ টাকা অবধি বিনিয়োগকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়।*

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Cottage and Small-scale Industries): কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে (১) গ্রামীণ ও (২) পৌর—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প: গ্রামীণ কুটির শিল্পের মধ্যে কতকগুলি আছে যাহা কৃষকগণ কৃষিকার্যের সংগে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে পরিচালনা করে। কৃষিকার্য সকল সময় চলে না বলিয়া অবসর সময়ে সে তাহার আয়বৃদ্ধি ও গৃহে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগানের জন্য নিজ গৃহের কোন-না-কোন শিল্প পরিচালনা করিতে পারে। এই প্রকারের শিল্পের মধ্যে সুতাকাটা ও বয়ন, মক্ষিকা পালন, ঝুড়ি তৈয়ারি, দড়ি প্রস্তুত, বেতের কার্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে সুতাকাটা ও বয়ন শিল্প অধিক প্রসিদ্ধ। পরে হস্তবয়ন বা তাঁতশিল্প সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে।

গ্রামীণ শিল্পসমূহের প্রকৃতি

গ্রামীণ কুটির শিল্পের মধ্যে আবার কতকগুলি শিল্প আছে যাহা গ্রামের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে সাহায্য করে এবং কারিগরগণ ইহাদিগকে জীবিকার্জনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে। গ্রামে গ্রামে কামার, কুমার, ছুতার-মিস্ত্রী, তাঁতী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিল্পিগণ গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। এক সময় ছিল যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবনের ইহারা ছিল অপরিহার্য অংগ। অনাড়ম্বর গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত এই গ্রামীণ শিল্পিগণ। বিগত অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা গ্রামীণ শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। অনেক গ্রামীণ শিল্পী জীবিকার্জনের জন্য সহরাঞ্চলে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা হইলেও গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক শিল্প দেখা যায়। শিল্পিগণ পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। গ্রামীণ শিল্পজাত অনেক দ্রব্যের চাহিদাও যথেষ্ট রহিয়াছে।

উপরি-উক্ত ধরনের শিল্প ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে বহু সুকুমার কলাশিল্প আছে। বাংলা, কাশ্মীর ও মহীশূর রাজ্যে রেশমশিল্প বিশেষভাবে সমাদৃত। মির্জাপুর ও বেনারসের কার্পেট-বুনন, বাংলা ও বিহারের ধাতুশিল্পও সমধিক প্রসিদ্ধ। উত্তরপ্রদেশের কাঁচের চুড়ি ও বাংলার সূক্ষ্ম সূচিকর্ম-বিশিষ্ট বস্ত্রাদি অন্যান্য দেশে পর্যন্ত চালান যায়। কাশ্মীরের শাল সুদূর ইয়োরোপ ও আমেরিকায় পর্যন্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। মাটির খেলনা ও মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণকার্যেও বহু মৃৎশিল্পী নিযুক্ত রহিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে সুকুমার কলাশিল্প

* India—1962 ৩২৫ পৃষ্ঠা

গ্রামাঞ্চলে যে-সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প আছে তাহার কাজকারবার প্রায় ক্ষেত্রেই বৎসরের নির্দিষ্ট সময় চলে এবং প্রধান কৃষিজ পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পদ্ধতির (processing) সহিত এই শিল্পগুলি সংশ্লিষ্ট। যেমন, চাউলের কল, ময়দার কল, ইক্ষু হইতে গুড় ও খান্দসারী প্রস্তুতের কারখানা ইত্যাদি। পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োগের সংস্থা হিসাবে স্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গ্রামাঞ্চলে কদাচিৎ দেখা যায়। সম্প্রতি অবশ্য এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠার দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

পৌর কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ঃ প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের নগরগুলি শিল্পকলার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে। অভিজাতশ্রেণীর পৃষ্ঠ-পোষকতা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা ও কারিগরদের শিল্পনৈপুণ্য নগরাঞ্চলের শিল্পকলাকে সম্প্রসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পৌর কুটির শিল্পের উদাহরণ হিসাবে হাতীর দাঁত ও কাঠ খোদাই-এর কাজ, সূচীশিল্প, খেলনা নির্মাণ, জরির কাজ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুটির শিল্প ছাপাখানা ব্যতীত নগরাঞ্চলে স্বল্পায়তন গেঞ্জীর কারখানা, যন্ত্রপাতির কারখানা প্রভৃতি বহু রকমের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পও আছে।

তুলাতাঁত শিল্প (The Cotton Handloom Industry) ঃ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির মধ্যে তাঁতশিল্পই প্রধান। ইহাতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা প্রায় সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যার সমান। সুতরাং নিয়োগের সংস্থা হিসাবে তাঁতশিল্পের স্থান কৃষির পরই। মোটামুটিভাবে ভারতের আভ্যন্তরীণ বস্ত্রের চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ পূরণ হয় তাঁতের কাপড়ের দ্বারা।*

তাঁতশিল্পের গুরুত্ব

এরূপ গুরুত্ব সত্ত্বেও তাঁতশিল্প বর্তমানে একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন। ইহা হইল কাপড়ের কলগুলির প্রতিযোগিতা। যুদ্ধাবস্থায় ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মিলে প্রস্তুত কাপড়ের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য তাঁতশিল্প বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে। কিন্তু পরে মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁতশিল্প সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়। এই সংকট প্রতিবিধানকল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং ঐ সকল ব্যবস্থা কতটা ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহার আলোচনার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে, তাঁতশিল্প যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের তুলনায় কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে কিনা, এবং ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থায় তাঁতশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার সপক্ষে কোন সংগত যুক্তি আছে কিনা।

কতিপয় ক্ষেত্রে তাঁতশিল্প যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের তুলনায় কয়েকটি সুবিধা ভোগ করে। প্রথমত, তাঁতে বিভিন্ন নক্সার কাপড় যেভাবে উৎপন্ন করা যায় যন্ত্রশিল্পে তাহা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত অভিরুচি ও পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদনে তাঁত

* Report of the All-India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society for the year 1961-62

অধিকমাত্রায় সমর্থ। দ্বিতীয়ত, অতি সূক্ষ্ম সুতার কাপড় বয়নে যন্ত্রশিল্প তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। তৃতীয়ত, ইহা ব্যতীত এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, মিলের কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড় অধিক টেকসই। ফলে অনেকেই মিলের কাপড়ের পরিবর্তে তাঁতের কাপড় পছন্দ করিয়া থাকে।

যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের তুলনায় তাঁতশিল্পের সুবিধা

তাঁতশিল্পের উপরি-উক্ত সুবিধা ব্যতীত আরও কতকগুলি বিষয় আছে যাহা ঐ শিল্পের ভবিষ্যৎ বিবেচনা প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, তাঁতশিল্পে অধিক মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সহজেই উৎপাদনবৃদ্ধি করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তাঁতশিল্প হইতে অসংখ্য লোক জীবিকার্জন করে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকও সামান্য উপার্জন-হেতু এই শিল্পকে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। যে-হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা যে-আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে নিয়োগের সংস্থা হিসাবে তাঁতশিল্পের মত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তৃতীয়ত, ক্রেতা হিসাবে তাঁতশিল্প প্রস্তুত সুতার চাহিদার সৃষ্টি করে। অতএব, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারবিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ এবং ভারতীয় আর্থিক কাঠামোতে ইহার একটা বিশিষ্ট স্থান অবশ্যই আছে।

তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ

তবে তাঁতশিল্পের কতকগুলি সমস্যা আছে যাহার সমাধান এই শিল্পের প্রসার-সাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে মূলধনের অভাব, সংগঠনের অব্যবস্থা, বিক্রয়করণের অসুবিধা, চিরাচরিত অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল এবং যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতাই হইল প্রধান।

তবে ইহার কতকগুলি সমস্যা রহিয়াছে

অধিকংশ ক্ষেত্রেই তন্তুবায়কে দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয়। মহাজন বা ব্যবসায়ী তাহার দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বল্প মূল্যে বিক্রয়ের সর্তে ব্যবসায়ী তাহাকে ঋণপ্রদান করিয়া থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর লাভ শতকরা ৪৭ ভাগ পর্যন্ত উঠে।

বিক্রয়করণের অসুবিধা হইল তাঁতশিল্পের দ্বিতীয় সমস্যা। বিক্রয়করণের অসুবিধার জন্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের শোষণের পরিমাণ এখনও অধিক। ফলে তাঁতশিল্পীও উৎপাদনবৃদ্ধিতে বিশেষ উৎসাহিত হয় না।

তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন-পদ্ধতিও অনুন্নত এবং শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা অপ্রচুর। ফলে উৎপন্ন দ্রব্য উৎকৃষ্ট ধরনের হয় না।

পরিশেষে আছে উল্লিখিত যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের সংগে প্রতিযোগিতা। কানুনগো কমিটি হিসাব করিয়াছিল যে ১৯৬০ সালে আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য মোট ৪০০ কোটি গজ এবং রপ্তানির জন্য ১০০ কোটি গজ—এই মোট ৫০০ কোটি গজ মিলের

কাপড়ের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু মিলগুলি ১৯৫৭ সালেই ৫৩৭ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করে। অপরদিকে আবার রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া মোট ৬০ কোটি গজে দাঁড়ায়। উভয়ের সমন্বিত ফলে তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার সমস্যা সংকটে পরিণত হয়। সংকটের সমাধানকল্পে তাঁতশিল্প মিলের উৎপাদন নূতনভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার দাবি জানানো হয়। এই সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় তাঁতশিল্প বর্তমান অপেক্ষাও সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিল। সেই সময় হইতে ইহার পুনরুদ্ধার ও প্রসারসাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। এই সকল ব্যবস্থাকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে: (ক) তন্তুবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, এবং (খ) সরকারী প্রচেষ্টা।

ক। উন্নয়নকল্পে তন্তুবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

নিজস্ব বুদ্ধিবিবেচনা ও শিক্ষা-সংগতি অনুসারে উন্নততর কলাকৌশলের প্রবর্তনই হইল তন্তুবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। তাঁতশিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে তন্তুবায়গণ ক্রেতাদের রুচি ও ফ্যাসানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বস্ত্র উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করিতেছে, উন্নত ধরনের মাকু ও তাঁত প্রবর্তন করিতেছে এবং বস্ত্রাদি রং করিবার জন্য রাসায়নিক রঞ্জন দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে। উপরন্তু, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মূলধন, সংগ্রহ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইতেছে।

খ। প্রথম দুই পরিকল্পনায় সরকারী প্রচেষ্টা

তাঁতশিল্পের পুনরুদ্ধার উন্নয়নকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা হইল বিভিন্নমুখী। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে এই প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল: প্রথমত, তাঁতশিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বিচারবিবেচনার জন্য ১৯৫২ সালে একটি সর্ব-ভারতীয় তাঁতশিল্প বোর্ড (All-India Handloom Board) গঠন করা হয় এবং ১৯৫৪ সালে এই বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। পরবর্তী বৎসরে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য একটি খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড (All-India Khadi and Village Industries Board) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই বোর্ড শিক্ষাদান, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পরামর্শপ্রদান, বিক্রয়করণ প্রভৃতি বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কার্যকর করে। তাঁতশিল্প বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় নক্সা কেন্দ্রও আছে। দ্বিতীয়ত, তন্তুবায়গণের মধ্যে যাহাতে সমবায়িক প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ইহার ফলে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সমবায় সমিতির অধীনে তাঁতের সংখ্যা ৬ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ১৩.৪২ লক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়।* তৃতীয়ত, দেশে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি প্রসারের জন্য একটি তাঁতজাত দ্রব্য বিক্রয়করণ সমিতি (All-India Handloom Fabrics Marketing Society) গঠিত হয়। ইহার উপর সমবায় পদ্ধতিতে বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য ১৯৫৩ সালে সর্ব-ভারতীয়

* Report of the Handloom Fabrics Cooperative Society (January, 1962)

তাঁতশিল্প বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়করণ সংগঠন (Central Marketing Organisation) স্থাপন করা হয়। এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজে। বিভিন্ন শহরে ইহার শাখাও আছে। চতুর্থত, খাদি ও তাঁতশিল্পের উন্নয়নকল্পে অর্থসাহায্য করিবার জন্য উৎপন্ন মিলের কাপড়ের উপর টাকা প্রতি ২ নয়া পয়সা হারে সেস্ বা শুল্ক বসানো হয়। এই সূত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ সেস্ তহবিলে (Cess Fund) জমা হয় এবং তহবিল হইতে প্রয়োজনমত খাদি ও তাঁতশিল্পকে অর্থসাহায্য করা হয়। পঞ্চমত, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম গৃহীত নীতি অনুসারে মিল কর্তৃক ধুতি কাপড় উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাঁতজাত ধুতির বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। ষষ্ঠত, তাঁতজাত ও খাদি দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য সরকারী ব্যয়ে রেয়াৎও (rebates) দেওয়া হয়। পরিশেষে, তাঁতশিল্পের উন্নতিকল্পে আরও নানাভাবে অর্থসাহায্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সর্ব-ভারতীয় সুতাকাটা সমিতিকে (All-India Spinners' Association) অর্থসাহায্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজ্য সরকারগুলিও আপনাপন অঞ্চলে তাঁতশিল্পকে অর্থ ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করে।

ঐ দুই পরিকল্পনায় তাঁতশিল্পের জন্য মোট ব্যয় করা হয় প্রায় ৪২ কোটি টাকা। এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন ও ব্যয়ের ফলে পরিকল্পনার প্রথম ১০ বৎসরে (১৯৫১-৬১ সাল) তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন ৭৪ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০ কোটি গজে দাঁড়ায়।*

উৎপাদন

তৃতীয় পরিকল্পনায় তাঁতশিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ৩৪ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনায় শক্তি ও হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র এবং খাদির উৎপাদনকে ১৫০ কোটি গজের মত বর্ধিত করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে হস্তচালিত তাঁতের অংশে কতটা বাড়িবে তাহা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় অর্থসাহায্য, রেয়াৎ ও সংরক্ষিত বাজারের ব্যবস্থার ধীরে ধীরে বিলোপসাধন করিয়া ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পগুলিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার নীতি ঘোষিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কৌশল ও সংগঠনগত উন্নয়নের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হইবে সে সম্বন্ধে অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন।

তৃতীয় পরিকল্পনা

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান (Place of Cottage and Small-scale Industries in Indian Economy): ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান কি হইবে, তাহা লইয়া সম্প্রতি অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, বৃহদাকার যান্ত্রিক শিল্পের যুগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার কোন সার্থকতা আছে কি না? অনেকে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেও বলিতে হয় যে, ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিচারবিবেচনা করিলে কুটির ও ক্ষুদ্র

অর্থ-ব্যবস্থায় এই সকল শিল্পের স্থান লইয়া বাদানুবাদ

* Third Five Year Plan ৪২৯ পৃষ্ঠা

শিল্পকে এক বিশেষ স্থান নির্দেশ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। এমনকি অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৯০ ভাগের উপর এবং জাপানে শতকরা ৮০ ভাগের মত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রায়তন। ইংল্যাণ্ডে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারাই মোট উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়।*

শিল্পোন্নত দেশেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে

শুধু এই তুলনামূলকভাবেই নহে, অন্যান্য দিক দিয়াও ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের প্রবল যুক্তি রহিয়াছে। প্রথমত, নিয়োগের সংস্থা হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব অতুলনীয় বলিলেও চলে। ভারতে শুধু কুটির শিল্পসমূহে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ২ কোটির মত এবং মাত্র হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ৫০ লক্ষ, যাহা সকল সুসংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যার সমান। ইহার সহিত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি ধরিলে নিয়োগের পরিমাণ যে বহুগুণ অধিক হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের যুক্তি :

আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তখন নিয়োগ সম্প্রসারণের প্রয়োজনে শ্রম-প্রাধান্য (labour-intensive) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা অপরিহার্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ২·৬ কোটির মত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৯ লক্ষের নিয়োগের ব্যবস্থা মাত্র কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিতেই হইতে পারে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির মত স্বল্প মূলধন নিয়োগ করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যাপক ব্যবস্থা বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে করা কখনই সম্ভব নয়।**

১। নিয়োগের সংস্থা হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব

দ্বিতীয়ত, মূলধন-সংগতির সীমাবদ্ধতার জন্যও আমাদিগকে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। মূল শিল্পগুলিতে যাহাতে মূলধন নিয়োগ ব্যাহত না হয় তাহার জন্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ভার অধিক মূলধন-প্রয়োগকারী কারখানা শিল্পের উপর না দিয়া স্বল্প মূলধন-প্রয়োগকারী (capital-light) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর দেওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু, মূল শিল্পের প্রসার ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে অধিক ক্রয়শক্তির সৃষ্টি হইতেছে, তাহার ফলে যাহাতে ভোগ্যদ্রব্য দুর্মূল্য না হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে সেজন্যও কুটির ও হস্ত শিল্পের সাহায্যে অধিকমাত্রায় ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এই শিল্পগুলিতে বস্তু-উৎপাদন কার্য দ্রুত সুরু করা সম্ভব হয়। কারণ ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বস্তু-উৎপাদনের প্রারম্ভিক পর্বের

মূলধনের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান ইত্যাদির যুক্তি

* Fiscal Commission's Report (1949-50) ১০১ পৃষ্ঠা

** India, 1962

(gestation period) সময়-ব্যবধান (time-lag or fruition-lag) অপেক্ষাকৃত স্বল্প। ফলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধির সংগে সংগতি রক্ষা করিয়া উহাদের যোগানবৃদ্ধি করা সহজসাধ্য হইবে।

তৃতীয়ত, বর্তমানে যন্ত্রশিল্পের জন্য শিল্প-পদ্ধতি ও শিল্প-সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব রহিয়াছে। এই দিক হইতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থবিধা হইল যে, ইহাতে বিশেষ সংগঠনদক্ষতা ও কলাকৌশল প্রয়োজন হয় না। বস্তুত, ইহা স্বল্প কলাকৌশল-প্রয়োগকারী (skill-light) শিল্পরূপে পরিচিত।

বিকেন্দ্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা

চতুর্থত, মাত্র কয়েকটি সহরে বা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পগুলির কতকগুলি দুর্বলতা থাকিবেই। গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বলা হয় যে, যুদ্ধের সময় শিল্পাঞ্চলের উপর আক্রমণ হইলে দেশের আর্থিক জীবনে সহজে বিশৃংখলা আসে। সমগ্র দেশব্যাপী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ছড়াইয়া দিতে পারিলে এই বিপদের সম্ভাবনা ততটা থাকে না।

আর্থিক বৈষম্য অপসারণের নির্দেশ

পঞ্চমত, বৃহৎ শিল্প কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত করিতে সাহায্য করিয়াছে। ফলে বৈষম্য ও দারিদ্র্য প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে। অনেকের ধারণা যে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারের সাহায্যে এই আর্থিক বৈষম্যকে অনেক পরিমাণে দূরীভূত করা সম্ভব হইবে। স্থতরাং আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্য হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থার (decentralised industrial system) সংগঠন করা হইল আশু কর্তব্য। আরও বলা

যান্ত্রিক জীবন হইতে মুক্তির দাবি

হয় যে, বৃহৎ শিল্পোদ্ভবের ফলে যন্ত্র মানুষকে আজ চাপিয়া ধরিয়াছে। তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার স্বাধীনতা, তাহার সৌন্দর্যবোধ, তাহার সৃষ্টির প্রেরণা ও তৃপ্তিবোধ সমস্তই অতি নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রদানব কর্তৃক নিষ্পেষিত হইতেছে। মুক্তির একমাত্র উপায় হইল সমবায়িক সংগঠনের ভিত্তিতে শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণ।

পার্শ্বজীবিকা হিসাবে কুটির শিল্পের গুরুত্ব

ষষ্ঠত, ভারতের ন্যায় দেশে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্যও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার প্রয়োজন। এই দেশে শতকরা ৬৫ ভাগ লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত—ইহা হইতে দিন গুজরানও করা চলে না। ইহা ছাড়া কৃষককে বৎসরে কয়েক মাস বসিয়া থাকিতে হয়। এ-ক্ষেত্রে কুটির শিল্পকে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া কৃষক তাহার সামান্য আয়ের বৃদ্ধি এবং অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারে। উপরন্তু, কোন বৎসর শস্যহানি ঘটিলে কৃষক জীবনধারণের জন্য কুটির ও হস্ত শিল্পকে শেষ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল যে, গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের প্রাথমিক

উদ্দেশ্য হইল কর্মসংস্থানের সুযোগ, আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা এবং গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থাকে পূর্ণাংগ করিয়া তোলা। তৃতীয় পরিকল্পনায় উহারই প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে।*

সপ্তমত, বৃহদাকারে উৎপাদন সর্বক্ষেত্রেই সম্ভব বা সুবিধাজনক বা কাম্য বলিয়া মনে করা ভুল। সূক্ষ্ম সূচীকার্য, হস্তীদন্তের কার্য, কারুকার্যখচিত শাল ও বস্ত্র প্রভৃতির মত দ্রব্যাদি বৃহদায়তন কারখানায় উৎপাদন সম্ভব নয়। আবার বিড়ি প্রস্তুত, বোতাম তৈয়ারি, মক্ষিকা পালন প্রভৃতিতেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং বৃহদায়তন কারখানা শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা নাই। ইহা ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন কারখানা শিল্পের পরিপূরক হিসাবে কার্য করিতে পারে। বৃহদায়তন কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ দ্রব্যের অংশবিশেষ অথবা কোন বিশেষ স্তরের উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাইকেলের অংশ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে প্রস্তুত হইতে পারে। এ-বিষয়ে জাপান বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। সেখানে বৃহৎ শিল্পের প্রসার সত্ত্বেও অধিকাংশ শ্রমিক ক্ষুদ্র ও মধ্যমাকারের শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে।

ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক

অষ্টমত, আবার উৎপাদন-ব্যয়ের দিক হইতে বৃহদায়তন কারখানা শিল্প এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা বিচারবিবেচনা করিবার সময় কেবল উৎপাদকের ব্যক্তিগত ব্যয়ের (private cost) কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না, সমাজকে কি ব্যয়ভার বহন (social cost) করিতে হয় তাহার কথাও চিন্তা করিতে হইবে। এই দৃষ্টিভংগি লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বৃহৎ কারখানা শিল্পের সামাজিক ব্যয়ভার অধিক। সহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের ফলে স্বাস্থ্য, বাসগৃহ, বেকারত্ব প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজকে যথেষ্ট ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। সুতরাং সামাজিক ব্যয়ভারকে গণ্য করা হইলে বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্য অনেক কমিয়া যাইবে।**

ক্ষুদ্র শিল্পের সামাজিক ব্যয়ভার স্বল্প

নবমত, বর্তমানে শিল্প সংক্রান্ত কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, উৎপাদকের ব্যক্তিগত ব্যয়ের দিক হইতেও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধাই প্রমাণিত হয়। বোরসোদির (Ralph Borsodi) মত বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মোট দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে বৃহদায়তনে উৎপাদন সুবিধাজনক। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের বেলায় ব্যক্তিবিশেষ বা সমবায় সংগঠন কর্তৃক স্বল্পায়তনে উৎপাদন ব্যয়সংক্ষেপ করে।

উৎপাদন-ব্যয়ও অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প

* Second Five Year Plan ৪২৯ পৃষ্ঠা এবং Third Five Year Plan ৪২৬ পৃষ্ঠা

** Report of the Fiscal Commission (1949-50) দ্রষ্টব্য

পরিশেষে, ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান ও গুরুত্ব নির্দেশ করিবার সময় ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের সম্ভাবনার প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়করণের যে বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

বিক্রয়বাজার কিন্তু ব্যাপক

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার সম্পর্কে বিচারবিবেচনার জন্য যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলটিকে (The Ford Foundation International Planning Team) ১৯৫৩ সালে ভারতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়, সেই বিশেষজ্ঞ দলও দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের এই বৃহৎ বাজারের কথা উল্লেখ করে। দলটির মতে, বিক্রয়-ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিতে পারিলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার অভাব হইবে না।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়ন ও নিয়োগ সংস্থানের প্রসার-সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্যের মধ্যে যে-দুইটি প্রধান পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহা হইল—(১) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসাহায্য করা; এবং (২) খাদি ও গ্রামীণ শিল্প, তাঁতশিল্প, হস্তচালিত শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি সমস্যার বিচারবিবেচনা ও প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্য কয়েকটি সর্ব-ভারতীয় বোর্ড স্থাপন করা। অধিকতর সরকারী মনোযোগ এবং এই সকল সর্ব-ভারতীয় বোর্ডের বর্ধিত কার্যের ফলে উক্ত শিল্পসমূহের অনেকগুলিতে উৎপাদন ও নিয়োগের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়।*

উপসংহার

প্রথম পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প

ইহার উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় হইতে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্থ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকৃত (decentralised) গুরুত্বপূর্ণ ও সম্প্রসারণশীল অংশ হিসাবে দেখা হইতেছে। অর্থ-ব্যবস্থার এই অংশ একদিকে কৃষি এবং অপরদিকে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইহার পরিধিকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করাই আমাদের অর্থ-ব্যবস্থার লক্ষ্য, কারণ ইহা সমাজতন্ত্রের অন্যতম দ্যোতক।**

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অসুবিধা এবং তাহাদের প্রতিবিধানের উপায় (Difficulties of Cottage and Small-scale Industries and their Remedies): বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায়

* Second Five Year Plan ৪১৯ পৃষ্ঠা

** Third Five Year Plan ৪২৬ পৃষ্ঠা

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সম্প্রসারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও সম্প্রসারণের পথে কয়েকটি বিশেষ প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। মূলধনের অভাব, অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি বা কলাকৌশল, বিক্রয়করণের অব্যবস্থা, শিল্পীদের অজ্ঞতা এবং উপযুক্ত ধরনের কাঁচামাল সরবরাহের সুব্যবস্থার অভাবই হইল প্রধান প্রতিবন্ধক :

প্রধান প্রধান অসুবিধা

(১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা : নিয়মিতভাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট ধরনের কাঁচামাল সরবরাহের সুব্যবস্থা না থাকায় কারিগরদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই কাঁচামাল মিল বা কারখানা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু সময়মত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উহা পাইবার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, তাঁতশিল্প মিলে বুনা সুতা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সুতাকল নিজস্ব কাপড়ের মিলের চাহিদা সর্বাগ্রে পূরণ করে। ইহা ব্যতীত মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ থাকার জন্যও কাঁচামালের দাম অধিক হয় ; এবং ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বাড়িয়া যায়। সুতরাং শিল্পিগণকে উপযুক্ত ধরনের কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রয়োজন সমবায়িক পন্থার সাহায্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করা। সমবায়িক পন্থা যে শুধু কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করে তাহাই নহে, উহাতে দামেও সুবিধা হয়।

(২) পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব : কৃষকদের মতই কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। সম্বলহীন বলিয়া তাহারা মহাজন বা কারখানাদারের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। চড়া সুদ আদায় ব্যতীত কারখানাদার স্বল্প দামে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সর্তে ঋণদান করিয়া থাকে। এইভাবে শিল্পিগণ তাহাদের প্রাপ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। অন্যান্য দেশে সমবায় সংগঠনগুলি ক্ষুদ্র শিল্পকলা সংরক্ষণ করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতে কিন্তু শিল্প সংক্রান্ত সমবায়িক আন্দোলন বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। অথচ এই সম্পর্কে সমবায়িক সংগঠন ভিন্ন অন্য কোন অনুসরণযোগ্য পন্থা নাই। রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শক্তিশালী সমবায় সংগঠন গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির এই সুপারিশ বিশেষ সমর্থনযোগ্য। আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল (The Ford Foundation International Planning Team) সুপারিশ করে যে, (ক) সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে ; (খ) প্রত্যেক রাজ্যেই রাজ্য অর্থ করপোরেশন (State Financial Corporation) প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; (গ) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে অধিক পরিমাণে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ঋণদান দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে ; এবং (ঘ) সম্পত্তির ভিত্তিতে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কিত 'গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প কমিটি' যাহা সাধারণত

পুঁজির অভাব দূরিকরণের জন্য আন্তর্জাতিক দলের সুপারিশ

'কার্ভে কমিটি' (The Karve Committee) নামে সুপরিচিত, তাহার সুপারিশও এই প্রসংগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমিটির মতে, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও শিল্পস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার যে-অর্থসাহায্য করিবে তাহা রাজ্য অর্থ করপোরেশনের মাধ্যমে করা সমীচীন। এই করপোরেশন দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিবে। যে-সর্তে বর্তমান শস্য-ঋণ (crop loans) দেওয়া হয় অনুরূপ সর্তে কেন্দ্রীয় সমবায়িক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে চলতি মূলধন যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে (The State Bank of India) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ঐ দ্বিতীয় পরিকল্পনারই প্রাক্কালে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন-সমস্যা তদন্ত কমিটি বা শ্রফ কমিটি (Shroff Committee, 1954) মন্তব্য করে যে, সরকার ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত যে-সকল দ্রব্য ক্রয় করে তাহার মূল্য পরিশোধ করিতে অযথা বিলম্ব করে। ইহাতে স্বল্প সম্বলসম্পন্ন উৎপাদককে কার্যকরী মূলধন সম্পর্কে অসুবিধায় পড়িতে হয়। সুতরাং যথাসম্ভব শীঘ্র মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কার্ভে কমিটির সুপারিশ

শ্রফ কমিটির মন্তব্য

(৩) **অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল :** এখনও অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ অনুন্নত প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আধুনিক পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রসারলাভ করে নাই। গবেষণা ও শিক্ষার সুযোগসুবিধাও প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বিভিন্ন শিল্পের পরিচালনাও সুসংগঠিত করা হয় নাই। চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক রুচি ও ফ্যাসান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নয়ন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইহারা মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে। সুতরাং স্বল্প উৎপাদন-ব্যয়ে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয়বাজারের সম্প্রসারণ করিতে হইলে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই শিল্পগুলিকে সংগঠিত করিতে হইবে, আধুনিক উন্নত ধরনের ছোটখাটো যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রবর্তন করিতে হইবে এবং দেশী ও বিদেশী বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ডিজাইন ও প্যাটার্ণের বিভিন্নতা প্রবর্তন করিতে হইবে।

অবলম্বনীয় প্রতিবিধান

এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া পূর্বোক্ত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করে। এই দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে চারিটি শিল্পকলা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (Institutes of Technology) স্থাপনের প্রস্তাব করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের কলাকৌশল এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করিবে; গবেষণার ফলাফল, উন্নততর পদ্ধতি ও কলাকৌশল, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প ও কারিগরগণকে জানাইয়া দিবে।

আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের সুপারিশ

ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল 'ডিজাইন' বা নক্সার উন্নয়নের জন্য 'ডিজাইন' সম্পর্কিত একটি জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করে।

সম্প্রতি অবশ্য সর্ব-ভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড, সর্ব-ভারতীয় হস্ত-পরিচালিত তাঁতশিল্প বোর্ড, সর্ব-ভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড প্রভৃতি সংস্থাগুলি শিক্ষাদান কলাকৌশল, ডিজাইন প্রভৃতির উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে। মোটকথা, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও ডিজাইনের প্রবর্তন, উৎকৃষ্ট ধরনের দ্রব্য উৎপাদন, সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রদর্শনী ও প্রচার-কার্যের ব্যাপক প্রসার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার সুযোগসুবিধা বিস্তারিত ও সহজলভ্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-পদ্ধতির ব্যবহার কারিগরগণ যথাযথভাবে শিক্ষা করিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষা-সহ-উৎপাদন (training-cum-production) কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য গবেষণাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলির (The National Laboratories) সহিত যোগাযোগ রাখিয়া এই গবেষণাগারগুলিকে চলিতে হইবে। এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠিত করা অবশ্য প্রয়োজন হইলেও যন্ত্রিকরণের ফলে বেকারের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায় তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা

(৪) বিক্রয়করণের অসুবিধা: বিক্রয়করণের অব্যবস্থা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের আর একটি প্রধান অসুবিধা। একাধিক মধ্যবর্তী ব্যবসাদারের শোষণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের নিকৃষ্টতার দরুন উৎপাদক ন্যায্য মূল্য পায় না। এই অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পাইবারও প্রকৃষ্ট উপায় হইল সমবায়িক পন্থায় বিক্রয়করণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করা। যে ব্যাপক পণ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা (warehousing system) করা হইতেছে তাহাতে এই সকল শিল্পজাত পণ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াও বিক্রয়করণের অসুবিধা অনেকাংশে দূর করিতে পারা যায়। আভ্যন্তরীণ বাজার ব্যতীতও বিদেশে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের অপরিমেয় সম্ভাবনা রহিয়াছে। উপরন্তু, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ফলে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব, দেশী ও বিদেশী বাজারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাকে বিভিন্ন সম্ভাব্য পন্থায় সম্প্রসারিত করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, অন্যান্য দেশে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়করণের অসুবিধা হইতেছে, কারণ যে-পরিমাণে এবং যে-নমুনা অনুযায়ী দ্রব্যাদি তাহারা চাহিতেছে তাহা সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধরনের দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের মান মির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা

সমবায়িক পন্থাই বিক্রয়করণের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিকার

বিক্রয়বাজার প্রসারের বিভিন্ন পন্থা

চলিতেছে। আবার অন্যান্য দেশের ক্রেতারা ভারতীয় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য সম্পর্কে বিশেষ খবর রাখে না। সুতরাং অন্যান্য দেশে অবস্থিত শিল্প প্রদর্শনীগুলিতে অংশগ্রহণ, বাণিজ্য প্রতিনিধি দল আমন্ত্রণ ও প্রেরণ, বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান, ব্যাপক প্রচারকার্য প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হইবে। উক্ত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল বিদেশী বাজার প্রসারের জন্য 'রপ্তানি উন্নয়ন অফিস' (Export Development Offices) প্রতিষ্ঠা করিবার সুপারিশ করে। আভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়-কেন্দ্র, প্রদর্শনী, স্থায়ী মিউজিয়াম, প্রচারকার্য প্রভৃতির মাধ্যমে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। সম্প্রতি সরকার এই বিষয়ে সচেতন হইয়াছে। তাঁতশিল্প, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি সংক্রান্ত বোর্ডগুলি বিক্রয়-কেন্দ্র, প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রসারসাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। সরকার তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ব্যাপারে উপযুক্ত ধরনের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যকে অধিকতর সুযোগসুবিধা প্রদান করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের সহায়তা করিতে পারে।

এ-সম্পর্কে সাম্প্রতিক সরকারী প্রচেষ্টা

(৫) বৃহৎ শিল্পজাত ও আমদানিকৃত দ্রব্যের প্রতিযোগিতা: অনেক ক্ষেত্রে কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য (যেমন, তাঁত বস্ত্র) বৃহৎ শিল্পজাত বা বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। এই অদক্ষতা বা অক্ষমতা সর্বক্ষেত্রেই কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পের যে সহজাত দুর্বলতা তাহা নহে ; বহুলাংশে ইহা হইল বহুদিনের অবহেলা ও কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতার ফল। সুতরাং স্থায়ী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠিত করা। যে-পর্যন্ত-না প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে সে-পর্যন্ত সাময়িকভাবে বৃহৎ শিল্পগুলির উপর উৎপাদন শুল্ক (cess) বসাইয়া, কতিপয় ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনকে নিষিদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া, বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানির উপর বাধানিষেধ বসাইয়া, কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর রেয়াৎ বা ছাড় (rebates) বাদ দিয়া; কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনে অর্থসাহায্য করিয়া সরকারকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট হইতে হইবে। তবে সাধারণ সংরক্ষণের (protection) মত এই ব্যবস্থাও যে বেশীদিন চলিতে পারে না তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে.

প্রতিযোগিতার প্রতিবিধানের চূড়ান্ত ও আশু উপায়

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন দ্বারা অনেকাংশে এই প্রতিযোগিতার অবসান করা যাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক বা সাহায্যকারী সংস্থা হিসাবে কার্য করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা আংশিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আর একটি উপায় হইল সমন্বয়সাধন

Third Five Year Plan ৪৩১ পৃষ্ঠা

আবার বৃহৎ শিল্পের জন্য আনুষংগিক দ্রব্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদন করিয়া সরবরাহ করিতে পারে—যেমন, যন্ত্রপাতির জন্য স্ক্রু, বল্টু প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যেই সহজে উৎপাদিত হইতে পারে। ১৯৫৫ সালে যে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন (National Small Industries Corporation Ltd.) স্থাপিত হইয়াছে তাহার অন্যতম কর্তব্য হইল এই প্রকার সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করা।

রাষ্ট্র এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (The State and Cottage & Small-scale Industries) : স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে সরকারের যে শিল্পনীতি ঘোষিত হয় তাহাতেই সর্বপ্রথম জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Cottage and Small-scale Industries under the First Plan) : তারপর আসিল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। প্রথম পরিকল্পনায় গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রায়তন ও হস্ত শিল্প গ্রামোন্নয়ন ও নিয়োগের সংস্থা হিসাবে বিশেষ স্থান পায়। প্রাচীন শিল্পগুলির সমস্যার ভালভাবে বিচারবিবেচনার জন্য কেন্দ্রে একটি খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। কলা-কৌশলের উন্নয়ন, গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতি পন্থার কথা ব্যতীত পরিকল্পনায় বলা হয় যে, যেখানে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা রহিয়াছে সে-ক্ষেত্রে কুটির শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। এই ব্যবস্থাগুলি হইল: (১) উৎপাদনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ, (২) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনক্ষমতার প্রসার সীমাবদ্ধ করা, (৩) বৃহৎ শিল্পের উপর উৎপাদন শুল্ক বসানো, (৪) কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, এবং (৫) গবেষণা শিক্ষাদান প্রভৃতির সমন্বয়সাধন। গ্রামীণ তৈলশিল্প, তিল তৈলের সাহায্যে সাবান তৈয়ারি, ধান ভানা, তালের গুড় তৈয়ারি, হস্তনির্মিত কাগজ, মক্ষিকা পালন প্রভৃতির উন্নয়ন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়। ক্ষুদ্র ও হস্ত শিল্পের প্রসারের জন্য কলাকৌশলের উন্নয়ন, শিক্ষাদান, গবেষণা, অর্থসাহায্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। খেলার সাজসরঞ্জাম, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ, কাঁসা-পিতলের শিল্প প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নও পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত হয়। সর্বক্ষেত্রে সমবায়িক সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে যে-সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নিম্নে সংক্ষেপে তাহাদের পর্যালোচনা করা হইল।

এই সকল শিল্পের উন্নয়নকল্পে অবলম্বিত বিভিন্ন ব্যবস্থা

সমবায়িক সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ

(১) ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রধানত রাজ্য সরকারসমূহের দায়িত্ব হইলেও প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে বিশেষ বিশেষ সমস্যার বিচারবিবেচনা ও সমাধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কতকগুলি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রধান বোর্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। বিভিন্ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা

(ক) সর্ব-ভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড (All-India Khadi and Village Industries Commission): ১৯৫৩ সালে এই কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কার্যাবলী হইল শিক্ষাদান, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পরামর্শ প্রদান, উৎপাদন, বিক্রয়করণ প্রভৃতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া উহাদের কার্যকর করা।

(খ) সর্ব-ভারতীয় তাঁতশিল্প বোর্ড (All-India Handloom Board): তাঁতশিল্পকে সুসংগঠিত এবং তাঁতদ্রব্য বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে এই বোর্ড ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রধানত তন্তুবায়দের মধ্যে সমবায় সংগঠন প্রসারের জন্য বোর্ড অর্থসাহায্য করে। বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়করণ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। একটি নক্সা বা ডিজাইন বিভাগও খোলা হইয়াছে। ভারতের অভ্যন্তরে ও বিদেশী বাজারে বিক্রয় যাহাতে প্রসারলাভ করে তাহার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে।

(গ) সর্ব-ভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড (All-India Handicrafts Board): হস্তশিল্পের উন্নয়নের জন্য এই বোর্ডও ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হস্তশিল্পকে সাহায্য-প্রদান ও উহাদের বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষত উৎপাদন এবং দেশে ও বিদেশে বিক্রয়ের প্রসারসাধন সম্পর্কে বোর্ড সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। গত কয়েক বৎসরে উন্নত ধরনের কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, গুণাগুণের মান নির্ধারণ, গবেষণা পরিচালনা, নূতন ডিজাইন ও প্যাটার্ণ প্রবর্তন এবং কাঁচামাল সরবরাহ সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনা বোর্ড গ্রহণ করিয়াছে। হস্তশিল্পের দ্রব্যাদিকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে দেশবিদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বোর্ড দিল্লীতে একটি সর্ব-ভারতীয় মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড (Central Silk Board): ১৯৪৯ সালে এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৫২ সালে বোর্ডকে ব্যাপকতর প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হয় এবং সমস্ত রেশমশিল্পকে ইহার অধীনে আনয়ন করা হয়। এই বোর্ড কাঁচা রেশমের মূল্যহ্রাস, রেশমশিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে রেশম-শিল্পের প্রসারের চেষ্টা করিতেছে। রাজ্য সরকারগুলির পরিকল্পনাসমূহকে বিচার-বিবেচনার জন্য একটি কলাকৌশল উন্নয়ন কমিটিও (a Technical Development Committee) নিযুক্ত হইয়াছে।

(ঙ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (Small-scale Industries Board): ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের কার্যের সমন্বয়সাধন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য সম্প্রতি এই বোর্ড সংগঠিত হইয়াছে।

(চ) নারিকেল-কাতা শিল্প বোর্ড (Coir Board): দেশী ও বিদেশী বাজারে চাহিদাবৃদ্ধি, উন্নত ধরনের কলাকৌশল প্রবর্তন এবং বিক্রয়করণের সুব্যবস্থা করিয়া যাহাতে নারিকেল-কাতা শিল্পকে সংরক্ষিত করা যায় তাহার জন্য এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

এই সকল শিল্পের উন্নয়ন প্রধানত রাজ্য সরকারগুলিরই দায়িত্ব বলিয়া রাজ্যগুলিতেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য অনুরূপ ধরনের বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগে এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবংগ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড (The West Bengal Khadi and Village Industries Board), রাজ্য তাঁতশিল্প বোর্ড (The State Handloom Board) এবং রাজ্য কুটির শিল্প বোর্ড (The State Cottage Industries Board) রহিয়াছে।

পশ্চিমবংগে বিভিন্ন বোর্ড

(২) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প যাহাতে প্রসারলাভের সুযোগসুবিধা পায় এবং যাহাতে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত হইতে সংরক্ষিত হইতে পারে তাহার জন্য কতকগুলি নীতির প্রবর্তন করা হয়। প্রথমত, কয়েক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যার্থে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের উপর সেস্ (cess) বসানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁত ও খাদি শিল্পের উন্নয়নের জন্য মিলের কাপড়ের উপর প্রতি গজে শতকরা ২ ভাগ শুল্ক বসানোর কথা পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। এইভাবে সেস্ হইতে প্রাপ্ত অর্থ তাঁতশিল্পের উন্নয়নকল্পে ব্যয়িত হইতে থাকে।* দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়প্রসারের জন্য রিবেট বা রেয়াৎ (rebates) দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। যথা, সাধারণত তুলাতাঁত বস্ত্রের বিক্রয়ের উপর শতকরা ৬ ভাগ এবং খাদির ক্ষেত্রে সর্বাধিক শতকরা ১৯ ভাগ রিবেট বা রেয়াৎ দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। তৃতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য উৎপাদনক্ষেত্র সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। যেমন, তাঁতশিল্পের প্রসারের জন্য মিলগুলিকে পূর্বের উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র ধুতি কাপড় উৎপাদন করিতে দেওয়া হয়।

২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিকে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা

(৩) প্রথম পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির মূলধনের অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টাও করা হয়। 'শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য আইনের' (State Aid to Industries Acts) অর্থসাহায্যের সর্তাবলীকে অধিকতর সহজ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পের উন্নয়নকল্পে ঋণদানের সুযোগসুবিধাদানের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য অর্থ করপোরেশন' (State Financial Corporation) স্থাপিত হয়। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের সুপারিশক্রমে স্থাপিত 'জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন'ও (National Small Industries Corporation) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থসরবরাহের কতকটা দায়িত্ব গ্রহণ করে। যাহাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি ব্যাংক এবং অনুরূপ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে তাহার জন্য করপোরেশনের মাধ্যমে গ্যারাণ্টি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

৩। মূলধনের অভাব দূরিকরণের প্রচেষ্টা

---

* ২২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয়করণের সাহায্যার্থে রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে অর্থপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়। (প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India) রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে অর্থসাহায্যকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়সাধনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ৯টি নির্বাচিত অঞ্চলে 'পাইলট স্কীম' (Pilot Scheme) চালু করা হয়।)

পাইলট স্কীম

((৪) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যাদির সরকারী ক্রয় যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য সরকারী ক্রয়নীতির বিচারবিবেচনার জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি (Stores Purchase Committee) নিযুক্ত করিয়াছিল। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে সরকারের প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য সরবরাহের ভার একমাত্র গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পকেই দেওয়া হয়)।

৪। ক্রয় ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা

((৫) ভারতীয় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য আমন্ত্রিত ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল ১৯৫৪ সালে তাহার রিপোর্ট দাখিল করে।

এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল বিভিন্ন স্থানে কলাকৌশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান (Regional Small Industries Service Institute), একটি বিক্রয়করণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (A Marketing Service Corporation) এবং উল্লিখিত ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান (A Small Industries Corporation) স্থাপনের সুপারিশ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য হইল কলাকৌশল ও সংগঠনের উন্নয়ন, ঋণ ও অর্থ সংগ্রহ, বিক্রয়করণ, সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন পরিকল্পনার সমন্বয়সাধন প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্য করা। প্রতিষ্ঠান-গুলির কার্যের সমন্বয়সাধনের ভার হইল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ডের উপর)।

৫। আন্তর্জাতিক দল ও উহার সুপারিশ

পরিকল্পনাধীন সময়ে মাদুরাই, বোম্বাই, কলিকাতা এবং ফরিদাবাদে চারিটি কলাকৌশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, যাহা ক্ষুদ্র শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান (small industries service institutes) নামেও অভিহিত, স্থাপিত হয়। 'জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন'ও স্থাপিত হয় ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে। পূর্বোল্লিখিত ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্থসংগ্রহে সহায়তা করা ছাড়াও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প করপোরেশনের কার্য হইল: (ক) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের নিকট হইতে যাহাতে সরকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটা মোটা অংশ ক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, (খ) প্রাপ্ত ক্রয়নির্দেশ যাহাতে পূরণ করিতে পারে তাহার জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে কলাকৌশল দান ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করা, (গ) যাহাতে ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প করপোরেশন

বা দ্রব্যের অংশবিশেষ উৎপাদন করিতে পারে তাহার জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। ১৯৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে ৪টি শাখা করপোরেশন (subsidiary corporations) খুলিয়া করপোরেশনের কার্যের বিকেন্দ্রিকরণের ব্যবস্থা করা হয়।

৬। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন

(৬) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমেও হস্তচালিত ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সমাজোন্নয়ন ব্লকগুলিতে একজন করিয়া, 'ব্লক শিল্পোন্নয়ন কর্মচারী' (Block Industrial Development Officer) নিযুক্ত করিয়া প্রত্যেক ব্লকে হস্তচালিত ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন-দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে মোট ব্যয়-বরাদ্দ করা হয় ৩১ কোটি টাকা; কিন্তু মোট ব্যয় হয় ৩৩'৬ কোটি টাকা। এই ব্যয় ও অন্যান্য পন্থা অবলম্বনের ফলে এই শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ বহু পরিমাণে সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহত্তর কার্যক্রম

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Cottage and Small-scale Industries under the Second Plan)ঃ বৃহত্তর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটিব ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নকল্পে স্বতই বৃহত্তর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয় 'গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প কমিটি' (১৯৫৫) বা কার্ভে কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া। সুপারিশ করিবার সময় কার্ভে কমিটি তিনটি প্রধান লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল—যথা,

(ক) কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে শিল্পে নিয়োগের পরিমাণ যাহাতে হ্রাস না পায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে; (খ) পরিকল্পনাধীন সময়ে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে যথাসম্ভব নিয়োগবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে হইবে; (গ) বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ-ব্যবস্থা (decentralised society) এবং ক্রমসম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

কার্যক্রমের বিশ্লেষণ

বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ-ব্যবস্থা বলিতে কেবল পদ্ধতি বা কৌশলগত পরিবর্তনই বুঝায় না। ইহার অর্থ কৌশলগত পরিবর্তন এইভাবে করিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত শিল্প-একক যেন অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদনে সমর্থ হয়। ইহার প্রয়োজন হইল "উন্নয়নশীল ব্যাপক গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে পিরামিডের ন্যায় শিল্পগত সংগঠন।"

১। বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ-ব্যবস্থা

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অনুসারে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে নানাভাবে রক্ষা করা হইলেও, সরকারী নীতির উদ্দেশ্য হইল উক্ত বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প ক্ষেত্রাংশকে (decentralised sector) স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা এবং উহাকে বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করা। সুতরাং রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র

উৎপাদকগণের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান মাধ্যম হইল পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিল্পগত সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইরূপ সমবায় সমিতি স্থাপনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন-কার্যক্রমের সমন্বয়সাধনের (Common Production Programme) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। ইহার জন্য তিনটি প্রধান পন্থার নির্দেশ করা হইয়াছিল—যথা, (১) উৎপাদনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ, (২) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনক্ষমতার প্রসার সীমাবদ্ধকরণ, এবং (৩) বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের উপর সেস্ বা শুল্ক বসানো। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই পন্থাগুলি বিশেষভাবে অনুসৃত হয়। ইহার উপর সরাসরি উৎপাদনের উপর অর্থসাহায্য (subsidy on production) অথবা বিক্রয়ের উপর রেয়াৎ ব্যবস্থাকে (rebates on sales) ব্যাপকতর করা হয়।

২। উৎপাদন কার্য-ক্রমের সমন্বয়সাধন

৩। সরকারী ক্রয়নীতি ও ৪। বিক্রয়ের ব্যবস্থা

তৃতীয়ত, সরকারী ক্রয়নীতিকে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আরও অনুপন্থী করিয়া তোলার প্রচেষ্টা করা হয়।

চতুর্থত, সমবায় পন্থা এবং সরকারী ক্রয়নীতি ছাড়াও গবেষণা প্রভৃতি দ্বারা বিক্রয়করণ-ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত করা হয়।

৫। বিদ্যুৎ সরবরাহ

পঞ্চমত, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহকে যথাসম্ভব এই বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থার উন্নয়নে নিয়োগ করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

৬। বাসস্থানের উন্নয়ন

ষষ্ঠত, শিল্পিগণের বাসস্থানের উন্নয়ন হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৭। ঋণ ও মূলধন সরবরাহ

সপ্তম স্থলে আছে, ঋণ ও মূলধন সরবরাহের কথা। মূলধন সরবরাহের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহকে ব্যাপকতর করা ছাড়াও নূতন একটি গ্যারাণ্টি স্কীম (guarantee scheme) প্রবর্তিত করা হয়। এই গ্যারাণ্টি স্কীম 'গ্যারাণ্টি সংস্থা' (guarantee organisation) নামক রিজার্ভ ব্যাংকের একটি উপবিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাতে বিভিন্ন ব্যাংক ও ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে যে ঋণদান করিয়া থাকে তাহার গ্যারাণ্টি প্রদান করা হয়, এবং তাহাতে লোকসান হইলে কেন্দ্রীয় সরকার লোকসানের একাংশ বহন করে। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে প্রবর্তিত পাইলট স্কীম দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে যেখানে যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের (State Bank of India) শাখা আছে সেখানেই সম্প্রসারিত হয় এবং সরকারী ঋণদানের পরিমাণও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

অষ্টমত, ঐ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য শিল্প-শিক্ষার সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও করা হয়। প্রথমত, 'শিল্প-শিক্ষা সম্প্রসারণ সেবা'র (Industrial Extension Service) প্রবর্তন করা হয়। এই সেবার কর্মিগণ কারিগরদিগকে নূতন নূতন কলাকৌশল অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করিয়া বেড়ায়। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক শিল্প শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের (Regional Institute of Technology or Small Industries Service Institute) সংখ্যা ৪ হইতে বর্ধিত করিয়া ১৫-তে লইয়া যাওয়া হয়। ফলে প্রত্যেক রাজ্যেই (গুজরাটে দুইটি) শিল্প শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা হয় এবং শিক্ষাকেন্দ্রগুলি হইতে শিক্ষার্থী বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

৮। শিল্প-শিক্ষার সম্প্রসারণ

পরিশেষে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে কতকগুলি শিল্প-উপনিবেশ (Industrial Estates) প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্মদক্ষতাবৃদ্ধি, উৎপাদনে সমতা আনয়ন এবং মালমসলা ও যন্ত্রপাতির সুযোগ্য ব্যবহারের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, শিল্প-উপনিবেশের উদ্দেশ্য হইল কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প একককে (small-scale units) অবস্থান, বৈদ্যুতিক শক্তি, জল সরবরাহ, রেলপথ প্রভৃতি সংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ সুযোগসুবিধা প্রদান করা। ইহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরের নিকটেই স্থাপন করা হয়, নগর বা মহানগরের নিকটে নহে। ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ১০৫টি শিল্প-উপনিবেশ অনুমোদন করা হয় এবং ৬৬টির স্থাপনকার্য সমাপ্ত হয়।

৯। শিল্প-উপনিবেশ

১৯৫৫ সালে স্থাপিত জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন এই পরিকল্পনাধীন সময়ে বিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠে। ইহার মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ৮ কোটি টাকার মত সরকারী অর্ডার পায়। প্রাপ্ত অর্ডার সরবরাহের জন্য ক্ষুদ্র শিল্পগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন তাহাতে গ্যারাণ্টি প্রদান করে। ইহা ছাড়া ভাড়ায় ক্রয় করা নীতির (hire purchase system) ভিত্তিতে করপোরেশন ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ৫.৫ কোটি টাকা যন্ত্রপাতি কিনিতে সহায়তা করে। করপোরেশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'উন্নয়ন ঋণ তহবিল' (Development Loan Fund) হইতে ৪.৭৬ কোটি টাকার ঋণ পায়। ঐ পরিকল্পনায় বিকেন্দ্রিকরণের নীতি অনুসরণে কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ ও দিল্লীতে চারিটি অধীনস্থ করপোরেশন স্থাপন করা হয়।

ব্যয়

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে প্রথম পরিকল্পনায় ৩১ কোটি টাকা ব্যয়ের তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় করা হয় ১৭৫ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Cottage and Small-scale Industries under the Third Plan): তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্প খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে ২৬৪ কোটি টাকা। ইহাতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ধরা হয় নাই। উপরন্তু, এই সকল শিল্পের মালিকগণ নিজেরাই ৩২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ

তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়ন কার্যক্রম প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনারই অনুরূপ। তবে বর্তমানে শিল্প-সমবায় এবং শিল্প-উপনিবেশ গঠনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, রেয়াৎ প্রভৃতি বিলোপসাধন করিয়া কলাকৌশল, ঋণ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ দ্বারা শিল্পগুলিকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার নীতি ঘোষিত হইয়াছে।* ইহাতে সমবায়িক সংগঠন ও বৃহদায়তন শিল্পের সহিত সমন্বয়সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। আশা করা হইয়াছে, পরিকল্পনাধীন সময়ে আরও ৩০০টি শিল্প-উপনিবেশ সংগঠিত হইবে। ইহার ফলে ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিশ্বের বাজারে ও আভ্যন্তরীণ যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহের প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে।

কার্যক্রম

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহে মূলধন সরবরাহ-ব্যবস্থার বিশদ আলোচনা একবিংশ অধ্যায়ে করা হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the rationale of fostering the small-scale and cottage industries in India under present conditions. Indicate briefly the measures recently adopted by the Government of India to assist the development of these industries. (C. U. B. A. 1962) (২২৯-২৩৩ এবং ২৩৮-২৪৫ পৃষ্ঠা)

2. On what lines and by what methods would you like to develop our cottage and small-scale industries so that they may play a useful part in India's economic development? (C.U. B. A. 1959) (২৩৩-২৩৮ পৃষ্ঠা)

3. Give a critical estimate of the measures adopted by the government of India for the development of *small-scale* industries.
(C. U. B. Com. 1961) (২৩৮-২৪৫ পৃষ্ঠা)

4. Indicate the steps that have been taken to develop *small-scale* industries in India during the plan period. (C. U. B. Com. (P.I) 1963) (২৩৮-২৪৫ পৃষ্ঠা)

5. Point out the role of community development projects and industrial estates in the growth of the Indian economy. (B. U. 1961)
(২১১-২১৩, ২৪৪ পৃষ্ঠা এবং ২২১ পৃষ্ঠার ৫নং প্রশ্ন দেখ।)

* Third Five Year Plan ৪৩১-৪৩৪

6. Discuss how far it is practicable to increase the supply of essential consumer goods in India through the encouragement of small-scale and cottage industries. (C. U. B. Com. 1958)

[ইংগিত : এইরূপ ভোগ্যপণ্যের মধ্যে তাঁতের কাপড়, গুড়, সাবান, কাঁসা-পিতলের বাসন ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে ইহাদের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে অন্তরায়ও বহুসংখ্যক। এই সকল অন্তরায় দূর করা এক-প্রকার দীর্ঘকালীন ব্যাপার; অতএব রাতারাতি ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের দ্বারা ভোগ্যপণ্যের যোগানবৃদ্ধি বিশেষ সম্ভব হইবে না...এবং ২২৫-২২৭, ২৩৪-২৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতে শিল্পোন্নয়ন

(Industrial Development in India)

ঐতিহাসিক পরিক্রমা (Historical Survey) : অর্থ-ব্যবস্থার কাঠামো এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের শিল্প-সমৃদ্ধি বিশ্ববিশ্রুত থাকিলেও বৈদেশিক শাসনের কবলে আসিয়া ভারতীয় শিল্পসমূহের ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকে। রাজ-দরবারের ধ্বংস, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক অনুসৃত বিশেষ নীতি, ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব, সুয়েজ খাল খনন, ভারতে পরিবহণ-ব্যবস্থায় অভাবনীয় উন্নতি প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন শিল্প-সমূহের ধ্বংসসাধন করিয়া এই দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকে ক্রমে সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে। ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল কাঁচামাল রপ্তানি এবং উৎপন্ন দ্রব্য আমদানি করা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের শেষ যুগে ভারত সম্পূর্ণভাবে ইহাই করিতে লাগিল।

আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ধীরে ধীরে আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহ গড়িয়া উঠিতে দেখা গেল। ব্রিটিশ মূলধন ও তত্ত্বাবধানে চা ও পাটকল শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর সংগঠিত হইল কয়লাখনি শিল্প। অপরদিকে ইংরাজ উদ্যোগীদের (entrepreneurs) অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে এদেশীয় ব্যবসায়িগণ বস্ত্রশিল্পের গোড়াপত্তন করেন।

এইরূপে শিল্পায়ন (industrialisation) সুরু হইলে পর ইহা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই দেখা যায় যে, কাপড়ের কলের সংখ্যা ৫০-এর উপর, পাটকল ৩০-এর কাছাকাছি এবং কয়লার উৎপাদন বাৎসরিক ১০ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে।

এইভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়ন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইলেও ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের যে-গতি—অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থায় যে-অবস্থান্তর তাহাতে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নাই বলা চলে। বস্ত্র শিল্প, পাটকল শিল্প, কয়লাখনি শিল্প যেমন একদিকে গড়িয়া উঠিতেছিল, অপরদিকে তেমনি আবার ভারত অধিক পরিমাণে কাঁচামাল ও খাদ্য রপ্তানি করিতেছিল। ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ব্রিটিশ উদ্যোগীদের বিনিয়োগ রেলপথ, কয়লাখনি, পাটকল, চা, কফি প্রভৃতি সেই সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল যেগুলি হইল কাঁচামাল রপ্তানির পক্ষে প্রয়োজনীয়। কাঁচামাল রপ্তানির সহায়ক হিসাবে ছাড়া অন্য কোনরূপে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্রিটিশ সরকার সুনজরে দেখে নাই।

প্রথম স্বদেশী আন্দোলন ও ভারতীয় শিল্প-প্রসার

১৯০৫ সাল হইতে সুরু হইল স্বদেশী আন্দোলনেব যুগ। স্বদেশী আন্দোলনের সহিত জড়িত বিলাতি দ্রব্য বর্জনের নীতি অনুসরণের ফলে দেশীয় শিল্পগুলি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ১৯০৫ সাল হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) মধ্যে শক্তিচালিত তুলাতাঁতের সংখ্যা বাড়িয়া চতুর্গুণ হইল, পাটতাঁতের সংখ্যা হইল চতুর্গুণের অধিক এবং কয়লার উৎপাদন হইল প্রায় ছয় গুণ। কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়িয়া ৩ লক্ষ হইতে ৯ লক্ষে দাঁড়াইল। কিন্তু তবুও "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের শিল্পায়নের জন্য সকল সরকারী প্রচেষ্টাকেই ভারত সচিবের দপ্তর (Whitehall) হইতে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছিল।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের শিল্প-সম্প্রসারণ

ইহার পরবর্তী অধ্যায় হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগ। বিশ্বযুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন বিদেশ হইতে আমদানি বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়, অপরদিকে তেমনি মিত্রশক্তিসমূহের চাহিদাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। মিত্রশক্তিসমূহের প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত, পাট, চর্ম ও পশমজাত দ্রব্যই ছিল প্রধান। ফলে এই শিল্পগুলি এবং আমদানির সংকোচনের জন্য বয়ন শিল্প বিশেষ প্রসারলাভ করে। ক্রমে ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। ব্রিটেন ইহা উপলব্ধি করে যে, ভারতবর্ষকে শিল্পে অনুন্নত রাখা সাম্রাজ্য সংরক্ষণের পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে; ব্রিটেন বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলে প্রয়োজনীয় শিল্পজ পণ্য সরবরাহের ভার ভারতকে দেওয়াই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

কিন্তু যুদ্ধ পরিসমাপ্তির সংগে সংগেই ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে বিদেশী শাসকের উৎসাহ যেন স্তিমিত হইয়া আসিল। শিল্পায়নের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার এবং নূতন নূতন শিল্প সংগঠনের প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার নির্দেশ ভারত সচিবের দপ্তর হইতে আসিতে লাগিল। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পাটকল শিল্পের ন্যায় ভারতের কয়েকটি সুসংগঠিত শিল্পের সমৃদ্ধি ছাড়া শিল্পায়ন সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। এই প্রসংগে

ডাঃ লোকনাথন বলিয়াছেন, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে সাময়িক লাভে সহায়তা করা ছাড়া ভারতকে প্রকৃত শিল্পায়নের পথে প্রতিষ্ঠিত করিতে কোন কিছুই করে নাই।"* যুদ্ধের সময় যে-সকল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যুদ্ধোত্তর যুগে তাহারা অবনতি অভিমুখেই অগ্রসর হইতে লাগিল; শিল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিযোগিতার সম্মুখে তাহারা দাঁড়াইতে পারিল না।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মোট ফল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের পরিবর্তিত শিল্পনীতির ফলে প্রধান প্রধান ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশে (Major British Indian Provinces) এক একটি করিয়া শিল্পদপ্তরের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইলে শিল্প প্রাদেশিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার পর ১৯২১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের জন্য ফিসক্যাল স্বাতন্ত্র্যের প্রথা (Fiscal Autonomy Convention) গ্রহণ করিলে ভারত তাহার ফিসক্যাল নীতি-নির্ধারণের জন্য ঐ সালেই একটি ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত করে। কমিশন পরবর্তী বৎসরে যে ফিসক্যাল নীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে তাহাকে 'বিচারমূলক সংরক্ষণ' (Discriminating Protection) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই বিচার-মূলক সংরক্ষণ নীতির সমালোচনা নানাভাবে করা হইলেও একথা অনস্বীকার্য যে, ইহারই আওতায় ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প এবং কাগজ শিল্প বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে। ইহার মধ্যে ভারত আবার চিনি ও দিয়াশলাই-এ একরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। অপরদিকে সংরক্ষণ ব্যতিরেকেও সিমেণ্ট শিল্প ভারতের সমগ্র আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে একরূপ সমর্থ হয়।

প্রথম ফিসক্যাল কমিশন ও বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি

এই প্রসংগে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প প্রসারেও বিশেষ যত্ন লইতে থাকে। শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, সরাসরি অর্থসাহায্য করিয়া, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া তাহারা বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক হিসাবে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প গঠনে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হয়।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের প্রসার

কিন্তু শিল্পায়নের পথে ভারতের এই অগ্রসরতা এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে আবার বাধাপ্রাপ্ত হইল। বাধা আসিল 'সাম্রাজ্যিক সুবিধা' (Imperial Preference) নামক বিশেষ শুল্কনীতি হইতে। এই শুল্কনীতির অধীনে ভারতের বাজারে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যাদিকে সাম্রাজ্যের বহির্ভূত বিভিন্ন দেশ এবং ভারতের শিল্পদ্রব্য হইতে শুল্কের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৩২ সালে অটোয়া চুক্তিতে (Ottawa Agreements) ভারতের উপর এই শুল্কনীতি জোর করিয়াই চাপানো

শিল্পায়নের পথে নূতন প্রতিবন্ধক—সাম্রাজ্যিক সুবিধা

Lokanathan, *Industrialisation*

হয়। ফলে দ্বিতীয় দশকের শুল্কনীতির দ্বারা ভারতের শিল্পায়নের যে-পথ প্রস্তুত করা হইতেছিল তাহা আবার রুদ্ধ করার ব্যবস্থা হয়। শুল্কের ভার অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় উত্তরোত্তর বর্ধিত পরিমাণে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যাদি ভারতের বাজারে আমদানি হইতে থাকে। ফলে স্বতই বাধিয়া উঠে ব্রিটিশ ও ভারতের শিল্পস্বার্থের মধ্যে সংঘাত।

বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজার ও শিল্পায়নে ব্যাঘাত

ইতিমধ্যে আবার বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজার (Worldwide Trade Depression) ভারতের শিল্পোন্নয়নের উপর অভূতপূর্ব আঘাত হানে। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ২২৫ কোটি টাকার মত কমিয়া যায়; কিন্তু আমদানির পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকার অধিক কমে নাই। ফলে ভারতকে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত মিটাইবার জন্য স্বর্ণ রপ্তানির ব্যবস্থা করিতে হয়।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, উপরি-উক্ত প্রতিবন্ধকসমূহ সত্ত্বেও ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ভারত ধীরে ধীরে শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এই শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে একটা ধারণা নিম্নলিখিত তথ্য হইতে পাওয়া যাইবে। শিল্পোন্নয়নের ফলে ভারত আটটি শিল্পোন্নত দেশের অন্যতম হইয়া দাঁড়ায়।* যে-শিল্পগুলি এই সময়ের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে তাহারা হইল বস্ত্র শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কাগজ শিল্প, চিনি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাঁচ শিল্প, বনস্পতি ও সাবান শিল্প। ইহাদের মধ্যে বস্ত্রের উৎপাদন তিন গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পায়, কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আড়াই গুণ, ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দেশের চাহিদার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মিটাইতে থাকে এবং চিনিতে ভারত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। দিয়াশলাই, কাঁচ, বনস্পতি, সাবান প্রভৃতির উৎপাদনও বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ইহার ফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে কিন্তু দেখা গেল যে, ভারতের এই শিল্পোন্নয়ন বিদেশী সরকারের প্রয়োজন ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় কোন মতেই পর্যাপ্ত নহে। উপরন্তু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের পক্ষে ভারত হইতে যুদ্ধের মালমসলা অধিক পরিমাণে সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, যুদ্ধে ফ্রান্স ও অন্যান্য কতিপয় ইয়োরোপীয় মিত্রশক্তির অতি শীঘ্র পতন হইয়াছিল, জার্মান বোমারু বিমান ইংল্যাণ্ডের বহু কলকারখানা ধ্বংস করিয়াছিল এবং পরিশেষে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়াকে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করার নীতি স্থিরীকৃত ও ঘোষিত হইয়াছিল। এই নীতি ঘোষণার পূর্বেই অবশ্য যুদ্ধের গতি অনুসরণ করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতের শিল্প-গঠন কার্যে অগ্রসর হইয়াছিল।

---

* Wadia and Merchant, *Our Economic Problem*

শিল্প-গঠন কি পদ্ধতিতে হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গ্রেডি মিশন (Grady Mission) ভারতে আসে। গ্রেডি মিশন আসিয়া দেখিল "ভারতের খনিজ সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার হয় নাই।…শিল্পসমুদয় সাধারণ ব্যবসায়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়া সেইমতই কাজ চালাইতেছে; ইহাদিগকে যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিবার সম্যক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই; এবং দক্ষ শিল্প-শ্রমিকের অভাব ভারতের শিল্পায়নের পথে কোন গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় নয়।"

গ্রেডি মিশন ও শিল্প-প্রসার

ইহার পরে ভারতের শিল্প-পদ্ধতিকে পুরাপুরি যুদ্ধাভিমুখী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। এই কারণে এবং যুদ্ধের সময়ে আমদানি হ্রাস পাওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য অনেক ছোট ছোট নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিল। মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা ও যুদ্ধের অভাবনীয় চাহিদার দরুন পুরাতন শিল্পগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

ডাঃ পি. জে. টমাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতে শিল্পোন্নয়নের সংক্ষিপ্তসার এইভাবে দিয়াছেন: পুরাতন শিল্পসমূহের বিশেষ উন্নতি, নূতন কলকারখানা ও নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ভারতের শিল্প-সংগঠনের ভিত্তির বিশেষ প্রসারসাধন করে। এইভাবে আমরা বিস্তৃত ভিত্তিতে শিল্পায়নের পথে উপনীত হইয়াছি এবং আশা করা যায় যে, শীঘ্রই আমরা আমাদের যন্ত্রচালিত শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা (lopsidedness) দূর করিতে পারিব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের শিল্পোন্নয়নের সংক্ষিপ্তসার

পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করিয়াছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সৃষ্ট অবস্থার দরুন পুরাতন শিল্পসমূহের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থা নূতন শিল্প-সংগঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল না।* পুরাতন শিল্পসমূহের এই পূর্ণ ব্যবহার অবশ্য জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া কাম্য বিবেচিত হইতে পারে নাই, কারণ যন্ত্রাদির প্রয়োজনীয় ক্ষয়পূরণ ও পরিবর্তনের সম্যক ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই এই পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। এই সঞ্চিত ক্ষয়পূরণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে দেশের পক্ষে দীর্ঘদিন লাগিবে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হইতে জাতীয় সরকার দেশের শিল্প-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরিকরণ ও শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে একটি সুস্পষ্ট সরকারী শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। ইহার পর শিল্পসমূহের অর্থসংগ্রহের সমস্যা সমাধানকল্পে একটি শিল্প অর্থ করপোরেশন (Industrial Finance Corporation) প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎপরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল নূতন ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ ও নূতন সংরক্ষণ নীতি-নির্ধারণ। তারপর আসিল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ—যাহাতে অর্থ-ব্যবস্থার সর্বাংগীণ উন্নতির সহিত স্বতই জড়িত

স্বাধীনতার পর শিল্পোদ্যম

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শিল্পোন্নয়ন

* First Five Year Plan ৪২১ পৃষ্ঠা

আছে শিল্পোন্নয়নের প্রশ্ন। এই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায় বা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতেই শিল্পোন্নয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি (Nature of Industrial Development in India): ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে স্বল্পোন্নত দেশের শিল্প-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই আছে শিল্পোন্নয়নের অ-পর্যাপ্তি। প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমিক সরবরাহের তুলনায় ভারতে শিল্পোন্নয়ন কোন মতেই পর্যাপ্ত হয় নাই। ইহা বিদেশী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী (Economic Imperialists) শাসকের অধীনস্থ থাকারই ফল। এই শাসক সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ঔপনিবেশিক রূপদান করিয়াছিল; তাহারা এদেশ হইতে কাঁচামাল রপ্তানি ও তাহাদের নিজের দেশ হইতে এদেশে শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ আমদানির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। নিজস্ব প্রয়োজনবোধেই তাহারা আবার—যেমন দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়ে—কখনও কখনও শিল্পায়নে কিছু কিছু সহায়তা করিয়াছিল।

১। বৈশিষ্ট্য: শিল্পোন্নয়নের অ-পর্যাপ্তি

দ্বিতীয়ত, বিদেশী শাসকের আমলে ভারতে শিল্পায়ন কখনও দেশের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতিতে করা হয় নাই। ফলে, ভারতের শিল্প-ব্যবস্থা হইয়া উঠিয়াছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ (unbalanced or lopsided)। দেশে মূল শিল্প (basic industries) বিশেষ গড়িয়া উঠে নাই। এদিক দিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছিল যে ব্রিটিশ আমলে ভারতের শিল্পোন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল ভোগ্যদ্রব্যের উপর এবং মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন সকল সময়ই অবহেলিত হইয়াছিল।* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকর হইবার পূর্বেই ভারত তুলাজাত বস্ত্র, চিনি, সাবান, দিয়াশলাই, লবণ প্রভৃতিতে একরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন তখন সম্ভাব্যতার পরিসীমাতেও পৌছায় নাই।

২। অসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প-ব্যবস্থা

অসামঞ্জস্যতার দুইটি দিক: ক। মূল শিল্পে অনগ্রসরতা

ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতার আর একটি দিক আছে। ইহা হইল কয়েকটি শিল্পের অতিমাত্রায় আঞ্চলিকতা বা স্থানীয়করণ (localisation)। বস্ত্র শিল্প, পাটকল শিল্প, চিনি শিল্প প্রভৃতির ন্যায় ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ইহার ফলে ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে আঞ্চলিকতার অসুবিধাগুলি বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি কয়েকটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকিলেও কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্র ছড়াইয়া আছে সমগ্র দেশব্যাপী। ফলে কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয় স্বতই

খ। অত্যধিক আঞ্চলিকতা

* First Five Year Plan ৪২১ পৃষ্ঠা

বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অনাবশ্যকভাবে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে বলিয়া বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্য অনেক ক্ষেত্রে হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির অভাব, শিল্প-শ্রমিকের অপেক্ষাকৃত অদক্ষতা, শিল্পপতিগণের দূরদৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি হইল ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন-ব্যয়ের আধিক্যের অন্যান্য কারণ। শ্রমিকপিছু উৎপাদন হিসাব করিলে দেখা যায় যে ইহা অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশসমূহ অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া উপায় নাই যে, ভারত শিল্পোন্নত হইয়াও শিল্পে অনগ্রসর—ভারতের শিল্পোন্নয়ন হইল অ-পর্যাপ্ত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহাই স্বল্পোন্নত দেশের শিল্প-ব্যবস্থার প্রকৃতি।

ভারত শিল্পোন্নত হইয়াও শিল্পে অনগ্রসর

তবে বর্তমানে রূপান্তর সুস্পষ্টভাবে সূচিত হইয়াছে। আমাদের সর্বাংগীণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের প্রতিও সম্যক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। গ্রামময়, ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় বিস্তৃততর শিল্পগত ভিত্তির (broader industrial base) দিকে। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পগত ভিত্তি আরও বিস্তৃততর (still broader) করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিকল্পনাকারিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন যে জীবনযাত্রার অতি নিম্ন ও স্থিতিশীল মান, অর্ধ-নিয়োগ ও বেকারাবস্থা, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট ব্যবধান প্রভৃতি স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কৃষির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতারই ফল। অতএব, দ্রুত শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা গঠন করিতে হইবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার অর্থ কৃষিকে উপেক্ষা করা নহে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে কৃষিকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলিতে পারে না। শিল্প ও কৃষিকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গণ্য করিয়াই উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা গঠনে অগ্রসর হইতে হইবে। বর্তমানে ইহাই করা হইতেছে। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে কিছুটা উপেক্ষা করা হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে পুনরায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Trace briefly the history of industrial development in India up to the introduction of planned economy. (২৪৬-২৫০ পৃষ্ঠা)

2. "The industrial system of India is unevenly and is in most cases inadequately developed." Elucidate. (C. U. B. Com. 1949)

[ইংগিত: ভারতের শিল্প-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নহে, সামঞ্জস্যপূর্ণও নহে। প্রকৃতির সম্পদ ও শ্রমিক সরবরাহের তুলনায় ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ভারতে সকল প্রয়োজনীয় শিল্পও গড়িয়া উঠে নাই এবং যে শিল্প-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অতিমাত্রায় আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট।·· এবং ২৫১-২৫২ পৃষ্ঠা]

3. Describe the nature of industrial development of an underdeveloped country in the light of Indian conditions. (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দেখ।)

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প

(Important Manufacturing Industries of India)

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) ঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প অন্যতম মূল শিল্প। ইহার উপরই দেশের সামগ্রিক শিল্পায়ন বিশেষ নির্ভর করে। ইংল্যাণ্ডে ইহাকে ভিত্তি করিয়াই শিল্প-বিপ্লব সুরু হইয়াছিল। আমাদের দেশে এই শিল্পের ইতিহাস হইল অতি প্রাচীন। দিল্লীর কুতব মিনারের নিকট লৌহস্তম্ভ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহা আনুমানিক ৪১৯ সালে নির্মিত। কিন্তু আমাদের ইস্পাত শিল্প ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন। প্রাচীন দামাস্কাসের সুবিখ্যাত তরবারি ভারতের হায়দরাবাদ অঞ্চল হইতে আমদানিকৃত ইস্পাতেই নির্মিত হইত এরূপ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগেও ভারতের ইস্পাত শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পী আঘারীয়ারা প্রায় সারা ভারতেই ছড়াইয়া ছিল। কিন্তু বিদেশী যন্ত্রোৎপাদিত সুলভ বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে ভারতীয় তাঁতীদের যেরূপ বয়নকার্য ছাড়িয়া কৃষিতে ভিড় করিতে হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই আঘারীয়ারা একদিন তাহাদের বর্ণগত পেশা ত্যাগ করিয়া কৃষিকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

আধুনিক পদ্ধতিতে লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা করেন জোসিয়া মার্শাল হীদ (Josiah Marshall Heath) নামক এক শিল্পোদ্যোক্তা। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। ইহার পর ১৮৭৫ সালে বাংলাদেশের কুলটিতে 'বরাকর লৌহ কারখানা' নামে একটি কারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানায় মাত্র লৌহই তৈয়ারি হইয়াছিল, ইস্পাত তৈয়ারি হয় নাই। কিছু দিন পরে এই কোম্পানী 'বরাকর লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী'র (Barakar Iron and Steel Company) অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়; এবং পরে এই সমগ্র কোম্পানী আবার 'বংগদেশের লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী' (Bengal Iron and Steel Company) নামে পরিচিত হয়।

আধুনিক পদ্ধতির সূত্রপাত

কিন্তু ভারতের আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রকৃত বুনিয়াদের পত্তন হয় ১৯০৭ সালে টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে। টাটার কারখানায় ১৯১১ সাল হইতে লৌহ পিণ্ড (pig iron) এবং ১৯১২-১৩ সাল হইতে ইস্পাত তৈয়ারি সুরু হয়। শীঘ্রই টাটা কোম্পানী লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন-পদ্ধতিতে যুগান্তরের সূচনা করে। কিভাবে পূর্ণাংগ উৎপাদন-পদ্ধতিতে (integrated production system) ব্যয়সংক্ষেপ ও বহুল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতে তাহারই পথপ্রদর্শক টাটার লৌহ কারখানা।

আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রকৃত ভিত্তিস্থাপন

টাটার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আরও দুইটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়—যথা, 'ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী' (The Indian Iron and Steel Co.) এবং 'মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা' (The Mysore Iron and Steel Works)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে বিদেশী প্রতিযোগিতার দরুন ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়িলে উহাকে ১৯২৪ সালে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়।

সংরক্ষণ

সংরক্ষণমূলক শুল্ক ধার্য করা ছাড়াও প্রত্যক্ষ অর্থসাহায্য (bounty) করিয়াও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত চলে। তাহার পর উহাকে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের অন্যায্য প্রতিযোগিতা (dumping) হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং এই ডাম্পিং-প্রতিরোধকারী (anti-dumping) ব্যবস্থার মেয়াদ ১৯৪৭ সাল অবধি চলে। তারপর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে একরূপ সম্পূর্ণভাবে অবাধ বাণিজ্যের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

সংরক্ষণ ও ডাম্পিং-প্রতিরোধকারী শুল্কের ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের যে উন্নতি ঘটে তাহাকে আশাতীত বলিয়া বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সংরক্ষণের ফলে প্রসার

পূর্বে এই শিল্প দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ মিটাইতে সমর্থ হয় এবং রপ্তানিও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের এই উন্নতি প্রধানত টাটা কোম্পানীরই উন্নতি, কারণ অপর দুইটি কারখানা—যথা, ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা—ইস্পাত তৈয়ারি সুরু করিতে করিতেই সংরক্ষণের সময় একরূপ অতিবাহিত হইয়াছিল।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry under Planned Economy): ভারতের লৌহ ও ইস্পাত

প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণীবিভাগ

উৎপাদনের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) বেসরকারী ক্ষেত্রভুক্ত (private sector) প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং (২) সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত (public sector) প্রতিষ্ঠানসমূহ। প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান মাত্র দুইটি—যথা, টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী এবং ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় চারিটি—যথা, মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং 'হিন্দুস্থান ইস্পাত' নামক সংস্থার অধীনে পরিচালিত রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরের কারখানা তিনটি। নির্মীয়মাণ বোকারোর কারখানাও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রভুক্ত।

সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে সকল লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন-কেন্দ্রের মধ্যে টাটার প্রতিষ্ঠানই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহা এখনও শুধু ভারতের মধ্যে নহে সমগ্র কমনওয়েলথের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।* ইহা বৃহদায়তন পূর্ণাংগ

Dr. Verrier Elerin, *The Story of Tata Steel*

উৎপাদন-পদ্ধতির (large-scale integrated production) প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১। টাটার প্রতিষ্ঠান

কিছুদিন পূর্বেও ইহার উৎপাদনক্ষমতা ছিল মাত্র ৯ লক্ষ টন নির্মিত ইস্পাত (finished steel)। ভারত সরকার ও বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত ঋণে ইহাকে বৃদ্ধি করিয়া বর্তমানে ২২ লক্ষ টনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

বার্ণপুরে অবস্থিত বর্তমান ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান (Indian Iron and Steel Co.) ১৯৫৩ সালে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী এবং বাংলার ইস্পাত করপোরেশন (Steel Corporation of Bengal) এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তির ফল। সংযুক্তির পর প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত ঋণে উৎপাদনক্ষমতাকে ৩ লক্ষ টন হইতে ৮ লক্ষ টনে লইয়া যায়। ফলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের (টাটা এবং ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের) ইস্পাত উৎপাদনক্ষমতা মোট ৩০ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের লক্ষ্য ৩২ লক্ষ টনে ধার্য করা হইয়াছে।*

২। ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান

মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা পূর্বতন দেশীয় রাজ্য মহীশূর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইহাই ক্ষুদ্রতম; উৎপাদনক্ষমতা এখনও ১ লক্ষ টনে পৌঁছায় নাই।

৩। মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা

১৯৪৮ সালে ঘোষিত শিল্পনীতি অনুসারে সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগাধীন লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উড়িষ্যার রুরকেলার কারখানাই হইতেছে সর্বপ্রথম। ইহা স্থাপনের জন্য ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার ক্রুপস ও ডেমাগ (Krupps and Demag) নামে এক জার্মান শিল্প-সমবায়ের সহিত বিনিয়োগ-মূলধন ও শিল্পজ্ঞান সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পরে জার্মান মূলধন পরিহার করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন করা হয়।

৪। রুরকেলার কারখানা

রুরকেলার কারখানায় প্রথমে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন ইস্পাত পিণ্ড (steel ingot) উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়। পরে উৎপাদনক্ষমতাকে দ্বিগুণ করিয়া ৭ লক্ষ ২০ হাজার টনে লইয়া যাওয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করিয়া ১৮ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের ভিলাই (Bhilai) নামক স্থানে দ্বিতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানটি সোবিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় স্থাপিত। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ইহাই সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। প্রথমে ভিলাই-এর কারখানা হইতে ৮ লক্ষ টনের কাছাকাছি ইস্পাত পিণ্ড (steel ingot) উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরে সোবিয়েত ইউনিয়নের সহিত আর একদফা

৫। ভিলাই-এর কারখানা

---

* Third Five Year Plan ৪৭৬ পৃষ্ঠা

চুক্তির বলে উৎপাদনক্ষমতাকে ২৫লক্ষ টনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।* এই সম্প্রসারণ কার্য সমাপ্ত হইলে ভিলাই-এর কারখানার আয়তন টাটাকেও ছাড়াইয়া যাইবে।

৬। দুর্গাপুরের লৌহ কারখানা

সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান হইল পশ্চিমবংগের দুর্গাপুরের কারখানা। ইহা ইস্কন (ISCON) নামক এক ব্রিটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের** সহযোগিতায় নির্মিত। বর্তমানে কারখানার উৎপাদনক্ষমতা ৯লক্ষ টনের মত। তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনক্ষমতাকে ১৬ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৭। বোকারোর কারখানা

তৃতীয় পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রত্যাশিত সহযোগিতায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বোকারোতে যে আর একটি ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করা হইতেছে তাহার প্রাথমিক উৎপাদনক্ষমতা হইল ১০ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া নিভেলিতে (Neiveli) একটি পিণ্ড লৌহের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব আছে।

বলা হইয়াছে যে রুরকেলা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরের সরকারী উদ্যোগাধীন কারখানা তিনটি হিন্দুস্থান ইস্পাত লিমিটেড নামক সংস্থার অধীনে পরিচালিত। এই সংস্থার মালিকানা সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের ওঅনুমোদিত মূলধন ৩০০ কোটি টাকা।

এই মূল শিল্পের অনগ্রসরতাও ইহার কারণ

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নের জন্য এই যে সরকারী প্রচেষ্টা ইহা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই মূল শিল্পের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপেরই ফল। এ-পর্যন্ত এই শিল্পের উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ সরকারী সহায়তা করা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে সংরক্ষণ-দান করিয়া পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহাতে একমাত্র টাটার প্রতিষ্ঠানই বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টা অথবা পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা কোনটিই আমাদের বিদেশী সরকার করে নাই। ফলে, এই মূল শিল্প পশ্চাৎপদ রহিয়া সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্পোন্নয়নকে ব্যাহত করিয়াছে।

এই শিল্প কতটা অনগ্রসর

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যে কতটা পশ্চাৎপদ তাহা একটিমাত্র তুলনামূলক আলোচনা হইতেই সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে। ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লৌহ-মাক্ষিক সঞ্চিত আছে। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চিত লৌহ-মাক্ষিকের তিন গুণেরও অধিক। অথচ প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে ভারতে মাত্র বৎসরে ১০ লক্ষ টনের কাছাকাছি ইস্পাত উৎপন্ন হইত। প্রথম পরিকল্পনায় উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করিয়া ১৩ লক্ষ টনের কিছু উপরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে ইস্পাত উৎপন্ন হয় ১০ কোটি টনের উপর। জনসংখ্যার দিক দিয়া ইস্পাত উৎপাদনে যদি ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর্যায়ে

* Third Five Year Plan ৪৬৬ পৃষ্ঠা

** প্রতিষ্ঠানটির নাম হইল Indian Steel Works Construction Company Ltd.

উপনীত হইতে হয় তবে আমাদিগকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন (মার্চ, ১৯৬১) ২৬ লক্ষ টনকে ২৩ কোটি টনে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু কাঁচামালের প্রাচুর্য সত্ত্বেও কয়েকটি প্রতিবন্ধকের জন্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ বিশেষ ব্যাহত হইতেছে। প্রথমত, ভারতের কয়লাখনিগুলি মোটামুটি একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এইজন্য যেখানেই লৌহ-আকর পাওয়া যায় সেখানেই কারখানা স্থাপন করা যায় না। দ্বিতীয়ত, একটি বৃহদায়তন কারখানা স্থাপন করিতে হইলে ন্যূনতম ১০০ কোটি টাকার প্রাথমিক ব্যয় হয়। ইহার দরুনও পর্যাপ্ত সংখ্যায় ইস্পাত কারখানা স্থাপনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির যে-অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করাও দুষ্কর। চতুর্থত, ঐ একই কারণে প্রয়োজনীয় কর্মী আনয়ন করাও কঠিন।

সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধক

তবুও কাঁচামালের অনুপাতে ও উন্নত দেশসমূহের তুলনায় আমাদের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিশেষ পশ্চাৎপদ বলিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার ন্যায় তৃতীয় পরিকল্পনাতেও এই শিল্পের সম্প্রসারণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মোট লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদনক্ষমতাকে ১.০৭ কোটি টনে এবং শুধু ইস্পাতের উৎপাদনক্ষমতাকে ১.০২ কোটি টনে লইয়া যাওয়ার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইস্পাতের উৎপাদনকে ২২ লক্ষ টন হইতে ৬৮ লক্ষ টনে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।* ইহাও অবশ্য কোনমতে পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে এই লক্ষ্যেরই বিরোধিতা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, এই পরিমাণ ইস্পাত দেশের বাজারে চাহিদার তুলনায় অধিক হইবে। এই যুক্তির বিরোধিতা করিয়া বলা যায়, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন ব্যবস্থা দেশের বাজারে চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করিলে চলিবে না, রপ্তানির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

তুলাবস্ত্র শিল্প (Cotton Textile Industry): দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পূর্বে প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্পের তালিকায় সর্বপ্রধান স্থানাধিকার করিত তুলাবস্ত্র শিল্প। এখন সেই স্থান অধিকার করিয়াছে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। কয়েক দিক দিয়া অবশ্য এখনও তুলাবস্ত্র শিল্পের জন্য প্রধান স্থান নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, ইহা প্রাচীনতম ভারতীয় যন্ত্রচালিত শিল্প। ১৯৫৪ সালে ইহার শতাব্দী পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়ত, সেদিন পর্যন্ত এই শিল্পেই বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক। এখন অবশ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এই দিক দিয়া এই শিল্পকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তৃতীয়ত, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও সর্বাধিক। শুধু তুলাবস্ত্র

গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য:

* Towards a Self-reliant Economy ২২২ পৃষ্ঠা

উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত আছে প্রায় ৯ লক্ষ শ্রমিক।* চতুর্থত, ইহা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় পুঁজি ও উদ্যোগে সংগঠিত। পঞ্চমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে উল্লেখযোগ্য-ভাবে মাত্র যে দুইটি শিল্পের উন্নয়ন হইয়াছিল, তুলাবস্ত্র শিল্প তাহার মধ্যে একটি। অপরটি হইল পাটকল শিল্প। ষষ্ঠত, ইহা শুধু প্রধান ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প নহে, অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পও বটে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

ভারতে প্রথম কাপড়ের কল কলিকাতার নিকট ১৮১৮ সালে স্থাপিত হইলেও তুলাবস্ত্র শিল্পের প্রকৃত অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৮৫৪ সালে বোম্বাই-এ। ১৮৫৪ সালে মাত্র ১টি হইতে ১৯০১ সালে কলের সংখ্যা মোট ১৭৮-এ আসিয়া দাঁড়ায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত তুলাবস্ত্র শিল্পের এই যে অগ্রগতি ইহা অব্যাহতভাবে হয় না। ল্যাংকাশায়ারের স্বার্থে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতির পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলেন যে, ভারতের বিদেশী সরকার ল্যাংকাশায়ারের মিলগুলির স্বার্থে ভারতীয় তুলার উন্নয়নে উৎসুক ও সচেষ্ট ছিল এবং ঐ একই কারণে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের প্রতি ইহা ছিল বিমুখ।**

স্বদেশী আন্দোলন

তবুও তুলাবস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নাই। ১৯০৫ সালের প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইহা হইয়া দাঁড়ায় দুইটি প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্পের একটি। ঐ বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগে কাপড়ের কলের সংখ্যা ২৫০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার এই শিল্পের অবস্থা জাপানের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে সংকটাপন্ন হইয়া উঠে। তখন ইহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। পরে ব্রিটিশ

সংরক্ষণ

সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলি হইতে আমদানির উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করায় এই শিল্প কার্যত দ্বিতীয় দফায় সংরক্ষিত হয়। ইহার প্রায় সংগে সংগেই সুরু হয় দ্বিতীয় স্বদেশী বা আইন অমান্য আন্দোলন। এই দুই-এর সমন্বিত ফলে আমাদের তুলাবস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি আবার সুরু হয়, যদিও জাপানী প্রতিযোগিতার ফলে এই অগ্রগতি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকে।

পরাধীন ভারতে উৎপাদনের রেকর্ড

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় তুলাবস্ত্র শিল্পে তেজী বাজারের (boom condition) সৃষ্টি হয়। বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল স্থাপিত হইতে থাকে, উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র উৎপাদন করা হইতে থাকে এবং উৎপাদনও বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সালে ৩১৪টি কল এবং ৬৭ কোটি গজ কাপড় উৎপাদনের তুলনায় ১৯৪৪ সালে কলের সংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৯৬ এবং ৪৮৫ কোটি গজে। ব্রিটিশ আমলে ভারতে ইহাই হইল তুলাবস্ত্র উৎপাদনের রেকর্ড।

* India—1962

** Wadia and Merchant, *Our Economic Problem*

এই অভূতপূর্ব বস্ত্রোৎপাদনের যুগেই ঘটিয়াছিল বস্ত্র-সংকট। সংকট দূরিকরণের জন্য বস্ত্রের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থার (system of control and rationing) প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল। শিল্পের দিক দিয়াও অভূতপূর্ব বস্ত্রোৎপাদন মোটেই কাম্য বিবেচিত হয় নাই। যন্ত্রপাতির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের দ্বারাই তুলাবস্ত্র শিল্পে যুদ্ধকালীন 'সৌভাগ্য' আনয়ন করা হইয়াছিল। যন্ত্রপাতির এই ক্ষয়পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অথবা উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে মূলধনবৃদ্ধির ব্যবস্থা —কোনটিই করা হয় নাই। ফলে যুদ্ধোত্তর যুগের মন্দা বাজারে এই শিল্পকে বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

দেশবিভাগ ও তুলাবস্ত্র শিল্পে সংকট

যুদ্ধোত্তর যুগের মন্দা বাজার সুরু হইতে না হইতেই আসিল দেশবিভাগ। ইহার ফলে ভারতের দুইটি প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প—তুলাবস্ত্র শিল্প ও পাটকল শিল্প কাঁচামালের জন্য আমদানির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। অবিভক্ত ভারতের বর্তমান পাকিস্তানভুক্ত অঞ্চলসমূহ হইতেই প্রধানত এই দুই শিল্পে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হইত।

প্রথম প্রথম অবশ্য দেশবিভাগ তুলাবস্ত্রের ক্ষেত্রে সুফলই আনয়ন করিয়াছিল। নবসৃষ্ট পাকিস্তান ভারত হইতে বহু পরিমাণে বস্ত্র আমদানি করিতেছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাসজনিত (devaluation) কারণে ভারত-পাক বাণিজ্যে যে-সংকট দেখা দেয় তাহার ফলে পাকিস্তানে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানিই যে শুধু রুদ্ধ হইয়া যায় তাহা নহে, পাকিস্তান হইতে ভারতে তুলা আমদানিও বন্ধ হইয়া যায়। এই তুলার অধিকাংশ ছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নোপযোগী দীর্ঘ আঁশের তুলা। স্বতই মিলগুলি ঐরূপ বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। এমনকি অনেক মিলকে দরজা বন্ধও করিতে হয়। ফলে বস্ত্রশিল্প হইয়া উঠে অন্যতম সমস্যা প্রপীড়িত শিল্প (problem industry)। কাঁচাতুলার অভাবে উৎপাদন হ্রাস পাইতে পাইতে ১৯৫০-৫১ সালে ৩৭২ কোটি গজে আসিয়া দাঁড়ায়।

প্রথম পরিকল্পনায় অভূতপূর্ব উৎপাদন

পরবর্তী বৎসর হইতে সুরু হয় পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। প্রথম পরিকল্পনায় মিলে উৎপাদিত তুলাবস্ত্রের পরিমাণকে ৩৭১ কোটি গজ হইতে ৪৭০ কোটি গজে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির করা হয়। কিন্তু ১৯৫৪ সালের মধ্যেই এই নির্দিষ্ট অংক অতিক্রম করিয়া মোট প্রায় ৫০০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ইহা ১৯৪৪ সালের উৎপাদন-রেকর্ড ভংগ করে। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ সালে উৎপাদন ইহা হইতেও বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৫৩০ এবং ৫৩২ কোটি গজে দাঁড়ায়।

তুলাবস্ত্রের এই অভাবনীয় উৎপাদনবৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইতিমধ্যে কাঁচাতুলার আমদানি সরল ও সহজ হইয়া উঠিয়াছিল; ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে কাপড়ের বিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছিল; এবং রপ্তানি ও উৎপাদন শুল্ক বিশেষ পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছিল।

উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়াও পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রথম যুগে বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতির আর একটি সূচক হইল তুলাবস্ত্র দ্রব্যের (cotton piece goods) রপ্তানি বৃদ্ধি।

রপ্তানির অবস্থা

১৯৫০ সালে ভারত মোট ৮০ কোটি টাকা মূল্যের ১২৭ কোটি গজের মত তুলাবস্ত্র দ্রব্য রপ্তানি করিয়া রপ্তানি বাণিজ্যের এই বিষয়ে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু পরবর্তী বৎসর হইতে মধ্য ও দূর প্রাচ্যের বাজারে ব্রিটেন, জাপান, নয়া চীন প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতার ফলে রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ কমিতে থাকে। ১৯৫৮-৫৯ সালে রপ্তানির মূল্য মাত্র ৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে সরকারকে রপ্তানি প্রসারের জন্য নানারূপ প্রচেষ্টা করিতে হয়।

১৯৪৯ সালের রপ্তানি প্রসার কমিটির (Gorwalla Export Promotion Committee) সুপারিশ অনুসারে তুলাবস্ত্র দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি রপ্তানি প্রসার পরিষদ (Export Promotion Council) স্থাপিত হয়। পরিষদ দূর প্রাচ্যের দেশসমূহে (Far Eastern Countries) তুলাবস্ত্রের বাজারের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৫৫ সালে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এই

রপ্তানিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

প্রতিনিধি দলের সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন দেশে পরিষদের শাখা খোলা হয় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানির অংক ১১০ কোটি গজে নির্দিষ্ট করা হয়। পরে চৈনিক প্রতিযোগিতার তীব্রতাবৃদ্ধির দরুন উহা আরও কমাইয়া ৮০ কোটি গজ বা ৫২ কোটি টাকায় লইয়া আসা হয়। পর পর দুই বৎসর (১৯৫৯-৬০ সাল এবং ১৯৬০-৬১ সাল) অবশ্য এই লক্ষ্যকে অতিক্রম করিয়া মোটামুটি ৬০ কোটি টাকার মত বস্ত্র রপ্তানি করা সম্ভব হয়। কিন্তু ১৯৬১-৬২ সালে রপ্তানি পুনরায় হ্রাস পাইয়া ৪৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। প্রধানত দুইটি কারণের জন্য তুলাবস্ত্রের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। প্রথমত, ব্রিটেন অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশগুলিতে ভারতীয় তুলাবস্ত্রের উপর নানারূপ নিষেধাজ্ঞা বসানো হইয়াছে। ফলে ঐ দেশগুলিতে তুলাবস্ত্রের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। দ্বিতীয়ত, অ-পর্যাপ্ত কাঁচাতুলা, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় ইত্যাদির ফলে ভারতীয় তুলাবস্ত্র শিল্প আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় তুলাবস্ত্র শিল্পের মূল সমস্যাগুলির সমাধান করিতে না পারিলে রপ্তানি ব্যাহত হইতে থাকিবে।

তুলাবস্ত্র শিল্পের প্রধান সমস্যা হইল তিনটি—যথা, কাঁচামাল সরবরাহের সমস্যা,

বর্তমান সমস্যা

তুলাতাঁত শিল্পের সহিত সমন্বয়ের সমস্যা এবং যুক্তিসিদ্ধভাবে পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশনের (rationalisation) সমস্যা।

প্রথমে কাঁচামাল সরবরাহের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় ভারতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলেও লম্বা আঁশযুক্ত তুলার জন্য ভারতকে এখনও বেশ কিছুদিন ধরিয়া অনেকাংশে আমদানির উপর নির্ভরশীল থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় হইতে লম্বা আঁশের তুলা

উৎপাদনের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সংগে সংগে একথাও বলা হইয়াছে—এই উৎপাদনবৃদ্ধি সেচ-ব্যবস্থার প্রসারের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।* সুতরাং পর্যাপ্ত পরিমাণে লম্বা আঁশের তুলা উৎপাদন করিতে সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির পরিবর্তে কতটা কাঁচাতুলা আমদানিতে ব্যয় করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে।

১। কাঁচামাল সরবরাহের সমস্যা

তুলাতাঁত শিল্পের (cotton handloom) সহিত যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের সমন্বয়ের সমস্যাকে উভয় শিল্পেরই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলিয়া অভিহিত করা যায়। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে শুধু তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে নহে, সকল ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেই, ইহাদের এবং ইহাদের প্রতিযোগী বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা ও পন্থা নির্দেশ করা হইয়াছে। পারস্পরিক উৎপাদন-ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নকল্পে যন্ত্রোৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের উপর সেস ধার্য করা, প্রভৃতি হইল এই সমন্বয়সাধনের পন্থা। এই সকলের ফলে তাঁত-শিল্পের কিছু কিছু সুরাহা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যন্ত্রোৎপাদিত বস্ত্রের উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে সামগ্রিকভাবে বস্ত্রোৎপাদন দেশের প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত হয় নাই। এই প্রসংগে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট বলেন যে, ভবিষ্যতে তুলাবস্ত্র শিল্প এবং তুলাতাঁত শিল্পের সমন্বয়সাধনের কার্যক্রম দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ধারণ করিতে হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য সেস্, রেয়াৎ প্রভৃতির বিলোপসাধন দ্বারা ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পগুলিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার নীতি ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতে যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের কিছুটা সুবিধা হইবে, আশা করা যায়।

২। তুলাতাঁত শিল্পের সহিত সমন্বয়ের সমস্যা

যুক্তিসিদ্ধভাবে পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশনের সমস্যা কিছুদিন হইতে ভারতীয় তুলাবস্ত্র শিল্পকে প্রপীড়িত করিতেছে। ইহার মধ্যে প্রধান কারণ হইল বিদেশী বিশেষ করিয়া জাপানী, চৈনিক ও পাকিস্তানী প্রতিযোগিতা। জাপানী, ব্রিটিশ প্রভৃতি বস্ত্রশিল্প আধুনিকভাবে সংগঠিত এবং চৈনিক ও পাকিস্তানী বস্ত্রশিল্প রপ্তানির উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে নানাভাবে সহায়তা পাইয়া থাকে। ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প মধ্য ও দূর প্রাচ্যের রপ্তানি বাজার অনেকাংশে হারাইয়াছে। উপরন্তু, ভারতীয় তুলাবস্ত্রের অধিকাংশ মিলগুলিতে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৫৮ সালে যোশী কমিটি (Joshi Committee) অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে যে,

৩। র‍্যাসানালাইজেশনের সমস্যা

* Second Five Year Plan ২৮৩ পৃষ্ঠা

ভারতীয় তুলাবস্ত্র শিল্পে অধিকাংশ যন্ত্রপাতি ৪০ বৎসরের অধিককাল যাবৎ নিয়োজিত আছে। ফলে উহা প্রায় সম্পূর্ণভাবে অকেজো ও অনুৎপাদনশীল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিবিধানের অন্যতম পন্থা হইল ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকেও আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করা। কিন্তু ভারতের বর্তমান নিয়োগ পরিস্থিতি হইতেছে র‍্যাসানালাই-জেশনের বিশেষ অন্তরায়। যখন বর্তমান পর্যায়ে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হইল অধিকতর নিয়োগের ব্যবস্থা করা তখন একদিক দিয়া প্রয়োজনীয় হইলেও বস্ত্র শিল্পের র‍্যাসানালাইজেশনের দ্বারা অত অধিক লোকের কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা সমর্থন করিতে পারা যায় কিরূপে? সুতরাং বর্তমানে তুলাবস্ত্র শিল্পের আধুনিককরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও র‍্যাসানালাইজেশনের পথে সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কার্ভে কমিটিও (Karve Committee)* ধীরে ধীরে র‍্যাসানালাইজেশনের পথে পদসঞ্চার করিতে উপদেশ দিয়াছিল।

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া কল্পনা করা যায়

তবুও দুইটি কারণে ভারতীয় তুলাবস্ত্র শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা না করিয়া থাকা যায় না। প্রথমত, ভারতে লোকপিছু বস্ত্র ব্যবহার অত্যন্ত কম। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা ছিল ১৫'৫ গজ মাত্র। মিশর, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কথা ধরিলেও এই অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। ঐ দুই দেশে বাৎসরিক লোকপিছু বস্ত্র ব্যবহার হইল যথাক্রমে ১৮ গজ ও ২২ গজ। এইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় লোকপিছু বস্ত্র ব্যবহারকে ১৭'২ গজে লইয়া যাইবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। দ্বিতীয়ত, তুলাবস্ত্র দ্রব্যের রপ্তানি বাজারকেও বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। সুতরাং কিছু পরিমাণ র‍্যাসানা-লাইজেশন অপরিহার্য। বর্তমানে এই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

আধুনিককরণের ব্যবস্থা

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (NIDC) তুলাবস্ত্র শিল্পের আধুনিককরণের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ঋণপ্রদান করিয়া চলিয়াছে। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত করপোরেশন প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি টাকার মত। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য অবলম্বিত অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদন-শুল্কের (excise duties) হ্রাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ সালে সকল প্রকার বস্ত্রের উপর উৎপাদন-শুল্ক হ্রাস এবং ঐ শুল্ককে যুক্তিসিদ্ধ (rationalised) করা হয়।

উৎপাদন ও উৎপাদন-লক্ষ্য

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে মিলবস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৭২ কোটি গজ। পরিকল্পনাধীন ১০ বৎসরে উৎপাদন হ্রাসবৃদ্ধি পাইয়া পরিকল্পনা শেষে ৫১৩ কোটি গজে দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে (১৯৬২-৬৩ সাল) উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৫২০ কোটি গজ। ঐ পরিকল্পনার শেষে ইহাকে ৫৮০ কোটি গজে লইয়া যাইবার

---

* ২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁতশিল্প, খাদি প্রভৃতির উৎপাদন ৩৫০ কোটি গজে পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্য সাধিত হইলে মোট বস্ত্র উৎপাদন ৯৩০ কোটি গজে দাঁড়াইবে।*

পাটকল শিল্প (Jute Mill Industry): তুলাবস্ত্র শিল্পের আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তুলাবস্ত্র শিল্প এবং পাটকল শিল্প—মাত্র এই দুইটিই ছিল ভারতের সংগঠিত শিল্প। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয়েরই সূত্রপাত হয় এবং উভয়েরই ক্রমোন্নতি ঘটিতে ঘটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে উভয়েই একরূপ সুসংগঠিত হইয়া উঠে।

তুলাবস্ত্র শিল্প ও পাটকল শিল্পের উদ্ভব ও প্রসারগত এইরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও গঠন ও প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে যথেষ্ট। প্রথমত, তুলাবস্ত্র শিল্প সংগঠিত হয় দেশীয় উদ্যোগ ও মূলধনে কিন্তু পাটকল শিল্পের প্রসার ঘটে বিদেশী পুঁজি ও তত্ত্বাবধানে। বর্তমানে বিদেশী পুঁজির একাংশ ভারতীয় শিল্পপতিগণের নিকট হস্তান্তরিত হইলেও তত্ত্বাবধান মূলত এখনও বিদেশীর হস্তে রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, তুলাবস্ত্র শিল্প হইল প্রধানত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প—বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু পাটকল শিল্পের গুরুত্ব হইল বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী হিসাবে পূর্বে রপ্তানি পণ্য হিসাবে পাটজাত দ্রব্যের স্থান ছিল প্রথম। পর পর কয়েক বৎসর এই স্থান চা শিল্পকে ছাড়িয়া দিতে হইলেও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি মূল্য এখনও সকল পণ্যের মোট রপ্তানি মূল্যের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। তৃতীয়ত, আঞ্চলিকতার দিক দিয়া পাটকল শিল্প হইল তুলনাবিহীন। পাটকল শিল্পের ন্যায় কেন্দ্রীভূত শিল্প ভারতে আর নাই। ভারতের মোট ১০৬টি রেজিষ্ট্রীভুক্ত পাটকলের মধ্যে প্রায় ১০০টি কলিকাতার চারিপার্শ্বে হুগলী নদীর দুই তীরে অবস্থিত।** চতুর্থত, সংগঠন-দক্ষতাতেও পাটকল শিল্প তুলনাবিহীন। ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুসংগঠিত শিল্প। পরিশেষে, সংরক্ষণ ব্যতিরেকেই ইহা সম্প্রসারিত হইয়াছে।

বৈশিষ্ট্য:

প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৫ সালে। ১৮৭৭ সাল হইতে এই শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটিতে থাকে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পাটকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০-এ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলের সংখ্যা ও উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। পাটকল শিল্পের এই অগ্রগতি ১৯২৯-৩৩ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজারের ফলে ব্যাহত হইলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আবার সৌভাগ্য আনয়ন করে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

ইহার পরেই কিন্তু দেশবিভাগের ফলে কাঁচাপাট সরবরাহের প্রধান কেন্দ্রগুলি পূর্ব-পাকিস্তানভুক্ত হওয়ায় ভারতীয় পাটকল শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় রাখার সমস্যার

---

* Third Five Year Plan ৪৮৭ পৃষ্ঠা

** Census of Indian Manufactures, 1958

সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথম প্রথম পূর্ব-পাকিস্তান হইতে কাঁচাপাট আমদানি করার অসুবিধা প্রকট হইয়া উঠে নাই; কিন্তু ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে মুদ্রামূল্যহ্রাসজনিত ভারত-পাক বাণিজ্য-সংকটের ফলে ভারতীয় পাটকলের পক্ষে কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা জীবনমরণ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব-পাকিস্তানে যে শুধু অধিক পাট উৎপন্ন হয় তাহা নহে, উৎকৃষ্ট পাটের অধিকাংশও এখানে উৎপন্ন হয়।

দেশবিভাগ ও পাটকল শিল্পের জীবন-মরণ সমস্যা

পাটকল শিল্পের এই সংকটাবস্থা দূরিকরণের জন্য ভারতীয় ইউনিয়নে অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট জাতের পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা তীব্রভাবে করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলপ্রসূও হয়। পরে পাকিস্তানের সহিত তত্ত্বগতভাবে বাণিজ্য-সংকট দূর হইলে ঐ দেশ হইতেও পাট আমদানি চলিতে থাকে। পাকিস্তান হইতে আমদানির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাইলেও এখন ভারতের পাটকলগুলি অনেকাংশে পাকিস্তানী পাটের উপর নির্ভরশীল। অজন্মার বৎসরে এই নির্ভরশীলতার পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া যায়।

সকল দিক দিয়া বর্তমান অবস্থার বিচার করিলে পাটকল শিল্পকে একটি সমস্যাপূর্ণ শিল্প (problem industry) বলিয়া বর্ণনা করা চলে। দেশবিভাগের ফলে তুলাবস্ত্র শিল্পও একটি সমস্যাপূর্ণ শিল্পে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বর্তমান সমস্যা একরূপ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। অপরদিকে পাটকল শিল্প বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমস্যার সম্মুখীনই রহিয়াছে। পাটকল শিল্পের সমস্যাসমূহকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়—(১) নিয়মিতভাবে উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা, (২) বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সমস্যা, (৩) পরিবর্তের (substitutes) সহিত প্রতিযোগিতার সমস্যা।*

বর্তমান সমস্যা :

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে ভারতীয় ইউনিয়নে চাষের পরিমাণ বাড়াইবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারত এখন কাঁচাপাট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে হিসাব করা হইয়াছিল যে ভারতের পাটকলগুলির পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য মোট ৭৩·৫ লক্ষ গাঁইট কাঁচাপাট প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে সবিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় ইউনিয়নে ৬০-৬২ লক্ষ গাঁইটের বেশী কাঁচাপাট উৎপন্ন হইতেছে না। অবশ্য ১৯৬১-৬২ সালে উৎপাদন ছিল ৬৩ লক্ষ গাঁইট। সুতরাং অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে হয় পাটকলগুলির পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না, না-হয় কাঁচাপাট সংগ্রহের জন্য পাকিস্তানের উপর কিছু-না-কিছু পরিমাণে নির্ভর করিতে হইবে। পাকিস্তান হইতে প্রয়োজনীয় আমদানি অসুবিধাজনক হওয়ায় বর্তমানে প্রথম পন্থাই অবলম্বন করিতে হইতেছে। ১৯৬০ সালের মধ্যভাগ হইতে প্রয়োজনমত পাটকলগুলিকে হয় বয়নযন্ত্রগুলির (looms) একাংশ বন্ধ রাখিতে হইতেছে, না-হয় সময়ে সময়ে পর্যায়ক্রমে মিলগুলিকেও বন্ধ রাখিবার (block closure) ব্যবস্থা

১। কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা

* **Problems of the Indian Jute Mill Industry, J. Jamieson**

করিতে হইতেছে। এই সংকট হইতে মুক্ত হইতে হইলে ভবিষ্যতে উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দেশে কাঁচাপাট উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু কাঁচাপাটের নিয়মিত উৎপাদনবৃদ্ধি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান হইল কাঁচাপাটের দামের স্থায়িত্ব। এক বৎসর দাম হ্রাস ঘটিলে পর বৎসর উৎপাদন বিশেষ ব্যাহত হয়। এক দিক দিয়া ১৯৬১-৬২ সালের উৎপাদন (৬৩ লক্ষ গাঁইট) তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন-লক্ষ্যকে (৬২ লক্ষ গাঁইট) ছাড়াইয়া গেলেও কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যার সমাধান ঘটিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ, দামহ্রাসের ফলে উৎপাদন আবার হ্রাসের দিকে যাইতে পারে। অতএব, উৎপাদনবৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য অন্যান্যের সহিত কাঁচাপাটের দামে স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে হইবে।

কাঁচাপাটের দামে স্থায়িত্ব আনয়নের প্রয়োজনীয়তা

আবার শুধু কাঁচাপাটের উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিলেই চলিবে না সংগে সংগে আবার কাঁচাপাটের জাত উন্নয়নের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য যে বৈদেশিক বাজার ক্রমশ হারাইতেছে তাহার অন্যতম কারণ হইল ভারতীয় পাটকলগুলি কর্তৃক নিকৃষ্ট জাতের কাঁচাপাট ব্যবহার। ভারতীয় পাটকল সংঘের সভাপতির মতে, উন্নত জাতের কাঁচাপাট ব্যবহার ব্যতিরেকে ভারত পাটজাত দ্রব্যের বিদেশী বাজারে কোনমতেই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।*

ভারতীয় পাটকল শিল্পের পৃথিবীতে একচেটিয়া বাজার আর নাই। এখন পাটজাত দ্রব্যের বাজারে ভারতের প্রধান প্রতিযোগী হইতেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানে পাটকল শিল্পের সম্প্রসারণ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। সম্প্রতি জাপানেও পাটকল শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানী ও জাপানী পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পাকিস্তান ও জাপান ছাড়া কয়েকটি ইয়োরোপীয় দেশও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আমাদের প্রতিযোগী। ভারতীয় পাটকল সংঘের সাম্প্রতিক বিবৃতি অনুসারে এই সকল ইয়োরোপীয় দেশ বর্তমানে সংরক্ষণের মাধ্যমে পাটকল শিল্পের সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিয়াছে। ফলে ঐ সকল দেশে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

২। বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সমস্যা

তৃতীয়ত, পরিবর্ত হইতে প্রতিযোগিতাও ভারতীয় পাটকল শিল্পের সম্মুখে বিশেষ আশংকার সৃষ্টি করিয়াছে। কাগজ, তুলা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বস্তা পাটের থলি হইতে দামে অনেক সস্তা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পাটজাত দ্রব্যের পরিবর্তে ইহাদের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে।

৩। পরিবর্ত হইতে প্রতিযোগিতার সমস্যা ও উহার সমাধান

---

* ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে প্রদত্ত বার্ষিক অভিভাষণ।

শেষোক্ত দুই প্রকার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার জন্য কাঁচাপাটের জাত উন্নয়ন ছাড়াও পাটজাত পণ্যের উপর রপ্তানি শুল্কের বিলোপসাধন, ভারতীয় পাটকল শিল্পে আধুনিককরণ (modernisation), গবেষণার মাধ্যমে নূতন নূতন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি প্রতিবিধান নির্দেশ করা হয়।

ইতিমধ্যেই প্রতিবিধানগুলি মোটামুটি অবলম্বিত হইয়াছে। পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পর ১৯৫৫ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্কের সময়োচিত বিলোপসাধন করা হয়। ভারতীয় পাটকল সংঘের কর্তৃপক্ষের মতে, ইহার এবং পাকিস্তানের কাঁচাপাট রপ্তানির উপর ন্যূনতম মূল্যধার্যের সিদ্ধান্তের ফলে বাহিরের বাজারে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য সর্বপ্রথম সার্থকভাবে উভয় প্রকার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিয়াছে। পাটকলসমূহের আধুনিককরণের পথেও ভারত বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের সহায়তায় শতকরা ৮৫ ভাগ পাটকল আধুনিককরণের কার্য একরূপ সমাপ্ত করিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে বস্ত্রশিল্পের ন্যায় পাটকল শিল্পেরও আধুনিককরণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু বস্ত্রশিল্পের মতই বর্তমান অবস্থায় সামগ্রিকভাবে নিয়োগহ্রাসের সম্ভাবনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই পাটকলগুলিকে আধুনিককরণ বা র‍্যাসানালাইজেশনের পথে চলিতে হইতেছে।

অবলম্বিত প্রতিবিধান-সমূহ

১। পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্কের বিলোপসাধন

২। পাটকলসমূহের আধুনিককরণ

ভারতে উৎপন্ন পাটের জাত উন্নয়নের ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কিছু কিছু করা হইলেও এই সম্পর্কে প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়তার পশ্চাতেই রহিয়া গিয়াছে। এই কারণে ১৯৬০ সালে ভারতীয় পাটকল সংঘের অধীনে একটি পাট উন্নয়ন শাখা (Jute Development Section) খোলা হইয়াছে।

৩। পাটের জাত উন্নয়নের ব্যবস্থা

গবেষণার মাধ্যমে নূতন নূতন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া যাইতেছে। কলিকাতার পাট সংক্রান্ত গবেষণাগারে পশ্চিম জার্মেনী হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া পাট হইতে উন্নত ধরনের কম্বল, গায়ের কাপড় প্রভৃতি নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

৪। নূতন নূতন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন

ভারতীয় পাটকল শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়া যে বিশেষ কঠিন তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। এই শিল্প হইল সমস্যা প্রপীড়িত শিল্প। সমস্যাগুলির সম্যক সমাধান না হইলে ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং এই শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদিগকে অতি সাবধানের সহিত চলিতে হইবে।

এই শিল্পের ভবিষ্যৎ

চিনি শিল্প (Sugar Industry): ভারতের আধুনিক চিনি শিল্প বিচারমূলক সংরক্ষণেরই (discriminating protection) দান। স্বাভাবিক সুবিধা থাকিলে একটি শিশু শিল্প সংরক্ষণের আওতায় কিভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে সুসংগঠিত হইয়া উঠিতে পারে ইহা তাহারই অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই শিল্প সংরক্ষণের দান

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতে আধুনিক কয়েকটি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইলেও ১৯৩১ সাল অবধি চিনিশিল্প বিশেষ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। তখন পর্যন্ত ভারতের প্রয়োজনীয় চিনির অধিকাংশ জাভা ও অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি হইত। এই সকল দেশের পুরাতন চিনিশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় নবজাত চিনিশিল্প পারিয়া উঠিত না।

১৯৩২ সালে ভারতীয় চিনিশিল্পকে প্রথমে ৭ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ প্রদান করা হইলে অভাবনীয় উন্নতি ঘটিতে থাকে। ঐ ৭ বৎসরের মধ্যে মোট উৎপাদন ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২ লক্ষ টনে পরিণত হয় এবং কলের সংখ্যা ৩১ হইতে ১৩০-এ গিয়া দাঁড়ায়। ফলে ভারত চিনিতে একরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে সমর্থ হয়। সংরক্ষণ অবশ্য ১৯৫০ সাল অবধি চলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু উৎপাদন বিশেষ হ্রাস না পাওয়া সত্ত্বেও সমগ্র দেশ চিনি-দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। ফলে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হয়। ১৯৫২ সাল হইতে এই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

চিনিশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা সংরক্ষণের আওতায় স্বল্প সময়ের মধ্যে সুসংগঠিত অন্যতম প্রধান ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প। নিয়োগ ও মূলধন বিনিয়োগের দিক দিয়া এই শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহের মধ্যে ইহার স্থান তুলাবস্ত্র শিল্পের পরই। অত্যধিক আঞ্চলিকতা হইল চিনিশিল্পের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। চিনির কলগুলির অধিকাংশই উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে অবস্থিত। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবংগ প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হইলেও এই সকল রাজ্যেও উপযুক্ত সংখ্যায় চিনির কল স্থাপিত হয় নাই। তৃতীয়ত, ভারতীয় চিনিশিল্পের উৎপাদন-ব্যয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার কারণ হইল ভারতে উৎপন্ন ইক্ষু নিকৃষ্ট জাতের; এবং ইক্ষু অপজাতের (by-products) সম্যক ব্যবহার এখন করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। চতুর্থত, মধ্যে মধ্যে কিছু চিনি আমদানি করিলেও অধিকাংশ বৎসর ভারত দ্রব্য-বিনিময়ের ভিত্তিতে (barter deal) চিনি রপ্তানিও করিয়া থাকে। সুতরাং এই শিল্পকে অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রার্জনকারী শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

চিনিশিল্পের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস এবং চিনির উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৫১ সালের শিল্প

উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন [Industries (Development and Regulation) Act, 1951] অনুসারে এই শিল্পের জন্য একটি উন্নয়ন পরিষদের (Development Council) গঠিত হইয়াছে। উন্নয়ন পরিষদের সুপারিশ অনুসারে অনেক ক্ষেত্রে ইক্ষুর গুণানুসারে, ওজন অনুসারে নহে, ইক্ষুর দাম প্রদান করা হইতেছে। ইহার ফলে কৃষকগণ ইক্ষুর জাত উন্নয়নে সচেষ্ট হইয়াছে। শক্তি সুরাসার (power alcohol), কাগজ, পেষ্ট বোর্ড প্রভৃতি উৎপাদনে ইক্ষু অপজাতের উত্তরোত্তর ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে যাহাতে ইক্ষু হইতে অধিকতর রস বাহির করা যায় তাহার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে।

উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

চিনিশিল্পের বিকেন্দ্রিকরণের প্রচেষ্টাও করা হইয়াছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। পশ্চিমবংগ, পাঞ্জাব এবং বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলে উৎকৃষ্ট জাতের ইক্ষু জন্মে। অথচ এই সকল স্থানে চিনির কল নাই বলিলেই হয়। অপরদিকে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বহুসংখ্যক কলের অবস্থানগত বিশেষ কোন সুবিধা নাই। এই সকল কলকে দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলেও প্রধানত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিরোধিতার জন্য ইহাকে কার্যকর করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমানে স্থানান্তরিতকরণের নীতি একরূপ পরিত্যক্ত হইলেও চিনির উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সমবায়িক ভিত্তিতে নূতন নূতন স্থানে কল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

চিনিশিল্পের বিকেন্দ্রিকরণের প্রচেষ্টা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১১ লক্ষ টনের কিছু অধিক চিনি উৎপন্ন হয়। বর্তমানে উহা বাড়িয়া ২৫ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে।* তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন ১০ লক্ষ টনের মত বৃদ্ধি করিয়া মোট ৩৫ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার প্রস্তাব আছে। এই উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নানারূপ প্রচেষ্টা করা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে উৎপাদন সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও দ্বিতীয় বৎসরে উৎপাদন হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে শিল্পের অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার চিনির মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জারি করিয়াছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি রাজ্যে বরাদ্দ-ব্যবস্থাও চালু করা হইয়াছে।

উৎপাদন ও সাম্প্রতিক অবস্থা

কয়লাখনি শিল্প (Coal Mining Industry): ভারতের অন্যতম প্রধান খনিজ ও শক্তি সম্পদ হিসাবে কয়লা সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। এখন শিল্প হিসাবে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

কয়লাখনি শিল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় যে, এই শিল্প মূল শিল্পসমূহের (basic industries) অন্যতম। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের

* India—1962

প্রসার এবং তাপজ বিদ্যুৎ (thermal power) উৎপাদনের পরিকল্পনার জন্য এই শিল্পের গুরুত্ব বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের পরিমাণের দিক দিয়া ইহাতে ভারত পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে। তৃতীয়ত, ইহা অন্যতম ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী শিল্পও বটে। নিয়োগের দিক দিয়াও এই শিল্পের গুরুত্বও রহিয়াছে। ১৯৬০ সালে গড়ে দৈনিক ৪ লক্ষের মত শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল।* অন্য কোন খনিজ শিল্পে এত অধিক শ্রমিক নিযুক্ত নাই। পরিশেষে, মূল ও ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহকারী শিল্প হিসাবে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নানান সমস্যায় পরিপূর্ণ।

বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

কয়লা উত্তোলনের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা করা হয় ১৮১৪ সালে রাণীগঞ্জে। তবে এই শিল্পের প্রসার সুরু হয় ১৮৮০ সাল হইতে, ভারতীয় রেলপথের ব্যাপক নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবার পর।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

পরবর্তী যুগেই রেলপথসমূহই কয়লাখনি শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা মোট উৎপন্ন কয়লার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক ব্যবহার করিতে থাকে। এইভাবে কয়লাখনি শিল্পের প্রসারের সংগে সংগে কয়লার রপ্তানিকার্যও আরম্ভ হয়।

কয়লাখনি শিল্প প্রথম সংকটের সম্মুখীন হয় ১৯২১ সালে। রেলপথগুলির কয়লাখনির মালিকানা, বৈদ্যুতিক শক্তি ও তৈলের অধিকতর সরবরাহ, শিল্পোন্নত দেশসমূহ হইতে স্বদেশ ও বিদেশের বাজারে তীব্রতর প্রতিযোগিতা প্রভৃতিই ছিল উপরি-উক্ত সংকটের কারণ। এই সংকট হইতে মুক্ত হইতে না হইতে আসিয়া পড়িল ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজার। ১৯৩৭ সাল হইতে আবার সুরু হয় ভারতীয় কয়লাখনি শিল্পের অগ্রগতি; এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই অগ্রগতিকে অব্যাহতই রাখে।

দেশবিভাগের সময় ভারতে উৎপন্ন কয়লার মোট পরিমাণ ছিল ২'৫ কোটি টনের মত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫১ সালে ইহা বাড়িয়া ৩'৪৩ কোটি টনে গিয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদন ২'২ কোটি টনের মত বৃদ্ধি করিয়া মোট ৬ কোটি টনে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উৎপাদন হয় ৫'৫৮ কোটি টন।**

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদন

এইভাবে উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব না হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন-লক্ষ্য ৯'৭ কোটি টনে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬২-৬৩ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া হয় প্রায় ৬'৪ কোটি টন।

১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি অনুসারে কয়লাখনি শিল্প উন্নয়নের অন্যান্য দায়িত্ব রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত। এই উদ্দেশ্যে অনেক কয়লাখনি সরকারী উদ্যোগের

---

* India – 1962

** Report on Currency and Finance for 1960-61

ক্ষেত্রে আনা হইয়াছে ও হইতেছে এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে কয়লাখনিসমূহের উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় কয়লা উন্নয়ন করপোরেশন (National Coal Development Corporation) গঠিত হইয়াছে।

উৎপাদন নিয়মিত বৃদ্ধি পাইলেও কয়লাখনি শিল্প কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন। সমস্যা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হইয়াছিল যে ইহা পরিবহণ-ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত। ১৯৫১ সাল হইতে কয়লার উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলেও পরিবহণের অব্যবস্থার প্রতিকার করা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন কয়লা পরিবহণ-ব্যবস্থার যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশনের সুপারিশ করিয়াছিল।

১। পরিবহণের সমস্যা

প্রধানত বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্যই পরিবহণ-ব্যবস্থার র‍্যাসানালাইজেশন প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বিশেষ চাহিদাবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও র‍্যাসানালাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন, উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাস—উভয়ই সংঘটিত করে।

২। র‍্যাসানালাইজেশনের সমস্যা

তৃতীয়ত, পরিকল্পনা-পূর্ব সময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের কার্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার যুক্তিসংগত ব্যবহারের কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে ভূগর্ভে লক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার এক বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে।

৩। যুক্তিসংগত ব্যবহারের সমস্যা

চতুর্থত, ভারতে ভাল কোক কয়লার পরিমাণ অধিক নহে। এইজন্য প্রয়োজন কোক কয়লার পরিবর্তে অন্য প্রকার কয়লার ব্যবহারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির; এবং ইহার জন্য প্রয়োজন অন্য প্রকার কয়লার উৎপাদনবৃদ্ধির। উপরন্তু, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পরিকল্পিত প্রসারের জন্য ভাল কোক ও ধাতু নিষ্কাশক (metallurgical) কয়লার প্রয়োজন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই কারণেও অন্যান্য কার্যে কোক কয়লার ব্যবহার-সংক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

৪। ভাল কোক কয়লার ব্যবহার-সংক্ষেপ সমস্যা

পরিশেষে, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু নিষ্কাশক কয়লার গুণগত অভিন্নতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হইল এই প্রকার কয়লার ধৌতকরণের (washing) ব্যবস্থা করা। আধুনিক পদ্ধতিতে ধৌতকরণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই প্রকার কয়লার অপচয়ের পরিমাণও কমিয়া যাইবে।

৫। ধাতু নিষ্কাশক কয়লা ধৌতকরণের সমস্যা

আজ পর্যন্ত যে-যে প্রতিবিধান অবলম্বিত হইয়াছে বা অবলম্বিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাদের সংক্ষেপ বর্ণনা এইভাবে করা যায়: পরিবহণের ত্রুটি

দূর করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের পিংগল বর্ণের কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে ঐ অঞ্চলকে গণ্ডোয়ানা কয়লাখনিগুলির উপর আর ততটা নির্ভর করিতে হইবে না। অবশ্য পরিবহণ-ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু র‍্যাসানালাইজেশন এখনও পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নাই। অপর-দিকে কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থায় র‍্যাসানালাইজেশনের কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য আমদানি-শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি নিয়োগ ছাড়াও সকল প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পাশাপাশি কয়লাখনিগুলির একত্রিকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খননকালে সাজাইবার পদ্ধতিরও (stowing method) উন্নতিসাধন করা হইতেছে। কয়লার পরিবর্তে বালি ইত্যাদি দ্বারা খনির ভিতরের প্রাচীর নির্মাণ ব্যবস্থা (sand stowing method) অবলম্বনের প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

অবলম্বিত প্রতি-বিধানসমূহ

• ভাল কোক কয়লার ব্যবহার যাহাতে অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সম্পর্কে ১৯৫২ সালে কয়লাখনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন [Coal Mining (Conservation and Safety) Act, 1952] নামে এক আইন পাস করা হয়। এই আইন অনুসারে একজন কমিশনারের (Coal Commissioner) অধীনে একটি বোর্ড (Coal Board) স্থাপিত হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে কয়লাখনি শিল্পের সমস্যাসমূহ লইয়া আলোচনা ও তাহাদের সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইল এই বোর্ডের কার্য। পরিকল্পনা কমিশনের অনুরোধমত ১৯৫৬ সাল হইতে রেলপথসমূহ কোক কয়লার পরিবর্তে ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রকার কয়লা ব্যবহারের প্রচেষ্টা করিতেছে।

উৎকৃষ্ট ধাতু নিষ্কাশক ও কোক কয়লার গুণগত অভিন্নতা বজায় রাখা ও ইহার অপচয় নিবারণের জন্য পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এই প্রকার সকল কয়লারই ধৌত-করণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে হাজারিবাগ জিলার কারগালিতে (Kargali) একটি ধৌতকরণ কারখানা ১৯৫৮ সালে স্থাপিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও তিনটি কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। মোট ধৌত কয়লার পরিমাণ ১৯৬১ সালে বাৎসরিক ১২ লক্ষ টনে পৌছায়। ইহা ছাড়া দুর্গাপুর প্রভৃতির কয়লা চুল্লীও উৎকৃষ্ট কোক কয়লা সরবরাহ করিতেছে।

পরিশেষে, কয়লাখনিসমূহের পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য যে জাতীয় কয়লা উন্নয়ন করপোরেশন (a National Coal Development Corporation) গঠিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশন (Rationalisation of Industries): বস্ত্রশিল্প ও পাটকল শিল্পের আলোচনা প্রসংগে যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখন এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন লইয়া বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। মালিক ও পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ পুনর্গঠনের পক্ষপাতী এবং উহার প্রবর্তনের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছে; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক-নেতাগণ র‍্যাসানালাইজেশনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে।

এই সকল যুক্তির পর্যালোচনা করিবার পূর্বে জানা প্রয়োজন যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশন কাহাকে বলে।

র‍্যাসানালাইজেশন কাহাকে বলে

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিল্পে প্রবর্তন করিয়া শ্রম, মালমসলা ও সময়ের ব্যয়সংক্ষেপ করাই হইল যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য। এইজন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের আধুনিককরণ, উপযুক্ত সংগঠনের সাহায্যে শ্রম ও কাঁচামালের সম্যক ব্যবহার এবং উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ সুযোগগ্রহণ।

যাহারা ভারতীয় বিভিন্ন শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের সুপারিশ করে, তাহাদের যুক্তি হইল এইরূপ: প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। নূতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ভিন্ন এই সকল শিল্পের উন্নতিবিধানের উপায়ান্তর নাই।

সপক্ষে যুক্তি

যেমন, তুলাবস্ত্র শিল্প সম্পর্কে বলা হয় উহার যন্ত্রপাতি প্রায়ই এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ক্রয় হইয়াছে এবং উহা বর্তমানে একপ্রকার অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলাবস্ত্র কমিটি (Cotton Text le Committee) এবং ১৯৫৪ সালের পাটশিল্প অনুসন্ধান কমিশন (Jute Enquiry Commission) যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ও আধুনিক-করণের উপর বিশেষ জোর দেয়। কয়লাখনি শিল্পেও ১৯৫১ সালে কয়লাশিল্প সম্পর্কিত কার্যকরী দল (Working Party on Coal Industry) অধিকতর মাত্রায় যন্ত্রিকরণের সুপারিশ করে। দ্বিতীয়ত বলা হয় যে, সাম্প্রতিককালে শ্রমিক-সংঘগুলির শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শ্রমিক উন্নয়নমূলক আইনকানুন অধিকমাত্রায় প্রবর্তিত হইয়াছে। ফলে শ্রম-ব্যয় অত্যধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিতে হইলে যন্ত্রপাতির প্রবর্তন এবং আধুনিককরণ বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বৈদেশিক প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করিয়াও শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। ইহা না করা হইলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। সম্প্রতি পাটশিল্পের ক্ষেত্রে পাকিস্তান, জাপান, ব্রেজিল, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধুই ইহাই নয়; পাটের পরিবর্ত-দ্রব্যের (substitutes) ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তুলাবস্ত্রের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক বাজারে জাপান ও অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং আধুনিক উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদনের উন্নয়ন না করিতে পারিলে বৈদেশিক বাজারে টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়িবে। রপ্তানি প্রসার কমিটিও রপ্তানি শিল্পগুলির ক্ষেত্রে অতি আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছে।

অপরদিকে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের বিরোধিতা করা হয়। ইহাদের যুক্তি হইল যে, এই পুনর্গঠনের ফলে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে। ইহা ব্যতীত ভারতের মূলধনের অপ্রাচুর্য রহিয়াছে। কিন্তু শ্রম সহজলভ্য। এই অবস্থায় অধিক যন্ত্রিকরণের পথে অগ্রসর না হইয়া অধিক পরিমাণে শ্রম ব্যবহার করা সমীচীন।

বিপক্ষে যুক্তি

শ্রমিকদের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের প্রতি ভীতি সম্পূর্ণ অমূলক নয়। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, পুনর্গঠনের ফলে যে লাভ হয় তাহার সমস্তটাই শিল্প-মালিক নিজে ভোগ করিতে চেষ্টা করে। ইহা ছাড়া যুক্তিসংগত পুনর্গঠনের ফলে বহুসংখ্যক শ্রমিকের বেকার হইয়া পড়িবার আশংকা আছে। অবশ্য দীর্ঘকালের কথা ধরিলে শ্রম-নিয়োগ না কমিয়া বরং বাড়িয়াই যাইবে, কারণ উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইলে দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে এবং শিল্পের প্রসার ঘটিবে।

যাহা হউক, এই তর্কবিতর্কের মধ্যে না যাইয়া বলা যায় যে ভারতীয় কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে, যেমন তুলাবস্ত্র ও পাটকল, যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; কিন্তু পুনর্গঠনকার্যে অতি সতর্কতার সহিত এবং পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে; এবং দেখিতে হইবে যে ইহার ফলে যেন কর্মরত শ্রমিক বেকার না হইয়া পড়ে। ইহার জন্য বিকল্প নিয়োগ-ব্যবস্থা করিয়া অতিরিক্ত শ্রমিকদের কর্মের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্পষ্টই বলা হইয়াছিল যে, পুনর্গঠনের ফলে যেখানে বেকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেখানে উহা শ্রমিকদের সংগে পরামর্শ করিয়া প্রবর্তিত হয়, যেখানে শ্রমিকদের কার্যের অবস্থাদির উন্নতিসাধন করা হয় এবং যেখানে পুনর্গঠনের সুযোগসুবিধা অধিকাংশ শ্রমিকরা ভোগ করিতে পায় সেখানেই যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

অবলম্বনীয় পন্থা

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমদপ্তর যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন সম্পর্কে এক চুক্তিপত্র রচনা করিয়াছে। এই চুক্তিপত্রে র‍্যাসানালাইজেশন শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়া যাইতে পারে এমন কোন যান্ত্রিক পরিবর্তন করিতে হইলে মালিককে শ্রমিক-সংঘকে নোটিস দিতে হইবে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বুঝাপড়া হইলে তবেই পুনর্গঠন করা যাইবে। অতিরিক্ত শ্রমিক যাহাতে চাকরি পায় তাহার জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, বিকল্প নিয়োগ, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই মীমাংসামূলক চুক্তিকেও তৃতীয় পরিকল্পনায় কার্যকর করা কঠিন হইবে, কারণ তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা ১.১০ কোটিরও অধিক হইবে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় র‍্যাসানালাইজেশনের কথা বেশীদূর অগ্রসর হইবে না ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the present position and problems of either the Iron and Steel Industry or the Jute Mil Industry of India.
(C. U. B. Com. 1962) (২৫৪-২৫৭ এবং ২৬৪-২৬৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the case for rationalisation of the cotton textile industry of India and point out briefly the measures already taken in this connection in recent years. (B. U. 1961) (২৬০-২৬২ পৃষ্ঠা)

3. What problems have faced Indian Cotton Mill Industry since the end of World War II ? What measures would you suggest to improve the present position of the industry ? (C. U. B. A. 1961) (২৫৮-২৬২ পৃষ্ঠা)

4. Consider in brief the present position and future prospects of the Jute Industry in India. (C. U. B. A. 1952, '58 ; B. Com. 1950) (২৬৩-২৬৬ পৃষ্ঠা)

5. What are the main problems of the Jute Mill Industry in the present times ? What measures would you suggest to improve the competitive position of the industry in the world market ? (C. U. B. A. 1959, '6) (২৬৪-২৬৬ পৃষ্ঠা)

6. What policy would you advocate in respect of the rationalisation of industries in India ? Give reasons for your answer.
(C. U. B. Com. 1958) (২৭১-২৭৩ পৃষ্ঠা)

7. Examine carefully the current problems of either the Jute Mill Industry or the Coal Mining Industry of India. What measures would you suggest for improving the present position of the industry ?
(C. U. B. A. 1962) (২৬৪-২৬৬ বা ২৭০-২৭১ পৃষ্ঠা)

ঊনবিংশ অধ্যায়

সরকারী শিল্পনীতি

(Industrial Policy of the Government)

বিদেশী শাসনের আমলে শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র যে-ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে সে-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* এখন জাতীয় সরকারের শিল্পনীতি ও শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক যুগে কোন ক্ষেত্রেই দ্রুত শিল্পোন্নয়ন রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও সোবিয়েত ইউনিয়নের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার সংরক্ষণ ও করনীতির মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা

কোন দেশেই দ্রুত শিল্পোন্নয়ন রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতিরেকে ঘটে নাই

* ২৪৬-২৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

করিয়াছে, অগ্রণী হইয়া বিদেশী মূলধন আহ্বান করিয়াছে। জাপানেও রাষ্ট্রকে শিল্পায়নের ধর্মপিতা (god-father) বলিয়াই গণ্য করা হয়। আর সোবিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্র আদিম পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দলপতির (patriarch) মত শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্যকর করা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই করিয়াছে এবং করিতেছে।

কৃষি বনাম শিল্প (Agriculture vs. Industry) : এইভাবে রাষ্ট্রীয় উৎসাহ ও উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে শিল্পায়ন সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত হওয়ায় ভারতীয় অর্থবিদ্যাবিদ মহলে স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে, পর্যাপ্ত শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত এই দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সম্যক সমাধান সম্ভব নহে। ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ শিল্পায়নাভিমুখেই প্রসারিত।

ভারতের শিল্পায়ন সম্বন্ধে সন্দেহ

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেদিন পর্যন্ত বিদেশী শাসকবর্গ ও স্বনামধন্য অর্থবিদ্যাবিদগণ ইহার বিপরীত ধারণাই পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। লর্ড কেইনস (Lord Keynes) প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত প্রতিযোগিতার জন্য ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা যুক্তিযুক্ত কি না ? ডাঃ ভেরা এ্যানস্টী (Dr. Vera Anstey) ভারতে ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ইহার ফলে সর্বসাধারণের শোষণের দ্বারা এক মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মুনাফাবৃদ্ধির কার্যই সাধিত হইবে। ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজারের পর অবাধ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতি একরূপ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হইলে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। ইহা অর্থবিদ্যাবিদগণ উপলব্ধি করিতে থাকেন যে, শিল্পায়নের দ্বারা এই সকল দেশের জনগণের ক্রয়শক্তির (purchasing power) বৃদ্ধিসাধন না করিলে শিল্পোন্নত দেশগুলিরও শিল্পসংগঠন অবনতির পথে পদার্পণ করিতে বাধ্য।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহে শিল্পায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি

যুদ্ধোত্তর যুগে এই দৃষ্টিভংগিই প্রসারিত হইয়া স্বল্পোন্নত দেশসমূহের (Under-developed Countries) উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ করে। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য কৃষির সুসংগঠন এবং শিল্পোন্নয়ন উভয়ই প্রয়োজন। এই সকল দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলিয়া একমাত্র কৃষির সুসংগঠনের দ্বারাই জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নসাধন সম্ভব হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষির উন্নয়ন বিশেষভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন.। দ্বিতীয়ত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকে সুসংগঠিত করা হইলে বহুসংখ্যক কৃষক কর্মহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহাদের নিয়োগের ব্যবস্থাও করা সম্ভব।*

* **Lewis, The Principles of Economic Planning**

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন রিপোর্টে এই কথাই বার বার বলা হইয়াছে। একটি রিপোর্টে আছে যে, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের যেগুলিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃষিজীবী জনসাধারণ রহিয়া গিয়াছে সেগুলিতে শিল্পায়ন দ্বারা এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার নিয়োগের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কৃষিগত উন্নয়নের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নহে। "প্রধানত এই কারণে কতকগুলি, বিশেষ করিয়া এশিয়ার, স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পোন্নয়ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়।"* ডাঃ রোজেনষ্টাইন রডানকে (Dr. Rosenstein Rodan) উদ্ধৃত করিয়াও বলা যায়, "কৃষিতে অতিরিক্ত বলিয়া পরিগণিত জনসংখ্যাকে শিল্পে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনয়ন করা হইল বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনীতির লক্ষ্য।"

ডাঃ রোজেনষ্টাইন রডানের এই উক্তি শিল্পায়নের স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়। শিল্পায়ন বলিতে কৃষিকে উপেক্ষা করা বুঝায় না, কৃষির উন্নয়নও বুঝায়। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও কৃষি পরস্পরের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। উভয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ডাঃ ষ্ট্যালি (Dr. Eugene Staley) বলেন, "কৃষির উন্নয়ন ও শিল্পায়নকে কোন দীর্ঘকালীন কার্যক্রমে পরস্পর হইতে পৃথক বা পরস্পরবিরোধী বলিয়া কল্পনা করা যায় না।...শিল্পায়ন হইল আয়বৃদ্ধির সূচক এবং কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়ক।" শিল্পায়ন ব্যতিরেকে এইরূপ দেশকে চিরকালই কাঁচামাল রপ্তানি ও নির্মিত দ্রব্য আমদানি করিয়া স্বল্পোন্নতই থাকিতে হইবে।

উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্প পরস্পরের পরিপূরক

সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা লইয়া মতদ্বৈধতার অবকাশ বর্তমানে আর নাই। ভারতের প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃষিজীবিগণকে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত করিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ভারতের জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হইয়া এই কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ স্বল্পোন্নত দেশে জনগণের স্বল্প ক্রয়শক্তির জন্য পুঁজিপতিগণ শিল্পপ্রসারে বিশেষ অগ্রসর হয় না।** এই প্রসংগে ইহা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, শাসনাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই জাতীয় সরকার এই নির্দেশ গ্রহণ করিয়া ইহাকে কার্যকর করিবার প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

ভারতের জাতীয় সরকার এই নির্দেশ গ্রহণ করিয়াছে

জাতীয় সরকারের শিল্পনীতি (Industrial Policy of the National Government) : জাতীয় সরকার যে ভারতের শিল্পায়নে

* "Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries." U. N. Report, May, 1951

** Ragnar Nurkse, *Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries.*

সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে ইহা সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের সরকারী শিল্পনীতি ঘোষণায়। এই ঘোষণায় মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার (mixed economy) পূর্ণ ইংগিত দেওয়া হয় ; এবং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে সরকার পর পর কয়েকটি গঠনমূলক কার্য সম্পাদন করে—যথা, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে শিল্পগত করপোরেশন (Industrial Finance Corporation) গঠন, ১৯৪৯ সালে নূতন ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ, ১৯৫১-৫২ সাল হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি। ইহার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে উক্ত ঘোষিত শিল্পনীতির পরিমার্জনা (revision) করা হয়। এখন প্রথমে ১৯৪৮ সালে ঘোষিত মূল শিল্পনীতির পর্যালোচনা করিয়া পরে পরিমার্জিত শিল্পনীতির বিচার-বিশ্লেষণ করা হইবে।

শিল্পায়নে সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণের ঘোষণা

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ইংগিত

মূল শিল্পনীতি (Original Industrial Policy) : জাতীয় সরকারের পক্ষে ১৯৪৮ সালে মূল শিল্পনীতি ঘোষণা করেন তৎকালীন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী স্বর্গত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই ঘোষণাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) শিল্পায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য, (২) শিল্পনীতির উদ্দেশ্য, (৩) শিল্পক্ষেত্রের বিভাগ, (৪) শিল্পক্ষেত্রের রাষ্ট্রভুক্ত অংশের পরিচালনা-ব্যবস্থা, (৫) বেসরকারী ক্ষেত্রভুক্ত শিল্পসমূহের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, (৬) শিল্পসমূহের অবস্থান নির্ধারণ, (৭) শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ, (৮) বৈদেশিক মূলধন, সংরক্ষণ এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প।

ঘোষণার বিভিন্ন অংশ

(১) শিল্পায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য (General Objective of Industrialisation) : শিল্পায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য ঘোষণায় বলা হইয়াছিল, ভারত ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে এক নূতন সমাজ-সংগঠনের পথে পদার্পণ করিয়াছে। ইহার জন্য অন্যান্যের মধ্যে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির উপাদানসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আবার পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

সাম্যের ভিত্তিতে উন্নততর আর্থিক জীবন

(২) শিল্পনীতির উদ্দেশ্য (Objective of Industrial Policy) : জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ও ইহার যথাযথ বণ্টনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থিক উন্নয়নকে ঘোষিত শিল্পনীতির উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল, কেবলমাত্র বণ্টনের দিকে দৃষ্টি দিলে দারিদ্র্যকেই বণ্টন করা হইবে। সুতরাং গতিশীল জাতীয় নীতির লক্ষ্য হইবে—উৎপাদনের বিচ্যুতিবিহীন বৃদ্ধি এবং ন্যায্য বণ্টন। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই শিল্পক্ষেত্রে সরকারের

উত্তরোত্তর উৎপাদন-বৃদ্ধি ও ন্যায্য বণ্টনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ

অনুপ্রবেশের প্রশ্ন বিচার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান অবস্থায় সম্ভব না হইলেও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে রাষ্ট্র শিল্প-ব্যবস্থায় তাহার পরিধি ক্রমশ বিস্তার করিয়া চলিবে।

(৩) শিল্পক্ষেত্রের বিভাগ (Division of the Industrial Field): শিল্পোন্নয়ন ও শিল্প-ব্যবস্থার পরিচালনা হইবে রাষ্ট্র ও বেসরকারী উদ্যোগের যৌথ দায়িত্ব। সরকারের দায়িত্ব শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পর্যায়ের হইবে। ফলে শিল্পসমুদয় বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইবে। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত চারিটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছিল:

(ক) রাষ্ট্রের একচেটিয়া এলাকাধীন শিল্প (Exclusive State Monopolies): এই শ্রেণীভুক্ত শিল্প ছিল মাত্র তিনটি—যথা, অস্ত্রশস্ত্রাদি উৎপাদন, আণবিক শক্তির গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ এবং রেলপথের মালিকানা ও পরিচালনা। ইহার উপর জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্র যে-কোন শিল্পকে শিল্পক্ষেত্রের এই অংশে আনয়ন করিতে সমর্থ ছিল।

(খ) রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রাংশ (State-controlled Sphere): শিল্পক্ষেত্রের এই অংশে ছিল কয়লাখনি, লৌহ ও ইস্পাত, বিমানপোত নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, খনিজ তৈল এবং টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারের কতিপয় যন্ত্র ইত্যাদি। এই পর্যায়ভুক্ত শিল্পসমূহের মধ্যে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ১০ বৎসরের জন্য—অর্থাৎ, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বেসরকারী মালিকানা ও তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিতে দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এই সময়ের মধ্যেই সাধারণের স্বার্থে সরকার ইহাদের যে-কোনটির অধিগ্রহণ করিতে পারে। উপরন্তু, এই ক্ষেত্রাংশভুক্ত নূতন কোন প্রতিষ্ঠান সংগঠনের দায়িত্ব হইবে সম্পূর্ণ-ভাবে রাষ্ট্রের। উপরি-উক্ত ১০ বৎসর পর বেসরকারী মালিকানাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি-নির্ধারণ করা হইবে।

(গ) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতকরণ ক্ষেত্রাংশভুক্ত শিল্পসমূহ (Industries subject to State Regulation and Control): শিল্পক্ষেত্রের এই অংশে ছিল চিনি, তুলা ও পশম বস্ত্র, সিমেণ্ট, কাগজ, লবণ, যন্ত্রাদি উৎপাদনের শিল্পসমূহ, প্রভৃতি। এগুলি বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হইলেও এগুলি সম্বন্ধে সরকার অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতকরণের নীতি অনুসরণ করিবে। প্রয়োজন হইলে ইহাদের উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি, ইহাদের অবস্থান সম্বন্ধে নির্দেশ দিবে, ইত্যাদি।

(ঘ) শিল্পক্ষেত্রের বাকী অংশ (The Rest of Industrial Field): শিল্প-ক্ষেত্রের বাকী অংশ থাকিবে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী উদ্যোগাধীনে। এই অংশেও প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটিতে পারে।

(৪) শিল্পক্ষেত্রের রাষ্ট্রভুক্ত অংশের পরিচালনা-ব্যবস্থা (Management of Industries in the Public Sector) : রাষ্ট্রের মালিকানা-ভুক্ত এবং উদ্যোগাধীন শিল্পসমূহের পরিচালনা সাধারণত সরকারী করপোরেশন (Public Corporation) দ্বারাই সম্পাদিত হইবে।

সরকারী করপোরেশন দ্বারা পরিচালনা

(৫) বেসরকারী ক্ষেত্রভুক্ত শিল্পসমূহের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (Regulation of Industries in the Private Sector) : শিল্পক্ষেত্রের ব্যক্তিগত অংশভুক্ত শিল্পসমূহের যথাযোগ্য উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে।

(৬) শিল্পসমূহের অবস্থান নির্ধারণ (Location of Industries) : সমগ্র দেশের স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত—যেমন, চিনি, লবণ, ভারী রসায়ন প্রভৃতি শিল্পগুলির অবস্থান সম্বন্ধে সরকার নির্দেশ দিবে। অর্থাৎ, প্রয়োজন হইলে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, নূতন প্রতিষ্ঠান সংগঠন প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক স্থানে করিতে হইবে, ইত্যাদি।

(৭) শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ (Labour-Capital Relations) : শিল্পোন্নয়ন এবং শিল্প-ব্যবস্থার সুপরিচালনার জন্য শ্রমিক ও মূলধন-মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্পূর্ণভাবেই অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের সকল কারণ দূর করিতে হইবে, এবং শ্রমিক যাহাতে ধীরে ধীরে শিল্প-পরিচালনায় উত্তরোত্তর অংশগ্রহণ করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মজুরিবৃদ্ধি, বাসস্থানের উন্নতি প্রভৃতি দ্বারা শ্রমিকের আর্থিক কল্যাণের পথও প্রশস্ত করিতে হইবে।

(৮) বৈদেশিক মূলধন, সংরক্ষণ এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প (Foreign Capital, Tariff and Small-scale & Cottage Industries) : বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছিল যে, যে-সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত থাকিবে সাধারণভাবে তাহাদের মালিকানার অধিকাংশ হইবে ভারতীয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যাহাতে ভারতীয়রা শিল্পজ্ঞান শিক্ষার ও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায় তাহাও দেখিতে হইবে।

বৈদেশিক মূলধন

ফিসক্যাল নীতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল, অন্যায্য বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ এবং দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির উপাদানসমূহের যথাযোগ্য ব্যবহারের জন্য নূতনভাবে প্রয়োজনীয় ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করিতে হইবে।

ফিসক্যাল নীতি

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প যে নূতন জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থার এক বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিবে সে-সম্বন্ধেও ঘোষণায় সুস্পষ্ট উক্তি করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে এই সকল শিল্প এবং বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে হইবে; তাহা না হইলে

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে নীতি

শেষোক্ত শিল্পসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের কাম্য প্রসার ঘটিতে পারিবে না। এই সমন্বয়সাধনের পন্থা হিসাবে সমবায়কেই (cooperation) নির্দেশ করা হইয়াছিল।

মূল শিল্পনীতির মূল্যায়ন (Evaluation of the Original Industrial Policy): সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় সরকারের উপরি-উক্ত মূল শিল্পনীতি স্বাধীন ভারতে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) সম্বন্ধে সর্বপ্রথম এক সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*laissez faire*) হইতে বিদায় লইয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশ অথচ নির্ধারিত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে বেসরকারী উদ্যোগের পরিপূরণমূলক অবস্থিতিকেই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলে। সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গেলে বলা যায়, উৎপাদন ও ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সহ-অস্তিত্বই (co-existence of the public and the private enterprise) হইল মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দ্বারা পরিচালিত হয় না। ইহা বিশ্বাস করে যে, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিবার জন্য উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। যেখানে বেসরকারী উদ্যোগে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা কাম্যভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হয় না সেখানে রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হইয়া সংগঠন ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। যেখানে বেসরকারী উদ্যোগ কার্যকর, সেখানে অবশ্য ইহাকে থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে এইরূপ উদ্যোগের ক্ষেত্র হইবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন। জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া সরকার এই নিয়ন্ত্রণকার্য পরিচালনা করিয়া যাইবে।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা একদিকে ধনতন্ত্রবাদ ও অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদ এই দুই-এর মধ্যপথ দিয়া চলে। ইহা ব্যক্তিগত উদ্যোগের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করে না। জাতীয় স্বার্থে যতটা প্রয়োজন বেসরকারী ক্ষেত্রের ততটা সংকোচন এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রের ততটা সম্প্রসারণই ইহার লক্ষ্য। প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র এই সংকোচন ও সম্প্রসারণের কার্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায়, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র (public sector) ক্রমশই প্রসারিত এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র (private sector) ক্রমশই সংকুচিত হইতে থাকে।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদের (evolutionary socialism) পথ। ধনতন্ত্রবাদের ত্রুটিসমূহ দূরিকরণার্থে আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ, বিশেষ করিয়া ইংল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলি (Scandinavian Countries), এই পথে চলিয়াছে। 'মোটামুটিভাবে তাহারা পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণের

জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও ব্যবসায়ের জাতীয়করণ করিয়া ইহাদিগকে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছে এবং নানাবিধ উপায়ে শ্রমিকের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট আছে।

ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা

ভারত ইহা অপেক্ষা আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার বণ্টন, পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিকের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টা ছাড়াও ইহা দেশের সর্বাংগীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ১৯৪৮ সালে মূল শিল্পনীতি ঘোষণায় শিল্পোন্নয়নের সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যেই এই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ইংগিত দেওয়া হয়। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে এই পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রই আছে।

সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের গুরুত্ব :

ভারতের ন্যায় দেশের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রই অধিক গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। প্রথমত, এই উদ্যোগের ক্ষেত্রের উপরই অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সংহতিসাধনের দায়িত্ব বিশেষভাবে ন্যস্ত থাকে। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত মুনাফার প্রবৃত্তি দ্বারা। সুতরাং যে-ক্ষেত্রে আশু মুনাফালাভের সম্ভাবনা নাই, বেসরকারী উদ্যোগ সেখানে অগ্রসর হয় না। অপরদিকে মুনাফার সম্ভাবনা থাকিলে বেসরকারী উদ্যোগ আর কিছু বিচার করে না। ফলে অকাম্য দ্রব্য উৎপাদন, প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি জাতীয় ক্ষতি সাধিত হইতে থাকে।

১। সরকারী উদ্যোগ অর্থ-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা দূর করে

সরকারী উদ্যোগ এই একটি হইতে মুক্ত। উহা সমাজের লাভক্ষতির দিক হইতেই সকল বিষয় বিবেচনা করে, সমাজের দিক হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়েই উদ্যোগী হয় এবং আশু মুনাফার সম্ভাবনা না থাকিলেও পিছাইয়া আসে না। এইভাবেই অর্থ-ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যতা (lopsidedness) দূর হয়। ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় ইহাই করা হইয়াছে।

২। উহা ধনবৈষম্য হ্রাস করে

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রের মুনাফা ভোগ করে পুঁজিপতিগণ। ইহাতে সমাজে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মুনাফা কিন্তু জনকল্যাণে ব্যয়িত হয়। অতএব, সমাজ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের (Social Welfare States) পক্ষে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ব্যাপক করিতে হইবে।* উপরন্তু, কর্মসংস্থান (employment) ইত্যাদির দ্বারা জনকল্যাণবৃদ্ধির জন্যও

* Prof. John K. Galbraith, *No Alternative to Public Sector*

সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থারও লক্ষ্য এই অভিমুখে।

৩। উহা অর্থ-ব্যবস্থার সম্যক সম্প্রসারণ সম্ভব করে

তৃতীয়ত, স্বল্পোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ (growth) বেসরকারী উদ্যোগের দ্বারা মোটেই সম্যকভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। বেসরকারী উদ্যোগের পক্ষে কাম্য পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূলধন ও শিল্পকৌশল (industrial know-how) সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোও সম্ভবপর হয় না। বৈদেশিক মূলধনকে প্রবেশের অবাধ অধিকার দিলে হয়ত কিছুটা শিল্পোন্নয়ন ঘটিতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে মুনাফা বিদেশে যায় বলিয়া জাতীয় আয়বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শিল্প-ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয় এবং পরোক্ষভাবে দেশ পরাধীন হইয়া পড়ে। সুতরাং সম্প্রসারণ-অভিমুখী অর্থ-ব্যবস্থাকে (growth-oriented economy) সরকারী উদ্যোগের উপরই নির্ভর করিতে হয়। সরকারই প্রয়োজনীয় দেশী ও বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ করে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (state trading) চালায়, ইত্যাদি। ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে অনুরূপ ভূমিকাই প্রদান করা হইয়াছে।

৪। উহা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে

পরিশেষে, ভারতের ন্যায় মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল সম্প্রসারণ ও জনকল্যাণবৃদ্ধির পথে সকল প্রতিবন্ধক দূর করা। ভারতেও এই প্রতিবন্ধক দূরিকরণের ভার সরকারের বা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের উপর ন্যস্ত।

ঘোষিত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার সমালোচনা :

১। ঘোষণা কোন শ্রেণীকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ঘোষণা কোন শ্রেণীকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। একদিকে ভারতীয় পুঁজিপতিগণ এই আশা করিয়াছিলেন যে, ভারত স্বাধীন হইবার সংগে সংগেই ভারতীয় পুঁজি ও উদ্যোগের উপরে ব্রিটিশ প্রবর্তিত যে বিভিন্ন প্রতিবন্ধক ও নিয়ন্ত্রণ ছিল তাহা সকলই অপসারিত হইবে এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার ফলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সমগ্র ক্ষেত্রটাই ভারতীয়দের একচেটিয়া অধিকারে আসিবে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থকগণ আশা করিয়াছিলেন, জাতীয় সরকারের অধীনে সকল প্রকার শিল্পোদ্যোগ রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া সমাজতান্ত্রিকতার ভিত্তি স্থাপন করা হইবে। স্বাভাবিকভাবেই ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণা এই দুই বিরুদ্ধ আশাবাদী-শ্রেণীর কোনটিকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয়ত, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ঘোষণা ভারতীয় পুঁজিপতিগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯৫৬ সালে শিল্পনীতির পরিমার্জনা সেই সন্ত্রাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। মূল শিল্পনীতিতে শিল্পক্ষেত্রের যে-অংশকে 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন' (State-controlled Sphere) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, সেই অংশের বেসরকারী মালিকানা-ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বেসরকারী উদ্যোগাধীন থাকিবার কথা ছিল। ইহার পর ইহাদের সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করিয়া সাধারণ নীতি-নির্ধারিত হইবে—এইরূপ ঘোষিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য এই ক্ষেত্রাংশভুক্ত নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান একমাত্র সরকারী উদ্যোগেই সংগঠিত হইতে পারিবে। ১০ বৎসর পরে জাতীয়করণের সম্ভাবনা এবং ১০ বৎসরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সহিত প্রতিযোগিতা 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন' শিল্পক্ষেত্রাংশে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়া আসিতেছিল। পুঁজিপতি-গণ এইরূপ মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মূলধন-সংরক্ষণ (capital maintenance), সুপরিচালনা প্রভৃতিতে লাভ কি—যখন ১০ বৎসর পরে বা উক্ত সময়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে? এই কারণে শিল্পক্ষেত্রের এই অংশে উদ্যোগ যে বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

২। ইহা ভারতীয় পুঁজিপতিগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল

তৃতীয়ত, বেসরকারী উদ্যোগাধীন শিল্পক্ষেত্রের (private sector) সকল অংশে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সকল সময়ই অল্প-বিস্তর বর্তমান থাকিবে। ইহাকেও শিল্পপতিগণ ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহারা বিনিয়োগ ও উদ্যোগের পথে অতি সতর্কতার সহিত পদসঞ্চার করিতেছেন।

৩। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-নীতি সম্বন্ধে সন্দেহ

চতুর্থত বলা হয়, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা পুরাপুরি ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালনা হইতে কঠিনতর। প্রথমোক্ত অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার কার্যে অতি নিপুণতার সহিত অগ্রসর হইতে হয়। এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদনের কাম্য বণ্টনকার্য সহজে সম্পাদিত হয় না। এই প্রসংগে ১৯৪৯ সালের ফিসক্যাল কমিশন বলিয়াছিল "শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশের সীমা একদিকে রাষ্ট্রের পরিচালনা-ক্ষমতা এবং অপরদিকে ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিদের আপেক্ষিক দক্ষতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়াই নির্ধারণ করিতে হইবে।" এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, জাতীয় সরকারের শিল্পনীতি এই প্রকারের সমন্বয়সাধনের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয় নাই। তাই আমাদের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হইতে পারে নাই।

৪। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা কঠিন কার্য

৫। আমাদের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হয় নাই

উপসংহারে বলা যায়, প্রায় দুই শত বৎসরের বিদেশী শাসনের পর মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাকেই ভারতের পক্ষে প্রকৃষ্ট শিল্পনীতি বলিয়া গণ্য করা চলে। পূর্ণ ধনতন্ত্রবাদ বা স্বাতন্ত্র্য নীতির (*laissez faire*) দিন শেষ হইয়াছে। বর্তমান জগতের গতি হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দিকে। সুতরাং স্বাধীন ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা অল্পবিস্তর পরিকল্পিত রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহার পুরাপুরি পরিকল্পিত রূপ দান করা যায় না। পুরাপুরি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার মত শাসনযন্ত্র ও সংগতি—কোনটাই বর্তমানে রাষ্ট্রের নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে, "স্বল্পোন্নত দেশে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রবর্তন উন্নত দেশে প্রবর্তন অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয় হইলেও অনেক বেশী দুরূহ কার্য।"* সুতরাং প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া ইহার প্রবর্তন দুরূহ বলিয়াই ইহার সীমা নির্ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের জাতীয় সরকার তাহাই করিয়াছে। বিবর্তনমূলক ধারায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার (Socialist Pattern of Society) প্রবর্তনই ইহার চরম লক্ষ্য। ভারতীয় পার্লামেণ্ট এই লক্ষ্য প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করিয়াছে।

উপসংহার

বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় সরকার ঠিক পথেই চলিয়াছে

মূল শিল্পনীতিকে কার্যকরকরণ (Implementation of the Original Industrial Policy): ১৯৪৮ সালে ঘোষিত শিল্পনীতিকে কার্যকরকরণের উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে—যথা, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের (Industrial Finance Corporation) প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৯ সালে নূতন ফিসক্যাল কমিশনের নিয়োগ, ১৯৫০-৫১ সাল হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি। ইহার পর ১২টি জাতীয় গবেষণাগার (National Laboratories)** প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পসংক্রান্ত গবেষণাকার্য এবং সরকারী ক্ষেত্রে (public sector) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনকার্য সুরু করা হয়। কিন্তু শিল্পনীতিতে ঘোষিত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয় ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে [Industries (Development and Regulation) Act, 1951]। এই আইন দ্বারা বেসরকারী ক্ষেত্রাংশভুক্ত শিল্পসমূহের যথাযোগ্য উন্নয়ন ও যথাপ্রয়োজন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আইনটি ১৯৫২ সালের মে মাস হইতে চালু করা হইয়াছে।

শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫১

* W. A. Lewis, *The Principles of Economic Planning*—Appendix II

** বর্তমানে (জুলাই, ১৯৬৩) জাতীয় গবেষণাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২১-এর কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে।

প্রথমে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে প্রধানত পূর্বোক্ত খ ও গ শ্রেণীর অন্তর্গত ৩৭টি শিল্পকে তালিকাভুক্ত করিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইহাদের উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। বর্তমানে ১৬২টি শিল্প ইহার আওতায় আসিয়াছে।*

১৬২টি শিল্প এই আইনের অধীন

সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের ব্যবস্থা হইল যে, তালিকার অন্তর্গত শিল্পগুলির প্রত্যেক পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে রেজিস্ট্রীভুক্ত হইতে এবং প্রত্যেক নূতন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ, স্থান পরিবর্তন প্রভৃতির জন্যও লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে। লাইসেন্স প্রদানকালে সরকার প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান, আয়তন প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি পালনীয় সর্ত আরোপ করিতে পারিবে। কতিপয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে-কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে এবং দোষত্রুটির প্রতিবিধানের জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে। নির্দেশ পালন করা না হইলে প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী উদ্যোগাধীনে আনয়ন করিতে পারিবে।

ক। নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই আইনের ব্যবস্থা

উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যবস্থা হইল যে, তালিকাভুক্ত বিভিন্ন শিল্পের জন্য একটি করিয়া উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) এবং সামগ্রিকভাবে এই সকল শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ (a Central Advisory Council of Industries) প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ অবিলম্বেই প্রতিষ্ঠিত হইবে ; কিন্তু বিভিন্ন শিল্পের জন্য উন্নয়ন পরিষদের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনমত করা হইবে। নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করিবার জন্য একটি লাইসেন্সপ্রদানকারী কমিটি (Licencing Committee) গঠন করা হইবে।

খ। উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যবস্থা

শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের বিধান অনুসারে ১৯৫২ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের সদস্যসংখ্যা ২৭ জন। সদস্যগণ হইলেন শিল্প, শ্রম, ভোগ্যপণ্যক্রেতা (consumers) এবং প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের প্রতিনিধি।

আইনকে কার্যকরকরণ

আইনানুসারে একটি লাইসেন্স প্রদানকারী কমিটিও স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা বাণিজ্য ও শিল্প, অর্থ, রেলপথ ও উৎপাদন মন্ত্রিদপ্তরসমূহ এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত।

* India—1968

চিনি, ভারী রসায়ন, পশম বস্ত্রাদি, কৃত্রিম সিল্ক, বাইসাইকেল, ঔষধপত্রাদি (pharmaceutical), কৃত্রিম সার, হালকা ও ভারী বৈদ্যুতিক শিল্প, লৌহবিহীন ধাতু (non-ferrous metals) প্রভৃতি শিল্পের জন্য পৃথক পৃথক উন্নয়ন কাউন্সিলও গঠন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শিল্পের বিশেষ বিশেষ সমস্যা পর্যালোচনার জন্য অনেক প্যানেল এবং বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠন করা হইয়াছে।

শিল্পনীতি কার্যকরকরণের আর একটি মাধ্যম হইল জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (National Industrial Development Corporation)। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা দূরিকরণই ইহার উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, যে-সকল শিল্পের উন্নয়ন সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে সাধারণত সংঘটিত হয় না অথচ যাহাদের উন্নয়ন শিল্প-ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্যতার জন্য প্রয়োজনীয়, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন মূলধন সরবরাহ ও অন্যান্য উপায়ে তাহাদের সংগঠন ও উন্নয়নে সহায়তা করে। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

পরিমার্জিত শিল্পনীতি (Revised Industrial Policy): ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু মূল শিল্পনীতির পরিমার্জনা ঘোষণা করেন। ঘোষণায় ১৯৪৮ সালের মূল শিল্পনীতির প্রকৃতি বর্ণনা করার পর বলা হয়, 'উক্ত শিল্পনীতির ঘোষণার পর হইতে আজ পর্যন্ত ৮ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।' ইতিমধ্যে ভারতে নানা পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে—ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হইয়াছে, পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হইতে চলিয়াছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য হিসাবে পার্লামেণ্ট কর্তৃক সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজের (Socialist Pattern of Society) ধারণা গৃহীত হইয়াছে, ইত্যাদি। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য দ্বিতায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় শিল্পনীতি নূতন করিয়া নির্ধারণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই নূতন নীতি সংবিধানের উদ্দেশ্য, সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা এবং বিগত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে।

শিল্পনীতি পরিমার্জনার কারণ:

সংবিধানের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়বিচারের (justice) প্রতিষ্ঠা এবং সকলকে সুযোগের সমতা প্রদান করা। উপরন্তু, উৎপাদনের উপাদানসমূহ যাহাতে কয়েক জনের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া সাধারণের স্বার্থের হানি না করে রাষ্ট্রকে তাহাও দেখিতে হইবে।* মোটকথা, সংবিধান অনুসারে সমাজতন্ত্রবাদের পথে অগ্রসর হইতে

সংবিধানের নির্দেশ ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসার

* সংবিধানের প্রস্তাবনা ও রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি।

হইবে। সংবিধানের এই নির্দেশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রস্তাবের মাধ্যমে পুনরুল্লিখিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য হিসাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ এবং দ্রুত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এই সুস্পষ্ট নির্দেশই দেয় যে, সমস্ত মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং সাধারণের উপযোগী·সেবামূলক কার্যসমূহ (public utility services) সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেই থাকিবে। অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্প এবং যে-সকল শিল্পে বর্তমান অবস্থার বিনিয়োগ একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্ভব তাহারাও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিবে।

সুতরাং রাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে শিল্পোন্নয়নের জন্য ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণের জন্য রাষ্ট্রের এই কার্যক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ করা এবং ইহা যে-যে শিল্পোন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে যত্নবান হইবে তাহাও নির্বাচন করা প্রয়োজন।

শিল্পসমূহের নূতন শ্রেণীবিভাগ :

বিভিন্ন দিক বিশেষত দ্বিতীয় পরিকল্পনার শিল্পোন্নয়নের কার্যসূচী বিচার করিয়া সরকার শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শিল্প সম্বন্ধে সরকারী ভূমিকা হইল বিভিন্ন পর্যায়ের। এই যে শ্রণীবিভাগ ইহাকে সম্পূর্ণ কঠোরতার সহিত অনুসরণ করা হইবে না। প্রয়োজনমত এক শ্রেণীভুক্ত কোন শিল্প অন্য শ্রেণীতে স্থানান্তরিত হইতে পারে এবং একই শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে সরকার বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। নূতন শ্রেণীবিভাগটি নিম্নরূপ :

১। প্রথম তালিকাভুক্ত শিল্প

(১) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র : প্রথম শ্রেণীতে আছে ১৭টি শিল্প। এগুলির উন্নয়ন হইবে অনন্যভাবে (exclusively) সরকারী দায়িত্বে। এই তালিকার মধ্যে প্রধান প্রধান শিল্প হইল : অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রতিরক্ষার অন্যান্য উপকরণ; আণবিক শক্তি; লৌহ ও ইস্পাত; কয়লা এবং প্রস্তরীভূত কয়লা; খনিজ তৈল; লৌহ-মাক্ষিক, মাংগানিজ-মাক্ষিক, জিপসাম প্রভৃতি খনি হইতে উত্তোলন; বিমানপোত, জাহাজ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি নির্মাণ; রেলপথ ও বিমানপথ; বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন; ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত শিল্প

(২) রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী উদ্যোগের যৌথ ক্ষেত্র : দ্বিতীয় তালিকায় আছে ১২টি শিল্প। এগুলি ক্রমশ সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে চলিয়া আসিবে। সরকারী উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও এগুলি সংগঠন করা যাইবে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল : প্রথম তালিকাভুক্ত হয় নাই এরূপ এবং অন্যান্য কয়েকটি ছাড়া সকল প্রকার খনিজ শিল্প, কতিপয় যন্ত্রপাতি, রসায়ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক দ্রব্য (intermediate products), রাসায়নিক সার, মোটর ও জাহাজ চলাচল, ইত্যাদি।

(৩) বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র: অন্যান্য সকল শিল্প বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রাধীন থাকিবে। সরকার এই শিল্পগুলির উন্নয়নের ব্যাপারে নানারূপ আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান করিবে।

৩। বাকী শিল্প

প্রথম তালিকাভুক্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন অনন্যভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হইলেও অস্ত্রশস্ত্রাদি আণবিক শক্তি এবং রেলপথ ও বিমানপথ ছাড়া অন্যান্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া সরকারী অধিকার ঘোষণা করা হয় নাই। অবশ্য ইহাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সকল নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে একমাত্র সরকার। কিন্তু যে-সকল প্রতিষ্ঠান বেসরকারী ক্ষেত্রে রহিয়া গিয়াছে তাহাদের ঐ অবস্থাতেই থাকিতে দেওয়া হইবে। বেসরকারী ক্ষেত্রের যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ অনুমোদন করা হইয়াছে তাহাদের সম্প্রসারণেও বাধা দেওয়া হইবে না।

তিনটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে সরকার নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গেলেও, ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণকে সরকারী সহযোগিতায় বা এককভাবে শিল্পক্ষেত্রাংশের উন্নয়নে ভূমিকা গ্রহণ করিতে সুযোগ দেওয়া হইবে।

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা

শিল্পক্ষেত্রের অবশিষ্টাংশ বেসরকারী উদ্যোগাধীন থাকিলেও সরকারের পক্ষে এই শ্রেণীভুক্ত কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পথে কোনই বাধা থাকিবে না। পরিমার্জিত শিল্পনীতি অনুসারে বেসরকারী উদ্যোগের (private sector) এই ক্ষেত্রে শিল্পসংগঠন সমবায়িক ভিত্তিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নানাভাবে সহায়তা করিবে।

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সমবায়িক ভিত্তি

কুটির ও গ্রামীণ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর ঘোষণায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, বৃহদায়তন শিল্পগুলির প্রতিযোগিতা হইতে এই শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে প্রভেদাত্মক করনীতি, প্রত্যক্ষ অর্থসাহায্য, বৃহদায়তন উৎপাদনকে সীমাবদ্ধকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রদান করা হইবে। তবে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কুটির ও গ্রামীণ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ

ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে শিল্পোন্নয়নের আঞ্চলিক বণ্টনের যে বৈষম্য দেখা যায় তাহা হ্রাস করিতে হইবে। অর্থাৎ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পোন্নয়নের মাত্রার যে অকাম্য পার্থক্য দেখা যায় তাহা অপসারণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিচালনার জন্য কর্মীদল সংগঠন, শ্রমিক-কল্যাণ প্রসার ইত্যাদি বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়।

শিল্পোন্নয়নের সুষম আঞ্চলিক বণ্টন ইত্যাদি

পরিশেষে বলা হয় যে, বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে সরকারী নীতির কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

বৈদেশিক মূলধন

পরিমার্জিত শিল্পনীতির মূল্যায়ন (Evaluation of the Revised Industrial Policy) : ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ঘোষিত শিল্পনীতি ১৯৪৮ সালের মূলনীতির পরিমার্জিত রূপ মাত্র। বস্তুত, ইহা পরিমার্জিত শিল্পনীতি (Revised Industrial Policy) নামেই অভিহিত। পরিমার্জিত নীতি মৌলিক সূত্র হইতে বিদায় লইতে পারে না। ভারতের শিল্পনীতিও লয় নাই। অনেকে বিপরীত ধারণা পোষণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ছাড়া আর কোন পরিবর্তনসাধন করা হয় নাই। ইহাতে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের বিলোপসাধনের ইংগিতই নাই। ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে জাতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (objects) এবং লক্ষ্যের (targets) সহিত যতটা পরিমাণ সংগতিপূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ততটাই স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে ; এবং যে-যে শিল্পে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগই অবস্থিত থাকিবে সেখানে কোন প্রভেদাত্মক বা অন্যায় ব্যবহার করা হইবে না।

নূতন শিল্পনীতি পুরাতন নীতির পরিমার্জিত রূপ মাত্র

পরিমার্জিত শিল্পনীতি জাতীয়করণ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলে নাই তবে জাতীয়করণ অপেক্ষা উন্নয়নের উপরই যে সরকার সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে চায়, ইহা সামগ্রিকভাবে ঘোষণাতে প্রতিভাত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে জাতীয়করণের ভয়ে ভীত হইবার কিছু নাই।

জাতীয়করণ অপেক্ষা নূতন শিল্পোন্নয়নের উপরই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার মূলনীতি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সহ-অস্তিত্বের (co-existence) উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়াও ঘোষণায় একটি নূতন কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইল একই শিল্পের ক্ষেত্রে উভয় উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা। অন্তত, আমাদের বর্তমান উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় যেখানে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার সংগতিই অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ সেখানে এই সহযোগিতাকে অপরিহার্য বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। পরিমার্জিত শিল্পনীতি এখানে প্রয়োজনীয় কার্যই সম্পাদন করিয়াছে। কিন্তু এই নীতি ঘোষণা করা এক ব্যাপার আর নীতির প্রয়োগ হইল ভিন্ন ব্যাপার। নীতির প্রয়োগে সরকারকে উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অতি সতর্কতার সহিত পথ চলিতে হইবে। না হইলে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত সমগ্র পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনায়ও এই দিকে এবং সমাজতান্ত্রিকতার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই শিল্পনীতিকে কার্যকর করা হইবে, ঘোষণা করা হইয়াছে।*

শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা

* **Third Five Year Plan** ১৩-১৬ এবং ৪৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা

শিল্পের জাতীয়করণ (Nationalisation of Industries) : শিল্পের জাতীয়করণের প্রশ্ন সরকারী শিল্পনীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং সরকারী শিল্পনীতি রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সরকারের ধারণা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত। সরকার যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী হয় তবে ইহা শিল্পক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*laissez faire*) প্রয়োগ করিবে। সুতরাং তখন জাতীয়করণের কোন প্রশ্ন বা সমস্যা নাই। অপরদিকে সরকার যদি সমাজতন্ত্রবাদ বা সমগ্রবাদের (collectivism) পথে চলে তবে ইহা শিল্প-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে সচেষ্ট হইবে ; এবং ফলে তখন জাতীয়করণের সমস্যাও দেখা দিবে।

জাতীয়করণের প্রশ্ন শিল্পনীতির সহিত সম্পর্কিত

ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রাভিমুখী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয়করণ হইল আমাদের অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রশ্ন হইল, জাতীয়করণের পথে কি গতিতে চলা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে জাতীয়করণ সম্বন্ধে কিছুটা তত্ত্বগত আলোচনা করিতে হয়।

জাতীয়করণ বলিতে বুঝায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনার অবসান এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনার প্রতিষ্ঠা। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে— উভয় দিকেই যুক্তি আছে। যুক্তিগুলির কয়েকটি হইল তত্ত্বগত, বাকিগুলি ব্যবহারিক। তত্ত্বগত যুক্তিগুলি আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয়করণকে সমর্থন করে। এই দিক দিয়া বলা হয়, সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণই (greatest good of the greatest number) হইল রাষ্ট্রের আদর্শ। সুতরাং রাষ্ট্র পার্থিব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ কয়েকজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইতে দিতে পারে না। শিল্প-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। না হইলে সর্বাধিক সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

জাতীয়করণের সপক্ষে যুক্তি :

দ্বিতীয়ত, এই কারণেই আর একদিক দিয়া জাতীয়করণের প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত শিল্প-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় একমাত্র মুনাফালাভের প্রবৃত্তি (profit motive) দ্বারা। যেখানে মুনাফা নাই ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণের উদ্যোগের সন্ধানও সেখানে মিলে না। সুতরাং মুনাফার হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদনের পরিমাণেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এই হ্রাসবৃদ্ধি কল্যাণের সূচক নাও হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মদ্য উৎপাদনকে লওয়া যাইতে পারে। মদ্য উৎপাদন করিয়া অধিক মুনাফা হইলে শিল্পপতিগণ অধিক উৎপাদনেই মনোযোগী হইবেন ; সমাজের ক্ষতির কথা একবারও চিন্তা করিবেন না। বস্তুত, ব্যক্তির হস্তে উৎপাদন-ব্যবস্থা সমর্পিত রাখিলে অকল্যাণকর দ্রব্য অকাম্যভাবে উৎপন্ন হয় এবং কাম্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়। সুতরাং বৃহত্তর আর্থিক কল্যাণের (economic welfare) জন্য প্রয়োজন হইল শিল্প-ব্যবস্থার জাতীয়করণের।

তৃতীয়ত, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, বেসরকারী পরিচালনাধীন শিল্প-ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পপতিগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বহু শ্রম, অর্থ ও উৎসাহের অপচয় ঘটে। অনেক সময় আবার প্রতিযোগীকে পরাস্ত করিবার জন্য অবৈধ দুর্নীতিমূলক পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। শিল্প-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে ইহার কোনটিরই অবকাশ থাকে না।

চতুর্থত, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়; কিন্তু বেসরকারী মালিকানাধীন শিল্প একমাত্র মুনাফা-প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া ইহা কোনমতেই সম্ভব নহে। ভারতের খনিজ শিল্পের উদাহরণ দিয়া বলা যায় যে, অতীতে আমাদের খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ উত্তোলন ও রপ্তানি অনেকাংশে খনিজ শিল্প ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন থাকারই ফল।

• পঞ্চমত, উৎপাদন-পদ্ধতির আধুনিককরণের জন্যও অনেক শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রয়োজন হয়। মুনাফার দিক দিয়া উচিত বিবেচিত না হইলেও ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতি কখনই আধুনিককরণের পথে পদসঞ্চার করিবে না; সরকার কিন্তু দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য দিকের কথা চিন্তা করিয়াই এই পথে অগ্রসর হইতে পারে। উপরন্তু, আধুনিককরণ উচিত বিবেচিত হইলেও ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতির সংগতিতে না কুলাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজন হয়।

ষষ্ঠত, জাতীয়করণ শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা (lop-sidedness) দূর করিবার অন্যতম মাধ্যম। এই কারণেই ইহার প্রয়োজন হইতে পারে। যে-প্রয়োজনীয় শিল্প ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাম্যভাবে গড়িয়া না উঠার ফলে শিল্প-ব্যবস্থা সামঞ্জস্যহীন হইয়া রহিয়াছে তাহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া তাহার প্রসার-সাধন করাই কর্তব্য।

সপ্তমত, ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকে। শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে জনমতের চাপে ও আদর্শের অনুপ্রেরণায় সরকারের পক্ষে শ্রমিকের প্রতি অধিকতর ন্যায্য ব্যবহার করিতে হয়। ফলে শিল্প-সীমান্তে সংঘর্ষের পরিমাণ কম হয়। শ্রমিকেরও কল্যাণ সাধিত হয়।

পরিশেষে, অল্পবিস্তর পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা হইল বর্তমান সভ্য জগতের নীতি। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা বলিতেই কিছু-না-কিছু শিল্পের জাতীয়করণ বুঝায়। সুতরাং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়করণের সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। শুধু প্রশ্ন হইল জাতীয়করণের মাত্রা লইয়া। ইহা অবশ্য নির্ভর করে পরিকল্পনার প্রকৃতির উপর। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার জাতীয়-করণের এই মাত্রা সুস্পষ্টভাবে শিল্পনীতিতে ঘোষণা করিতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রে তাহাই করা হইয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা বলিতে কিছু-না-কিছু জাতীয়করণ বুঝায়

জাতীয়করণের বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে তাহার কতকগুলি হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন মাত্র। বলা হয় যে, শিল্প-ব্যবস্থা বেসরকারী মালিকানায় থাকিলে প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও হ্রাস পায়।

জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি :

দ্বিতীয়ত বলা হয় যে, গণতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা হইল দক্ষতাবিহীন, মন্থরগতি ও অপচয়পূর্ণ। সরকারী পরিচালনা বলিতে বুঝায়—সরকারী কর্মচারীদিগের দ্বারা পরিচালনা মাত্র। এই সকল কর্মচারীর রুটিন-প্রীতি ও উদ্যোগের অভাব সর্বজনবিদিত। অপরিবর্তনীয় কার্যক্রমকে অনুসরণ করিতে পারিলেই দক্ষতার পরিচয় দেওয়া হইল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। উপরন্তু, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় তাঁহাদের পদোন্নতি কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে চাকরির দৈর্ঘ্যের উপর। ফলে সরকারী উদ্যোগাধীন থাকিলে শিল্পগত দক্ষতা (industrial efficiency) পদে পদে ব্যাহত হয়।

তৃতীয়ত, সরকারী পরিচালনাধীনে আসিলেই যে শিল্পটিকে জনকল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত করা হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেরও পরিচালনা করা হয় লাভক্ষতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ভারতের রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগের মাসুল এইরূপভাবে ধার্য করা হয় যাহাতে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়।

চতুর্থত, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে মূলধন-সংগঠনের সমস্যাও (problem capital formation) অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। শিল্পের জাতীয়-করণের ব্যাপক নীতি গ্রহণ করিলে মূলধন-সংগঠন ব্যাহত হইতে বাধ্য। এই কারণে অনেকের অভিমত হইল যে, জাতীয়করণের পথে বিবেচনার সহিত চলা উচিত।

পরিশেষে, আমাদের ন্যায় স্বল্প-শিল্পোন্নত দেশে এই প্রশ্নের বিচার সর্বাগ্রে করা উচিত যে, সরকার নূতন শিল্প-সংগঠনে ইহার সংগতি নিয়োগ করিবে, না প্রতিষ্ঠিত শিল্পের জাতীয়করণের দিকে প্রথম দৃষ্টি দিবে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রীয় সংগতি বেসরকারী সংগতি অপেক্ষা অধিক হইলেও ইহা সীমাহীন নহে। বরং ভারতের ন্যায় দেশে এই সীমা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। সুতরাং জাতীয়-করণ ও নূতন শিল্প-সংগঠনের মধ্যে অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়কেই বর্তমানে গ্রহণ করিতে হইবে। অনেকের মতে, এই অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়টি হইল নূতন শিল্প-সংগঠন, জাতীয়করণ নহে।

অনেকের মতে, জাতীয়করণের পরিবর্তে নূতন শিল্প-সংগঠনের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া উচিত

উপসংহার : ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বিবর্তনমূলক। ইহার অধীনে রাষ্ট্র সহসা সকল শিল্পবাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত না করিয়া ধীরে ধীরে জাতীয়করণের কার্যে অগ্রসর হইবে—সরকারের মূল ও পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে এইরূপ ইংগিতই দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি

জাতীয়করণ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলে নাই। কিন্তু শিল্পের জাতীয়করণ অপেক্ষা উন্নয়নের উপরই যে সরকার সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে চায় ইহা সামগ্রিকভাবে শিল্পনীতি ঘোষণাতে প্রতিভাত হইয়াছে। সংগে সংগে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের শিল্পনীতিও বিবর্তনমূলক। ১৯৪৮ সালের ঘোষিত শিল্পনীতি ১৯৫৬ সালে পরিমার্জিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহা আরও পরিবর্তিত হইতে পারে। সুতরাং জাতীয়করণের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে ইংগিত দেওয়া কঠিন। তবে এইটুকু বলা যায়, জাতীয়করণ ভারতের বর্তমান শিল্পনীতির কোন মৌলিক সূত্র নহে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষ্য দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং শিল্প-ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য যে-পরিমাণ জাতীয়করণ প্রয়োজন সেই পরিমাণ জাতীয়করণের নীতিই বর্তমানে অনুসৃত হইবে—তাহার অধিক নহে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কতিপয় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ বেসরকারী বিনিয়োগ গ্রহণ করিবার নীতি গৃহীত হইয়াছে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (National Productivity Council): ১৯৫৬ সালে জাপানে প্রেরিত ডেলিগেশনের (Production Delegation) সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৮ সালে সরকার, শিল্পপতি, শ্রমিক এবং অন্যান্যের প্রতিনিধি লইয়া একটি জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (a National Productivity Council) গঠিত হইয়াছে। পরিষদের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে স্থানীয় সংস্থা (local councils) এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক দপ্তর (regional directorate) প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের মধ্যে উৎপাদন-চেতনার সঞ্চার করা এবং উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য আধুনিকতম কলা-কৌশলের প্রবর্তন করা। পরিষদ ১৯৬৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৪৫টি স্থানীয় সংস্থা এবং কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কানপুর লুধিয়ানা ও বাংগালোরে ছয়টি আঞ্চলিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।*

প্রশ্নোত্তর

1. Comment on original Industrial Policy of the Government of India as announced in 1948. (C. U. B. Com. 1955) (২৭৭-২৮০ এবং ২৮২-২৮৪ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the steps that have been taken for the implementation of the Industrial policy of the Government. (C. U. B. Com. 1955) (২৮৪-২৮৬ পৃষ্ঠা)

3. Briefly discuss the Revised Industrial Policy of the Government of India. (C. U. B. Com. 1957)

[ইংগিত: ১৯৫৬ সালে ঘোষিত শিল্পনীতি ১৯৪৮ সালের মূল শিল্পনীতির পরিমার্জিত রূপ মাত্র। সুতরাং ইহাকে এইভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পরিমার্জনার দ্বারা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সংকোচনসাধন করা হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা, বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সমবায়িক ভিত্তি এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ হইল এই পরিমার্জিত শিল্পনীতির অন্যান্য সূত্র।...২৮৬-২৮৮ পৃষ্ঠা]

* India—1963

4. Elucidate the main features for the Industrial Policy of the Government of India as enunciated from time to time. (C. U. B. Com. 1959)

(২৭৭-২৮০ এবং ২৮৬-২৮৮ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the main features of the present Industrial Policy of the Government of India. (C. U. B. Com. 1961 ; B. Com. (P.I) 1962) (২৮৬-২৮৮ পৃষ্ঠা)

6. What is a Mixed Economy ? Write a short note on the importance of the public sector in the Indian economy. (২৮০-২৮৪ পৃষ্ঠা)

7. Do you advocate nationalisation of Indian Industries ? Give reasons for your answer. (C. U. B. A. 1948, '49, '57) (২৯০-২৯৩ পৃষ্ঠা)

8. Write a note on the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. (C. U. B. Com. 1961) (২৮৪-২৮৬ পৃষ্ঠা)

বিংশ অধ্যায়

ভারত সরকারের ফিসক্যাল নীতি

(Fiscal Policy of the Government of India)

ভারত সরকারের ফিসক্যাল নীতির* ইতিহাসের দুইটি অধ্যায় আছে—ব্রিটিশ আমলের ফিসক্যাল নীতি এবং জাতীয় সরকারের ফিসক্যাল নীতি। ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে তত্ত্বের দিক দিয়া ফিসক্যাল নীতির কিছু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

সুচিন্তিত ও সুপরিচালিত ফিসক্যাল নীতি শিল্পোন্নয়নের অন্যতম প্রধান সহায়ক। এই উক্তি বিশেষ করিয়া কৃষিপ্রধান স্বল্পোন্নত দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শিল্পসমৃদ্ধির উপাদানসম্পন্ন অথচ কৃষিপ্রধান হইয়া আছে এইরূপ দেশে সুচিন্তিতভাবে সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিয়া কার্যকর করিলে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধিসাধন এবং অর্থ-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা (lop-sidedness) দূর করে। এই প্রসংগে অধ্যাপক পিগু (Prof. A. C. Pigou) বলিয়াছেন, "কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের স্বাভাবিক সুবিধাসমূহ রহিয়াছে সেখানে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণের দাবি বিশেষভাবে প্রবল।" বস্তুত, সংরক্ষণ ব্যতিরেকে কৃষিপ্রধান স্বল্পোন্নত দেশ হয়ত কখনই শিল্পোন্নত হইতে পারিবে না—চিরকালই তাহাকে কাঁচামাল রপ্তানি ও যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদি আমদানি করিতে হইবে।

সংরক্ষণের গুরুত্ব

* 'ফিসক্যাল' (fiscal) শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। ইহার দ্বারা শিল্প-সংরক্ষণ (protection) নীতি বুঝাইতে পারে, আবার রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়াদিও বুঝাইতে পারে। এই পরিচ্ছেদে শব্দটি প্রথম অর্থে—অর্থাৎ, শিল্প-সংরক্ষণের অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে।

সংরক্ষণ দুইভাবে দেওয়া যায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে। প্রথম পদ্ধতিতে দেশীয় শিল্পকে সরাসরি অর্থসাহায্য (subsidy or bounty) করা হয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিদেশী পণ্যের উপর সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করা হয়। উভয় পদ্ধতিতেই দেশী ও বিদেশী পণ্যের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য হ্রাস পায় বা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। ফলে দেশের বাজারে দেশীয় পণ্য বিদেশী পণ্যের সহিত সহজেই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে।

সংরক্ষণ পদ্ধতি

এইভাবে উভয় পদ্ধতি দেশী ও বিদেশী পণ্য মূল্যের মধ্যে সমতা আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেও উভয়ের অর্থনৈতিক ফলাফল একই নহে। সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করা হইলে প্রপীড়িত হয় ভোগ্যপণ্যক্রেতারা (consumers), কারণ বর্ধিত শুল্কের ভার তাহাদিগকেই বহন করিতে হয়। অপরদিকে জাতীয় কোষাগার হইতে শিল্পকে সরাসরি অর্থসাহায্য করিলে শ্রেণী হিসাবে ভোগ্য-পণ্যক্রেতাদের কোন বর্ধিত মূল্যভারই বহন করিতে হয় না; ভার বহন করিতে হয় সামগ্রিকভাবে করদাতাদিগকে। তাহাদের প্রদত্ত করেই বিশেষ ভোগ্য-পণ্যক্রেতারা শ্রেণী হিসাবে সুবিধা ভোগ করে। আবার সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করা হইলে সরকারের আয় হয়; কিন্তু সরাসরি অর্থসাহায্য করিলে সরকারকে সাধারণ তহবিল হইতে ব্যয় করিতে হয়।

সংরক্ষণের সপক্ষে সাধারণত যে-সকল যুক্তির অবতারণা করা হয় তাহার মধ্যে শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি, জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি এবং শিল্প-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তিই হইল প্রধান।

সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি :

(ক) শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (Infant Industries Argument): তত্ত্বগত অর্থনীতির দিক দিয়া অবাধ বাণিজ্যের সমর্থন হয়ত করা চলে। বাধা-বিহীনভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য চলিলে সকলের জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ হয় এবং ফলে বিশ্বজনীনভাবে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের এই নীতি সবেমাত্র শিল্পায়নের পথে পদসঞ্চার করিয়াছে এইরূপ দেশের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। এইরূপ দেশে অনেক শিশু শিল্প থাকে যাহাদিগকে শিল্পোন্নত দেশের পুরাতন শিল্পগুলির সহিত সম্মুখ প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়া দিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য। সুতরাং শৈশবাবস্থায় তাহাদিগকে লালন করিতে হইবে, বাল্যাবস্থায় তাহাদের সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করা যাইতে পারে। এই নীতির সংক্ষিপ্তসার হিসাবে লালা হরকিষেণলাল বলিয়াছিলেন, "শিশুর পরিচর্যা কর, বালককে রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং বয়ঃপ্রাপ্তকে মুক্ত করিয়া দাও" (Nurse the baby, protect the child and free the adult)।

এই যুক্তিই প্রবলতম

(খ) জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি (National Self-sufficiency Argument): সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তিগুলির মধ্যে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার

যুক্তি হইল দুর্বলতম। বর্তমান সভ্য জগতে মানুষের অভাব এত বিরাট, বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল যে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। উপরন্তু, যাঁহারাই শিল্পদ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি অনুসরণ করিতে চাহেন তাঁহারাই আবার সাধারণত রপ্তানি প্রসারের সপক্ষে। কিন্তু এই দুইটি বিষয় যে পরস্পরবিরোধী ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে চাহেন না। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় (barter) বলিয়া অভিহিত করা যায়। সুতরাং অধিক রপ্তানি করিলে অধিক আমদানির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সুতরাং স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং অধিক রপ্তানি বাণিজ্য পরস্পরের সহিত মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। তবে কয়েকটি বিষয়ে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রধানত প্রতিরক্ষার (defence) জন্য প্রয়োজনীয় ও জাতীয় জীবনে অপরিহার্য দ্রব্যাদিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যাভিমুখেই চলা উচিত। অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি অপরিহার্য দ্রব্যাদির জন্য অপর দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়া নানা দিক দিয়া বিশেষ বিপজ্জনক।

এই যুক্তিই দুর্বলতম

কয়েকটি বিষয়ে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে

(গ) শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি (Diversification of Industries Argument): শিল্প-ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যতা (lop-sidedness) দূরিকরণের অন্যতম উপায় হইল সংরক্ষণের সাহায্যে কয়েকটি শিল্প গঠন করা। সুতরাং এ-যুক্তি মূল্যবান। কিন্তু এই পন্থা অবলম্বনেও বিশেষ সতর্কতার সহিত চলিতে হইবে। সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থার উপর ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নূতন শিল্প গঠন বা প্রসারের জন্য সংরক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

অন্যান্য যুক্তি

সংরক্ষণের সপক্ষে অন্যান্য যুক্তিও আছে—যথা, ইহা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে, নিয়োগ ও মজুরি বৃদ্ধি করে, ইত্যাদি।

বর্তমানে অবশ্য উপরি-উক্ত যুক্তিতর্কের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। এই প্রসংগে ১৯৪৯ সালের ফিসক্যাল কমিশন বলিয়াছে যে, শিল্প-সংরক্ষণের নীতি আর তত্ত্বগতভাবে যুক্তিতর্কের দ্বারা নির্ধারিত হইবার প্রয়োজন নাই। অবাধ বাণিজ্য না সংরক্ষণ—এই লইয়া যে-বিতর্ক বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে আজ আর তাহার কোন মূল্য নাই। অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ হইতেই বর্তমানে সংরক্ষণের বিষয় বিচার করিতে হইবে; দেখিতে হইবে যে, সামগ্রিক অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণের মোট ফলাফল কি হয়।

উপসংহার

বিচারমূলক সংরক্ষণ (Discriminating Protection): ১৯২১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ফিসক্যাল স্বাতন্ত্র্যের নীতি গৃহীত হইলে ঐ সালেই ভারত সরকার প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ করে। ইহার পূর্বে

অবশ্য ভারতে সংরক্ষণের সপক্ষে জনমত বিশেষ প্রবল হওয়া সত্ত্বেও ভারতের বিদেশী সরকার অবাধ বাণিজ্যের নীতিকেই লক্ষ্য করিয়া বসিয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ ভারতের জন্য যে ফিসক্যাল নীতির সুপারিশ করেন তাহাকে 'বিচারমূলক সংরক্ষণ' (Discriminating Protection) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

'বিচারমূলক' শব্দটির অর্থ

'বিচারমূলক' শব্দটির অর্থ হইল যে, সকল শিল্পকেই সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হইবে না। সংরক্ষণ প্রদান করিবার সময় বিচার করিতে হইবে যে কোন্ কোন্ শিল্প সংরক্ষণের উপযুক্ত। অন্যভাবে বলিতে পারা যায়, যে-সকল শিল্প ফিসক্যাল কমিশন নির্ধারিত কয়েকটি সর্ত পূরণ করিতে পারিবে মাত্র তাহাদিগকেই সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান করা হইবে; অন্যথায় মাত্র কতকগুলি সংগঠনগত দুর্বল ও দক্ষতাবিহীন

সংরক্ষণকে বিচারমূলক করিবার কারণ

শিল্পকে অস্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারণের সুযোগ দেওয়া হইবে। সংরক্ষণ-রহিত অবস্থায় একদিন-না-একদিন অস্বাভাবিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই শিল্পগুলির পতন হইতে বাধ্য। তাই সংরক্ষণ প্রদানের পূর্বে প্রয়োজন হইল গভীরভাবে বিচারবিবেচনার। যে-শিল্পগুলি কয়েকটি সর্ত পূরণ করিতে পারিবে মাত্র তাহাদিগকেই সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে—অন্যান্য শিল্পকে নহে।

প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নির্ধারিত মূল সর্ত ছিল সংখ্যায় তিনটি :

(ক) শিল্পটিকে স্বাভাবিক সুবিধাভোগ করিতে হইবে—যথা, অফুরন্ত কাঁচামালের সরবরাহ; সুলভ শক্তির নৈকট্য—যথা, প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান, ব্যাপক আভ্যন্তরীণ বাজার ইত্যাদি। (খ) শিল্পটি এমন

বিচারমূলক সংরক্ষণের মূল সর্তাবলী

হইবে যে, সংরক্ষণ ব্যতীত ইহার উন্নয়ন মোটেই সম্ভব নয়, অথবা জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে যত দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন তত দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। (গ) শিল্পটি এমন হইবে যে, শেষ পর্যন্ত ইহা বিনা সংরক্ষণেই বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে।

ফিসক্যাল কমিশনের রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল যে, পরিকল্পিত সংরক্ষণ সর্বক্ষেত্রেই ক্ষণস্থায়ী হইবে এবং মাত্র সেই সকল শিল্পকে ইহা প্রদান করা হইবে যেগুলি শেষ পর্যন্ত বিশ্বের বাজারে নিজের পায়ে

অন্যান্য সর্ত

দাঁড়াইতে পারিবে। অবশ্য যে-সকল শিল্পের ক্ষেত্রে সমগ্র আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার সম্ভাবনা আছে সেগুলির পক্ষে সংরক্ষণের দাবি বিশেষ প্রবল।*

সমগ্র আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো ছাড়াও আরও দু'একটি কারণে কোন শিল্প সংরক্ষণের জন্য বিশেষ দাবি করিতে পারে। যথা, ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি (Law of Increasing Returns) যে-সকল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য,

* (First) Fiscal Commission Report ৪৫ পৃষ্ঠা

যে-সকল শিল্প জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য অপরিহার্য, যে-সকল শিল্প অপর শিল্প সংগঠনের সহায়ক বা মূল শিল্প এবং যে-সকল শিল্পকে বিদেশী বাউন্টি-প্রাপ্ত (bounty-fed) শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে।

সংরক্ষণের হার, মেয়াদ ও পদ্ধতি

সংরক্ষণ শুল্কের হার এইরূপভাবে নির্ধারিত হইবে যেন দেশীয় শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় ও বিদেশী শিল্পের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সমতা আসে। যতদিন পর্যন্ত দেশীয় শিল্পের পক্ষে বিদেশী শিল্পের সমকক্ষ হইবার জন্য প্রয়োজন ততদিনই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে—কোন ক্ষেত্রেই চিরকালের জন্য নহে। মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে—যথা, যে-সকল শিল্পের পণ্য অপর শিল্পে ব্যবহৃত হয় এবং যে-ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের উপর সংরক্ষণ শিল্পের ভার অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হয়—সরাসরি অর্থসাহায্য দ্বারা সংরক্ষণের সুপারিশ করা হইয়াছিল।

শুল্ক বোর্ড

উপরি-উক্ত নীতিসমূহ অনুসারে কোন শিল্প সংরক্ষণের আওতায় আসিতে পারে কি না সে-বিচার করিবে একদল বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত একটি শুল্ক বোর্ড (Tariff Board)। শুল্ক বোর্ড সংরক্ষণের সময় এবং সংরক্ষণ শুল্কের হারও নির্ধারণ করিবে।

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রকৃতি (Nature of the Policy of Discriminating Protection): প্রথম ফিসক্যাল কমিশন অনুমোদিত বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির সমালোচনা নানাভাবে করা হইয়াছে। প্রথমত, ফিসক্যাল কমিশনেরই সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যগণ তাঁহাদের রিপোর্টে বলেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের প্রধান সুপারিশকে এইভাবে সর্তাধীন করা হইয়াছে যে ইহার উপযোগিতাই ব্যাহত হইতে বাধ্য।" বস্তুত, সর্তগুলি এত কঠিন ছিল যে, অধিকাংশ শিল্পের পক্ষে সংরক্ষণের প্রার্থনা জানানোও সম্ভব ছিল না।

সমালোচনা:
১। ইহাকে কঠিন সর্তাধীন করা হইয়াছিল

দ্বিতীয়ত, বিচারমূলক সংরক্ষণের মূল সর্ত তিনটির বিশ্লেষণ করিলে এই অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কমিশন সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্প-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিতে পারে নাই। সংরক্ষণকে কঠিন সর্তাধীন করিলে কয়েকটি শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু ইহাতে শিল্প-ব্যবস্থা সুসংগঠিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত হয় না।

২। ইহা সামগ্রিকভাবে শিল্প-ব্যবস্থার সহায়ক হয় নাই

তৃতীয়ত, ফিসক্যাল কমিশন একটি স্থায়ী শুল্ক বোর্ড (a Permanent Tariff Board) প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করিয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার পরিবর্তে প্রয়োজনমত সাময়িক শুল্ক বোর্ড (*ad hoc* Tariff Board) গঠন করা হইত। ফলে শুল্ক বোর্ডের কার্যে ছিল নিরবচ্ছিন্নতার বিশেষ অভাব।

৩। অস্থায়ী শুল্ক বোর্ড বিশেষ উপযোগী হয় নাই

চতুর্থত, সংরক্ষণের পরিপূরক ব্যবস্থায়—যথা, রেলপথে অনুকূল মাসুল, শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা, শিল্পজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, সরকার হইতে সরাসরি অর্থসাহায্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ কোন সুপারিশ ফিসক্যাল কমিশনের রিপোর্টে করা হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির পক্ষে যে কতদূর কার্যকর হওয়া সম্ভব ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মোট-কথা, ব্রিটিশ স্বার্থের সহিত যথাসম্ভব সংগতি বজায় রাখিয়াই প্রথম ফিসক্যাল কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিয়াছিল। ইহা কমিশনের সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যদের রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হইয়াছিল। ইহাতে বলা হইয়াছিল, "আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতের শিল্পে অনগ্রসরতা কোনমতেই ভারতীয় জনগণের অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য নহে; ইহা বিরামহীন দমন নীতির দ্বারা, প্রতিকূল শুল্কনীতির দ্বারা জনগণের স্বভাবজাত শিল্প-প্রতিভাকে নিষ্পেষিত করিয়া সংঘটিত করা হইয়াছে।"*

৪। সংরক্ষণের পরিপূরক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয় নাই

ঐ সংরক্ষণ নীতি ছিল ব্রিটিশ স্বার্থের সহায়ক

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির ফলাফল (Effects of the Policy of Discriminating Protection): বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির অধীনে যে-সকল শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তুলাবস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজের মণ্ড শিল্প, (paper pulp industry) এবং দিয়াশলাই শিল্পই প্রধান। ইহার মধ্যে ভারতের দুইটি প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প—যথা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং তুলাবস্ত্র শিল্প সংরক্ষণের জন্যই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়, চিনি শিল্প সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণের আওতাতেই গড়িয়া উঠে এবং কাগজ ও দিয়াশলাই শিল্পের শৈশবাবস্থায় সংরক্ষণের সাহায্য বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়।

সুফল: ১। সংরক্ষণের ফলে কয়েকটি শিল্প গঠিত হয়

বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগের ফল এইভাবে দেখা যায়: ১৯২৩ সাল হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯ সাল) সুরু পর্যন্ত ইস্পাতের উৎপাদনবৃদ্ধি পাইয়াছিল প্রায় ৮ গুণ, তুলাবস্ত্রের উৎপাদন প্রায় ২·৫ গুণ, কাগজের উৎপাদন ২ গুণের কাছাকাছি, দিয়াশলাই-এর উৎপাদন প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ; এবং চিনিতে ভারত একরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছিল।

২। কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ উৎপাদন-বৃদ্ধিও ঘটে

অপরদিকে কিন্তু কতিপয় উল্লেখযোগ্য শিল্পকে বিভিন্ন অজুহাতে সংরক্ষণের সহায়তা প্রদান করা হয় নাই। ভারী রসায়নের (heavy chemicals) মত গুরুত্বপূর্ণ মূল শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করা হইয়াছিল এই

* (First) Fiscal Commission Report ১৮০ পৃষ্ঠা

অজুহাতে যে আভ্যন্তরীণ গন্ধকের যোগান পর্যাপ্ত নহে। অনুরূপভাবে অপরিষ্কৃত সোডার (soda ash) অভাব কাঁচ শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ না-মঞ্জুর করার পক্ষে বিশেষ কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। অধ্যাপক আদারকারের (Prof. B. P. Adarkar) মতে, এই সকলের ফলে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রতিকূল প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

কুফল: ১। বিভিন্ন অজুহাতে অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রদান করা হয় নাই

প্রয়োগের দিক দিয়া বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতিকে সংরক্ষণ করিতে 'বিচারহীন অস্বীকারের নীতি' (policy of indiscriminate refusal to protect) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই অভিযোগকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা না গেলেও বলিতে হয় যে, বিচারমূলক সংরক্ষণের ফলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শিল্প সুসংগঠিত হইতে পারিয়াছে, এবং ইহার ফলে ভারতে শিল্পায়নের পথ কিছুটা প্রস্তুত হইয়াছে।

কিন্তু অপরদিকে আবার দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের অভিমত সমর্থন করিয়া বলা যায় যে, বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগের ফলে মাত্র কয়েকটি শিল্প সুসংগঠিত হওয়ায় ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি হইয়াছে অধিকতর অসামঞ্জস্যপূর্ণ (lop-sided)।

২। এই সংরক্ষণ নীতি শিল্প-পদ্ধতির অসামঞ্জস্য-তার অন্যতম কারণ

যুদ্ধকালীন ফিসক্যাল নীতি (Fiscal Policy during the War) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৈদেশিক প্রতিযোগিতা অন্তর্হিত হওয়ায় একপ্রকার স্বাভাবিক সংরক্ষণের (natural protection) অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। শিল্পপতিগণ এই সুযোগে নূতন নূতন শিল্প সংগঠনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ভয় সর্বদাই ছিল যে, যুদ্ধোত্তর যুগে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এই সকল নব-সংগঠিত শিল্পের ধ্বংসসাধন করিবে। এই আশংকা দূর করিবার জন্য ১৯৪০ সালে সরকার ঘোষণা করে যে, যুদ্ধোত্তর যুগে নব-সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-দাবি বিচার করা হইবে বিচারমূলক সংরক্ষণের সর্তের দিক দিয়া নহে, সুসংগঠনের দিক দিয়া। এইভাবে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধের পর এই নীতি অনুসারে একটি শুল্ক বোর্ড স্থাপন করিয়া নব-গঠিত শিল্পসমূহের সংরক্ষণের দাবি বিচারের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু শুল্ক বোর্ডের কার্য শেষ হইতে না হইতে প্রতিষ্ঠিত হইল জাতীয় সরকার এবং ঘোষিত হইল নূতন (বা বর্তমান) ফিসক্যাল নীতি।

যুদ্ধকালীন স্বাভাবিক সংরক্ষণের অবস্থা

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন

নূতন ফিসক্যাল নীতি (The New Fiscal Policy) : নূতন (বা বর্তমান) ফিসক্যাল নীতি বলিতে বুঝায় ১৯৪৯ সালের ফিসক্যাল কমিশন বা দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতি।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণা অনুসারে এই নূতন বা দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয় ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন শ্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী। সুতরাং ইহা কৃষ্ণমাচারী কমিশন নামেও পরিচিত।

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন

কৃষ্ণমাচারী কমিশনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ভারার্পণ করা হয়: (ক) বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগের ফলাফল বিশ্লেষণ করা, (খ) স্বাধীন ভারতের জন্য এক দীর্ঘকালীন ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণ কর', এবং (গ) এই নীতিকে কার্যকর করার অবলম্বনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করা।

১৯৫০ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয় যে, সংরক্ষণ শিল্পোন্নয়নের অন্যতম পন্থা মাত্র। ইহা দেশের সর্বাংগীণ উন্নয়ন পরিকল্পনার (development planning) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইবে। যতদিন-পর্যন্ত-না এই পরিকল্পনা গৃহীত ও কার্যকর হয় ততদিন পর্যন্ত সকল প্রতিরক্ষামূলক ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী শিল্পকে (all defence and strategic industries) সংরক্ষিত করিতে হইবে—তা এই সংরক্ষণের ব্যয়ভার যাহাই হউক না কেন। মূল শিল্পের (basic industries) ক্ষেত্রে শুল্ক কমিশন (Tariff Commission) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সর্তাধীনে সংরক্ষণের বিষয় বিচারবিবেচনা করিয়া সংরক্ষণের সুপারিশ করিবে। এই সকল শিল্পের সংরক্ষণের জন্য চিরকালের মত কোন অপরিবর্তনীয় সর্তাবলী নির্ধারণ করা যায় না। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সুযোগসুবিধা এবং উৎপাদন-ব্যয়ের বিচার করিয়া যদি প্রতীয়মান হয় যে, শিল্পটি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ ব্যতিরেকেই চালাইয়া যাইতে পারিবে, অথবা ইহা এমন একটি শিল্প যাহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়াই প্রয়োজন এবং দেশের উপর সংরক্ষণের ব্যয়ভার অতিরিক্ত নহে—তবে ইহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

কমিশনের সুপারিশের সংক্ষিপ্তসার

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহের বিশ্লেষণ এইভাবে করা যায়: (১) স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ নীতি (safe-guarding or defensive type of protection) হইতে বিদায় লইয়া উন্নয়নমূলক (developmental type of protection) সংরক্ষণের প্রবর্তনই হইল কৃষ্ণমাচারী কমিশনের প্রধান সুপারিশ। দেশের সর্বাংগীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণার সহিত কোনরূপ সংগতিসাধন না করিয়াই প্রথম ফিসক্যাল কমিশন বিচার-মূলক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত বা প্রপীড়িত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করা।

সুপারিশসমূহের বিশ্লেষণ

উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ

সংহতভাবে ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের পথ প্রস্তুত করার লক্ষ্য ইহার ছিল না। ফলে দেশে কয়েকটি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু শিল্প-পদ্ধতি হইয়াছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই এই পুরাতন নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই পরিবর্তন বা সংশোধনই হইল বর্তমান সংরক্ষণ নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমান নীতি দেশের সর্বাংগীণ আর্থিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। এই উদ্দেশ্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী শিল্প অপেক্ষা মূল শিল্পের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইবে ; প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে পুরাতন অপেক্ষা নূতন শিল্পকেই সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

প্রতিরক্ষামূলক শিল্প-সমূহের সংরক্ষণ

(২) জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া প্রতিরক্ষামূলক ও সমরোপকরণ সরবরাহকারী শিল্পসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণমাচারী কমিশন সুপারিশ করে যে, ব্যয়ভার যাহাই হউক না কেন, সংরক্ষণের মাধ্যমে ইহাদের সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে।

মূল শিল্পসমূহের সংরক্ষণ

(৩) সামগ্রিক শিল্পোন্নয়নই যখন চূড়ান্ত লক্ষ্য তখন মূল শিল্পসমূহের সংগঠন অপরিহার্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এই কারণে ইহাদের সংরক্ষণের জন্য কোন অপরিবর্তনীয় সর্তাবলী নির্ধারণ করা যায় না। অবস্থা অনুসারে ইহাদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সর্তাবলী, সংরক্ষণের সময় ও সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ধারিত করিতে হইবে। এই নির্ধারণের ভার ন্যস্ত থাকিবে একটি স্থায়ী শুল্ক কমিশনের (a Permanent Tariff Commission) উপর, পূর্বের ন্যায় অস্থায়ী শুল্ক বোর্ডের (*ad hoc* Tariff Board) উপর নহে।

অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি

(৪) অপরাপর শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ, স্বাভাবিক সুবিধা, উৎপাদন-ব্যয়, সংরক্ষণের ব্যয়ভার, সংরক্ষণের সময় প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া সংরক্ষণ প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। তবে সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় স্বার্থই হইল মূল লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই সকল বিষয় বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

জাতীয় স্বার্থ মূল লক্ষ্য বলিয়া বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণে নমনীয়তা অবলম্বন করিতে হইবে—যথা,

(ক) বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির মত স্বাভাবিক সুবিধা বলিতে সকল প্রকার স্বাভাবিক সুবিধা বুঝাইবে না। যদি কোন শিল্পের আভ্যন্তরীণ বাজার, শ্রমিক সরবরাহ প্রভৃতির সুবিধা থাকে, তবে আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায় না—মাত্র এই অজুহাতে ইহার সংরক্ষণের দাবি অস্বীকার করা যাইবে না।

(খ) আভ্যন্তরীণ চাহিদা বলিতেও দেশের সমগ্র চাহিদা বুঝা যাইবে না। যদি কোন শিল্প দেশের সমগ্র চাহিদার এক বিশেষ অংশও মিটাইতে সমর্থ হয় তবে শিল্পটিকে সংরক্ষণ প্রদান করা যাইতে পারে।

(গ) আবার সকল সময় আভ্যন্তরীণ চাহিদার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না; ভবিষ্যতের রপ্তানি বাজারেরও দিকে নজর রাখিতে হইবে। -যদি কোন শিল্পের পক্ষে পণ্য যুক্তিসংগত পরিমাণে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করার সম্ভাবনা থাকে তবে শিল্পটির অনুকূলে সংরক্ষণ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(৫) যে-সকল শিল্প সংরক্ষিত শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণমূলক সংরক্ষণ (compensatory protection) প্রদান করা যাইতে পারে।

ক্ষতিপূরক সংরক্ষণ

• (৬) জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে কৃষিজ দ্রব্যকেও সংরক্ষণ প্রদান করিতে হইবে। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সময় কোনমতেই পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না; এবং সরকার কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা এই পাঁচ বৎসর সময়কে সংক্ষেপিত করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

(৭) সাধারণভাবে সংরক্ষিত শিল্পসমূহের উপর অন্তঃশুল্ক (excise duties) ধার্য করা যাইবে না।

(৮) সংরক্ষণ শুল্ক হইতে কিছুটা আহরণ করিয়া একটি উন্নয়ন তহবিল (Development Fund) সৃষ্টি করিতে হইবে; এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই তহবিল হইতে সরাসরি অর্থসাহায্য (subsidies) প্রদান করিয়া প্রত্যক্ষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৯) সংরক্ষণ-ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে অধিক পরিমাণে মূলধন সরবরাহ, শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবহণের অধিকতর সুবিধা প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(১০) সংরক্ষণ প্রদান যেমন সরকারের কর্তব্য, তেমনি অপরদিকে সংরক্ষিত শিল্পসমূহেরও দায়িত্ব রহিয়াছে সম্ভবমত দক্ষতা বজায় রাখিবার এবং সমাজবিরোধী কার্য হইতে বিরত থাকিবার। প্রত্যেক সংরক্ষিত শিল্পকে যুক্তিসংগত মূল্যনীতি (price policy) ও উৎপাদন-পদ্ধতি (production system) অনুসরণ করিতে হইবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মান উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

সংরক্ষিত শিল্পসমূহের দায়িত্ব

(১১) ফিসক্যাল নীতি পরিচালিত হইবে আইন দ্বারা সংগঠিত একটি স্থায়ী শুল্ক কমিশনের (Tariff Commission) মাধ্যমে। পূর্বের মত স্বল্পস্থায়ী শুল্ক বোর্ড (*ad hoc* Tariff Board) হইলে চলিবে না। এই স্থায়ী শুল্ক কমিশনের কার্যপরিধি হইবে পূর্বতন শুল্ক বোর্ড হইতে ব্যাপকতর। পূর্বের মত সংরক্ষণ-প্রার্থনার বিচার-

স্থায়ী শুল্ক কমিশন ও ইহার কার্যাবলী

বিবেচনা এবং অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করা ছাড়াও ইহা প্রয়োজন হইলে স্বীয় উদ্যোগে যে-কোন সংরক্ষিত শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ফলাফল অনুসন্ধান করিতে পারিবে। কমিশন এই অনুসন্ধানের রিপোর্ট নিয়মিতভাবে সরকারের নিকট পেশ করিবে। রিপোর্টে ফলাফলের ব্যাখ্যা ছাড়াও কমিশনের সুপারিশসমূহ সন্নিবিষ্ট থাকিবে। উপরন্তু, কমিশন সংরক্ষণ সম্বন্ধে নিয়মিত-ভাবে গবেষণা চালাইয়া যাইবে। কমিশনকে সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রত্যেক আবেদনের বিচার যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পাদন করিতে হইবে; এবং সরকারের পক্ষেও কমিশনের সুপারিশসমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বিলম্ব করিলে চলিবে না।

নূতন ফিসক্যাল নীতির প্রয়োগ (Application of the New Fiscal Policy): ফিসক্যাল নীতি সম্বন্ধে কৃষ্ণমাচারী কমিশনের সুপারিশ সরকার গ্রহণ করে এবং ১৯৫২ সালে শুল্ক কমিশন গঠন করিবার জন্য শুল্ক কমিশন আইন (Tariff Commission Act, 1952) পাস করে। শুল্ক কমিশনের সদস্যসংখ্যা সভাপতি-সহ অনধিক পাঁচজন। সদস্যগণের সকলেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত। শুল্ক কমিশন ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কার্য সুরু করিয়াছে।

শুল্ক কমিশনের গঠন

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শুল্ক কমিশনের কার্যাবলী পূর্বতন বোর্ডের কার্যাবলী হইতে ব্যাপকতর। কমিশন সরকারের নির্দেশে সংরক্ষণের সকল প্রকার আবেদন লইয়া বিচারবিবেচনা করা ছাড়াও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিতে পারে। এমনকি যে-সকল শিল্প এখনও উৎপাদনকার্য সুরু করে নাই তাহাদের সম্বন্ধেও সুপারিশ করিতে পারে। পূর্বতন শুল্ক বোর্ড অনধিক তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করিতে পারিত; বর্তমানে শুল্ক কমিশনের ক্ষেত্রে এইরূপ কোন বাধানিষেধ নাই। ইহা যে-কোন মেয়াদী সময়ের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করিতে পারে। ইহা একই শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিভিন্ন ফলাফল—যথা, উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপন্ন দ্রব্যের মান ও মূল্য লইয়া অনুসন্ধান করিতে পারে।

সংগঠনের পর শুল্ক কমিশনের হস্তে পূর্বতন শুল্ক বোর্ডের বিচারাধীন ছিল এইরূপ অনেক আবেদন আসে। কমিশন ১৯৫২-৫৩ সালে মোট ২১টি অনুসন্ধানকার্য সম্পাদন করে। ইহার মধ্যে সংরক্ষণের নূতন আবেদন, সংরক্ষণ প্রবর্তিত রাখার আবেদন, মূল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রভৃতি সকলই ছিল। ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে ১৯৬১-৬২ সালপর্যন্ত ইহা মোট ১০৩টি সংরক্ষণ সংক্রান্ত আবেদনের বিচার করে।*

* Report on Currency & Finance for 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62

এই সময়ের মধ্যে যে-সকল নূতন শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা লাভ করে তাহাদের মধ্যে মোটরগাড়ী শিল্প (automobile industry), প্ল্যাসটিক শিল্প, কসটিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, বল-বিয়ারিং (ball-bearing), এঞ্জিনিয়ারের ইস্পাত ফাইল (engineers' steel files), পিত্তল নির্মিত বৈদ্যুতিক বাতিধার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে-সকল নূতন শিল্প সংরক্ষণ হইয়াছে

প্রশ্নোত্তর

1. Write a note on Discriminating Protection. (C. U. B. Com. 1962)
(২৯৬-২৯৯ পৃষ্ঠা)

2. "The Indian Fiscal Commission 1949-50 approached their task from a new angle and laid down now principles of protection." Elucidate the statement. (C. U. B. A. 1953)

[ইংগিত: ১৯২২-২৩ সালের ফিসক্যাল কমিশন যে-সংরক্ষণের সুপারিশ করিয়াছিল তাহাকে প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ (safeguarding or defensive type of protection) বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত বা প্রপীড়িত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করা। সুসংহতভাবে এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের পথ প্রস্তুত করার লক্ষ্য ইহার ছিল না। এই প্রকার সংরক্ষণ নীতি হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লইয়া দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করাই ছিল দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের (১৯৪৯-৫০) উদ্দেশ্য। ইহা যে-সংরক্ষণ নীতির সুপারিশ করিয়াছে তাহাকে উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ (developmental type of protection) বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই উন্নয়নমূলক সংরক্ষণের সর্তাবলী হইল পুরাতন বিচারমূলক সংরক্ষণের সর্তাবলী হইতে একেবারেই পৃথক্। ৩০১-৩০৪ পৃষ্ঠা]

3. Explain the main features of the Fiscal Policy followed in India since 1949-50. How far has there been a departure from the policy of discriminating protection as adopted in 1923 ? (C. U. B. Com. (P.I) 1963) (৩০১-৩০৪ পৃষ্ঠা)

4. Explain the principal changes in the fiscal policy of India as the result of the recommendations of the Fiscal Commission of 1949-50. (B. U. 1961)
(পূর্ববর্তী ২নং প্রশ্নের উত্তর এবং ৩০১-৩০৪ পৃষ্ঠা)

5. Write a short note on the Fiscal Policy adopted by the Government after 1949-50. (C. U. B. A. 1959, '61 ; B. Com. 1960, '61) (৩০১-৩০৪ পৃষ্ঠা)

একবিংশ অধ্যায়

বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্যা

(Problem of Industrial Finance in the Private Sector)

পুরাপুরি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে শিল্পগত সরবরাহের কোন সমস্যা নাই বলিলেই চলে। কারণ, এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিকল্পনা সম্ভাব্য পরিমাণ অর্থসংগ্রহের ভিত্তিতেই করা হয়। কিন্তু আমাদের মত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে (private sector) মূলধন সরবরাহের সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার সম্যক সমাধান ব্যতিরেকে দেশের শিল্পোন্নয়ন কখনই পর্যাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং এই সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতীয় শিল্পসমূহের অর্থসংগ্রহের চিরাচরিত সূত্রসমূহ (Traditional Sources of Industrial Finance in India): বর্তমানে বেসরকারী ক্ষেত্রভুক্ত ভারতীয় শিল্পসমূহ যে যে সূত্র হইতে মূলধন সংগ্রহ করে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—চিরাচরিত (traditional) এবং নবসৃষ্ট (newly created)। এই চিরাচরিত সূত্রসমূহ পর্যাপ্ত না হওয়ার দরুনই সরকারী উদ্যোগ ও উৎসাহে নূতন সূত্রসমূহের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং প্রথমেই চিরাচরিত সূত্রসমূহের প্রকৃতির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সূত্রসমূহের শ্রেণীবিভাগ—চিরাচরিত ও নবসৃষ্ট

তত্ত্বগতভাবে শিল্পসমূহের দুইপ্রকার মূলধনের প্রয়োজন হয়—যথা, প্রাথমিক বা দীর্ঘকালীন মূলধন (initial or long-term capital) এবং চলতি মূলধন (working capital)।

দীর্ঘকালীন মূলধনের চিরাচরিত সূত্র:

প্রাথমিক বা দীর্ঘকালীন মূলধন সংগ্রহের চিরাচরিত সূত্র প্রধানত তিনটি : অংশ বা শেয়ার বিক্রয়, ডিবেঞ্চার বিক্রয়, এবং সরকার হইতে ঋণ।

১। শেয়ার বা অংশ বিক্রয়

দীর্ঘকালীন মূলধনের অধিকাংশ সংগৃহীত হয় শেয়ার বা অংশ বিক্রয় দ্বারা। পূর্বে সাধারণ শেয়ার ছাড়া অগ্রগণ্য শেয়ারও (preference shares) বিক্রয় করা হইত। কিন্তু একমাত্র পাটকল শিল্প ছাড়া অন্য কোন শিল্প এই সূত্র হইতে বিশেষ মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই।

মূলধন সরবরাহের কার্যে ডিবেঞ্চার এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি দেখিয়াছিল যে সামগ্রিকভাবে কলিকাতার যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়লব্ধ অর্থ

মোট ৮৫ কোটি টাকার মধ্যে ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি টাকার কিছু উপর। বোম্বাই-এ অবশ্য ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি টাকার মধ্যে ১৭.৫ কোটি টাকা।* তাহা হইলেও শিল্পক্ষেত্রে অর্থ-সংগ্রহের সূত্র হিসাবে ডিবেঞ্চারকে স্বচ্ছন্দেই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অভিহিত করা চলে। ইহার অবশ্য নানা কারণ আছে। প্রথমত, শিল্প-অর্থ করপোরেশন (Industrial Finance Corporation) প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা এ-দেশে ছিল না। দ্বিতীয়ত, ডিবেঞ্চার শেয়ারের মত বাজারে সর্বদা বিক্রয়যোগ্য নহে বলিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি উহা লইতে চাহে না। তৃতীয়ত, বিক্রয়বাজারে ডিবেঞ্চারকে সরকারী ঋণ-পত্রের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে হয়।

২। ডিবেঞ্চার বিক্রয়

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও সরকারী ঋণকে শিল্পগত প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সূত্র বলিয়া গণ্য করা যাইত না। শিল্পসমূহকে রাষ্ট্রীয় অর্থ-সাহায্য আইনের (State Aid to Industries Acts) দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু মূলধন সংগ্রহ করা হইয়াছে বটে, তবে ইহা পরিমাণে এত অল্প যে ইহার দ্বারা শিল্পগত মূলধন-সমস্যার একাংশেরও সমাধান হয় নাই। অবশ্য সম্প্রতি সরকার টাটা কোম্পানী, ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রভৃতিকে দীর্ঘকালীন মোটা ঋণদান করিয়াছে। কিন্তু সরকারী ঋণ হইলেও ইহা শিল্পগত মূলধন সংগ্রহের চিরাচরিত সূত্র নহে—সাম্প্রতিক সূত্র মাত্র। সুতরাং ইহার আলোচনা বর্তমান প্রসংগে করা চলিতে পারে না।

৩। সরকার হইতে ঋণের পরিমাণ অত্যল্প

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে চলতি মূলধন সরবরাহের সূত্রসমূহ হইল সংখ্যায় প্রধানত চারিটি: সাধারণের নিকট হইতে আমানত, পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত, দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ঋণ এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে ঋণ।

চলতি মূলধনের চিরাচরিত সূত্র:

সাধারণের নিকট হইতে আমানত (public deposits) বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলির মূলধন সংগ্রহের এক বিশেষ সূত্র। এই সূত্রের সন্ধান দেশের অন্যান্য অংশে মিলে না। বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলে এই সূত্র হইতে বহু পরিমাণে চলতি মূলধন সংগৃহীত হয়। কিন্তু ইহা বিশেষ বিপজ্জনক। প্রথমত, মিল-মালিকেরা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত আমানত গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় তাঁহারা এই স্বল্পকালীন ঋণ দীর্ঘদিনের জন্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করেন। পরিশেষে, অনেক সময় দেখা যায় যে, সামান্য গুজবেও আমানতকারীরা টাকা উঠাইয়া লইতে ব্যস্ত হইয়াছে।

১। সাধারণের নিকট আমানত

* Central Banking Enquiry Committee Report, Vol. I ৩৩৩ পৃষ্ঠা

এই কারণে এই সকল আমানতকারীকে 'সুসময়ের বন্ধু' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত (private deposits) বলিতে বুঝায় ম্যানেজিং এজেণ্ট, অন্যান্য শিল্পপতি এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে আমানত। এই সকল আমানতকারী সুসময়ের বন্ধু না হইলেও এই পদ্ধতির একটি বিশেষ ত্রুটি আছে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত সাধারণের অগোচরে কখন শেয়ারে পরিণত হইয়াছে।

২। পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত

দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়িগণ শিল্পগত চলতি মূলধন সরবরাহের এক উল্লেখযোগ্য সূত্র। কিন্তু ইহাদের সুদের হার এত চড়া যে শিল্পপতিগণ গত্যন্তরবিহীন না হইলে এই সূত্র হইতে ঋণসংগ্রহ করিতে চাহেন না। অথচ সাধারণভাবে তাঁহারা গত্যন্তরবিহীন বলিয়া এই সূত্র হইতেই তাঁহাদের মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়।

৩। দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী

পরিশেষে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হইতেও অনেক ক্ষেত্রে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক এই প্রকার ঋণদান বিষয়ে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করে এবং ঋণও অতি অল্প সময়ের জন্য প্রদান করে। ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে ইহাদের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। সম্প্রতি অবশ্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি শিল্প-মূলধন সরবরাহে পূর্বাপেক্ষা কিছুটা সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।*

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংক

শিল্পগত অর্থসংগ্রহের পরম্পরাগত সমস্যা (Traditional Problem of Industrial Finance) : যাহা হউক উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, শিল্পগত অর্থসংগ্রহের পরম্পরাগত সমস্যা হইল মূলধনের অপ্রতুলতার সমস্যা বা পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের সমস্যা। অন্যান্য কারণের মধ্যে সুসংগঠিত মূলধন বাজারের (Capital Market) অভাবের দরুন ভারতে শিল্পোন্নয়ন সর্বদাই ব্যাহত হইয়াছে। শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া যে সামান্য পরিমাণ প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা অধিকাংশ সম্ভব হইয়াছে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্য।** ইহা একরূপ সর্বজনবিদিত যে প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেণ্টদের নাম জড়িত না থাকিলে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা ছিল একপ্রকার অসম্ভবই। প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেণ্টরাও পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিতেন না।

প্রধান সমস্যা অপ্রতুলতার সমস্যা

* Reserve Bank Bulletin, Oct. 1960

** The Managing Agency System published by the National Council of Applied Economic Research

ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা প্রাথমিক মূলধন এইভাবে সংগ্রহ করা হয় যে, শিল্প-সংগঠনের প্রাথমিক কাজ মিটিয়াও চলতি মূলধন হিসাবে কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকে। ভারতে কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক কার্যাদির জন্যও পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হয় না। ফলে এদেশে শিল্পপতিগণকে চলতি মূলধনের একটা অংশকে দীর্ঘকালের জন্য আবদ্ধ রাখিতে হয়। তত্ত্বের দিক দিয়া এই পদ্ধতি বিশেষ অবাঞ্ছনীয়, কারণ ইহা বিপজ্জনক।

দেখা গিয়াছে, চলতি মূলধনও বিশেষ সুলভ ও ত্রুটিবিহীন নহে। সাধারণের নিকট হইতে আমানত চলতি মূলধন সংগ্রহের একটি বিশেষ বিপজ্জনক সূত্র হইলেও ইহার উপর বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিকে নির্ভর করিতে হয়। পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ঋণ ও চলতি মূলধন সংগ্রহের কাম্য সূত্র নহে। শিল্পপতিগণের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব এবং ম্যানেজিং এজেন্টগণ যে-ঋণদান করেন তাহা অনেক সময় শেয়ারে রূপান্তরিত হইয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ইঁহাদের করতলগত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দৃষ্টিভংগি সেদিন পর্যন্ত ছিল সম্পূর্ণ হতাশাব্যঞ্জক। এই দৃষ্টিভংগিকে 'আমাকে ছুঁইও না' (touch me not) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ছুঁইতে না পারিয়া শিল্পপতিগণ দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের নিকট যাইতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু এই শেষোক্ত সূত্র হইতে ঋণের সুদের হার এত বেশী যে অনেককে ঋণ করিতে গিয়াও ফিরিয়া আসিতে হইত।

চলতি মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতির ত্রুটি

পরিশেষে, শিল্প-অর্থ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে শিল্পগত মূলধন সরবরাহে রাষ্ট্রের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না বলিলেই চলে। শিল্পে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্য আইন (State Aid to Industries Acts) অনুসারে সরকার মাঝে মাঝে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক মূলধন সরবরাহ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এতই স্বল্প যে তাহার দ্বারা শিল্পগত অর্থসরবরাহের সমস্যার একাংশেরও সমাধান হয় নাই। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ বিশেষ করিয়া জাপানের সহিত তুলনায় ভারতে রাষ্ট্রের এই নিষ্ক্রিয় ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছিল।

রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা

ভারতের শিল্প-অর্থ করপোরেশন (Industrial Finance Corporation of India): ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অর্থসরবরাহের এই সমস্যা সমাধানের জন্য নানা পন্থার নির্দেশ করা হইয়াছিল—যথা, পর্যাপ্ত-সংখ্যক শিল্প-ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগ-ট্রাষ্ট (Investment Trust) প্রতিষ্ঠা, শেয়ার-বিক্রয় বাজারের সংখ্যাবৃদ্ধি, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পুনর্গঠন ও মিশ্র ব্যাংকিং-এর (mixed banking) প্রসার, শিল্প-অর্থ করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। অবশেষে স্বাধীনতার পর শিল্প-অর্থ করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

গঠনঃ করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। ইহা প্রত্যেকটি এককালীন দেয় ৫ হাজার টাকার মূল্যের ২০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত। মাত্র প্রতিষ্ঠানসমূহই করপোরেশনের শেয়ার ক্রয় করিতে পারে। স্বতই সূচনায় মোট বিলিকৃত মূলধন—অর্থাৎ, ৫ কোটি টাকার শেয়ারের সমগ্রটাই কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সমবায় ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিয়াছে। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে করপোরেশন আরও ২ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার শেয়ার মূলধনের মূল্য এবং শতকরা ২½ হারে (নূতন শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে শতকরা ৪ টাকা হারে) লভ্যাংশের জামিন হইয়া থাকে। বর্তমানে আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চিত অর্থের (reserve) ১০ গুণ পর্যন্ত ঋণ করিবার ক্ষমতা করপোরেশনের আছে। এই ঋণ সাধারণত ডিবেঞ্চার ও বণ্ডের মাধ্যমে করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের সম্বন্ধেও গ্যারান্টি প্রদান করিয়া থাকে। বর্তমানে এই বণ্ড ও ডিবেঞ্চার সাধারণেও ক্রয় করিতে পারে। করপোরেশন একাদিক্রমে অন্যূন পাঁচ বৎসরের জন্য সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতে পারে। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে বিশ্ব ব্যাংক হইতেও ঋণ করিতে পারে।

মূলধন

ভারতের শিল্প-অর্থ করপোরেশনের পরিচালনা ভার ১২ জন পরিচালক লইয়া সংগঠিত একটি বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত। ইহাদের মধ্যে ৪ জন কেন্দ্রীয় সরকার ও ২ জন রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা মনোনীত এবং বাকী ৬ জন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক প্রভৃতি অন্যান্য শেয়ারহোল্ডার দ্বারা নির্বাচিত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪ জনের মধ্যে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং একজন সহকারী ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুসারে পরিচালকমণ্ডলীকে কার্য করিতে হয়। নির্দেশ অমান্য করিলে সরকার বোর্ড ভাঙিয়া দিয়া করপোরেশনের পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে।

পরিচালনা

কার্যঃ ভারতের শিল্প-অর্থ করপোরেশন সসীম দায়সম্পন্ন সাধারণ যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান (Public Limited Companies) এবং সমবায় সমিতির যেগুলি পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয়করণোপযোগীকরণে (processing activities) অথবা খনির কার্যে, অথবা শক্তি সরবরাহে অথবা হোটেল শিল্পে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে এবং জাহাজী কোম্পানীদিগকে (shipping companies) মূলধন সরবরাহ করিতে বা সরবরাহে সাহায্য করিতে পারে।* এই উদ্দেশ্যে ইহা শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি ঋণদান করিতে পারে বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারে। এই

মূলধন সরবরাহ

* ১৯৬০ সালের সংশোধন দ্বারা কার্যপরিধি এইরূপ বিস্তৃততর করা হইয়াছে।

ঋণ বা ডিবেঞ্চারের মূল্য পরিশোধ সর্বাধিক ২৫ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ১৯৬১ সাল হইতে করপোরেশনকে সরাসরি শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারে বিনিয়োগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

অন্যান্য কার্য

তৃতীয়ত, করপোরেশন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতির অবলেখনের (underwriting) কার্য করিতে পারে। এই কার্য সম্পাদনে যে-সকল শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইহার হস্তগত হইবে অনধিক ৭ বৎসরের মধ্যে তাহা হস্তান্তরিত করিয়া ফেলিতে হইবে। চতুর্থত, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ টাকার বাজার হইতে যে-ঋণ সংগ্রহ করে তাহার সময় ২৫ বৎসরের অধিক না হইলে করপোরেশন সেই সকল ঋণ সম্পর্কে গ্যারাণ্টি প্রদান করিতে পারে। পঞ্চমত, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ভবিষ্যতে পাওনা মিটানোর চুক্তিতে (on deferred payments arrangement) বিদেশ হইতে বা দেশের অভ্যন্তরে মূলধন-দ্রব্য ক্রয় করিলে সেই পাওনা মিটানো সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান বিদেশ হইতে বিদেশী মুদ্রায় ঋণ করিলে, অথবা তপশীলী ব্যাংক বা সমবায় ব্যাংক হইতে ঋণ করিলে করপোরেশন ঐ ঋণ সম্বন্ধেও গ্যারাণ্টি প্রদান করিতে পারে।

প্রথমে করপোরেশনের সুদের হার ছিল ৫½%। ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া উহা বর্তমানে ৭½%-এ পরিণত হইয়াছে। চুক্তিমত ঋণ পরিশোধ করিলে ½% ফেরত (rebate) দেওয়া হয়। বৈদেশিক মুদ্রায় যে-ঋণ দেওয়া হয় উহার সুদের হার শতকরা ৮¼ টাকা।

কার্যসম্পাদন ও সমালোচনা ঃ ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৬২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত—প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এই ১৪ বৎসরে শিল্প-অর্থ করপোরেশন ৪২৭টি ঋণের আবেদন অনুমোদন করিয়া মোট ১৩০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করে। ইহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে মোট ৬৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

১৪ বৎসরের কার্য বিবরণী

যে-সকল শিল্পকে ঋণদান করা হইয়াছে তাহার মধ্যে চিনি শিল্পই প্রধান। ইহা ছাড়া রসায়ন শিল্প, কাগজ শিল্প, তুলাবস্ত্র শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প, এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এবং মোটরগাড়ী শিল্পও আছে। নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও আধুনিককরণের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। ১৯৬২ সালের জুন মাস পর্যন্ত করপোরেশনের শেয়ার অবলেখনের পরিমাণ ছিল ৪·৯২ কোটি টাকা, ভারতীয় আমদানিকারিগণের সপক্ষে গ্যারাণ্টি প্রদানের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৬ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণমঞ্জুরের পরিমাণ ছিল ৭·০৬ কোটি টাকা।

নানাদিক দিয়া শিল্প-অর্থ করপোরেশনের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে শিল্প-অর্থ করপোরেশন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বলিয়া

ইহা বৃহদায়তন শিল্পসমূহকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। মধ্যায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ ইহার নিকট হইতে কোনরূপ সহায়তা পায় না। দ্বিতীয়ত, শিল্প-অর্থ করপোরেশন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হইলেও ভারতের স্থায় বিশাল দেশের তুলনায় ইহা ক্ষুদ্র। ইহার ঋণদানের সংগতির পরিমাণ অত্যল্প। তৃতীয়ত, সেদিন পর্যন্ত করপোরেশন বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণদান ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারে সরাসরি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে নাই; এমনকি এখনও এই দুই প্রকার অর্থসরবরাহের পরিমাণ অত্যল্প। চতুর্থত, করপোরেশন প্রদত্ত ঋণের সুদের হার অত্যধিক এবং উহাকে দিনের পর দিন বৃদ্ধি করা হইতেছে। পঞ্চমত, কার্যসম্পাদনেও করপোরেশনের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম করপোরেশনকে শেয়ার ক্রেতাগণকে প্রতিশ্রুত (guaranteed) লভ্যাংশ প্রদান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। কয়েক ক্ষেত্রে ইহা এইরূপ ঋণপ্রদান করিয়াছে যাহা শেষ পর্যন্ত বিরাট ক্ষতিতে পরিণত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, সোদপুরের কাঁচের কারখানাকে (Sodepur Glass Works Ltd.) ঋণদানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার করপোরেশন নিজস্ব কার্যালয়ের খসড়া প্রস্তুতি-কার্যে প্রায় ১·৫ লক্ষ টাকা নষ্ট করিয়াছে।

অভিযোগ

করপোরেশনের কার্যসম্পাদন সম্পর্কে অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য ১৯৫২ সালে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর সভাপতিত্বে একটি তদন্তকারী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি করপোরেশনের ঋণপ্রদান ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব, অন্যান্য প্রকার দুর্নীতি, কার্যসম্পাদনে অনাবশ্যক বিলম্ব, জটিলতা প্রভৃতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইহার পুনর্গঠনের সুপারিশ করে। ফলে ১৯৫৫ সালে করপোরেশন আইনের বিশদ সংশোধন করা হয়। প্রথমত, অবৈতনিক আংশিক সময়প্রদানকারী (part-time) সভাপতির পদকে বেতনভোগী পুরা সময়প্রদানকারী (whole-time) সভাপতির পদে পরিণত করা হয়। দ্বিতীয়ত, কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রভূত উন্নতিসাধন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৮ ও ১৯৬০ সালে দুইটি সংশোধন দ্বারা উহার কার্যপরিধিও বিস্তৃততর করা হয়। এই সকলের ফলে করপোরেশনের কার্যসম্পাদনে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। উহার নীট মুনাফার পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে নীট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১২·২৫ লক্ষ টাকা। ১৯৬১-৬২ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৮০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

অভিযোগের ফলে করপোরেশন আইনের সংশোধন

সাম্প্রতিক উন্নতি

উপসংহার : শিল্প-অর্থ করপোরেশনের যে-সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু অযৌক্তিকতা রহিয়া গিয়াছে। প্রথমত,

করপোরেশন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে-সমালোচনা করা হয় তাহা মোটেই যুক্তিসংগত নহে। স্পষ্টতই শিল্প-অর্থ করপোরেশন একটি বৃহদায়তন জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত শিল্প-সমূহকে মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি। মধ্যায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের মূলধনের সমস্যা ইহার পরিধি-ভুক্ত নহে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহকে এই ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য রাজ্য শিল্প-অর্থ করপোরেশন, মধ্যায়তন শিল্পসমূহকে মূলধন যোগাইবার জন্য পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশনের (Refinance Corporation) ন্যায় বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে ইহাই করা হইয়াছে।

অভিযোগের মূল্যায়ন

ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা করপোরেশনের পরিধিভুক্ত নহে

দ্বিতীয়ত, শিল্প-অর্থ করপোরেশনের ঋণদানের সংগতি অত্যল্প সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সমালোচনাও যৌক্তিকতার সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছে। এই শ্রেণীর সমালোচকগণ শিল্প-অর্থ করপোরেশনের প্রকৃত ভূমিকা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। করপোরেশন বর্তমান মূলধন বাজারের পরিপূরক (supplement) মাত্র—ইহার পরিবর্ত (substitute) নহে। যে-সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাজার হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না তাহাদের সহায়তা করাই ইহার কার্য। করপোরেশনের সভাপতির ভাষায় বলা যায়, করপোরেশন "সেই সকল প্রতিষ্ঠানকেই ঋণদান করিয়াছে যাহারা মূলধন বিনিয়োগের আধিক্য ও মুনাফার স্বল্পতার জন্য সাধারণ ব্যাংক বা বিনিয়োগ-কারী জনসাধারণের নিকট হইতে প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে নাই; এবং ভবিষ্যতে এই পন্থাই অবলম্বন করা হইবে।" উপরন্তু বলা যায়, যে-দেশে মূলধন সরবরাহ ব্যাপারে ঋণের ভূমিকা লইয়া গর্ব করিবার কিছুই নাই সে-দেশে এই পথে সতর্কতার সহিতই পদসঞ্চার করা ভাল।

ইহা মূলধন বাজারের পরিপূরক, পরিবর্ত নহে

সুদের হার সম্বন্ধে বলা যায় যে, বাজারের তুলনায় ইহা মোটেই অধিক নহে। সুদ সম্বন্ধে ইহা সাধারণ বাণিজ্যিক নীতি—বাজারে চলতি হার অনুসরণ করিয়াছে মাত্র।

সুদের হার অধিক নহে

অবশ্য করপোরেশনের কার্যসম্পাদনের বিরুদ্ধে যে-সকল সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা পুরাপুরি না হইলেও অধিকাংশে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। শিল্প-অর্থ করপোরেশনের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যদি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়, নানাপ্রকার দুর্নীতির আবাসস্থল হয় তবে জাতীয় জীবনের প্রগতি ব্যাহত হইতে বাধ্য। এইজন্য যে-সকল সংশোধন করা হইয়াছে তাহা ছাড়াও করপোরেশনের কার্যাবলীর উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা উচিত। জীবনবীমা করপোরেশনের বিনিয়োগ ব্যাপারে দুর্নীতি প্রকাশের পর সরকারের পক্ষে ইহা অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও চলে।

তবে কার্যসম্পাদনের বিরুদ্ধে সমালোচনা অনেকাংশেই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে

রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন (State Financial Corporations) : শিল্প-অর্থ করপোরেশনের পক্ষে ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন আঞ্চলিক শিল্পসমূহকে মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব নহে বলিয়া রাজ্যসমূহকে তাহাদের নিজস্ব অর্থ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট ১৯৫১ সালে রাজ্য অর্থসরবরাহকারী করপোরেশন আইন (State Financial Corporations Act) পাস করে। এই আইনের দ্বারা রাজ্যসমূহ তাহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অর্থসরবরাহ করপোরেশন স্থাপন করিবার অধিকারী হয়।

প্রয়োজনীয়তা

এই আইনের বলে বর্তমানে ভারতের ১৪টি রাজ্যে অর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সহিত ঐ একই প্রকৃতির মাদ্রাজ শিল্প বিনিয়োগ করপোরেশনকে (Madras Industrial Investment Corporation) ধরিলে বলা যায় যে সকল রাজ্যেই একটি করিয়া রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশনগুলি সাধারণত নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ও আধুনিককরণের জন্য ২৫ হাজার টাকা হইতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যকরী মূলধনের জন্যও ঋণ প্রদান করা হয়। সুদের সর্বাধিক হার শতকরা ৭ টাকা। করপোরেশনগুলির শেয়ার-মূলধন যোগাইয়া থাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার, রিজার্ভ ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রভৃতি। জনসাধারণের নিকট বণ্ড বিক্রয় করিয়াও করপোরেশনগুলি মূলধনের একাংশ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ১৯৬২ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই করপোরেশনগুলি মোট ৪৬ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করে।

বর্তমান সংখ্যা

মূলধন ও কার্যাবলী

পশ্চিমবংগ রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ২ কোটি টাকা এবং প্রাথমিকভাবে বিলিকৃত মূলধন (initially issued capital) ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। প্রাথমিকভাবে আদায়ীকৃত মূলধনের ৩০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল রাজ্য সরকারের নিকট হইতে এবং বাকী ২০ লক্ষ টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে। পরে করপোরেশন মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণকে বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি টাকায় লইয়া যায়, এবং এই বর্ধিত মূলধন যোগান দেয় বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি। ইহার উপর ১৯৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বণ্ড বিক্রয় করিয়া করপোরেশন ১·৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। ফলে উহার কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২·৫ কোটি টাকায়।* পশ্চিমবংগ সরকার এই করপোরেশনের অংশীদারগণের (shareholders) এবং বণ্ড ক্রেতাগণের মূলধন, লভ্যাংশ ও নির্দিষ্ট সুদের জামিনদাতা।

পশ্চিমবংগ রাজ্য অর্থ-সরবরাহ করপোরেশন

* ১৯৬২ সালের জুন মাসে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ

এই রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশনের পরিচালনার ভারও অন্যান্যের মত একটি বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত। বোর্ড একজন সভাপতি ও একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমেত মোট ১০ জন পরিচালক লইয়া গঠিত।

অতীতে বিভিন্ন রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন অনেক ক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় প্রতিনিধি বা ভারতের শিল্প-অর্থ করপোরেশনের (IFC) সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছে। দেখা গিয়াছে, একই শিল্প-প্রতিষ্ঠান একই সংগে রাজ্য সংস্থা ও সর্ব-ভারতীয় সংস্থার নিকট ঋণের আবেদন করিয়াছে এবং উভয় করপোরেশনই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটিকে ঋণ প্রদান করিয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ঠিক হইয়াছিল যে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ-গ্রহণেচ্ছু প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রাজ্য করপোরেশনের নিকট আবেদন পেশ করিবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঠিক হয় যে বিশেষ ক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় সংস্থাটি ১০ লক্ষ টাকার কম ঋণও প্রদান করিবে এবং রাজ্য করপোরেশনগুলি ১০ লক্ষ টাকা অধিক ঋণও প্রদান করিতে পারে। ইহার পর আবার রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশনগুলির ঋণদানের ক্ষমতা ১০ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২০ লক্ষ টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। ইহার ফলে রাজ্য অর্থ-সরবরাহ করপোরেশনগুলির পক্ষে বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ প্রদান করিবার ঝোঁক দেখা দিয়াছে। ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ বিশেষভাবে ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই অর্থসরবরাহ করিবার জন্যই এই রাজ্য করপোরেশনগুলি গঠন করা হইয়াছে।

বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কার্যক্ষেত্রের বণ্টন

শিল্পগত মূলধনের সাম্প্রতিক সমস্যা (Recent Problem of Industrial Finance): পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর হইতে শিল্পগত মূলধন সংগ্রহের সমস্যা এক নূতন রূপে দেখা দিয়াছে। এ-পর্যন্ত শিল্পগত মূলধনের সমস্যা ছিল অপ্রতুলতার সমস্যা, বিনিয়োগ-ইচ্ছার অভাবের সমস্যা। ইহার উপর সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থায় দেখা দিয়াছে প্রতিযোগিতার সমস্যা—সরকার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সমস্যা। মূলধনের অপ্রতুলতার সমস্যাও নূতন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতে শিল্পোন্নয়নের সুরু হইতে যে-যে শ্রেণী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই হয় আজ অবলুপ্ত না-হয় সঞ্চয়হীন। সুতরাং বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের (private sector) পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে নূতন নূতন মূলধন সরবরাহের সূত্রের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিবার। জাতীয় এবং রাজ্য শিল্প-অর্থ করপোরেশনগুলি ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের এই নূতন অভাবের একাংশও মিটাইতে পারিতেছে না।

প্রতিযোগিতার নূতন সমস্যা

মূলধনের অপ্রতুলতার সমস্যার নূতন রূপ

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে মূলধন লইয়া এই যে প্রতিযোগিতার সমস্যা ইহা সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও শিল্পগত গণতন্ত্রের স্বাভাবিক

প্রতিফলন। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে শিল্পোন্নয়ন শিল্পগত গণতান্ত্রিকতার ধারণা ছড়াইয়া পড়িবার পূর্বেই সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং এই সকল দেশের পক্ষে মূলধন-গঠনে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শিল্পোন্নয়নের সুফল মুষ্টিমেয় লোকে ভোগ করার ফলে তাহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং স্বাভাবিক-ভাবেই তাহারা অধিকতর মূলধন সরবরাহ করিতে পারিয়াছিল। উপরন্তু, ঔপনিবেশিক শোষণের দ্বারা বিভিন্ন ইয়োরোপীয় শক্তি তাহাদের মূলধনের বুনিয়াদ ব্যাপক ও সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের অন্যতম কারণ হইল নিগ্রো শ্রমিকদের শোষণ। বর্তমান জগতে কিন্তু শিল্পোন্নয়নের জন্য এইরূপ পরিস্থিতির কল্পনাই করিতে পারা যায় না। বর্তমানে শিল্পায়নাভিমুখী সকল দেশেই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমাইয়া আনিয়া অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের রূপ দিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরা ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয়কারী শ্রেণীর সাক্ষাৎ বর্তমানে আর বিশেষ মিলে না। সামাজিক দাবি মিটাইবার জন্য অতিরিক্ত করভার বহন করিয়া ব্যক্তি বা শ্রেণীর হস্তে আজ আর উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছু থাকে না বলিলেই চলে। সম্প্রতি অক্সফোর্ডের পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান (Oxford Institute of Statistics) দেখাইয়াছে যে, যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে বীমা প্রভৃতির ন্যায় চুক্তির মাধ্যম ছাড়া ব্যক্তিগত কোনরূপ সঞ্চয়ই আর হয় না। ভারতে দেশীয় রাজন্যবর্গের অপসারণ, জমিদারী প্রথার বিলোপ প্রভৃতি একে ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগকারী শ্রেণীর অবসান ঘটাইয়াছে; ইহার উপর আবার জীবনযাত্রার ব্যয়ের অত্যধিক বৃদ্ধি ও অভূতপূর্ব করভার সাধারণ লোকের সঞ্চয়ের সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে, আমাদের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় মূলধন-গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সঞ্চয় একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ

সুতরাং যাহা কিছু সঞ্চয় সম্ভব হয় বর্তমান মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য সরকার ও বেসরকারী শিল্পপতিগণের প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক-ভাবেই লাগিয়া থাকিবে। কিন্তু শিল্পপতিগণের বক্তব্য হইল যে এইভাবে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার স্বরূপ বজায় রাখা যায় না। ক্ষীয়মাণ সঞ্চয়ের অধিকাংশই যদি সরকার নিজ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে টানিয়া লয় তবে ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সংগৃহীত হয় কোন্ সূত্র হইতে? সরকার যে শুধু ঋণের মাধ্যমে সঞ্চয়সংগ্রহ করে তাহা নহে, নিজ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের জন্য কর-পদ্ধতিকেও (system of taxation) পুনর্গঠিত করিয়াছে। ইহা ছাড়া, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়েরও (compulsory savings) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে কর-পদ্ধতি সরকারের দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহ এবং বৈষম্য দূরিকরণেরই মাধ্যম মাত্র নহে, ইহা পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের যন্ত্রও

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় বিরোধিতার অভিযোগ

বটে। কিন্তু সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের জন্য এইভাবে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করিলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা (Governmental Attempt for solving the Problem) : শিল্পপতিগণের এই অভিযোগ বিচারের জন্য প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়েই ব্যাংক-ব্যবসায়িগণের একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ইহা শ্রফ্ কমিটি নামে অভিহিত।

কমিটির প্রধান কার্য ছিল কিভাবে বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণকে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রাভিমুখী করা যায় তাহা নির্দেশ করা। কিভাবে অধিকতর মূলধন-গঠন (capital formation) করা যায় তাহা নির্ধারণ করিবার ভার কমিটির উপর দেওয়া হয় নাই। কমিটি প্রথমে মিশ্র ব্যাংকিং-এর (mixed banking) সম্ভাবনা লইয়া আলোচনা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে। তবে কমিটি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যাহাতে শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ, ইহাদের জামিনে ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অর্থ করপোরেশনসমূহের শেয়ার ও বণ্ড অধিক পরিমাণে ক্রয় প্রভৃতি পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে শিল্প মূলধন সরবরাহে অধিক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে তাহার সুপারিশ করে। এই প্রসংগে কমিটির আর একটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের সুব্যবস্থা বা অবলেখনের (underwriting) কার্য করিবার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের নেতৃত্বাধীনে প্রধান প্রধান ব্যাংকের একটি সিণ্ডিকেট বা কনসরটিয়াম (consortium) গঠন করা। কিন্তু পরবর্তীকালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ এই সুপারিশের মূলে কুঠারাঘাত করে।

শ্রফ্ কমিটির অভিমত ও সুপারিশ

কমিটি স্বল্পকালীন মূলধন সরবরাহের জন্য বিল বাজারের (bill market) সংগঠন ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবসায়ের বিস্তারের সুযোগসুবিধা প্রদানের সুপারিশ করে।

কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, বীমা কোম্পানীগুলির সম্পত্তি (assets) রক্ষণের নিয়মাবলীর পরিবর্তনসাধন করা হইলে ইহারা শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন মূলধন সরবরাহ করিতে পারিবে। শিল্প-অর্থ করপোরেশনকেও এই দিক দিয়া অধিকতর উপযোগী করিয়া তোলা যাইতে পারে। ইহাদের ঋণদানের পদ্ধতির মধ্যে সরলতা আনয়ন করিতে হইবে এবং পার্লামেণ্টকে ইহার দৈনন্দিন কার্যপরিচালনায় হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

মূলধন সরবরাহের চিরাচরিত সূত্রগুলি কিভাবে অধিকতর উপযোগী হইতে পারে সে-সম্বন্ধে আলোচনার পরে শ্রফ্ কমিটি বিলিকরণ প্রতিষ্ঠান (Issue Houses), বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Investment Trusts), একক প্রতিষ্ঠান

(Unit Trusts) প্রভৃতির ন্যায় কয়েকটি বিশেষ সংগঠন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ইতিপূর্বেই অবশ্য বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশ অনুসারে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (National Industrial Development Corporation) এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প-ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন (Industrial Credit and Investment Corporation) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঘোষিত হইয়াছিল। কমিটি এই প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করে। কিছুদিন পরে উভয় প্রতিষ্ঠানই গঠিত হয়। ইহার পর আবার ১৯৫৮ সালে মধ্যায়তন শিল্পসমূহকে মূলধন সরবরাহ করিবার জন্য পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন (Refinance Corporation) স্থাপিত হয়।

নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (National Industrial Development Corporation) : এই করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে। ইহার উদ্দেশ্য "পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার আনুষংগিক শিল্পগুলিকে মূলধন দিয়া সাহায্য করা।"* ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় যে সকল শিল্পের উন্নয়ন সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে সাধারণত সাধিত হয় না, অথচ যাহাদের উন্নয়ন শিল্প-ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্যতার জন্য প্রয়োজনীয়, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন মূলধন সরবরাহ দ্বারা সেই সকল শিল্পের গঠন ও উন্নয়নে সহায়তা করে। সুতরাং মূলধন সরবরাহ ইহার আনুষংগিক কায মাত্র, আসল কার্য হইল শিল্প-ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করা। এইজন্য ঋণপ্রদান ব্যাপারে ইহা শিল্প-যন্ত্রপাতির ন্যায় মূলধন-দ্রব্য (capital goods) উৎপাদনকারী এবং ফিল্ম, রবার, এ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতির ন্যায় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনকারী শিল্পের দাবি অগ্রগণ্য বিবেচনা করে। নূতন শিল্প গঠনের প্রস্তাব কার্যকর করিবার সময় ইহা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে লভ্য সকল প্রকার শিল্প-উপাদান (industrial equipment), অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। এই সকল ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ঘাটতিটুকুই মাত্র সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হইতে পূরণের ব্যবস্থা করে। যে সকল শিল্প-সংগঠনের ফলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনুপূরক শিল্প গড়িয়া উঠে এই করপোরেশন সেই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠাও করিতে পারে। ইহা ছাড়া করপোরেশন কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত শিল্প-ঋণ বণ্টনের এজেন্ট হিসাবে কার্য করে।

উদ্দেশ্য

কার্যাবলী

করপোরেশনটি একটি ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠান (Private Limited Company) হিসাবে গঠিত হইয়াছে। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি

* Report on Currency and Finance, 1954-55 and Reserve Bank Bulletin, June, 1962

টাকা এবং বর্তমানে বিলিকৃত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। বিলিকৃত মূলধনের সমস্তটাই কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছে। করপোরেশন শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া নিজ আর্থিক সংগতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। কার্যকরী মূলধনের বাকী টাকা সরকার হইতে ঋণ বা সাহায্য হিসাবে গৃহীত হয়।

গঠন

১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত কার্যসম্পাদন হইতে জানা যায় যে, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন শিল্প-যন্ত্রপাতি, কাঁচা ফিল্ম, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল, এবং প্ল্যাসটিক, ঔষধপত্র প্রভৃতি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক দ্রব্য (intermediate products) উৎপাদনকারী শিল্পসমূহ যাহাতে গড়িয়া উঠে তাহার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে ইহা বৈদেশিক শিল্প-সংস্থা ও সোবিয়েত সরকারের ন্যায় বৈদেশিক সরকারের সহিত সহযোগিতায় আবদ্ধ হইয়া কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছে।* পাটকল শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিককরণ এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের (machine tool industry) সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে বিশেষ ঋণ (special loans) প্রদান করিতেছে তাহা এই করপোরেশনের এজেন্সীর মাধ্যমেই করা হইতেছে। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অনুমোদিত এইরূপ ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৬½ কোটি টাকা।**

কার্যসম্পাদন

ভারতের শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন (Industrial Credit and Investment Corporation of India, Ltd.):

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (NIDC) কার্য হইল শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা দূর করা—শিল্প-সংগঠনের শূন্য স্থানগুলি পূরণ করা। ইহা সরকারী ও বেসরকারী—উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন দিয়া সহায়তা করে। ইহার নিজস্ব সংগতির পরিমাণ অতি সামান্য; মোটামুটিভাবে ইহা সরকারী ঋণ বণ্টনেরই এজেন্সী বা মাধ্যম। ফলে ইহার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হইলেও বেসরকারী উদ্যোগের দৃষ্টিকোণ হইতে মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল ভারতীয় ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন।

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব

শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে। সরকারী সহায়তা ও উৎসাহ পাইলেও ইহাকে বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান (privately sponsored institution) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহার উদ্দেশ্য হইল বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রাংশভুক্ত উদ্যোগকে সহায়তা করা। সাধারণভাবে

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

* Annual Report of the Corporation for 1960-61 (published in June, 1962)

** Report on Currency and Finance, 1962-63

বলিতে পারা যায়, (১) এইরূপ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ; (২) এইপ্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে দেশী ও বৈদেশিক উভয় প্রকার মূলধনের অধিকতর অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান; (৩) শিল্পগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎসাহ প্রদান; এবং (৪) বিনিয়োগ বাজারের সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা—ইহার প্রধান কার্য। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, ভারতের শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন (১) ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘকালীন ও মধ্যমেয়াদী ঋণদান করে; (২) নূতন শেয়ার ও বণ্ডের মাধ্যমে বাজার হইতে অর্থসংগ্রহ করে; (৩) শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের অবলেখনের (underwriting) কার্য সম্পাদন করে; (৪) ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগকারিগণের মূলধনের জামিন হয়; (৫) মূলধন যাহাতে দ্রুত আবর্তিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে; এবং (৬) শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা ও শিল্পকৌশলগত উপদেশ দেয় এবং সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উপযুক্ত ব্যক্তি সংগ্রহে সহায়তা করে।

শেয়ার মূলধন

করপোরেশনের অনুমোদিত শেয়ার-মূলধন ২৫ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সাধারণ শেয়ারের মূল্য হইল ৫ কোটি টাকা। বাকী ২০ কোটি টাকার শেয়ারকে কোনরূপ পর্যায়ভুক্ত করা হয় নাই (unclassified)। বর্তমানে ৫ কোটি টাকার সাধারণ শেয়ারই বিলি করা হইয়াছে। শেয়ার-ক্রেতাগণের মধ্যে আছেন ও আছে কয়েকজন মার্কিন পুঁজিপতি ও কয়েকটি করপোরেশন, কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী, কয়েকটি কমনওয়েলথ বীমা কোম্পানী এবং কয়েকজন ভারতীয় বিনিয়োগকারী।

কার্যকরী মূলধন

করপোরেশন শেয়ার বিক্রয় করা ছাড়াও অন্যান্য সূত্র হইতে কার্যকরী মূলধন সংগ্রহ করে। এই সকল সূত্রের মধ্যে ভারত সরকার প্রদত্ত ঋণ, বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন ঋণই তহবিল (U. S. Development Loan Fund) হইতে ঋণ প্রধান। ১৯৬২ সালের শেষে করপোরেশনের ৬·৫ কোটি ডলার মূলধন ছিল। ইহা ছাড়া করপোরেশন পশ্চিম জার্মেনী হইতেও ঋণ সংগ্রহ করিতেছে। ১৯৬১-৬২ সালে করপোরেশন পশ্চিম জার্মেনী ও বিশ্ব ব্যাংক হইতে ১০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

প্রতিষ্ঠার সময় (১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাস) হইতে ১৯৬২ সালের শেষ পর্যন্ত—এই ৮ বৎসরের মধ্যে করপোরেশন ৬০·১৬ কোটি টাকার ঋণের আবেদন মঞ্জুর করে। ইহার মধ্যে ১৯৬২ সালেই মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৯·৬০ কোটি টাকা। যে যে শিল্প সহায়তা পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে মোটর গাড়ী ও মোটর গাড়ীর অংশ, কাগজ, রসায়ন, ঔষধপত্র, বৈদ্যুতিক দ্রব্য, বস্ত্র, চিনি, ধাতু-মাক্ষিক, কাঁচ, রেয়ন, রবার, এ্যালুমিনিয়ম, নাইলন প্রভৃতিই প্রধান। আর্থিক

সহায়তা প্রদানের জন্য অবলেখন (underwriting), শেয়ারক্রয় এবং সরাসরি ঋণপ্রদান—এই তিনটি পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবলেখনের কার্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অবলেখনের জন্য করপোরেশন শিল্প-অর্থ করপোরেশন (IFC), জীবন-বীমা করপোরেশন প্রভৃতির সহিত সহযোগিতা স্থাপন করিয়াছে। ১৯৬২ সালে অবলেখনের পরিমাণ ছিল ২·৪২ কোটি টাকা।* বর্তমানে করপোরেশন-প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহা বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ সরবরাহের অন্যতম প্রধান সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কার্যসম্পাদন

শিল্প পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন (Refinance Corporation for Industry): বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রভুক্ত মধ্যায়তন শিল্পসমূহের (medium sized industries) জন্য ঋণ সরবরাহ-ব্যবস্থা সুপ্রসারিত করিবার জল্পনাকল্পনা কিছুদিন যাবৎ চলিতেছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার একটি পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করিতে সিদ্ধান্ত করিয়া দেশের ১৫টি বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও জীবনবীমা করপোরেশনকে ইহার অংশীদার হইবার জন্য আহ্বান জানায়। অবশেষে ১৯৫৮ সালের জুন মাসে পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশনের সদর কার্যালয় বোম্বাই-এ অবস্থিত। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর ইহার পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি। তিনি রিজার্ভ ব্যাংকের সহকারী গভর্ণর, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও জীবনবীমা করপোরেশনের সভাপতি এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলির ৩ জন প্রতিনিধি লইয়া পরিচালকমণ্ডলী গঠিত। করপোরেশন ঘরোয়া যৌথ কোম্পানী হিসাবে রেজিস্ট্রীকৃত হইলেও ১৯৬০ সালের কোম্পানী আইনের সংশোধনের ফলে ইহা একটি সাধারণ যৌথ কোম্পানীতে (public limited company) পরিণত হইয়াছে।

সংগঠন

করপোরেশনের প্রাথমিক শেয়ার-মূলধন ১২·৫ কোটি টাকা। এই ১২·৫ কোটি টাকার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংকের অংশ ৫ কোটি টাকা এবং জীবনবীমা করপোরেশন, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এবং সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ২·৫ কোটি টাকা করিয়া। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণের মাধ্যমে যে খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছিল তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ২৬ কোটি টাকা করপোরেশনের হস্তে কার্যকরী মূলধন হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে। ফলে, কার্যকরী মূলধন ৩৮·৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

মূলধন

* Reserve Bank Bulletin—May, 1963

শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংকগুলি যে-ঋণপ্রদান করিয়া থাকে তাহার বিরুদ্ধে করপোরেশন পুনরায় ঋণপ্রদানের সুযোগ দান করে। অর্থাৎ, ঐ ঋণপত্র জমা রাখিয়া ব্যাংকগুলি করপোরেশনের নিকট হইতে মধ্য-মেয়াদী ঋণগ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু এইভাবে গৃহীত ঋণ পুনরায় মধ্যায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থসরবরাহ কার্যে নিযুক্ত হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলি সাধারণত ৩-৭ বৎসরের জন্য এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ১০ বৎসর পর্যন্ত ৫০ লক্ষ টাকা অবধি ঋণ পাইতে পারে। তবে বর্তমানে 'মধ্যমেয়াদী ঋণের' সংজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া ৭-১০ বৎসর বা ততোধিক সময়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রথমে ১৫টি শেয়ারহোল্ডার বাণিজ্যিক ব্যাংককে পুনঃঅর্থসরবরাহের কর্মভার দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমানে আরও ৫০টির মত ব্যাংক, সকল রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন এবং কয়েকটি রাজ্য সমবায় ব্যাংককেও এই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

কার্য

প্রথমে করপোরেশন মাত্র মধ্যায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে—অর্থাৎ, যাহাদের মোট সংগৃহীত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ মিলিয়া ২.৫ কোটি টাকার অধিক নহে, ঋণপ্রদান করিতে পারিত। বর্তমানে বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষাও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ঋণ-প্রার্থনা বিচার করিবার ক্ষমতা করপোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬০ সাল হইতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকেও গ্যারান্টি স্কীমের অধীনে পুনঃঅর্থসংগ্রহের (refinancing facilities) ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে। করপোরেশনের ঘোষিত নীতি অনুসারে ব্যাংকগুলিকে প্রধানত উৎপাদনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ঋণপ্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া করপোরেশন খনির কার্য ও রপ্তানি প্রসারের দরুন ঋণপ্রদানের নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত করপোরেশন ১২৮টি আবেদনের সপক্ষে ২৭ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে।* যে-সকল শিল্প ঋণ পায় তাহাদের মধ্যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পই প্রধান। ইহার পর ছিল তুলাবস্ত্র শিল্প, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, চিনি শিল্প ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থসরবরাহ (Financing of Small Industries) : ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থসরবরাহের জন্য রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন ছাড়া রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে গ্যারান্টি স্কীম (guarantee scheme), রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীনে ঋণপ্রদান প্রভৃতির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।** এখন এ-সম্বন্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইতেছে।

ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থসরবরাহের জন্যই রাজ্য অর্থ করপোরেশনসমূহ স্থাপিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে এই করপোরেশনগুলি ক্ষুদ্র শিল্প অপেক্ষা

* India, 1963

** ২৪৩ পৃষ্ঠা; ২য় খণ্ডের ১০৯-১১০ পৃষ্ঠাও দেখ।

বৃহৎ ও মধ্যায়তন শিল্পগুলিকেই সাহায্যদানের অধিকতর পক্ষপাতী। মোট-কথা, ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের মূলধন-সমস্যায় সমাধানে রাজ্য অর্থ করপোরেশনসমূহ পর্যাপ্ত বিবেচিত হয় নাই। তাই কর্তৃপক্ষকে রিজার্ভ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

১। রাজ্য অর্থ করপোরেশন

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে ঋণপ্রদান দিন দিন ব্যাপকতর করিয়া তোলা হইতেছে। ১৯৬২ সালে এইরূপ প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১১'৮১ কোটি টাকা এবং ঋণ পাইয়াছিল প্রায় ৩ হাজারের উপর শিল্প-প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে মধ্যমেয়াদী (৭ বৎসর পর্যন্ত) ঋণপ্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীনস্থ (subsidiaries) ব্যাংকগুলি এই কার্য ইতিমধ্যেই সুরু করিয়াছে।*

২। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক

● জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশনের সহিত চুক্তিক্রমে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ঋণপ্রদান করিয়া থাকে। ইহার উপর বর্তমানে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণপ্রদানের জন্য স্কীম তৈয়ারি করা হইতেছে।

১৯৬০ সালের জুলাই মাস হইতে ২২টি নির্বাচিত জিলায় রিজার্ভ ব্যাংকের গ্যারান্টি স্কীমে প্রথমে চালু করা হয়। ১ বৎসরের মধ্যে এই স্কীম ৫২টি জিলায় সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে স্কীমটির অধীনে প্রদত্ত ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

৩। রিজার্ভ ব্যাংকের গ্যারান্টি স্কীম

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যাহাতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অধিক পরিমাণে ঋণদান করে সে-সম্বন্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির এই প্রকার ঋণদানের পরিমাণ হইল মোট প্রদত্ত ঋণের শতকরা ২½ ভাগ মাত্র। ১৯৬২ সালের জুন মাস হইতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক ঋণপ্রদান করিবে, এবং তাহারা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে অধিক ঋণ করিতেও সমর্থ হইবে। আশা করা হইয়াছে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি এই সুবিধা গ্রহণ করিবে, এবং ফলে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের মূলধন-সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হইবে।

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংক

উপসংহার: শিল্প-অর্থ করপোরেশন, রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন এবং শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন যে তাহাদের বর্তমান সংগতি ও কার্য-পরিধিতে ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রাংশে মূলধন সরবরাহের পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না, একথা পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী সুসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের

মূলধন সরবরাহ কার্যে উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহ পর্যাপ্ত নহে

* **Trend and Progress of Banking in India during 1961**

(organised industries) জন্য মোট প্রয়োজনীয় অর্থ ৭২০ কোটি টাকার মধ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠান (পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন বাদে) ও সরকারী সূত্র হইতে মাত্র ৬০ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করিবার আশা করা হইয়াছিল। সেইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হইয়াছিল, "বিশেষ করিয়া ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার হ্রাসমান ভূমিকার জন্য নূতন মূলধনের বাজার সুসংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আরও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন হইতে পারে"।* আরও ব্যাপকতর তৃতীয় পরিকল্পনায় এই প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেই ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী নূতন প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতির সাক্ষাৎ মিলিতে পারে।

সুতরাং নূতন প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইতে পারে

ভারতে মূলধন-গঠন (Capital Formation in India): ভারতের ন্যায় দেশে মূলধন সরবরাহের সমস্যা মূলধন-গঠনের সমস্যার (problem of capital formation) সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। আমাদের অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত ও উন্নয়ন-মূলক হওয়ায় বর্তমানে এই দ্বিতীয় সমস্যাটির গুরুত্ব বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগের পূর্বে মূলধন-গঠনকে দেখা হইত শুধু বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টিকোণ হইতে; এবং শিল্পোদ্যোগও ছিল তখন মূলত ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ হইতে মূলধনের দাবি তখন ক্রমবর্ধমান থাকিলেও এই বৃদ্ধির হার অধিক ছিল না। কিন্তু বর্তমানের উন্নয়ন-ব্যবস্থায় এই সকল পরিবর্তিত হইয়াছে। শিল্প-সংগঠনের জন্য বর্তমানে মূলধনের দাবি করিতেছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ—উভয়ই; এবং এই দাবির পরিমাণ হইল পরিকল্পনাপূর্ব সময় অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। স্বাভাবিকভাবেই মূলধন-গঠনের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় মূলধন-গঠন সমস্যার গুরুত্ব

মূলধন-গঠনের অর্থ (Meaning of Capital Formation): এক-কথায় মূলধন-গঠন বলিতে বুঝায় বিনিয়োজিত অর্থের সাহায্যে মূলধন-দ্রব্য (capital goods) উৎপাদন বা সংগ্রহ (acquisition) করা। এই গঠনকার্যকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে: (১) সঞ্চয়ের সৃষ্টি, (২) সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগ তহবিলে রূপান্তরিত করা, এবং (৩) বিনিয়োজিত অর্থ দ্বারা মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করা।

মূলধন-গঠনের তিনটি পর্যায়

দেখা যাইতেছে, মূলধন-গঠন মূলত সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। সঞ্চয় অলস সঞ্চয় (idle savings) না হইলে উহার পরিমাণ যত অধিক হইবে, মূলধন-

---

* Second Five Year Plan—A Draft Outline ১৭ পৃষ্ঠা।

গঠনের হারও তত বৃদ্ধি পাইবে। এখন দেখা যাউক, ভারতের সঞ্চয়ের হার ও উহার আনুপাতিক মূলধন-গঠনের অবস্থা কি।

ভারতে মূলধন-গঠনের অবস্থা (State of Capital Formation in India) ঃ আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় মূলধন-গঠনের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইলেও মূলধন-গঠনের অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতে মূলধন-গঠনের হার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪'৯৪ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া মাত্র শতকরা ৬ ভাগের কিছু উপর আসিয়া দাঁড়ায়।* ১০ বৎসর পরিকল্পনাধীন সময়ের পর (১৯৫১-৬১ সাল) দেখা যায় যে, দেশে সঞ্চয়ের হার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৮'৫ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।** মূলধন-গঠনের হার যে উহা অপেক্ষা কিছু কম তাহা বলাই বাহুল্য। উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা ছাড়িয়া দিলেও যে-দেশে জনসংখ্যা বাৎসরিক শতকরা ২-এর অধিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই দেশে এই পরিমাণ মূলধন-গঠন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে বাৎসরিক মূলধন-গঠনের হার মোট জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা ২০ ভাগ হওয়া উচিত। অধ্যাপক লুইস্-এর মতে, যে-দেশ কোনপ্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় ব্রতী হইয়াছে তাহার পক্ষে মোটামুটি জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫-২০ ভাগ মূলধন-গঠনই কাম্য বাৎসরিক হার।† কিন্তু আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও বিনিয়োগের হার ১৫-তে পৌছিবে না এবং এই বিনিয়োগেরও একাংশ সংঘটিত হইবে বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা। জাপান, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশ তাহাদের শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ হারে সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন করিয়াছিল। এই উচ্চ হারের কথা বর্তমানে ছাড়িয়া দিয়া শুধু যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচিত হারের (জাতীয় আয়ের শতকরা অন্তত ১৫ ভাগ) দিক দিয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ কারণ বর্তমানে আমাদের মূলধন-গঠনকে ব্যাহত করিতেছে।

ভারতের মূলধন-গঠনের বৃদ্ধির অত্যল্প হার

ভারতে মূলধন-গঠনের প্রতিবন্ধক (Factors that hinder Capital Formation in India) ঃ মূলধন-গঠনের যে-তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ভারতে তাহাদের প্রত্যেকটি ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত, বর্তমানে সাধারণের সঞ্চয়ের ক্ষমতা অতি সামান্য। সঞ্চয় আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য মাত্র। আমাদের মাথাপিছু আয় এত স্বল্প যে তাহা ন্যূনতম জীবনধারণের মানের (minimum subsistence standard) পক্ষেও পর্যাপ্ত নহে। ১৯৬১-৬২ সালে

ভারতে মূলধন-গঠনের প্রত্যেকটি পর্যায় ত্রুটিপূর্ণ

* Review of the First Five Year Plan ৯ পৃষ্ঠা

** Third Five Year Plan ৯১ পৃষ্ঠা

† Lewis, *The Theory of Economic Growth* ২০৮ পৃষ্ঠা

ইহা ছিল ২৯৩ টাকা।* এ-ক্ষেত্রে কাম্য হারে সঞ্চয়ের আশা করিতে পারা যায় কিরূপে? উপরন্তু, বর্তমানের মূল্যাধিক্য ও করভার সাধারণের পক্ষে যেটুকু সঞ্চয় করা সম্ভব ছিল তাহাকেও একরূপ নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের (personal savings) পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে উপেক্ষণীয়।

১। সঞ্চয়ের ক্ষমতা অতি সামান্য

অবশ্য এই শেষোক্ত পরিস্থিতি সাম্প্রতিক যুগে একপ্রকার বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আজিকার দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ছাড়া অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে ব্যক্তিগত সঞ্চয় শিল্পে মূলধন সরবরাহ করে না বলিলেই চলে। ব্যক্তিগত যা-কিছু সঞ্চয় এই সকল দেশে বর্তমানে সম্ভব হয় তাহার মাধ্যম হইল জীবনবীমা প্রভৃতির ন্যায় চুক্তি (contractual saving)। ভারতে কিন্তু চুক্তির মাধ্যমেও সঞ্চয়ের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় নগণ্য। যে-মধ্যবিত্তশ্রেণী পূর্বে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অধিকাংশ সরবরাহ করিত, জাতীয় সম্পদের বণ্টন-পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে এই ক্ষমতা তাহাদের আজ চলিয়া গিয়াছে। পূর্বের তুলনায় আজ জাতীয় সম্পদের একটা মোটা অংশ গিয়া পড়িয়াছে কৃষিজীবী ও শিল্প-শ্রমিকদের হস্তে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর সঞ্চয়ের ক্ষমতা তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং ভারতে যে মূলধন-গঠনকার্যের প্রাথমিক পর্যায় অধিকতর সমস্যা-প্রপীড়িত থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য কি?

সাধারণের সঞ্চয় ছাড়াও আজ শিল্পগত সঞ্চয় পদে পদে ব্যাহত হইতেছে। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ, শিল্পের জাতীয়করণের ভীতি ও শিল্পের উপর করভার শিল্পোদ্যোগকে ব্যাহত করিতেছে। ফলে শিল্পপতিগণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা উভয়ই কমিয়া যাইতেছে।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা কমিয়াছে; কৃষিজীবী ও শিল্প-শ্রমিকদের ক্ষমতা বাড়িলেও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার উপর যুদ্ধোত্তর যুগে সংক্রামকভাবে ব্যাংক ফেল পড়া, বহু যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাওয়া, সম্প্রতি জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও বাধ্যতামূলক আমানত-ব্যবস্থার প্রবর্তন সাধারণকে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ ব্যাপারে বিশেষ সাবধানী করিয়া তুলিয়াছে।

২। বিনিয়োগের পরিমাণ আরও সামান্য

শিল্পপতিগণের যতটা বিনিয়োগের ক্ষমতা বর্তমান আছে তাহারও পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না ফটকাবাজার প্রভৃতির জন্য। এই সকলের সামগ্রিক ফল হইল এই যে, দেশের সকল সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগযোগ্য তহবিলে রূপান্তরিত হইতে পারিতেছে না।

Preliminary Estimate of National Income for 1961-62 at 1948-49 prices

বিনিয়োজিত অর্থে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের সুব্যবস্থাও ভারত আজ পর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। সেদিন পর্যন্ত সরকার মূল শিল্প-সংগঠনে কোন মনোযোগ দেয় নাই ; এবং শিল্পপতিগণ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিয়াই চলিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশ ছাড়া সমগ্র পৃথিবীতেই মূলধন-দ্রব্যের অভাবের জন্য বাহির হইতেও এইরূপ দ্রব্যাদি আনয়ন দ্বারা মূলধন-গঠনের সহায়ক ছিল না। এইজন্য ১৯৪৯-৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশন এই উক্তি করিয়াছিল যে, আমাদের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সমস্যার সহিত সংযুক্ত হইয়া শিল্পে মূলধন-দ্রব্যের অভাব আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই এই সমস্যা সুরু হইয়া বর্তমানে সম্পূর্ণ সংকটে পরিণত হইয়াছে। ফলে সরকারকে উন্নয়নকার্যের জন্য মূলধন-দ্রব্যের আমদানিতে বিশেষ বিচারবিবেচনা করিতে হইতেছে।

৩। বিনিয়োজিত অর্থে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থাও অ-পর্যাপ্ত

অবলম্বনীয় প্রতিবিধানসমূহ (Remedial Measures): প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে মূলধন-গঠনের সমস্যা অন্যতম দীর্ঘকালীন সমস্যা ; সুতরাং দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার ভিত্তিতেই ইহার সমাধানের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। প্রায় দুইশত বৎসরের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদীর শক্তির অধীনস্থ থাকার ফলে যে-সকল অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, স্বল্পকালীন ভিত্তিতে তাহাদের সমাধানের প্রচেষ্টা করিলেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। উপরন্তু, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা অতি কঠিন কার্য। এরূপ অর্থ-ব্যবস্থার সকল কার্যই সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে এখন এমন প্রতিবিধান নির্দেশ করা প্রয়োজন যে, উভয় প্রকার উদ্যোগই যেন সুসম্পাদিত হইয়া পরিকল্পনাকে সার্থকতায় রূপান্তরিত করে।

ইহা দীর্ঘকালীন সমস্যা

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিবিধান নির্দেশ করিতে হইবে

প্রথমে সঞ্চয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ লোকের নিজ উদ্যোগে সঞ্চয়বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ নাই। বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় জাতীয় আয় কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইলেও মূল্যবৃদ্ধির দরুন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঞ্চয়ের সুযোগের সম্প্রসারণ তদনুসারে ঘটিবে না। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষি ও অনুরূপ কর্মসমূহ হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৭·৫ ভাগ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যায়।* এই আয়বৃদ্ধির অনুপাতে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় নাই। কারণ, যে-শ্রেণীর আয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সঞ্চয়ের স্বভাব এখনও গড়িয়া

সাধারণের সঞ্চয়বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ নাই

* Review of the First Five Year Plan ৮ পৃষ্ঠা

উঠে নাই। তবে বর্তমানে ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রভৃতির আয়বৃদ্ধিজনিত সঞ্চয়ের ক্ষমতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং সাধারণের সাধারণ সঞ্চয় ও শেষোক্ত শ্রেণীর অতিরিক্ত সঞ্চয়ের উপযুক্ত বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর জন্য ব্যাংকের সুযোগসুবিধা (banking facilities) ও ব্যাংকিং স্বভাবের বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন অর্থসরবরাহকারী করপোরেশনের ন্যায় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইবে।

১। সুতরাং বিনিয়োগের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে

ব্যাংকের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি সাধারণের সঞ্চয়ের জন্য পর্যাপ্ত নহে। ইহার উপর স্বল্প পরিমাণের সঞ্চয়ের (small savings) জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দেখা গিয়াছে, সাধারণকে, বিশেষত গৃহকর্ত্রীদের, স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিলে এবং প্রাইজ বণ্ডের ন্যায় নূতন নূতন পন্থার উদ্ভাবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা যাহাতে তাহাদের অর্থ লইয়া ফটকা খেলা, আগাম ব্যবসায় (forward trading) ও অন্যান্য স্পেকুলেশনের কার্য না করে তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন পাস ও তাহাকে কঠোরতার সহিত কার্যকর করিতে হইবে।

২। স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিতে হইবে

৩। স্পেকুলেশন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে

বিনিয়োগবৃদ্ধির আর একটি পন্থা হইল মূল্যবান ধাতুর প্রতি আমাদের দেশের লোকের সাধারণ আকর্ষণকে হ্রাস করা। অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিবৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে ভারতে ৪০০০ কোটি টাকার মত শুধু স্বর্ণই সঞ্চিত আছে।* ইহার মধ্যে একটা মোটা অংশকে মূলধন-গঠনের কার্যে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে।

৪। সঞ্চিত মূল্যবান ধাতু কাজে লাগাইতে হইবে

ইহার পর মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প-সংগঠনের প্রতি নজর দিতে হইবে। আমদানি বাণিজ্যকে যথাসম্ভব উৎপাদনের দ্রব্য আমদানিতে নিয়োজিত করিতে হইবে।

৫। মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন ও আমদানির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে

উপসংহার: প্রতিবিধান সম্পর্কে বর্তমানে সরকার কতকটা উপরি-উক্ত নির্দেশিত পথেই চলিয়াছে। শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন (ICIC) জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (NIDC), পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সরকার অন্যান্যের মধ্যে মূলধন-গঠনেও সহায়তা করিতেছে। ব্যাংকের সুযোগসুবিধার প্রসারের দিকেও নজর দেওয়া হইয়াছে। সঞ্চিত স্বর্ণ উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োজিত করার জন্য 'স্বর্ণ বণ্ড' (Gold Bond) বিক্রয় করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে 'স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ' (Gold Control) আদেশও জারি করা হইয়াছে। স্বল্প সঞ্চয় হইতে সংগ্রহের পরিমাণও বিশেষ বাড়িয়া

* ১৯৬২ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখের বিবৃতি।

গিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে (১৯৫০-৫১ সাল) এই সূত্র হইতে বাৎসরিক সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটি টাকা; বর্তমানে (১৯৬১-৬২ সাল) ইহা ১০০ কোটি টাকার উপরে দাঁড়াইয়াছে। আশা করা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বিনিয়োগের হার মোটামুটি ন্যূনতমে বা মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪-১৫ ভাগে পৌছিবে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে উহা যথাক্রমে শতকরা ১৭-১৮ ভাগ ও ১৯-২০ ভাগে দাঁড়াইবে।* অতএব, কাম্য বিনিয়োগ-হারে পৌছিতে এখনও বেশ কিছুটা দেরী আছে।

অবলম্বিত প্রতিবিধান ও ভবিষ্যৎ মূলধন-গঠনের হার

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital): বৈদেশিক মূলধন 'বৈদেশিক সাহায্যে'রই (foreign aid) একটি রূপ। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বৈদেশিক সাহায্য আসে বিভিন্ন রূপে, যেমন বৈদেশিক ঋণ ও দান, কারিগরি সাহায্য, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ দ্বারা সাহায্য, শিল্প মূলধনে অংশগ্রহণ, ইত্যাদি।** এগুলির মধ্যে বৈদেশিক মূলধনই অন্যতম। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও আর্থিক উন্নয়নে, বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নয়নে, বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা লইয়া অতীতে বিশেষ বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। বলা যায়, এই বিতর্কের সমাপ্তি আজও ঘটে নাই। দেশে মূলধন-গঠন ও মূলধন সরবরাহের হার পর্যাপ্ত না হওয়ায় আজও আমরা বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভরশীল; কিন্তু নানা কারণে বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করা যাইতেছে না। সুতরাং বৈদেশিক মূলধনের সমস্যা রহিয়াই গিয়াছে। এই সমস্যার বর্তমান প্রকৃতি সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার পূর্বে বৈদেশিক মূলধনের সাধারণ সমস্যা—অর্থাৎ, ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়।

বৈদেশিক মূলধনের সমস্যা রহিয়াই গিয়াছে

বৈদেশিক মূলধনের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Foreign Capital): অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈদেশিক মূলধন অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকিতে পারে, শ্রমের যোগানও পরিমিত বা প্রয়োজনাধিক হইতে পারে, কিন্তু মূলধনের অভাবের দরুন শিল্পোন্নয়নের হার পর্যাপ্ত হইয়া উঠিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থ-ব্যবস্থার ইহাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক নার্কসের ভাষায় বলা যায়, "উন্নত দেশসমূহের তুলনায় তথাকথিত স্বল্পোন্নত দেশগুলি তাহাদের জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাতে মূলধন বিষয়ে

সুবিধা

---

* Third Five Year Plan ২৮ পৃষ্ঠা

** ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট 'ক' দেখ।

বিশেষ অভাবগ্রস্ত।"* বর্তমানের অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশ—যথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি একদিন এইরূপ অভাবগ্রস্তই ছিল। ফলে শিল্পোন্নয়নের আদিতে তাহাদিগকে বৈদেশিক মূলধন ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। ভারতেও রেলপথ নির্মাণ, সেচ-ব্যবস্থা, রোপণ শিল্পসমূহ (plantation industries), পাটকল শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রভৃতির মূলে আছে বৈদেশিক মূলধন। বস্তুত, শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বৈদেশিক মূলধনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মূলধন আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করে। বৈদেশিক মূলধনের সহায়তায় উৎপন্ন সম্পদের একাংশ যখন সুদ ও মুনাফা হিসাবে বিদেশে চলিয়া যায় তখন দেশে সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই প্রসংগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "শুধু যে উন্নয়নের হ্রাসবৃদ্ধির জন্যই বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা তাহা নহে, ইহা আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়েরও সহায়ক।"

তৃতীয়ত, বৈদেশিক মূলধন শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক ঝুঁকি (pioneering risk) বহন করে। ভারতে বৈদেশিক মূলধন রোপণ শিল্পসমূহ, কাঁচ শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় মুনাফার পরিবর্তে বহু ক্ষতি সহ্য করিয়া ইহাদের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছিল। ফলে এই সকল শিল্প আজ সুগঠিত হইতে পারিয়াছে।

চতুর্থত, বৈদেশিক মূলধনের সংগে অধিকাংশ সময়ে আসে উন্নত ধরনের বৈদেশিক শিল্পকৌশল (industrial know-how) ও সংগঠন। ইহার ফলে দেশে আধুনিক শিল্পকৌশলের বিস্তার ও শিল্প-সংগঠনের উন্নয়ন সাধিত হয়।

সুবিধার সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ, নিয়োগ ও মজুরি বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন করে, এবং শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা (lop-sidedness) দূর করিতে সহায়তা করে, শিল্পগত আবহাওয়ার (industrial atmosphere) সৃষ্টি করিয়া দেশীয় মূলধন ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করে; বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীনে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগ সম্প্রসারণের গতিকে ত্বরান্বিত করে।**

অসুবিধা

অপরদিকে আবার বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের অসুবিধাও আছে; এবং অনেক সময় এই অসুবিধার পরিমাণ সুবিধাকে ছাড়াইয়া গিয়া দেশকে বিপদগ্রস্ত করে। তাই বৈদেশিক মূলধন আহ্বান ও বিনিয়োগ ব্যাপারে অতি সতর্কতার সহিত চলিতে হইবে।

* Ragnar Nurkse, "Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries"

** P. C. Jain, *Foreign Capital for the Third Plan*

প্রথম বিপদ বৈদেশিক মূলধনের রাষ্ট্রনৈতিক রূপ লইয়া। সাধারণত বৈদেশিক মূলধনের সংগে আসে বৈদেশিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ। ক্রমে বিদেশীয়রা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। অর্থ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়ে। মিশর ও চীন দেশে এইরূপই ঘটিয়াছিল। ভারতেও বৈদেশিক পুঁজিপতিরা কায়েমী স্বার্থের (vested interests) সৃষ্টি করিয়া ভারতের মুক্তির পথের সবিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মূলধন আহ্বানের ফলে দেশ শিল্প-ব্যবস্থায় বিদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে পারে। এমনকি জাতীয় প্রতিরক্ষার দিক দিয়া অপরিহার্য মূল শিল্পগুলিও (basic industries) বিদেশীয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিতে পারে। এরূপ ঘটিলে দেশের স্বাধীনতা ও শিল্পোন্নয়ন উভয়ই ব্যাহত হইতে বাধ্য। ভারতের ক্ষেত্রে প্রথম ফিসক্যাল কমিশন তাহার রিপোর্টে বলিয়াছিল, রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হইবার ভয়ে অধিকাংশ ভারতীয় বৈদেশিক মূলধনের আমদানিকে সুনজরে দেখিত না।

তৃতীয়ত, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে শিল্পোন্নয়ন ঘটিলে এই শিল্পোন্নয়নের ফলে একটা মোটা অংশ মুনাফা ও পারিশ্রমিক হিসাবে বিদেশে চলিয়া যায়। উপরন্তু, বিদেশীয়রা শুধু মুনাফার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করিতে থাকে। ফলে, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনমত সংরক্ষিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অরণ্যসম্পদের বিচারহীন ধ্বংস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধনের 'অবদান'।

চতুর্থত, বৈদেশিক মূলধনের গুণ ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, ইহার সহিত আসে উন্নত বৈদেশিক শিল্পকৌশল, উন্নত পরিচালনা-ব্যবস্থা। কিন্তু দেখা যায়, বিদেশীয়রা এই শিল্পকৌশলের দ্বার দেশীয় লোকদের নিকট রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। পরিচালনা-ব্যবস্থাতেও তাহাদের অংশীদার করিয়া লয় না। পরাধীন ভারতে বিদেশী পুঁজি-পরিচালিত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই ভারতীয়দের প্রতি প্রভেদাত্মক ব্যবহার করা হইত। শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা তখন নিয়ম অপেক্ষা ব্যতিক্রম বলিয়াই বিবেচিত হইত। ভারতীয়গণকে শিল্পজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে নানাভাবে ইহা হইতে বঞ্চিত রাখাই ছিল বিদেশীয় পুঁজিপতিগণের নীতি। উপরন্তু, উন্নত শিল্পকৌশল আমদানি করিবার জন্য বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান করিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় না। সোবিয়েত ইউনিয়ন শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে বৈদেশিক শিল্পকৌশল আমদানি করিয়াছিল, কিন্তু বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান করে নাই। এই কারণে প্রথম ফিসক্যাল কমিশন সুপারিশ করিয়াছিল যে, বিদেশ হইতে যেন শুধু শিল্পকৌশলই আমদানি করা হয়।

বৈদেশিক মূলধনের উপরি-উক্ত যে-বিরুদ্ধ সমালোচনা তাহা এই প্রকার মূলধনের সহিত নিয়ন্ত্রণ জড়িত থাকিলেই প্রযোজ্য। অন্যভাবে বলা যায়, সমালোচনা বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে নহে, বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণবিহীন বৈদেশিক মূলধন যদি পাওয়া যায় এবং যদি আভ্যন্তরীণ মূলধন সরবরাহের হার পর্যাপ্ত না হয় তবে বৈদেশিক মূলধন আমদানি করিতে আপত্তি থাকিবার বিশেষ কোন কারণ থাকিতে পারে না। মুনাফা ও পারিশ্রমিক হিসাবে দেশের বাৎসরিক আয়ের একটি অংশ বাহিরে চলিয়া যাইবে সত্য; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ভারতের উল্লেখ করিয়া বলা যায়, পূর্বে হয়ত এদেশে বৈদেশিক মূলধনের আমন্ত্রণ ও নিয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানের রাষ্ট্রনৈতিক স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মূলধনের নিয়োগকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন বলিয়াই মনে করা হয়।*

উপসংহার

ভারতে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাপ (Estimates of Foreign Capital invested in India):

বৈদেশিক বিনিয়োগের জরিপকার্য

স্বাধীনতার পর এই দেশে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাপ করিবার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ফলে, রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের ভিত্তিতে বৈদেশিক মূলধনের পুংখানুপুংখ জরিপকার্য সম্পাদন করে। ইহার পর হইতে বৈদেশিক বিনিয়োগের নিয়মিত হিসাব করিয়া আসা হইতেছে।

এই বিভিন্ন হিসাবের ফলে দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসাবাণিজ্যে ব্যাংক-ব্যবসায় বাদে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ২৫৬ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৬৯১ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৬১ সালের প্রাথমিক হিসাব হইতে জানা যায় যে ঐ বৎসরের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৬১ কোটি টাকা হয়।** এই বিনিয়োগবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হইল বিশ্ব ব্যাংক (IBRD) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও মার্কিন উন্নয়ন ঋণ তহবিল (DLF) প্রভৃতি হইতে গৃহীত ঋণ। ১৯৪৮ সালে ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসাবাণিজ্য বিশ্ব ব্যাংক হইতে কোন ঋণ পায় নাই। ১৯৬০ সালে ঐ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ কোটি টাকায়।

প্রথম জরিপ অনুসারে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন তারিখে ভারতের 'ব্যবসা-বাণিজ্যে' মোট বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের ২৫৬ কোটি টাকার মধ্যে ব্রিটেনের অংশ ছিল ২০৬ কোটি টাকা বা মোট বিনিয়োজিত অর্থের শতকরা

* P.C. Jain, *Foreign Capital for the Third Plan*

** Reserve Bank Bulletin, October 1962

৮০ ভাগের কাছাকাছি। ইহার পর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট ১১ কোটি টাকা। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাবে দেখা যায় যে মোট ৬৯১ কোটি টাকার মধ্যে ব্রিটেনের বিনিয়োগের পরিমাণ মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশে বা ৪৪৬ কোটি টাকায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের পরিমাণ ১১৩ কোটি টাকায় বা শতকরা ১৫ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ও দেশগত শ্রেণীবিভাগ মোটামুটিভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নে ছকটি দেওয়া হইল :

বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ও শ্রেণীবিভাগ

ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ (হিসাব কোটি টাকায়)

	ব্রিটেন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	অন্যান্য দেশ	বিশ্ব ব্যাংক	মোট
১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন	২০৬	১১	৩৯	—	২৫৬
১৯৫৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর	৩৭৭	৪০	৩৬	৩	৪৫৬
১৯৬০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর	৪৪৬	১১৩	৫৪	৭৮	৬৯১

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্ব ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য দেশের বিনিয়োগের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই অন্যান্য দেশের মধ্যে পশ্চিম জার্মেনীর বিনিয়োগের পরিমাণই সর্বাধিক, কিন্তু উহাও অকিঞ্চিৎকর।

বিনিয়োজিত মূলধনের বাজার-দাম

এই প্রসংগে একটি স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল যে, উক্ত সকল অংকই খাতায় লিখিত মূল্যে (book value) নির্ধারিত। উহাদের মধ্যে যে অংশ ঝুঁকি-মূলধন (equity capital) তাহার বাজার-দাম অনেক বেশী। অনুমান করা হইয়াছিল, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে বিনিয়োজিত ২১৬ কোটি টাকার বাজার-দাম ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি হইবে। অনুরূপভাবে, ১৯৬০ সাল অবধি বিনিয়োজিত ৬১৩ কোটি টাকা ঝুঁকি-মূলধনের (মোট ৬৯১ কোটি টাকা হইতে ৭৮ কোটি টাকা ঋণ-মূলধন বাদ দিয়া) বাজার-দাম ১ হাজার কোটি টাকার উপর হইবে।

ব্যবসাবাণিজ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়: নিয়ন্ত্রণবিহীন বিনিয়োগ (portfolio type of investment) এবং প্রত্যক্ষ বা নিয়ন্ত্রণসহ বিনিয়োগ (direct type of investment)।

বৈদেশিক মূলধন দুই প্রকারের—নিয়ন্ত্রণ-বিহীন ও প্রত্যক্ষ

সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণবিহীন বিনিয়োগের উদাহরণ। বিদেশী পুঁজিপতি এগুলি ক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করে না। অপরদিকে বিদেশী ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন হইল প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ শেয়ার (equity shares) ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ এই দুই-এর মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে। এই প্রকার শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা বিদেশী পুঁজিপতি যদি নিয়ন্ত্রণক্ষমতা লাভ করে তবে ইহা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বলিয়া পরিগণিত হইবে। নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ না করিলে ইহা নিয়ন্ত্রণবিহীন বিনিয়োগের পর্যায়ভুক্ত হইবে। বিশ্ব ব্যাংক প্রভৃতি হইতে ঋণও নিয়ন্ত্রণবিহীন বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের বেসরকারী মোট বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধন ৬৯১ কোটি টাকার মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫০২ কোটি টাকা বা শতকরা ৭৩ ভাগ; বাকী ১৮৯ কোটি টাকা বা শতকরা ২৭ ভাগ ছিল নিয়ন্ত্রণবিহীন বিনিয়োগ।

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অধিকাংশই উৎপাদন-ক্ষেত্রে (manufacturing sector) নিয়োজিত। নিম্নে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে বৈদেশিক বিনিময়ের বণ্টন-প্রকৃতি দেওয়া গেল:

ক্ষেত্রানুসারে বৈদেশিক বিনিয়োগ (হিসাব কোটি টাকায়)

	১৯৪৮ সাল ৩০শে জুন	১৯৫৬ সাল ৩১শে ডিসেম্বর	১৯৬০ সাল ৩১শে ডিসেম্বর
১। উৎপাদন শিল্প (Manufacturing)	৯৩	২৩৮	৪৪২
২। বাণিজ্য (Trading)	৪৩	২৭	৩০
৩। রোপণ শিল্প (Plantations)	৫২	৮৭	৯৯
৪। অর্থসরবরাহ (Financial Business)	৭	২৭	২৬
৫। পরিবহণ (Transport)	৩১	৪০	৫৪
৬। খনিজ (Mining)	৭	১০	১৪
৭। বিবিধ (Miscl.)	২৩	২৭	২৬
মোট	২৫৬	৪৫৬	৬৯১

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার ছকটির পরিশিষ্ট হিসাবে বলা প্রয়োজন যে উৎপাদন-ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আবার পাটকল ও পেট্রোলিয়াম শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণই অধিক এবং রোপণ শিল্পসমূহের মধ্যে চা-বাগানই প্রথম স্থানাধিকার করে।

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি (Policy of the Government of India regarding Foreign Capital): দেখা গেল যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের বেসরকারী ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে (private sector) বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ৪৩৫ কোটি টাকার (৬৯১ – ২৫৬ = ৪৩৫) মত বৃদ্ধি পাইয়াছে।* মাত্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়েই বৃদ্ধির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা বলিয়া প্রাথমিকভাবে হিসাব করা হইয়াছে।** এখন প্রশ্ন হইল, এই বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় কি না? বাঞ্ছনীয় হইলে পর্যাপ্ত কি না? এবং ইহা কি কোন বিশেষ নীতি অনুসরণের ফল? প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইলে ঐতিহাসিক পরিক্রমায় বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির পর্যালোচনা করিতে হয়।

ভারতে বৈদেশিক মূলধনের বৃদ্ধি কাম্য এবং পর্যাপ্ত কি না

বলা যায়, ১৯২১ সালের পূর্বে—অর্থাৎ, প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হইবার পূর্বে ভারতে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা সম্বন্ধে নীতি-নির্ধারণের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। সাধারণ ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি—যথা, কাঁচামাল ও শ্রমিকের প্রাচুর্য, আভ্যন্তরীণ বিরাট বাজার অথচ আধুনিক ব্যবসায় সংগঠনের অভাব প্রভৃতি ইংরাজ ও স্কটিশ বিনিয়োগকারিগণকে স্বতই এদেশে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল; এবং মূলত তাহাদের মূলধন ও উদ্যোগেই এদেশের আধুনিক শিল্পসমূহের প্রাথমিক সংগঠন সম্ভব হইয়াছিল। পরে ভারতীয় মূলধন ও উদ্যোগ শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করিতে থাকিলে দেশীয় ও বৈদেশিক মূলধনের মধ্যে এক স্বাভাবিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়; এবং ফলে প্রয়োজন হয় বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে সরকারী নীতি নির্ধারণ ও ঘোষণা করিবার। ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশন প্রথম বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে নীতি ঘোষণার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করে। কমিশন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই অভিমত প্রদান করে যে, ভারতীয়গণ বৈদেশিক মূলধনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিলেও দ্রুত শিল্পায়নের

ঐতিহাসিক পরিক্রমা:

১। ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশন

---

* সরকারী খাতে বৈদেশিক মূলধনের আমদানির আলোচনা এখন করা হইল না। ইহা মুদ্রা ও বিনিময় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রসংগে করা হইবে। তবে প্রয়োজনীয় বলিয়া এই অধ্যায়ে স্থানে স্থানে উহার উল্লেখ দেখা যাইবে।

** Foreign Investment in India 1960; Reserve Bank Bulletin, October 1962

জন্য ইহার আমদানিতে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করা চলিবে না। কমিশনের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল অবশ্য ইহাতে আপত্তি করিয়া তিনটি সুস্পষ্ট সর্তের নির্দেশ করে যাহা পূরিত হইলে তবেই ভারতের বৈদেশিক মূলধন অনুপ্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমত, এইরূপ সমস্ত বৈদেশিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে ভারতে সমিতিবদ্ধ (incorporated) এবং ভারতীয় টাকার মূলধন অনুমোদন করিয়া ভারতে রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, এইরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতে এক যুক্তিসংগতঅংশ ভারতীয়গণের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। তৃতীয়ত, এই সকল প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় শিক্ষানবীসীদিগকে (apprentices) সংগত পরিমাণে শিক্ষার সুযোগসুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

২। ১৯২৫ সালের বৈদেশিক মূলধন কমিটি

১৯২৫ সালের বৈদেশিক মূলধন কমিটি (External Capital Committee) ফিসক্যাল কমিশনের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের উপরি-উক্ত অভিমত সমর্থন করিয়া সুপারিশ করে যে, ভারতীয় শিক্ষার্থী-দিগকে শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগসুবিধা না দিলে ঐ সকল বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ সংরক্ষণ (direct protection) বা বাউন্টি (bounty) প্রদান করা হইবে না।

দুঃখের বিষয় উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহের কোনটিই ভারতের তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে নাই। অপরদিকে, বরং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে (Government of India Act, 1935) ভারতে ব্রিটিশ-প্রজাদের (British Subjects) মূলধন ও স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতমূলক ধারাই সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল।

৩। ১৯৪৬ সালের পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ড

ইহার পর ১৯৪৬ সালে নিযুক্ত পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ড (Planning Advisory Board) এই অভিমত প্রকাশ করে যে সাধারণভাবে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধনকে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত হইবে না। "মূল শিল্পগুলি ত বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবেই, এমনকি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বাধা সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।"*

৪। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সর্তাবলী

এই বিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ডকেও ছাড়াইয়া যায়। ইহাতে ভারতে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের উপর কঠিন সর্তাবলী আরোপ করে। কয়েকটি সর্ত হইল : সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (public sector) ছাড়া জাতীয় পরিকল্পনার জন্য কোন অংশে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত হইবে না ; কোন মূল বা অপরিহার্য শিল্পে বৈদেশিক মূলধন থাকিতে পারিবে না। এই প্রকার মূলধন বর্তমানে যে-সকল বিশেষ সুবিধা (concessions) ভোগ করিতেছে তাহার অবসান অনতি-

* Report of the Planning Advisory Board ১৭ পৃষ্ঠা

বিলম্বেই ঘটাইতে হইবে। সরকারের অনুমতি এবং পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষের (Planning Authority) নির্দিষ্ট সর্তাধীন ব্যতীত বৈদেশিক মূলধন কোন প্রতিষ্ঠানেই বিনিয়োজিত হইতে পারিবে না ; বর্তমানে অপরিহার্য শিল্প, খনিজ শিল্প প্রভৃতিতে বিনিয়োজিত সমস্ত বৈদেশিক মূলধনকে যথাসম্ভব শীঘ্র রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে, ইত্যাদি।*

৫। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির এই অভিমত ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় সমর্থন করা হয়। শিল্পনীতিতে বলা হয়, দেশের শিল্পোন্নয়নের বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হইলেও মাত্র নির্দিষ্ট সর্তাধীনে এই প্রকার মূলধনকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়তা করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

৬। দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন (১৯৪৯-৫০) বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও ইহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। কমিশনের মতে, সরকারী উদ্যোগের যে-ক্ষেত্রকে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি পরিহার করিবার জন্য গড়িয়া তোলা হইতেছে, বেসরকারী উদ্যোগের যে-ক্ষেত্রে নূতন উৎপাদনের পথ প্রস্তুত করা হইতেছে এবং যে-ক্ষেত্রে দেশীয় মূলধন ও সংগঠন পর্যাপ্ত নহে—মাত্র সেই সেই ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধনকে সক্রিয় থাকিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। উপরন্তু, যেখানে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজন সেখানে এই প্রকার মূলধন বিশ্ব ব্যাংক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-আমদানি ব্যাংক (Export-Import Bank) প্রভৃতির ন্যায় প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ-পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হইবে। যেখানে মূলধন ছাড়া শিল্পজ্ঞান আমদানিরও প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে প্রত্যক্ষ মূলধন আমদানি করা যাইতে পারে—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ বা নিয়ন্ত্রণসহ মূলধন (direct type of investment) আমন্ত্রণ ও আমদানি ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে পরিবর্তিত

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবেশের উপর এরূপ সর্তাবলী আরোপ করিলেও মূলত ইহা একপ্রকার মূলধনকে আহ্বান করিতেই উপদেশ দেয়। কমিশন রিপোর্টের এই প্রসংগ এই বলিয়া শেষ করে যে, সরকারী নীতি এরূপভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত যেন প্রবেশেচ্ছু বৈদেশিক মূলধনের আগমনের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্ট ও সংরক্ষিত হয়।

বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে সরকারের এইরূপ কতক পরিমাণে পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগি ছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিরই ফল। ইতিমধ্যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছিল যে, আভ্যন্তরীণ মূলধন-গঠন ও যোগান

* **Report of the National Planning Committee ৪০-৪১ পৃষ্ঠা**

প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া ১৯৪৯ সালের ৬ই জুন তারিখে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, "আমাদের অর্থ-ব্যবস্থা বিদেশীয়ের করতলগত থাকার জন্যই অতীতে জাতীয় স্বার্থে বৈদেশিক মূলধনের পরিধি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইবে জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া সর্বাধিক পরিমাণে সহায়ক বলিয়া বিবেচিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক মূলধনের ব্যবহার।" ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বলেন, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণভার ভারতীয়গণের হস্তেই থাকিবে তবুও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদেশীয়দের হস্তেও এই নিয়ন্ত্রণভার সমর্পিত রাখা যাইতে পারে। যদিও উচ্চ পদসমূহে ভারতীয়গণের নিয়োগই হইবে সাধারণ নীতি—তবুও প্রয়োজনবোধে এই সকল পদে বিদেশীয়দের নিয়োগে সরকার আপত্তি করিবে না। উপসংহারে শ্রীনেহেরু বলেন, "ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নে গঠন ও সহযোগিতামূলক ভূমিকায় বৈদেশিক মূলধনের দান ভারত সরকার সানন্দেই গ্রহণ করিবে।"

৭। ১৯৪৯ সালে প্রধান মন্ত্রীর উক্তি

সরকারের অন্যান্য মুখপাত্র, বিশেষ করিয়া অর্থমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী, বারংবার প্রধান মন্ত্রীর উপরি-উক্ত আশ্বাসবাণীর প্রতিধ্বনি করেন।

পরিকল্পনা কমিশন ইহারই অনুসরণ করিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদেশিক মূলধনকে সাদর আহ্বান জানায়। পরিকল্পনায় বলা হয়, "বর্তমান অবস্থায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মূলধনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। শিল্পকৌশল ও উৎপাদনের দ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত করিবে বলিয়া বৈদেশিক মূলধনের বাধাবিহীন আগমনকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো যাইতে পারে। সরকার ত বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে নিম্নলিখিত আশ্বাসবাণী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছে—যথা, (ক) সাধারণ শিল্পনীতির প্রয়োগে বৈদেশিক ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন প্রভেদাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না; (খ) দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় অবস্থার (foreign exchange position) সহিত সংগতিপূর্ণভাবে বিদেশীয় পুঁজিপতিদিগকে তাঁহাদের মুনাফা প্রেরণ করিতে এবং মূলধন ফিরাইয়া লইয়া যাইতে সকল প্রকার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করা হইবে; (গ) এই সকল প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

৮। পরিকল্পনা কমিশনের আহ্বান

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায়

* First Five Year Plan ৪৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা

বলা হয় যে, বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে উক্ত সরকারী নীতির কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই

বর্তমান নীতি (Present Policy) : এইভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক মূলধনকে কতকটা সাদর আহ্বান জানানো হইলেও বৈদেশিক ঝুঁকি-মূলধন (foreign equity capital) সম্বন্ধে সন্দিগ্ধতার অবসান ঘটে নাই। বৈদেশিক মূলধন আহ্বান করা হইলেও অনিয়মিতভাবে বৈদেশিক মূলধনকে যে ভারতে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না, এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল, সকল ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধন আভ্যন্তরীণ মূলধনের পরিপূরক (supplementary) হইবে, পরিবর্ত (substitutes) নহে। যে-ক্ষেত্রে দেশীয় মূলধন, উদ্যোগ ও শিল্পকৌশলের অভাবের দরুন উৎপাদন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্যকভাবে পরিচালিত হইতেছে না অথবা নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে না অথবা বর্তমান শিল্পগুলি দেশের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না—সে-ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সর্তে বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান করিয়া আনা যাইতে পারে। সর্তটি হইল "নীতি হিসাবে মালিকানা এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের অধিকাংশ পরিমাণ থাকিবে ভারতীয়গণের হস্তে।" এই দিক দিয়া ঝুঁকি-মূলধন অপেক্ষা ঋণ-মূলধনই (loan capital) অধিক কাম্য বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু ঋণ-মূলধন যে পর্যাপ্ত হইতে পারে না এবং পরিশোধ ও সুদ প্রদানের দিক দিয়া একটা সীমা অতিক্রম করিলেই ঋণ-মূলধন যে বিশেষ অসুবিধাজনক তাহা অনুভূত হইতে বিলম্ব হয় নাই। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দিকে বৈদেশিক ঝুঁকি-মূলধন সম্বন্ধে সরকারী নীতির পুনরায় বিচারবিবেচনা করা হয় এবং পরিমার্জিত নীতি ঘোষিত হয় তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতেই—১৯৬১ সালের মে মাসে।

তৃতীয় পরিকল্পনার পরিমার্জিত নীতি :

এই পরিমার্জিত নীতি অনুসারে বৈদেশিক ঝুঁকি-মূলধন আনয়নের সকল সম্ভাব্য প্রচেষ্টাই করা হইবে। প্রথমত, এই উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মূলধন-নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্সের জন্য একটিমাত্র সংস্থা রাখা হইবে। ফলে সংগঠকগণকে বিভিন্ন সরকারী বিভাগে ছুটাছুটি করিতে বা দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না।

দ্বিতীয়ত, সরকারী শিল্পনীতির প্রথম তালিকাভুক্ত ১৭টি শিল্পে প্রয়োজন হইলে বৈদেশিক বেসরকারী মূলধন বিনিয়োগ করিতে দেওয়া হইবে।

তৃতীয়ত, যদিও সাধারণ ক্ষেত্রে অধিকাংশ শেয়ার থাকিবে ভারতীয়গণের হস্তে, তবুও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১-৬২ সালে ৪৪০টি চুক্তির ক্ষেত্রে মাত্র ১২টি ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম ঘটিতে দেওয়া হইয়াছে।**

* ২৮৮ পৃষ্ঠা দেখ।

** ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে অর্থমন্ত্রীর বিবৃতি।

চতুর্থত, করের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধনের আগমনের পথে কিছু কিছু প্রতিবন্ধক ইতিমধ্যেই দূর করা হইয়াছে। 'রয়্যালটি'র (royalty) উপর যে সর্বাধিক ৬৩% আয়কর ও অতিরিক্ত করের (super tax) হার ছিল তাহা কমাইয়া ৫০% করা হইয়াছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ বৈদেশিক ও দেশী কোম্পানীর মধ্যে করহারের যে পার্থক্য ছিল তাহা দূর করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া ভারতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য বিতরণ করিবার জন্য এবং ভারতীয়গণকে বৈদেশিক মূলধন প্রাপ্তিতে সহায়তা করিবার জন্য ১৯৬০ সালেই যে বিনিয়োগ-কেন্দ্র (The Indian Investment Centre) খোলা হইয়াছে তাহাকে আরও কাজে লাগানো হইবে।

এইভাবে বৈদেশিক ঝুঁকি-মূলধন আনয়নের সবিশেষ প্রচেষ্টা করা হইবে।

উপসংহার: তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫৭৫০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই প্রয়োজন মিটাইতে হইলে ৩৭০০ কোটি টাকার মত বা দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা ৬৫০ কোটি টাকা অধিক রপ্তানির প্রয়োজন হইবে। অনেকের মতে ইহা সম্ভব হইবে না। অতএব, বৈদেশিক ঝুঁকি-মূলধন যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আসে তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে কর-ব্যবস্থা ও সরকারী শ্রমনীতির আরও কিছু পরিবর্তনসাধন করিবার নির্দেশও দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the traditional problem of Industrial Finance in India. What steps have been taken to deal with it?

[ইংগিত: উত্তর হিসাবে ভারতের শিল্প-অর্থ করপোরেশন ও রাজ্য অর্থ সরবরাহকারী করপোরেশন-সমূহের কার্যাবলী বর্ণনা কর।...৩০৮-৩০৯, ৩১০-৩১১ এবং ৩১৪ পৃষ্ঠা]

2. Describe the organisation and functions of the Industrial Finance Corporation of India and comment upon its working. (C. U. B. A. 1955, '59; B. Com. 1952, '56, '62; B. Com. (P.I) 1963) (৩১০-৩১৩ পৃষ্ঠা)

3. Examine the main financial requirements of large-scale industries in India. What part has been played by the Industrial Finance Corporation in meeting these requirements? (C. U. B. A. 1961) (৩০৬-৩০৭ এবং ৩১১-৩১৩ পৃষ্ঠা)

4. Describe the recent problem of Industrial Finance and discuss the Governmental attempt for solving it.

[ইংগিত: ভারতের শিল্পগত মূলধনের সাম্প্রতিক সমস্যা হইল সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে প্রতিযোগিতার সমস্যা। মূলধনের অপ্রতুলতার সমস্যাও নূতন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনায়। করনীতির পরিবর্তন এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংগতির অবস্থা বিশেষ মন্দা হওয়ার জন্য এই অপ্রতুলতার সমস্যা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রপীড়িত করিতেছে এবং সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে।

সমস্যার সমাধান হিসাবে প্রথম সরকারী প্রচেষ্টা হইল শ্রফ্ কমিটি নিয়োগ। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইল জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন এবং শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দ্বিতীয়

পরিকল্পনায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইহারা পর্যাপ্ত প্রতিবিধান নহে। সুতরাং অন্যান্য পন্থাও অবলম্বনের প্রয়োজন হইতে পারে।...৩১৫-৩১৮ পৃষ্ঠা]

5. Give an account of the special agencies that have been set up in India after World War II for providing long-term finance to private industry.

(C. U. B. A. 1958, '59 ; B. Com. 1957, '58, '59)

(৩০৯-৩১১, ৩১৪-৩১৫ এবং ৩১৮-৩২১ পৃষ্ঠা)

6. Give a critical account of the working of the institutions set up in India for long-term financing of industries.

(C. U. B. Com. 1961) (৩০৯-৩১১, ৩১৪-৩১৫ এবং ৩১৮-৩২১ পৃষ্ঠা)

7. Consider the financial problems of small and medium scale industries in India and discuss the measures that have been adopted in recent years to solve these problems. (C. U. B. A. 1960 ; B. Com 1960)

[ইংগিত : ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পসমূহের অর্থসংগ্রহের সমস্যা দূর করিবার জন্য রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশনসমূহের ও পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, শিল্পে রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্যের নিয়মাবলী সহজ করা হইয়াছে, পাইলট স্কীম, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক হইতে ঋণ প্রভৃতির ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। শিল্প-অর্থ করপোরেশন প্রভৃতিও বর্তমানে এই ঋণ প্রদানে অগ্রসর হইয়াছে। ...২৩৪ এবং ৩২১-৩২৪ পৃষ্ঠা]

8. Give a critical estimate of the activities of the principal agencies of the supply of finance to large-scale industries in india.

(B. U. (O) 1961, '62) (৩১০-৩১৩ এবং ৩১৮-৩২১ পৃষ্ঠা)

9. Indicate the problem of Capital Formation in India. What remedial measures would you suggest ? (৩২৫-৩২৮ পৃষ্ঠা)

10. Examine the case for and against encouraging the flow of Foreign Capital into India under existing circumstances.

(C. U. B. A. 1961 ; B. U. 1961) (৩২৯-৩৩২ পৃষ্ঠা)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শিল্পগত পরিচালনা

(Industrial Management)

বেসরকারী ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে পৃথক শিল্প-পরিচালনার ব্যবস্থা

ভারতের বর্তমান মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় (Mixed Economy) শিল্পক্ষেত্র দুইটি অংশে বিভক্ত। একটি হইতেছে বেসরকারী উদ্যোগের (Private Sector) ক্ষেত্র, এবং অপরটি হইতেছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের (Public Sector) ক্ষেত্র। স্বতই এই দুইটি উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প-পরিচালনার ব্যবস্থা একরূপ হইতে পারে না। উভয় ক্ষেত্রের শিল্প-পরিচালনা ব্যবস্থা পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পগত পরিচালনা (Industrial Management in the Private Sector) : সেদিন পর্যন্ত ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থাই ছিল ভারতের শিল্প-পরিচালনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বেসরকারী ক্ষেত্রের বৃহদায়তন শিল্পগুলি যৌথ মূলধনের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও উহাদের দৈনন্দিন পরিচালনার ভার সাধারণত ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর হস্তেই ন্যস্ত থাকিত না—ন্যস্ত থাকিত 'ম্যানেজিং এজেন্টস্' নামে অভিহিত এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের হস্তে। বর্তমানে অবশ্য কোম্পানী আইনের (Companies Act) বিবিধ সংশোধনের ফলে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার প্রাধান্য কমিয়াছে, কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের (Secretaries and Treasurers) সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ, উহাদের সংগঠন পদ্ধতি, কার্যাবলী প্রভৃতির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতে বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পগত পরিচালনার বৈশিষ্ট্য

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা (The Managing Agency System) : ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার উদ্ভব হয় গত শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইহার উদ্ভবের কারণ ঐতিহাসিক। ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ যখন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এ-দেশে মূলধন নিয়োগ সুরু করেন তখন তাঁহারা একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সমস্যাটি হইল পরিচালনার সমস্যা। বিদেশস্থ তাঁহাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা কাহারা করিবে? স্বদেশ হইতে মূলধন প্রেরণ করা যায়, শিল্প-সংগঠনের ব্যবস্থা করা যায়—কিন্তু দৈনন্দিন পরিচালনাকার্য ত কাম্যভাবে সম্পাদন করা যায় না। ফলে এই কার্য গিয়া পড়িল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূতপূর্ব কর্মচারিগণ দ্বারা সংগঠিত 'এজেন্সী হাউস' (Agency House) নামে অভিহিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হস্তে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনাকার্য সম্পাদন করিতে করিতে ক্রমে মূলধন সরবরাহের দায়িত্বও গ্রহণ করে। শেষোক্ত দায়িত্ব পালন তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, কারণ তাহারা ঐ সময় ব্যাংক-ব্যবসায়েও নিযুক্ত ছিল। এই 'এজেন্সী হাউস' কথা হইতেই 'ম্যানেজিং এজেন্সী' কথাটির উৎপত্তি। সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণ স্বীয় উদ্যোগে নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া নিজেদের এজেন্সীকার্যের পরিধি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, তাঁহারা তাঁহাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে নিজেদেরই নিয়োগ করেন। ক্রমে মূলধন, উদ্যোগ ও সুযোগ্য পরিচালকের অভাবে প্রপীড়িত ভারতীয় শিল্পপতিগণও এই ব্যবস্থার মোহে আকর্ষিত হইয়া

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার উদ্ভব

ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থায় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার প্রসার

পড়েন ; এবং অবশেষে ইহা ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থায় একপ্রকার বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করে।

সংগঠন ও কার্যাবলী (Organisation and Functions) : ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানসমূহ আদিতে অংশীদারী কারবার (Partnership) এবং ঘরোয়া যৌথ ব্যবসায়ের (Private Limited Companies) ভিত্তিতে গঠিত হয় ; পরে উহাদের অধিকাংশই অবশ্য সাধারণ যৌথ কোম্পানীতে (Public Limited Companies) পরিণত হয়। বর্তমানে প্রখ্যাত এজেন্সী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোম্পানী (Andrew Yule & Co.), ম্যাকনীল বেরী (Macneill & Barry Ltd.), মার্টিন বার্ণ (Martin Burn Ltd.), শ ওয়ালেস (Shaw Wallace & Co. Ltd.) প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পারা যায়।

সংগঠন

অতীতে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান নূতন শিল্পের পথিকৃৎ হিসাবে কার্য রিয়াছে। কোন নূতন শিল্প স্থাপন সম্ভব এবং কাম্য কি না, সে-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ইহা শিল্প-সংগঠনে অগ্রণী হইয়াছে। ভারতের পাটকল শিল্প, চা-বাগান শিল্প এবং কয়লাখনি শিল্পের পথপ্রদর্শক হইল ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হিসাবে দৈনন্দিন কার্যের অধিকাংশও সম্পাদন করেন—যথা, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা, কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগ করা, উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। অন্যান্য দেশে এই সকল কার্য সম্পাদিত হয় বেতনভোগী ম্যানেজার বা মুখ্য পরিচালক (Managing Director) দ্বারা। তৃতীয়ত, শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে মূলধন সরবরাহ করাও ছিল ম্যানেজিং এজেন্টের অন্যতম মুখ্য কর্তব্য। এই মূলধন স্বল্প ও দীর্ঘ—উভয়কালীন ভিত্তিতেই সরবরাহ করা হইত। এজেন্সী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ-কালীন বা স্থায়ী মূলধন সরবরাহ করিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া এবং দীর্ঘকালীন ঋণদান করিয়া। তাহারা স্বল্পকালীন মূলধন সরবরাহ করিত হয় নিজস্ব তহবিল হইতে না-হয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণদানের জামিন হইয়া। এই মূলধন সরবরাহের ভূমিকা এখনও লুপ্ত হয় নাই।*

কার্যাবলী

সংক্ষিপ্তসার হিসাব বলিতে পারা যায়, শিল্প-সংগঠকের (entrepreneurs) যাহা কাজ এ-দেশে ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাহাই সম্পাদন করিতেন। কি উৎপাদন হইবে, কোথায় উৎপাদন করা হইবে এবং কিভাবে উৎপাদন করা হইবে—শিল্প-প্রতিষ্ঠানের হইয়া এই তিনটি মৌলিক বিষয় নির্ধারণ করিত পরিচালকমণ্ডলী নহে, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান। উৎপাদনের পর বিক্রয়-ব্যবস্থাও করিত এই প্রতিষ্ঠান। বণ্টনের (distribution) ভারও ছিল একরূপ

* The Managing Agency System, National Council of Applied Economic Research

ইহার হস্তেই ন্যস্ত। এখনও যেখানে যেখানে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে সেখানে ম্যানেজিং এজেণ্টগণের এইরূপ ভূমিকাই দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার মূল্যায়ন (An Evaluation of the Managing Agency System) : ভারতের শিল্পোন্নয়নে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভূমিকার বর্ণনা ১৯৪৯-৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশন এইভাবে করিয়াছে: বিগত ৭৫ বৎসর ধরিয়া ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা ভারতীয় শিল্পসমূহকে যে-সেবা করিয়াছে তাহা অতুলনীয়। শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে যখন উদ্যোগ বা মূলধন—কোনটিরই প্রাচুর্য ছিল না তখন ম্যানেজিং এজেণ্টগণ উভয়ই সরবরাহ করিয়াছিলেন; এবং ভারতের তুলাবস্ত্র শিল্প, পাটকল শিল্প, ইস্পাত শিল্প প্রভৃতির ন্যায় সুসংগঠিত শিল্প তাহাদের বর্তমান অবস্থার জন্য বহুসংখ্যক প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের গঠনোদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানের নিকট ঋণী।

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন কর্তৃক এই প্রথার ভূমিকা বর্ণনা

অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট বলেন, অতীতে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। অগ্রণী হইয়া শিল্প-সংগঠন করা ছাড়াও তাঁহারা মন্দা বাজারের সময় বহু শিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।* বস্তুত, তুলাবস্ত্র ও পাটকল শিল্প প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিলুপ্তই হইত, যদি-না তাহাদের ক্ষতি ম্যানেজিং এজেণ্টগণ নিজেরা বহন করিতেন।

গুণ: শিল্প সংগঠন ও শিল্প সংরক্ষণ

তৃতীয়ত, মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভূমিকা পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হয়। যে-দেশে মূলধন-বাজার সুসংগঠিত নহে, যে-দেশে মূলধনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হইল সাধারণ সন্দিগ্ধতা সে-দেশে ম্যানেজিং এজেন্সী পদ্ধতির ভূমিকা লঘু করিয়া কোনমতেই দেখা যায় না। প্রাথমিক মূলধন হইতে সুরু করিয়া দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে ম্যানেজিং এজেণ্টগণের মাধ্যমে বা তাঁহাদের নিকট হইতে। সরকারী স্বীকৃতি অনুসারে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ বৎসরে ৬০-১০০ কোটি টাকার কার্যকরী মূলধন সরবরাহ করিতেন।** অপরদিকে আবার তাঁহাদের সুনাম ও উদ্যোগের জন্যই বাজার হইতে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় এবং আমানত দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

মূলধন সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

চতুর্থত, একই ধরনের বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান একই ম্যানেজিং এজেন্সীর হস্তে থাকায় একক পরিচালনার (unified management) বহু সুবিধা ভোগ করা গিয়াছে। পরিচালনার এই সুবিধা হইল প্রধানত ব্যয়সংক্ষেপের (economies) দিক দিয়া। ম্যানেজিং এজেন্সীর পদ্ধতির জন্য আভ্যন্তরীণ (internal) ও

* **Wadia & Merchant,** ***Our Economic Problem***

** **Managing Agency,** ***Geoffrey Tyson***

বাহ্যিক (external) উভয় প্রকার ব্যয়সংক্ষেপই সম্ভব হইয়াছে। বহুল পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, গবেষণা, প্রচারকার্য, সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি হইল ইহাদের উদাহরণ। উপরন্তু, প্রয়োজনের সময়ে এক শিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে অন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ঋণদান, সাধারণ সময়ে এক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন অপর প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

একক পরিচালনার সুবিধা

সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলিতে পারা যায়, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্য ভারতে শিল্পোদ্যোগের যোগান হইয়াছে, সুদক্ষ পরিচালনা সম্ভব হইয়াছে, মন্দা বাজারের সময় শিল্পগুলি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, নিয়মিত মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে এবং বাহ্যিক আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ সংঘটিত হইয়াছে।

গুণাবলীর সংক্ষিপ্তসার

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় অন্যান্য প্রথা ও পদ্ধতির ন্যায় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথাও অবিমিশ্র সুফল প্রসব করে নাই। ভারতের শিল্পোন্নয়নে ইহার অবদান অনন্যসাধারণ হইলেও এই প্রথার ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারা যায় না। ১৯৩৬ সালের পূর্বে প্রধান ত্রুটি বিশেষভাবে নিহিত ছিল ইহার বংশানুক্রমিক রূপের মধ্যে। ম্যানেজিং এজেন্টদের এই বংশানুক্রমিক রূপ আবার ভারতীয় এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই ছিল প্রকটভাবে প্রতিভাত। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলি চিরকালই বাহির হইতে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের অংশীদার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচালনার অধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষানুক্রমিক সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। উদ্যোগী সুদক্ষ পরিচালকের পুত্র যে সুদক্ষ হইবেই এইরূপ কোন নিশ্চিয়তা নাই। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার মান কমিয়া গিয়াছে। ডাঃ সরোজকুমার বসু বলেন, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে পিতার আসনে অধিষ্ঠিত পুত্রের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে তাঁহার উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই। তাঁহারা যে ক্রয়বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করেন তাহারাও এই বিষয়ে সমান অজ্ঞ। অন্যান্য বিষয়েও এই ম্যানেজিং এজেন্টগণের অজ্ঞতা অনুধাবন করিতে বেশী দূর যাইতে হয় না।*

ত্রুটি :

১। প্রথার বংশানুক্রমিক রূপ

দ্বিতীয়ত, ম্যানেজিং এজেন্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সাধারণ পরিচালকবর্গ (directors) অকর্মণ্য হইয়া পড়েন। ম্যানেজিং এজেন্টগণই যখন গুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলি সম্পাদন করেন তখন পরিচালকবর্গ বা ম্যানেজারের করিবার বিষয় সামান্যই থাকে। এই সকল

২। পরিচালকবর্গের নিষ্ক্রিয়তা

* Dr. S. K. Basu, *Industrial Finance in India*

সামান্য বিষয়েও তাঁহাদিগকে ম্যানেজিং এজেন্সীর মুখ চাহিয়া চলিতে হয়। এইরূপ পরমুখাপেক্ষিতাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ভারতের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান-সমূহের (managed companies) বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়ত, ডাঃ লোকনাথনের ভাষায় বলা যায়, "ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্য অর্থ শিল্পের ভৃত্য না হইয়া প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"* ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার ম্যানেজিং এজেন্টদের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইত প্রধানত ম্যানেজিং এজেন্টগণের মূলধন সরবরাহের ক্ষমতার জন্য, তাঁহারা পরিচালনায় সুদক্ষ বলিয়া নহে। আবার ম্যানেজিং এজেন্সীর পরিবর্তনসাধন করাও হইত মূলত ঐ কারণে। বারংবার ম্যানেজিং এজেন্সীর পরিবর্তনসাধন করিলে সুপরিচালনা ব্যাহত হইতে বাধ্য। এই কারণেই বোম্বাই-এর বহুসংখ্যক কাপড়ের কলের পতন ঘটিয়াছিল।

৩। অর্থের নিকট শিল্পের অধীনতা

চতুর্থত, একই ম্যানেজিং এজেন্সীর হাতে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার থাকার দরুন নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়—যথা, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিপদে পড়িলে তাহার প্রতিক্রিয়া অন্যগুলিতেও দেখা দিতে পারে; সকল প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করা ম্যানেজিং এজেন্টদের সংগতিতে না কুলাইতে পারে; ম্যানেজিং এজেন্টগণ পরিচালনায় সুদক্ষ না হইলে বহুপ্রকারের অপচয় দেখা দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা গিয়াছে যে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান শুধু ম্যানেজিং এজেন্সার অপারগতা বা অক্ষমতার জন্য বিপদে পড়িয়াছে।

৪। একক পরিচালনার অসুবিধা

পঞ্চমত, ম্যানেজিং এজেন্টগণকে অনেক সময় মূল ব্যবসায়ের অনুপূরক (subsidiary) কার্যেও লিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার ফলে মূল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। অনেক সময় আবার ম্যানেজিং এজেন্টদের স্পেকুলেশনের কার্য তাঁহাদের পরিচালনাধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে সংকটের সম্মুখীন করিয়া তুলিয়াছে।

। অনুপূরক কার্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য বিপদ

ষষ্ঠত, ম্যানেজিং এজেন্টগণ যে-পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন তাহারও নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। অফিস-পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ (office allowance) লওয়া ছাড়াও তাঁহারা নির্দিষ্ট হারে বিক্রয় বা উৎপাদনের অংশও লইতেন। অভিযোগ ছিল যে, অফিস-পরিচালনার জন্য তাঁহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ এবং বিক্রয় বা উৎপাদনের অযৌক্তিক অংশ তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশ দাবি করিবার সপক্ষে কোন যুক্তিই ছিল না, কারণ বিক্রয় হইলেই যে মুনাফা হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা

৬। এজেন্টদের অযৌক্তিক পারিশ্রমিক

* P. S. Lokanathan, *Industrial Organisation in India*

নাই। উৎপাদনের উপর কমিশন ছিল আরও অযৌক্তিক। ইহাতে বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই ম্যানেজিং এজেণ্টগণ উৎপাদনের পরিকল্পনা করিতেন। ফলে অত্যধিক এবং অপকৃষ্ট জাতের উৎপাদন হইত। যে-ক্ষেত্রে এজেণ্টগণ মাত্র মুনাফার অংশ লইতেন সে-ক্ষেত্রেও ইহা অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইত। অনেক সময় আবার তাঁহাদিগকে কাঁচামাল ক্রয় ইত্যাদির উপরও কমিশন লইতে দেখা যাইত। ম্যানেজিং এজেণ্টদের পারিশ্রমিকের আলোচনার উপসংহার হিসাবে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট বলিয়াছেন, "সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই কমিশনকে অত্যধিক বলিয়া বর্ণনা করা কোনমতেই অযৌক্তিক হইবে না।"*

সপ্তমত, ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা নানারূপ দুর্নীতির সহিত সংযুক্ত। আইনের চক্ষু এড়াইয়া নিজেদের সুবিধামত হিসাবরক্ষা, প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়বিক্রয়, ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থকে শেয়ারে রূপান্তরিত করা প্রভৃতি দুর্নীতি ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছিল। এই বৈশিষ্ট্য এখনও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই।

৭। নানা দুর্নীতির হিত সংযুক্ত

পরিশেষে, এই প্রথার দরুন শিল্পগত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র কয়েকটি এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের হস্তে। ১৯৫১ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, এণ্ড্রু ইউল, ম্যাক্লিয়ড (Mcleod), মার্টিন ও ডালমিয়ার ম্যানেজিং এজেন্সীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫০, ৪০, ২৬ এবং ৩৪টি। আমাদের সংবিধান যখন অর্থ-ব্যবস্থায় সম্পদ ও সুযোগের কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে নির্দেশ দিয়াছে** এবং যখন আমরা সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি, তখন এই ক্ষমতা-কেন্দ্রিকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের সংশোধন দ্বারা ইহাই করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে পূর্ববর্তী সংস্কার-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

৮। শিল্পজাত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার সংস্কার (Reforms of the Managing Agency System): প্রধানত অংশীদারদের সমিতির (Shareholders' Association) আন্দোলনের জন্য ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার উপরি-উক্ত ত্রুটিসমূহ যথাসম্ভব দূরিকরণার্থে ১৯৩৬ সালের কোম্পানী আইনের সংশোধন করা হয়। সংশোধনের ফলে যে-সকল পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা ছিল এইরূপ: (১) ব্যাংকিং বা বীমা কোম্পানীর কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত করা চলিবে না। (২) ২০ বৎসরের অধিককালের জন্য কোন ম্যানেজিং

১৯৩৬ সালের কোম্পানী আইনের সংশোধন

* Wadia & Merchant, *Our Economic Problem*

** ভারতীয় সংবিধানের ৩৯ (গ) অনুচ্ছেদ

এজেন্টকে নিযুক্ত করা যাইবে না ; এমনকি 'বর্তমান' এজেন্সীদেরও কার্যকালের অবসান ঐ একই সময়ের মধ্যে ঘটিবে। অবশ্য কার্যকলাপ সমাপ্ত হইলে তাহাদের পুনর্নিয়োগ করা যাইতে পারে। (৩) ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে দোষী সাব্যস্ত অথবা দেউলিয়া প্রমাণিত হইলে ঐ ২০ বৎসর সময়ের মধ্যেই যে-কোন সময়ে তাহাদের অপসারণ করা যাইতে পারে। (৪) এজেন্টদের নিয়োগ, অপসারণ ও নিয়োগের সর্তাবলীর পরিবর্তন অংশীদারগণের সম্মতি-সাপেক্ষ হইবে। (৫) কোম্পানী আইনের এই সংশোধনের পরে নিযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টগণ পারিশ্রমিক হিসাবে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ (office allowance) এবং নীট মুনাফার (net profit) একাংশ পাইবেন। কি হারে এই নীট মুনাফা হিসাব করা হইবে আইনে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়, ইত্যাদি।

সমালোচনা : ১৯৩৬ সালের সংশোধন ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার দোষ-ত্রুটি কতকাংশে দূর করিলেও ইহার কাম্য সংস্কারসাধনে সমর্থ হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, পারিশ্রমিক সম্বন্ধে সংশোধনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছিল যে সংশোধন পাস হইবার পরে নিযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টগণ চুক্তি অনুসারে পারিশ্রমিক পাইবেন। ইহার ফলে সংশোধনের পূর্বে নিযুক্ত এজেন্টগণ পূর্বের মতই অযৌক্তিকভাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন। আবার এক-একবারের জন্য ম্যানেজিং এজেন্সীর জীবনকাল ২০ বৎসরে নির্দিষ্ট করিয়া ইহার পুরুষানুক্রমিক রূপের (hereditary character) পরিবর্তনসাধনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রতি ২০ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে, ম্যানেজিং এজেন্সীর পরিবর্তন প্রয়োজন কি না। কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্টগণ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকিতেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাম্য বিবেচিত হইলেও এজেন্সীর পরিবর্তন করা অংশীদারগণের পক্ষে সম্ভব হইত না।

ইহা কাম্য সংস্কারসাধনে সমর্থ হয় নাই

এই সকল কারণের জন্য ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার আমূল সংস্কার—এমনকি বিলোপসাধনেরও দাবি করা হয়। এই দাবির বিচারবিবেচনার্থে ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সরকার একটি কোম্পানী আইন কমিটি (Company Law Committee) নিয়োগ করে। ইহা 'ভাবা কমিটি' (Bhaba Committee) নামেও পরিচিত। ভাবা কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে নূতন কোম্পানী আইনে (Companies Act, 1956) ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার আমূল সংস্কার করা হয়। এই ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় ১৯৬০ সালে কোম্পানী আইনের ম্যানেজিং এজেন্সী সম্পর্কিত ব্যবস্থাসমূহের আবার কিছু কিছু সংশোধন করা হইয়াছে।

এই কারণে ১৯৫৬ সালে আমূল সংস্কার

১৯৬০ সালে পুনরায় সংস্কার

১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে প্রবর্তিত সংস্কার (Changes Effected in 1956 and 1960): ১৯৫৬ সালে নূতন কোম্পানী আইনের এবং ১৯৬০ সালে উহার সংশোধনের ফলে ম্যানেজিং এজেন্সী সম্পর্কিত যে-সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

১। নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ : সরকারী নির্দেশিত বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শিল্প ও ব্যবসায়ে ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিবেই না। এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান-সমূহের ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা ছিল ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যে তাহাদের অবসান ঘটিয়াছে। কোন ম্যানেজিং এজেন্সী কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট থাকিতে পারিবে না। কোন অধীনস্থ কোম্পানীও ম্যানেজিং এজেন্ট হইতে পারিবে না।*

২। নিয়োগ ও নিয়োগকাল : যে-সকল প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিতে পারিবে সেখানে নিয়োগ, পুনর্নিয়োগ বা নিয়োগের সর্তাবলীর পরিবর্তন এক সাধারণ সভায় কোম্পানীর অংশীদারগণ দ্বারা অনুমোদন করিয়া লইতে হইবে। তাহার পরও ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতীত ম্যানেজিং এজেন্সীর হস্তান্তর চলিবে না। পদত্যাগের পরও এজেন্টগণ আর্থিক ও অন্যান্য দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন না। ম্যানেজিং এজেন্সীর নিয়োগকাল সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে প্রথম দফায় উহার মেয়াদ ১৫ বৎসরের অধিক হইবে না; এবং পুনর্নিয়োগের মেয়াদ ১০ বৎসরের বেশী হইবে না।

৩। পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্টের পরে কোন ম্যানেজিং এজেন্ট ১০টির বেশী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিতে পারে না।

৪। পরিচালনার অবসান ও গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন : কয়েক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও ম্যানেজিং এজেন্টের পরিচালনার অবসান ঘটিতে পারে—যথা, নিজে দেউলিয়া হইলে, এজেন্সী প্রতিষ্ঠান বা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া গেলে, এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের মালিক বা পরিচালক ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্তত ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিলে, ইত্যাদি। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তি যদি এজেন্সী প্রতিষ্ঠান হইতে বিতাড়িত হন তবে এজেন্সীর কার্যের অবসান ঘটে না। উপরন্তু, পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ এক সাধারণ প্রস্তাব (ordinary resolution) দ্বারা প্রবঞ্চনা অথবা বিশ্বাসভংগের জন্য এবং এক বিশেষ প্রস্তাব (special resolution) দ্বারা অবহেলা বা কুপরিচালনার জন্য ম্যানেজিং এজেন্টকে অপসারিত করিতে পারে।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের (constitution) যে-কোন পরিবর্তন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ। উত্তরাধিকার সূত্রে

* ১৯৬০ সালের সংশোধন

এজেন্ট-পদে অধিষ্ঠানের ব্যবস্থা গঠনতন্ত্রে থাকিলে তাহা বিধিবহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫। পারিশ্রমিক: ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিকের নীট মুনাফার শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইবে না। ইহাও আবার গতিশীলতার ভিত্তিতে (on the principle of progression) নির্ধারিত হইবে।* অর্থাৎ, ম্যানেজিং এজেন্টগণ প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর শতকরা ১০ টাকা, পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকার উপর শতকরা ৯ টাকা, ইত্যাদি হারে পারিশ্রমিক পাইবেন। শতকরা ১০ ভাগের অধিক পারিশ্রমিকের জন্য অংশীদারগণের বিশেষ সমর্থন ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। কোন আর্থিক বৎসরের জন্য পারিশ্রমিক ততক্ষণ প্রদান করা হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত-না চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত, পরীক্ষা এবং সাধারণ সভায় পেশ করা হয়। পরিচালনার জন্য ভাতা (office allowance) বলিয়া কিছুই থাকিবে না, তবে এজেন্সী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকিলে সেই অর্থ পাইতে অধিকারী হইবে। নীট মুনাফা হিসাব করিবার সময় মূলধনের ক্ষতি (capital loss), আদায়ের সম্ভাবনা নাই এইরূপ প্রাপ্য (bad debts) প্রভৃতি বাদ দিতে হইবে।

৬। এজেন্সী কার্যের নিয়ন্ত্রণ: ম্যানেজিং এজেন্ট বা তাঁহার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেশের অভ্যন্তরে ক্রয় বা বিক্রয় এজেন্ট নিযুক্ত হইতে অথবা এই সূত্রে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দেশের বাহিরে এই প্রকার এজেন্সীকার্য করিবার জন্য পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। আবার ম্যানেজিং এজেন্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সহিত ৫ হাজার টাকার অধিক মূল্যের মাল সরবরাহ, পণ্য বিক্রয় ইত্যাদির চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিলে এইরূপ চুক্তিও সাধারণ অংশীদারগণ দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

৭। ক্ষতিপূরণ: ম্যানেজিং এজেন্ট যদি পুনর্গঠন, সংযুক্তিকরণ ইত্যাদির জন্য পদত্যাগ করিয়া পরে আবার পুনর্গঠিত কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হন অথবা যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন তাহা হইলে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। অনুরূপভাবে এই আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী ম্যানেজিং এজেন্ট যদি পদত্যাগ করেন অথবা পদচ্যুত হন তাহা হইলেও কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। যে-ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে সে-ক্ষেত্রে ইহা অনতিবাহিত সময়টুকু অথবা সর্বাধিক তিন বৎসরের জন্য দেওয়া যাইতে পারে।

৮। ক্ষমতা সীমাবদ্ধকরণ: সীমাবদ্ধভাবে ছাড়া ম্যানেজিং এজেন্সী পরিচালিত এক প্রতিষ্ঠানের অর্থ অন্য প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ রহিত করা

* ১৯৬০ সালের সংশোধন

হইয়াছে।* পরিচালক মনোনয়ন সম্পর্কে বিধি হইল যে, পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সংখ্যা ৫-এর অধিক হইলে দুইজন এবং ৫-এর কম হইলে একজনের বেশী পরিচালককে ম্যানেজিং এজেণ্ট মনোনীত করিতে পারিবেন না।

৯। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ: ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন সর্বপ্রথম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদের স্বীকৃতি প্রদান করে। এই দুই পদাধিকারীর কার্যাবলী অনেকটা ম্যানেজিং এজেণ্টগণের কার্যেরই অনুরূপ। ফলে, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোম্পানী আইনের ম্যানেজিং এজেন্সী সংক্রান্ত প্রায় সকল ধারাই এই দুই পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যতিক্রমগুলি হইল: (ক) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কেহই ম্যানেজিং এজেণ্ট হইতে পারে কিন্তু সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইতে পারে মাত্র প্রতিষ্ঠানই; ব্যক্তি নহে। (খ) একই প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্সী, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ একসংগে কাজ করিতে পারিবেন না। (গ) সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কোন শিল্প বা ব্যবসায়ে সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের নিয়োগ রহিত করিতে পারে। (ঘ) সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ কোন পরিচালক মনোনীত করিতে পারেন না।

পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা সমর্থিত না হইলে সম্পাদকগণ কোম্পানীর পক্ষে ক্রয়বিক্রয়ের এজেণ্ট হিসাবে কার্য করিতে পারেন না। সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষগণকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে তাহা নীট মুনাফার শতকরা ৭.৫ ভাগের অধিক হইতে পারে না।

সমালোচনা: অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন সময়ে ম্যানেজিং এজেন্সী সংক্রান্ত সংস্কার-ব্যবস্থার প্রধান বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল দুইটি। প্রথমত, ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত সংশোধন অনুসারে ব্যবস্থা ছিল যে, সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রচার করিবে কোন্ কোন্ শিল্পের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিতে পারিবে না। সুরুতেই এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় নাই বলিয়া সকল শিল্পই সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাইয়াছে। প্রত্যেক ম্যানেজিং এজেণ্ট ও শিল্পপতি আশংকা করিতেছিলেন যে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহাদের শিল্পেরই নাম উঠিবে। ফলে উদ্যোগ ব্যাহত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থা ছিল যে কোন ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক ১০টি শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারিবে না।

১। সকল প্রতিষ্ঠানকেই সন্ত্রস্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল

আথিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে ইহাকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু এক শ্রেণীর মতে, বর্তমানে আর্থিক ক্ষমতা যে অকাম্যভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাহার জন্য ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান ততটা দায়ী নহে, যতটা দায়ী হইল বিভিন্ন আর্থিক ও

২। আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয় নাই

* নিম্নের সমালোচনার শেষ অংশ দেখ।

সংগঠন স্বার্থের পারস্পরিক অংগীভূত অবস্থা (interlocking of managerial and financial interests)। বর্তমানে বিভিন্ন যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং কোম্পানী একই পরিচালনাধীনে থাকে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত উহার উপর আবার জীবন-বীমা কোম্পানীও থাকিত। এই দিক দিয়া ১৯৫৬ সালের সংশোধনে কিছুই করা হয় নাই। পরে অবশ্য ১৯৬০ সালের সংশোধনে এক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের শতকরা ১০ ভাগের অধিক শেয়ার ক্রয় বা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়ে শতকরা ২০ ভাগের অধিক মূলধন আবদ্ধ করা নিষিদ্ধ করিয়া এই কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা বা অলিগোপলির (Oligopoly) প্রতিবিধান অবলম্বন করা হইয়াছে। অনেকে কিন্তু ইহাকেও পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন না।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভবিষ্যৎ (Future of the Managing Agency System): বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে ম্যানেজিং এজেন্সী সম্বন্ধে একরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার কেহই করে না যে, আমাদের বর্তমান শিল্পগত সংগঠনের মূলে রহিয়াছে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা। প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্টগণের তত্ত্বাবধানেই আমাদের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থা যে নানা দিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাও বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। শ্রফ্ কমিটি (Shroff Committee) ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার গুণকীর্তনের পর এই উক্তি করিয়াছিল যে, ম্যানেজিং এজেন্টের কুপরিচালনা ও সুযোগের অসদ্ব্যবহার বহু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটাইয়া বিনিয়োগ-কারীশ্রেণীর বিশ্বাসের মূলে আঘাত করিয়াছে। ফলে শেষ পর্যন্ত মূলধন-সংগঠনই ব্যাহত হইয়াছে। উপরন্তু, সমাজতান্ত্রিক সমাজাভিমুখী অর্থ-ব্যবস্থা আর্থিক কেন্দ্রিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে বাধ্য। অথচ বর্তমান অবস্থায় এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের সপক্ষেও অভিমত দিতে পারা যায় না। সুতরাং যে-দিক দিয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণের কর্তৃত্বের সংকোচন করিয়া ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা হইয়াছে তাহা সমালোচনার উর্ধ্বে না হইলেও কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ভবিষ্যৎ

সংস্কার সমালোচনার উর্ধ্বে না হইলেও কাম্য হইয়াছে

সংস্কারের ফলে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা আজ জীবন-মরণ পরীক্ষার সম্মুখীন। এই পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল কি হইবে তাহা না দেখিয়া ভূতপূর্ব ম্যানেজিং এজেন্টগণ ম্যানেজিং এজেন্সীর পরিবর্তিত রূপ 'সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের' পদের দিকেই অধিক ঝুঁকিয়াছেন।* মনে হয় ভবিষ্যতে

* The Corporate Sector in India, Research and Statistics Division of the Ministry of Commerce & Industry

বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্প-পরিচালনায় এই পরিবর্তিত রূপই অতীতের ম্যানেজিং এজেন্সীর পুরাপুরি স্থলাভিষিক্ত হইবে।

সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্পগত পরিচালনা (Industrial Management in the Public Sector) : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে। পরিবহণ ও সংসরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কার্য (Public Utility Services) ছাড়াও অন্যান্য শিল্পবাণিজ্য রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়ণের জন্য যে-কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে উহা কার্যকর করার জন্য শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা একরূপ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত পরিচালনার অপচয়, অনগ্রসরতা, কার-সমস্যা, ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার কুফল প্রভৃতি যে-সকল ত্রুটি লক্ষ্য . রা যায় রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় তাহা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের পরিমাণ যতই প্রসারলাভ করিতেছে উহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার সমস্যা ততই জটিল হইয়া উঠিতেছে।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের গুরুত্ব

বস্তুত, ভারতের সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে তিন প্রকারের পরিচালন-ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। প্রথমত, কোন কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সরকারের কোন বিভাগ বা দপ্তর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, রেল পরিবহণ, ডাক ও তার ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের কারখানা, ইত্যাদি। এইরূপ সংগঠন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জারি করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা সরাসরি সম্পাদিত না হইয়া সরকারী করপোরেশনের (Statutory or Public Corporations) মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এই করপোরেশনগুলি আইনত স্বতন্ত্র হইলেও ইহারা কার্যপরিচালনার জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকে ; আবার সরকারও ইহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকে। দামোদর ভ্যালি করপোরেশন, ইণ্ডিয়ান্ এয়ার লাইনস্ করপোরেশন, জীবনবীমা করপোরেশন প্রভৃতি সরকারী করপোরেশনের দৃষ্টান্ত। তৃতীয়ত, ভারতের সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে আরও একপ্রকারের পরিচালন-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করিতেছে। উহা হইতেছে সরকারী মালিকানায় ও পরিচালনায় যৌথ মূলধনী কারবার। এই ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে এইরূপ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যৌথ মূলধনী কারবারের ন্যায় সংগঠিত হয় এবং সরকার নিজেই সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, হিন্দুস্থান ষ্টীল্ লিমিটেড্ প্রভৃতি এইরূপ রাষ্ট্রীয় সংগঠন।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ

এই তিন প্রকার রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে শেষোক্ত দুই প্রকারের বিশেষ প্রসার ঘটিতেছে। ১৯৫৬ সালে সরকারী উদ্যোগের সংগঠন সম্পর্কে ECAFE-এর যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় উহাতে ঐ শেষোক্ত দুই প্রকারের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের—অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় করপোরেশন ও রাষ্ট্রীয় যৌথ মূলধনী কারবার—প্রাধান্যের উল্লেখ করা হয়। গোরওয়ালা কমিটি (১৯৫১) ও কৃষ্ণমেনন কমিটিও (১৯৫৯) এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে। অবশ্য কমিটি দুইটির মতামতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। গোরওয়ালা কমিটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের স্বাতন্ত্র্যতার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু মেনন কমিটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টীয় নিয়ন্ত্রণ ও বিভাগীয় হস্তক্ষেপের জন্য সুপারিশ করে। এই সম্পর্কে সরকারী নীতি এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পর্কে গোরওয়ালা কমিটি (১৯৫১) ও কৃষ্ণমেনন কমিটির (১৯৫৯) অভিমত

প্রশ্নোত্তর

1 "Although, in the initial stage, the Managing Agency System played an important role in the development of industries in India, it has several drawbacks." Discuss. (৩৪৩-৩৪৭ পৃষ্ঠা)

2. Estimate the advantages and disadvantages of the Managing Agency System and indicate how legislation has helped to remove some of the defects of the system. (C. U. B. Com. 1963 ; B. U. (O) 1963)
(৩৪৪-৩৪৭ এবং ৩৪৯-৩৫১ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the role of the Managing Agents in financing the industrial development of India. Are you in favour of abolition of the Managing Agency System ? Give reasons for your answer. (C. U. B. A. (P.II) 1963)
(৩৪৪-৩৪৫, ৩৪৭ এবং ৩৫২-৩৫৩ পৃষ্ঠা)

4. Give your own evaluation of the part played by the Managing Agency System in India's economic development.
(C. U. B. Com. 1959 ; B. A. 1960) (৩৪৪-৩৪৭ পৃষ্ঠা)

5. Write a brief note on the different forms of the management of State enterprises in India. (C. U. B. Com. 1962) (৩৫৩-৩৫৪ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শিল্প-শ্রমিক

(Industrial Labour)

ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Industrial Labour of India) : ভারতে এখনও স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক দল গড়িয়া উঠে নাই। শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী বসবাসকারী শ্রমিকের সংখ্যা কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও অধিকাংশ শিল্প-শ্রমিক গ্রামাঞ্চল হইতেই আসে। এইভাবে গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার আসল কারণ হইল প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থার চাপ, সহরের আকর্ষণ নয়।* অধিকাংশ শ্রমিক ভূমিহীন এবং চাকরির সন্ধানেই তাহারা শিল্পাঞ্চলের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। গ্রামের সংগে তাহাদের সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হয় না। সুযোগসুবিধা পাইলেই তাহারা আপনাপন গ্রামে ফিরিয়া যায়। কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ করিবার জন্য যে তাহারা গ্রামে আসে এই ধারণা ঠিক নয়; বিশ্রাম, আত্মীয়স্বজনের সংগে দেখাশুনা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ প্রভৃতিতে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা প্রধানত গ্রামে আসে।**

১। স্থায়ী শিল্প-শ্রমিকের অভাব

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে কার্যে অনুপস্থিতির হারও অধিক। বোম্বাই, কানপুর ও অন্যান্য স্থানে দেখা গিয়াছিল যে, অনুপস্থিতির শতকরা হার ১২-১৪ জন। এই ব্যাপক অনুপস্থিতির জন্য কার্য পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধা হয় এবং উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনুপস্থিত ও অনিয়মিত শ্রমিকদের কার্য চালাইবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করিতে হয়। শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী শ্রমিক দল গঠনের অভাব এবং গ্রামাঞ্চলে ফিরিয়া যাইবার অভ্যাস বা প্রয়োজনীয়তা কতকটা ইহার জন্য দায়ী। কারখানাগুলিতে কার্যের অসুবিধাজনক সর্তাদির ফলেও কতকটা এইরূপ হইয়া থাকে।

২। কার্যে অনুপস্থিতির উচ্চ হার

তৃতীয়ত, ভারতীয় শ্রমিক দল বিভিন্ন ভাষাভাষী ও আচারব্যবহারবিশিষ্ট লোক লইয়া গঠিত। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা এবং উৎপাদনকার্য বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়।

৩। শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যতার অভাব

---

* The Report of the Royal Commission on Indian Labour, 1931

** The Report of the Labour Investigation Committee, 1946

চতুর্থত, আশ্চর্যজনক মনে হইলেও ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল শ্রমিকের অ-পর্যাপ্তি। জনসংখ্যা অগণিত হইলেও এদেশে দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহে বিশেষ অভাব দেখা যায়। অবশ্য সম্প্রতি শিল্পগত শিক্ষাদান-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের ফলে কতকটা অবস্থার উন্নতি হইয়াছে।

৪। দক্ষ শ্রমিকের অপ্রাচুর্য

পরিশেষে বলা হয় যে, ভারতীয় শ্রমিক অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় অনেক কম দক্ষ। অর্থাৎ, অন্যান্য উন্নত দেশের শ্রমিকদের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিলেও উহা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। নিম্নে এই সম্পর্কে বিস্তারিত সমালোচনা করা হইতেছে।

৫। ভারতীয় শ্রমিকের নিম্ন উৎপাদন-ক্ষমতা

ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা (Efficiency of the Indi Labour): ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ প্রায়ই আ... করা হয়। বলা হয় যে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের শ্রমিক কোন নির্দিষ্ট সময়ে যতটা পরিমাণ কার্য-সম্পাদন করিতে পারে ভারতীয় শ্রমিক তাহা পারে না। এই অভিযোগ প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারের তুলনামূলক হিসাব এবং যুক্তিও প্রদর্শিত হয়। যেমন, বলা হইয়াছে, ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের মিলগুলির বয়ন বিভাগে একজন বালিকা শ্রমিক ভারতীয় কাপড়ের মিলের ৬ জন শ্রমিকের সমান কার্য করিতে সমর্থ। আবার হিসাব করিয়া দেখানো হইয়াছে যে যখন ১ হাজার মাকু (spindles) পরিচালনার জন্য ভারতে ২২ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয় তখন ল্যাংকাশায়ার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলগুলিতে প্রয়োজন হয় যথাক্রমে ৬.৭ ও ৪.৫ শ্রমিক।* কয়লাখনিগুলির ক্ষেত্রে দেখানো হইয়াছে যে প্রত্যেক শ্রমিকের বাৎসরিক গড়পড়তা উৎপাদন ভারতবর্ষে ১৩১ টন, গ্রেট ব্রিটেনে ২৫০ টন, আমেরিকায় ৭৮০ টন এবং ট্রান্সভালে ৪২৬ টন। ইস্পাত শিল্পে জে. আর. ডি. টাটার হিসাব অনুসারে ১৯৩৯ সালে মাসে গড়ে প্রত্যেক ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদনের হার ছিল ½ টন এবং মার্কিন শ্রমিকের ছিল ৫ টন।

অদক্ষতার অভিযোগ

একদিকে যেমন এই সমস্ত হিসাব দেখাইয়া ভারতীয় শ্রমিকের অদক্ষতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অপরদিকে আবার যুদ্ধকালীন গ্রেডি মিশন (The Grady Mission) এবং শ্রম অনুসন্ধান কমিটি প্রভৃতি মত প্রকাশ করিয়াছে যে অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা কম নয়। গ্রেডি মিশন বলিয়াছে, ভারতীয় কারখানাগুলিতে আলোর যথেষ্ট অভাব থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা ৬৫ সেণ্টের

অভিযোগের বিরোধিতা

* Economic Survey of Asia and the Far East, 1950

মত দৈনিক মজুরিতে চমৎকার যন্ত্রপাতি উৎপাদন করিতেছে এবং জামসেদ-পুরের টাটা ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের উৎপাদনের হার আমেরিকার পিটস্‌বার্গ কারখানাগুলির শ্রমিকদের উৎপাদনের হার হইতে কম নহে। শ্রম অনুসন্ধান কমিটির মতে, ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে অদক্ষতার যে-অভিযোগ করা হয় তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন।

শ্রম-দক্ষতার তুলনামূলক বিচার কিভাবে করিতে হইবে

এই প্রসংগে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শ্রমিকের উৎপাদন-দক্ষতার সঠিক তুলনামূলক বিচার করিতে হইলে শ্রমিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। শ্রমিক ব্যতীত কার্যের সর্ত, যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির প্রকৃতির উপরও শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। যদি দুই দেশের শ্রমিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিভিন্নতা থাকে তবে তাহাদের উৎপাদনেও বিভিন্নতা প্রকাশ পাইবে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় শ্রমিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার—অর্থাৎ, কার্যের সর্ত, কারখানার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি, পরিচালকবর্গের দক্ষতা ইত্যাদি অন্যান্য দেশের তুলনায় নিকৃষ্ট। ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতার তুলনামূলক পরিমাপ করিবার সময় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কারণে আমরা এই বিচারটি করি না। ইহা ব্যতীত আর একটি বিষয়ও আমরা ভুলিয়া যাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে যন্ত্রপাতির তুলনায় শ্রমিক নিয়োগ ব্যয়বহুল; অপরপক্ষে ভারতে শ্রমিকের তুলনায় যন্ত্রপাতি নিয়োগ ব্যয়বহুল। এই অবস্থায় আমেরিকার মত দেশে প্রত্যেকটি শ্রমিকের সহিত অধিক যন্ত্রপাতি জুড়িয়া দিয়া তাহার নিকট যতটা সম্ভব কার্য আদায়ের চেষ্টা করা হয়। ভারতে স্বল্প পারিশ্রমিকে শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা থাকায়, স্বল্প যন্ত্রপাতির সহিত অধিক শ্রম নিয়োগ করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয় না।* এইজন্যই ভারতে একজন শ্রমিক অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক মাকু বা তাঁত পরিচালনা করিয়া থাকে।

উপসংহার: ভারতীয় শ্রমিক স্বভাবতই অদক্ষ নহে

সুতরাং, ভারতীয় শ্রমিক স্বভাবতই স্বল্প দক্ষতাসম্পন্ন, একথা সত্য নহে। ঠিক একই প্রকার কার্যের সর্ত, পরিচালনার দক্ষতা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেখা যাইবে ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় কোন অংশে কম নয়।** অতএব ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন যদি অপেক্ষাকৃত কম হয় তাহার জন্য শ্রমিককে সম্পূর্ণভাবে দায়ী না করিয়া অন্যান্য যে-সমস্ত উপাদানের উপর উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে তাহাদের উন্নয়নের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে।

* Graham Hutton, *We Too Can Prosper*

** The Report of Labour Investigation Committee, 1946

এখন সকল দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক, ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা কোন্ কোন্ কারণে ব্যাহত হইয়া থাকে।

ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন কম হইবার কারণ:

১। মানসিক শক্তির অভাবের যুক্তি

প্রথমত বলা হয় যে, উদ্ভাবনী শক্তি বা মানসিক উৎকর্ষ জাতিগত বৈশিষ্ট্যের (racial qualities) উপর নির্ভর করে। একথা সত্য হউক বা না-হউক, ইহা বোধ হয় বলিলে ভুল হইবে না যে প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয়রা বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, শিল্পকৌশল প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে।

২। জলবায়ু

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর দেশের জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব থাকে। ভারতের জলবায়ু অধিক পরিশ্রমের অনুকূল নহে। অতিশয় গ্রীষ্মতাপ এবং বর্ষা ঋতুতে স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া শ্রমিকদের মধ্যে সহজেই ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব আনিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি লাগিয়াই আছে। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে কর্মশক্তির অভাব ঘটে।

৩। স্বল্প মজুরি

তৃতীয়ত, শ্রমিকের দক্ষতার উপর তাহার মজুরির প্রভাবও যথেষ্ট। ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকের মজুরি সুস্থ ও সবল জীবনযাপনের পক্ষে অ-পর্যাপ্ত। দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিজনগণের প্রতিপালনের দুশ্চিন্তা ও খাদ্যপুষ্টির অভাব সহজেই শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে পংগু করিয়া দেয়, এবং নানা প্রকারের ব্যাধি ও স্বাস্থ্যহীনতা তাহার দেহকে আশ্রয় করিয়া বসে। বলা হয়, শ্রমিকের কর্মদক্ষতার অভাবই হইল স্বল্প মজুরির প্রকৃত কারণ। কিন্তু আবার ইহাও বলা যায়, স্বল্প মজুরিই কর্মদক্ষতার পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে, যে-সকল স্থানে উপযুক্ত মজুরি প্রদানের দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা হইয়াছে সে-সকল স্থানে শ্রমিকের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, আমেদাবাদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বেও বোম্বাই-এর শ্রমিকের তুলনায় আমেদাবাদের শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ কম ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমেদাবাদের শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় দেখা গিয়াছে যে তাহারা বোম্বাই-এর শ্রমিকগণ অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিতেছে।*

৪। নিকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

চতুর্থত, ভারতীয় শ্রমিককে যে-সমস্ত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল লইয়া কাজ করিতে হয় তাহা মোটেই উৎকৃষ্ট ধরনের নয়। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকের উৎপাদন-দক্ষতা ব্যাহত হয় এবং তুলনামূলকভাবে উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়।

* D. R. Gadgil, ***Regulation of Wages and the Problem of Industrial Labour in India***

পঞ্চমত, কারখানাগুলির আভ্যন্তরীণ পরিবেশ অধিক উৎপাদনের অনুকূল নহে। প্রায় কারখানাতেই আলোবাতাস অপ্রচুর, অধিক গ্রীষ্ম বা অধিক শীতের হাত হইতে শ্রমিককে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা নাই। শ্রম-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির ত্রুটিও রহিয়াছে যথেষ্ট। পানীয় জল, স্বল্প মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা, স্নানাগার প্রভৃতি সম্পর্কে অধিকাংশ কারখানা উদাসীন। সংশ্লিষ্ট শিল্প হইতে যে-সমস্ত ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্যেও শৈথিল্য দেখা যায়। স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা করিবার বা ঔষধাদি সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা অনেক কারখানাই করে না। অবশ্য সম্প্রতি সরকার এইগুলির জন্য অধিক দৃষ্টি দিতেছে।

৫। কারখানার প্রতিকূল পরিবেশ

ষষ্ঠত, শিল্প-শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহাদির অভাব তাহার দক্ষতার আর একটি প্রধান অন্তরায়। অধিকাংশ স্থানেই শ্রমিকরা অস্বাস্থ্যকর বস্তি প্রভৃতিতে বাস করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে একদিকে যেমন তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হয়, অপরদিকে তেমনি নৈতিক চরিত্রেরও অবনতি ঘটে। অধুনা সরকার এই বিষয়েও দৃষ্টি দিতেছে।

৬। স্বাস্থ্যকর বাসগৃহাদির অভাব

সপ্তমত, শিল্প-শিক্ষা বা কারিগরি দক্ষতার (technical skill) অভাব এবং নিরক্ষরতা শ্রমিকের অদক্ষতার আর একটি কারণ। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতা কতকটা প্রসারিত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় উহা যথেষ্ট নয়।

৭। শিক্ষার অভাব

পরিশেষে, শিল্প-পরিচালনার ত্রুটির জন্যও শ্রমিকের কর্মদক্ষতা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। সর্বত্র না হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই শিল্প-পরিচালকবর্গের অদূরদর্শিতা, অসহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিভংগি ও ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা শিল্পোৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে স্বল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদনের মূলে রহিয়াছে সুদক্ষ পরিচালনা।

৮। শিল্প-পরিচালনার ত্রুটি

উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলির কথা স্মরণ করিয়াই শ্রম অনুসন্ধান কমিটি মন্তব্য করিয়াছে, "যখন দেখি যে অন্য দেশের তুলনায় এ-দেশে কার্যের সময় অধিক, বিশ্রামের ব্যবস্থা স্বল্প, শিল্পগত শিক্ষার সুযোগ অ-পর্যাপ্ত, খাদ্য ও কল্যাণকর ব্যবস্থাদি নিকৃষ্ট এবং মজুরির হার নিম্ন তখন আমরা তথাকথিত অদক্ষতার কারণ হিসাবে শ্রমিকের স্বাভাবিক বুদ্ধি বা ক্ষমতার অভাবকে স্বীকার করিয়া লইতে পারি না।"

শ্রম-দক্ষতা উন্নয়নের পন্থা (Measures for Improving Efficiency of Labour): শ্রম-দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন

করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে মালিক, সরকার এবং শ্রমিক নেতাদের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। প্রথমত, সাধারণ ও শিল্প শিক্ষার (technical education) ব্যাপক প্রসারের প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

১। সাধারণ ও শিল্প শিক্ষার প্রসার

দ্বিতীয়ত, কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে হইবে। ফ্যাক্টরী আইনে আলোবাতাস ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়মাবলী আছে। ঐগুলি যাহাতে যথাযথভাবে বলবৎ করা হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মোটকথা, প্রত্যেক কারখানাতেই শ্রম-কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং কার্যের সর্তাদিকে মানবোচিত করিতে হইবে।

২। সুস্থ ও সবল আভ্যন্তরীণ পরিবেশ

তৃতীয়ত, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় চিকিৎসার সুযোগসুবিধা প্রদান করিতে হইবে। বিশেষত, শিল্পগত ব্যাধির (occupational diseases) প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কারখানা খনিগুলিতে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা এবং আঞ্চলিক হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক।

৩। স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা

চতুর্থত, শ্রমিকদের খাদ্যপুষ্টির প্রতি যত্ন লইতে হইবে। অবশ্য খাদ্যপুষ্টির প্রশ্ন দেশের খাদ্য-সমস্যার সহিত জড়িত। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য 'ক্যান্টিনে'র ব্যবস্থা করিয়া স্বল্প দামে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এইরূপ 'ক্যান্টিন'গুলি শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রিয়। এই ক্যান্টিন-ব্যবস্থার সাহায্যে একদিকে যেমন খাদ্যপুষ্টির সমস্যাকে কতকাংশে সহজ করা যাইতে পারে, অপরদিকে তেমনি মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য গৃহে গমনাগমন হইতে অব্যাহতি দিয়া সময়-সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। ডাঃ আকরয়ড (Dr. Aykroyed) ক্যান্টিন-গুলির উপযোগিতা অনুভব করিয়াই বলিয়াছেন যে, উপযুক্তভাবে ক্যান্টিনগুলির প্রসারসাধন করিতে পারিলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও খাদ্যপুষ্টি সত্যই উন্নতিলাভ করিবে।*

৪। খাদ্যপুষ্টি

পঞ্চমত, শ্রমিকদের দক্ষতার সহিত সম্পর্কিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল শ্রমিকদের বাসগৃহের সমস্যা। কয়েকটি স্থান ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বসবাস করিতে হয়। এই বস্তিগুলি যে মানুষের মোটেই বসবাসযোগ্য নয় তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গৃহাভাবের ফলে শ্রমিক পরিজনবর্গের সহিত স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনযাত্রার সুস্থ পরিবেশ হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং শ্রমিকদের জন্য অধিকসংখ্যক উপযুক্ত ধরনের গৃহনির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে মালিক, সরকার ও পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির গুরু

৫। বাসগৃহের সুবন্দোবস্ত

* The Report of the Bombay T. L. E. Committee

দায়িত্ব রহিয়াছে। গৃহনির্মাণ সম্পর্কে যে-সমবায় আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে তাহাকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সম্প্রতি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য এবং ঋণদানের ব্যবস্থা করিতেছে।

ষষ্ঠত, শ্রমিকের আয়বৃদ্ধি ব্যতীত শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির কোন আশা নাই। ভারতীয় সংবিধানে জীবনধারণোপযোগী মজুরি নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। যে-সমস্ত শিল্পে মজুরির হার অত্যল্প সে-সমস্ত স্থানে মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। আয়বৃদ্ধি

সর্বনিম্ন মজুরি আইন পাসের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে মজুরির ন্যূনতম হার ধার্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই আইন এখনও ব্যাপকভাবে কার্যকর হয় নাই। উপরন্তু, কিভাবে ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা যায় তাহাও এক সমস্যা। অবশ্য এই ব্যাপারে একদিকে যেমন শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন, তেমনি অপরদিকে তাহার উৎপাদনশীলতার কথাও মনে রাখিতে হইবে। সর্বনিম্ন মজুরির পরে উৎপাদনানুযায়ী মজুরি প্রদানের পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নানাভাবে উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করিয়া মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টাও করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রম-উৎপাদন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে এই দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

উৎপাদনশীলতা পরিষদ

দেশব্যাপী উৎপাদনবৃদ্ধির মনোভাব সৃষ্টি ও উৎপাদনে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (National Productivity Council) নামে ১৯৫৮ সালে একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। এই পরিষদ সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছে। ১৯৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই পরিষদ বিভিন্ন শিল্প-কেন্দ্রে ৪৩টি স্থানীয় পরিষদ (local councils) এবং কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কানপুর লুধিয়ানা ও বাংগালোরে ছয়টি আঞ্চলিক দপ্তর (regional directorates) স্থাপন করিয়াছে।* ইহা ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনায় দক্ষতার নিয়মাবলী (Code of Efficiency) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে ভবিষ্যতে মজুরিবৃদ্ধির প্রশ্ন অধিক উৎপাদনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা হইবে। অর্থাৎ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইলে তবেই মজুরি বৃদ্ধি করা হইবে, নচেৎ নয়।**

দক্ষতার নিয়মাবলী

এই শ্রম উৎপাদনশীলতার সহিত শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের (rationalisation) প্রশ্ন অংগাংগিভাবে জড়িত। অধিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উন্নত ধরনের

* ২৯৩ পৃষ্ঠা দেখ।

** Aims of India's Labour Policy by L. N. Misra, formerly Deputy Minister for Labour etc.

যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে ভারতে বেকারাবস্থা যে-ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাই আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধভাবে ও ধীরে ধীরে র‍্যাসানালাইজেশনের পথে অগ্রসর হওয়ার নীতি অবলম্বিত হইয়াছে।

র‍্যাসানালাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা ও বিপদ

সপ্তমত, সুদক্ষ পরিচালনা যাহাতে নিশ্চিত হয় তাহার জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। 'শিল্পাভ্যন্তরীণ' 'শিক্ষা (training within industry) প্রবর্তনের দ্বারা তত্ত্বাবধান বা পরিচালনদক্ষতার উন্নতিসাধন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে আমেদাবাদ বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষামূলক কার্য চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাতে বিশেষ সুফল ফলে।

৭। পরিচালনার উন্নয়ন

অষ্টমত, শ্রমিকদের ঋণগ্রস্ততা তাহাদের স্বাস্থ্য ও দক্ষতার উপর প্রতিক্রিয়া বিস্তার না করিয়া পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতা বা অদূরদর্শিতা দায়ী হইলেও ঋণগ্রস্ততার মূল কারণ হইল আয়ের অপ্রতুলতা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালনের প্রয়োজনীয়তা। যাহা হউক, ঋণগ্রস্ততার হাত হইতে শ্রমিককে সংরক্ষণ করিতে হইবে। আয়বৃদ্ধি, আইন প্রণয়ন, সমবায় সমিতি স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে এই সমস্যার পূর্ণাংগ সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।*

৮। শ্রমিকের ঋণগ্রস্ততার প্রতিকার

নবমত, নানাভাবে শিল্পাঞ্চলের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া শ্রমিকদিগকে শিল্পকেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট করিতে হইবে। নচেৎ, স্থায়ী শ্রমিকদল গড়িয়া উঠিবে না।

৯। শিল্পাঞ্চলের আকর্ষণ বৃদ্ধি

দশমত, অধিকমাত্রায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক (social security) ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া শ্রমিককে বৃদ্ধাবস্থা বা অন্যান্য অকাম্য অভাবাবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

১০। সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা

পরিশেষে, ভারত বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সাফল্য অর্জন করিতে পারে না। অতএব, শ্রমিকদের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে যে, এই বিরাট পরিকল্পনা তাহাদেরও স্বার্থে পরিচালিত এবং শিল্পনীতি নির্ধারণে তাহাদেরও মতামতের মূল্য রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে শ্রমিককে ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে হইবে এবং যথাসম্ভব তাহাদিগের সহিত মুনাফার ভাগাভাগির ব্যবস্থা (profit sharing) করিতে হইবে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এই বিষয়ের

১১। শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনায় অংশপ্রদান ও মুনাফার ভাগাভাগি

* Report of the Rege Committee ৩৬৯ পৃষ্ঠা

উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

শিল্প-সম্পর্ক (Industrial Relations): শিল্প-সম্পর্ক বলিতে বুঝায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক। আমাদের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার মালিক হইল দুই শ্রেণীর—সরকার ও ব্যক্তিগত শিল্পপতিগণ। সুতরাং শ্রমিকের সংগে দুই প্রকার মালিকেরই সম্পর্কের আলোচনা করিতে হইবে। এই আলোচনা প্রধানত করা হয় শিল্পক্ষেত্রে সংঘর্ষ বা শিল্প-বিরোধের দিক দিয়া। নিম্নে তাহাই করা হইতেছে।

শিল্প-বিরোধ (Industrial Disputes): (শিল্পক্ষেত্রে শান্তিশৃংখলা বজায় রাখা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পোৎপাদনবৃদ্ধির একটি প্রধান সর্ত। শ্রমিককে যথাসম্ভব স্বল্প মজুরি দিয়া উৎপাদনের ব্যয়সংক্ষেপ করাই মালিকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; অপরপক্ষে শ্রমিকদের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা হইল মজুরির হার বৃদ্ধি ও কার্যের সুবিধাজনক সর্ত আদায় করা। এই দুই দলের বিপরীতগামী স্বার্থের ফলেই দেখা দেয় শিল্পজগতে সংঘর্ষ ও বিশৃংখলা। ফলে উৎপাদনহ্রাস, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতির দরুন দেশের সামগ্রিক স্বার্থ হয় ব্যাহত।) সুতরাং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ককে সহজ, সরল ও শান্তিপূর্ণ করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষত ভারত যখন পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে তখন শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সহযোগিতার মনোভাব উদ্রেকের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টাই করা কর্তব্য। (উদার দৃষ্টিভংগি ও উপযুক্ত সংগঠনের সাহায্যে শিল্প-বিরোধের সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করা হইলে সুফল ফলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে)

শান্তিপূর্ণ শিল্প-শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা

ভারতে শিল্প-বিরোধের গতি (Trends in Industrial Disputes in India): শিল্প-বিরোধ বহু পূর্ব হইতে দেখা দিলেও উহা ব্যাপক আকার ধারণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু অবধি শিল্প-বিবাদ সমতালে চলিতে থাকে। যুদ্ধের মধ্যে কতকটা হ্রাস পাইলেও যুদ্ধাবসান এবং স্বাধীনতালাভের সংগে সংগে শিল্প-বিরোধ আবার বিশেষ বৃদ্ধি পায়। দেখা যায় যে, স্বাধীনতালাভের বৎসরেই সর্বাধিক সংখ্যক শিল্প-বিরোধ ও উহার ফলে সর্বাধিক ক্ষতি হয়। শিল্প-বিরোধের এইরূপ অভূতপূর্ব বৃদ্ধির মূলে ছিল বিভিন্ন কারণ—যথা, স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে শ্রমিকদের আগ্রহ, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির দরুন শ্রমিকদের আর্থিক দুর্দশা, যুদ্ধকালীন কড়াকড়ি অপসারিত হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের সুবিধা, ইত্যাদি।

শিল্প-বিরোধ বৃদ্ধি ও ইহার কারণ

অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সরকার সাময়িক 'শিল্প-শান্তি চুক্তি'র (Industrial Truce Agreement) সাহায্যে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করে।

ইহা ব্যতীত শ্রমিক আন্দোলনের ফলে মজুরিও কতকটা বৃদ্ধি পায়, এবং সংগে সংগে শিল্প-বিরোধ সংক্রান্ত আইনকানুনগুলির মাধ্যমে কার্যকরীভাবে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিবার প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। এই সমস্তের ফলে শিল্পগত সম্পর্কে ধীরে ধীরে উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ১৯৫৫ সালে কিন্তু অবস্থা আবার অবনতির দিকে যায়। এই কারণে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতির জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহাদের মধ্যে শিল্পে নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলী (Code of Discipline) প্রবর্তন, বিভিন্ন শ্রমিক-সংঘের মধ্যে সুসম্পর্ক নির্ধারণের জন্য নিয়মাবলী (Code of Conduct) প্রবর্তন, শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনায় অধিকার প্রদান, শিল্প-বিরোধ আইনের সংশোধন, বেতন কমিশন (Pay Commission) নিয়োগ, ইত্যাদিই প্রধান। ইহাদের ফলে ১৯৫৯ সালে শিল্প-বিরোধ বেশ কিছুটা প্রশমিত হইলেও পরবর্তী বৎসরে উহা আবার বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সাল হইতে শিল্প-বিরোধের অবস্থা মোটামুটি অনুধাবনের জন্য নিম্নের ছকটি দেওয়া হইল:

শিল্প-বিরোধ ১৯৪৭-৬১*

সাল	বিরোধের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা (হাজারে)	বিরোধের ফলে কার্যের দিন নষ্ট হইয়াছে (হাজারে)
১৯৪৭	১৮১১	১৮৪১	১৬৫৬৩
১৯৫১	১০৭১	৬৯২	৩৮১৯
১৯৫৬	১২০৩	৭১৫	৬৯৯২
১৯৫৮	১৫২৪	৯২৯	৭৭৯৮
১৯৫৯	১৫৩১	৬৯৪	৫৬৩৩
১৯৬০	১৫৫৬	৯৮৩	৬৫১৫
১৯৬১	১৩৫৭	৫১২	৪৯১৯

শিল্প-বিরোধের কারণ (Causes of Industrial Disputes): শিল্প-বিরোধের কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণই প্রধান। শ্রম-কমিশনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট ঘটে নাই যাহার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান ছিল না। অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে প্রথমেই আসে মজুরি ও বোনাসের প্রশ্ন। বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে,

১। অর্থনৈতিক কারণ—মজুরি ও বোনাসের দাবি লইয়া বিরোধ

* **Indian Labour Journal** হইতে গৃহীত।

বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর হইতে, মজুরিবৃদ্ধি দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই। স্বতই শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি ও বোনাস বা লভ্যাংশের জন্য আন্দোলনের ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছে শিল্প-বিরোধ। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ শ্রমিকের পক্ষে অকাম্য হয়। কারখানা আইনের নিয়মকানুনগুলিও অনেক ক্ষেত্রে মালিকগণ মানিয়া চলেন না। শ্রমিকরা অধিক সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্য মালিকের সহিত বিরোধে লিপ্ত হয়। অত্যধিক সময় শ্রম করানোর জন্যও বহু শিল্প-বিরোধ হইয়াছে। বর্তমানে কারখানা আইনে কার্যের সময় সপ্তাহে অনধিক ৪৮ ঘণ্টায় বাঁধিয়া দেওয়া হইলেও আইনের এই বিধানকে উপেক্ষা বা অমান্য করিবার প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়ত, ছাঁটাই ও শ্রমিকের আচরণের প্রশ্ন লইয়াও শিল্প-বিরোধ দেখা দেয়। মালিক শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিবার অবাধ অধিকার দাবি করে; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে।

২। কারখানায় আভ্যন্তরীণ পরিবেশ, অত্যধিক শ্রম করানো ইত্যাদি

৩। ছাঁটাই ও শ্রমিক আচরণের প্রশ্ন

চতুর্থত, শ্রমিকদের মধ্যে একটা সাধারণ অসন্তোষ ও হতাশার ভাবও রহিয়াছে। ইহার কারণ হইল তাহাদের আর্থিক দুরবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, নিয়োগের অস্থায়িত্ব, বেকারাবস্থা এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার অভাব। যে-কোন সময় এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়া শ্রম-বিবাদে পরিণত হয়।

৩। শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ অসন্তোষ ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ

অনেক সময় শ্রম-বিরোধের পশ্চাতে রাষ্ট্রনৈতিক কারণও বর্তমান থাকে। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক সময় শ্রমিকদের ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু শিল্প-মালিকরা যেভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন তাহা ঠিক নহে। কোন অর্থনৈতিক কারণে অসন্তোষ বর্তমান না থাকিলে মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক কারণে ব্যাপক ধর্মঘট সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় না। শ্রম-কমিশন বহু পূর্বে যে-উক্তি করিয়া গিয়াছে তাহা বর্তমান অবস্থাতেও প্রযোজ্য। কমিশন বলিয়াছে, "ধর্মঘট ব্যাপারে শিল্পের সহিত অসম্পর্কিত কারণগুলিকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় ঐগুলি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়......ব্যবসাবাণিজ্য, জাতীয়তাবাদ বা কমিউনিষ্ট মতবাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হয়ত আন্দোলনকারীরা শ্রমিকদের প্ররোচিত করিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় নাই।"

৫। রাষ্ট্রনৈতিক কারণ—ইহা অর্থনৈতিক কারণের উপর নির্ভরশীল

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল শিল্প-বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার মোটামুটি শতকরা কত ভাগ কোন্ কোন্ কারণের জন্য তাহা নিম্নের ছকটি হইতে বুঝা যাইবে।

বিভিন্ন কারণ	শতকরা হার
মজুরি ও ভাতা	৩২·০
বোনাস	৭·০
ছাঁটাই, শ্রমিকের আচরণ ইত্যাদি	৩৫·০
ছুটি ও কার্যের সময়	১০·০
অন্যান্য কারণ	১৬·০
	১০০·০

শিল্প-বিরোধের প্রতিরোধ এবং মীমাংসা (Prevention and Settlement of Disputes): শিল্পে শান্তিরক্ষাকল্পে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। প্রথমত, শ্রমিক ও মালিক উভয়ের সম্মতিক্রমে শিল্প-বহির্ভূত কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যস্থতা বা সালিসির (arbitration) মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, স্বেচ্ছামূলক আপোষের (voluntary conciliation) ব্যবস্থা থাকিতে পারে। যেমন, দৈনন্দিন ছোটখাট বিরোধগুলি মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পরিষদ সহজেই মিটাইয়া ফেলিতে পারে—এমনকি ব্যাপক শিল্প-বিরোধকেও প্রতিরোধ করিতে পারে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শিল্প-আদালত বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবশ্যিক সালিসির (compulsory arbitration) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। চতুর্থত, শ্রমিক ও মালিক সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে শিল্পে নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলী (Code of Discipline) থাকিতে পারে এবং ঐ নিয়মাবলী ঠিকমত মান্য করা হইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ত্রিদলীয় কমিটি (Tripartite Committee) গঠন করা যাইতে পারে।

শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ ও মীমাংসার বিভিন্ন উপায়

শিল্প-বিরোধ আইন—ঐতিহাসিক পরিক্রমা (Industrial Disputes Acts—A Historical Survey): ১৯২১ সালে বাংলা ও বোম্বাই-এ শিল্প-বিরোধ দূরিকরণের উপায় সম্পর্কে বিচারবিবেচনার জন্য দুইটি কমিটি নিযুক্ত হয়। বাংলার কমিটি আইনের মাধ্যমে বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে এবং সংযুক্ত 'কার্য-সংসদের' (Works Committees) সাহায্যে বিবাদ-মীমাংসার

১। বোম্বাই ও বাংলার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা

জন্য সুপারিশ করে। বোম্বাই কমিটি মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি লইয়া 'অনুসন্ধান কোর্ট' (Courts of Enquiry) গঠনের জন্য আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে।

১৯২৮-২৯ সালের মধ্যে শিল্প-বিরোধের অবস্থায় বিশেষ অবনতি ঘটে। ফলে ১৯২৯ সালের ভারতীয় শিল্প-বিরোধ আইন (Trade Disputes Act, 1929) পাস হয়। এই আইনের ফলে বিবদমান একপক্ষ কোন সরকার বা রেল-কর্তৃপক্ষ হইলে ঐ বিবাদকে 'অনুসন্ধান কোর্ট' (Court of Enquiry) অথবা 'আপোষ বোর্ডে'র (Board of Conciliation) নিকটে পেশ করা যাইত। বিবদমান দল দুইটি ঐরূপ করিবার জন্য আবেদন জানাইলে সরকারকে এই পন্থা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইত।

২। ১৯২৯ সালের শিল্প-বিরোধ আইন

অনুসন্ধান কোর্ট সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দান করিত। অপরপক্ষে আপোষ বোর্ড দুই দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিত, এবং এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইলে বোর্ড নিয়োগকারী সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিত।

১৯২৭ সালের ব্রিটিশ শিল্প-বিরোধ আইনের অনুকরণে রচিত ১৯২৯ সালের এই আইনটিতে জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান (public utility concerns) এবং অন্যান্য শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালিককে ১৪ দিনের নোটিস না দিয়া কোন ধর্মঘট করা যাইত না।

ধর্মঘটের অধিকারকে সীমাবদ্ধকরণ

আইনটির তীব্র সমালোচনা করা হয়। শ্রম সম্পর্কিত রয়াল কমিশন মন্তব্য করে যে, ভারতীয় আইনটি গ্রেট ব্রিটেনের ব্যবস্থার অধিক মূল্যবান অংশকে পরিহার করিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশকে গ্রহণ করিয়াছে।* বিবাদ সুরু হইতে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সাহায্যে মীমাংসা করিবার জন্য কোন আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা এই আইনে করা হয় নাই। অবশ্য ১৯৩৮ সালে 'আপোষ কর্মচারী' (Conciliation Officers) নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া এই ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

আইনটির ত্রুটি: বিবাদ-মীমাংসার কোন আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা করা হয় নাই

ঐ সালেই বোম্বাই-এ যে শিল্প-বিবাদ আইনটি পাস করা হয় তাহাতেই ভারতে প্রথম 'শিল্প-আদালত' (Industrial Court) প্রবর্তিত হয়। ধর্মঘট কিংবা কারখানা বন্ধ করিবার পূর্বে নোটিস প্রদান প্রভৃতি কতকগুলি পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়।

৩। ভারতে প্রথম 'শিল্প-আদালত' প্রবর্তন

---

* **The Report of the Royal Commission on Indian Labour** ৩৩৮ পৃষ্ঠা

ইহার পর ১৯৪৬ সালে বোম্বাই-এর শিল্প-সম্পর্ক আইন পাস হয়। এই আইনে আবশ্যিক সালিসির ব্যবস্থা করা হয়। জনশৃংখলা ব্যাহত অথবা সর্বসাধারণের বিশেষ অসুবিধা বা সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইবার আশংকা আছে বলিয়া মনে করিলে সরকার, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে-কোন পক্ষ বিবাদকে শিল্প-আদালতের (Industrial Court) নিকট পেশ করিতে পারিত।

ভারতে প্রথম আবশ্যিক সালিসির ব্যবস্থা

সর্ব-ভারতীয় দিক হইতে দেখিলে ১৯২৯ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শিল্প-সংঘর্ষ সংক্রান্ত কোন আইনই পাস করা হয় নাই। যুদ্ধের সময় শিল্প-বিরোধ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ব্যাপক আপৎকালীন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। ভারতের প্রতিরক্ষা নিয়মাবলী (Defence of India Rules) অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিরক্ষা, জনশৃংখলা সংরক্ষণ, জনসাধারণের নিরাপত্তা, সম্যকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মঘট এবং কারখানা বন্ধকে নিষিদ্ধ করিতে পারিত।*

যুদ্ধের সময় শিল্প-বিরোধ নিয়ন্ত্রণ

বর্তমান ব্যবস্থা—ক। ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইন (The Present Provision : Industrial Disputes Act, 1947) : যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই শিল্প-বিরোধ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিল্প-বিরোধ আইন (Industrial Disputes Act, 1947) প্রবর্তন করে। এই কেন্দ্রীয় আইনটি উল্লিখিত ১৯৪৬ সালের বোম্বাই-এর আইনের অনুকরণে রচিত হয়। শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ (prevention) এবং মীমাংসা (settlement) উভয়ের ব্যবস্থাই এই আইনের দ্বারা করা হয়। বিভিন্ন দফায় সংশোধিত ১৯৪৭ সালের এই আইনই বর্তমান শিল্প-সংঘর্ষ সংক্রান্ত আইন। নিম্নে প্রথমে মূল আইনের বর্ণনা করিয়া পরে উহার বিভিন্ন সংশোধনের ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

বিরোধ প্রতিরোধ ও মীমাংসা—উভয়ের ব্যবস্থা

(১) মূল আইন অনুসারে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যাহাতে আলাপ-আলোচনার মনোভাব গড়িয়া উঠে তাহার জন্য শ্রমিক ও মালিকের প্রতিনিধি লইয়া 'কার্য-সংসদ' (Works Committees) গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা এখনও বর্তমান আছে। ১০০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে এমন যে-কোন শিল্প-মালিককে 'কার্য-সংসদ' গঠন করিবার নির্দেশ প্রদান করা যাইতে পারে। বলা হয়, 'কার্য-সংসদ' আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া দৈনন্দিন বিবাদগুলির মীমাংসা করিয়া শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহার্দাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করিবে। (২) এই আইন অনুসারে আবার সংশ্লিষ্ট সরকার বিবাদ-বিসংবাদ

ক। কার্য-সংসদের মাধ্যমে প্রতিরোধ

* The Indian Labour Year Book (1952-53) ১১০ পৃষ্ঠা

মীমাংসার উদ্দেশ্যে আপোষ কর্মচারী (Conciliation Officers) নিয়োগ এবং আপোষ বোর্ড (Boards of Conciliation), অনুসন্ধান কোর্ট (Courts of Enquiry) ও শিল্প-ট্রাইব্যুনাল (Industrial Tribunals) গঠন করিতে সমর্থ হয়।*

খ। অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে মীমাংসা

১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনে উক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে তিন পর্যায়ে শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ ও মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়। যথা, প্রথম পর্যায়ে কার্য-সংসদের মাধ্যমে বিরোধ প্রতিরোধের (prevention) প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় পর্যায়ে আপোষ কর্মচারী ও আপোষ বোর্ডের মাধ্যমে স্বেচ্ছামূলক সালিসির (voluntary arbitration) ব্যবস্থা এবং তৃতীয় পর্যায়ে শিল্প-ট্রাইব্যুনাল-আদালতের মাধ্যমে আবশ্যিক সালিসির (compulsory arbitration) ব্যবস্থা।

প্রতিরোধ ও মীমাংসার তিনটি পর্যায় : ১। প্রতিরোধ, ২। স্বেচ্ছামূলক সালিসি, ৩। আবশ্যিক সালিসি

শিল্প-বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিলেই কার্য-সংসদ সক্রিয় হইয়া উঠে ; উহা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করে। প্রতিরোধ সম্ভব না হইলে আপোষ কর্মচারী দুই পক্ষের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করে। আপোষ কর্মচারীর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইলে সরকার আপোষ বোর্ডের মাধ্যমে মিটমাটের আর একবার চেষ্টা করিতে পারে। আপোষ বোর্ডও বিফলকাম হইলে বিবাদটি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রথমে উহাকে অনুসন্ধান কোর্টের নিকট এবং পরে সংগৃহীত তথ্যাদি সহ শিল্প-আদালতের নিকট প্রেরণ করা হয়। শিল্প-আদালতের নিষ্পত্তি রায় (award) বাধ্যতামূলক। এইজন্যই শিল্প-আদালতের বিচারকে 'আবশ্যিক সালিসি' বলা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট সরকার অবশ্য ৩০ দিনের মধ্যে এই রায়কে প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তন করিতে পারে।

জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান (public utility services) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের একটি বৈশিষ্ট্য। জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সকল বিরোধকেই সরকারকে আপোষের জন্য পেশ করিতে হয় ; কিন্তু অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের স্বাধীনতা রহিয়াছে। তবে যে-ক্ষেত্রে দুই পক্ষই বিরোধকে বোর্ড কিংবা কোর্ট বা ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য আবেদন জানায় সে-ক্ষেত্রে সরকার উহা করিতে বাধ্য থাকে। জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট কিংবা কারখানা বন্ধের নোটিস দেওয়া হইলে সরকার উহাকে বাধ্যতামূলকভাবে আদালতের নিকট প্রেরণ করে।

আইনে জনস্বার্থ সম্পর্কিত শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের মধ্যে পার্থক্য

* ১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইনে এই শিল্প-ট্রাইব্যুনালের গঠনের পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে।

ধর্মঘট এবং কারখানা বন্ধ সম্পর্কে আইনে কতকগুলি বাধানিষেধ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। প্রথমত, উপযুক্ত পদ্ধতিতে নোটিস না দিয়া অথবা বিরোধ আপোষ কর্মচারীর বিবেচনাধীনে থাকাকালীন জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট বা কারখানা বন্ধ করা বেআইনী। দ্বিতীয়ত, যখন কোন বিষয় সম্পর্কে আপোষ বোর্ড অথবা শিল্প-আদালতের বিচারবিবেচনা চলিতে থাকে অথবা যখন কোন চুক্তি বা রায় কার্যকর থাকে তখন কোন-প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই ধর্মঘট বা কারখানা বন্ধ করা যায় না।

ধর্মঘট ও কারখানা বন্ধ সম্পর্কে বাধা-নিষেধ

১৯৫৬ সালের ব্যাপক সংশোধনের পূর্বে ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের তিনবার কিছু কিছু সংশোধন করা হয়। প্রথম বা ১৯৪৯ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানী সম্পর্কে বোর্ড, কোর্ট বা ট্রাইব্যুনাল গঠনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হস্ত হইতে লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করা হয়।* এইরূপ করিবার কারণ হইল ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসা ব্যাপারে ঐক্যসাধন করা।

বিভিন্ন সংশোধন ও বর্তমান ব্যবস্থা : ১। ১৯৪৯ সালের সংশোধন

দ্বিতীয় বা ১৯৫০ সালের সংশোধন দ্বারা আপিল-ট্রাইব্যুনাল (Appellate Tribunal) সৃষ্টি করা হয়। বিভিন্ন শিল্প-আদালত, কোর্ট, শিল্প-মজুরি বোর্ড প্রভৃতির রায় বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই আপিল-ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যাইত।** ১৯৫০ সালের এই সংশোধনটির মূলে ছিল দুইটি কারণ : (ক) বিভিন্ন রাজ্যের ট্রাইব্যুনালগুলি পরস্পরবিরোধী রায় প্রদান করিতেছিল বলিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতেছিল ; এবং (খ) আপিল করিবার কোন উচ্চতর সংস্থা না থাকায় ট্রাইব্যুনালগুলি যথেচ্ছভাবে কার্য করিতে সুযোগ পাইত।

২। ১৯৫০ সালের সংশোধন—আপিল-ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় বা ১৯৫৩ সালের সংশোধন অনুসারে ৫০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্তকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাময়িক শ্রমিক ব্যতীত অন্য শ্রমিককে বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া বসাইয়া রাখিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। আবার ন্যূনতম এক-বৎসরব্যাপী অবিচ্ছিন্নভাবে কার্য করিতেছে এমন কোন শ্রমিককে এক মাসের নোটিস বা তৎপরিবর্তে এক মাসের মজুরি এবং যে-কয় বৎসর সে কার্য করিয়াছে সেই কয় বৎসরের জন্য প্রতি ১৫ দিনের বেতন না দিয়া ছাঁটাই করা যায় না।

৩। ১৯৫৩ সালের সংশোধন

* সংশোধনী আইনটির নাম হইল **Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949**

** ১৯৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা এই আপিল-ট্রাইব্যুনাল উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সমালোচনা: শিল্প-বিরোধ আইনটির উপরি-উক্ত তিন দফা সংশোধন সত্ত্বেও শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ ও মীমাংসার সামগ্রিক ব্যবস্থা নানাভাবে সমালোচিত হয়। প্রথমত, সমগ্র দেশে এক-প্রকারের আইন প্রচলিত ছিল না। ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইন ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য আইন প্রণয়ন করিয়াছিল। ফলে শিল্প-বিরোধ আইনে বিভিন্নতা এবং বিশৃংখলা দেখা গিয়াছিল।

ক। সমগ্র দেশে এক-প্রকারের আইন প্রচলিত না থাকার দরুন বিশৃংখলা

দ্বিতীয়ত, আবশ্যিক সালিসির ব্যবস্থা অকাম্য বলিয়া অভিহিত হয়। যুদ্ধ বা তদনুরূপ সময়ে আবশ্যিক মীমাংসার ব্যবস্থাকে অনুমোদন করা হইলেও অন্যান্য সময়ে ঐ ব্যবস্থার সমীচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। বলা হয়, ইহাতে স্বেচ্ছামূলকভাবে বিবাদ-মীমাংসার মনোভাব গড়িয়া উঠে না; এবং সুস্থ ও সবল শ্রমিক-সংঘও প্রসারলাভ করে না। বরঞ্চ ইহাতে ট্রাই-ব্যুনাল আদালতের নিকট মামলা করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সর্বদা মনোমালিন্যের ভাব বর্তমান থাকায় শিল্পজগতে আবহাওয়া দূষিত হইয়া পড়ে।

খ। আবশ্যিক মীমাংসার ব্যবস্থা শিল্প-শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে

তৃতীয়ত, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহায়সম্বলহীন শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিবাদ জানাইবার একমাত্র অবলম্বন হইল ধর্মঘট। এই ধর্মঘটকে অকার্যকর করিয়া আইন শ্রমিকদের প্রতি অবিচার করিয়াছে, তাহাদের অসহায় অবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।* পরিশেষে সালিসির জন্য শিল্প-সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব হওয়ায় অনেক সময় সালিসি-কর্তৃপক্ষের রায় অযৌক্তিক হইয়া পড়ে।

গ। অন্যান্য ত্রুটি

সরকারও ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনটির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিল না। ফলে উহা ১৯৫০ সালে একটি ব্যাপক শিল্প-সম্পর্ক বিল (Industrial Relations Bill) রচনা করিয়া আইনে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ফলে বিলটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫২ সালে শ্রী ভি. ভি. গিরি শ্রমদপ্তর গ্রহণ করিবার পর ভারত সরকারের শ্রমনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভংগি কতকটা পরিবর্তিত হয়। তাঁহার মতে, শিল্প-বিরোধ মীমাংসার জন্য আবশ্যিক বিচার-মীমাংসার পরিবর্তে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও যৌথ চুক্তির (collective bargaining) আশ্রয় করাই সমীচীন হইবে। ইহাই "গিরি এ্যাপ্রোচ" (Giri Approach) নামে পরিচিত। এই উদ্দেশ্যে একটি বিলও রচিত হয়, কিন্তু উহা আইনে পরিণত হয় নাই। ইহার পর পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করে,* "বিবাদ-

শ্রমনীতি সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন

* Wadia and Merchant, *Our Economic Problem*

মীমাংসার জন্য যথাসম্ভব পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং স্বেচ্ছামূলক সালিসির আশ্রয়ই গ্রহণ করা হইবে" এবং এ-পর্যন্ত "শিল্প-বিরোধ মীমাংসার যে-ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত জটিল"। সুতরাং ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের আর একবার সংশোধন করিয়া পদ্ধতিতে সরলতা আনয়ন করা প্রয়োজন। ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে ঐ আইনের আর এক দফা সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন আইন ১৯৫৬ সালের শিল্প-বিরোধ (সংশোধন ও অন্যান্য ব্যবস্থা) আইন [Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1956] নামে পরিচিত। এই আইন চালু করা হইয়াছে ১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে।*

৪। ১৯৫৬ সালের সংশোধন

খ। ১৯৫৬ সালের শিল্প-বিরোধ সংশোধন আইন (Industrial Disputes Amendment Act, 1956): ১৯৫৬ সালের আইন বা ১৯৪৭ সালের আইনের চতুর্থ দফা সংশোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য তিনটি: (১) শিল্প-আদালত প্রভৃতি কর্তৃক বিরোধ-নিষ্পত্তির (adjudication) ব্যবস্থাতে সরলতা আনয়ন করা; (২) শিল্প আপিল-ট্রাইব্যুনালের বিলোপসাধন করা; এবং (৩) শ্রমিক স্বার্থের সহিত সংগতি বজায় রাখিয়া ১৯৩৭ সালের আইনের ৩৩ ধারা সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি দূর করা। আইনটির প্রধান প্রধান ব্যবস্থার বর্ণনা নিম্নলিখিতভাবে করা যাইতে পারে:

তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য

প্রধান প্রধান ব্যবস্থা

১। শ্রমিকের ব্যাপকতর সংজ্ঞা

প্রথমত, শ্রমিকের (workman) সংজ্ঞা ব্যাপকতর করিয়া সকল টেক্‌নিক্যাল ও ব্যবস্থাপক কর্মচারীদের (technical and supervisory personnel) ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

২। আপিল-ট্রাইব্যুনালের বিলোপ

দ্বিতীয়ত, ১৯৫০ সালের শিল্প-বিরোধ (আপিল-ট্রাইব্যুনাল) আইনকে বিলুপ্ত করিয়া আপিল-ট্রাইব্যুনালগুলির বিলোপসাধন করা হইয়াছে।

৩। তিন পর্যায়ের আদালত

তৃতীয়ত, ইহার পরিবর্তে তিন পর্যায়ের শিল্প-আদালত (three-tier system of labour courts) গঠন করা হইয়াছে। প্রথমে আছে কতকগুলি শ্রমিক-আদালত (Labour Courts)। ইহাদের কার্য হইল আইনের দ্বিতীয় তপশীলভুক্ত (second schedule) বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা। এই সকল বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে আছে স্থায়ী নির্দেশের (standing orders) অধীনে নিয়োগকর্তার বরখাস্ত ইত্যাদি করিবার ক্ষমতা, ধর্মঘট বা কারখানা বন্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারের আইনগত দিক, প্রভৃতি।

* Report of the Minister of Labour and Employment for 1959-60

দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে কতকগুলি শিল্প-ট্রাইব্যুনাল (Industrial Tribunals)। এই সকল ট্রাইব্যুনাল দ্বিতীয় ও তৃতীয় তপশীলভুক্ত বিষয়সমূহ—যথা, মজুরি, কার্যের সময়, বোনাস, র‍্যাসানালাইজেশন, ছাটাই প্রভৃতি লইয়া বিরোধের মীমাংসা করে।

পরিশেষে, এই বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে একটি জাতীয় শিল্প-ট্রাইব্যুনাল (a National Industrial Tribunal)। এই আদালত দুই প্রকার শিল্প-বিরোধের মীমাংসা করে: (ক) সরকারের মতে, যে-সকল শিল্প-বিরোধ, জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ; (খ) যে-সকল শিল্প-বিরোধের ফলে একাধিক রাজ্যে অবস্থিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

বিচারপতিগণের যোগ্যতা

উক্ত তিন পর্যায়ের শিল্প-আদালতের কোনটিতেই আপিলের ব্যবস্থা নাই বলিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিচারক নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। অন্যূন ৭ বৎসর সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অথবা অন্যূন ৫ বৎসরের শিল্প-আদালতের সভাপতির কাজ করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই নূতন শিল্প-আদালতের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করা হয়। শিল্প-ট্রাইব্যুনালের সভাপতিগণ হাই-কোর্টের বিচারপতি হিসাবে অথবা শিল্প আপিল-ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে অন্যূন ২ বৎসর কার্য করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হন।

৪। স্থায়ী নির্দেশের পরিবর্তনসাধন

চতুর্থত, স্থায়ী নির্দেশেরও (standing orders) কতকগুলি পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে। বর্তমানে ২১ দিনের নোটিস না দিয়া কোন নিয়োগকারী শ্রমিকের কার্যের অবস্থা সংক্রান্ত কোন পরিবর্তনসাধন করিতে পারিবে না। আবার পূর্বে একমাত্র নিয়োগকারী স্থায়ী নির্দেশ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করিতে পারিত; বর্তমানে শ্রমিককেও ঐ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

৫। ৩৩ ধারার সংশোধন

পঞ্চমত, ১৯৪৭ সালের আইনের ৩৩ ধারাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া রচনা করা হইয়াছে। মূল আইন অনুসারে শিল্প-বিরোধের জন্য আপোষ বা মীমাংসার প্রচেষ্টা চলিতে থাকাকালীন নিয়োগকর্তা কোন কারণেই শ্রমিককে স্পর্শ করিতে পারিত না। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে বিরোধের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এই কারণে নিয়োগকর্তা বিরোধের মীমাংসা চলিতে থাকা অবস্থাতেও শ্রমিকের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। অবশ্য এই ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদন করিয়া লইতে হয়। বলা হইয়াছে, নূতন ব্যবস্থার ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মানুবর্তিতা বৃদ্ধি পাইবে।

ষষ্ঠত, নিষ্পত্তি রায় (awards) সম্পর্কিত ধারাগুলিও নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এইরূপ রায় প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে ইহাদের কার্যকর

করিতে হইবে। সরকার কিন্তু রায়ের পরিবর্তন বা রায়কে বাতিল করিতে সমর্থ। নিষ্পত্তি রায় সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন আদালতে তোলা যাইবে না।

৬ নিষ্পত্তি রায়

পরিশেষে, কিন্তু এ-ব্যবস্থাও করা হইয়াছে যে বিবদমান পক্ষদ্বয় বিরোধ-মীমাংসার জন্য লিখিতভাবে স্বেচ্ছামূলক সালিসির আবেদন করিতে পারে। এইরূপ আবেদন পাইলে সালিস-কর্মচারী সালিসির ব্যবস্থা করিবে।

৭। সালিসি

১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইনের অনুসরণে কেন্দ্রীয় এলাকাধীন শিল্প-বিরোধ মীমাংসার জন্য দিল্লী ও ধানবাদে শিল্প-আদালত এবং দিল্লী ও বোম্বাই-এ শিল্প-ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হইয়াছে। রাজ্যগুলিতেও শিল্প-আদালত ও শিল্প-ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় ট্রাইব্যুনালগুলিকে প্রয়োজনমত স্থাপন করা হয় এবং কার্য শেষ হইলে উহাদের ভাঙিয়া দেওয়া হয়।

সমালোচনাঃ ১৯৫৬ সালের সংশোধন আইনও সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। প্রথমত, টেক্‌নিক্যাল ও ব্যবস্থাপক কর্মচারীদের 'শ্রমিক' পর্যায়ভুক্ত করায় শ্রমিক মহল হইতে বিশেষ আপত্তি উঠিয়াছে। কারণ, এই সকল কর্মচারী নিয়োগকারিগণেরই একাংশ।

১। শ্রমিকের ব্যাপকতর সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ

দ্বিতীয়ত, আপিল-ট্রাইব্যুনাল উঠাইয়া দিয়া শিল্প-বিরোধের পদ্ধতিকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহার দ্বারা ন্যায়বিচার ব্যাহত হইয়াছে। এখন বিবদমান পক্ষ দুইটি একটিমাত্র আদালতের চূড়ান্ত বিচার মানিয়া লইতে বাধ্য। ইহা অবশ্য বলা যায় যে আপিলের ব্যবস্থা থাকাকালীন শ্রমিক অপেক্ষা মালিকই ইহার সুবিধা অধিক ভোগ করিত। তবুও আপিল-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

২। আপিল-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রহিত করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই

তৃতীয়ত, ৩৩ ধারার পরিবর্তনসাধন করিয়া বিরোধ চলিতে থাকাকালীন নিয়োগকর্তাকে শ্রমিকের বিরুদ্ধে যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শ্রমিক-স্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

৩। শ্রমিক-স্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে

চতুর্থত, নিষ্পত্তি রায়ের পরিবর্তন করিবার যে-ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আদালতের বিচারের সংশোধন শাসন বিভাগ করিবে কেন?

৪। নিপত্তি রায় পরিবর্তনের ক্ষমতা সমর্থনযোগ্য নহে

অপরদিকে সংশোধন আইনটির যে কোন একটি সমর্থনযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা হইল বিবাদের যে-কোন পর্যায়ে স্বেচ্ছামূলক সালিসির (voluntary arbitration) ব্যবস্থা। বলা যায় যে,

এই ব্যবস্থাটি ছাড়া ১৯৫৬ সালে শ্রমবিরোধ সংশোধন আইনে শ্রীযুক্ত গিরির অনুপ্রেরণায় পরিবর্তিত সরকারী দৃষ্টিভংগি বিশেষ প্রতিফলিত হয় নাই। সুতরাং পরিকল্পনা কমিশনের উক্তি যে 'সংশোধন কাম্য পথেই করা হইয়াছে'* তাহা সমর্থন করা যায় না।

কিন্তু সালিসির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য

উপসংহার

আবশ্যিক সালিসির ব্যবস্থা কাম্য কি না? (Is Compulsory Arbitration Desirable ?) : আবশ্যিক সালিসির ব্যবস্থাকেই ১৯৪৭ ও ১৯৫৬ সালে শিল্প-বিরোধ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা যায়। এখন প্রশ্ন, আবশ্যিক সালিসি কাম্য কি না? এই প্রশ্নের সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিপক্ষে যুক্তিগুলি হইল এইরূপ: (১) শিল্পজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে স্বেচ্ছামূলক পারস্পরিক চুক্তি বা মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে হইবে। আবশ্যিক মীমাংসার দ্বারা শান্তিপূর্ণ শিল্প-সম্পর্ক স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না; এই ব্যবস্থায় মনোমালিন্যের মনোভাব সর্বদা বর্তমান থাকিবেই। অতি তুচ্ছ কারণেও বিবদমান দলগুলি আদালতের আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিবে। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা এই যুক্তিকেই সমর্থন করে। (২) শ্রমিক-সংগঠন ও আন্দোলন আবশ্যিক মীমাংসার ব্যবস্থার ফলে সুস্থ ও সরলভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। শ্রমিক-সংগঠনের প্রধান ভিত্তি ঐক্য। সামগ্রিক স্বার্থের জন্য সমবেতভাবে আন্দোলন চালানো এবং সংগ্রাম করিবার ফলেই ঐক্যভাব সুদৃঢ় হয়। কিন্তু আবশ্যিক সালিসি বা বিচার ব্যবস্থা এই ঐক্যভাব গড়িয়া উঠিবার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে। (৩) আবশ্যিক সালিসি বা বিচার ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের যে-আদর্শ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সহিত এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ।

বিপক্ষে যুক্তি

অপরদিকে আবশ্যিক বিচার-মীমাংসার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে: (১) ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে শিল্প-বিবাদ চলিতে দেওয়া হইলে উৎপাদন ও উন্নয়ন ব্যাহত হইবে। বিশেষত অত্যাবশ্যক জনস্বার্থ সম্পর্কিত শিল্পগুলির উৎপাদনকার্য ব্যাহত হইলে জনসাধারণের দুর্দশা বাড়িয়া যাইবে। (২) স্বেচ্ছামূলক সালিসি-মীমাংসার ব্যবস্থাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের। কিন্তু ভারতে সুদক্ষ শক্তিশালী শ্রমিক-সংগঠন এখনও গড়িয়া উঠে নাই। (৩) শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদও যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতারা নিজেদের স্বার্থের প্ররোচনায় কার্য করে। ফলে শিল্প-জগতে শান্তির পরিবর্তে বিশৃংখলারই সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থে আবশ্যিক বিচার-মীমাংসার ব্যবস্থাই কাম্য।

সপক্ষে যুক্তি

---

* Second Five Year Plan ৫৭৫ পৃষ্ঠা

উপসংহার: সপক্ষে যত যুক্তিই প্রদর্শিত হউক না কেন ইহা অনস্বীকার্য যে, পুরাপুরিভাবে আবশ্যিক বিচার-মীমাংসার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য। জনস্বার্থ সম্পর্কিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং জরুরী অবস্থায় এই ব্যবস্থা অনুমোদন-যোগ্য হইলেও অন্যান্য শিল্পে বা সময়ে এই ব্যবস্থাকে শিল্প-বিবাদ সমাধানের প্রকৃত পন্থা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই ব্যবস্থার ফলে যে শ্রমিক-সংগঠন দুর্বল হইয়া পড়ে এবং বিবাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি পায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং স্বেচ্ছামূলক বিচার-মীমাংসার উপরই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

শিল্পে শান্তিরক্ষাকল্পে অবলম্বিত অন্যান্য ব্যবস্থা (Other Measures for Promotion of Industrial Peace):

শিল্পে শান্তিরক্ষাকল্পে শিল্প-বিবাদ মীমাংসা ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা (২) পরোক্ষ ব্যবস্থা। প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা বলিতে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ (Workers' Participation in Management) ও মুনাফার ভাগাভাগি (Profit Sharing), শিল্পে নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলী (Code of Discipline) প্রবর্তন, বিভিন্ন শ্রমিক-সংঘের মধ্যে সুসম্পর্ক সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Code of Conduct) প্রবর্তন—এই তিনটিই প্রধান। ইহা ছাড়া বর্তমান জরুরী অবস্থায় শিল্পে শান্তি রক্ষা করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখার জন্য ১৯৬২ সালে নভেম্বর মাসে মালিক ও শ্রমিকদের এক কেন্দ্রীয় সম্মেলনে 'শিল্পে সাময়িক-শান্তি প্রস্তাব' (Industrial Truce Resolution, November 1962) গৃহীত হয়। পরোক্ষ ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় শ্রম-কল্যাণ ও শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টা—যথা, মজুরি-বৃদ্ধি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বাসগৃহ ইত্যাদি। নিম্নে অবলম্বিত প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাসমূহ লইয়া আলোচনা করা হইতেছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থা

ক। শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ (Workers' Participation in Management): দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প-পরিচালনা ব্যাপারে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলা হয়, ইহার ফলে উৎপাদন প্রসারলাভ করিবে, শ্রমিকরা শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থায় তাহাদের ভূমিকা উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং তাহাদের আত্মবিকাশের প্রেরণা পূরণ হইবে। বস্তুত, শিল্প-জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শ্রমিকদের শিল্প-পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে দিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশনের অনুসন্ধান দল (Study Group) পশ্চিমী দেশে এই অংশগ্রহণ ব্যবস্থা কিভাবে কার্য করে তাহা অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলি সুপারিশ করে। ১৯৫৮ সালে শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিরা মিলিয়া এই সুপারিশগুলির বিচারবিবেচনা করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশ-

গ্রহণের নীতিতে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে যথাসম্ভব কার্যকর করিতে হইবে। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ৩০টির অধিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তন করা হয়। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে একটি করিয়া 'পরিচালনা পরিষদ' (Management Council) স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিষদ পরিচালনা সংক্রান্ত যে-কোন বিষয়ে খবরাখবর করিতে পারে এবং ইহার উপরই শ্রম-কল্যাণ, শ্রমিকের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে। তৃতীয় ও পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে এই ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করিয়া ইহাকে শিল্প-পরিচালনার সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা যাইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।*

খ। মুনাফার ভাগাভাগি (Profit Sharing): মুনাফার ভাগাভাগি ব্যবস্থা শিল্পজগতে শান্তি বজায় রাখার একটি অন্যতম পন্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে শিল্প-মালিক শ্রমিকদিগকে মজুরি ছাড়াও উদ্বৃত্ত মুনাফার একটি অংশ প্রদান করে। ভারতের শিল্পনীতিতে শ্রমিক ও মালিককে শিল্পের অংশীদার হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অংশীদার বলিতে শিল্প হইতে অর্জিত লাভের অংশীদারত্বকেই বুঝাইতেছে। ভারতের শিল্প-ব্যবস্থায় ইহার গুরুত্ব খুবই বেশী। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যে লাভ হয় তাহার ন্যায়সংগত পরিমাণ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হইলে উহাদের মধ্যে একটি সন্তুষ্টির ভাব আসিবে এবং উহারা শিল্পের উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিবে। ইহা ছাড়া এ-ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকদের কার্য-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং শিল্প-বিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে। পরিশেষে বলা যায় যে মুনাফার ভাগাভাগি দ্বারা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে।

ভারতের শিল্প-ব্যবস্থায় মুনাফার ভাগাভাগির গুরুত্ব

মুনাফার ভাগাভাগি দ্বারা শিল্প-বিরোধ হ্রাস এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায় কি না, তাহা লইয়া স্বাধীনতার পর হইতেই আলোচনা চলিয়া আসিতেছে বলা যায়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে জাতীয় সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি (Profit Sharing Committee, 1948) নিয়োগ করে। রিপোর্টে কমিটি বলে যে, শুধু শিল্প-বিরোধ হ্রাস ও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির জন্যই নহে, শ্রমিকদের শিল্প-পরিচালনায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতিকার্য হিসাবেও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট

কমিটির মতে, মূলধন ও রিজার্ভের উপর শতকরা ৬ হারে লভ্যাংশ বিনিয়োগকারিগণের প্রাপ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত মুনাফার অর্ধাংশকে শ্রমিকদের মধ্যে তাহাদের মূল বেতনের অনুপাতে বণ্টন করিতে হইবে। শ্রমিকের মূল বেতনের শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত মুনাফার অংশ দেওয়া হইবে নগদ টাকায় এবং বাকী অংশ জমা পড়িবে শ্রমিকের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা অন্য কোন হিসাবে। কমিটি প্রথমে তুলাবস্ত্র, পাটকল, লৌহ ও

* Third Five Year Plan

ইস্পাত, সিগারেট, সিমেণ্ট ও টায়ার—এই ছয়টি সুসংগঠিত শিল্পে এই মুনাফা ভাগাভাগির ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে।

কমিটির রিপোর্ট অবশ্য সর্বসম্মত ছিল না। ফলে কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ইহার পর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মুনাফা ভাগাভাগির নীতি স্বীকৃত হইলেও বলা হয় যে, এ-বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রয়োজনীয় নীতি-নির্ধারণ করিতে হইবে।

আশা করা গিয়াছিল যে তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্তৃপক্ষ এই পথে উল্লেখ-যোগ্যভাবে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু তাহার পরিবর্তে ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রিদপ্তর একটি বোনাস কমিশন (Bonus Commission) নিয়োগ করিয়াছে। মুনাফা ভাগাভাগির ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বোনাসের প্রশ্ন আর থাকে না। চুক্তি অনুযায়ী অতিরিক্ত মুনাফা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। অপরদিকে বোনাসের ক্ষেত্রে শ্রমিকগণকে মালিকের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হয় বা বিরোধের পথে অগ্রসর হইতে হয়। যাহা হউক, বোনাস কমিশন নিয়োগের ফলে মনে হয় যে, কর্তৃপক্ষ বর্তমানে মুনাফা ভাগাভাগির প্রশ্নকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি আবার অতিরিক্ত মুনাফা কর (Super Profits Tax) ধার্য করার ফলে ইহার প্রবর্তনের সম্ভাবনার একরূপ অবসান ঘটিয়াছে।

বর্তমান অবস্থা

নিয়মানুবর্তিতা এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের মধ্যে সম্পর্ক (Code of Discipline and Code of Conduct): দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুসৃত শ্রমনীতি অনুসারে শিল্পে শান্তি আনয়নের জন্য নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলী (Code of Discipline) রচনা করা হয়। শ্রম সম্মেলন এবং স্থায়ী শ্রম কমিটি কর্তৃক ঐ নিয়মাবলী সমর্থিত হয়। যাহাতে পারস্পরিক বুঝাপড়া এবং সহযোগের মাধ্যমে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়, যাহাতে অযথা আদালতের দ্বারস্থ হইতে না হয় সেই আবহাওয়ার সৃষ্টিই এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্য। ১৯৫৮ সালের জুন মাস হইতে নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলীকে প্রবর্তন করা হইয়াছে।

নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা

১৯৫৮ সালের মে মাসে নৈনীতালে বিভিন্ন সর্ব-ভারতীয় শ্রমিক সংঘগুলি তাহাদের নিজেদের মধ্যে যাহাতে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহার জন্য নিয়মাবলী (Code of Conduct) সূচনা করে। এই উভয় নিয়মাবলীই মান্য করা হইতেছে কি না তাহার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহে কার্যকরকরণ সমিতি গঠন করা হইয়াছে। এই দুই নিয়মাবলীর ফলে শিল্প-সংঘর্ষের পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আদালতের পরিবর্তে এই ব্যবস্থার উপরই অধিক নির্ভর করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।*

বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সম্পর্ক

* Third Five Year Plan and Aims of India's Labour Policy by L. N. Misra

শ্রমিক সংঘ (Trade Unions) : ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক সংঘের প্রসার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। বহুপূর্ব হইতেই ভারতে শ্রমিক সংঘ গঠনের প্রচেষ্টা চলিলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক আন্দোলন সুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের এই মন্থর গতির মূলে রহিয়াছে সংঘবদ্ধভাবে সমস্বার্থসাধন করিবার দৃঢ় মনোভাবের অভাব। যখন উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা হইতে বিচ্যুত হইয়া একদল সহায়সম্বলহীন শ্রমজীবী গড়িয়া উঠে তখনই শ্রমিক সংঘ গঠনের পথ প্রস্তুত হয়। গ্রেট বিটেন প্রভৃতি দেশে যেমনভাবে শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল শ্রমিক দল গঠিত হইয়াছিল ভারতে তেমন হয় নাই। ভারতীয় শ্রমিক বহুদিন পর্যন্ত গ্রামের জমিজমার সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি অবশ্য শিল্পের উপর জীবিকার্জনের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল শ্রমিক দল গড়িয়া উঠিতেছে। শিল্পবিস্তারের ফলে নানা প্রকার সমস্যাও আসিয়া দেখা দিতেছে, এবং ফলে শিল্প-শ্রমিকগণও সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছে।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের মন্থর গতির কারণ

১৮৯০ সালে বোম্বাই মিল শ্রমিক সংঘের (Bombay Millhands' Association) প্রতিষ্ঠাকেই ভারতে শ্রমিক-আন্দোলনের গোড়াপত্তন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহার পর ১৯০৫ সালে কলিকাতায় মুদ্রক সংঘ (Printers' Association), বোম্বাই-এ ১৯০৭ সালে ডাক ইউনিয়ন প্রভৃতি গঠিত হয়। তারপর আসিল প্রথম মহাসমরের ঢেউ। যুদ্ধাবসানে চারিদিকে অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে মালিকশ্রেণী মুনাফা-শিকার করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছিল, অপরদিকে শ্রমিক মূল্যাধিক্যের চাপে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। ইহার সহিত আসিয়া যুক্ত হইল ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব। মজুরিবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত এবং শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রথমদিকে অবশ্য এই সংঘগুলি ধর্মঘট সংগঠনকারী কমিটি ভিন্ন কিছুই ছিল না। শ্রমিক আন্দোলন প্রসারে আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের (ILO) ভূমিকাও উপেক্ষা করিবার নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (International Labour Conference) প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ায় ১৯২০ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (All-India Trade Union Congress) নামে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯২০ সালের পর আর্থিক দুর্দশা, কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রী নেতাদের আন্দোলন ও ধর্মঘটের সফলতার ফলে শ্রমিক আন্দোলন বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়। কিন্তু ১৯২১ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্ট ইংল্যাণ্ডের প্রথাগত আইনকে (Common Law) অনুসরণ করিয়া এক রায় প্রদান করে যে, শ্রমিক সংঘগুলি অবৈধ

শ্রম-আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রসার

ষড়যন্ত্র মাত্র। ইহাতে শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা হইয়া পড়ে। ইহার পর যাহাতে শ্রমিক সংঘগুলি আইনগত স্বীকৃতিলাভ করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা চলিতে থাকে। পাঁচ বৎসর চেষ্টার পর ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাস হয় এবং শ্রমিক সংঘগুলির রেজিষ্ট্রারী করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রথমদিকে সংঘগুলি স্বল্প সংখ্যায় রেজিষ্ট্রারীভুক্ত হইলেও ক্রমশ উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইত্যবসরে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ ও কলহ দেখা দেওয়ায় আন্দোলনের গতি মন্থর হইয়া পড়ে। ১৯২৯ সালে শ্রম সংক্রান্ত রয়াল কমিশন বয়কট করিবার ব্যাপার লইয়া অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বিভক্ত হইয়া যায়, এবং ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (National Trade Union Federation) গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধে বুঝাপড়া হয় এবং আবার একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রাখিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। এই চুক্তি সত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধকে সমর্থন করা হইবে কি না এই প্রশ্নে আবার ভাঙন ধরে। শ্রী এম. এন. রায় এবং শ্রীযমুনাদাস মেটা যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (Trade Union Federation) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইনে শ্রমিক সংঘগুলির স্বীকৃতিলাভ

দলাদলির ফলে শ্রমিক সংঘগুলির মধ্যে ভাগাভাগি

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা শ্রমিক সংঘ আন্দোলন প্রসারে বিশেষ সহায়তা করে। ১৯৪৬ সালে শ্রমিক বিক্ষোভ চরমে উঠে। ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘট যেভাবে সফল হয় তাহাতে আন্দোলন বেশ কিছুটা শক্তি অর্জন করে। মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব সময়ের (১৯৩৯) তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে শ্রমিক সংঘ ও উহাদের সদস্যসংখ্যা যথাক্রমে ১৫ গুণ ও ৬ গুণে দাঁড়ায়।*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে শ্রম-বিক্ষোভ বৃদ্ধি

সম্প্রসারণ সত্ত্বেও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি ও মতবিরোধ বহু পূর্ব হইতে চলিতেছিল তাহার অবসান ঘটে নাই। ১৯৪৭ সালে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ কংগ্রেসপন্থী সংঘগুলি লইয়া ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (Indian National Trade Union Congress) নামে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। আবার সমাজতন্ত্রী দল যখন কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন তাহারা হিন্দুস্থান মজদুর পঞ্চায়েত (Hindusthan Mazdoor Panchayat) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। পরে ১৯৪৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবারের (Indian Federation of

বিভিন্ন দলীয় কেন্দ্রীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠান

* Indian Labour Journal, January 1960

Labour) সংগে মিলিত হইয়া হিন্দ মজদুর সভা (Hind Mazdoor Sabha) নামে পরিচিত হয়। ইহা ব্যতীত অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কচ্যুত আর একটি দল ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস (United Trades Union Congress) নামে অপর একটি সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্ত ভাগাভাগির ফলে স্বতই শ্রমিক আন্দোলন কতকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, ১৯৬০ সালের শেষ পর্যন্ত উপরি-উক্ত চারিটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ও সদস্যসংখ্যা যাহা ছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :*

প্রতিষ্ঠানের নাম	অন্তর্ভুক্ত সংঘগুলির সংখ্যা	মোট সদস্যসংখ্যা
ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস	৮৬০	১০,৫৩,৫৮৬
অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস	৮৮৬	৫,০৮,৯৬২
হিন্দ মজদুর সভা	১৯০	২,৮৬,২০২
ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস	২২৯	১,১০,০৩৪
মোট	২১৬৫	১৯,৫৮,৭৮৪

ভারতীয় শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের অসুবিধা (Difficulties of the Trade Union Movement in India) : ভারতীয় শ্রমিক সংঘ আন্দোলন অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের আন্দোলনের পর্যায়ে পৌছাইতে পারে নাই। যে-সমস্ত কারণে আন্দোলনের প্রসার ব্যাহত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

প্রথমত, ভারতে এখনও স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক গড়িয়া উঠে নাই।** শিল্পাঞ্চল হইতে গ্রামে এবং গ্রাম হইতে আবার শিল্পাঞ্চলে গমনাগমন সদাসর্বদাই চলে। ইহা ব্যতীত এক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া অন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যোগদান অনেক ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে। ফলে এই সমস্ত অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অধুনা অবশ্য স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক গড়িয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের অবসর সময়ের অভাব এবং দারিদ্র্য হইল আর একটি অসুবিধা। আন্দোলনে যতটা অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন সময়াভাবে শ্রমিকরা তাহা করিতে পারে না এবং যে-সামান্য মজুরি পায় তাহা হইতে সংঘের চাঁদা দিতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের কষ্ট হয়। অবশ্য সংঘবদ্ধ হওয়ার মূল্য

* India—1962

** ৩৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

উপলব্ধি করিতে পারিলে কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহারা সময় ও অর্থ দিয়া সংঘকে শক্তিশালী করিয়া তুলিত।

তৃতীয়ত, ভাষাগত, জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যসাধন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

চতুর্থত, মালিকশ্রেণী প্রায় ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংঘের বিরোধিতা করিয়া থাকে এবং সর্বতোভাবে উহাকে পংগু করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অথচ শক্তিশালী শ্রমিক সংঘই শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

পঞ্চমত, শিক্ষার অভাব এবং অদৃষ্টবাদ শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারকে বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। অশিক্ষার দরুন শ্রমিকদের সঠিকভাবে সংগঠিত করা সম্ভব হয় না; ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারে না।

ষষ্ঠত, অনেক ক্ষেত্রে সংঘগুলির কার্যপরিচালনায় গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভাবও পরিলক্ষিত হয়।

সপ্তমত, শ্রমিক সংঘগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ধর্মঘট এবং আন্দোলন চালাইবার সংস্থা হিসাবে কার্য করে। শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, তাহাদের চিকিৎসা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা প্রভৃতি সেবামূলক কার্যাদি কদাচিৎ করিয়া থাকে। এই সীমাবদ্ধ কার্যের দরুন সংঘগুলি শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের উদ্রেক করিতে পারে নাই।

পরিশেষে, ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের আর একটি প্রধান অসুবিধা হইল যে যাঁহারা আন্দোলনের পরিচালনা ও নেতৃত্ব করেন তাঁহারা বাহিরের লোক, শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন। এই সমস্ত পেশাদারী নেতা হইলেন আইন ব্যবসায়ী অথবা সমাজ সেবক। শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে তাঁহারা শ্রমিক-সমস্যাগুলি যতটা উপলব্ধি করিতে পারিতেন বর্তমান অবস্থায় ততটা তাঁহাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। অনেক সময় তাঁহারা একাধিক সংঘ পরিচালনা করিবার ফলে কোনটির প্রতিই সম্যক দৃষ্টি দিতে সমর্থ হন না। ইহা ব্যতীত অনেক শ্রমিক-নেতাই নিজেদের স্বার্থসাধন অথবা বিশেষ কোন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রমিক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা হইল আভ্যন্তরীণ। ইহা অবশ্য অনস্বীকার্য যে শ্রমিক আন্দোলন প্রসারের পথে বাহির হইতে বহু বাধা-বিপত্তি আসিয়াছে। যেমন, মালিকশ্রেণী কোন সময়ই শ্রমিক আন্দোলনকে সুনজরে দেখেন নাই। সরকারও অনেক ক্ষেত্রে মালিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই আন্দোলনের প্রসারকে ব্যাহত করিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান প্রতিবন্ধক

সম্প্রতি অবশ্য অবস্থার কতকটা উন্নতি হইয়াছে। বর্তমানে শ্রমিকরা তাহাদের অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন; তাহারা সংঘ গঠন করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে আগ্রহান্বিত। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিও সংঘগুলির শক্তিবৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিতেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ থাকায় ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনও শক্তিসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যে-সমস্ত আইন পাস করিয়াছে তাহাতেও শ্রমিক সংঘগুলিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রমিক আন্দোলনের সাম্প্রতিক উন্নতি

অবলম্বনীয় প্রতিবিধান (Suggested Remedies): শ্রমিক আন্দোলনের যে-সমস্ত দুর্বলতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলেই শ্রমিক সংঘগুলি শিল্পজগতে উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে; এবং ফলে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতিকার হিসাবে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে:

প্রথমত, শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে; আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতি এই শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সংঘগুলির কার্যের গণ্ডি প্রসারিত করিতে হইবে। সেবামূলক কার্যের মধ্য দিয়া শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ যোগাইতে হইবে।

তৃতীয়ত, আন্দোলন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শ্রমিকদের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক বাহির করিতে হইবে। শিক্ষাবিস্তারের ফলে ইহা করা সম্ভব হইবে।

চতুর্থত, শ্রমিক আন্দোলনের কার্যে যাহারা লিপ্ত হইবেন তাঁহাদিগকে শ্রমিক সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

পঞ্চমত, শ্রমিক সংঘগুলির কার্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করিতে হইবে।

ষষ্ঠত, যাহাতে সংঘগুলির আর্থিক অবস্থা কতকটা সচ্ছল হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সপ্তমত, মালিকশ্রেণীর দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনও প্রয়োজন। তাঁহাদের ইহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে সুসংগঠিত শ্রমিক সংঘ থাকিলেই শ্রম-বিবাদের সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ-মীমাংসার সুবিধা হয়।

পরিশেষে, বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিদ্বেষ বা রেষারেষিও দূর করা প্রয়োজন।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারের ঘোষিত শ্রমনীতি অনুসারে উক্ত প্রতিবিধানগুলির প্রায় সকলই অবলম্বিত হইয়াছে বা হইতেছে। শিক্ষার প্রসারের দ্বারা আভ্যন্তরীণ নেতা গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে, সেবামূলক কার্যের গণ্ডি প্রসারিত হইতেছে, সংঘের আর্থিক

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমিক সংঘ

সংগতিবৃদ্ধির জন্য ন্যূনতম চাঁদার হার ধার্য করা হইয়াছে এবং মালিক কর্তৃক সংঘের স্বীকৃতিলাভের জন্য আইনের আর একদফা সংশোধনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সুসম্পর্ক নির্ধারণের জন্য নিয়মাবলী (Code of Conduct) প্রবর্তন করা হইয়াছে।

শ্রমিক সংঘ সম্পর্কিত আইন (Trade Union Legislation): পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার দিকে শ্রমিক সংঘগুলি আইনগত কতকগুলি অসুবিধা ভোগ করিত। এমনকি ১৯২১ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্ট শ্রমিক সংঘকে বেআইনী ষড়যন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে।* বহু চেষ্টার পর ১৯২৬ সালে শ্রমিক সংঘ আইন (Trade Union Act, 1926) পাস হয়। ১৯২৮ সালে এবং ১৯৪২ সালে আইনটির কিছু কিছু সংশোধন করা হইলেও ১৯৪৭ সালের পূর্বে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ১৯৪৭ সালে এক সংশোধন আইনের দ্বারা শ্রম-আদালতের নির্দেশে মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রতিনিধিমূলক শ্রমিক সংঘকে স্বীকৃতিদান বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ১৯৬০ সালের সংশোধন দ্বারা সদস্যপিছু ন্যূনতম চাঁদা ২৫ নয়া পয়সায় ধার্য করা হয়।**

১৯২৬ সালে প্রথম শ্রমিক সংঘ আইন

উহার বিভিন্ন সংশোধন

বিভিন্ন দফায় সংশোধিত ১৯২৬ সালের শ্রমিক সংঘ আইনটির প্রধান প্রধান ধারা নিম্নে বিবৃত হইল:

প্রধান প্রধান ব্যবস্থা:

(১) যে-কোন শ্রমিক সংঘের ৭ বা ততোধিক সদস্য রেজিষ্ট্রারের নিকট সংঘকে রেজিষ্ট্রারীভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারে। রেজিষ্ট্রারীভুক্ত সংঘের পরিচালকগণের অন্তত অর্ধেককে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তি হইতে হইবে।

(২) রেজিষ্ট্রারীভুক্ত ইউনিয়নের সদস্য ও পরিচালকগণ সংঘের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যে-সমস্ত চুক্তি করিবেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ফৌজদারী দায়ে অভিযুক্ত করা যাইবে না। শিল্প-বিবাদের স্বার্থে কোন কার্য করা হইলেও ইহাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা রুজু করা যাইবে না।

(৩) সংঘের সাধারণ তহবিলের অর্থ যে-সমস্ত বিষয় আইনে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত বিষয়ের জন্যই মাত্র ব্যয় করা যায়। তবে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপের একটি আলাদা তহবিল সৃষ্টি করা যাইতে পারে। সংঘকে রেজিষ্ট্রারের নিকট বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে হয়।

(৪) কোন সংঘকে মালিক অস্বীকার করিবার ফলে বিবাদ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বন্দর, খনি প্রভৃতির বেলায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য

* ৩৭৯-৩৮০ পৃষ্ঠা দেখ।

** Indian Labour Journal, March 1961

ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিবাদের বিচারবিবেচনার জন্য শ্রম-আদালত (Labour Court) গঠন করিতে পারে। শ্রম-আদালতের আদেশে মালিককে সংশ্লিষ্ট সংঘকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তবে স্বীকৃত হইবার জন্য সংঘকে নিম্নলিখিত সর্তগুলি পূরণ করিতে হয়: (ক) সংঘকে রেজিষ্ট্রারীভুক্ত হইতে হইবে, (খ) সংঘের সাধারণ সদস্যগণকে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, (গ) সংঘটিকে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইতে হইবে, (ঘ) ধর্মঘট ঘোষণা করিবার পদ্ধতি নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং (ঙ) প্রত্যেক ছয় মাসে অন্তত একবার করিয়া সংঘের কার্যকরী কমিটির সভা আহ্বান করিতে হইবে।

স্বীকৃতি আদায় ও উহার সর্তাবলী

(৫) আইনে অন্যায় কার্য অনুষ্ঠানের অভিযোগে সংঘের স্বীকৃতি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অন্যায় কার্য বলিতে বুঝায়: (ক) অবৈধ ধর্মঘটে অধিকাংশ সদস্যের অংশগ্রহণ; (খ) সংঘের কার্যকরী কমিটি কর্তৃক অবৈধ ধর্মঘটের সমর্থন বা উহাতে উস্কানি প্রদান; এবং (গ) সংঘের পরিচালকবর্গ কর্তৃক মিথ্যা বিবরণী পেশ। অনুরূপভাবে মালিক যদি শ্রমিক সংগঠনে বা পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে, অথবা সংঘের কার্যে অংশগ্রহণ বা আইনত কোন অনুসন্ধান-কার্যে সাক্ষ্যপ্রদান বা অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য কোন শ্রমিকের প্রতি বিভেদ-করণ করে, অথবা যদি স্বীকৃত কোন সংঘের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে নারাজ হয় তাহা হইলে সে অন্যায় কার্য অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী হইবে; এবং তাহার ১ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

কৃতি প্রত্যাহারের ২স্থা

শ্রমিক সংঘ আইনের ত্রুটি (Defects of the Trade Union Act): উপরি-উক্ত আইনটির দুইটি বিশেষ ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। (১) আইনটি বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত শ্রমিক সংঘের রেজিষ্ট্রারীভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করে নাই; কতকগুলি সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করিয়া সংঘগুলিকে রেজিষ্ট্রারীভুক্ত হইতে উৎসাহিত করিয়াছে মাত্র। (২) ইহা ব্যতীত সাধারণ তহবিল এবং রাষ্ট্রনৈতিক তহবিলের মধ্যে যে-পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ, সংঘের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী এবং অন্যান্য কার্য অংগাংগিভাবে জড়িত, একেকে অপর হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব হয় না। ইহার দ্বারা অন্যায্যভাবে সাধারণ তহবিলের অর্থব্যয় সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দুইটি প্রধান ত্রুটি

১৯৫০ সালের ব্যাপক শিল্প-সম্পর্ক বিলে (Industrial Relations Bills)* শ্রমিক সংঘগুলিকে সুসংগঠিত করিবার ধারাও ছিল। বিলটি বাতিল হওয়ায় ধারাগুলিও কার্যকর হয় নাই। তবে ১৯৬০ সালের সংশোধন দ্বারা সদস্যদের

* ৩৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

চাঁদার হার ন্যূনতম ২৫ নয়া পয়সায় ধার্য করা হয়। অবশ্য তৃতীয় পরিকল্পনায় শ্রমিক সংঘ আইনের আরও সংশোধন করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু বলা হয় যে যেভাবেই শ্রমিক সংঘ আইনের সংশোধন করা হউক না কেন, আবশ্যিক সালিসি-ব্যবস্থার ফলে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন দুর্বল না হইয়া পারে না।*

শ্রমিক সংক্রান্ত আইন (Labour Legislation): প্রথম প্রথম সংগঠিত শিল্পের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিভিন্ন শ্রমিক আইন রচিত হয়। শ্রমিক আইন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রবর্তনের প্রয়োজন বহুদিন পর্যন্ত অনুভূত হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন (ILO) প্রতিষ্ঠার পর সরকারের দৃষ্টিভংগি কতকটা পরিবর্তিত হয় এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে কতকগুলি আইন রচিত হয়। ১৯৩৭ সালে প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর হইতেই শ্রমিকদের সমস্যাগুলির প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতে থাকে এবং শ্রমিক সংক্রান্ত বহু আইন প্রণীত হয়। কিন্তু এই সমস্ত আইন ব্রিটিশ ভারতের সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ছোটখাট অথবা অনিয়ন্ত্রিত শিল্পে (unregulated industries) নিযুক্ত বহু শ্রমিকই এই সমস্ত আইনের দ্বারা উপকৃত হয় নাই। ইহা ছাড়া ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি উভয়ই শ্রম সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। ইহাতে শ্রম-আইন এবং নিয়মকানুনগুলিতে বিভিন্নতা দেখা দেয়। এই বিভিন্নতা দূরিকরণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ অনুভূত হইতে থাকে। উপরন্তু, যুদ্ধ-প্রচেষ্টার স্বার্থে শ্রমিক ও মালিক সম্পর্কের উন্নতি-সাধন অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৪২ সালে সরকার, মালিক এবং শ্রমিকের প্রতিনিধি লইয়া আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের অনুকরণে গঠিত ত্রিদলীয় শ্রম-সংগঠন (Tripartite Labour Organisation) প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই সংগঠনের কার্য হয়: (ক) একই প্রকার শ্রম-আইন প্রবর্তনে সাহায্য করা; (খ) শিল্প-বিবাদ মীমাংসার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করা; এবং (গ) শিল্প-বিক্ষোভের বিচারবিবেচনা করা। এই ত্রিদলীয় সংগঠনের প্রচেষ্টায় শ্রম-আইন বেশ কিছুটা প্রসারলাভ করে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

শ্রম-আইনের উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টা

স্বাধীনতালাভের পর, বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পর, শ্রম-সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইতে থাকে। যাহাতে সমগ্র দেশব্যাপী একই প্রকারের আইন প্রচলিত হয় এবং যাহাতে শ্রমিকদের স্বার্থ অধিক মাত্রায় সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য নানা প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে শ্রম সম্পর্কে বহু আইন ও সংশোধন পাস করাও হয়। তৎসত্ত্বে এখনও

* B. N. Datar, Compulsory Adjudicati:n, Yojana—Third Plan Special Number

শ্রমিকদের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে স্বীকার করা হইয়াছিল যে, 'এখনও শ্রম উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।' তৃতীয় পরিকল্পনার দুই বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই বলা চলে।*

শ্রমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার আইন

এখন শ্রমিক সংক্রান্ত প্রধান প্রধান আইনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যাইতে পারে। শ্রমিক আইনগুলিকে মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) কার্যের সর্তাদি সংক্রান্ত আইন; (খ) মজুরি প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন; (গ) সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন; এবং (ঘ) শ্রমিক সংঘ ও শিল্প-বিবাদ সংক্রান্ত আইন।

ইহাদের মধ্যে শ্রমিক সংঘ ও শিল্প-বিবাদ সংক্রান্ত আইনগুলির আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

ক। কার্যের সর্তাদি সংক্রান্ত আইন (Legislation regarding Conditions of Work, etc.): কার্যের সর্তাদি সংক্রান্ত আইন বলিতে বুঝায় বিভিন্ন কারখানা আইন, খনি সংক্রান্ত আইন, পরিবহণ সংক্রান্ত আইন, রোপণ শিল্প সংক্রান্ত আইন এবং দোকান ও আপিস সংক্রান্ত আইন। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথম কারখানা আইন

(১) কারখানা আইন (Factories Acts): প্রথম কারখানা আইন পাস হয় ১৮৮১ সালে। এই আইন ও ইহার পরবর্তী সংশোধনসমূহে শিশু ও স্ত্রী শ্রমিকের নিয়োগ সম্বন্ধে বিভিন্ন বাধানিষেধ আরোপ করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের কার্যের সময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ব্রিটিশ আমলের শেষ কারখানা আইনে (১৯৪৬ সাল) প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের জন্য অস্থায়ী ও স্থায়ী কারখানাসমূহে কার্যের সময় ধার্য হয় যথাক্রমে ৫৪ ও ৪৮ ঘণ্টায়। ইহা ছাড়া এই আইনে পানীয় জল, বিশ্রামস্থান প্রভৃতি আবশ্যিক ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালের ব্যাপক কারখানা আইন

১৯৪৮ সালের কারখানা আইন (The Factory Act, 1948): স্বাধীন ভারতে ব্যাপক কারখানা আইন পাস হয় ১৯৪৮ সালে। পূর্ববর্তী আইনগুলির সংশোধন করিয়া এই আইনে শ্রমিক সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়। আইনটির গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

পরিধি (Scope): শক্তি-চালিত (power operated) এবং ১০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগকারী সকল কারখানাই এই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শক্তি-চালিত নহে এমন কারখানায় যদি ২০ বা ততোধিক শ্রমিক কার্য করে

* Industrial Labour in India, ILO Publication

তাহা হইলেও উহাদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হইবে। শক্তি-চালিত হউক বা না-হউক এবং শ্রমিকের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, উৎপাদনকার্য চলিতেছে এমন সমস্ত স্থানে এই আইনকে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হইয়াছে।

স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ (Health, Safety and Welfare): স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শ্রমিক-কল্যাণ সম্পর্কে আইনে বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলোবাতাস, ময়লা নিষ্কাশন, তাপ নিয়ন্ত্রণ, গ্রীষ্মকালে শীতল পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশ আইনে দেওয়া আছে। কারখানায় শ্রমিকপিছু কতটা করিয়া স্থান থাকিবে সে-সম্পর্কে আইনে ধারা নিবদ্ধ আছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিপজ্জনক বাষ্প ও বিস্ফোরক, অতি ভারী দ্রব্য উত্তোলন, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশও রহিয়াছে।

আইনটি শ্রম-কল্যাণকর ব্যবস্থাদিও করিয়াছে। প্রাথমিক চিকিৎসা, ক্যান্‌টিন, বিশ্রামাগার, শিশুসন্তান রাখিবার স্থান প্রভৃতি সম্পর্কে আইনে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৫০০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে এমন সমস্ত কারখানাকে শ্রম-কল্যাণ কর্মচারী (Welfare Officers) নিয়োগ করিতে হয়।

অল্পবয়স্কদের নিয়োগ (Employment of Young Persons): কারখানায় নিয়োগের ন্যূনতম বয়স করা হইয়াছে ১৪-১৫ বৎসর হইতে। ১৮ বৎসরের শ্রমিক কিশোর (adolescents) বলিয়া গণ্য। কার্য করিতে সমর্থ বলিয়া রেজিষ্টারীভুক্ত ডাক্তার প্রমাণপত্র না দিলে কোন শিশু বা কিশোরকে কারখানায় নিয়োগ করা যায় না; এবং প্রমাণপত্র মাত্র এক বৎসরের জন্য কার্যকর থাকে।

শ্রমের সময় (Hours of Work): এই আইনে প্রাপ্তবয়স্কদের শ্রমের সময় সর্বাধিক দৈনিক ৯ ঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশু ও কিশোরদের কার্যের সময় উহার অর্ধেক। রাত্রে নারী ও শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে অতিরিক্ত সময় (overtime) শ্রমের জন্য সাধারণ মজুরির হারের দ্বিগুণ মজুরি প্রদান করিতে হয়।

মজুরিসহ ছুটি (Leave with Wages): আইনে মজুরিসহ সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটির ব্যবস্থা আছে। প্রাপ্য ছুটি ভোগ করিবার পূর্বে কোন শ্রামককে ছাঁটাই করা হইলে অথবা সে কার্য পরিত্যাগ করিলে মালিককে তাহার প্রাপ্য ছুটির দরুন মজুরি দিতে হয়।

শিল্পগত ব্যাধি প্রভৃতি (Occupational Diseases): নির্দিষ্ট রকম দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু ঘটিলে অথবা আশংকাজনক শারীরিক আঘাত পাইলে অথবা শ্রমিকরা শিল্পগত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে ম্যানেজারকে ঐ সম্পর্কে

সংবাদাদি জানাইতে হয়। যে-ডাক্তার শিল্পগত ব্যাধির চিকিৎসা করিবেন তাঁহাকেও মুখ্য কারখানা পরিদর্শকের (Chief Inspector of Factories) নিকট রিপোর্ট প্রদান করিতে হয়। দুর্ঘটনা অথবা শিল্পগত ব্যাধি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য রাজ্য সরকার উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করিতে পারে।

কারখানা আইনের ফলাফল: কারখানা আইনগুলিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, কার্যের সর্ত, নিরাপত্তা প্রভৃতি সম্পর্কে যে-রকম ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে তাহাদের কর্মদক্ষতা ও অবস্থার উন্নতি না হইয়া পারে না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কারখানা আইন হইতে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় নাই। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে এই কারখানা আইন না থাকিলে যাহা সম্ভব হইয়াছে তাহাও সম্ভব হইত না। আশানুরূপ উন্নতি সাধিত না হইবার একাধিক কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, কারখানা পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ফলে কারখানা আইনের নির্দেশগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় না। মালিকরা যত রকমভাবে পারে আইন এড়াইয়া চলে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট শ্রমিকরা অজ্ঞতা ও সংগঠনের অভাবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে অপারগ। সুতরাং কারখানা আইনে যতটা সুযোগসুবিধা তাহাদের দেওয়া হইয়াছে তাহা তাহারা সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে না।

ফল আশানুরূপ হয় নাই, কারণ :

১। কারখানা পরিদর্শন: ব্যবস্থার অভাব

দ্বিতীয়ত, কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশের কিছুটা উন্নতি হইলেও শ্রমিকদের বাসগৃহাদির প্রতি এখনও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ফলে তাহারা একরূপ পূর্বের মতই শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বসবাস করিয়া কর্মদক্ষতা বজায় রাখা সম্পূর্ণ কঠিন।

২। বাসগৃহের উন্নতির অভাব

তৃতীয়ত, কর্মদক্ষতা জীবনধারণের মানের উপর নির্ভরশীল। তাহারা যে-মজুরি পায় তাহা দুর্মূল্যের বাজারে সুস্থ ও সবল জীবনধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং মাত্র কারখানা আইনের দ্বারা কারখানার আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতিসাধন করিলেই শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উন্নতি হইবে না। ইহা ব্যতীত কর্মদক্ষতার উন্নতির জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কারিগরি শিক্ষা, সুদক্ষ পরিচালনা, মালিকের উদার দৃষ্টিভংগির প্রসার প্রভৃতিও প্রয়োজন।

৩। পর্যাপ্ত মজুরির অভাব

(২) খনি সংক্রান্ত আইন (Mines Act): খনিতে কার্যের সর্তাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বপ্রথম আইন প্রণীত হয় ১৯০১ সালে। এই আইনে খনি পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পরে ইহার স্থানাধিকার করে ১৯২৩ সালের ভারতীয় খনি আইন (The Indian Mines Act, 1923)। এই

আইনে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৪৮ সালে নূতন ফ্যাক্টরী আইন পাস হইলে খনি আইনেরও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এইজন্য ১৯৫২ সালে খনি আইন পাস করা হয়। এই আইনটি সকল খনির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আইনে খনি-শ্রমিকদের কার্যের বয়স এবং কার্যের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারখানা আইনের মত ইহাতেও ছুটি ও বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। খনির নীচে রাত্রে নারী-শ্রমিক নিয়োগ করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সম্পর্কে ব্যবস্থা কারখানা আইনের ব্যবস্থার অনুরূপ। ১৯৪৮ সালে কয়লা খনি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং বোনাস পরিকল্পনা আইন (Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948) প্রণয়ন করিয়া বাধ্যতামূলক-ভাবে কয়লা খনি শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রবর্তিত হইয়াছে। আর একটি আইন দ্বারা কয়লা ও অভ্র খনিতে শ্রমিক-কল্যাণ তহবিল গঠন করা হইয়াছে। গৃহনির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য এই তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা হয়। ইহা ব্যতীত ১৯৪১ সালের খনি সংক্রান্ত প্রসূতি কল্যাণ আইনে (Mines Maternity Benefit Act, 1941) প্রসূতিদের সুবিধার ব্যবস্থাও আছে। ১৯৬১ সালের প্রসূতি কল্যাণ আইনের ধারা খনিগুলির পক্ষেও প্রযোজ্য।

১৯৫২ সালের খনি আইন

(৩) পরিবহণ সংক্রান্ত আইন (Transport Legislation): বর্তমানে পরিবহণ-শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন আইন আছে। রেলপথের ক্ষেত্রে যে নিয়মকানুন* প্রবর্তিত আছে তাহাতে রেলকর্মচারীদের চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—(১) অতি পরিশ্রমী (Intensive), (২) সবিরাম (Essentially Intermittent), (৩) অবিরাম (Continuous) এবং (৪) বহির্ভূত (Excluded)। অতি পরিশ্রমীদের সর্বাধিক সাপ্তাহিক শ্রম করিবার সময় হইল ৪৫ ঘণ্টা, সবিরাম কার্যরত কর্মচারীদের ৭৫ ঘণ্টা এবং অবিরাম কার্যরত কর্মীদের ৫৪ ঘণ্টা। মোটরগাড়ী চালকদের নিয়োগ, কার্যের সময়, বিশ্রামের সময় ইত্যাদি ১৯৩৯ সালের মোটর যানবাহন আইনের (The Motor Vehicles Act, 1939) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ডক শ্রমিকদের জন্য ১৯৪৪ সালে যে ভারতীয় ডক শ্রমিক আইন (The Indian Dock Labourers Act, 1944) পাস হয় তাহা ১৯৪৮ সালে কার্যকর করা হয়। এই আইনে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত ১৯৪৮ সালের ডক শ্রমিক (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) আইন [The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948] দ্বারা ডক শ্রমিকদের নিয়োগ, মজুরি, শিক্ষা, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

---

* **The Railway Servant's (Hours of Employment) Rules, 1951**

(৪) রোপণ শিল্প সংক্রান্ত আইন (Plantations Legislation) ঃ ১৯৫১ সালে যে রোপণ শিল্প শ্রমিক আইন (The Plantations Labour Act, 1951) পাস করা হয় তাহা চা কফি রবার এবং সিনকোনা রোপণ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইনটিতে শ্রমিকের বয়স, কার্যের সময়, বিশ্রাম, ছুটি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া চিকিৎসা, বাসগৃহ ইত্যাদি সম্পর্কেও নিয়মকানুন প্রবর্তিত করা হইতেছে। ১৯৬০ সালে আইনটির পরিধি ব্যাপকতর করা হইয়াছে।

(৫) দোকান ও আপিস সংক্রান্ত আইন (Shops and Offices Acts) ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪২ সালের সাপ্তাহিক ছুটি আইন (Weekly Holidays Act) দোকান রেস্তোরাঁ বা থিয়েটারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সপ্তাহে একদিন ছুটির ব্যবস্থা করে। বর্তমানে প্রায় সকল রাজ্য সরকারই দোকান আপিস সংক্রান্ত নিজস্ব আইন পাস করিয়াছে।

খ। মজুরি সংক্রান্ত আইন (Legislation in respect of Wages) ঃ মজুরি সংক্রান্ত আইন বলিতে বুঝায় মজুরি প্রদান এবং ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরি ধার্যকরণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন বা প্রণয়নের প্রচেষ্টা।

মজুরি প্রদান (Payment of Wages) ঃ মজুরি প্রদান সম্পর্কে পূর্বে নানা দুর্নীতি চলিত। মজুরি দিতে দেরি করিয়া এবং নানা অজুহাতে মজুরি কাটিয়া লইয়া মজুরদের হয়রান ও শোষণ করা হইত। এই অবস্থার অবসানকল্পে ১৯৩৬ সালে ভারত সরকার 'মজুরি প্রদান আইন' (The Payment of Wages Act, 1936) প্রণয়ন করে। পরে এই আইনের সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইন কারখানা, রেলপথ, রোপণশিল্প, খনি ও ডকে নিযুক্ত যে-সমস্ত ব্যক্তি ৪০০ টাকা বা তাহার কম বেতন বা মজুরি পায় তাহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাজ্য সরকারগুলি এই আইনকে অন্য যে-কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করিতে এবং নিজ নিজ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারে। আইনটির ফলে মজুরি প্রদানে অযথা বিলম্ব করা যায় না, মজুরি হইতে অন্যায়ভাবে জরিমানা কাটা যায় না এবং জরিমানা হইতে প্রাপ্ত অর্থ শ্রম-কল্যাণের জন্য ব্যয় করিতে হয়। তবে বাড়ীভাড়া, কার্যে অনুপস্থিতি, সমবায় সমিতির প্রাপ্য আদায় প্রভৃতির দরুন মজুরি হইতে টাকা কাটিয়া লওয়া যায়।

১৯৩৬ সালের মজুরি প্রদান আইন

ন্যূনতম মজুরি (Minimum Wages) ঃ মজুরির উপর শ্রমিকদের জীবনধারণের মান নির্ভর করে। জীবনধারণের মানের উপর আবার কর্ম-দক্ষতা অনেকখানি নির্ভরশীল। ভারতীয় শ্রমিকের মজুরি যে প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নহে তাহা সকলেই স্বীকার করে। অন্যান্য দেশের

মত আমাদের দেশেও শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য বহুদিন পূর্বেই আন্দোলন সুরু হয়। কানপুর শ্রম অনুসন্ধান কমিটি (The Cawnpur Labour Enquiry Committee), বোম্বাই বস্ত্রশিল্প শ্রম অনুসন্ধান কমিটি (The Bombay Textile Labour Enquiry Committee) মজুরিবৃদ্ধি ও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করে। শ্রম সংক্রান্ত রাজকীয় কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে, যে-সমস্ত শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা প্রয়োজন সেই সমস্ত শিল্প সম্পর্কে আইন পাস করা যাইতে পারে। ১৯২৮ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্র সংগঠিত শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিতে সম্মত হইলেও ভারত সরকার উহাতে কোন সম্মতি প্রদান করে নাই। ভারতীয় শিল্প মালিকরাও এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধা দেয়।

ন্যূনতম মজুরি ধার্যের জন্য আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ত্রিদলীয় শ্রম সম্মেলন (Tripartite Labour Conference) ন্যূনতম মজুরি আইন প্রণয়নের নীতিকে সমর্থন জানাইলে ১৯৪৬ সালে ঐ উদ্দেশ্যে এক বিল উত্থাপিত হয়। অবশেষে ১৯৪৮ সালে ন্যূনতম মজুরি আইন (The Minimum Wages Act, 1948) পাস হয়। এই আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কতকগুলি নির্দিষ্ট শিল্পে ও কৃষিতে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিয়া দিতে পারে। এই শিল্পগুলির মধ্যে আছে চাউলের কল, ময়দার কল, তামাকের কারখানা, চর্ম-শোধন কারখানা প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট সরকার প্রয়োজন বোধ করিলে অন্যান্য শিল্পেও এই আইন প্রয়োগ করিতে পারে। প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের মধ্যে ন্যূনতম মজুরির হারের পুনর্বিবেচনা করা হইবে। নির্দিষ্ট শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য যে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা হইবে মালিক তাহা অপেক্ষা কম মজুরি দিতে পারিবে না।

১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন—ইহার ব্যবস্থা

যে-যে শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা চলিবে

আইনটির ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া বর্তমানে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, মজুরির হারের পরিবর্তন ইত্যাদির জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে পরামর্শদান বোর্ড ও কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে, এবং পরামর্শদান বোর্ডগুলির কার্যের সমন্বয়সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শদান বোর্ডও (a Central Advisory Board) গঠন করা হইয়াছে।

পরামর্শদান বোর্ড ইত্যাদি

১৯৫৪ সালের ন্যূনতম মজুরি (সংশোধন) আইনে (Minimum Wages Amendment Act, 1954) নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত রাজ্যকে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিতে হইবে। ইহার ফলে কতকগুলি রাজ্য আইনকে কার্যকর করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পশ্চিমবংগে চাউলের কল, ময়দার কল, তেলের কল, পথনির্মাণকার্য, চর্ম-শোধন কারখানা প্রভৃতির

ন্যূনতম মজুরি ধার্যের সময় নির্দেশ বাঁতিল

ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়। কিন্তু উক্ত তারিখ অতিবাহিত করার পর দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কারণে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। প্রধানত, এই কারণেই ১৯৫৭ সালে ন্যূনতম মজুরি আইনের আর এক দফা সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনে বলা হয় যে ১৯৫৯ সালের মধ্যে কৃষি সমেত সকল প্রকার শ্রমিকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি আইনকে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা সম্ভব না হওয়ায় ১৯৬১ সালের সংশোধন দ্বারা আইনটি হইতে সময় নির্দেশ (time limit) সংক্রান্ত ধারাকে বাতিল করা হইয়াছে।

মজুরির হারের পুনর্বিবেচনার সময়বৃদ্ধি

দ্বিতীয়ত, মূল ১৯৪৮ সালের আইন অনুসারে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ধার্য ন্যূনতম মজুরির পুনর্বিবেচনা করিবার কথা ছিল। ইহাও সম্ভব না হওয়ায় ১৯৫৭ সালের সংশোধন দ্বারা পাঁচ বৎসর পরেও পুনর্বিবেচনা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সংশোধনী আইনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হইল মজুরির হার পুনর্নির্ধারণ (revision) পদ্ধতিতে সমতা আনয়ন করা, ন্যূনতম মজুরি আদায় ব্যাপারে দাবি-কর্তৃপক্ষকে (claims authority) অধিকতর ক্ষমতা প্রদান, আইনভংগকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং সরকারী ঠিকাদারদের ঠিকমত মজুরি প্রদানে বাধ্য করা।

অন্যান্য ব্যবস্থা

ন্যূনতম মজুরি ধার্যের পথে প্রতিবন্ধক

ন্যূনতম মজুরি আইন প্রয়োগ ব্যাপারে কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়। মালিকরা অনেক ক্ষেত্রে মজুরি আইন ও উহার নিয়মকানুনকে মানিয়া চলিতে চায় না এবং ধার্য মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি দিয়া থাকে। অনেক সময় আবার মালিক ধার্য মজুরি না দিয়াও শ্রমিকদের নিকট হইতে লিখাইয়া লয় যে তাহারা নির্দিষ্ট হারেই মজুরি পাইয়াছে। মালিকরা মজুরি সংক্রান্ত কাগজপত্রাদিও রাখে না ; ফলে আইনভংগ করিয়াছে কি না, তাহা ধরাও কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক সরকারের সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে, নিয়মিতভাবে সরকারী তদন্ত করা হইলে এবং শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারকার্য ও শিক্ষাবিস্তার করা হইলে এই দুর্নীতি অনেক পরিমাণে রোধ করা সম্ভব হইবে।

ন্যূনতম মজুরি ধার্যের নীতি (Principles or Norms of Minimum Wage Fixation) : ন্যূনতম মজুরি ধার্য ব্যাপারে আর একটি বিবেচ্য বিষয় হইল যে উহা কোন্ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া স্থির করা হইবে। এই সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালগুলি (Tribunals) যে-সকল রায় প্রদান করিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে ন্যায্য মজুরি কমিটির (Fair Wages Committee) মতামতই গৃহীত হইয়াছে। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বজায় রাখিবার জন্য যাহা আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন তাহাই ন্যায্য মজুরি এবং অন্য কোন বিষয়

বিচার না করিয়া তাহা শ্রমিককে দিতেই হইবে।* ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে (The Fifteenth Indian Labour Conference) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য কতকগুলি নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ভারতের সর্বত্র ঐ নীতিগুলি প্রয়োগ করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। এখন সম্মেলনের নীতিগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

ন্যূনতম মজুরি ধার্যের নীতি

উপরি-উক্ত ১৯৫৭ সালের পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে স্থির হয় যে ন্যূনতম মজুরি 'প্রয়োজনভিত্তিক' (need-based) হইবে এবং শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবে। এই উদ্দেশ্যে ন্যূনতম মজুরি ধার্যের ব্যাপারে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করিবার সুপারিশ করা হয়:

প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি

(১) প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি হিসাব করিবার সময় ধরিতে হইবে যে প্রত্যেক শ্রমিকের সংসারে শ্রমিককে ধরিয়া মোট ৪ জন করিয়া লোক আছে, (২) প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়ের যতটা ক্যালোরি-মূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত বলিয়া ডাঃ আকরয়েড (Dr. Akroyd) অভিমত দিয়াছেন তাহার ভিত্তিতেই ন্যূনতম খাদ্যের হিসাব করিতে হইবে,** (৩) মাথাপিছু ১৮ গজের ভিত্তিতে প্রত্যেক সংসারে বৎসরে ৭২ গজ কাপড় প্রয়োজন ধরিতে হইবে, (৪) সরকারী শিল্প গৃহ-পরিকল্পনায় (Industrial Housing Scheme) যে ন্যূনতম জায়গার কথা বলা হইয়াছে তাহার জন্য যতটা ভাড়া প্রয়োজন তাহা ন্যূনতম মজুরির হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে, এবং (৫) জ্বালানি, বাতি ও অন্যান্য ব্যয় মোট ন্যূনতম মজুরির শতকরা ২০ ভাগ বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই নীতিগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রমিকদের দুরবস্থা কতকটা লাঘব করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য শ্রমিকদের সহযোগিতা পাইতে হইলে নীতিগুলির ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি ধার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমে কর্তৃপক্ষ নীতিগুলিকে মানিয়া লইয়া যাহাতে ন্যূনতম মজুরি উহাদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি দেয়। পশ্চিমবংগ সরকার ন্যূনতম মজুরি ধার্যের সময় এই নীতিগুলি অনুসরণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। বিভিন্ন বোর্ড এবং কমিটিও নীতিগুলির ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি ধার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পরে অবশ্য নীতিগুলি ব্যাপকভাবে প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শিত হইতে থাকে।

নীতিগুলি কার্যকর করার ব্যবস্থা

* Indian Labour Gazette—February, 1957

** ডাঃ আকরয়েডের মতে একজন সাধারণ প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে ২০০০ ক্যালোরি-মূল্যের খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন।

হিসাব করিয়া দেখানো হয় যে এই নীতি অনুসারে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা হইলে উহা স্থান বিশেষে দাঁড়াইবে ১১০ টাকা হইতে ১৫০ টাকায়। বর্তমান অবস্থায় এই হারে ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হইলে অনেক শিল্পের পক্ষে টিকিয়া থাকা কঠিন হইবে। ইহার ফলে বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ঐ নীতি কার্যকর কারলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কারণ, উহার ফলে যে-পরিমাণ ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইবে সে-পরিমাণ অর্থসংস্থান করা সম্ভব হইবে না। আরও বলা হইয়াছে, মজুরিবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যাইবে এবং জিনিসপত্রের দামও বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষত, বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় ও মূল্যবৃদ্ধি পাইলে রপ্তানি সম্প্রসারণ সম্ভব হইবে না'

নীতিগুলি প্রবর্তনের বিরোধিতা

এইভাবে বিরোধিতার জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি ধার্যের উপরি-উক্ত নীতিসমূহের পুনর্বিবেচনা করা হইতেছে এবং এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে ভবিষ্যতে মজুরিবৃদ্ধির প্রশ্নের বিচার উৎপাদনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতেই করা হইবে।

ন্যায্য মজুরি (Fair Wages)ঃ ন্যূনতম মজুরি ধার্যের প্রশ্নের সহিত জড়িত রহিয়াছে ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন। ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, শ্রমিকরা যাহাতে সুস্থ সবল ও সহজ জীবনযাপন করিতে পায় তাহার জন্য আইন প্রণয়ন বা উপযুক্ত অর্থনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্র শ্রমিকদের জীবনধারণোপযোগী মজুরি প্রদানের চেষ্টা করিবে।* ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের উপযোগিতা অনস্বীকার্য; কিন্তু ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়। যাহাতে উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা যায়, যাহাতে শ্রমিকরা পরিজনবর্গ লইয়া কতকটা সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করিতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত মজুরি প্রদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে-সমস্ত শিল্পে মজুরি শোচনীয়ভাবে স্বল্প সেখানে উন্নতির পথে প্রথম সোপান হইল ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে বাঁচিয়া থাকিবার মত ব্যবস্থা করা। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিবার পরবর্তী ধাপ হইল সর্বত্র ন্যায্য মজুরি (fair wages) প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও বলা হইয়াছিল, শ্রমিকরা যাহাতে বর্ধিত হারে প্রকৃত মজুরি (real wages) পায় তাহার জন্য উপযুক্ত মজুরি-নীতি প্রবর্তিত করা প্রয়োজন; এবং এই নীতির মূল ভিত্তি হইবে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ন্যায্য অংশ শ্রমিকদের প্রদানের ব্যবস্থা করা।** দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়,

ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করাই যথেষ্ট নয়

জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নয়নের জন্য ন্যায্য মজুরি প্রদানের ব্যবস্থাও করিতে হইবে

* রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি—সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদ

** First Five Year Plan ৫৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা

ন্যায্য মজুরিতে শ্রমিকদের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।* তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য বর্ধিত বা ন্যায্য মজুরির প্রশ্নকে উৎপাদনবৃদ্ধির সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। যাহা হউক, সমাজতান্ত্রিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে ন্যায্য মজুরিতে শ্রমিকের অধিকারকে অস্বীকার করিতে পারে না, তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ নাই।

স্বাধীনতার পর হইতেই সরকার ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৭ সালে শিল্প-শান্তি সম্মেলন (Industrial Truce Conference) ন্যায্য মজুরি সম্পর্কে সুপারিশ করে। ফলে ১৯৪৯ সালে একটি ন্যায্য মজুরি কমিটি (Fair Wages Committee) নিযুক্ত হয়। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটি ন্যায্য মজুরি বিলও উত্থাপিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় বিলটি আইনে পরিণত হয় নাই।

ন্যায্য মজুরি কমিটি

এই প্রসংগে ন্যায্য মজুরি কমিটির (Fair Wages Committee) মতামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা প্রয়োজন। 'ন্যায্য মজুরি' সম্পর্কে কমিটির ধারণা হইল যে উহা 'জীবনধারণোপযোগী মজুরি'র (living wage) হার হইতে কম হইবে; কিন্তু 'ন্যূনতম মজুরি'র (minimum wage) হার হইতে অধিক হইবে। এখন আবার প্রশ্ন উঠে যে 'জীবনধারণোপযোগী মজুরি'র সংজ্ঞা কি? শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য যাহা নিতান্তই প্রয়োজন তাহাকে বলা হইয়াছে 'ন্যূনতম মজুরি', আর উন্নত ধরনের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাকে বলা হইয়াছে 'জীবনধারণোপযোগী মজুরি'।

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সকল শ্রমিকের উন্নত জীবনযাত্রার মানের উপযোগী মজুরি প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে যাহাতে শ্রমিকদের জীবনে কতকটা স্বাচ্ছন্দ্য আসে, ন্যায্য মজুরি ধার্যের মাধ্যমে তাহার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। এই ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের নিম্নতম ও উচ্চতম সীমা হইবে যথাক্রমে 'ন্যূনতম মজুরি' ও 'শিল্পের মজুরি প্রদানের সামর্থ্য' (the capacity of the industry to pay)। এই দুই সীমার মধ্যে থাকিয়া মজুরি ধার্য করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে: (১) শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা, (২) প্রচলিত মজুরির হার, (৩) জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও বণ্টন, এবং (৪) দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট শিল্পের স্থান।

ন্যায্য মজুরি কিভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে

নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট শিল্পের সামর্থ্যই হইবে শিল্পের মজুরি প্রদানের মাপকাঠি। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ

---

* Second Five Year Plan ৫৭১-৭৮ পৃষ্ঠা

ব্যাপারে আরও তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়—যথা, (১) মজুরি ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক; (২) ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থায় মজুরি প্রাপ্তি সম্পর্কে শ্রমিকদের আশা; এবং (৩) ন্যায্য মজুরি ধার্য না হওয়া পর্যন্ত মজুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে শিল্প-সংঘর্ষ।*

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ন্যায্য মজুরি

মজুরি ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাপারে বলা হয় যে, ন্যূনতম মজুরির উর্ধ্বে উপার্জন নিশ্চয়ই উৎপাদনের আপেক্ষিক হইবে। অর্থাৎ, **উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে তবেই মজুরি বাড়িবে।** ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থায় মজুরি প্রাপ্তি সম্পর্কে শ্রমিকদের আশা সম্বন্ধে বক্তব্য হইল যে, মজুরি কমিশন (Wage Commission) সময়ান্তরে ইহা নির্ধারণ করিতে থাকিবে; এবং মজুরি কমিশনের কাজ সহজ করিবার জন্য অবিলম্বেই মজুরি সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। পরিশেষে বলা হয় যে, ন্যায্য মজুরি ধার্য না হওয়া পর্যন্ত মজুরি সংক্রান্ত শিল্প-সংঘর্ষ মীমাংসার ভার ত্রিদলীয় (tripartite) মজুরি বোর্ডের (Wage Boards) হস্তেই দেওয়া উচিত।

উক্ত নীতি অনুসারে তুলাবস্ত্র, সিমেন্ট, চিনি ও রোপণ শিল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মজুরি বোর্ড (Central Wage Boards) গঠন করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় মজুরি নির্ধারণ ব্যাপারে দ্বিতীয় পরিকল্পনার নীতিকেই অনুসরণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য একটি ত্রিদলীয় মজুরি বোর্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়লা খনি শিল্পের মত সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া দ্বিদলীয় (bipartite) মজুরি বোর্ড গঠনের প্রচেষ্টাও করা হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ন্যায্য মজুরি

এইভাবে নির্ধারিত মজুরি 'ন্যায্য মজুরি' হইবে কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ইহাকে 'ন্যূনতম মজুরি' বলিয়াই অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ফলে (fruits of progress) শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ন্যায্য মজুরি কমিটির নির্দেশানুযায়ী এই দাবি কার্যকর করা যে প্রয়োজন, তাহাও বলা হইয়াছে।** কিন্তু কিভাবে ইহা করা সম্ভব তাহার ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুতরাং বলা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনা ন্যায্য মজুরির প্রশ্নকে কতকটা এড়াইয়া গিয়াছে।

(খ) সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন (Social Security Legislation): মাত্র আইনের দ্বারা মজুরি নির্ধারণ করিয়া

* Second Five Year Plan ৫৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা

** Third Five Year Plan ২৫৩ ও ২৫৬ পৃষ্ঠা

ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা বা দুর্ঘটনার চিন্তা হইতে শ্রমিককে রক্ষা করিতে না পারিলে তাহার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা সম্ভব হইবে না। যে-কোন সময় সে পীড়িত হইতে পারে, যে-কোন সময় কারখানায় তাহার দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে এবং যে-কোন সময় সে বেকার হইয়া পড়িতে পারে। এই সমস্ত অবস্থায় শ্রমিককে সাহায্যের ব্যবস্থা করা শুধু মানবোচিত কার্যই নয়, উৎপাদনের স্বার্থেও কাম্য। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমনীতির মূলসূত্র হইল শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। ভারতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। অবশ্য ইহার কারণও আছে। পাশ্চাত্য দেশে সামাজিক চেতনা যেভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে আমাদের দেশে তাহা হয় নাই। ঐ সকল দেশে শ্রমিকরা বিনা দোষে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলে সমাজ তাহাদের দায়িত্ব বহন করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ইহা ব্যতীত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমিকরা সুসংগঠিত এবং নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। ফলে মালিকশ্রেণী এবং রাষ্ট্রকে বাধ্য হইয়া শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা দিতে হয়। যাহা হউক, ভারতেও সম্প্রতি সমাজ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি কিছু কিছু প্রবর্তিত হইতেছে। তবে এখনও সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র ছাড়া ইহা মোটেই সম্প্রসারিত হয় নাই।*

সামাজিক নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থার গুরুত্ব

১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন (The Employees' State Insurance Act, 1948) প্রণীত হওয়ার পূর্বে ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (The Workmen's Compensation Act, 1923) এবং বিভিন্ন প্রদেশের প্রসূতি কল্যাণ আইনে (Maternity Benefit Acts) কিছু কিছু সমাজ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা করা হয়। শেষোক্ত এই দুইটি আইন যে-সমস্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় বীমা আইন প্রযুক্ত হইবে সেই সমস্ত অঞ্চলে কার্যকর হয় না, কারণ রাষ্ট্রীয় বীমা আইনেই ক্ষতিপূরণ এবং প্রসূতি কল্যাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(১) শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (The Workmen's Compensation Act): ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনটির একাধিকবার সংশোধন করা হইয়াছে। এই ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে কার্যব্যপদেশে দুর্ঘটনার ফলে কোন শ্রমিক অসমর্থ বা পংগু হইয়া পড়িলে অথবা তাহার মৃত্যু ঘটিলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। শিল্পগত ব্যাধির দ্বারা পংগু হইলেও শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। কেরানী ও পরিচালনাকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য যে-সমস্ত শ্রমিক ৪০০ টাকার নিম্নে বেতন পায় তাহাদের ক্ষেত্রেই এই আইন প্রযোজ্য। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতির গুরুত্বের উপর নির্ভর করে।

Third Five Year Plan ২৫৭ পৃষ্ঠা

শ্রমিকগণ এই আইনের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই, কারণ অধিকাংশ শ্রমিকই তাহাদের আইনগত অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইহা ছাড়া শিল্পগত ব্যাধির ক্ষেত্রে এই আইন একপ্রকার অকার্যকরই রহিয়া গিয়াছে।

এই আইন বিশেষ কার্যকর হয় নাই

(২) প্রসূতি কল্যাণ আইন (Maternity Benefit Acts) : ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম প্রসূতি কল্যাণ আইন পাস করে বোম্বাই সরকার। ইহার পর অন্যান্য রাজ্য বোম্বাই-এর অনুবর্তী হয়। বিভিন্ন রাজ্যের আইন ছাড়াও তিনটি কেন্দ্রীয় আইন প্রসূতি কল্যাণের ব্যবস্থা করে। আইন তিনটি হইল ১৯৪১ সালের খনি প্রসূতি কল্যাণ আইন (Mining Maternity Benefit Act, 1941), উপরিল্লিখিত শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন (Employees' State Insurance Act, 1948) এবং ১৯৫১ সালের রোপণ শিল্প-শ্রমিক আইন (Plantation Labour Act, 1951)। প্রসূতি কল্যাণের জন্য যাহাতে সকল অঞ্চল ও সকল শিল্পক্ষেত্রে একই রকম ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহার জন্য ১৯৬১ সালে একটি নূতন কেন্দ্রীয় আইন পাস করা হইয়াছে। যে-সকল অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় বীমা আইন প্রবর্তিত আছে সেই সকল অঞ্চল ছাড়া ইহা অন্য সকল স্থানেই প্রযুক্ত হয়।

(৩) শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা-ব্যবস্থা (Employees' State Insurance Scheme) : ১৯৪৮ সালের শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইনে (The Employees' State Insurance Act, 1948) যে বীমা ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। এইরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা পূর্বে করা হয় নাই এবং যথাযথভাবে কার্যকর করা হইলে ইহাতে শ্রমিকেরা প্রকৃতই উপকৃত হইবে। স্থির করা হইয়াছিল যে এই আইনটিকে প্রথমে কতকগুলি মনোনীত অঞ্চলে প্রয়োগ করিয়া পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত করা হইবে। এই ব্যবস্থায় মালিকপক্ষ হইতে আপত্তি উঠে। তাঁহারা বলেন, যে-সমস্ত অঞ্চলে আইনটি কার্যকর করা হইবে সেই সমস্ত অঞ্চলের মালিকদের অর্থপ্রদান করিতে হইবে বলিয়া অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পের তুলনায় তাঁহাদের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁহাদের অসুবিধা হইবে। প্রধানত এই আপত্তির দরুনই ১৯৫১ সালে আইনটির এক সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন অনুসারে পরিকল্পনার জন্য দেশের সকল শিল্প-মালিককেই অর্থপ্রদান করিতে হয়। তবে যে-সমস্ত অঞ্চলে বীমা পরিকল্পনাকে চালু করা হইয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলে মালিকদের উচ্চতর হারে অর্থপ্রদান করিতে হয়। বীমা আইনটির প্রধান প্রধান ব্যবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল :

সামাজিক নিরাপত্তার পথে বৃহৎ পদক্ষেপ

১৯৫১ সালের সংশোধন

পরিধি (Scope): এই আইন যে-সমস্ত শক্তিচালিত স্থায়ী কারখানায় ২০ বা ততোধিক শ্রমিক কার্য করে সেই সমস্ত কারখানার ক্ষেত্রে প্রথমে প্রযুক্ত হইবে। সংশ্লিষ্ট সরকার অবশ্য যে-কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইনটি প্রয়োগ করিতে পারে। ৪০০ টাকার নিম্নে যে-সমস্ত শ্রমিক এবং কেরানী মজুরি বা বেতন পায় তাহারাই এই আইনের সুযোগসুবিধা ভোগ করিতে পারে।

সাহায্য (Benefits): আইনে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারের সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে:

(ক) পীড়িতাবস্থায় সাহায্য (Sickness Benefit): পীড়িতাবস্থায় বীমাকারী শ্রমিক বৎসরে সর্বাধিক ৫৬ দিনের জন্য অর্থসাহায্য পাইতে পারে। দৈনিক সাহায্যের হার হইল সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের গড়পড়তা দৈনিক মজুরির অর্ধেক। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্য নির্দিষ্ট স্থানে চিকিৎসা করাইতে হ

(খ) প্রসূতিদের সাহায্য (Maternity Benefit): এই আইন শ্রমিক প্রসূতিদেরও অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। অর্থসাহায্যের হার হইল দৈনিক ১২ আনা। সন্তান প্রসবের ৬ সপ্তাহ পূর্ব হইতে সন্তান প্রসবের পর ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত এই সাহায্য দেওয়া হয়।

(গ) অকর্মণ্য অবস্থায় সাহায্য (Disablement Benefit): কার্যব্যপদেশে কোন দুর্ঘটনার ফলে যদি কোন বীমাকারী শ্রমিক সাময়িক বা স্থায়ীভাবে, সম্পূর্ণ বা অংশত অকর্মণ্য হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহারা অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে। সাময়িক অকর্মণ্যতার ক্ষেত্রে অর্থসাহায্যের হার হইল গড়পড়তা মজুরির অর্ধেক; আর স্থায়ী বা সম্পূর্ণ অকর্মণ্যতার জন্য সারাজীবন ঐ হারে অর্থসাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে।

(ঘ) পোষ্যদের সাহায্য (Dependents Benefit): কোন বীমাকারী শ্রমিকের কার্যব্যপদেশে দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানরা নির্দিষ্ট হারে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে।

(ঙ) চিকিৎসার সুবিধা (Medical Benefit): বীমাকারী শ্রমিক অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার সুযোগসুবিধা ভোগ করে। বিনামূল্যে ডাক্তার, ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থা এই বীমা পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। ব্যাধি কঠিন হইলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি এবং রোগীর বাড়ীতে ডাক্তার প্রেরণ করা হয়। যাহারা সুদূর গ্রামে বাস করে তাহাদের জন্য ভ্রমণশীল ডিস্পেন্সারীর (mobile dispensary) প্রবর্তন করা হইয়াছে। এমনকি বীমা করপোরেশন সম্ভব মনে করিলে বীমাকারী শ্রমিকদের পরিজনবর্গের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিতে পারে।

পরিচালনা ও অর্থ (Administration and Finance): এই বীমা পরিকল্পনার পরিচালনা শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা করপোরেশন (The Employees' State Insurance Corporation) নামে সংস্থার হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই করপোরেশন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, মালিক, শ্রমিক, চিকিৎসক ও সংসদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত।

রাষ্ট্রীয় বীমা করপোরেশন

পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য যে-অর্থ প্রয়োজন হয় তাহা শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা তহবিল (The Employees' State Insurance Fund) হইতে আসে। এই তহবিল শ্রমিক ও মালিক যে-অর্থ প্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যে-অর্থ মঞ্জুর বা সাহায্য করে তাহা লইয়া গঠিত। আয় অনুযায়ী বীমাকারী শ্রমিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বীমার হার নির্দিষ্ট হইয়াছে। মালিকদের ক্ষেত্রে তাহারা যে মোট মজুরি প্রদান করে তাহার শতকরা একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করিতে হয় তবে যে-সমস্ত অঞ্চলে পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে সেখানে মালিকদের উচ্চতর হারে অর্থ প্রদান করিতে হয়।

রাষ্ট্রীয় বীমা তহবিল

ব্যবস্থাটিকে সর্বপ্রথমে ১৯৫২ সালে কানপুর ও দিল্লীতে চালু করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ১৭ লক্ষ শ্রমিক সমম্বিত শতাধিক কেন্দ্রে প্রসারিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় যেখানেই ৫০০ বা ততোধিক শিল্প-শ্রমিক আছে সেখানেই আইনটিকে কার্যকর করা হইবে। ফলে মোট ৩০ লক্ষ শ্রমিক ইহার অধীনে আসিবে। এই পরিকল্পনায় সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের পরিজনবর্গের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে এবং শ্রমিকদের জন্য হাসপাতালে ৬ হাজার বিছানার ব্যবস্থা করা হইবে

ব্যবস্থাটির সম্প্রসারণ

(৪) শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-ব্যবস্থা (Employees' Provident Fund Scheme): সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রবর্তনের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া ফ্যাক্টরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রবর্তনের নির্দেশ দেয়। পরে এই অর্ডিন্যান্সের স্থান পূরণ করে ১৯৫২ সালের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন (The Employees' Provident Fund Act, 1952)। ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত এই আইনকে বয়ন, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ, সিগারেট, ইঞ্জিনিয়ারিং, দিয়াশলাই, চিনি প্রভৃতি ৪৩টি প্রধান* এবং ১৬টি

১৯৫২ সালের আইন

* Third Five Year Plan ২৫৭ পৃষ্ঠা

অপ্রধান এই মোট ৫৯টি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। পূর্বে এই সকল শিল্পভুক্ত যে-সকল প্রতিষ্ঠানে ৫০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত হইত তাহারাই এই আইনের আওতায় আসিত। বর্তমানে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানাসমূহকে পরিকল্পনাটির অধীনে আনা হইয়াছে। এই আইনানুসারে মালিককে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে শ্রমিকদের মজুরি এবং মাগ্‌গি ভাতার শতকরা ৬¼ ভাগ হারে অর্থ প্রদান করিতে হয়; শ্রমিকরাও ঐ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। তবে শ্রমিকরা ইচ্ছা করিলে শতকরা ৮⅓ হারে অর্থ প্রদান করিতে পারে। ১৯৬৩ সালের সুরু হইতে সিগারেট, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি উৎপাদন, লৌহ ও ইস্পাত এবং কাগজ—এই চারিটি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের অর্থপ্রদানের হার শতকরা ৬¼ হইতে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৮-এ লইয়া যাইবার জন্ম বিল আনয়ন করা হইয়াছে। উপরন্তু, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই ব্যবস্থার অধীনে আনিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পরিধি

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের গঠন

১৯৬১ সালের প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৫,২৪২টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠান এবং ৩০ লক্ষের উপর শ্রমিক এই ব্যবস্থাধীনে আসে। মোটামুটি আর ৩-৪ লক্ষ শ্রমিককে এই পরিকল্পনাধীনে আনয়ন করিলেই উহা সকল শিল্প-শ্রমিকের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইবে। আশা করা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যভাগেই এই কার্য সমাপ্ত হইবে।

ব্যবস্থাটির সম্প্রসারণ

এই ব্যবস্থা ব্যতীত কয়লাখনির শ্রমিকদের জন্ম বোনাস ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা ভারত সরকার করিয়াছে। এ-সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।* ১৯৫৬ সালের এক সংশোধন দ্বারা এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-ব্যবস্থাকে রোপণ শিল্প ও অন্যান্য খনি শিল্পে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সকল প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-ব্যবস্থা পেনসন্‌ ও গ্রাচুইটি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হইতে পারে।

কয়লাখনির প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও বোনাস ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমনীতি (Labour Policy under Planned Economy): প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রবর্তিত শ্রম আইনগুলিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিবার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্মিলিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিল্প-বিরোধের মীমাংসা এবং শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরিবৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-ব্যবস্থা প্রভৃতি সংক্রান্ত আইনগুলিকে কার্যকরকরণ; কারখানা, খনি ও রোপণ শিল্পে কার্যের সর্তাদির উন্নতিসাধন; শ্রম-কল্যাণ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শ্রমনীতি

---

* ৩৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মসূচী গৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত উৎপাদন সম্পর্কিত নানা সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শ্রম প্রতিষ্ঠান (Central Labour Institute) গঠনের প্রস্তাব করা হয়। পরিকল্পনাধীন সময়ে সরকার, শ্রমিক ও মালিকের সহযোগিতায় উক্ত প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করিবার ব্যবস্থাও করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শ্রমিক সম্পর্কে নীতির কোন বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই; তবে সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার নীতি অবলম্বনের দরুন কিছু কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। পরিকল্পনায় বলা হয়, শ্রমিক যে তাহার ক্ষুদ্র ভূমিকা লইয়া উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা গঠনে সাহায্য করিতেছে ইহা তাহার পক্ষে অনুভব করিবার প্রয়োজন আছে, এবং এই কারণে শিল্পগত গণতন্ত্রের (industrial democracy) সৃষ্টি হইল সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজের অন্যতম মূল সর্ত।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শ্রমনীতি

সমাজতান্ত্রিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় শিল্পক্ষেত্র (public sector) সম্প্রসারিত হওয়ায় এই ক্ষেত্রে কার্যের সর্তাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, কারণ সরকারী শিল্পক্ষেত্রের কার্যের সর্তাদিই হইবে ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রের (private sector) কার্যের সর্তাদির আদর্শ। সুতরাং পরিকল্পনা কমিশন উপযোগী শ্রমনীতি নির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালে একটি প্রতিনিধিমূলক শ্রম সম্পর্কিত প্যানেল (panel) গঠন করে। এই প্যানেল নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে:

(১) শ্রমিক সংঘ সম্পর্কিত নীতি: আইনের সাহায্যে শ্রমিক সংঘগুলিতে শিল্প-বহির্ভূত ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস করিতে এবং সংঘের কর্মচারীদের ভীতি প্রদর্শনের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে; নিজস্ব তহবিলের সাহায্যেই সংঘগুলিকে আর্থিক দিক হইতে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে এবং আইনগত স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(২) শিল্প-বিবাদ সম্পর্কিত নীতি: (ক) বিবাদ-মীমাংসার জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং স্বেচ্ছামূলক সালিসি-ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। সরকার মাত্র চরম অবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবে।

(খ) শিল্প-বিবাদ আইনে শ্রম-বিবাদ সংক্রান্ত রায় বা সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার বর্তমান ব্যবস্থা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য একটি স্থায়ী শিল্প ট্রাইব্যুনাল (a Standing Industrial Tribunal) গঠন করা প্রয়োজন।

(গ) সম্মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা (The Joint Consultative Machinery): সকল পর্যায়ে ভালভাবে কার্য করিতেছে না—যেমন, কার্য-সংসদগুলির (Works Committees) কার্য মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। সুতরাং আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে।

* Second Five Year Plan ৫৭২ পৃষ্ঠা।

(৩) শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ: দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য শ্রমিকদের শিল্প-পরিচালনায় অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণ করিতে দিতে হইবে। ইহাতে একদিকে শিল্প-বিবাদ হ্রাস পাইবে এবং অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রমিক এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি লইয়া সংযুক্ত পরিচালনা পরিষদ (Joint Management Council) গঠন করিতে হইবে।

(৪) মজুরি সংক্রান্ত নীতি: একদিকে উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করা যেমন প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি আবার শ্রমিকরা যাহাতে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ন্যায্য অংশ পায় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মজুরিনীতি নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। উৎপাদনের সহিত মজুরিপ্রদানের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে; তবে মজুরির একটা ন্যূনতম হার নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। মজুরি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার ভার ত্রিদলীয় মজুরি বোর্ডের (Tripartit Wages Board) উপরেই ন্যস্ত করা উচিত।

(৫) প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড: কর্মচারী বা শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পরিকল্পনাকে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

(৬) শ্রম-কল্যাণ: বিভিন্ন রাজ্যে অধিক শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্র (Welfare Centres) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং শ্রমিক ও মালিক সংগঠন এবং সরকার এই শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্রগুলির পরিচালনা করিবে।

প্যানেলের উপরি-উক্ত সুপারিশগুলির অধিকাংশই পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হইয়া পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে পরিকল্পনার শিল্প-শ্রমিক সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গঠিত হয়:

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

শ্রমিক সংঘকে সুসংগঠিত করা, প্রধানত পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও সালিসি-ব্যবস্থার মাধ্যমেই শিল্প সম্পর্কে উন্নতিসাধন করা, শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা আনয়ন করা, প্রথমে ন্যূনতম মজুরি এবং পরে ন্যায্য মজুরি ধার্যকরণ, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপকতর ব্যবস্থা, র‍্যাসানালাইজেশন সম্বন্ধে সতর্কতা, প্রায় ২০ হাজার অধিক শিক্ষার্থীকে শিল্প-শিক্ষা প্রদান করা, নিয়োগ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জাতীয় নিয়োগ সংস্থার (National Employment Service) প্রসার, শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধে অধিকতর গবেষণা, বাসগৃহাদির উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রকার শ্রম-অনুসন্ধান।

তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার শ্রমনীতিকেই মোটামুটি অনুসরণ করা হইয়াছে। তবে বলা হইয়াছে যে এই পরিকল্পনা শ্রমনীতির বিবর্তনে সহায়তা করিবে এবং উহার মৌলিক লক্ষ্যগুলিকে উপলব্ধির প্রচেষ্টা করিবে। এই মৌলিক নীতিগুলি হইল শ্রমিককে উন্নয়ন-ফলের (fruits of progress) ন্যায্য অংশ ভোগ করিতে দেওয়া,

তৃতীয় পরিকল্পনায় নীতি ও কার্যক্রম

যাহাতে তাহারা শিল্প-পরিচালনায় অধিক অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলী (Code of Discipline) প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্প-বিবাদ হ্রাস করা, মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে মজুরি ধার্য করা, শিল্প-শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির সম্প্রসারণ করা এবং বাসগৃহের আরও উন্নয়নসাধন করা। ইহা ছাড়া শ্রম-কল্যাণের অন্যান্য দিকের সম্প্রসারণের কথাও আছে।

শ্রম-কল্যাণ (Labour Welfare): শ্রম-কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনার সুরুতেই শ্রম-কল্যাণের অর্থ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টের সংজ্ঞানুসারে শ্রম-কল্যাণ হইল শিল্পাভ্যন্তরীণ বা শিল্পের সন্নিহিত স্থানে সংগঠিত সেই সমস্ত কল্যাণকর কার্য ও সুযোগসুবিধা যাহার ফলে শ্রমিকরা সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কার্য করিতে পারে এবং তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি সাধিত হয়। অর্থাৎ, শ্রমিকদের নৈতিক মানসিক শারীরিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের সমস্ত প্রচেষ্টাকে শ্রম-কল্যাণকর কার্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ক্যান্টিন, বিশ্রাম ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, চিকিৎসার সুযোগ, যাতায়াতের সুবিধা, বাসগৃহাদির ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, সমবায় প্রতিষ্ঠান, নারী-শ্রমিকদের জন্য শিশুরক্ষার স্থান, প্রসূতিকল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি শ্রম-কল্যাণের অন্তর্গত।

শ্রম-কল্যাণের সংজ্ঞা

শ্রম-কল্যাণের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। প্রথমত, শ্রম-কল্যাণকর কার্যাদি শিল্পে শান্তিপ্রতিষ্ঠার সহায়ক। রাষ্ট্র ও মালিকরা কল্যাণকর ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিলে তাহাদের প্রতি শ্রমিকরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করিবে না; এই ধারণা হইবে যে রাষ্ট্র ও মালিক তাহাদের কল্যাণের বিষয়ে নির্লিপ্ত নয়। শিল্পে শান্তিরক্ষার পক্ষে এই মনোভাবের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।

শ্রম-কল্যাণের গুরুত্ব

দ্বিতীয়ত, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির অভাবে স্থায়ী ও দক্ষ শ্রমিকশ্রেণী গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং অবিলম্বেই প্রয়োজন হইল পারিপার্শ্বিক অবস্থা উন্নয়নের ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বনের। বাসগৃহ, সমবায়-সংগঠন, ক্যান্টিন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেনসন্, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করা হইলে শিল্পাঞ্চলের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া শিল্পের উপর স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণী গঠিত হইবে। ফলে কার্যে অনুপস্থিত ও কর্মস্থল পরিত্যাগের হারও হ্রাস হইবে।

তৃতীয়ত, মানবতার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও সামাজিক দিক হইতে শ্রম-কল্যাণের মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। যথা, নিঃসংগ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপনের ফলে শ্রমিকরা নানাপ্রকার আবিলতার দিকে সহজেই আকৃষ্ট হয়; বাসগৃহ ও

আমোদপ্রমোদের সুবন্দোবস্ত করিয়া এই অবনতির হাত হইতে শ্রমিকদের রক্ষা করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। আবার চিকিৎসা, প্রসূতিকল্যাণ প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নয়ন এবং শিশুমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হয়। শিক্ষাবিস্তারের ফলে শ্রমিকদের মানসিক উৎকর্ষ ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রম-কল্যাণ বিভিন্ন দিক হইতে সমাজের কল্যাণ সাধিত করে।

শ্রমিকের প্রকৃত কল্যাণের জন্যই কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করিতে হইবে

এই প্রসংগে আমাদের একটি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন। শ্রমিকদের প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে উপযুক্ত মনোভাব লইয়া কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মালিকরা শ্রমিক সংঘগুলিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে ঐগুলিকে ব্যবহার করে; তাহারা সুযোগসুবিধা দান ব্যাপারে শ্রমিক সংঘের অন্তর্গত এবং অন্যান্য শ্রমিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকদের সংঘ পরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত করে। শ্রমিকদের কল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ অধিক প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। পরিণামে এই মনোভাব উভয় পক্ষেরই স্বার্থ বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে।

ভারতে প্রবর্তিত শ্রম-কল্যাণ ব্যবস্থা:

ভারতে যে-সমস্ত কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) যে-সকল কল্যাণ-ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে প্রবর্তিত হইয়াছে; এবং (২) যে-সকল ব্যবস্থাদি মালিকরা স্বেচ্ছায় প্রবর্তন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রমিকরা নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছু কিছু শ্রম-কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পর শ্রম-কল্যাণের সম্প্রসারণ

দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে সরকার শ্রম-কল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয় নাই। ভারত সরকার ঐ যুদ্ধের সময়ই প্রথম সক্রিয়ভাবে শ্রম-কল্যাণ প্রসারের চেষ্টা করে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের উৎসাহ-বর্ধন। স্বাধীনতালাভের পর ভারত যখন কল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করিল তখন স্বাভাবিকভাবে শ্রম-কল্যাণের উপর আরও গুরুত্ব প্রদান করা হইল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার ফলে বহু প্রকারের শ্রম-কল্যাণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা সম্ভব হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্রম-কল্যাণ তহবিল

কয়লাখনি ও অভ্রখনিগুলিতে শ্রম-কল্যাণ তহবিল (Labour Welfare Funds) প্রতিষ্ঠা, প্রধান প্রধান শিল্পে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড গঠনের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের জন্য সমাজ নিরাপত্তামূলক ও গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার প্রবর্তন, ফ্যাক্টরী, খনি ও রোপণ শিল্পে কার্যের সর্তাদি মানবোচিত করিবার জন্য আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রভৃতি কল্যাণকর ব্যবস্থাদির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কয়লাখনি শ্রম-কল্যাণ তহবিলের (The Coal Mines Labour Welfare Fund) সাহায্যে কয়লাখনির শ্রমিক ও তাহাদের পরিজনবর্গের চিকিৎসা, শিক্ষা, আমোদপ্রমোদ, ভ্রাম্যমাণ ক্যান্টিন, চলচ্চিত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থসংগ্রহ করা হয় কয়লা প্রেরণের উপর শুল্ক বসাইয়া।

কয়লাখনির মত অভ্রখনির জন্যও শ্রম-কল্যাণ তহবিল (Mica Mines Welfare Fund) রহিয়াছে এবং অনুরূপ উপায়ে এই তহবিলের অর্থ সংগ্রহ করা হয়। চিকিৎসার বন্দোবস্ত, নিরক্ষরতা দূরিকরণ, আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা প্রভৃতি শ্রম-কল্যাণমূলক কার্যাদির জন্য তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা হয়।

১৯৫১ সালের রোপণ শিল্প শ্রম আইনে (Plantations Labour Act, 1951) বিধান রহিয়াছে যে সকল রোপণ শিল্পকে শ্রমিকদের জন্য আবাসগৃহ এবং হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি, ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন, ১৯৫২ সালের খনি আইন প্রভৃতির মাধ্যমেও শ্রমিকদের কল্যাণসাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারখানা আইনে ক্যান্টিন, শিশু রক্ষণাবেক্ষণের স্থান, বিশ্রামের স্থান, স্নানাগার, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। খনি আইনেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাজ্য সরকারগুলির শ্রম-কল্যাণ প্রচেষ্টা

কেন্দ্রীয় সরকারের উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত রাজ্য সরকারগুলি নানাভাবে শ্রম-কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তৎকালীন বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে শ্রম-কল্যাণ তহবিল গঠনের নিমিত্ত আইন প্রণীত হইয়াছে। শরীর-চর্চা, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, শিশু রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির জন্য শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগে এই ধরনের অনেকগুলি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং শ্রমিকদের জন্য বিশ্রাম, আমোদপ্রমোদ, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার বিনা পয়সায় চিকিৎসার জন্য ডিস্পেন্সারি রহিয়াছে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রম-কল্যাণ প্রচেষ্টা

অনেক স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের উদ্যোগে শ্রম-কল্যাণের সুবন্দোবস্ত করিয়াছে। টাটার লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী, দিল্লীর কাপড় ও জেনারেল মিল (The Delhi Cloth and General Mills), মাদ্রাজের বাকিংহাম ও কার্ণাটিক মিল, কানপুরের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ও জে. কে. ইণ্ডাষ্ট্রিজ, নাগপুরের এম্প্রেস্ মিল, মাদুরা মিল, আমেদাবাদের ক্যালিকো মিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রম-কল্যাণের একটি বিশেষ দিক হইল শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহাদির সুবন্দোবস্ত করা। সম্প্রতি এদিকেও সরকার মনোনিবেশ করিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণের জন্য অর্থসাহায্য ও ঋণ প্রদানের নীতি

গৃহীত হয়। ১৯৫২ সালে যে 'সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্প গৃহনির্মাণ' (Subsidised Industrial Housing) পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে গৃহনির্মাণের ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সাহায্য এবং বাকী অর্থ ঋণ হিসাবে দেওয়া স্থির করে। মালিক ও শ্রমিকদের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গৃহনির্মাণের ব্যয়ের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ সাহায্য করা হয়। ইহা ব্যতীত ঋণদানেরও ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণের পরিকল্পনাকে সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। মালিক এবং সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে অধিকমাত্রায় গৃহনির্মাণকার্যে অগ্রণী হয় তাহার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই উদ্দেশ্যে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প-শ্রমিকদের বাসস্থান ও বস্তি অপসারণ প্রভৃতির জন্য মোট ৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।* পরিকল্পনায় শ্রমিকদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা এবং কারিগরি জ্ঞানপ্রসারের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the causes of comparative inefficiency of Indian labour. Suggest measures for removing the inefficiency (C.U. B. Com. 1948, '50) (৩৫৬-৩৬২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the causes of Industrial Disputes in India. What measures have been taken to promote industrial peace in the country? (C. U. B. A. 1951, '52, '57 ; B. Com. 1951, '52) (৩৬৪-৩৬৬, ৩৬৮-৩৭০, ৩৭২-৩৭৪ এবং ৩৭৬-৩৭৮ পৃষ্ঠা)

3. Explain the present position of the legal machinery for the settlement of industrial disputes in India. How far do you think compulsory arbitration should be adopted as means of settling such disputes in the country?
(C. U. B. A. 1954, '57 ; B. Com. 1953, '56, '61) (৩৬৮-৩৭৬ পৃষ্ঠা)

4. Describe and comment critically on the industrial disputes legislation in India. (C. U B. Com. 1960 ; B. U. (O) 1962) (৩৬৬-৩৭৫ পৃষ্ঠা)

5. Trace the evolution of the machinery for the settlement of industrial disputes in India. (C. U. B. Com. (P.I) 1963) (৩৬৬-৩৭০, ৩৭২-৩৭৪ পৃষ্ঠা)

6. Write a critical note on the Employees' State Insurance Scheme in India. (C. U. B. A. 1962) (৩৯৯-৪০১ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the possibilities and limitations of adopting profit sharing schemes in Indian industries. (C. U. B A. 1962) (৩৭৭-৩৭৮ পৃষ্ঠা)

8. Trace the growth of the Trade Union Movement in India. What obstacles have stood in the way of the development of the movement?
(C. U. B. Com. 1957 ; B. A. 1961)

[ইংগিত: ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাগুলি হইল—(১) স্থায়ী শিল্প-শ্রমিকের

* Third Five Year Plan ৬৮১ পৃষ্ঠা

অভাব; (২) শ্রমিকের দারিদ্র্য ও অবসর সময়ের অভাব; (৩) শ্রমিকের মধ্যে ঐক্যের অভাব; (৪) শিক্ষার অভাব ও অদৃষ্টবাদ; (৫) মালিক শ্রেণীর বিরোধিতা; (৬) গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভাব; (৭) সংঘগুলি ধর্মঘটের সংস্থা হিসাবেই কার্য করে; (৮) শ্রমিক নেতৃবর্গ বাহিরের লোক। এবং ৩৭৯-৩৮৩ পৃষ্ঠা]

9. Indicate some of the problems that Trade Unionism has had to face in India. What remedies do you suggest for solving the same ?

(C. U. B. Com. 1963) (৩৮১-৩৮৪ পৃষ্ঠা)

10. Would you advocate minimum wages for industrial workers in India ? Discuss the principles that may be followed in fixing minimum wage.

(C. U. B. A. 1959 ; B. Com. 1958) (৩৯১-৩৯৫ পৃষ্ঠা)

11. Give in brief the labour policy and programme of the Government of India under our planned economy. (৪০২-৪০৫ পৃষ্ঠা)

12. What do you mean by Labour Welfare ? Describe briefly the measures adopted in recent years for the welfare of industrial labour in India.

[ইংগিত: আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের রিপোর্ট অনুসারে শ্রম-কল্যাণ বলিতে বুঝায় শিল্পাভ্যন্তরীণ বা শিল্পের সন্নিহিত স্থানে সংগঠিত সেই সমস্ত কল্যাণকর কার্য ও সুযোগসুবিধা যাহার ফলে শ্রমিকেরা সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কার্য করিতে পারে—যাহাতে তাহাদের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল দিকের উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টাকেই শ্রম-কল্যাণ বলিয়া অভিহিত করা যায়।......এবং ৪০৫-৪০৮ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পরিবহণ

(Transport)

স্বল্পোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় পরিবহণের গুরুত্ব (Importance of Transport in an Underdeveloped Economy) : ইংরাজ কবি কিপলিং পরিবহণকে সভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পরিবহণ সভ্যতার বাহন ও সূচক উভয়ই। ইহা অজানাকে জানাইয়া, দূরকে নিকট বন্ধু করিয়া তুলিয়া সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থায় অকল্পনীয় পরিবর্তনসাধন করে। ইহা গ্রামাঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য ঘুচায়, জনগণের রক্ষণশীলতা দূর করে, শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি করে, বিক্রয়বাজারের প্রসারসাধন করে। আবার জাতীয় প্রতিরক্ষা, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ প্রভৃতির দিক দিয়াও পরিবহণের গুরুত্বকে কোন অংশে ন্যূন করিয়া দেখা যায় না। রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত তুলনা করিলে পরিবহণকে রাষ্ট্রের স্নায়ুমণ্ডলী বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

সামাজিক মূলধন গঠন

স্বল্পোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় পরিবহণের গুরুত্ব আরও অধিক। পরিবহণের অব্যবস্থা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অস্তিত্বের অন্যতম কারণ; এবং পরিবহণের সুব্যবস্থাকে উন্নয়ন-পরিকল্পনার (development planning) অন্যতম প্রধান উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়। পরিবহণ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণকে সামাজিক মূলধন গঠন (social capital formation) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থা (Indian Transport System) : ভারতের বর্তমান পরিবহণ-ব্যবস্থা প্রধানত ব্রিটিশ আমলের সৃষ্টি। এই পরিবহণ-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লর্ড ডালহৌসীর সময়।

বর্তমানে ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থা বলিতে রেলপথ, পথ পরিবহণ, আভ্যন্তরীণ জলপথ, সমুদ্রপথ এবং বিমানপথ বুঝায়।

ভারতে রেলপথের গুরুত্ব

রেলপথ (Railways) : রেলপথ ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিবহণ-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ইহাকে যথার্থই জাতির জীবনরেখা বলিয়া বর্ণনা করা চলে। ১৬০০ কোটি টাকার মত বিনিয়োজিত মূলধন এবং ৩৫·৫ হাজার মাইল দৈর্ঘ্য লইয়া ভারতীয় রেলপথ হইল বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় অন্যতম মূলভিত্তি। দৈর্ঘ্যের দিক দিয়া ভারতীয় রেলপথ

পৃথিবীতে চতুর্থ এবং এসিয়ায় প্রথম স্থানাধিকার করে। নিয়োগ-সংস্থা হিসাবেও ইহার সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রায় ১২ লক্ষ লোক ভারতীয় রেলপথে নিযুক্ত।*

ভারতে রেলপথ নির্মাণ (Construction of Railways in India) : ভারতে রেলপথ নির্মাণের ইতিহাস একরূপ বৈচিত্র্যময়। রেলপথ কখনও বা বেসরকারী উদ্যোগে, কখনও বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নির্মিত হইয়াছে। বেসরকারী উদ্যোগে নির্মাণের বিভিন্ন সময়ে সরকার বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন প্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

প্রথমে বেসরকারী উদ্যোগের উপরই রেলপথ নির্মাণের ভার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে সরকার বিভিন্ন রেল-কোম্পানী কর্তৃক বিনিয়োজিত মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ বা লভ্যাংশের গ্যারাণ্টি প্রদান করে এবং অতিরিক্ত মুনাফার অর্ধাংশ নিজে লইতে থাকে। কিছুদিন পরে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া সরকার নিজেই রেলপথ নির্মাণের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য সরকার বেশীদিন এই ভার বহন করিতে পারে নাই। শীঘ্রই আবার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণের নীতি পরিত্যক্ত হইয়া বেসরকারী উদ্যোগের উপর ভারার্পণের নীতি পুনঃগৃহীত হয়। এই পুনঃগৃহীত নীতিতে প্রতিশ্রুত লভ্যাংশের হার (rate of guaranteed dividend) কিছু কমাইয়া দেওয়া এবং অতিরিক্ত মুনাফার সরকারী প্রাপ্য অংশ কিছু বর্ধিত করা হয়।

রাষ্ট্র কর্তৃক রেলপথ পরিচালনা ও নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ

বিংশ শতাব্দীর সুরু হইতেই ভারতীয় রেলপথসমূহ বেশ মোটা রকমের মুনাফা করিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সরকার রেলপথের পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য কয়েকটি কমিটি নিযুক্ত করে। ইহাদের অন্যতম এ্যাক্ওয়র্থ কমিটির (Acworth Committee) সুপারিশ অনুসারে নীতি হিসাবে সরকার রেলপথ পরিচালনা ও নির্মাণের দায়িত্ব স্বীয় হস্তে গ্রহণ করে। ফলে ধীরে ধীরে কোম্পানী পরিচালিত রেলপথগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হইতে থাকে।

দেশবিভাগ

দেশবিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের ৪০·৫ হাজার মাইল রেলপথের মধ্যে প্রায় ৩৪ হাজার মাইল ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িলেও দেশের কয়েকটি অংশের মধ্যে রেলপথ সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে কয়েকটি রেলপথ স্থাপনকার্য অনতিবিলম্বেই সুরু করিতে হয়। স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত প্রায় ১·৫ হাজার মাইল নূতন রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে।**

সরকারী শিল্পনীতি

এ-সকলই সম্পাদিত হইয়াছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীনে। জাতীয় সরকারের শিল্পনীতি অনুসারে (Industrial Policy) রেলপথ রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে থাকিবে।

* India—1962 এবং Railway Budget, 1968

** Railway Budget Speech, 1968

ভারতে রেলপথ নির্মাণের অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic Effects of Railways in India) : ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় রেলপথের গুরুত্ব অনুধাবন করিবার ফলে এ-ধারণা করিয়া বসিলে ভুল করা হইবে যে, রেলপথ অর্থনৈতিক জীবনে অবিমিশ্র আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। একদিকে রেলপথ নির্মাণ যেমন শিল্প ও কৃষিতে বিপ্লব সংঘটিত করিয়া দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর আনয়ন করিয়াছে, অন্যদিকে ইহা তেমনি নানা অনিষ্টসাধনও করিয়াছে। নিম্নে এই ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইতেছে।

সুফল

বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করে। ভারতে ইহার ব্যবহার শিল্প ও কৃষি—উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লব সংঘটিত করে। পূর্বে কৃষি ছিল জীবিকানির্বাহের সূত্র ; রেলপথ স্থাপনের ফলে উহা বাণিজ্যিক রূপ গ্রহণ করে। মূলত ইহাই ভারতীয় কৃষিকে বিশ্বের বাজারের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

রেলপথ স্থাপন শিল্পোন্নয়নে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছে। পরোক্ষভাবে ইহা শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি করিয়া, কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্য সুলভে বহন করিয়া বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রসারে সহায়তা করিয়াছে। অপরদিকে রেলপথ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কয়লাখনি শিল্প প্রভৃতির উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিয়া উহাদের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ প্রেরণা যোগাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে রেলপথ স্থাপনই কয়লাখনি শিল্পের গোড়াপত্তন করে।

ভারতে রেলপথ স্থাপন দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য—উভয়েরই পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার ফলে বহু সুসংগঠিত বাজারেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

কুফল

এখন চিত্রের অপরদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, রেলপথ ভারতের প্রাচীন কুটির শিল্প ধ্বংস করিয়াছে, জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি করিয়াছে, ভারতের বহির্বাণিজ্যের ঔপনিবেশিক রূপদান করিয়াছে এবং বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে।

রেলপথ নির্মাণের ফলে বিদেশী যন্ত্রোৎপাদিত সুলভ পণ্যসমূহ এদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে ভারতের একদা বিশ্ববিশ্রুত কুটির শিল্প ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়।

ভারতীয় কুটির শিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে এদেশের কাঁচামাল রেলপথসমূহের মাধ্যমে বিদেশে চালান হইতে থাকে। ফলে ভারত হইয়া দাঁড়ায় কাঁচামাল রপ্তানি ও উৎপন্ন দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্র। এইরূপ বহির্বাণিজ্যকে ঔপনিবেশিক ধরনের বহির্বাণিজ্য (colonial type of foreign trade) বলে। ইহার ফলে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের বহু পরিমাণ ধ্বংস ঘটিয়াছে।

কুটির শিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ভূতপূর্ব কুটির শিল্পী কৃষিতে যাইয়া ভিড় করিতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ দিন দিন বাড়িতে থাকে

এবং কৃষির ক্ষেত্রে অর্ধ-নিয়োগের (underemployment) সমস্যা দেখা দেয়। এইভাবে অর্থনৈতিক জীবনে ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া ফেলিয়া ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হয়।

ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয় বৈদেশিক মূলধনের দ্বারা এবং রেলপথ স্থাপনের ফলে এদেশের কাঁচামাল ও সুলভ শ্রমের সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য বৈদেশিক মূলধন আমদানি হইতে থাকে। সুতরাং বৈদেশিক মূলধনের বেশকিছু ত্রুটি ইহার সহিত জড়িত।

উপসংহার

ভারতে রেলপথ স্থাপনের যে অর্থনৈতিক কুফল তাহার অধিকাংশের জন্যই দায়ী হইল বিদেশী শাসকের আর্থিক নীতি। এই নীতি যদি অন্যরূপ হইত তবে রেলপথ নির্মাণ ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে অবিমিশ্র আশীর্বাদই বহন করিয়া আনিত।

স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতিসাধন (Railway Development in Free India): স্বাধীন ভারত রেলপথ সংক্রান্ত দুইটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হয়: (ক) দেশবিভাগের ফলে ভারতের কয়েকটি অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের সমস্যা, এবং (খ) ভারতীয় রেলপথের পুনর্বাসনের সমস্যা। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় সমস্যাটিই ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ-সম্পর্কে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, ভারতীয় রেলপথ-সমূহের সম্মুখে গভীরতম সমস্যা হইল পুনর্বাসন ও সরঞ্জাম সরবরাহের সমস্যা।

দুইটি সমস্যা:
১। বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ পুনঃস্থাপন,
২। পুনর্বাসন

পুনর্বাসনের সমস্যাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ

স্বাধীনতার পূর্বে দুই দশক ধরিয়া ক্ষয়ক্ষতিপূরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই ভারতীয় রেলপথসমূহের সাজসরঞ্জামের অত্যধিক ব্যবহার করিয়া আসা হইতেছিল। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের সময় তাহাদের আয় কমিয়া যাওয়ায় অবপূর্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে নাই। ইহার উপর যুদ্ধের সময় বহু পরিমাণ রেললাইন মালগাড়ী রেল-ইঞ্জিন প্রভৃতিকে দেশের বাহিরে যুদ্ধক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হয়, অনেকগুলি শাখা লাইনকে উৎপাটিত করিয়া ফেলা হয় এবং কয়েকটি রেলওয়ে কারখানাকে যুদ্ধের উপকরণ উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত করা হয়।

যুদ্ধের পরেই আসিল দেশবিভাগ। ইহার ফলে ভারত হইতে কয়েকটি রেলপথের সহিত চলিয়া গেল সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কারখানাগুলি। অবিভক্ত ভারতের বাংলা-আসাম রেলপথের খণ্ডিকরণের ফলে স্বাধীন ভারতে আসামের সহিত দেশের অবশিষ্টাংশের কোন রেলপথ-সংযোগ থাকিল না। এই সংযোগ স্থাপনের জন্য আসাম-লিংক লাইন নির্মাণ করিতে হইল। করাচী বন্দর ভারত হইতে বিচ্যুত হওয়ায় নূতন কান্দলা বন্দরের সৃষ্টি করিতে এবং কান্দলা-দিসা (Kandala-Deesa) নামক নূতন রেলপথ স্থাপনকার্য আরম্ভ করিতে হইল।* উপরন্তু, যুদ্ধোত্তর

* **First Five Year Plan** ৪৬১-৬২ পৃষ্ঠা

যুগে ও দেশবিভাগের ফলে যাত্রী ও মাল চলাচলের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি রেলপথসমূহের দক্ষতার উপর অকল্পনীয় চাপ দিতে থাকিল।

এহেন পরিস্থিতিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু হইল। পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দ করা হয় ৪০০ কোটি টাকা কিন্তু ব্যয় হয় ৪৩২ কোটি টাকার উপর।*

প্রথম পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতিসাধন (Railway Development under the First Plan) : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যক্রমের মধ্যে পুনর্বাসনই প্রধান স্থানাধিকার করিয়াছিল।** পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাধীন সময়ে ৪৩০ মাইলের মত উৎপাটিত রেললাইনকে পুনঃস্থাপিত এবং ৪৬ মাইলের মত ছোট লাইনকে (narrow gauge lines) বড় লাইনে (broad gauge lines) পরিবর্তিত করা হয়; চিত্তরঞ্জনে রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা এবং টাটার ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা যথাক্রমে ৩৩৭টি ও ১৭০টি ইঞ্জিন নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়; এবং পেরাম্বুরের কোচ নির্মাণ কারখানা কার্য সুরু করে। ঐ পরিকল্পনায় রেলপথসমূহ দেশ ও বিদেশ হইতে মোট ১৫ শতের উপর ইঞ্জিন, ৪.৫ হাজারের উপর যাত্রীবাহী কোচ এবং ৬১ হাজারের উপর মালবাহী গাড়ী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

১। পুনর্বাসন

২। পবিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি

ইহা ছাড়া পুরাতন সাজসরঞ্জামের পরিবর্তনসাধন করা অনেকাংশে সম্ভব হয়। রেলওয়ে পরিবহণ-ব্যবস্থায় যুদ্ধপূর্ব যুগের পরিচালনার দক্ষতাও (operational efficiency) কতকটা ফিরিয়া আসে, এবং ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় রেলপথসমূহের যাত্রী ও মালপত্র পরিবহণের ক্ষমতা শতকরা ২৪.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়।†

৩। নূতন রেলপথ নির্মাণ

ঐ পরিকল্পনায় ৩৮০ মাইলের মত নূতন রেলপথ নির্মিত হয় এবং ৪০০ মাইলের উপর নূতন রেলপথ নির্মাণের কার্য সুরু হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধাকল্পে প্রথম পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর ৩ কোটি টাকা করিয়া বরাদ্দ করা হয়। উত্তর বিহারের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য মোকামার নিকট গংগা নদীর উপর পুল নির্মাণ এবং কলিকাতার নিকটবর্তী কয়েকটি লাইনের বৈদ্যুতিকরণের কার্যক্রম প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়েই গৃহীত হয়, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার কিছুদিনের মধ্যেই উভয় কার্য সমাপ্ত হয়।

৪। অন্যান্য উন্নয়ন-ব্যবস্থা

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতিসাধন (Railway Development under the Second Plan) : রেলপথের উন্নতি সংক্রান্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম দুই অংশে বিভক্ত—(ক) মূল পরিকল্পনার কার্যক্রম, এবং (খ) পরিবর্তিত পরিকল্পনার কার্যক্রম। উভয় কার্যক্রমেই অবশ্য যাত্রী ও মালপত্র বহনের বর্ধিত

* Review of the First Five Year Plan ২৩১ পৃষ্ঠা

** Third Five Year Plan

† Review of the First Five Year Plan

চাহিদা মিটানোকেই প্রধান লক্ষ্য করা হইয়াছিল এবং যাত্রীবহন ও মালপত্র বহন উভয়ই কার্যক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে অতিক্রম করিয়াছিল।*

কার্যক্রমের ছাঁটকাট

মূল পরিকল্পনায় পুনর্বাসন, পুরাতনের স্থলে নূতন লাইন পাতা, বৈদ্যুতিকরণ, রেলওয়ে কারখানাগুলির সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয়ে যে কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছিল পরিবর্তিত পরিকল্পনায় তাহার কিছু কিছু ছাঁটকাট করা হইয়াছিল।

বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ঐ পরিকল্পনায় ৮০০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপন, ৮ হাজার মাইল রেলপথে পুরাতনের স্থলে নূতন লাইন পাতা এবং চলমান সাজসরঞ্জামের (rolling stock) বিশেষ পরিমাণবৃদ্ধি সম্ভব হয়। আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতেই সাজসরঞ্জামের যোগানবৃদ্ধি ছিল ঐ পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অনুমান (৪২০ কোটি টাকা) অপেক্ষা অনেক কম (৩২০ কোটি টাকা) প্রয়োজন হয়।

ঐ পরিকল্পনায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আরও সুবিধা দেওয়া হয় এবং রেলওয়ে কর্মচারীদের কল্যাণের (welfare) জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হয়।

পরিকল্পনায় রেলপথের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১০৮০ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতিসাধন (Railway Development under the Third Plan): তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলপথ উন্নয়ন খাতে প্রথমে ১৩২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে উহাকে বর্ধিত করিয়া ১৪৭০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বর্ধিত ব্যয়বরাদ্দের অধিকাংশই যাইবে কয়লা বহন-ব্যবস্থার উন্নয়নে। ফলে অন্যান্য মালপত্র বহনের চাহিদা যে প্রাথমিক অনুমান (২৫ কোটি টন) অপেক্ষা ১ কোটি টনের (২৬ কোটি টন) মত অধিক হইবে বলিয়া ধরা হইতেছে, তাহার জন্য বিশেষ কিছু করা সম্ভব হইবে না। এই কারণে পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ব্যয় আরও বৃদ্ধি করিয়া ১৫৩৫ কোটি টাকায় লইয়া যাইবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ ও কার্যক্রম

এই ব্যয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: (১) রেলপথসমূহের মালপত্র বহনের ক্ষমতা শতকরা ৬০ ভাগের উপর (১৫২ কোটি টন হইতে ২৬০ কোটি টন) বৃদ্ধি করা; (২) যাত্রীবহনের ক্ষমতা শতকরা ১৫ ভাগ বর্ধিত করা; (৩) ১৭৫০-এর অধিক নূতন ইঞ্জিন, ৭৮০০-এর উপর যাত্রীবাহী কোচ এবং ১.১ লক্ষের মত মালগাড়ী সংগ্রহ করা; (৪) ১২০০ মাইলের মত নূতন রেলপথ নির্মাণ করা; (৫) কয়লাখনি শিল্পের উন্নয়নের জন্য আরও ২০০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণ করা; (৬) রেলপথসমূহের বহনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনেক স্থলে দুইটি করিয়া লাইন পাতা, ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার করা, ১১০০ মাইলের মত লাইনের বৈদ্যুতিকরণ সমাপ্ত করা; এবং (৭) রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য ৫৪ হাজার বাসগৃহ নির্মাণ করা।

* রেলমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, ১৯৬২

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৩২০ কোটি টাকার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলপথ-সমূহের জন্য মাত্র ২০৫-২১০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হইবে। রেলপথের সাজসরঞ্জামের আভ্যন্তরীণ যোগান যে কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়।*

রেলপথের পুনর্বিন্যাস (Regrouping of the Railways) ঃ স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতিসাধন প্রসংগে পুনর্বিন্যাসের (regrouping) সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় রেলপথসমূহ অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফলে পূর্ব-ভারতীয় রেলপথের (E I R) ন্যায় কোনটি ছিল অতি দীর্ঘ (৪৩৮০ মাইল) এবং আসাম রেলপথের ন্যায় কোনটি ছিল অতি ক্ষুদ্র (১২৪০ মাইল)। ক্ষুদ্র রেলপথসমূহের পরিচালনা ব্যয় ছিল অত্যধিক। উপরন্তু, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রেলপথ লইয়া গঠিত ব্যবস্থা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এই সকল কারণে ১৯৫০-৫১ সাল হইতে পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্যকর করা হয়।

পুনর্বিন্যাসের কাবণ

পুনর্বিন্যাসের ফলে প্রথমে ৬টি, মধ্যে ৭টি এবং শেষ পর্যন্ত ৮টি জোন (Zone) সৃষ্ট হয়। এই ৮টি জোন হইল—(১) উত্তর রেলপথ, (২) উত্তর-পূর্ব রেলপথ, (৩) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ, (৪) দক্ষিণ রেলপথ, (৫) মধ্য রেলপথ, (৬) পশ্চিম রেলপথ, (৭) পূর্ব রেলপথ, এবং (৮) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ।

প্রথম যখন ৬টি জোন সৃষ্টি করা হয় তখন মোটামুটি প্রত্যেক জোনে ৬০০০ মাইল রেলপথ ছিল। পরে ৬টি ভাঙিয়া ৮টি জোন করা হইলে দৈর্ঘ্যের এই সমতা আর বজায় থাকিল না। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বতন উত্তর-পূর্ব রেলপথের কিছু অংশ লইয়া গঠিত বর্তমান উত্তর-পূব সীমান্ত রেলপথের দৈর্ঘ্য মাত্র ১৭০০ মাইল।

পুনর্বিন্যাসের নানা বিরুদ্ধ সমালোচনাও করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটিই প্রধান—যথা, (ক) পুনর্বিন্যাসের ফলে পরিচালনার দক্ষতা হ্রাস পাইয়াছে, (খ) পুনর্বিন্যাস পরিকল্পিত পদ্ধতিতে করা হয় নাই। সমালোচনার দরুন বর্তমানে পুনর্বিন্যাসের পুনর্বিবেচনা করা হইতেছে। ফলে বর্তমানে আর এক দফা পুনর্বিন্যাস ঘটিতে পারে।**

বিরুদ্ধ সমালোচনা

রেলপথের আয়-ব্যয় (Railway Finance) ঃ ভারতীয় রেলপথের আয়-ব্যয় বলিতে দুইটি বিষয় বুঝায় ঃ (১) রেলপথসমূহের সামগ্রিক আয় ও ব্যয় এবং ইহার ফলে রেলপথ পরিচালনায় লাভ-ক্ষতি, এবং (২) রেলপথের আয়-ব্যয়ের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের সম্পর্ক। এই দুইটি বিষয়েরই আলোচনা কিছু ঐতিহাসিক পটভূমিকায় করা প্রয়োজন।

মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রেলপথ পরিচালনার ফলে সরকারের

---

* Third Five Year Plan and the White Paper issued by the Ministry of Railways in February, 1962

** রেলমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, ১৯৬৩

বিরাট ক্ষতি হয়। ইহার পর হইতে রেলপথসমূহ লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং ইহা এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার পর্যন্ত বজায় থাকে। ইহার পর ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত রেলপথসমূহের আয় এত কমিয়া যায় যে, ইহাদের পক্ষে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর নির্দিষ্ট সুদ বা ডিভিডেণ্ড প্রদান করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

রেলপথের পরিচালনার লাভ-ক্ষতি

ইতিমধ্যেই ১৯২৪ সালের এ্যাক্ওয়র্থ কমিটির (Acworth Committee) সুপারিশ অনুসারে রেলপথসমূহের আয়-ব্যয়কে সাধারণ আয়-ব্যয় (general finances) হইতে পৃথক করা হইয়াছিল এবং প্রতি বৎসর একটি পৃথক রেলওয়ে বাজেটও প্রস্তুত করা হইতেছিল।

সাধারণ বাজেট হইতে রেল বাজেটের পৃথকিকরণ

এ্যাক্ওয়র্থ কমিটি রেলপথের আয়-ব্যয়কে কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ আয়-ব্যয় হইতে পৃথকিকরণের সুপারিশকালে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিয়াছিল: রেলপথ হইল অন্যতম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং যে-নিয়মাবলী সরকারের অন্যান্য বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত তাহা রেলপথের ক্ষেত্রে সম্যক্ভাবে প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। যেমন, অন্যান্য বিভাগের বেলায় ৩১শে মার্চের মধ্যে বরাদ্দ অর্থের যে-অংশ ব্যয় করিতে না পারা যায় তাহা বাতিল হইয়া যায়। রেলপথসমূহের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করিলে বিশেষ অসুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া রেলপথসমূহের পক্ষে ক্ষয়ক্ষতিপূরণের অবপূর্তি তহবিলের (Depreciation Fund) উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রেলপথসমূহের আয়-ব্যয় সরকারের সাধারণ আয়-ব্যয়ের সহিত জড়িত থাকিলে সম্যক্ বাণিজ্যিক হিসাবরক্ষণের অভাবে ইহা সম্ভব হয় না। সুতরাং পরস্পরকে পৃথক করা প্রয়োজন।

পৃথকিকরণের পর সাধারণ ও রেলপথের আয়-ব্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ১৯২৪ সালের পৃথকিকরণ প্রথা (Seperation Convention, 1924) দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

এই প্রথা অনুসারে রেলপথসমূহের পক্ষে সরকারকে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর বাৎসরিক শতকরা ১ টাকা হারে 'ডিভিডেণ্ড' এবং ৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত লাভের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করিতে হইত। প্রতিরক্ষা প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় যে-সমস্ত লাইনে (strategic lines) ক্ষতি হইত তাহা বহন করিত সরকার। এই প্রথা দ্বারা একটি অবপূর্তি তহবিল (Depreciation Fund) এবং সঞ্চয় তহবিলেরও (Reserve Fund) সৃষ্টি করা হয়। অবপূর্তি তহবিলে প্রতি বৎসর বিনিয়োজিত মূলধনের $\frac{1}{60}$ ভাগ জমা রাখিতে হইত এবং দাবিদাওয়া মিটাইয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তাহা সঞ্চয় তহবিলে জমা হইত।

১। ১৯২৪ সালের পৃথকিকরণ প্রথা এবং সাধারণ ও রেল বাজেটের মধ্যে সম্বন্ধ

বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার সুরু হওয়া পর্যন্ত পৃথকিকরণ প্রথায় কার্য বেশ ভালভাবেই চলিয়াছিল। বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ হারে অর্থপ্রদান করিতে বা জমা রাখিতে রেলপথ-

সমূহ কোন বিশেষ অসুবিধাই ভোগ করে নাই। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত রেলপথসমূহের আয় এত কমিয়া যায় যে, ইহাদের পক্ষে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ডিভিডেণ্ড প্রদান করিবার জন্য প্রথমে সঞ্চয় তহবিলের উপর হাত দিতে হয়, পরে আয় আরও কমিয়া গেলে ডিভিডেণ্ড প্রদান বন্ধ রাখিতে হয়।

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা

১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে আবার রেলপথসমূহের আয়বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে ইহা অকল্পনীয় অংকে গিয়া দাঁড়ায়। আয়বৃদ্ধির দরুন রেলপথসমূহ ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যেই সমস্ত বকেয়া পাওনা মিটাইয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যে যাহাতে ইহারা সাধারণ রাজস্ব খাতে অধিকতর অর্থপ্রদান করিতে পারে তাহার জন্য প্রথার পুরাতন ব্যবস্থাকে স্থগিত রাখিয়া উদ্বৃত্ত অনুসারে অর্থপ্রদানের নূতন অন্তর্বর্তীকালীন (interim) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধের পরে আবার ১৯২৪ সালের প্রথায় ফিরিয়া যাওয়া হয়।

৩। কুঞ্জরু কমিটি ও ১৯৪৯ সালের নূতন ব্যবস্থা

১৯২৪ সালের প্রথায় এই ব্যবস্থা ছিল যে, সময়ান্তরে ইহার পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ফলে যুদ্ধোত্তর যুগে ১৯৪৯ সালে কুঞ্জরু কমিশনের (Kunzru Commission) সুপারিশ অনুসারে প্রথাটির বিচার-বিশ্লেষণের পর ইহার পরিবর্তে এক নূতন প্রথা গ্রহণ করা হয়। ইহা ১৯৪৯ সালের রেলওয়ে প্রথা (The Railway Convention, 1949) নামে পরিচিত। এই প্রথার প্রধান প্রধান ব্যবস্থা নিম্নে বিবৃত হইল :

(ক) রেলপথসমূহের আয়-ব্যয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় পৃথকই ছিল, এবং রেলপথসমূহ বিনিয়োজিত মূলধনের উপর কেন্দ্রীয় সরকারকে বাৎসরিক ৪% হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করিত। (খ) অবপূর্তি তহবিলে (Depreciation Fund) প্রতি বৎসর অন্তত ১৫ কোটি টাকা করিয়া জমা রাখিতে হইত। (গ) একটি নূতন রেলপথ উন্নয়ন তহবিল (A Railway Development Fund) সৃষ্টি করা হয়। এই তহবিলের অর্থ যাত্রীদের সুবিধা, শ্রমিকদের কল্যাণ এবং প্রাথমিকভাবে অনুৎপাদনশীল পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইত। তখন যে উৎকর্ষসাধক তহবিল (Betterment Fund) ছিল তাহাকে এই উন্নয়ন তহবিলের সহিত মিশাইয়া এক করিয়া দেওয়া হয়। এই সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রতি বৎসর ৩ কোটি টাকা করিয়া যাত্রীদের সুবিধা প্রদানার্থে ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। (ঘ) রাজস্ব-ব্যয় ও মূলধন-ব্যয়ের (revenue and capital expenditure) মধ্যে সম্বন্ধ নূতন করিয়া নির্ধারণ করা হয়।

১৯৪৯ সালের নূতন প্রথার ফলে রেলপথসমূহের সাধারণ আয়-ব্যয়ের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট অর্থ পাইতে থাকে এবং রেলপথসমূহও তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ গঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হয়।

১৯৫৪ সালে আবার ১৯৪৯ সালের প্রথার বিচারবিবেচনা করিয়া উহার পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। সুপারিশ কার্যকর হয় ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে। পরিবর্তনের ফলে যে-প্রথা প্রবর্তিত হয় তাহা ১৯৫৪ সালের পরিমার্জিত প্রথা (Revised Convention, 1954) নামে অভিহিত।

৪। ১৯৫৪ সালের পরিমার্জিত প্রথা

পরিমার্জনার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(ক) রেলপথসমূহ বিনিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৪ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করিলেও কয়েক ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করা হয়—যথা, যেখানে নূতন লাইন পাতা হইয়াছে, যেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ (overcapitalisation) করা হইয়াছে, ইত্যাদি।

(খ) ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় রেলপথসমূহের পক্ষে অবপূর্তি তহবিলে অর্থপ্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১৫ কোটি টাকা হইতে ৪৫ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া যায়।

(গ) যাত্রীদের সুখ-সুবিধার্থে বাৎসরিক ৩ কোটি টাকা করিয়া ব্যয় করা ছাড়াও ৩ লক্ষ টাকার অধিক সমস্ত অনুৎপাদনশীল পরিকল্পনার ব্যয় রেলপথ উন্নয়ন তহবিল (Railway Development Fund) হইতে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই পরিমার্জিত প্রথা ৬ বৎসর—অর্থাৎ, ১৯৬১ সালের মার্চ অবধি বলবৎ ছিল। ইহার পর ১৯৬১-৬২ সাল হইতে রেলপথ প্রথা কমিটির (Railway Convention Committee) সুপারিশ অনুসারে নিম্নলিখিত নূতন ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে :

তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হয় :

(১) রেলপথসমূহের ডিভিডেণ্ড প্রদানের হার শতকরা ৪ ভাগ হইতে শতকরা ৪.২৫ ভাগে বর্ধিত করা হয় ; (২) অবপূর্তি তহবিলে অর্থপ্রদানের হার বাৎসরিক ৪৫ কোটি টাকা হইতে গড়ে ৭০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয় ; (৩) রেলমাসুলের উপর যে কর ধার্য করা হইয়াছিল তাহা যাত্রীমাসুলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহার দরুন বাৎসরিক ১২.৫ কোটি টাকা রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৬৩-৬৪ সাল হইতে এই ব্যবস্থারও কিছুটা রদবদল করা হইয়াছে—যথা, ডিভিডেণ্ড প্রদানের হারকে শতকরা ৪.৫ ভাগে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং অবপূর্তি তহবিলে অর্থপ্রদানের পরিমাণ গড়ে ৮০ কোটি টাকায় ধার্য করা হইয়াছে।

বর্তমান ব্যবস্থা

আশা করা যায়, রদবদলের ফলে যে ব্যবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা ঘোষণামত তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত (১৯৬৫-৬৬ সাল) বর্তমান থাকিবে।

উপসংহার : সাধারণ বাজেট ও রেলওয়ে বাজেটের মধ্যে ১৯৬১-৬২ সালের নূতন প্রথা দ্বারা যে-সম্বন্ধ নির্ধারিত হইয়াছে তাহা তৃতীয় পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি

রাখিয়াই করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারের পক্ষে সাধারণ আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক অর্থসংগ্রহ করা প্রয়োজন হইবে। আবার রেলপথসমূহকেও তাহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করিয়া যাইতে হইবে। এইজন্য ডিভিডেণ্ড প্রদানের হার দুই দফায় কিছুটা বর্ধিত করিয়া উক্ত দুই পরস্পরবিরোধী দাবির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা হইয়াছে। আবার বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও অবপূর্তি তহবিলের পরিমাণ নিয়মিত বৃদ্ধি করা হইতেছে। নূতন লাইন ও অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সালের নিয়মকে যে অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে তাহাও সমর্থনযোগ্য।

নূতন প্রথা তৃতীয় পরিকল্পনার উপযোগী হইয়াছে

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতে রেলপথসমূহের আয় হ্রাস পাইলেও ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে উহা বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে মোট আয় হয় ৪৫৭ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে বর্ধিত মাসুলের ভিত্তিতে ইহাকে ৬০০ কোটি টাকায় ধরা হইয়াছে। তবে সংগে সংগে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটায় উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৬০-৬১ সালে উদ্বৃত্ত ছিল ৩২ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে বর্ধিত মাসুল সত্ত্বেও উদ্বৃত্ত ৩১ কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র নীট উদ্বৃত্তটাই উন্নয়ন তহবিলে জমা হয়।

আয়ের তুলনায় উদ্বৃত্তের সামান্য বৃদ্ধি

রেলপথের মাসুল (Railway Rates)ঃ ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির উপর রেলপথের মাসুল-নীতির গুরুত্ব অত্যধিক। মাসুল-নীতি সহায়ক হইলে শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি সমৃদ্ধ হয়; আবার মাসুল-নীতি পরিপন্থী বা প্রভেদাত্মক হইলে উহারা ব্যাহত হয়।

মাসুল-নীতির গুরুত্ব

ব্রিটিশ যুগে শেষোক্ত ব্যাপারটিই ঘটিয়াছিল। ভারতে রেলপথসমূহ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদেশীর তত্ত্বাবধানে থাকায় রেলপথের মাসুল এইভাবে নির্ধারিত হইয়াছিল যে, ইহা দেশের স্বার্থসাধন করার পরিবর্তে ইহাকে ক্ষুণ্ণই করিয়াছিল। যে-সকল কোম্পানী ভারতীয় রেলপথসমূহ পরিচালনা করিত তাহারা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন মাত্রা-সাপেক্ষে যে-কোন মাসুল ধার্য করিতে পারিত। প্রথম যুগে এই সকল কোম্পানী ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নয়নে বিশেষ উৎসুক ছিল। সুতরাং তাহারা এরূপভাবে মাসুল ধার্য করিত যাহাতে প্রধান প্রধান বন্দর অভিমুখে এবং বন্দর হইতে মাল-চলাচল বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে সংগঠিত শিল্পগুলিকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। উদাহরণস্বরূপ, চিনির উপর মাসুলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বন্দর হইতে দেশের অভ্যন্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য চিনির উপর যে-হারে মাসুল দিতে হইত তাহা আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে বহনের মাসুল অপেক্ষা স্বল্প ছিল। এইরূপ প্রভেদাত্মক ব্যবস্থার দরুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে বড় বড় বন্দরের নিকট

ব্রিটিশ যুগে পরিপন্থী মাসুল-নীতির ফল

কেন্দ্রীভূত হইবার প্রবণতা দেখা দিয়াছিল। শিল্পপতিগণ স্বভাবিকভাবেই বন্দর হইতে এবং বন্দরাভিমুখী মাল-চলাচলের মাস্থলের স্বল্প হারের সুবিধা লইবার জন্য বন্দরাঞ্চলেই শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে উৎসুক ছিলেন। ফলে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থায় দেখা দিয়াছিল অত্যধিক আঞ্চলিকতা।

আর এক উপায়েও রেলপথের মাস্থল নির্ধারণ নীতি শিল্পোদ্যোগকে ব্যাহত করিয়াছে। কোম্পানীর আমলে বিভিন্ন রেলপথ যখন কোন মাল বহন করিত তখন প্রত্যেক কোম্পানী মালটি তাহার নিজস্ব লাইনে যতটুকু যাইবে তাহার উপরই হিসাব করিয়া মাস্থল ধার্য করিত। ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি দূরত্বের সুবিধা না পাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইত; এবং স্বতই তাহাদের পক্ষে দূরে মাল প্রেরণ করিবার ইচ্ছা থাকিত না।

মাস্থল ট্রাইব্যুনাল গঠনের সুপারিশ

এই সকল কারণের জন্য রেল-মাস্থল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন চলিতে থাকে। ফলে এ্যাক্ওয়র্থ কমিটি ইংল্যাণ্ডের অনুসরণে একটি রেলপথের মাস্থল ট্রাইব্যুনাল (Railway Rates Tribunal) গঠন করিতে সুপারিশ করে। সরকার কিন্তু ইহার পরিবর্তে সীমাব ক্ষমতাসম্পন্ন মাত্র একটি রেলপথের মাস্থল-উপদেষ্টা কমি (Railway Rates Advisory Committee) নিযুক্ত করে।

১৯৪৯ সালে মাস্থল ট্রাইব্যুনাল গঠন

রেলপথের মাস্থল-উপদেষ্টা কমিটির কার্যের সমালোচনার জন্য জাতীয় সরকার ১৯৪৯ সালে একটি মাস্থল ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। মাস্থল সংক্রান্ত সমস্ত অযৌক্তিকতার অভিযোগ বিবেচনা করাই হইল ট্রাইব্যুনালের কার্য। রেলপথগুলিকে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে হয়।

রেল-মাস্থলের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন

এই প্রসংগে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা হইল ১৯৪৮ সালে রেল-মাস্থলের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন (Rationalisation of Railway Rates Structure)। যুক্তিসিদ্ধভাবে পুনর্গঠিত রেল-মাস্থল যাত্রী ও মাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইহার দ্বারা পূর্বের সকল প্রকার প্রভেদাত্মক ব্যবস্থা দূর করা হইয়াছে। এখন মাস্থল ধার্যের ব্যাপারে সকল রেলপথকেই একটি সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং মাল-চলাচল ব্যাপারে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

১৯৫৫ সালে দূরবীক্ষণ-মূলক হার প্রবর্তন

১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাস হইতে দূরবীক্ষণমূলক হার (telescopic rates) যাত্রী ও মাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে ভ্রমণ বা বহনের দূরত্ব যত বাড়িয়া যায় মাস্থলের হারও তত কমিয়া যায়।

যাত্রী-মাস্থলের উপর কর

ইহার পর ১৯৫৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে যাত্রী-মাস্থলের উপর যে গতিশীল হারে (at progressive rate) কর ধার্য করা হইয়াছিল ১৯৬১-৬২ সাল হইতে তাহাকে যাত্রী-মাস্থলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

যাত্রী-মাসুলের হার বিশেষ বৃদ্ধি করা হইয়াছে ১৯৬২-৬৩ সাল হইতে। এই বৃদ্ধির হার হইল তৃতীয় ও উচ্চতর শ্রেণীসমূহের জন্য যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ ও ১৫ ভাগ।

মালপত্রের উপর মাসুল সম্পর্কে অনুসন্ধান সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫৫ সালে মুদালিয়র কমিটি (Freight Structure Enquiry Committee or Mudaliar Committee) নিযুক্ত হয়। কমিটি বিভিন্ন মালপত্রের উপর বিচারমূলক পার্থক্য-করণের ভিত্তিতে (on the basis of selective variation) মাসুল-হারের সংস্কার করিতে সুপারিশ করে। ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস হইতে ঐ সুপারিশ আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া মালপত্রের মাসুলের হার পুনর্গঠিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই পুনর্গঠিত ব্যবস্থায় খাদ্যের উপর মোট মাসুলের হার কমানো হয় এবং তাঁত শিল্পজাত দ্রব্য, খাদি, পুস্তক প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। ইহার পর বেতন কমিশনের (Pay Commission) সুপারিশ কার্যকর করা ইত্যাদি এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য মালপত্রের উপর মাসুলের হার কিছু কিছু বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে যাত্রী-মাসুলের হার বৃদ্ধি করা না হইলেও মালপত্র ও পার্শেলের মাসুল আর এক দফা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইভাবে মালপত্রের মাসুল নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। ইহাতে একদিকে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বমুখী হইতেছে, এবং অপরদিকে মালপত্র বহনের জন্য রেলপথ ও পথ পরিবহণের (road transport) মধ্যে প্রতিযোগিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ যাহাতে বিশেষ ব্যাহত না হয় তাহার জন্য কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রভেদাত্মক মাসুলের সুবিধা দেওয়া হয়।

মালপত্রের মাসুল-হারের পুনর্গঠন

রাজপথ (Roads) : ভারতের ন্যায় দেশে গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার প্রসারসাধন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্যের দেওয়াল ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য রাজপথ এবং পথ পরিবহণের (road transport) গুরুত্বকে কোনমতেই লঘু করিয়া দেখা যায় না। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে রেলপথ নির্মাণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে রাজপথ-পদ্ধতি (road system) ও পথ পরিবহণ-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হইতে পারে নাই।

ব্রিটিশ আমলে এই অপর্যাপ্তি দূরিকরণের কতকটা প্রচেষ্টা করা হয় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে। ঐ আইনে রাজপথকে প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত করিয়া উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে এই কর্তব্য সম্যক্‌ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় নাই। এই কারণে ১৯২৮ সালে নিযুক্ত রাজপথ উন্নয়ন কমিটি (Road Development Committee) কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজপথ উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং একটি কেন্দ্রীয় পথ উন্নয়ন তহবিল (a Central Road Fund) সৃষ্টির সুপারিশ করে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৯ সালে পেট্রলের উপর অতিরিক্ত কর (surcharge) ধার্য দ্বারা উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি করা হয় এবং প্রদেশগুলিকে ইহা হইতে অর্থসাহায্য প্রদান করা হইতে থাকে। ইহার

রাজপথের উন্নয়ন

পর ১৯৪৩ সালে নাগপুরে মুখ্য বাস্তুকারদের (Chief Engineers) একটি সম্মেলন হয়। সম্মেলনে ২০ বৎসরের জন্য রাজপথ উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনাটি 'নাগপুর পরিকল্পনা' (Nagpur Plan) নামে পরিচিত। পরিকল্পনা অনুসারে ঐ সময়ের মধ্যে উন্নত কোন কৃষি-অঞ্চল রাজপথ (main road) হইতে ৫ মাইলের অধিক দূরে থাকিবে না। উক্ত সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ সালের জাতীয় রাজপথগুলির (National Highways) নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

নাগপুর পরিকল্পনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজপথ উন্নয়ন খাতে মোট ১০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ঐ পরিকল্পনায় নাগপুর পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের এক-তৃতীয়াংশকে কার্যকর করা সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া ঘোষিত হয়।* পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় রাজপথে ৭৪৬ মাইলের মত সংযুক্তিসাধন (construction of missing links), ৫ হাজার মাইল রাজপথের উন্নয়ন এবং ৩৩টি বড় বড় পুল নির্মাণ করা হয়। ইহা ছাড়া আন্তঃরাজ্য রাজপথ (Inter-State Roads, অর্থ-ব্যবস্থার দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ রাজপথ প্রভৃতির প্রভূত উন্নতিসাধন করা হয়। জাতীয় রাজপথ ছাড়া অন্যান্য প্রকার রাজপথের পরিমাণ বর্ধিত হয় সর্বসমেত ২৪ হাজার মাইলের মত।

প্রথম পরিকল্পনায় রাজপথ উন্নয়ন

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়েই ১৯৫২ সালে একটি কেন্দ্রীয় রাজপথ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (a Central Road Research Institute) স্থাপন করা হয়। রাজপথ সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশলগত সমস্যার গবেষণা করাই ইহার কার্য।

কেন্দ্রীয় রাজপথ গবেষণা প্রতিষ্ঠান

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজপথ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৭১ কোটি টাকা। এই ব্যয়ে ১২০০ মাইল নূতন জাতীয় রাজপথ নির্মাণ, ১০০ মাইলের মত জাতীয় রাজপথের সংযুক্তিসাধন, ৪০টি বড় বড় পুল নির্মাণ, ৩·৫ হাজার মাইল জাতীয় রাজপথের উন্নয়ন এবং ৩ হাজার মাইল পথ ব্যাপকতর করার কথা ছিল। জাতীয় রাজপথ ছাড়া কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ১ হাজার মাইল অন্যান্য রাজপথ নির্মাণ, ২ হাজার মাইল রাজপথের পর্যায় উন্নয়নও (upgrading) ছিল এই পরিকল্পনার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যসমূহের কর্মসূচীর মধ্যে ২১ হাজার মাইল উঁচু এবং ৩৭ হাজার মাইল নীচু রাজপথের নির্মাণ পরিকল্পনা ছিল। আশা করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে নাগপুর সম্মেলনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের একরূপ কাছাকাছি পৌছানো সম্ভব হইবে।**

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাজপথ উন্নয়ন

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উক্ত বরাদ্দের মধ্যে ২২৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়। হিসাবে দেখা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন ১০ বৎসরের মধ্যে পাকা সড়কের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৯৭ হাজার মাইল হইতে ১·৪৪ লক্ষ মাইলের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

---

* **Second Five Year Plan—A Draft Outline**

** **Second Five Year Plan ৪৭৬ পৃষ্ঠা এবং India—1960**

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে আগামী ২০ বৎসরের (১৯৬১-৮১ সাল) জন্য রাজপথ উন্নয়নের আর একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ২০ বৎসরের মধ্যে পাকা সড়কের পরিমাণ ২.৫২ লক্ষ মাইলে এবং কাঁচা সড়কের পরিমাণ ৪.০৫ লক্ষ মাইলে পৌঁছিবে, এবং দেশের কোন কৃষি-অঞ্চলই একপ্রকার না একপ্রকার সড়ক হইতে ১.৫ মাইলের অধিক দূরে থাকিবে না।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

এই নূতন পরিকল্পনা অনুসারেই তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে। গৃহীত কর্মসূচীর ব্যয় ৩২৪ কোটি টাকায় ধার্য করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাজ্যসমূহের খাতে ব্যয় হইল ২৪৪ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় খাতে ব্যয় বাকী ৮০ কোটি টাকা।*

পথ পরিবহণ (Road Transport): মোটরযান এবং গো-মহিষযান হইল ভারতের পথ পরিবহণের প্রধান মাধ্যম। ভারতের ন্যায় দেশে অল্প দূরত্বের জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থা হিসাবে গো-মহিষযানের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তবে ইহার সংখ্যাবৃদ্ধির সুপারিশও করা চলে না এই কারণে যে, লৌহচক্রসমন্বিত যানপথের, বিশেষ করিয়া কাঁচা সড়কের, প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। যদি লৌহচক্রের পরিবর্তে রবার-নির্মিত চক্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায় তবে সময় ও অর্থের অপচয় এবং পথের ক্ষতিসাধন রহিত হইয়া গো-মহিষযানের উপযোগিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশানুসারে রবার-নির্মিত চক্রের উপযোগিতা লইয়া পরীক্ষা চালানো হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে উন্নত ধরনের একপ্রকার প্রশস্ততর লৌহচক্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে।

গো-মহিষযানের উপযোগিতাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

ভারতে এসিয়ার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় মোটরযান আছে। তাহা হইলেও জনসংখ্যার তুলনায় ইহা অত্যল্প। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে যথাক্রমে প্রতি ৩ জন এবং প্রতি ১৫ জন লোকপিছু একখানি করিয়া মোটরযান আছে, সেখানে ভারতে মোটরযান আছে প্রতি ১ হাজারেরও অধিক লোকপিছু ১ খানি করিয়া। দেশের দারিদ্র্য এবং মোটরযান ও তৈলের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতাই যে এই আপেক্ষিক স্বল্পতার কারণ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মোটরযান

এ-দেশে সেদিন পর্যন্ত মোটরযান পরিবহণ অসংগঠিত অবস্থায় থাকায় রেলপথ ও মোটরযান পরিবহণ পরস্পরের সহিত অপচয়মূলক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। এই ত্রুটির প্রতিবিধানার্থে ১৯৩৯ সালে মোটরযান আইন (Motor Vehicles Act, 1939) পাস করা হয় এবং ইহার অধীনে মোটরযান-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে আঞ্চলিক পরিবহণ সংস্থা (Regional Transport Authority) প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোটরযান পরিবহণ

* Third Five Year Plan ৫৫০ পৃষ্ঠা

যুদ্ধোত্তর যুগ হইতে, বিশেষ করিয়া স্বাধীনতার পর হইতে, রাষ্ট্রীয় পরিবহণের প্রতি ঝোঁক দেখা গিয়াছে। বর্তমানে মোটামুটি সকল রাজ্যেই সরকারী উদ্যোগাধীনে

রাষ্ট্রীয় পরিবহণ

বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত মোটর-চলাচলের ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এই ব্যবস্থা হইল প্রধানত যাত্রী পরিবহণেরই ব্যবস্থা। ১৯৫০ সালের পথ পরিবহণ করপোরেশন আইন (Road Transport Corporation Act, 1950) অনুসারে অধিকাংশ রাজ্যে রেলপথ, রাজ্য সরকার ও বেসরকারী পরিবহণ-মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া 'পথ পরিবহণ করপোরেশন' প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই তিন কর্তৃপক্ষের কার্যের মধ্যে সংহতিসাধনই করপোরেশনের উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়া মোটরযান পরিবহণ চলাচল-ব্যবস্থার সংহতিসাধনের জন্য একটি আন্তঃরাজ্য পরিবহণ কমিশন গঠন করা হইয়াছে।*

মধ্যে মোটরযান পরিবহণ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবি উঠিয়াছিল, এবং ফলে ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন সিদ্ধান্ত করে যে, পথ পরিবহণকে বেশ কিছুদিন বেসরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কারণ, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তবে সামর্থ্যমত ধীরে ধীরে জাতীয়করণের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

বর্তমানে অনুসৃত নীতি ও তৃতীয় পরিকল্পনা

এই নীতির অনুসরণে ঠিক হইয়াছে যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ মালপত্র বহন সুরু করিতে পারে, তবে মালপত্র বহন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে না। দ্বিতীয়ত, যাত্রীবহন-ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে না সেখানে বেসরকারী উদ্যোগীদের মোটর চলাচল-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের জন্য সকল সম্ভাব্য সুযোগ দেওয়া হইবে।

এই নীতির ভিত্তিতে অনুমান করা হইয়াছে যে পূর্ববর্তী পরিকল্পনার ন্যায় তৃতীয় পরিকল্পনাতেও রাষ্ট্রীয় পরিবহণ মোটামুটি শতকরা ৩০ ভাগ যাত্রী বহন করিবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের মোটর চলাচল-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য ২৩ কোটি টাকার মত ব্যয় হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২৬ কোটি টাকা।

রাজপথ বনাম রেলপথ (Roads *v* Railways): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাজপথ ও রেলপথের মধ্যে প্রতিযোগিতা আমাদের পরিবহণ-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল। এই সমস্যার সমাধানকল্পে কমিটি নিয়োগ ও বিভিন্ন প্রতিবিধান অবলম্বিত হইয়াছিল। তবুও সমস্যা মিটে নাই। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে সমস্যা আবার মাথা তুলিয়াছে এবং ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে অন্যান্য পরিবহণ-ব্যবস্থারও অপচয়মূলক প্রতিযোগিতার সমস্যা। ফলে দেখা দিয়াছে সামগ্রিক পরিবহণ-ব্যবস্থার সংহতিসাধনের সমস্যা। এ-সম্পর্কে আলোচনা এই অধ্যায়ের শেষে করা হইতেছে।

* India—1962

জলপথ (Waterways): ভারতের জলপথকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়: (১) আভ্যন্তরীণ জলপথ, এবং (২) সমুদ্রপথ। সমুদ্রপথ আবার দুইভাগে বিভক্ত: (ক) উপকূল বাণিজ্যপথ, এবং (খ) বৈদেশিক বাণিজ্যপথ।

আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Waterways): উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ জলপথ অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিত। ইহার পর হইতে রেলপথ স্থাপন, সেচকার্যের জন্য নাব্য নদী হইতে জল অপসারণ প্রভৃতি কারণে ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্ব ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। এখন মাত্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পরিবহণকার্য অনেকাংশে জলপথে পরিচালিত হয়। অনুমান করা হইয়াছে, ভারতে প্রায় ৫০০০ মাইলের উপর নদীপথকে শক্তিচালিত পোত-চলাচলের উপযোগী করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার স্থলে বর্তমানে মাত্র ১৫৫০ মাইল নদীপথ এইরূপ নৌবাহ্য। ইহার উপর অবশ্য ৩৫০০ মাইল নদীপথ বড় বড় দেশী নৌকা যাতায়াতের উপযোগী।* খাল খনন ও পলিমাটি উদ্ধার দ্বারা সকল প্রকার নাব্য নদীপথের পরিমাণকে বহুগুণ বর্ধিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা বিশেষ ব্যয়বহুল ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

নাব্য নদীপথের পরিমাণবৃদ্ধির প্রথম প্রচেষ্টা

এই পরীক্ষা চালাইবার সর্বপ্রথম ব্যবস্থা করা হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গংগা-ব্রহ্মপুত্র জলপথ পরিবহণ বোর্ড (Ganga-Brahmaputra Water Transport Board) স্থাপন করিয়া। এই বোর্ড গংগা নদীর অববাহিকার উচ্চতর অংশে (Upper Ganga Region) এবং ব্রহ্মপুত্রের কয়েকটি উপনদী বিধৌত অঞ্চলে নৌবাহ্য খাল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতেছে, এবং আভ্যন্তরীণ জলপথে চালানোর জন্য নূতন ধরনের পোত নির্মাণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ জলপথের ও জলপথ পরিবহণের বিশেষ উন্নতিসাধন সম্ভব হয় নাই। ঐ পরিকল্পনায় এই খাতে মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় কিন্তু এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং যে-কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার ব্যয় ৭·৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ কমিটির (Inland Water Transport Committee) সুপারিশ অনুসারে প্রণয়ন করা হইতেছে। সুপারিশের মধ্যে আছে প্রধান প্রধান নদীর মাপজোখ করা, ব্রহ্মপুত্র নদী ও সুন্দরবন অঞ্চলের জন্য ড্রেজিং-এর বন্দোবস্ত করা, আসামে একটি ষ্টীমার মেরামতের কারখানা খোলা এবং বিশেষ করিয়া কেরল ও উড়িষ্যায় নৌবাহ্য খালের উন্নয়ন করা।**

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যপথ (Coastal and Oceanic Trade): ব্রিটিশ আমলে সমুদ্রপথে ভারতের বাণিজ্য পরিবহণ বিদেশী, বিশেষ করিয়া ইংরাজ

---

* India—1962

** Third Five Year Plan

কোম্পানীগুলির একচেটিয়া অধিকার ছিল। তারপর নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভারতীয়গণ পরিবহণ-ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে থাকে। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের নীতি ও প্রত্যক্ষ সাহায্যের ফলে তাহারা সকল প্রকার জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থায় এক বিশেষ অংশ অধিকার করিয়া ফেলে।

প্রথম দুই পরিকল্পনায় জাহাজী শক্তির পরিমাণবৃদ্ধি

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে মোট ভারতীয় জাহাজী শক্তি ছিল ৩.৯ লক্ষ টনের মত। পরিকল্পনার ১০ বৎসর পরে (১৯৬১) উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৯ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। *প্রথম দুই পরিকল্পনায় জাহাজী* **শক্তির পরিমাণবৃদ্ধির জন্য মোট ব্যয় হয় ৭২ কোটি টাকা।** দ্বিতীয় পরিকল্পনায় একটি জাহাজ-চলাচল উন্নয়ন তহবিল (Shipping Development Fund) স্থাপন করা হয়। এই তহবিল হইতে জাহাজী কোম্পানীগুলিকে জাহাজ ক্রয় ও জাহাজ নির্মাণের জন্য ঋণপ্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়েই একটি জাহাজ-চলাচল সংক্রান্ত বোর্ড (National Shipping Board) গঠন করা হয়। জাহাজ-চলাচল সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেওয়াই এই বোর্ডের কার্য। বোর্ড তৃতীয় পরিকল্পনায় জাহাজী শক্তিকে ৯ লক্ষ হইতে ১৪ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার সুপারিশ করিয়াছিল। ইহার অনুমিত

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

ব্যয় ছিল ১১৯ কোটি টাকা। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় সর্বসমেত ৬৬ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করা সম্ভব হইবে না বলিয়া ধরা হইয়াছে। ফলে জাহাজী শক্তির পরিমাণও ৩ লক্ষ টনের অধিক বৃদ্ধি পাইবে না বা ১২ লক্ষ টনের উপর পৌছিবে না। তবে বর্তমানে এই খাতে আরও টাকা বরাদ্দ করিয়া জাহাজী শক্তির পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

জাহাজ-চলাচল নীতি-নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, ১৯৪৭ সালে নিযুক্ত জাহাজ-চলাচল নীতি-নির্ধারণ কমিটি (Shipping Policy Committee) অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে:

(ক) ভারতের উপকূলে জাহাজ চলাচলের একচেটিয়া অধিকার ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে দিতে হইবে; (খ) ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সহিত বাণিজ্য-পণ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতীয় জাহাজেই পরিবাহিত হইবে; (গ) দূরবর্তী দেশগুলির বাণিজ্যের শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ ভারতীয় জাহাজগুলিকে বহন করিতে হইবে।

সুপারিশের কয়েকটি লক্ষ্যে পৌছিতে এখনও বিলম্ব আছে

জাহাজ-চলাচল কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫১ সালে উপকূল বাণিজ্যপথের একচেটিয়া অধিকার ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত করা হয় এবং বর্তমানে ভারতের সমগ্র উপকূল-বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু অন্যান্য লক্ষ্যে পৌছিতে যে এখনও অনেক দেরী আছে তাহা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে।

বন্দর ও পোতাশ্রয় (Ports and Harbours) : ভারতের ৩৫০০ মাইল দীর্ঘ উপকূলরেখায় মাত্র ৬টি প্রধান বন্দর (major ports) আছে। ইহারা হইল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্, কোচিন এবং কান্দলা। ইহাদের মধ্যে কান্দলা নবনির্মিত। প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে বন্দরসমূহের সামগ্রিক ক্ষমতা (total handling capacity) ছিল ২ কোটি টনের মত। প্রথম পরিকল্পনার শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২'৫ কোটি টনে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল সামগ্রিক ক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করিয়া ৩'৩ কোটি টনে লইয়া যাওয়া। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যে-কর্মসূচী গৃহীত হয় তাহা সমাপ্ত হইলে প্রধান বন্দরসমূহের সামগ্রিক ক্ষমতা ৪'৯ কোটি টনে পৌঁছিবে। এই কর্মসূচী সমাপ্ত হইবে তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে।

প্রধান বন্দরসমূহের সামগ্রিক ক্ষমতা

বিভিন্ন পরিকল্পনায় ক্ষমতাবৃদ্ধি

তৃতীয় পরিকল্পনার বন্দরসমূহের ক্ষমতা (port capacity) অপেক্ষা বন্দরসমূহ প্রদত্ত সুযোগসুবিধা (port facilities) বৃদ্ধির দিকেই প্রধানত দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ দ্বারা কলিকাতা বন্দরকে বাঁচানো, বোম্বাই বন্দরের আধুনিকিকরণ, হলদিয়া প্রভৃতি স্থানে সহায়ক বন্দর (ancilliary port) নির্মাণ প্রভৃতি ব্যবস্থাও গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বন্দর উন্নয়ন খাতে ৬০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার ব্যয় ১১৫ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

আকাশপথ (Airways) : ভারতে বেসামরিক বিমান-চলাচল ১৯২৪-২৫ সাল হইতে সুরু হইলেও এই ব্যাপারে উৎসাহ ও কর্মোদ্যম উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে। ১৯৪৯ সালে ভারতের বড় বড় সহরের মধ্যে বিমানযোগে চিঠিপত্র প্রেরণের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইলে বেসামরিক বিমান-চলাচলের গুরুত্ব আরও বর্ধিত হয়।

১৯৫৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন ছিল। বিমান পরিবহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বিমান কোম্পানীগুলি কিন্তু দিন দিন ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছিল। ফলে সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থসাহায্য করিতে হইতেছিল। এই কারণে এবং বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৫১ সালে রাজাধ্যক্ষ কমিটি (Rajadhyaksha Committee) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থার জাতীয়করণের সুপারিশ করে।

বিমান চলাচল-ব্যবস্থার জাতীয়করণ

সুপারিশ অনুসারে সরকার ১৯৫৩ সালে বিমানপথ পরিবহণ আইন (Air Corporation Act, 1953) দ্বারা বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থার পরিচালনাভার নব-সংগঠিত দুইটি করপোরেশনের উপর

ন্যস্ত করা হয়। একটির নাম হইল ভারতীয় বিমানপথ করপোরেশন (Indian Airlines Corporation)। ইহা আভ্যন্তরীণ বিমানপথসমূহের পরিচালনা করে। অপরটি ভারতের আন্তর্জাতিক বিমানপথ (Air India International) নামে অভিহিত। ইহা ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে বিমান চলাচল-ব্যবস্থা পরিচালনা করে। ১৯৫৩ সালের বিমানপথ পরিবহণ আইন অনুসারে ১৯৫৫ সালে একটি বিমান পরিবহণ পরিষদও (Air Transport Council) গঠিত হয়।

বর্তমান পরিচালনা ব্যবস্থা

১৯৫৩ সাল হইতে বিমান পরিবহণের পরিমাণ একরূপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় বেসামরিক বিমানপোত ১'৯ কোটি মাইলের মত উড়িয়াছিল। ১৯৬১ সালে এই পরিমাণ আসিয়া দাঁড়ায় ২'৭৪ কোটি মাইলে। যাত্রীর সংখ্যাও ঐ সময়ের মধ্যে ৩ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৯'৫ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছায়।*

বিমান পরিবহণের পরিমাণবৃদ্ধি

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেসামরিক বিমান চলাচল উন্নয়ন খাতে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই পরিবহণ খাতে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উন্নয়ন-ব্যবস্থা

বিভিন্ন পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে আছে আধুনিক ধরনের বিমানপোত সংগ্রহ, বিমান চালনায় শিক্ষাপ্রদানের ব্যাপকতর ব্যবস্থা, বিমান কারখানার সম্প্রসারণ, ইত্যাদি। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে বিমান চলাচল উন্নয়নের (civil aviation) জন্য ব্যয় করা হইবে ২৫'৫ কোটি টাকা, এবং বাকী টাকা ব্যয়িত হইবে অন্যান্য উদ্দেশ্যে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি অনুসারে বিমান চলাচল-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সরকারের একচেটিয়া অধিকারেই থাকিবে।

পরিবহণ-ব্যবস্থার সংহতিসাধনের সমস্যা (Problem of Co-ordination of the Transport System): রেলপথ ও রাজপথের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, পরিবহণ-ব্যবস্থার সামগ্রিক সংহতিসাধন বর্তমানে অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ, বর্তমানে যে কেবল রেলপথ ও মোটরযানের মধ্যেই অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, পরিবহণ-ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহা বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এই কারণে পরিবহণ-ব্যবস্থার সামগ্রিক সংহতিসাধন আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই মৌলিক নীতিকে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছিল: অপচয়মূলক দ্বৈতকরণ (duplication) নিবারণার্থে পরিবহণের সকল প্রকার সংহতিসাধন সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে রেলপথ

সমস্যার প্রকৃতি

* India—1962

ও মোটরযানের মধ্যে সংহতিসাধন ছাড়াও রেলপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথের মধ্যে সংহতিসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই শেষোক্ত সংহতিসাধনকার্য হইল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি বিশেষ সমস্যা। এই অঞ্চলে যৌথ ষ্টীমার কোম্পানীগুলি বহু পরিমাণে মালপত্র বহন করে।*

রেলপথ ও মোটরযানের মধ্যে সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিশেষভাবে করা হইয়াছিল। পরে অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিবহণ-ব্যবস্থার উপর অভূতপূর্ব চাপের জন্য এই প্রয়োজনীয়তা পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছিল। বর্তমানে উহা আবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ানোর ফলে এবং উহার সহিত পরিবহণ-ব্যবস্থার অন্যান্য দিকের অপচয় নিবারণের সমস্যা যুক্ত হওয়ায় সংহতিসাধনের সমস্যা ব্যাপকতর রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং আমাদের পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থায় শুধু পরিবহণের উন্নয়নের দিকেই দৃষ্টি দিলে চলিবে না, সংগে সংগে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অপচয় নিবারণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। পূর্বসূত্র উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, বর্তমানে এই প্রচেষ্টাই করা হইতেছে।

সমস্যার বিভিন্ন দিক :

প্রথমত, রেলপথ ও মোটরযান চলাচলের মধ্যে সংহতিসাধনের জন্য সকল রাজ্যকেই পথ পরিবহণ করপোরেশন (Road Transport Corporation) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ করপোরেশনের অংশীদার হইবার জন্য রেলপথসমূহের হস্তে মোট ১০ কোটি টাকা অর্পণ করা হইয়াছে। রাজ্য সরকার, রেলপথ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া এইরূপ করপোরেশন গঠিত হয়। রেলপথ ও মোটরযান চলাচলের মধ্যে সংহতিসাধনই ইহার প্রধান কার্য। প্রায় সকল রাজ্যেই এখন এইরূপ করপোরেশন কার্য করিতেছে। ইহা ছাড়া, একটি কেন্দ্রীয় পরিবহণ বোর্ডও (Central Transport Board) স্থাপিত হইয়াছে। ইহার কার্য হইল সর্বাংগীণ সমন্বয়সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

১। রেলপথ ও মোটরযান চলাচলের সংহতিসাধন

ইহা ছাড়া, আন্তঃরাজ্য মোটর-চলাচলের সংহতিসাধনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে এক আন্তঃরাজ্য পরিবহণ কমিশন (Inter-State Transport Commission) গঠন করা হইয়াছে। কমিশন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পরিবহণ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও সংহতিসাধন সম্পর্কে কোন বিরোধের উদ্ভব ঘটিলে তাহার মীমাংসা করে, এবং দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে যাত্রী ও মালবাহী মোটর-চলাচলের পারমিট প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত, রেলপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথের সংহতিসাধনের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য ১৯৫৫ সালের জুন মাসে একটি বিশেষ কমিটি (Rail-Sea Co-ordination Committee) নিযুক্ত হয়। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে। অন্যান্যের মধ্যে কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে :

২। রেলপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথের সংহতিসাধন

* Second Five Year Plan ৪৭৪ পৃষ্ঠা

(ক) উপকূল বাণিজ্য ও সন্নিহিত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাহাজী শক্তির পরিমাণকে ৪'১২ লক্ষ টনে লইয়া যাইতে হইবে। ইহার দ্বারা উপকূল বাণিজ্যে ৪০ লক্ষ টনের মত মালপত্র বহন করা সম্ভব হইবে। (খ) রেলপথ হইতে জলপথে মালপত্র বহন স্থানান্তরিত করিবার সুদৃঢ় নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। (গ) মালপত্র বহন রেলপথ ও জলপথের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। (ঘ) উপকূল বাণিজ্যপথে মালপত্রের ভাড়ার যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন (rationalisation) করিতে হইবে।

৩। পরিবহণ-ব্যবস্থার সামগ্রিক সংহতিসাধন

তৃতীয়ত, পরিবহণ-ব্যবস্থার সামগ্রিক সংহতিসাধনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রী কে. সি. নিয়োগীর অধীনে একটি কমিটি গঠিত হয়। নিয়োগী কমিটি যে-রিপোর্ট প্রকাশ করে তাহাতে বলা হয়:

(১) তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে রেলপথসমূহের উপর পরিবহণের বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার মূল ভার পড়িবে; (২) এই পরিকল্পনায় এবং ইহার বেশ কিছু পরেও মোট পরিবহণ-ব্যবস্থায় ঘাটতি থাকিবে; (৩) নূতন রেলপথ নির্মাণের পূর্বে রাজপথের সহিত সংহতিসাধনের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে; এবং (৪) রেলপথসমূহ যাহাতে উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান হারে পরিকল্পনার জন্য অর্থপ্রদান করিতে পারে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরিবহণ-ব্যবস্থার সংহতিসাধনের কার্যক্রম প্রণয়ন করা হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Write a note on Railway Finance. (C. U. B. Com. 1954, '58)

[ইংগিত: ঐতিহাসিক পটভূমিকার সামান্য উল্লেখ করিয়া ১৯৪৯ সালের প্রথা, ১৯৫৪ ও ১৯৬১ সালের সংশোধিত প্রথা এবং বর্তমান প্রথার পর্যালোচনা করিতে হইবে।......(৯-১৩ পৃষ্ঠা)]

2. Write a note on Railway rates in India. (১৩-১৫ পৃষ্ঠা)

3. Give a brief account of Railway Development under our planned economy. (৬-৯ পৃষ্ঠা)

4. Write a note on the co-ordination of the transport system under our planned economy. (২১-২৭ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের বহির্বাণিজ্য

(Foreign Trade of India)

অতি সুদূর অতীতেও ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। খৃষ্টপূর্ব যুগে বহুদিন হইতে মিশর রোম গ্রীস আরব ইরাণ চীন প্রভৃতি দেশ এবং ভারতের মধ্যে এক সমৃদ্ধিশালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়িয়া উঠে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

মুসলমান রাজত্বের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রনৈতিক বিশৃংখলার দরুন ভারতের সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের প্রসার কতকটা ব্যাহত হইলেও পরে ভারতের বাণিজ্য ক্রমশ সমৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো ডি-গামা কর্তৃক উত্তমাশা হইয়া ভারতে আসিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পর ইয়োরোপের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের সুযোগ ঘটে। পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী ও ইংরাজ জাতি ভারতে বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই বিজয়ী হয়।

প্রথমদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শিল্পপ্রসারে উৎসাহ প্রদান করে এবং ভারতও ইংল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিয়া সমৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। কিন্তু অচিরেই ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন শিল্পস্বার্থ ভারতীয় দ্রব্যাদি আমদানির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে। ফলে কয়েক ক্ষেত্রে ভারত হইতে আমদানি নিষিদ্ধ করা হয় এবং কয়েক ক্ষেত্রে ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর উচ্চহারে আমদানি-শুল্ক বসানো হয়। শিল্প-বিপ্লবের পর ভারত হইয়া দাঁড়ায় সুলভ মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ এবং ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজার। এইভাবে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ভারতের বহির্বাণিজ্যে দেখা দেয় এক বিশেষ পরিবর্তন ; পূর্বে যে-সকল দ্রব্যাদি ভারত হইতে রপ্তানি করা হইত তাহা এখন আমদানি করা হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখা যায় যে ভারত চাউল গম চা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য ও তুলা তৈলবীজ পাট চর্ম প্রভৃতি কাঁচামাল রপ্তানি এবং লৌহ, বয়ন, কাঁচ শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও রেলপথের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম আমদানি করিতেছে।*

ব্রিটিশ যুগে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রবর্তন

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হইল সুয়েজ খাল খনন। ইহার ফলে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যাতায়াতের দূরত্ব হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া, ভারতে রেলপথ নির্মাণের ফলে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত বৃহৎ বৃহৎ বন্দরের সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সমস্ত সুযোগসুবিধা হওয়ায় ভারতের বহির্বাণিজ্য দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে।

---

* R. C. Dutt, *The Economic History of India in the Victorian Age*

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই প্রসার কতকটা অব্যাহত ছিল। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ইহা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ (১৯১৩-১৪) ৪০৭ কোটি টাকা হইতে কমিয়া (১৯১৮-১৯) ২২৩ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

তবে একদিক দিয়া ভারতের উপকারও সাধিত হয়। যুদ্ধাবস্থার চাপে ভারত শিল্পপ্রসারের পথে কতকটা অগ্রসর হয়। ভারত লৌহ ও ইস্পাত, তুলা, চর্ম, পাট প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে থাকে। অপরপক্ষে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণে আমদানি হইতে থাকে।

যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে ভারতের বহির্বাণিজ্য আশাতীতভাবে প্রসারলাভ করে। বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্যাদির চাহিদা এবং ভারতের আমদানি উভয়ই বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার কিছুদিন পর হইতে বিভিন্ন বৈদেশিক বাজারে ভারতকে তীব্র জাপানী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। ফলে দেখা দেয় ১৯২০-২২ সালে ভারতের সর্বপ্রথম প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (unfavourable balance of trade)। ১৯২৩ সালের পর আবার ভারতের রপ্তানিবাণিজ্য উন্নতিলাভ করে এবং পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

প্রথম প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের সময় ভারতের বহির্বাণিজ্য আবার প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। মন্দাবাজারের সময় কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যই অধিক হ্রাস পাইয়াছিল। ফলে ভারতের আমদানির তুলনায় রপ্তানিতেই অধিক অবনতি ঘটিয়াছিল। বাধ্য হইয়া ভারতকে বৈদেশিক দেনা বিশেষত 'হোম চার্জে'র (Home Charges) খাতে দেয় অর্থ মিটাইবার জন্য বহু পরিমাণ স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হইয়াছিল।

১৯৩৪ সালের পর হইতে আবার অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতের পণ্য ব্যবসায়ে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের (balance of trade in merchandise) পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকা; ১৯৩৬-৩৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ইহার পর ১৯৩৮-৩৯ সালে চারিদিকে সমর-প্রস্তুতির হিড়িক লাগিয়া যায় এবং বিভিন্ন দেশের সরকার সমরোপকরণের জন্য অধিক ব্যয় করিতে থাকে। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারলাভ করে এবং ভারতের বহির্বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হইতে থাকে।

প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of India's Foreign Trade before World War II) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে যে-পরিবর্তন আসে তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে যুদ্ধপূর্ব যুগের ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, যুদ্ধপূর্ব

যুগে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই ব্রিটেনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৪ সালের পূর্বে ভারতের আমদানির শতকরা ৬৩ ভাগ আসিত ব্রিটেন হইতে।

প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য :

অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে উহা ক্রমশ হ্রাস পাইয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ৩৩ ভাগে পরিণত হয়। ইহা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাজ্যের অংশই ছিল সর্বাধিক। এই প্রাধান্যের মূলে ছিল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উভয় কারণই। অন্যান্য দেশে শিল্পোন্নতি ঘটিবার বহু পূর্বেই ইংল্যাণ্ডে শিল্পপ্রসার ঘটে। ইহা ব্যতীত ভারত ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকায় ভারতে মালপত্র বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধাও

১। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে ব্রিটেনের প্রাধান্য

ছিল। রপ্তানির ক্ষেত্রেও অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য ছিল সর্বাধিক। ১৯১৩-১৪ সালের পূর্বে ভারত হইতে মোট রপ্তানির শতকরা ২৩-২৪ ভাগ ব্রিটেনেই প্রেরিত হইত। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৪৪ ভাগে দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যের প্রাধান্য বজায়ই থাকে।

দ্বিতীয়ত, গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের বহির্বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের (colonial type)। কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া ভারত শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রপ্তানির শতকরা ৭০ ভাগের মত ছিল খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল। ১৯৩৮-৩৯ সালেও অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। আমদানি ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এবং এমনকি যুদ্ধের অব্যবহিত

২। ভারতের বহির্বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের

পরেও ভারতের আমদানির শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক ছিল শিল্পজাত সামগ্রী। ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশনের (Fiscal Commission) সুপারিশ অনুযায়ী বিচারমূলক সংরক্ষণের (Discriminating Protection) নীতি গ্রহণ করার পর লৌহ ও ইস্পাত, চিনি প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প সীমাবদ্ধভাবে প্রসারলাভ করে। ইহার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি কিছুটা হ্রাস পাইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে শতকরা ৬৩ ভাগে নামিয়া আসে মাত্র। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। যে-সকল ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাইতে থাকে ভারতের সেই সকল শিল্পক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য বিদেশী মালিক প্রবেশ করিতে বিশেষ সচেষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, দিয়াশলাই শিল্পে সুইডেনের শিল্পজোটের ভূমিকা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, যুদ্ধপূর্ব যুগে পণ্য ব্যবসায়ে একরকম নিয়মিতভাবেই ভারতের

৩। পণ্য ব্যবসায়ে নিয়মিতভাবে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইত

বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল (favourable balance of trade in merchandise) হইত। অর্থাৎ, ভারতের প্রত্যক্ষ রপ্তানি প্রত্যক্ষ আমদানিকে নিয়মিত ছাড়াইয়া যাইত ? এই অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সাহায্যেই ভারত বৈদেশিক প্রাপ্য মিটাইতে সমর্থ হইত।

হোম চার্জের দরুন তাহাকে প্রতি বৎসর ৩০-৫০ কোটি টাকার পাওনা মিটাইতে হইত। অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পাইলে ঐ প্রাপ্য মিটাইতে ভারতকে স্বর্ণ প্রেরণ করিতে হইত।

৪। ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশী শাসকের স্বার্থে পরিচালিত হইত

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, যুদ্ধপূর্ব যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানত বিদেশী শাসকের স্বার্থের অনুকূলেই পরিচালিত হইত, ভারতীয় শিল্পস্বার্থের অনুকূলে নয়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত চিরাচরিত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা একপ্রকার অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকে।* ইতিমধ্যে শিল্পপ্রসারের পথে ভারত কিছুটা অগ্রসর হইলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যেও কিছুটা পরিবর্তন আসে। ১৯৩০ সালের পর ক্রমশ ভারত শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি হ্রাস করিয়া শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা ও যন্ত্রপাতি অধিক পরিমাণে আমদানি করিতে থাকে।

৫। স্থলবাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য

প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যায়—যথা, ভারতের স্থলবাণিজ্যের (land-frontier trade) পরিমাণ ছিল অতি সামান্য। এই সামান্য স্থলবাণিজ্যই আবার মোটামুটিভাবে আফগানিস্তান ও তিব্বতের সহিত পরিচালিত হইত; অন্য কোন দেশের সহিত স্থলবাণিজ্য ছিল না বলিলেই চলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের বহির্বাণিজ্য (World War II and India's Foreign Trade): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের বহির্বাণিজ্যের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে অবশ্য নানাপ্রকার অসুবিধা আসিয়া দেখা দেয়। কিন্তু যুদ্ধের অগ্রগতির সংগে সংগে রপ্তানির ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে যে-সমস্ত পরিবর্তন আসে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল:

যুদ্ধের দরুন বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতিতে পরিবর্তন: ১। পূর্বাপেক্ষা অধিক অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

প্রথমত, ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত পূর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় অনুকূল হয়। যুদ্ধের দরুন আমদানি বিশেষ হ্রাস পাইলেও রপ্তানি বিশেষ ব্যাহত হয় নাই। ফলে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারত নিয়মিত অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ভোগ করিতে থাকে। ইহার ফলে ভারত তাহার ষ্টার্লিং-ঋণ পরিশোধ করিয়াও ১৭০০ কোটি টাকার উপর ষ্টার্লিং (Sterling Balances) জমাইতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয়ত, ভারতের আমদানি-রপ্তানির প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। পূর্বে ভারত প্রধানত অন্য দেশগুলিকে খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করিত এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করিত। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশের বাজারে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বিদেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্যের

* India—1957

আমদানি হ্রাস পাইতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে দেশীয় শিল্পগুলি দেশে উৎপন্ন কাঁচামাল অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে থাকায় বিদেশে কাঁচামাল রপ্তানি স্বাভাবিকভাবেই কমিতে থাকে। ১৯৩৮ সালে মোট রপ্তানির মধ্যে কাঁচামাল ছিল শতকরা ৪৪ ভাগ। ১৯৪৫ সালে উহা হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় শতকরা ৩২ ভাগে।

২। রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিবর্তন

তৃতীয়ত, আমদানির ক্ষেত্রে কাঁচামালের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মোট আমদানির মধ্যে কাঁচামালের শতকরা ২৪ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪ হয়। অপরদিকে ঐ সময়ে মোট আমদানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের শতকরা ৬১ ভাগ হইতে হ্রাস পাইয়া ৩৬ ভাগে দাঁড়ায়।

৩। আমদানির ক্ষেত্রে পরিবর্তন

চতুর্থত, যুদ্ধের সময়ে ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী গতিরও (direction) পরিবর্তন হয়। যুদ্ধের ফলে শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন হয়। যদিও ভারতের বহির্বাণিজ্যে যুক্তরাজ্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে তবুও পূর্বের তুলনায় আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই ঐ দেশের সংগে বাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায়। অপরদিকে অন্যান্য দেশের সংগে বাণিজ্য-সম্পর্ক উন্নতিলাভ করে। বিশেষত, সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলির বাজারে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় হইত। যুদ্ধাবস্থায় ঐ সকল দেশের বাজারে উপরি-উক্ত দেশগুলির বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যাদি স্থান পাইতে থাকে। ইহা ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রসারলাভ করিতে থাকে। এইভাবে যুদ্ধের চাপে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে।

৪। দেশানুযায়ী গতির পরিবর্তন

দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে ভারতের বহির্বাণিজ্য (Indian Foreign Trade after the Partition) : স্বাধীনতালাভের পর ভারতের বহির্বাণিজ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ইহার মূলে ছিল যুদ্ধোত্তর যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং দেশবিভাগ ও তজ্জনিত সমস্যা। যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে যে অনুকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিয়াছিল তাহা ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তির সূচক ছিল না।* আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে যুদ্ধের সময় কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভবের ফলেই ভারতের বহির্বাণিজ্যে অধিক অনুকূল উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানে এই সকল অবস্থা অন্তর্হিত হওয়ায় আবার বহির্বাণিজ্যে মন্দগতি দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতির দরুন রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ ব্যাহত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পাটজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাগজ ও

দেশবিভাগ ও অন্যান্য কারণে পরিবর্তন :

১। প্রতিযোগিতার ফলে রপ্তানি হ্রাস

* India—1956

তুলা হইতে নির্মিত পরিবর্ত দ্রব্য (substitutes) অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকে। সুতা ও অন্যান্য তুলাজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় এবং তৈলবীজের চালান একপ্রকার বন্ধই হইয়া যায়।

২। কাঁচামাল ও খাদ্য আমদানি

দেশবিভাগের ফলে ভারতের রপ্তানি আরও ব্যাহত হয়। পূর্বে ভারত কাঁচাতুলা, কাঁচাপাট, তৈলবীজ, চর্ম প্রভৃতি কাঁচামাল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি করিত; দেশ-বিভাগের পর কাঁচাপাট, কাঁচাতুলা প্রভৃতি আমদানি করাই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। দেশের একটা বৃহদংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খাদ্যসীমান্তেও অবনতি ঘটে। ফলে বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। উপরন্তু,

৩। নিয়মিত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

যুদ্ধকালীন বাধানিষেধের পর ভোগ্যদ্রব্যের আমদানিও বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতির ফলে যন্ত্রপাতির অবপূর্তির বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার পর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হইলে আমদানির প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত নিয়মিত প্রতিকূল হইতে থাকে।

সাম্প্রতিককালের ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of India's Foreign Trade in Recent Years):

বর্তমান বৈশিষ্ট্য:
১। মোট বহি-র্বাণিজ্যের মূল্যবৃদ্ধি

প্রথমত দেখা যায়, পূর্বের তুলনায় ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই পরিমাণ ছিল ৩২১ কোটি টাকার মত। ১৯৪৮-৪৯ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১১০০ কোটি টাকার উপরে দাঁড়ায়। এই বৃদ্ধির মূলে ছিল অধিক পরিমাণে খাদ্য আমদানি ও আমদানি-রপ্তানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। ইহা ব্যতীত অবিভক্ত ভারতে যাহা ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দেশবিভাগের পর তাহা হইয়া দাঁড়ায় বহির্বাণিজ্য। উদাহরণস্বরূপ, কাঁচাপাট ও তুলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ

১৯৪৮-৪৯ সালের পর হইতে অব্যাহত গতিতে না হইলেও বহির্বাণিজ্যের মূল্য নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৬১-৬২ সালে বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্য ছিল ১৭০০ কোটি টাকা।* এই সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির মূলে আছে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ও প্রতিরক্ষাজনিত অভূতপূর্ব আমদানিবৃদ্ধি। এই কারণে সকল সময়ই আমদানি রপ্তানিকে ছাড়াইয়া যাইতেছে এবং প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ঘটিতেছে।

২। বহির্বাণিজ্য আর ঔপনিবেশিক

দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি ভারতের বহির্বাণিজ্যের গঠন এবং প্রকৃতিতেও সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন আসিয়াছে। ভারতের বহির্বাণিজ্যকে আর ঔপনিবেশিক ধরনের (colonial type) বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। ভারত এখন আর প্রধানত কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ নহে; ভারতের রপ্তানির একটা মোটা অংশ বর্তমানে

* Report on Currency and Finance, 1961-62

শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া গঠিত। আমদানির ক্ষেত্রেও বিদেশী শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে এবং শিল্পপ্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশ-বিভাগের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে আমদানি হইতে থাকে। খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরায় নাই। ১৯৬০-৬১ সালেই ১৪৫ কোটি টাকার খাদ্যশস্য ইত্যাদি আমদানি করা হয়।

ক। আমদানি বাণিজ্য—খাদ্যশস্য, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি

কাঁচাতুলা ও কাঁচাপাট পূর্বে প্রধানত রপ্তানি করা হইত; কিন্তু দেশবিভাগের পর এই সকল কাঁচামালের আমদানি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ১৯৫১-৫২ সালে ১৩৭ কোটি টাকার মত কাঁচাতুলা আমদানি করা হয়। আভ্যন্তরীণ তুলার উৎপাদন উন্নতিলাভ করায় পরবর্তী সময়ে কাঁচাতুলার আমদানি ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। তবু এখনও ভারত ৭০-৮০ কোটি টাকার মত লম্বা আঁশের কাঁচাতুলা আমদানি করিয়া থাকে।

কাঁচাপাটের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। দেশের উৎপাদনের উন্নতি হওয়ায় কাঁচাপাটের আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে ৬৭ কোটি টাকার কাঁচাপাট আমদানি করা হয়। ১৯৬১-৬২ সালে আমদানির পরিমাণ কমিয়া মাত্র ৬'২ কোটি টাকায় দাঁড়াইলেও পাকিস্তানের সরকারী বিবৃতি অনুসারে ভারত এখনও পাকিস্তানী কাঁচাপাটের প্রধান গ্রাহক।* কাঁচাপাট রপ্তানির ক্ষমতা বর্তমানে ভারতের নাই বলিলেই চলে। দেশবিভাগের পর প্রথম ১৯৫৯ সালে সামান্য কিছু কাঁচাপাট রপ্তানি করা হয়। তাহার পর অবশ্য রপ্তানি তালিকায় দ্রব্যটির উল্লেখ দেখা যায় নাই।

শিল্পোৎপাদনের অন্যান্য কাঁচামাল এবং মালমসলাও ভারত আমদানি করিয়া থাকে। কাঁচা পশম, কৃত্রিম রেশম সুতা, রাসায়নিক দ্রব্য, রং ও চর্ম আমদানিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে। আভ্যন্তরীণ শিল্পপ্রসারের গতি ত্বরান্বিত হওয়ায় উৎপাদনবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই সমস্ত কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৈল আমদানি ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে, এবং গত ৭-৮ বৎসরের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে ৭০-৮০ কোটি টাকার তৈল আমদানি করা হয়। অবশ্য আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে যন্ত্রপাতি। ১৯৪৮-৪৯ সালে যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য ছিল ৪১ কোটি টাকা। ১৯৬১-৬২ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২৩২ কোটি টাকা।

সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, আমদানির মধ্যে শিল্পজাত ভোগ্য-দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া শিল্পপ্রসারের জন্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচা-মালের পরিমাণ অতি দ্রুত প্রসার পাইয়াছে। বহির্বাণিজ্যের এই বৈশিষ্ট্য পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে অর্থনৈতিক অগ্রগতিরই সূচক।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

* Statement of the State Bank of Pakistan

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে করা যাইবে। বিষয়গুলির আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল যথাক্রমে পাটজাত দ্রব্য, কাঁচাতুলা, চা, বীজ ও কাঁচাপাট। ১৯৪৮-৪৯ সালে পাটজাত দ্রব্য, চা, তুলাবস্ত্র ও সুতা, কাঁচাতুলা, উদ্ভিজ্জ তৈল এবং চর্ম রপ্তানি বাণিজ্যে যথাক্রমে গুরুত্ব অনুযায়ী স্থানাধিকার করে। ১৯৬১-৬২ সালে রপ্তানি বাণিজ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে পাটজাত দ্রব্য, চা এবং তুলাবস্ত্র। ইহাদের রপ্তানি-মূল্য যথাক্রমে ছিল ১৪১ কোটি, ১২১ কোটি এবং ৭৮ কোটি টাকার কাছাকাছি। শুধু ১৯৬২ সাল ধরিলে পাটজাত দ্রব্য ও চা-এর রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৬০ এবং ১২৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

খ। রপ্তানি বাণিজ্য—শিল্পজাত দ্রব্যের অংশবৃদ্ধি

পাটজাত দ্রব্য, চা এবং তুলাবস্ত্র—এই তিনটিই ভারতের বর্তমান রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান পণ্য। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই ভারতকে বিশেষ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। তুলাবস্ত্রের রপ্তানিতে যুদ্ধের পরই ভারত প্রথম স্থানাধিকার করিয়াছিল; বর্তমানে বহু পশ্চাতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রধান তিনটি রপ্তানি-পণ্য

প্রতিযোগিতার ফলে এবং একপ্রকার প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের (deficit balance of payments) দরুন বর্তমানে ভারত রপ্তানি সংগঠনে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (State Trading Corporation), রপ্তানি প্রসার পরিষদ (Export Promotion Councils) প্রভৃতির মাধ্যমে উক্ত তিনটি পণ্যের বৈদেশিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াও নূতন নূতন পণ্য রপ্তানির প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে উদ্ভিজ্জ তৈল, ডিজেল ইঞ্জিন, বাইসাইকেল, সেলাই-এর কল, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বেশ কিছুটা বাড়িয়া গিয়াছে।* কাঁচামালের ক্ষেত্রে পরিমাণ বাড়িয়াছে মাত্র লৌহ-আকরের (iron-ore) বেলায়। কাঁচাতুলা প্রধানত আমদানি-পণ্য হইলেও এখন কয়েক প্রকারের কাঁচাতুলা কিছুটা রপ্তানি করা হয়। রপ্তানি বাণিজ্যে পণ্যের সংখ্যা ও শিল্পজাত দ্রব্যের অংশ—উভয়ই বৃদ্ধি পাইলেও ভারত এখনও রপ্তানির ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি দ্রব্যের উপর বিশেষমাত্রায় নির্ভরশীল; মোট রপ্তানি এখনও জাতীয় আয়ের শতকরা ৪·৫ ভাগ মাত্র। সুতরাং রপ্তানি বাণিজ্যের এই দুর্বলতা দূরিকরণে আরও মনোযোগী হইতে হইবে।

রপ্তানি বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অংশবৃদ্ধি

তবুও রপ্তানি বাণিজ্যের সংগঠন বিশেষ দুর্বল

তৃতীয়ত, ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী গতির বেশ কিছুটা পরিবর্তন

* Report on Currency and Finance, 1960-61

দেখা যায়। যদিও ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের (U. K.) অংশ এখনও সর্বাধিক, তথাপি অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক দিন দিন প্রসারিত হইতেছে। স্বাধীনতালাভের পর হইতে ভারত সরকার বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বকে পরিহার করিয়াই চলিয়াছে। পরিকল্পনার প্রয়োজন, বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ এবং দেশীয় শিল্পের প্রসারসাধন এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাণিজ্যনীতিকে পরিচালিত করা হইতেছে। অবশ্য এই তিনটি বিষয়ই পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত।

৩। ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী গতির পরিবর্তন

ক। আমদানি বাণিজ্যের গতি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম স্থানাধিকার

আমদানির ক্ষেত্রে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যুক্তরাজ্যের (U. K.) স্থান ছিল সর্বপ্রথম, ইহার পরই ব্রহ্মদেশ ও জাপানের স্থান নির্দেশ করা হইত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ অপেক্ষাকৃত অল্পই ছিল। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। ইহার পর পরিকল্পনাধীন সময়ে যন্ত্রপাতি ও খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রসারলাভ করিতে থাকে। বর্তমানে আমদানি বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের (U. K.) অংশ হইল শতকরা ১৯-২০ ভাগ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হইল শতকরা ২২-২৩ ভাগ। অতএব, আমদানি বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকে প্রথম স্থান হইতে দ্বিতীয় স্থানে সরাইয়া দিয়াছে। ইহার পরবর্তী স্থানসমূহে আছে পশ্চিম জার্মেনী, জাপান ও ইরাণ। সোবিয়েত ইউনিয়নের সহিত আমদানি বাণিজ্য বিশেষ পরিবর্তনশীল।* ক্রমাগত বাণিজ্যনীতির পরিবর্তন, রাষ্ট্রনৈতিক মনোমালিন্য প্রভৃতি কারণে পাকিস্তান হইতে আমদানি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

মুদ্রাঞ্চল হিসাবে ভারতের আমদানি বাণিজ্যের বণ্টন

মুদ্রাঞ্চল হিসাবে ভারতের আমদানি বাণিজ্যের গতি বিচার করিলে দেখা যায় যে বর্তমানে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে ষ্টার্লিং অঞ্চল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে যথাক্রমে ডলার অঞ্চল, ও. ই. ই. সি. দেশসমূহ (O. E. E. C. Countries) এবং ষ্টার্লিং অঞ্চলের বহির্ভূত দেশসমূহ।**

খ। রপ্তানি বাণিজ্যের গতি:

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে অবশ্য যুক্তরাজ্যের অংশ এখনও অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক; ইহা শতকরা ২৭-২৮ ভাগের মত। ইহার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। যুদ্ধোত্তরকালে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা মাত্র ৮ ভাগের মত যাইত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

* India—1962

** Report on Currency and Finance, 1961-62

ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক সময় বলা হইত যে, বর্তমানে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। ভারত যে বিরাট অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও মালমসলা আনয়ন করিতেই হইবে। ইহা ব্যতীত যুদ্ধের মধ্যে ভারত যে-ষ্টার্লিং জমাইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলেও বিশেষ অসুবিধা হইবে না। উপরন্তু, ভারত অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে ঋণও পাইতেছে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগ হইতে এই আশাবাদ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে থাকে। বর্তমানে (মে, ১৯৬৩) ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হ্রাস পাইয়া ১০০ কোটি টাকারও কম দাঁড়াইয়াছে, এবং নোট ছাপা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ঐ পরিমাণ টাকা জমা রাখা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। ফলে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত মিটানোর জন্য ভারত প্রায় সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক ঋণের উপরই নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থা মোটেই কাম্য নহে। অতএব সতর্ক হইয়া চলা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া যাইতে পারে। এ-সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইতেছে।

প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত সম্পর্কে সতকতা অবলম্বন প্রয়োজন

পঞ্চমত, যুদ্ধপূর্ব যুগে ভারতকে ডলার ঘাটতির সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তই হইত। কিন্তু ইহার পর দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় ১৯৫৩-৫৪ সাল ছাড়া অন্যান্য বৎসরে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (trade balance) প্রতিকূল হয়। তবে অদৃশ্য বাণিজ্য (invisibles) এবং প্রাপ্ত সরকারী দান (official donations) ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে প্রথম পরিকল্পনার শেষ তিন বৎসরে লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূলই হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হইতেই ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও লেনদেনের উদ্বৃত্ত উভয়ই নিয়মিত প্রতিকূল হইয়া চলিয়াছে। সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে এই অঞ্চলের সহিত মোট প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (trade balance) ও চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্তের (balance of payments) পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১০ এবং ৪৩০ কোটি টাকা।*

৫। যুদ্ধোত্তর যুগে ডলার অঞ্চলের সহিত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

ডলার অঞ্চলের সহিত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বিশেষ আশংকার সৃষ্টি করিয়াছে, কারণ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কারিগরি কলাকৌশল প্রধানত ঐ অঞ্চল হইতেই আমদানি করা হয়। তবে আশার কথা হইল যে, পশ্চিম জার্মেনী, জাপান, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক উন্নতিলাভ করিতেছে; এবং উহাদের নিকট

ইহার প্রতিবিধান

* **Report on Currency and Finance, 1960-61**

হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন-দ্রব্যাদি পাইবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। সুতরাং মূলধন-দ্রব্যাদির জন্য ডলার অঞ্চলের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ দিন দিন কমিবে আশা করা যায়।

৬। ভারতের স্থলবাণিজ্য

পরিশেষে, পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ায় ভারতের স্থলবাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ও অন্যান্য কারণে এই বাণিজ্যের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। অপরদিকে আবার চীনের সহিত মনোমালিন্যের ফলে তিব্বতের সহিত বাণিজ্যও বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং স্থলবাণিজ্যের বিশেষ নীট বৃদ্ধি ঘটে নাই, বলা চলে।

ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্ত (India's Balance of Payments) : কোন দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে হইলে মাত্র বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের (Balance of Trade) দিকে নজর দিলেই চলিবে না, লেনদেন-উদ্বৃত্তের (Balance of Payments) অবস্থাও বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, শুধু দৃশ্য আমদানি-রপ্তানির বিচার করিলেই চলিবে না, উহার সংগে অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানির কথাও ধরিতে হইবে।

লেনদেন-উদ্বৃত্তের চারিটি যুগ :

ঐতিহাসিক পরিক্রমায় ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্তকে চারিভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়—যথা, (ক) প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে লেনদেন-উদ্বৃত্ত, (খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর যুগে লেনদেন-উদ্বৃত্ত, (গ) প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে লেনদেন-উদ্বৃত্ত, এবং (ঘ) দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে লেনদেন-উদ্বৃত্ত।

ক। যুদ্ধপূর্ব যুগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের লেনদেনের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সহজ ছিল। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত সাধারণত অনুকূলই হইত। এই অনুকূল উদ্বৃত্তের সাহায্যে ভারত 'হোম চার্জ' প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হইত।

খ। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অভূতপূর্বভাবে অনুকূল হয়। ফলে বৈদেশিক প্রাপ্য মিটাইয়াও ভারত একটা মোটা টাকার ষ্টার্লিং জমাইতে সমর্থ হয়। কিন্তু যুদ্ধের পর, বিশেষত দেশবিভাগের পর হইতে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে থাকে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে দেখা দেয় অসুবিধা। ১৯৪৮-৪৯ হইতে ১৯৫০-৫১ সাল, এই তিন বৎসরের মধ্যে চলতি হিসাবের (Current Account) খাতে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হয় ২৬০ কোটি টাকা। সঞ্চিত ষ্টার্লিং, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও অন্যান্য সূত্র হইতে ঋণের সাহায্যে এই পাওনা মিটানো হয়।

প্রথম পরিকল্পনার ৫ বৎসরের মধ্যে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত (সরকারী দান সমেত) ১৯৫১-৫২ সাল ব্যতীত অন্যান্য বৎসরে অনুকূল হয়।

অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্য (সরকারী দান সমেত) অনুকূল হওয়ার দরুনই ইহা সম্ভব হয়—কারণ, বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বরাবরই প্রতিকূল হইয়াছে। কিন্তু সরকারী দান বাদ দিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে চলতি হিসাবের খাতে পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরেও ঘাটতি হয়।*

গ। প্রথম পরিকল্পনা-ধীন সময়

১৯৫১-৫২ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের হিড়িকে ভারতের রপ্তানি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিনিয়োগের প্রসার ও খাদ্যাভাবের দরুন আমদানি রপ্তানিকে ছাড়াইয়া যায়। ফলে চলতি হিসাবের খাতে দেখা দেয় ঘাটতি। সরকারী দান বাদ দিলে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৬৮ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ইহাই হইল ঘাটতির সর্বাধিক পরিমাণ। পরবর্তী দুই বৎসরে (১৯৫২-৫৪) কোরিয়ার যুদ্ধের হিড়িকের অবসান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ে শ্লথগতির ফলে রপ্তানি বিশেষভাবে হ্রাস পাইলেও দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের গতিতে মন্থরতা ও খাদ্যাবস্থার উন্নয়নের ফলে আমদানির পরিমাণ আরও বেশী কমিয়া আসে। ফলে দেখা দেয় চলতি হিসাবের খাতে অনুকূল উদ্বৃত্ত। প্রথম পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসরে (১৯৫৪-৫৬) রপ্তানি ও আমদানি উভয়ই প্রসারলাভ করে। একদিকে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যের সম্প্রসারণের ফলে যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে বিদেশে অর্থনৈতিক কাজকর্মের উন্নতির ফলে রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমদানির ক্ষেত্রে প্রসার ঘটে রপ্তানি অপেক্ষা অধিক। চলতি হিসাবের খাতে (সরকারী দান বাদ দিয়া) দেখা দেয় ঘাটতি।

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ঘাটতির পরিমাণ

সামগ্রিকভাবে দেখিলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে চলতি হিসাবের খাতে (সরকারী দান বাদ দিয়া) ঘাটতির মোট পরিমাণ ছিল ১২৩ কোটি টাকা। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে সরকারী সাহায্য (Official Donations) এবং সরকারী ঋণ হইতে প্রাপ্ত অর্থ মোট ঘাটতিকে অতিক্রম করে।**

পরিকল্পনা কমিশন আশংকা করিয়াছিল যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় চলতি হিসাবের খাতে ৭০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবে। কার্যক্ষেত্রে চলতি হিসাবের খাতে (সরকারী দান বাদ দিয়া) ঘাটতি কম হওয়ার প্রধান কারণ ছিল তিনটি: (১) দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন উন্নতিলাভ করার ফলে যে-পরিমাণ খাদ্য আমদানি করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা হয় নাই। (২) লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনকারী শিল্পের প্রস্তাবিত নির্মাণকার্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সুরু করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং যে-পরিমাণ

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অপেক্ষা কম ঘাটতি হইবার কারণ

* India's Balance of Payments, 1948-49—1955-56—published by the Reserve Bank of India

** Report on Currency and Finance, 1955-56

যন্ত্রপাতি আমদানি করা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল তাহা হয় নাই। (৩) বিনিয়োগের হারও আশানুযায়ী বৃদ্ধি পায় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে লেনদেন-উদ্বৃত্ত (Balance of Payments in the Second Plan Period) ঃ প্রথম পরিকল্পনার সময় অধিকাংশ বৎসরে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই (১৯৫৬-৫৭) চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি (current account deficit) দাঁড়ায় ৩৫৩ কোটি টাকা। এই ঘাটতি মিটাইতে যাইয়া ভারতকে তাহার বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় (foreign exchange reserves) হইতে ২২১ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি আরও বাড়িয়া দাঁড়ায় ৫৩৭ কোটি টাকায়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার এবং বিদেশ হইতে অধিক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ভারতকে ঘাটতি মিটাইবার জন্য বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় হইতে ২৬০ কোটির মত টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই অকল্পিত ঘাটতির জন্য নানা প্রতিবিধান অবলম্বন করার ফলে পরিকল্পনার তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে—অর্থাৎ, ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৫৯-৬০ সালে ঘাটতির পরিমাণ কমিয়া যথাক্রমে ৩৭০ ও ২৩৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু পরিকল্পনার শেষ বৎসরে উহা আবার বৃদ্ধি পাইয়া ৪২৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ফলে সমগ্র পরিকল্পনাধীন সময়ে লেনদেন-ঘাটতির পরিমাণ হয় ১৯২০ কোটি টাকা বা মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাব হইতে ৮০০ কোটি টাকা অধিক, এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে ব্যয় করিতে হয় অনুমান অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বা ২০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৫৯৫ কোটি টাকা।* এখন দেখা প্রয়োজন এরূপ বিপুল ঘাটতি হইবার কি কি কারণ ছিল।

ঘ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে লেনদেন-ঘাটতির অকল্পিত বৃদ্ধি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্বাপেক্ষা অধিক বিনিয়োগ (investment) এবং দ্রুত শিল্পপ্রসারের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে স্বতই বহির্বাণিজ্যের উপর গুরু দায়িত্ব পড়ে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালমসলার জন্য অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাসংগ্রহের সমস্যা দেখা দেয়। এই কারণেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, ভারতের বাণিজ্যনীতির উদ্দেশ্য হইবে একদিকে রপ্তানিকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করা, আর অপরদিকে আমদানিকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা। আমদানির ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয় এমন সমস্ত দ্রব্যেরই আমদানি সংক্ষেপ করা হইবে। ঐ ব্যয়সংক্ষেপের সাহায্যেই অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ করা সম্ভব হইবে।

ইহার কারণ ঃ

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমগ্র পরিকল্পনাধীন সময়ে যে চলতি হিসাবের খাতে (Current Account) ১১০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবে

* Report on Currency and Finance, 1960-61

বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহার মধ্যে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ, রপ্তানি-আমদানি এবং অন্যান্য কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে উপরি-উক্ত সম্ভাব্য ঘাটতির পরিমাপ করা হইয়াছিল। প্রথমত, ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে বাণিজ্য-সর্ত (terms of trade) অপরিবর্তিত থাকিবে।* অর্থাৎ, আমদানি-দ্রব্যের মূল্যসূচক যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্যসূচকও ততটা বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়ত, বলা হইয়াছিল যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাইবে। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের অবস্থা যে এই দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল তাহা একরূপ সর্বজ্ঞাত সত্য। বাণিজ্য-সর্তের সামান্য অবনতির ফলেও লেনদেনের অবস্থায় বিশেষ অবনতি দেখা দিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতিও লেনদেনের উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। যখনই মুদ্রাস্ফীতির ফলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় তখনই বিদেশী দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িয়া যায় ও বিদেশে দেশীয় দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়—অর্থাৎ, রপ্তানিহ্রাস ও আমদানিবৃদ্ধি প্রবণতা দেখা দেয়। সুতরাং বাণিজ্য-সর্ত এবং আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য যে-কোনও একটির প্রতিকূল পরিবর্তন পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবকে বানচাল করিয়া দিয়া লেনদেনের ঘাটতির পরিমাণকে বৃদ্ধি করিতে পারিত। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে উক্ত দুইটি বিষয়ই কার্যকর হইয়াছিল।

আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কে অতিরিক্ত আশাবাদী অনুমান

এই অনুমানের ভিত্তি: ক। বাণিজ্য-সর্ত অপরিবর্তিতই থাকিবে

খ। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত করা হইবে

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানির সম্ভাবনা সম্পর্কে তুলাবস্ত্রের উপর বিশেষ আস্থা-স্থাপন করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কয়েকটি নূতন ও পুরাতন রপ্তানি-পণ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল এবং নূতন নূতন দ্রব্যের রপ্তানির প্রসারের কথা এবং পাটজাত দ্রব্য, চা, তুলাবস্ত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান দ্রব্যের রপ্তানি ও বিক্রয়-বাজার যাহাতে সম্প্রসারিত হয়, তাহার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার কথাও বলা হইয়াছিল।

গ। রপ্তানি কতকটা সম্প্রসারিত হইবে

আমদানি বাণিজ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছিল যে মূল শিল্পগুলির প্রসারের জন্য যন্ত্রপাতি, যানবাহন, লৌহ ও ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতব দ্রব্যই অধিক পরিমাণে আমদানি করা হইবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির অনুমান করা হইয়াছিল। অপরদিকে তৈল, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্রাদির আমদানি একরূপ থাকিবে অনুমান করা হইলেও সাধারণ ভোগ্যদ্রব্যাদির আমদানি নিয়ন্ত্রিত করিবার নীতি ঘোষিত হইয়াছিল। শিল্পপ্রসারের জন্য অপরিহার্য নয় এমন সমস্ত দ্রব্যের আমদানিকে সীমাবদ্ধ করিয়া যন্ত্রপাতি এবং শিল্পের কাঁচামাল প্রভৃতি

ঘ। আমদানি নিয়ন্ত্রিত হইবে

* আমদানি-দ্রব্যের মূল্যসূচকের (imports index) সহিত রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্যসূচকের (exports index) আনুপাতিক হারকে বাণিজ্য-সর্ত বলা হয়।

অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করা হইবে—ইহা বিশেষভাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল। অদৃশ্য বাণিজ্যের (Invisibles) ক্ষেত্রে (সরকারী দান বাদ দিয়া) প্রতি বৎসর গড়ে ৫১ কোটি টাকার মত অনুকূল উদ্বৃত্ত হইবে, এইরূপ হিসাব করা হইয়াছিল।

এই ঘাটতির পূরণ কিভাবে করা হইবে, সে-সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন নির্দিষ্ট ব্যবস্থার উল্লেখ করে নাই, সাধারণভাবে কতকগুলি উপায়ের ইংগিত দিয়াছিল মাত্র। প্রথমত জমা ষ্টার্লিং হইতে ২০০ কোটি টাকার মত ব্যয় করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। বাকী ৯০০ কোটি টাকার ঘাটতি নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে পূরণ করা হইবে বলা হইয়াছিল: (১) বৈদেশিক বাজারে ঋণসংগ্রহ; (২) বিদেশ হইতে মাল সরবরাহের জন্য রপ্তানি, ক্রেডিট ও ব্যাংকারস্ ক্রেডিটের (Exports and Bankers' Credit) ব্যবস্থা; (৩) বিশ্বব্যাংক (World Bank) এবং আন্তর্জাতিক অর্থসাহায্য করপোরেশন (International Finance Corporation) হইতে ঋণ গ্রহণ; (৪) অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও দান; (৫) মিত্রভাবাপন্ন বিদেশী সরকারগুলির নিকট হইতে দান ও ঋণ গ্রহণ, এবং (৬) বেসরকারী বৈদেশিক মূলধনের (private foreign investment) বিনিয়োগ। ইহাদের মধ্যে বেসরকারী বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, এবং উহা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেই (private sector) বিনিয়োজিত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৮০০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল।

ঙ। লেনদেন-ঘাটতি সহজেই মিটানো যাইবে

পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত হিসাবকে ভুল প্রমাণিত করিয়া প্রথম দুই বৎসরেই (১৯৫৬-৫৮) মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৯০ কোটি টাকা—যদিও বা মোট পরিকল্পনাধীন সময়ে ১১০০ কোটি টাকা ঘাটতির অনুমান করা হইয়াছিল। এই ঘাটতি পূরণের জন্য এই দুই বৎসরে মোট ৪৮১ কোটি টাকা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে ব্যয় করিতে হয় এবং ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের পরিমাণ বিশেষ কমিয়া গিয়া মোট ৪২১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।* ইহার ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংকটের সূচনা দেয় এবং ভারতের নোট প্রচলন-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন** এবং পরিকল্পনার ছাঁটকাট করিতে হয়। সংগে সংগে অবশ্য লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে পরিকল্পনার তৃতীয় ও চতুর্থ

উক্ত আশাবাদী অনুমানের ব্যর্থতা ও বৈদেশিক মুদ্রাসংকট

* Report on Currency and Finance, 1960-61

** পরবর্তী অধ্যায় দেখ।

বৎসরে (১৯৫৮-৬০) ঘাটতির পরিমাণ কমিলেও পঞ্চম বা শেষ বৎসরে (১৯৬০-৬১) আবার উহা বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষিপ্তসার : আমদানির অকল্পিত বৃদ্ধি ও রপ্তানিহ্রাসই ঘাটতির কারণ

অতএব দেখা যাইতেছে, আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমান সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া যাওয়াতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে অস্বাভাবিক লেনদেন-ঘাটতি ঘটিয়াছিল। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আমদানি অনুমান অপেক্ষা বহু পরিমাণ অধিক এবং রপ্তানি অনুমান অপেক্ষা বিশেষ কম হওয়াতেই এরূপ হইয়াছিল।

অকল্পিত আমদানি-বৃদ্ধির কারণ :

এখন অকল্পিত আমদানিবৃদ্ধির কারণানুসন্ধানে প্রথমেই দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য কি পরিমাণ আমদানির প্রয়োজন হইবে সে-সম্পর্কে কমিশন হিসাবে ভুল করিয়াছিল। অর্থাৎ, আমদানির প্রয়োজনীয়তাকে অযৌক্তিক-ভাবে কম করিয়া ধরিয়াছিল।

দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে অধিক পরিমাণে আমদানি—বিশেষ করিয়া মূলধন-দ্রব্যের আমদানি বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা প্রকাশের পরও কতকগুলি নূতন কর্মসূচী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৃতীয়ত, সরকার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করিয়াই পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে অধিক পরিমাণে আমদানি-লাইসেন্স (import licence) প্রদান করায় বেসরকারী খাতে আমদানি-পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট অংককে বিশেষ ছাড়াইয়া যায়। চতুর্থত, খাদ্যাবস্থার অবনতি হওয়ায় খাদ্যশস্যের আমদানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে মাত্র ২৯ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে গড়ে বৎসরে ১২৫ কোটি টাকার মত খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল। পঞ্চমত, দেশরক্ষা খাতের বর্ধিত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অধিক আমদানি হয়। ষষ্ঠত, সাধারণ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানির মূল্যের পরিমাণ কতকটা বৃদ্ধি পায়। সপ্তমত, ১৯৫৬-৫৭ সালে আমদানির মূল্য অধিক হওয়ার আর একটি কারণ হইল সুয়েজ খাল লইয়া বিবাদ। এই বিবাদের ফলে মালের মাসুল বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানির মোট মূল্য বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে, পরিকল্পনার তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে আমদানি হ্রাসের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে আমদানি কতকটা হ্রাস পাইলেও পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৬০-৬১) অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের গতি বজায় রাখিবার জন্য আবার আমদানি বৃদ্ধি করিতে হয়।* অবশ্য আমদানির এইরূপ বৃদ্ধি অপ্রত্যাশিত হইলেও মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, আর্থিক উন্নয়ন ও ক্রমবর্ধমান জাতীয় আয় আমদানি প্রভৃতিকে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করে।**

---

* Report on Currency and Finance, 1960-61

** W. B. Reddaway, *The Development of the Indian Economy* p. 30

প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরের (১৯৫৫-৫৬) তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে রপ্তানি হ্রাসের অন্যতম কারণ ছিল দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যদ্রব্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি। বিদেশী বাজারে অন্যান্য দেশের তীব্র ও অন্যায্য প্রতিযোগিতাও (stiffer and unfair competition) ছিল আর একটি কারণ। রপ্তানি প্রসারের নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাটশিল্পজাত দ্রব্য, তুলাবস্ত্র, কাঁচাতুলা, উদ্ভিজ্জ তৈলের রপ্তানি বিশেষভাবে হ্রাস পায়। উপরন্তু, ১৯৫৭-৫৯ সাল—এই দুই বৎসরে ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে (U. K.) মন্দার ফলে ঐ সকল দেশে ভারতীয় দ্রব্য কম বিক্রয় হয়। পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে এই মন্দা দূরীভূত হইতে ভারতের রপ্তানি প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরের অংকে পৌছিতে পারে না।

রপ্তানি হ্রাসের কারণ

নিম্নে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্তের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল ঃ

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫৬-৬১) ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্ত ঃ

(হিসাব কোটি টাকায়)

মোট আমদানি	৫৩৭০
মোট রপ্তানি	৩০৬৫
বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত	--২৩০৫
অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি	(সরকারী দান ছাড়া) +৩৮৫
চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত	(সরকারী দান ছাড়া) –১৯২০

তৃতীয় পরিকল্পনায় লেনদেন-উদ্বৃত্তের গতি (Trend of Balance of Payments in the Third Plan) ঃ তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে লেনদেন-উদ্বৃত্তের যে প্রাথমিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে পূর্বাপেক্ষা আশান্বিত হইবার কোন কারণ ঘটে নাই। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে প্রথম বৎসরে মোট আমদানি ও রপ্তানি হইয়াছে যথাক্রমে ১০৩৮ কোটি এবং ৬৬২ কোটি টাকা। ফলে বাণিজ্য-ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ৩৭৬ কোটি টাকা। দ্বিতীয় বৎসর ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট আমদানির পরিমাণ ছিল ৭৪৩ কোটি টাকা ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫২০ কোটি টাকা।* পরিকল্পনায় প্রয়োজনের সহিত প্রতিরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা সংযুক্ত হওয়াতেই ঘাটতি একটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা হউক, আশংকা করা হইতেছে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় গড়ে বাৎসরিক ৮৫০ কোটি টাকা রপ্তানি করিয়াও লেনদেন-ঘাটতিকে অনুমিত ২০০০ কোটি টাকার কাছকাছি রাখা সম্ভব হইবে কি না।

* Reserve Bank Bulletin, March 1963

যুদ্ধোত্তর ও সাম্প্রতিককালের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও লেনদেন-উদ্বৃত্তের কারণের সংক্ষিপ্তসার (Summary of the Reasons for Adverse Balance of Trade and Balance of Payments in the Post-war and Recent Years) : যুদ্ধোত্তর ও সাম্প্রতিককালে প্রতি বৎসরেই বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইয়াছে। তবে প্রথম পরিকল্পনার ১৯৫১-৫২ সাল ব্যতীত অন্যান্য বৎসরে লেনদেন-উদ্বৃত্ত অনুকূল ছিল। ইহা সরকারী দানের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। পূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও লেনদেন-উদ্বৃত্তের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইলেও এখন উহার একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে : (১) স্বাধীন ভারতের একটি প্রধান সমস্যা হইল খাদ্যাভাব। ইহার জন্য ভারতকে বিদেশ হইতে একটা মোটা টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে। (২) দেশবিভাগের পূর্বে ভারত কাঁচামাল রপ্তানি করিত। একদিকে যেমন দেশবিভাগের ফলে কাঁচামালের ঘাটতি হয়, অপরদিকে শিল্পপ্রসারের জন্য কাঁচা-মালের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। ফলে ভারতকে বহুল পরিমাণে কাঁচামাল আমদানি করিতে হয়। (৩) যুদ্ধাবস্থায় আয় বৃদ্ধি পাইলেও ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা অপূর্ণই থাকিয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের পর ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি বাড়িয়া যায়। (৪) যুদ্ধকালে যন্ত্রপাতির যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহার পূরণের জন্য ভারতকে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতির সাজসরঞ্জাম আমদানি করিতে হয়। (৫) মুদ্রাস্ফীতির ফলে ভারতীয় বাজারে বিক্রয় যেমন সুবিধাজনক হয়, ভারত হইতে ক্রয় তেমনি আবার অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ব্যয়-মূল্যের (cost-price) মধ্যে অসমতা ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যকে ব্যাহত করে। (৬) আশানুরূপভাবে ভারতের উৎপাদনকে রপ্তানিবৃদ্ধি ও আমদানিহ্রাসের উপযোগী করিয়া সংগঠিত করা সম্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া ভারতীয় দ্রব্যাদির গুণগত উৎকর্ষেরও উন্নতি করা হয় নাই ; ফলে বিদেশে উহাদের বিক্রয়-সম্ভাবনার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা যায় নাই। অন্যান্য দেশের অন্যায্য প্রতিযোগিতাও এই পথে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। (৭) পাকিস্তানের সংগে বাণিজ্য-সম্পর্ক সকল সময় সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় নাই। ইহাতে ভারতের উৎপাদন ও বহির্বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। (৮) পরিশেষে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য ভারতকে বহু পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও পরিবহণ সাজসরঞ্জাম আমদানি করিতে হইতেছে। বস্তুত, এই খাতেই বর্তমানে আমদানি হইল সর্বাপেক্ষা অধিক। এই কারণগুলি ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার মূল্যগত অসাম্যাবস্থা (price disequilibrium) ও কাঠামোগত অসাম্যাবস্থা (structural disequilibrium) উভয়েরই নির্দেশক।

লেনদেন-ঘাটতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত প্রতিবিধান (Remedies Adopted Against Imbalance) : প্রথমত, উৎপাদনবৃদ্ধি বিশেষত খাদ্যশস্যের

উৎপাদনবৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রয়োজনমত বৃদ্ধি পায় নাই।* এই কারণে মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লওয়া হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে আবার অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করার লক্ষ্যনীতি নির্দিষ্ট হইয়াছে।

১। খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

দ্বিতীয়ত, খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে শিল্প ও রপ্তানি-পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজ কাঁচামালের উৎপাদনবৃদ্ধির নীতি ঘোষিত হইয়াছে।**

২। অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

তৃতীয়ত, স্বাধীনতার পর যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায় তাহা রোধ করিবার জন্য নানাবিধ আর্থিক ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৬ সালের মে মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাংক পরিমাণমূলক (quantitative) এবং নির্বাচনমূলক (selective) ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রয়োজনমত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা রপ্তানি প্রসারের অন্যতম সর্ত।

। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ

চতুর্থত, অপরিহার্য নয় এরূপ দ্রব্যাদির আমদানি বিশেষভাবে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং যথাসম্ভব বিদেশী দ্রব্যের চাহিদা দেশীয় দ্রব্যের দ্বারা পূরণ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যবসায়, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের জন্যও বিদেশ ভ্রমণ নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে, এবং কয়েক ক্ষেত্রে মূলধন-দ্রব্যও মাত্র বিলম্বে পাওনা মিটানোর ব্যবস্থার (deferred payment arrangements) ভিত্তিতে আমদানি করিতে দেওয়া হইতেছে।

৪। আমদানি নিয়ন্ত্রণ

পঞ্চমত, রপ্তানি প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ক্রমশ রপ্তানির উপর হইতে বাধানিষেধ অপসারিত করা হইতেছে, রপ্তানিকারীদের রিবেট, করহ্রাস ইত্যাদি নানাপ্রকার সুযোগসুবিধা দেওয়া হইতেছে। একটি রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদ (an Export Advisory Council) ছাড়াও রপ্তানিবৃদ্ধির উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৪৯ সালে একটি রপ্তানি প্রসার কমিটি (Gorwalla Export Promotion Committee) নিয়োগ করা হয়। সরকার এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রপ্তানি প্রসারের জন্য নানা পন্থা গ্রহণ করে। ১৯৫৭ সালে আবার একটি রপ্তানি প্রসার কমিটি (Export Promotion Committee, 1957) নিয়োগ করা হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস, বিভিন্ন

৫। রপ্তানি প্রসারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা :

---

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee

** Third Five Year Plan ৪৮ পৃষ্ঠা

রপ্তানি-পণ্যের জন্য রপ্তানি প্রসার পরিষদ (Export Promotion Councils) গঠন, রপ্তানির জন্য অতিরিক্ত কোটা মঞ্জুর প্রভৃতি নানা পন্থা অবলম্বন করা হয়। ১৯৫৮ সালে বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যাদির সমন্বয়ের জন্য একটি বৈদেশিক বাণিজ্য বোর্ড (Foreign Trade Board) এবং রপ্তানি প্রসার নীতির সমন্বয়ের জন্য একটি রপ্তানি প্রসার দপ্তর (Directorate of Export Promotion) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।* রপ্তানি বাণিজ্যের ঝুঁকি বীমার (Export Credit Insurance) জন্য ১৯৫৭ সালে একটি রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন (Export Risks Insurance Corporation) গঠন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সম্প্রতি একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন [The State Trading Corporation of India (Private) Ltd.] গঠিত হইয়াছে। এই করপোরেশন বহির্বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করিতেছে। রপ্তানি প্রসারের প্রচেষ্টাকে তীব্রতর করিবার জন্য ১৯৬২ সালে মে মাসে বাণিজ্য বোর্ড (Board of Trade) গঠন করা হইয়াছে, এবং বিলম্বে পাওনা আদায়ের ভিত্তিতে রপ্তানির ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ, ভারতীয় দ্রব্যাদির মান নির্ধারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে শো-রুমের (show rooms) ব্যবস্থা ও প্রচারকার্য প্রভৃতি ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করিয়াছে। ইহার উপর ভারত সরকার বিভিন্ন দেশে শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত শুভেচ্ছা দল (Industrial-cum-Commercial Mission) প্রেরণ করিয়া রপ্তানি প্রসারের চেষ্টা করিতেছে।

রপ্তানি প্রসার পরিষদ

রপ্তানি বাণিজ্য ঝুঁকি পরিকল্পনা

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন

বাণিজ্য বোর্ড

ষষ্ঠত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণের (Exchange Control) সাহায্যে বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে উহাকে ব্যবহৃত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, বিদেশী মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়, বিদেশ-ভ্রমণের ব্যয়, বিদেশে শিক্ষার জন্য ব্যয়, স্বর্ণ ও গহনাদির আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থা (balance of payments position) অনুসারে এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে শিথিল বা কঠিন করা হয়।

৬। বিনিময় নিয়ন্ত্রণ

সপ্তমত, বিভিন্ন দেশের সহিত ভারত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ২৬টি দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি কার্যকর রহিয়াছে, দেখা যায়। এই সকল চুক্তির ফলে ঐ সমস্ত দেশ হইতে শিল্পপ্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আমদানি করা কতকটা সহজসাধ্য হইয়াছে, এবং ঐ দেশগুলিতে ভারতীয় দ্রব্যাদির রপ্তানির কিছুটা প্রসারলাভ করিয়াছে।

৭। বাণিজ্য-চুক্তি

* Report on Currency and Finance, 1957-58

অষ্টমত, যুদ্ধোত্তর যুগে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ভারতীয় মুদ্রামান-হ্রাস। ১৯৪৯ সালে যুক্তরাজ্যের পদাংক অনুসরণ করিয়া ভারত ডলারের হিসাবে টাকার বিনিময়-মূল্য শতকরা ৩০.৫ ভাগ হ্রাস করে। ইহার ফলে ভারতীয় রপ্তানি প্রসারলাভ করে এবং আমদানি সংকুচিত হয়। একদিকে ডলার অঞ্চলে রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্যহ্রাস, অপরদিকে ষ্টার্লিং অঞ্চলে অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতার চাপ হ্রাস ভারতীয় রপ্তানি প্রসারে সাহায্য করে।

৮। মুদ্রামানহ্রাস

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি বিভিন্ন সময়ে অনুসৃত হইয়াছে, তবে মুদ্রামানহ্রাস ছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে ১৯৫৭ সালের মধ্যভাগ হইতে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে বাণিজ্য-ঘাটতি ও লেনদেন-ঘাটতি উভয়ই কতকটা হ্রাস পায়; কিন্তু পঞ্চম বা শেষ বৎসরে আবার আমদানিবৃদ্ধিহেতু উহাদের পরিমাণ আবার পূর্ববৎ হয়।

উপসংহারঃ ভারতের বাণিজ্য ও লেনদেন উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও যে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হইতেছে তাহার অন্যতম কারণ হইল বৈদেশিক সাহায্য। ভারত মিত্রভাবাপন্ন দেশগুলি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে দান ও ঋণ এবং বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ঋণ পাইতেছে। এইরূপ বৈদেশিক সাহায্য (external assistance) হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৮৮ এবং ১০৯০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়। মূল তৃতীয় পরিকল্পনায় মার্কিন পাবলিক ল ৪৮০-র (P. L. 480) অধীনে আমদানি ছাড়া অন্যান্য সূত্রে বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির প্রয়োজন ২৬০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। এই প্রয়োজন না মিটিলে—অর্থাৎ, ঐ পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য না পাওয়া গেলে পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যাপারে বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কথা। এখন ঐ বিপদেরই সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় রপ্তানি প্রসারের উপর আরও অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট ৩০০০ কোটি টাকার রপ্তানির তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানির লক্ষ্য প্রথমে ৩৭০০-৩৮০০ কোটি টাকায় ধার্য করা হইলেও বর্তমানে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া ৪২৫০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এ-সম্পর্কে বাণিজ্যনীতি প্রসংগে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

পরিকল্পনা কার্যের জন্য বৈদেশিক সাহায্য

মুদ্রামানহ্রাস* ও ভারতের বহির্বাণিজ্য (Devaluation and India's Foreign Trade)ঃ ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডলারের

* স্বর্ণ এবং বিদেশী মুদ্রার হিসাবে কোন দেশের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য সরকারীভাবে হ্রাস করা হইলে তাহাকে মুদ্রামানহ্রাস বা ডিভ্যালুয়েশন (Devaluation) বলা হয়। ঐ মুদ্রামানহ্রাস সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানি ও রপ্তানির উপর প্রভাব বিস্তার করে। মুদ্রামানহ্রাসকারী দেশে বিদেশী দ্রব্যের

হিসাবে ভারতীয় টাকার বিনিময়-মূল্য শতকরা ৩০.৫ ভাগ হ্রাস করা হয়। অবস্থার চাপে পড়িয়াই ভারতকে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাজ্যের অনুসরণে ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশ ডলারের হিসাবে উপরি-উক্ত পরিমাণে তাহাদের মুদ্রামানহ্রাস করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে যুক্তরাজ্যের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইতে দেখা যায়। বিশেষত, ডলার অঞ্চলে রপ্তানি হ্রাস পায়। যুক্তরাজ্য (U. K.) ও ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলিতে ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের লেনদেনের উদ্বৃত্ত (Balance of Payments) ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে থাকে। ইহার ফলে স্বর্ণ ও ডলার সঞ্চয় দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবস্থা সংকটজনক হইয়া দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্য এবং উহার সহিত ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলি লেনদেনের অবস্থার উন্নতিসাধনের পন্থা হিসাবে মুদ্রামানহ্রাস-ব্যবস্থা অনুসরণ করে।

ষ্টার্লিং অঞ্চলের মুদ্রামানহ্রাস

ভারতের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ১৯৪৫ সালের পর হইতে ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে লেনদেন-উদ্বৃত্ত (Balance of Payments) ক্রমাগত প্রতিকূল হইতেছিল। তৎসত্ত্বেও ভারত মুদ্রামানহ্রাসের পক্ষপাতী ছিল না। সরকার স্পষ্টই ঘোষণা করে যে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রামানহ্রাস ডলার দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যার প্রকৃত সমাধান নয়। আমদানি ত সরকারী বাধানিষেধের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে, মুদ্রামানহ্রাসের সাহায্যে আমদানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া আমদানি হ্রাস করিবার প্রয়োজন নাই এবং কাম্যও নয়। ভারতের রপ্তানির অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদির সরবরাহের প্রকৃতি অনতিপরিবর্তনশীল (inelastic) হওয়ায় মুদ্রামানহ্রাসের সাহায্যে রপ্তানি-পণ্যের মূল্য হ্রাস করিয়া রপ্তানি হইতে আয়বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ষ্টার্লিং অঞ্চল যখন মুদ্রামানহ্রাস করিল তখন ভারতকে একপ্রকার বাধ্য হইয়াই ঐ পথে পদসঞ্চার করিতে হইল।* কারণ, ভারতের তিন-চতুর্থাংশ রপ্তানি ষ্টার্লিং অঞ্চলে হইত। সুতরাং, ভারতীয় মুদ্রামানহ্রাস না করা হইলে ঐ অঞ্চলের মুদ্রার হিসাবে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইত এবং ভারতের রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলি। এই অবস্থায় ভারত মুদ্রামানহ্রাস না করিলে তাহার প্রতিযোগিতার শক্তি হ্রাস পাইত। কারণ, যে-সমস্ত দেশ মুদ্রামানহ্রাস করিয়াছিল তাহাদের রপ্তানি দ্রব্যাদির তুলনায় ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া দাঁড়াইত। ফলে বিদেশী বাজারে ভারতীয় দ্রব্যাদির চাহিদা কমিয়া যাইত। বলা হয় যে, এই পরিস্থিতিতে ভারতকে আত্মরক্ষার জন্যই মুদ্রামানহ্রাস করিতে হইয়াছিল।

আত্মরক্ষার জন্য ভারতকে মুদ্রামানহ্রাস করিতে হয়

মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশে ঐ দেশের রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। ফলে ঐ মুদ্রামানহ্রাসকারী দেশের আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের দিকে যাইতে পারে।

* 'মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা' সম্পর্কিত অধ্যায় দেখ।

এখন দেখা যাউক বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের মুদ্রামানহ্রাসের ফলাফল কি দাঁড়ায়:

(১) রপ্তানির উপর প্রভাব: মুদ্রামানহ্রাসের ফলে ডলার ও দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাঞ্চলে (hard currency area) ভারতীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পায়। তুলাবস্ত্র তৈল অভ্র চর্ম প্রভৃতি দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ষ্টার্লিং অঞ্চলেও রপ্তানি বৃদ্ধি হয়, কারণ যে-সমস্ত দেশ মুদ্রামানহ্রাস করে নাই তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের সুবিধা হয়। যেমন, জাপান মুদ্রামানহ্রাস না করায়, ষ্টার্লিং অঞ্চলে তুলাবস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। তবে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই বৃদ্ধির একমাত্র কারণ মুদ্রামানহ্রাস নয়। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে সমরায়োজন ও দ্রব্যসঞ্চয়ের হিড়িকে ভারতীয় রপ্তানি অনেকটা সম্প্রসারিত হয়। ইহা ছাড়া, ভারত সরকার রপ্তানি প্রসারের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিতে থাকে।

ফলাফল: রপ্তানি বৃদ্ধি

(২) আমদানির উপর প্রভাব: ডলার অঞ্চল ও অন্যান্য যে-সমস্ত দেশ মুদ্রামানহ্রাস করে নাই তাহাদের নিকট হইতে আমদানির মূল্য বৃদ্ধি পায়। ঐ অঞ্চলগুলি হইতে খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় মূলধন-দ্রব্যের ক্রয় ভারতের পক্ষে অধিক ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে। ভারতের আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। এমনকি যে-সমস্ত দেশ মুদ্রামানহ্রাস করে তাহাদের নিকট হইতেও আমদানি ব্যয়সাধ্য হয়, কারণ ডলার ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাঞ্চলে ঐ সমস্ত দেশের জিনিসপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ভারতের আমদানিহ্রাসের একমাত্র কারণ মুদ্রামানহ্রাস নয়। ভারত সরকার অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত করে। দেশের মধ্যে খাদ্য, পাট ও তুলা উৎপাদনের বৃদ্ধির দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

ডলার অঞ্চল হইতে আমদানিহ্রাস

(৩) বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের উপর প্রভাব: রপ্তানিবৃদ্ধি ও আমদানিহ্রাসের ফলে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে কিছু সময়ের জন্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২৮৩ কোটি টাকা। ১৯৪৯-৫০ সাল ও ১৯৫০-৫১ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯০ কোটি টাকা ও ৩.৫ কোটি টাকায়। কিন্তু পরের বৎসর এই উন্নতি অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় নাই। ১৯৫১-৫২ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে উন্নতি

(৪) বাণিজ্য-সর্তের উপর প্রভাব: বাণিজ্য-সর্তেও (terms of trade) উন্নতি দেখা যায়। মুদ্রামানহ্রাসের পর হইতে উহা ভারতের পক্ষে অনুকূল হইতে থাকে। তবে এই উন্নতির মূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের সমর প্রস্তুতির প্রভাবও বর্তমান ছিল।

বাণিজ্য-সর্তের অনুকূল অবস্থা

(৫) পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্যের উপর প্রভাব : পাকিস্তান প্রথমে—অর্থাৎ, ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহার মুদ্রার মান হ্রাস করে নাই। ফলে পাকিস্তানের ১০০ টাকার বিনিময়-মূল্যের হার দাঁড়ায় ভারতীয় ১৪৪ টাকা। এই বিনিময় হারে হিসাব করিলে পাকিস্তান হইতে আমদানি দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই উচ্চ মূল্যে কাঁচাপাট, চর্ম, তুলা প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। একদিকে পাকিস্তান এই নূতন বিনিময় হার কার্যকর করিতে মনস্থ করে, অপরদিকে ভারত সরকার এই বিনিময় হার মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। ইহাতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যে দেখা দেয় অচলাবস্থা। পাট, চর্মশোধন প্রভৃতি শিল্পগুলি কাঁচামালের অভাবে সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়। পাটশিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানিও হ্রাস পায়। অপরপক্ষে পাকিস্তানও কয়লা ও তুলা শিল্পজাত দ্রব্যের অভাবে অসুবিধায় পড়ে। পরে ১৯৫১ সালের পাক-ভারত চুক্তির পর অবস্থার কতকটা উন্নতি হয়।

পাক-ভারত বাণিজ্যে অচলাবস্থা

স্বাধীন ভারতের বাণিজ্যনীতি (Trade Policy in Independent India) : দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশী শাসকের সাম্রাজ্যিক স্বার্থেই পরিচালিত হইত। প্রধানত 'হোম চার্জে'র পাওনা মিটাইবার প্রয়োজনে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল রাখিবার চেষ্টা করা হইত।

যুদ্ধপূর্ব যুগে বাণিজ্য-নীতি

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় বাণিজ্যনীতিকে যুদ্ধোপযোগী করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়—কারণ, ভারত মিত্রশক্তির যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের উপর কড়াকড়িভাবে বাধানিষেধ বসানো হয়; শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়; এমনকি নিরপেক্ষ ও মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির সহিত বাণিজ্য নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। যাহা হউক, যুদ্ধের সময় আমদানি হ্রাস পাইয়া রপ্তানি বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়, এবং ভারতের হিসাবে মোটা অংকের ষ্টার্লিং জমা হয়।*

দ্বিতীয় যুদ্ধ ও বাণিজ্যনীতি

যুদ্ধাবসান ও দেশবিভাগের পরে ভারত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, মূলধন-দ্রব্যের অভাব প্রভৃতির জন্য অধিক আমদানি করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং বাণিজ্যনীতি তদনুযায়ী পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজন হয়।

স্বাধীন ভারতে বাণিজ্যনীতি

আমদানি নীতি (Import Policy) : আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যনীতিকে পরিচালিত করা হয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া : (১) ভারতের বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় (foreign exchange resources) হ্রাস পায় এবং

* ২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে থাকে। সুতরাং সরকার যতটা সম্ভব আমদানিকে সীমাবদ্ধ করিয়া লেনদেনের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। (২) অপরদিকে আবার মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় ভারতকে বাধ্য হইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানির ব্যবস্থা করিতে হয়। (৩) শিল্পপ্রসার ও কৃষি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানি একপ্রকার অপরিহার্য হইয়া পড়ে। (৪) অন্যান্য প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও যতটা সম্ভব বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদাপূরণের ব্যবস্থা করা হয় এবং তদনুযায়ী আমদানি নীতিকে পরিচালিত করা হয়।

আমদানি নীতি

ভারতের আমদানি নীতি নিয়ন্ত্রণকারী উপরি-উক্ত বিষয়গুলি কতকটা পরস্পর-বিরোধী এবং বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল। ফলে আমদানি নীতিও নিয়ত পরিবর্তনশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন সময় কড়াকড়ি শিথিল করা হইয়াছে আবার কোন সময় বা বাধানিষেধ চাপানো হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৭ সালে যখন স্থির হইল যে, ইংল্যাণ্ডে জমা ষ্টার্লিং হইতে মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ বহির্বাণিজ্যের চলতি ঘাটতি মিটাইবার জন্য পাওয়া যাইবে তখন প্রয়োজন হইল আমদানি নিয়ন্ত্রিত করিবার; অপরদিকে আবার যখন ১৯৪৮ সালে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা সংকটে পরিণত হইল তখন প্রয়োজন দেখা দিল আমদানিবৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করিবার। কিন্তু আমদানি প্রসারনীতির ফলে আমদানি এতটা বৃদ্ধি পাইল যে দেখা গেল, তাহার মূল্য দেওয়ার মত ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সংগতি নাই। ফলে ১৯৫৯ সালে আবার আমদানি নীতির কড়াকড়ি করা হইল।

আমদানি নীতি নিয়ত পরিবর্তনশীল

১৯৫০ সালে আমদানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটি প্রথমেই অভিমত প্রকাশ করে যে আমদানি সম্পর্কে সরকারী নীতির স্থিরতা বা নিশ্চয়তা ভিন্ন ব্যবসাবাণিজ্যে শৃংখলা আনয়ন করা সম্ভব নহে। আমদানি নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া কমিটি বলে: (১) যে-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (foreign exchange) পাওয়া যাইবে আমদানি তাহাতেই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে, এবং (২) কৃষি ও শিল্পের প্রসার, অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাপূরণ এবং নিদিষ্ট দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য যে-সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে বিদেশী মুদ্রা যথাযথ-ভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। কমিটির অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান, পদ্ধতির বিকেন্দ্রিকরণ, আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নূতন ব্যবসায়ীকে সুবিধাসুযোগ প্রদান, মুদ্রাঞ্চল অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরকার এই কমিটির অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ করে এবং তাহাদের কার্যকর করার ব্যবস্থা করে। বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় শিল্প ও ভোগ্যদ্রব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকার অধিক পরিমাণে আমদানি করিবার নীতি গ্রহণ করে।

১৯৫০ সালে আমদানি অনুসন্ধান কমিটি

ফলে ১৯৫১ সাল হইতে আমদানির উপর বাধানিষেধ শিথিল করা এবং অবাধ লাইসেন্সের পরিধি বিস্তৃততর করা হয়। মোটামুটিভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত এই শিথিল আমদানি নীতিই প্রবর্তিত ছিল, যদিও বা ১৯৫৪ সালে আমদানি-শুল্কের মাধ্যমে কিছুটা আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে আমদানি নীতি

কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একরূপ সুরু হইতেই, এবং বিশেষ করিয়া ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাস হইতে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকায় আমদানি নীতিতে বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বনের আবার প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে ভোগ্যদ্রব্য আমদানি বহুল পরিমাণে হ্রাস করা হয়; এমনকি বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন-দ্রব্য আমদানিতেও বিশেষ নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাস হইতে 'বিলম্বে পাওনা মিটানোর ব্যবস্থা'র (deferred payment arrangements) ভিত্তিতে মূলধন-দ্রব্যাদি আমদানি করিবার চেষ্টা হইতে থা— তৎসত্ত্বেও ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় ক্রমাগতই হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে ১৯৫৭-৫৮ সালে সরকারকে আমদানি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন দ্রব্যের আমদানি যথাসম্ভব নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও বিলম্বে পাওনা মিটানোর ব্যবস্থার ভিত্তিতে মূলধন-দ্রব্য আমদানি করিতে দেওয়া হয়। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইলে পর ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে কাঁচামাল ও মূলধন-দ্রব্য আমদানির নীতিকে আরও শিথিল করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে আমদানি নীতি

তৃতীয় পরিকল্পনায় ঐ একই আমদানি নীতি প্রবর্তিত রাখা হইয়াছে। তবে ভোগ্যদ্রব্য ও অদৃশ্য (invisible) আমদানির ব্যাপারে আরও কড়াকড়ি করা হইয়াছে। বলা যায়, বর্তমানে উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার যুগ্ম স্বার্থেই আমদানি নীতি নির্ধারণ করিয়া কার্যকর করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে শিল্পের উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় ও রপ্তানির প্রসার—ইহাই বর্তমান আমদানি নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।*

তৃতীয় পরিকল্পনায় আমদানি নীতি

রপ্তানি নীতি (Export Policy)ঃ রপ্তানির ক্ষেত্রে যে নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা রপ্তানি প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। রপ্তানি প্রসার ব্যতিরেকে প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নাই। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান দুর্বলতা হইল পাটজাত দ্রব্য, চা এবং তুলাজাত দ্রব্য—এই কয়টি পণ্যের উপর সবিশেষ নির্ভরশীলতা। এই দুর্বলতা দূর করিয়াই রপ্তানি প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতীয় ব্যবসায়িগণ এতদিন যে ইহা করিতে পারে নাই তাহার দুইটি প্রধান কারণ ছিলঃ (ক) ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য অসংগঠিত অবস্থায় ছিল, (খ) সরকারের রপ্তানি নীতিও অনির্দিষ্ট ছিল।

রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব প্রদান

* Report on Currency and Finance, 1961-62

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যাভাব থাকায় কতকগুলি দ্রব্যের রপ্তানি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ইহার সাহায্যে আভ্যন্তরীণ চাহিদাপূরণের চেষ্টা করা হয়। অবশ্য ক্রমশ রপ্তানির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ কতকটা শিথিল করা হয়। সরকার রপ্তানি প্রসারের উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৪৯ সালে একটি রপ্তানি প্রসার কমিটি (Gorwalla Export Promotion Committee) নিয়োগ করে। কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশ ছিল নিম্নলিখিত রূপঃ (১) ভারতীয় শিল্পপতিগণকে আভ্যন্তরীণ বাজার লইয়া পড়িয়া থাকিলেই চলিবে না ; বৈদেশিক বাজারের প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কেও সচেতন হইতে হইবে। (২) ভারতীয় দ্রব্যাদির উৎকর্ষসাধন করিতে হইবে। যাহাতে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভেজাল দ্রব্য সরবরাহ প্রভৃতি অসাধু উপায় অবলম্বিত না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (৩) ভারতীয় দ্রব্যাদি যাহাতে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে তাহার জন্য ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য অধিক না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে।

প্রথমে রপ্তানি প্রসার বা গোরওয়ালা কমিটি

ব্যাখ্যা করিয়া রপ্তানি প্রসার কমিটি বলে যে, রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী বাধানিষেধ যতদূর সম্ভব অপসারিত করিতে হইবে। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত কাঁচামালের সাহায্যে রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমদানি-শুল্ক ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রপ্তানি-শুল্ককে সরকারী আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হিসাবে গণ্য করা সমীচীন হইবে না ; দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই উহার হ্রাস বা বিলোপসাধন করিতে হইবে। অতীতে মালমজুত ও ফটকা কারবারের জন্যও রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে। ইহার প্রতিকারবিধান করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক মতবিরোধের জন্য কোন দেশে রপ্তানিকে বাধা দেওয়া অনুচিত। অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদনকে ব্যাহত করা কাম্য নয়।

গোরওয়ালা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকার রপ্তানি প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালের পূর্বে রপ্তানি প্রসারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করা হয় নাই। ইতিপূর্বে ১৯৫০-৫১ সালে মুদ্রামানহ্রাস ও অন্যান্য কারণে রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাইলে সরকার নানাভাবে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণেরই ব্যবস্থা করে। বলা হয় যে, দেশের অভ্যন্তরে কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতার আশংকা দেখা দেওয়ায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। যাহা হউক, ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে বিশেষভাবে রপ্তানি প্রসারের প্রচেষ্টা করা হয়। অনেক দ্রব্যের উপর হইতে রপ্তানি-শুল্ক উঠাইয়া লওয়া হয়, অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করা হয়, বহু ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয় এবং লাইসেন্স-প্রদান পদ্ধতিকে সহজ ও সরল করা হয়। ইহা ব্যতীত রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য যে-সমস্ত কাঁচামাল আমদানি করা হয় তাহাদের ক্ষেত্রে আমদানি-শুল্কে রেয়াৎ (rebates) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে রপ্তানি প্রসার

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানি প্রসারের তীব্রতর প্রচেষ্টা

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে গৃহীত রপ্তানি প্রসারের এই নীতি এখনও অব্যাহত আছে; বরং লেনদেন-উদ্বৃত্ত ও বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের অবস্থা বিশেষ মন্দ হওয়ায় সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় তীব্রতর করা হইয়াছে। কিভাবে ইহা করা হইয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে রপ্তানি প্রসার

দ্বিতীয় রপ্তানি প্রসার কমিটি

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে সামগ্রিকভাবে রপ্তানি প্রসারের প্রশ্নকে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য দ্বিতীয় রপ্তানি প্রসার কমিটি (Export Promotion Committee) নিয়োগ করা হয় (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)। কমিটি তাহার রিপোর্টে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেঃ (১) সকল দিকে উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া কৃষিজ উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে ; (২) আভ্যন্তরীণ ভোগ বা ব্যবহারকে কতকটা সীমাবদ্ধ করিয়াও রপ্তানি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে ; (৩) ভারতের চিরন্তন রপ্তানি দ্রব্যগুলির জন্য নূতন নূতন বাজারের অনুসন্ধান করিতে হইবে, ইহা ব্যতীত নূতন দ্রব্যাদির জন্যও বিভিন্ন বিদেশী বাজার সন্ধান করিতে হইবে ; (৪) রপ্তানি দ্রব্যের নূতন ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা চালাইতে হইবে এবং তদনুযায়ী আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করিতে হইবে ; (৫) যাহাতে ভারতীয় টাকায় অন্য দেশের পাওনার একাংশ পরিশোধ করা যায় এমনভাবে বাণিজ্য-চুক্তির চেষ্টা করিতে হইবে ; (৬) দ্রব্যমূল্যকে প্রতিযোগিতার স্তরে রাখিতে হইবে।

কমিটি কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, কারণ প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলি হয় কৃষিজাত আর না-হয় কৃষির উপর ভিত্তিশীল। ইহা ব্যতীত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া খাদ্যশস্যের আমদানি হ্রাস না করিতে পারিলে বহির্বাণিজ্যে স্থায়িত্ব আসিবে না। রপ্তানি প্রসারের আর একটি সমস্যা হইল রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ও উৎকর্ষ। অনেক দ্রব্যেরই নির্দিষ্ট মান নাই। রপ্তানিকারী দ্রব্যের মান নির্দিষ্ট করিয়া না চলিলে বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে উৎপাদন-ব্যয়কেও যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। উৎপাদন-ব্যয় সম্পর্কে দুইটি প্রধান প্রশ্ন হইল— (ক) শিল্পের উৎপাদনশীলতা, এবং (খ) করভার। উৎপাদন ব্যাপারে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং শ্রমিকের উৎপাদনের হারও বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। করধার্য বিষয়ে কমিটির অভিমত ছিল যে, রপ্তানি দ্রব্যকে উৎপাদন-শুল্ক ও বিক্রয়কর হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে এবং রপ্তানি-শুল্কের হার হ্রাস করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত রপ্তানি প্রসারে উৎসাহিত করিবার জন্য আয়-কর ব্যাপারে রপ্তানিকারীকে সুবিধাসুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পরিশেষে, কমিটি অভিমত প্রকাশ করে যে, বিদেশে আমাদের

দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত প্রচার হয় নাই। সুতরাং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমিটির সুপারিশ অনুসারে রপ্তানি প্রসারের অধিকাংশ ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়। কিন্তু সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে রপ্তানির পরিমাণ অপরিবর্তিতই থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও উন্নয়ন পরিকল্পনাধীনে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু, কৃষিজ পণ্য এবং পাটজাত দ্রব্য, তুলাবস্ত্র প্রভৃতির ন্যায় কৃষির উপর নির্ভর শিল্পজ পণ্যের রপ্তানি হ্রাস পায়। নূতন নূতন পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ার দরুনই মোট রপ্তানির অংক মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৩০০০ কোটি টাকার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট রপ্তানির লক্ষ্য ৩৭০০-৩৮০০ কোটি টাকায় নির্দিষ্ট হইয়াছে।* কিভাবে রপ্তানির এই কে পৌছানো যায় তাহা নির্ধারণের ভার আমদানি-রপ্তানি নীতি সম্পর্কিত ালিয়র কমিটির (Mudaliar Committee) উপরও অর্পিত হয়। মুদালিয়র কমিটি আবশ্যিক রপ্তানির জন্য বিশেষ বিশেষ শিল্পের ও বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের পৃথক পৃথক বার্ষিক রপ্তানি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দেয়। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের রপ্তানিতে ক্ষতিপূরণের জন্য কমিটি সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ ভোগের উপর সামান্য মাত্রায় 'সেস্' ধার্য করিতে বলে। ইহা ছাড়া একটি 'রপ্তানি প্রসার রিজার্ভ' (export development reserve) গঠন করিতে হইবে। রপ্তানি হইতে আয়ের উপর স্ল্যাব-পদ্ধতিতে কিছু কর-অব্যাহতি দিয়া এই রিজার্ভ গঠন করা যাইতে পারে। রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য কাঁচামাল আমদানির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মার্কিন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতে ঋণ পাওয়া যাইতে পারে। এই কাঁচামাল আমদানির জন্য আর একটি ২৫-৩০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রার আবর্তনমূলক তহবিল (revolving fund) গঠন করা প্রয়োজন। এই তহবিল হইতে ঋণ লইয়া শিল্পসমূহ প্রয়োজনমত কাঁচামাল আমদানি করিবে।

মুদালিয়র কমিটির সুপারিশ

কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হইল যে রপ্তানি পণ্যের উপর অধিকমাত্রায় কর ধার্য করা চলিবে না, এবং কাঁচামালের অভাবে কোন শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার না হইলে তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই করিতে হইবে। মুদালিয়র কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানি প্রসারের কার্যক্রম নূতন করিয়া প্রণীত

রপ্তানি প্রসারের পূর্ণ কার্যক্রম

* মধ্যে রপ্তানির অংককে আবার মোট ৪২৫০ কোটি টাকায় বা গড়ে বাৎসরিক ৮৫০ কোটি টাকায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রপ্তানির লক্ষ্যকে উক্ত ৩৭০০-৩৮০০ কোটি টাকাতেই নিবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

হয়। মধ্যে আবার উহার কিছু রদবদলও করা হয়। পরিবর্তিত কার্যক্রম বর্তমানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গঠিত :

তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানি প্রসার

(১) উৎপাদনবৃদ্ধি ও ভোগহ্রাস দ্বারা রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য সৃষ্টি করা, (২) দেশের বাজার অপেক্ষা বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা, (৩) নূতন নূতন পণ্য রপ্তানির প্রচেষ্টা করা, (৪) বিদেশে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার জন্য বৃহদায়তনে উৎপাদন প্রভৃতির মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা, (৫) রপ্তানি দ্রব্যের অভিন্নতা বজায় রাখা ও গুণ নিয়ন্ত্রণ (standardisation and quality control), (৬) রপ্তানি পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলিকে কাঁচামাল, অর্থ ও বৈদেশিক মুদ্রার সুযোগসুবিধা দেওয়া, (৭) সকল বাণিজ্য-জোটের সংগে যথাসম্ভব সদ্ভাব বজায় রাখা, (৮) অধিকসংখ্যক দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা, (৯) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-ব্যবস্থাকে (State trading) সম্প্রসারিত করা, (১০) কাঁচামাল আমদানির উদ্দেশ্যে ১০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার একটি আবর্তনমূলক তহবিল গঠন, (১১) রপ্তানির ঝুঁকি হ্রাস করিবার জন্য রপ্তানি বীমা করপোরেশন ছাড়াও একটি রপ্তানি বাণিজ্য গ্যারাণ্টি করপোরেশন (Export Trade Guarantee Corporation) গঠন করা, (১২) রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য বিশেষজ্ঞ কর্মী সম্প্রদায় গড়িয়া তোলা, (১৩) ৩-৫ বৎসরের বিলম্বে পাওনা আদায়ের ভিত্তিতে বিদেশে বিক্রয় করা, (১৪) বাণিজ্য বোর্ডের মাধ্যমে রপ্তানি প্রসারের ব্যবস্থা সময়ান্তরে পর্যালোচনা করা, (১৫) বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে অধিকতর প্রচারকার্য চালানো, (১৬) ভারতীয় রপ্তানিকারী ও বৈদেশিক আমদানিকারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার জন্য যৌথ বণিক সংঘ (joint chambers of commerce) স্থাপন করা, (১৭) রপ্তানি প্রসার ব্যাপারে উৎসাহ (inducement) প্রদান ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্যকরণের (compulsion) নীতি অবলম্বন।*

পরিকল্পনায় বাণিজ্য নীতিকে এরূপভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে যে শেষ পর্যন্ত যেন উহা অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিকে শক্তিশালীকরণের এবং আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) সহায়ক হয়। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন-লক্ষ্যকে এই নীতির সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রপ্তানির উপরি-উক্ত অংক নির্ধারণ করা হইয়াছে। উপরন্তু, বর্তমানে ইহার সহিত প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আমদানিকেও সম্পর্কিত করা হইয়াছে। এই রপ্তানি প্রসার সম্পর্কে মিঃ রেড্ডাওয়ে একটি সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মাত্র রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশ্যেই যে-সকল দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করা যায় না, অথচ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাইতে যাহা আমাদিগকে উৎপাদন করিতেই হয়, সেই সকল দ্রব্যের রপ্তানিবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে—যেমন, ইস্পাত বা জটিল মূলধন-দ্রব্য। এশিয়ার অন্যান্য স্বল্পোন্নত

* Statements by Manubhai Shah, Minister for International Trade, on June 8, '62 and on April 5, '63

দেশে এই দ্রব্যগুলি উৎপাদন করা বিশেষ লাভজনক হইবে না, কিন্তু ভারতকে লেনদেন-সমস্যা মিটাইবার জন্য ইহাদিগকে উৎপাদন করিতেই হইবে। জাপান ও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে উৎকৃষ্ট ধরনের লৌহ-আকর পাওয়া যায় এবং এখানে শ্রমিকের মজুরি-হার অপেক্ষাকৃত কম। এই সুবিধার জন্য লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের রপ্তানির সকল সম্ভাব্য প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে। অবশ্য এই প্রচেষ্টা দীর্ঘ-মেয়াদী হইবে।*

রপ্তানি প্রসারকল্পে অবলম্বিত সাম্প্রতিক ব্যবস্থাসমূহের সংক্ষিপ্তসার : পরিকল্পনা কমিশন রপ্তানি প্রসারকল্পে অবলম্বিত সাম্প্রতিক ব্যবস্থাসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে—যথা, (ক) সংগঠনের পরিবর্তন, (খ) রপ্তানিকারীদের অধিক সুযোগসুবিধা ও উৎসাহপ্রদান, এবং (গ) বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য আনয়ন (diversification)।

তিন শ্রেণীর ব্যবস্থা :

প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে আছে বিভিন্ন পণ্যের জন্য রপ্তানি প্রসার পরিষদ গঠন, রপ্তানি বাণিজ্য ঝুঁকি বীমা করপোরেশন (Exports Risks Insurance Corporation), রপ্তানি বাণিজ্য গ্যারান্টি করপোরেশন ইত্যাদি গঠন ; চা, কফি ও নারিকেল কাতা বোর্ডের উপর রপ্তানি প্রসার পরিষদের কার্যভার অর্পণ ; প্রদর্শনী, শিল্পমেলা, বিদেশে বাণিজ্য-মিশন প্রেরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো।

১। সংগঠনগত পরিবর্তন

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে আছে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও কোটা (quota) পদ্ধতির পরিহার, অধিকাংশ রপ্তানি-শুল্কের বিলোপসাধন, অন্তঃশুল্কের দরুন প্রদত্ত অর্থ ফেরত দেওয়া, রপ্তানির উদ্দেশ্যে কাঁচামাল আমদানির জন্য বিশেষ আমদানি-লাইসেন্সের (special import licence) ব্যবস্থা, বৈদেশিক মুদ্রার আবর্তনমূলক তহবিল গঠন এবং পরিবহণ ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান।

২। রপ্তানিকারীদের অধিক সুযোগসুবিধা

৩। রপ্তানিতে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য আনয়ন

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যবস্থা হইল দুইটি—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading) এবং নূতন নূতন দেশের সহিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা।

ইহা ছাড়া বলা যায়, রপ্তানি-পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা করা হইতেছে, রপ্তানিকে দেশের বাজারে বিক্রয় অপেক্ষা আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে, রপ্তানি প্রসারের সম্ভাবনা ও পন্থা লইয়া নিয়মিত গবেষণা চালানো হইতেছে এবং বিলম্বে পাওনা আদায়ের ভিত্তিতে রপ্তানির বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

নিম্নে উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহের কয়েকটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

রপ্তানি ঝুঁকি বীমা (Export Risks Insurance) : রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের অন্যতম পন্থা হইল বাণিজ্য ঝুঁকি গ্রহণের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা।

* W. B. Reddaway, *The Development of the Indian Economy*

রপ্তানি বাণিজ্যে নানাপ্রকারের ঝুঁকি থাকে। সুতরাং রপ্তানিকারীর ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনাও থাকে যথেষ্ট। তাহাকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক যে সম্প্রসারিত হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। একাধিক দেশে এই বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হইয়াছে।

বীমার উদ্দেশ্য

ভারত সরকারও এই ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রপ্তানি ঝুঁকি বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছে। বীমা পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারত সরকার পূর্বোল্লিখিত রপ্তানি বাণিজ্য ঝুঁকি পরিকল্পনা কমিটি (Export Credit Guarantee Committee) নিয়োগ করে। কমিটি তাহার রিপোর্টে বলে: রপ্তানি বীমা-ব্যবস্থা রপ্তানি সম্প্রসারিত করিতে বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করা যায়। ক্ষুদ্র ও মধ্যকারের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রমশ অংশগ্রহণ করিতেছে; তাহাদের জন্য রপ্তানি বীমার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বীমা প্রবর্তিত হইলে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিকল্পনার জন্য অর্থ সহজলভ্য হইবে এবং রপ্তানিকারীও নূতন নূতন বিক্রয় বাজারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। অন্যান্য দেশে রপ্তানি বীমার সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতীয় রপ্তানিকারীকে অনুরূপ সুযোগসুবিধা না দেওয়া হইলে প্রতিযোগিতায় তাহার অসুবিধা হইবে। বীমা-ব্যবস্থার এই সমস্ত সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া কমিটি অনতিবিলম্বে ভারতে রপ্তানি ক্রেডিট বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তনের এবং ইহার পরিচালনা একটি করপোরেশনের উপর ন্যস্ত করিবার সুপারিশ করে।

রপ্তানি ঝুঁকি পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ

কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে 'রপ্তানি বাণিজ্য ঝুঁকি বীমা করপোরেশন' (Export Risks Insurance Corporation) গঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত। ইহার দায়িত্ব ৭ জন ডিরেক্টর লইয়া গঠিত একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। উহার অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা এবং বিলিকৃত মূলধন ২.৫ কোটি টাকা। করপোরেশনকে পরামর্শদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council) আছে। রপ্তানি-ব্যবসায়ী, রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থপ্রদানকারী ব্যাংক, রপ্তানি প্রসার পরিষদগুলি (Export Promotion Councils) এবং পণ্য বোর্ডের (Commodity Boards) ২১ জন প্রতিনিধি লইয়া এই পরিষদ গঠিত।

রপ্তানি বাণিজ্য ঝুঁকি বীমা করপোরেশন

করপোরেশন বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উভয় প্রকারের ঝুঁকিই (Commercial and Political Risks) গ্রহণ করে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত:

কার্যাবলী:

১। বাণিজ্যিক ঝুঁকি

বাণিজ্যিক ঝুঁকি: (১) ক্রেতা দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে (insolvency risks); (২) ক্রেতা ঋণের সর্তে জিনিস লইয়া নির্দিষ্ট তারিখে দাম পরিশোধ করিতে অস্বীকার বা অসমর্থ হইতে পারে (default risk)।

রাষ্ট্রনৈতিক ঝুঁকি : (১) রপ্তানিকারী ও আমদানিকারী প্রভৃতি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার ফলে অথবা আমদানিকারীর দেশে যুদ্ধ গৃহবিবাদ বিদ্রোহ বিশৃংখলার ফলে রপ্তানিকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে (war and civil war risk); (২) রপ্তানিকারীর দেশের সীমানার বাহিরে মালবাহী জাহাজের গতি বাধাপ্রাপ্ত বা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে মালপ্রেরণের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে পারে (diversion risk); (৩) ক্রেতার আমদানি বা মুদ্রা বিনিময় লাইসেন্স বাতিল বা উহার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইতে পারে (import control risk); (৪) কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান ক্রয়চুক্তি সম্পাদন করিয়া পরে উহাকে বাতিল করিতে পারে বা জিনিস গ্রহণে অস্বীকার করিতে পারে; অথবা কোন ক্রেতা ক্রয়চুক্তি অস্বীকার করিতে পারে বা দেউলিয়া বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে (repudiation risk); (৫) আইনকানুন প্রবর্তনের ফলে ক্রেতার দেশ হইতে বিক্রেতার দেশে প্রাপ্য অর্থপ্রেরণ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে (transfer risk); (৬) বিদেশে ডক-শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘট দেখা দিতে পারে, মাল ছাড়ানোর ব্যাপারে বিলম্ব হইতে পারে এবং বন্যা ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে।

২। রাষ্ট্রনৈতিক ঝুঁকি

করপোরেশন উপরি-উক্ত ধরনের ঝুঁকি ব্যতীত রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকিও (export control risk) গ্রহণ করে। অর্থাৎ, যদি ভারতীয় রপ্তানিকারীর রপ্তানি-লাইসেন্স বাতিল বা পুনঃপ্রদান বন্ধ হয় অথবা উহার উপর নূতন বাধা-নিষেধ আরোপিত হয় তবে তাহার ঝুঁকিও করপোরেশন লইতে পারে। আবার বিশেষ অবস্থায় বিদেশী বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান, প্রচারকার্য পরিচালনা ও অন্যান্য ধরনের রপ্তানির প্রসারকার্যের জন্য অর্থব্যয় সম্পর্কেও করপোরেশনকে ঝুঁকি লইতে হয়। অবশ্য মুদ্রামানহ্রাস, মুদ্রা-বিনিময় হারের পরিবর্তন প্রভৃতি সম্পর্কিত ঝুঁকির দায়িত্ব করপোরেশন বহন করে না।

৩। অন্যান্য প্রকারের ঝুঁকি

রপ্তানি ঝুঁকি পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ মত বাণিজ্যিক ঝুঁকির শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত এবং রাষ্ট্রনৈতিক ঝুঁকির শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত করপোরেশন বহন করে, আর বাকী দায়িত্ব রপ্তানিকারীকেই লইতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত রপ্তানিকারীকে সাধারণত তাহার সকল রপ্তানি দ্রব্যকে বীমার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমানে বীমা-ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছামূলক রাখা হইয়াছে; পরে উহাকে বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। করপোরেশন মুনাফাকারী প্রতিষ্ঠান নহে; এবং বীমার হারকে যতদূর সম্ভব স্বল্প রাখা হইয়াছে।

ঝুঁকির পরিমাণ

বীমা-ব্যবস্থা স্বেচ্ছামূলক

বীমা-ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছামূলক করার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, উহাকে বাধ্যতামূলক করাই সমীচীন ছিল, কারণ বীমাকারী রপ্তানিকারকের সংখ্যা অধিক না হইলে করপোরেশনের সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে না। বাণিজ্যিক ঝুঁকিকে যত

বেশী ছড়াইয়া দেওয়া হইবে করপোরেশনের ভিত্তিও তত বেশী সুদৃঢ় হইবে। তাহা ছাড়া বীমাকারীর সংখ্যা অধিক না হইলে প্রিমিয়ামের হার কম করা সম্ভব হইবে না। আবার বীমার প্রিমিয়ামের হার স্বল্প না হইলে করপোরেশন ব্যবসায়ীদের নিকট লাভজনক হইবে না। সুতরাং করপোরেশনকে স্বেচ্ছামূলক রাখা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই করপোরেশনকে আপাতত স্বেচ্ছামূলক রাখিবার সুপারিশ করিয়াছে।

বীমা-ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছামূলক রাখিবার বিরুদ্ধে যুক্তি

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাণিজ্য ঝুঁকি বীমা করপোরেশন উল্লেখযোগ্যভাবে কার্য সুরু করে ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে। তখন হইতে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত করপোরেশন ১১৯৮টি পলিসির বিরুদ্ধে মোট ৩৬ কোটি টাকার উপর ঝুঁকি গ্রহণ করে। ১৯৫৯-৬০ সাল হইতে করপোরেশন বিল পরিকল্পনার (Bill Market Scheme) অধীনে ব্যাংকগুলি বীমাবদ্ধ রপ্তানিকারীদের ঋণপ্রদান করিলে তাহার গ্যারান্টি দিবার দায়িত্ব পরীক্ষামূলক-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ঐ বৎসর হইতেই বীমার প্রিমিয়ামের হার গড়ে শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে এবং নূতন নূতন বৈদেশিক বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে বীমার সর্তাবলী শিথিল করা হইয়াছে।* এইভাবে বীমা-ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উহার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় নাই।

কার্যসম্পাদন

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading): বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ-ভাবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। গত যুদ্ধের পূর্বে একমাত্র জার্মেনী ও সোবিয়েত ইউনিয়নেই ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশে একদিকে যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত করা হয়, অপরদিকে তেমনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বণ্টন ব্যাপারেও রাষ্ট্র সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে থাকে। যুদ্ধোত্তর যুগে বহু দেশেই রাষ্ট্র সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। সোবিয়েত ইউনিয়ন, নয়া চীন প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংগ হিসাবে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্বার্থানুযায়ী বাণিজ্যকে পরিচালিত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও রাষ্ট্র অল্পবিস্তর অপরাপর দেশের সহিত সরাসরি বাণিজ্য পরিচালনা করিতে সুরু করিয়াছে।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ

একাধিক কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্র বর্তমানে ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইতেছে। প্রথমত, জরুরী অবস্থা, যেমন খাদ্যাভাব দেখা দিলে রাষ্ট্র অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশের সহিত সরাসরি বাণিজ্যে লিপ্ত

* Report on Currency and Finance for 1958-59, 1959-60, 1960-61 and 1961-62

হয়। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে একচেটিয়া ব্যবসায় ক্রমশ প্রসারলাভ করিতেছে। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবারের স্থানে রাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসায় অধিক কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তৃতীয়ত, সম্প্রতি বিভিন্ন দেশ অধিকমাত্রায় দ্বি-দলীয় চুক্তি সম্পাদিত করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। চুক্তির সর্তাদি কার্যকর করিবার জন্য বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। চতুর্থত, রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতিকে কার্যকর করিবার জন্যও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রয়োজন হইতে পারে। পঞ্চমত, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফার লোভ, অসাধু উপায় অবলম্বন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাষ্ট্র বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ অন্যান্য দেশে নূতন নূতন দ্রব্যাদির বিক্রয়ের প্রসারসাধনে অপারগ বা অনিচ্ছুক হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হইতে হয়। মোটকথা, বহির্বাণিজ্যের প্রসার এবং সরকারী অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও নীতিকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র সরাসরিভাবে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

বাণিজ্যে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের কারণ

ভারত সরকার গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কথা চিন্তা করিয়া আসিতেছিল। ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটির সভাপতিত্ব করেন ডাঃ পি. আর. দেশমুখ। কমিটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতিকে অনুমোদন করে এবং খাদ্য, কয়লা, ইস্পাত, তুলা, সার ও তুলাজাত দ্রব্য প্রভৃতির বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ২ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন (Initial Capital) লইয়া একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (State Trading Corporation) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলে কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই।

ভারতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

১৯৪৯ সালের অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ

এই বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালের মে মাসে সরকারী উদ্যোগে ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন [The State Trading Corporation of India (Private) Ltd.] একটি ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংগঠিত হয়। করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে ৫ লক্ষ টাকার মূলধন বিলি করা হইয়াছে। ইহার সমগ্রটাই ভারত সরকার যোগান দিয়াছে। করপোরেশনের পরিচালনার ভার একটি বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বোর্ডের সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। ইহারা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের গঠন

করপোরেশনের স্মারকলিপিতে (Memorandum of Association) করপোরেশনের উদ্দেশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। করপোরেশন যে-সকল দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি সংগঠিত করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবে তাহাদের আমদানি-রপ্তানি সংগঠিত করিবে, ভারতে কিংবা অন্যান্য দেশে ঐ সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় ও গমনাগমন এবং ব্যবসায় পরিচালনা সংগঠিত করিবে। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে-সকল আনুষংগিক পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইবে তাহাও করপোরেশন করিতে পারিবে।

করপোরেশনের উদ্দেশ্য

করপোরেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসংগে শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী বলিয়াছিলেন : প্রধানত রপ্তানি বাণিজ্য ও উহার সংগে আমদানি বাণিজ্যের প্রসারসাধনের নিমিত্তই এই করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি করপোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমত, সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রসার পাইতেছে। এই সমস্ত দেশে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত। সুতরাং ঐ সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার সহিত সম্যকভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করিতে হইলে ভারতেও অনুরূপ রাষ্ট্রীয় সংস্থা প্রবর্তিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদির আমদানির জন্য একচেটিয়া ব্যবস্থাই অধিক কাম্য বলিয়া মনে হয়; ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ সকল সময় ন্যায্য মূল্যে এই সমস্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। ইহা ব্যতীত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; যাহাতে ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবার গড়িয়া না উঠে, যাহাতে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত না হয় তাহার জন্য রাষ্ট্রকে অধিকমাত্রায় শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে।* পরিশেষে, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হইবে। এ-বিষয়েও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কিছুটা সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে।**

ভারতে করপোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সমর্থনে তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, বহির্বাণিজ্যের বৈচিত্র্যসাধন, খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন এবং সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা গ্রহণ করিবেই। সমাজতন্ত্র অভিমুখে সম্প্রসারিত আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ইহা অন্যতম স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত।†

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনাও করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সমালোচনা করিয়াছেন ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ ও বিভিন্ন বণিক-সংঘ

* Industrial Policy Resolution, 1956

** Second Five Year Plan ৯১ পৃষ্ঠা।

† Third Five Year Plan ৭, ১৩১ ইত্যাদি পৃষ্ঠা।

(Chambers of Commerce)। প্রথমত বলা হইয়াছে, বাণিজ্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই। সুতরাং ব্যর্থতার সম্ভাবনা অধিক। দ্বিতীয়ত, সরকারী প্রতিষ্ঠানে উৎসাহ, উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রুটি দুইটির জন্য দ্রব্যমূল্য অধিক হইবে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর অকাম্যভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে। চতুর্থত, করপোরেশনের উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত অনির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। এই অনির্দিষ্টতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া করপোরেশন বাণিজ্য পরিচালনার বর্তমান ব্যবস্থাদির পরিবর্তন করিলে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা অধিক, কারণ ব্যবসায়িগণের মতে, প্রচলিত ব্যক্তিগত বাণিজ্য-ব্যবস্থাই বহির্বাণিজ্য পরিচালনার পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের কার্য (Functions and Working of the State Trading Corporation): সম্প্রতি ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের চার প্রকার কাজের উল্লেখ করিয়াছে: (১) করপোরেশন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও অন্যান্য দেশের সংগে নির্দিষ্ট কতকগুলি দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য পরিচালনা করে; (২) রপ্তানি বাণিজ্যের বৈচিত্র্যসাধন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ইহা চিরন্তন রপ্তানিদ্রব্যগুলির জন্য নূতন বাজারের অনুসন্ধান করে ও নূতন রপ্তানি দ্রব্য-সমূহ বিদেশের বাজারে বিক্রয়যোগ্য করিয়া তুলে; (৩) যে-সব দ্রব্যের যোগানে ঘাটতি আছে উহাদের মূল্য স্থায়িত্বকরণ ও যথাযোগ্য বণ্টনের জন্য ইহা সরকারের নির্দেশে সেই দ্রব্যগুলি আমদানি করে এবং উহা ভারতের অভ্যন্তরে বণ্টনের ব্যবস্থা করে, এবং (৪) জনস্বার্থে সরকার আমদানি, রপ্তানি বা আভ্যন্তরীণ বণ্টনের জন্য যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইহা সেইগুলি কার্যকর করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

বর্তমানে স্থির হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সিমেণ্ট, কষ্টিক সোডা (caustic soda), সোডা এ্যাস (soda ash) প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আমদানির ভার করপোরেশন গ্রহণ করিবে এবং লৌহ-মাক্ষিক, ম্যাংগানীজ-মাক্ষিক ও অন্যান্য আকর জাতীয় দ্রব্য এবং নূতন নূতন পণ্য—অর্থাৎ, যে-সকল পণ্যের রপ্তানিতে সাধারণ রপ্তানিকারী উৎসাহী নহে—অন্য দেশে রপ্তানি করিবে। ইহা ব্যতীত করপোরেশন কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে উদ্ভিজ্জ তৈল এবং চুক্তি অনুসারে বৈদেশিক বাণিজ্য-সংগঠনসমূহের (Foreign Trade Organisations) জন্য সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই রপ্তানি করিবে। প্রয়োজনমত করপোরেশনের কার্যপরিধি সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে।

প্রতিষ্ঠার পর হইতেই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার করিয়া উহাদিগের নিকট হইতে ইস্পাত, সিমেণ্ট ও শিল্প-যন্ত্রপাতি আমদানির প্রচেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের তীব্রতা কিছুটা কম হইয়াছে। করপোরেশন যুক্তিসংগত মূল্যে সিমেণ্ট, সোডা এ্যাস, কষ্টিক সোডা, কাঁচা সিল্ক,

কার্যসম্পাদন

রাসায়নিক সার, জিপসাম, গুঁড়া দুধ, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রভৃতি ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশের মধ্যে যোগানে যেন ঘাটতি না পড়ে এবং সর্বাধিক উৎপাদন যেন সম্ভব হয়—এই দুই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই সকল দ্রব্যের আমদানির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। করপোরেশন কর্তৃক রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল খনিজ আকর (mineral ores), জুতা, হস্ত-শিল্পজাত দ্রব্য, তামাক লবণ চা কফি গালা চীনাবাদাম ঔষধপত্র, পশমজাত দ্রব্য এবং জ্যাম জেলি বিস্কুট ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য। ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে করপোরেশন রপ্তানি প্রসারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে।

সিমেন্টের ব্যবসায় বর্তমানে একরূপ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সাল হইতে লৌহ-আকর (iron ore) রপ্তানির সম্পূর্ণ ভারও উহার উপর দেওয়া হইয়াছে। রপ্তানি প্রসার ও আমদানি সুসংগঠনের জন্য করপোরেশন বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সংগঠনের (Foreign Trade Organisations) সহিত চুক্তিও সম্পাদন করিয়াছে।* ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত করপোরেশনের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮৩ কোটি টাকার উপর। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদকরা যাহাতে বিদেশী আমদানিকারীদের সংগে যোগাযোগ করিতে পারে তাহার জন্য করপোরেশন একটি পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বহির্বাণিজ্য ছাড়াও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। খাদ্য-সীমান্তই হইল এই ক্ষেত্র। মধ্যে খাদ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতিকে একরূপ পরিহার করা হইলেও বর্তমানে আবার খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন করার উদ্দেশ্যে উহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।**

বাণিজ্য-চুক্তি (Trade Agreements): উপনিবেশ ডোমিনিয়নগুলিতে মাল রপ্তানি বিষয়ে ইংল্যাণ্ড বহুদিন হইতেই সুযোগসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এই সকল দেশে সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলির তুলনায় ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক ধার্য করা হইত। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের আমদানির ক্ষেত্রে কিন্তু সাম্রাজ্যিক দেশগুলিকে অধিক সুযোগ দেওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। কারণ, ইংল্যাণ্ড অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করিত।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা: সাম্রাজ্যিক সুবিধা

ভারত সাম্রাজ্যিক সুবিধার নীতি প্রথমদিকে গ্রহণ করে নাই। কারণ, সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলির সহিত বাণিজ্য করিয়া ভারতের যে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইত তাহা হইতেই ইংল্যাণ্ডের পাওনা মিটানো সম্ভব হইত; এই অবস্থায় সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতের নীতি গ্রহণ করা হইলে অন্যান্য দেশ কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের আশংকা ছিল।

* Report on Currency and Finance for 1960-61 and 1961-62

** Third Five Year Plan ১৩১ পৃষ্ঠা

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতের প্রশ্ন বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। প্রথম ফিসক্যাল কমিশন ঐ নীতি ভারতের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া স্বীকার করিলেও সীমাবদ্ধভাবে উহা গ্রহণের সুপারিশ করে। ফলে ভারতে ব্রিটিশ ইস্পাত ও বস্ত্রের উপর শুল্কের হার হ্রাস করা হয়।

ইহার পর বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের ফলে ইংল্যাণ্ড ১৯৩২ সালে অবাধ বাণিজ্যের নীতিকে পরিহার করিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির দ্রব্যাদিকে শুল্ক ব্যাপারে সুযোগসুবিধা দিবার সিদ্ধান্ত করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালে অটোয়াতে (Ottawa) একটি সাম্রাজ্যিক অর্থনৈতিক সম্মেলন (Imperial Economic Conference) আহূত হয়। সম্মেলনে স্থির হয় যে, সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক সুবিধা প্রদান করিয়া চলিবে। ভারতের সংগে যুক্তরাজ্যের যে বাণিজ্য-চুক্তি হয় তাহাতে উভয় দেশে পরস্পরকে শুল্ক-সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

অটোয়া চুক্তি

জাতীয়তাবাদীরা এই চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে, কিন্তু সরকার উহার গুণগান করিতে থাকে। সরকারী অভিমত ছিল, ভারত যে-সুবিধা প্রদান করিয়াছিল তাহার তুলনায় অধিক সুবিধা লাভ করিয়াছিল। অপরদিকে জাতীয়তাবাদীরা দেখাইয়াছিল যে অটোয়া চুক্তির ফলে ইংল্যাণ্ডের রপ্তানিই বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল। উপরন্তু, যে-সকল ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন। সুতরাং, ভারতীয়দের বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই।

অটোয়া চুক্তির সমালোচনা

যাহা হউক, চুক্তির লাভালাভের পরিমাণ নিরূপণ করা কঠিন। কারণ, অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছিল। বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দেয়, বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং বহির্বাণিজ্যের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ আরোপ করিতে থাকে। এই অবস্থায় ভারতের আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে অটোয়া চুক্তির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। অটোয়া চুক্তি দ্বারাই ভারত রপ্তানিকে কতকটা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল।

অটোয়া চুক্তির বিরুদ্ধে বহুদিন ধরিয়া তীব্র সমালোচনার ফলে ১৯৩৯ সালে এক নূতন ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্য-চুক্তি (Indo-British Trade Agreement, 1939) সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে সাম্রাজ্যিক সুবিধাদানের মূল-নীতিকে অক্ষুণ্ণই রাখা হয়। তবে অটোয়া চুক্তির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। যুক্তরাজ্যের যে-সমস্ত দ্রব্যকে সুবিধা দান করা হইত তাহাদের সংখ্যা হ্রাস করা এবং প্রধানত যে-সমস্ত দ্রব্য ভারতে উৎপাদিত হয় না তাহাদের বেলাই সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পরিবর্তে ব্রিটিশ কতকগুলি ভারতীয় দ্রব্য বিনা শুল্কে বা সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশের তুলনায় কম শুল্কে আমদানি করিতে স্বীকৃত হয়।

১৯৩৯ সালের ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্য-চুক্তি

এই চুক্তিও অটোয়া চুক্তির ন্যায় ভারতের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ভারতীয়রা উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বলা হয়, মূলত উহা ব্রিটিশ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল, ভারতের শিল্পবাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে নহে।

এই চুক্তির ফলাফল নির্ণয় করা কঠিন

১৯৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশনের মতে, উক্ত চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রদান করা কঠিন, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর যুগে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় চুক্তিটি পূর্ণভাবে কার্যকর হইতে পারে নাই।

সাম্রাজ্যিক সুবিধার পরিবর্তে নূতন নূতন বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন

স্বাধীনতালাভের পর স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যিক সুবিধাদানের নীতিকে পরিহার করিবার দাবি উত্থাপিত হয়। উহার পরিবর্তে ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত নূতনভাবে চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করা হয়। ভারত সরকার প্রশ্নটি বিচারবিবেচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করে যে, সাম্রাজ্যিক সুবিধার এখন আর ভারতের নিকট গুরুত্ব নাই এবং বর্তমান ব্যবস্থা ভারতের স্বার্থের অনুকূলেই কার্য করিতেছে।

বস্তুত, ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতির দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যাইবে যে, ভারত আপন স্বার্থানুযায়ী বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে। কমনওয়েলথ্-বহির্ভূত দেশগুলির সংগে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ক্রমশ প্রসারলাভ করিতেছে। ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ভিত্তি ক্রমশ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। ব্রিটেন ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে এই ভিত্তিকে ব্যাপকতর করিয়া তুলিতেই হইবে।

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি (Bilateral Trade Agreement): বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা হইতেছে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তির মাধ্যমে। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি অবশ্য নূতন কিছু ব্যাপার নয়। বিগত তৃতীয় দশকের মন্দাবাজারের সময় হইতেই এই দিকে গতি লক্ষ্য করা যায়। ভারত ব্রিটেনের সহিত চুক্তি ছাড়াও জাপান ও ব্রহ্মদেশের সহিত এইরূপ বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করে। স্বাধীনতার পর ভারত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তির দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক ঝুঁকিয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ হইল ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। অনেক সময় ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং সরকারকে চুক্তির মাধ্যমে নূতন নূতন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে হয়। বর্তমানে ভারত ইহাই করিতেছে। ইহা ছাড়া শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারত

যুদ্ধোত্তর যুগে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের দিকে অধিক ঝোঁক ও ইহার কারণ

চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেছে। এই সমস্ত চুক্তি স্বল্পমেয়াদী হইলেও মেয়াদ শেষে সাধারণত ইহাদের পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়।

স্বাধীনতার পর যে-সমস্ত দেশের সহিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইতালী, রুমানীয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সোবিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, ইরাক, ইথোপিয়া, হাংগেরী, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, পাকিস্তান, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মেনী, চীন, গ্রীস, জাপান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে ভারতের সহিত ৩০টি দেশের বাণিজ্য-চুক্তি বলবৎ থাকে।*

কয়েকটি চুক্তির বিবরণ

এই প্রসংগে দুই-একটি চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে সোবিয়েত ইউনিয়নের সংগে চুক্তি করা হয় যে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ দেশ ভারতকে বিভিন্ন প্রকার সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ঔষধ সরবরাহ করিবে। ইহার পরিবর্তে সোবিয়েত ইউনিয়ন ভারত হইতে চা, কফি, মসলা, চর্ম, বনস্পতি তৈল, তামাক, পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি অধিক হারে ক্রয় করিবে। আবার ইতালীর সংগে চুক্তি করা হইয়াছে যে কলাকৌশল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহের ব্যাপারে উক্ত দেশ দুই দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কার্যকরীভাবে সহযোগিতার প্রসারসাধন করিবে। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ভারত ঐ দেশ হইতে ডিসেল ইঞ্জিন, রসায়ন দ্রব্য, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রভৃতি আমদানি করিবে এবং লৌহ ও ম্যাংগানীজ-আকর, চা, কফি, অভ্র প্রভৃতি দ্রব্য চেকোশ্লোভাকিয়ায় রপ্তানি করিবে।

চুক্তির সাহায্যে পরিকল্পনার জন্য মূলধন-দ্রব্য সংগ্রহ

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে ভারত এই সমস্ত চুক্তির সাহায্যে পরিকল্পনার জন্য প্রধানত মূলধন-দ্রব্যাদি (capital goods) আমদানি করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। উপরন্তু, ইহার ফলে ভারত নূতন নূতন বাজারে নূতন নূতন দ্রব্য রপ্তানি করিয়া লেনদেন-ঘাটতিকে বেশ কিছুটা সীমাবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইতেছে।

ভারত এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন (India and the International Trade Organisation): গত যুদ্ধের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ অনুভব করেন যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বাণিজ্য ব্যাপারে দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার প্রসার করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। হাভানায় (Havana) অনুষ্ঠিত জাতিপুঞ্জের এক সম্মেলনে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সম্পর্কে একটি সনদ (Charter) ৫৩টি জাতির প্রতিনিধি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন (International Trade Organisation) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়। ভারতও

হাভানা সনদ

* Report on Currency and Finance, 1961-62

এই হাভানা চুক্তিতে (Havana Charter) স্বাক্ষর প্রদান করে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত না হইলে এই সনদ কার্যকর হইবে না।

এই সনদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে বাধানিষেধ ও বিভেদমূলক আচরণকে অপসারিত করিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও সহযোগিতার প্রসারসাধন করা। সনদে অবশ্য বলা হয় যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলি তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যের উপর প্রয়োজনীয় বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিবে। অর্থাৎ, শিল্পপ্রসার, পূর্ণ-নিয়োগ ও বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের অসুবিধা (balance of payments difficulties) দূরিকরণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বহির্বাণিজ্যের উপর বাধানিষেধ বসাইতে পারিবে।

হাভানা সনদের উদ্দেশ্য

ভারত সরকার উপরি-উক্ত সনদ গ্রহণ করিবে কি না, সে-সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশনকে সনদটি বিচারবিবেচনা করিতে বলা হয়। কমিশন সনদের বিভিন্ন দিকের বিচার করিয়া নিম্নলিখিত সুপারিশ করেঃ (১) ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক সনদ গৃহীত হইলে, এবং (২) স্বীকৃতিদানের সময় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যথোপযুক্ত মনে হইলেই ভারত সরকার সনদে সম্মতি প্রদান করিতে পারে।

এই সুপারিশ কোন কাজে লাগে নাই, কারণ, ব্রিটেন কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাভানা চুক্তি গ্রহণ না করায় ভারতের পক্ষেও ঐ সনদ স্বীকার করিয়া লইবার কোন প্রশ্ন জাগে নাই।

ভারত হাভানা সনদ গ্রহণ করে নাই

শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি (General Agreement on Tariff and Trade): এই সাধারণ চুক্তির উদ্দেশ্যও অবাধভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্য-শুল্কের হ্রাস করা। জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে জেনেভায় এক সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে ২৩টি জাতি যোগদান করে এবং দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে বাণিজ্য-শুল্ক হ্রাসের জন্য আলাপ-আলোচনা চালায়। এই আলাপ-আলোচনার ফলে যে-চুক্তি গৃহীত হয় তাহা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সমস্ত জাতির পক্ষে প্রযুক্ত হয়। এই সমস্ত চুক্তির ফলাফল পরে দলিল-বদ্ধ করা হয়। ঐ দলিলই শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি নামে পরিচিত। ভারতও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করে এবং ১৯৪৮ সালের ৯ই জুন তারিখ হইতে চুক্তি কার্যকর করে। পরে চুক্তিটির কিছু রদবদল করা হয় এবং মোট ৩৩টি দেশ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি

এই সাধারণ চুক্তির ফলে বহুক্ষেত্রেই বাণিজ্য-শুল্কের হার হ্রাস করা সম্ভব হইয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল, ক্যানাডা, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহু দেশের সংগে বাণিজ্য-শুল্ক সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন কতকগুলি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-শুল্ক সম্পর্কে সুযোগসুবিধা আদায় করিয়াছে, অপরদিকে আবার অন্যান্য দেশকে শুল্কের ব্যাপারে সুযোগসুবিধা দিতেও হইয়াছে।

চুক্তির ফলাফল

সাধারণ চুক্তিতে ভারতের যোগদানের বিরুদ্ধে সমালোচনাও করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ কোন সুবিধা পায় নাই। দ্বিতীয়ত, বিদেশী দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক হ্রাস করায় ভারতীয় শিল্পস্বার্থ ক্ষুন্ন হইয়াছে। ১৯৫০ সালে ফিসক্যাল কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত চুক্তি (GATT) ভারতের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হয় নাই, কারণ অন্যান্য দেশ তাহাদের বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণাধীনই রাখিয়াছে। তবু কমিশন যে-কারণে হাভানা সনদ গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছিল সেই কারণেই ভারতকে সাধারণ চুক্তির (GATT) আওতায় থাকিবার পরামর্শ দিয়াছে।

এই চুক্তি দিন দিন মূল্যহীন হইয়া পড়িতেছে

বর্তমানে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র জোট বাঁধার দিকে ঝোঁক দেওয়ায় শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত এই সাধারণ চুক্তি দিন দিন মূল্যহীন হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ অন্যতম জোট হইল ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজার। এখন ইহার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজার ও ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য (European Common Market and India's Export Trade) : বলা হইয়াছে, যুদ্ধোত্তরকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনুপ্রেরণা ও তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথে অগ্রসর হইলেও দেখা যাইতেছে যে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করা বা জোট বাঁধার ঝোঁক বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ফ্রান্স, ইতালী, পশ্চিম জার্মেনী, নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গ এই ছয়টি দেশ নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ঐক্য বা সংহতি গড়িয়া তুলিবার জন্য ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক সমাজের (The European Economic Community) সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৫৭ সালে এই ছয়টি দেশ চুক্তির (Rome Treaty) মাধ্যমে ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market) নামে একটি শুল্ক-এলাকা সৃষ্টি করে এবং ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী ইহা সংগঠিত হয়। এই সাধারণ বাজারের প্রধান উদ্দেশ্য হইল : (১) নিজেদের মধ্যে আমদানি শুল্ক ও 'কোটা' ব্যবস্থাকে ক্রমশ অপসারণ করিয়া ১৯৭০-৭৩ সালের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তন করা; (২) সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন দেশগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি সম্পর্কে সম শুল্কহার (common tariffs) প্রবর্তন করা; (৩) মূলধন ও শ্রমের অবাধ গতি সম্ভব করা; (৪) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে ঋণপ্রদানের উদ্দেশ্যে একটি ইয়োরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক (European Investment Bank) গঠন করা। এই সকল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের পশ্চাতে রহিয়াছে একটি বিরাট রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য। ইহা হইল

ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজার বলিতে কি বুঝায়

সাধারণ বাজারের উদ্দেশ্য

ইয়োরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যসাধন করা। সুতরাং ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক সমাজকে 'রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত অর্থনৈতিক জোট' বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বাণিজ্যিক স্বার্থ ও সম্পর্ক যে দৃঢ়তর হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু সাধারণ বাজার অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। বিশেষ করিয়া ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজারে ইংল্যাণ্ডের যোগদানের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাতে ভারত ও কমনওয়েলথ্‌ভুক্ত দেশগুলি তাহাদের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা করে।* ভারতের আশংকা হইল এইরূপ: ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের অবস্থা সুবিধাজনক নয়, অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার্জনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম রূপায়ণের জন্য ভারতের বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ ৭৫০ কোটি টাকায় লইয়া যাইতে হইবে। রপ্তানিবৃদ্ধির পথে নূতন কোন বাধা দেখা দিলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। এখন পশ্চিমী দেশগুলিতে রপ্তানিবৃদ্ধির সম্ভাবনাও খুব আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না। চা, তুলাজাত দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি কয়েকটি চিরাচরিত দ্রব্য ব্যতীত বিদেশে রপ্তানি করিবার মত কিছুই নাই। এই দ্রব্যগুলিও বিদেশী বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। আবার, সাধারণ বাজারের কতকগুলি দেশে উচ্চ হারে শুল্ক, আভ্যন্তরীণ কর ও পরিমাণের উপর বিভেদমূলক নিয়ন্ত্রণ থাকায় ভারতের রপ্তানি প্রসারের অসুবিধা হইতেছে। ইহার ফলে সাধারণ বাজারের দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য অত্যন্ত প্রতিকূল। ১৯৬১-৬২ সালে ঐ দেশগুলি হইতে ভারত ১৮২ কোটি টাকার উপর দ্রব্য আমদানি করে এবং ঐ বৎসরে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ হয় মাত্র ৫২ কোটি টাকা; সুতরাং ঘাটতি হয় ১৩০ কোটি টাকা। অপরদিকে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইংল্যাণ্ডের স্থান একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যাণ্ড এখনও ভারতের দ্রব্যাদির বৃহত্তম ক্রেতা। মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ইংল্যাণ্ডেই যায়। ইহা ব্যতীত বাণিজ্য-উদ্বৃত্তও বিশেষ প্রতিকূল নয়। ১৯৬১-৬২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ইংল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্যে ভারতের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে দাঁড়ায় প্রায় ১৯৪ কোটি টাকা এবং ১৬১ কোটি টাকা।**

সাধারণ বাজারে ইংল্যাণ্ডের যোগদান

ভারতের উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া

এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমানে 'কমনওয়েলথ্‌ পক্ষপাতিত্বে'র (Commonwealth Preference) আশ্রয়ে ভারতের প্রায় সকল দ্রব্যই ইংল্যাণ্ডের বাজারে বিনা শুল্কে প্রবেশ করিতে পায়। তা'ছাড়া

* ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রাসেলস্‌এ সাধারণ বাজার দেশগুলির যে সম্মেলন হয় তাহাতে স্থির হয় যে আপাতত ইংল্যাণ্ডকে উহার সর্তে সাধারণ বাজারের পূর্ণ সদস্য করা সম্ভব হইবে না।

** Report on Currency and Finance, 1961-62

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের উপর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ নাই। সুতরাং ইংল্যাণ্ড কমনওয়েলথ্ দেশগুলির স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিয়া বিনা সর্তে সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে ভারতের রপ্তানি ইংল্যাণ্ডের বাজারে আর পূর্বের মত সুযোগসুবিধা ভোগ করিবে না। অবশ্য ইংল্যাণ্ড কমনওয়েলথ্ দেশগুলির জন্য সাধারণ বাজারের দেশগুলির নিকট কিছু বাণিজ্য-সুবিধা দাবি করিয়াছে। ভারতীয় রপ্তানির তিনটি প্রধান দ্রব্য হইল তুলাজাত বস্ত্র, চা ও পাটজাত দ্রব্য। ভারতীয় তুলাজাত বস্ত্র ইংল্যাণ্ডের বাজারে এখন বিনা শুল্কে প্রবেশ করিতে পায়। সাধারণ বাজারে যোগদানের পর ইংল্যাণ্ডকে সাধারণ শুল্ক বসাইতে হইবে। ফলে ভারতীয় বস্ত্রের দাম ব্রিটেনের তুলাজাত দ্রব্যের দামের তুলনায় অধিক হইবে। ইহা ব্যতীত সাধারণ বাজারের দেশগুলির বস্ত্র শিল্পের সংগে ভারতকে তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। কারণ, সাধারণ বাজারের অন্তর্গত দেশগুলির দ্রব্য শুল্ক বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের বাজারে সুবিধা ভোগ করিবে। চা-এর ক্ষেত্রেও আফ্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা থাকিলেও ভারতীয় রপ্তানি বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে বলিয়া আশংকা করা হয় না। তবে দামবৃদ্ধির ফলে ইংল্যাণ্ডের চাহিদা কতকটা কমিয়া যাইতে পারে। পাটজাত দ্রব্য সম্পর্কে বলা হয় যে বর্তমানেই ডাণ্ডীর শিল্পের (Dundee Industry) সংরক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তবে ভারতকে বেলজিয়ামের মত দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতে হইবে। ইহা ছাড়া, সাধারণ বাজার দেশগুলির অধীনস্থ আফ্রিকায় যে-সব দেশ আছে সেই দেশগুলির সংগেও ভারতের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, ঐ দেশগুলিও সাধারণ বাজারের দেশগুলির ন্যায় ইংল্যাণ্ডের বাজারে শুল্ক-সুবিধা ভোগ করিবে। ইহার ফলে চামড়া, কার্পেট ইত্যাদি দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস পাইবে।

ভারতীয় রপ্তানি-হ্রাসের আশংকা

অপরপক্ষে বলা হয় যে, ইংল্যাণ্ড সাধারণ বাজারের সহিত যুক্ত হইলে ভারতের প্রথমে কতকটা অসুবিধা হইলেও শেষ পর্যন্ত সুবিধাই হইবে। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক প্রসারের হার যথেষ্ট দ্রুত নয়। কমনওয়েলথের দেশগুলিতেও উহার রপ্তানি হ্রাস পাইতেছে। অপরদিকে ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজার দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। ১৯৫৭-৬২ সালের মধ্যে ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক সমাজের জাতীয় আয় ও শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ২৮ ও ৪০ শতাংশ, এবং ১৯৫৮-৬২ সালের এই চার বৎসরে উহাদের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় ৮৫ শতাংশ।* এ-অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ়তর করিতে হইলে উহাকে ইয়োরোপীয় সাধারণ বাজারের সুযোগসুবিধা গ্রহণ করিতে হইবে। ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক প্রসার ত্বরান্বিত হইলে ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের দুই দিক হইতে লাভ হইবে। প্রথমত, ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারিত হইবে। দ্বিতীয়ত,

ভবিষ্যতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রসার-লাভের আশা

* Speech of Prof. Hallstein in New Delhi, April 1963

ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ়তর হইলে উহারা ভারতকে অধিকমাত্রায় মূলধন সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে। ইহা ব্যতীত ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমে ইয়োরোপের দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাজারের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। সুতরাং কিছুদিনের জন্য যদি ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যকে ইংল্যাণ্ডে প্রবেশে পূর্বের মত সুবিধা দেওয়া হয় তাহা হইলেই চলিবে।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে বর্তমানে পৃথিবীতে ভারতকে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইলে চলিবে না। যাহাতে অন্যান্য দেশের সহিত ন্যায্যভাবে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় তাহার দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সংরক্ষিত সুযোগসুবিধা ভোগের আশা না করিয়া শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ও মূল্য হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইংল্যাণ্ডের মত সংরক্ষিত বাজার (sheltered market) হারানোর ফলে ভারতের সম্মুখে যে 'চ্যালেঞ্জ' দেখা দিবে পরিশেষে তাহার ফলাফল যে মঙ্গলজনক হইতে পারে তাহা মোটেই অসম্ভব নয়।* ইহার জন্য নূতন নূতন দেশগুলিতে যেমন, আফ্রিকার ও ল্যাটিন আমেরিকাস্থ দেশগুলিতে রপ্তানি প্রসারের প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. What was the nature of India's Foreign Trade before World War II ? Discuss the main changes that have come about since then.

[ইংগিত: (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের বহির্বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের; (২) বহির্বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের (U. K.) প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়; (৩) পণ্যব্যবসায় বহির্বাণিজ্যে নিয়মিতভাবে অনুকূল উদ্বৃত্ত হইত; (৪) ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশী বণিকদের স্বার্থে পরিচালিত হইত; (৫) স্থলপথে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য।

বর্তমান বৈশিষ্ট্য: (১) বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; (২) বহির্বাণিজ্যের গঠন ও প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসিয়াছে—ভারত এখন শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি এবং কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য আমদানি করে; (৩) দেশানুযায়ী বহির্বাণিজ্যের গতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে—নানাদেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে; (৪) বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত একরূপ নিয়মিতভাবে প্রতিকূল হইতেছে—ডলার অঞ্চলের সহিত এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইল অধিক; (৫) দেশবিভাগের ফলে স্থলবাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে।...(২৬-২৮ এবং ৩০-৩৭ পৃষ্ঠা)]

2. Describe the important trends in the direction of India's Foreign Trade since 1939.
(C. U. B. A. 1944, '48, '54, '56) (২৭ এবং ৩২-৩৪ পৃষ্ঠা)

3. What important changes have taken place in the nature, volume and direction of India's Foreign Trade since Independence ?
(C. U. B. A. 1949, '60 ; B. Com. 1949, '58 ; B. Com. (P. I) 1962) (৩০-৩৭ পৃষ্ঠা)

4. Give a short account of India's balance of payments difficulties in recent years. How is it possible to improve her balance of payments ?
(B. U. (O) 1962) ; (C. U. B. Com. (P.I) 1963) (৪৪-৪৭ পৃষ্ঠা)

---

* Dr. B. Datta, *Essays in Plan Economics*, p. 129

5. Explain the causes of India's adverse balance of payments during the Second Five Year Plan. (C. U. B. A. 1958 ; B. Com. 1959, '61) (৩৯-৪৩ পৃষ্ঠা)

6. What are the main exports of India ? What are the possibilities of raising our exports in future ? (C. U. B. Com. 1960) (৩২ এবং ৫২-৫৭ পৃষ্ঠা)

7. What is the present position of India's export ? What measures have been taken in recent years to promote India's export earnings ?
(C. U. B. Com. 1962) (৩২, ৪৪ এবং ৫২-৫৭ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the Export Credit Guarantee Scheme and comment on its working.
(৫৭-৬০ পৃষ্ঠা)

9. Briefly discuss the organisation and functions of the State Trading Corporation of India. (C. U. B. A. Hons. 1956) (৬০-৬৪ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the main features of India's export trade and examine the prospects of increasing our export-earnings in the near future.
(C. U. B. Com. 1958) (৩২, ৪৪ এবং ৫২-৫৭ পৃষ্ঠা)

11. Briefly describe the organisation and features of the European Common arket. How is India likely to be affected by Britain's joining it ? (৬৯-৭২ পৃষ্ঠা)

12. State the arguments for and against State Trading in India ?
(C. U. B. Com. 1962) (৬০-৬৩ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থা

(Indian Currency and Exchange System)

ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার বিবর্তন (Evolution of the Indian Currency System) : প্রাচীন ভারতে হিন্দু ও মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্বে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র ইত্যাদি ধাতব-মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রসার ঘটে ব্রিটিশ আমলে।

ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন পর্যায় :

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে শাসনক্ষমতায় আসীন হইয়া প্রথমেই মুদ্রা-ব্যবস্থার বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনিতে সচেষ্ট হয়। আলোচনার স্থবিধার্থে ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার বিবর্তনকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় :

(১) ১৮০১-৩৫—দ্বি-ধাতুমান (Bimetallic Standard) : এই সময় দ্বি-ধাতুমান প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে সরকারী বিনিময়-হার রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় ১৮৩৫ সাল হইতে ভারতে একধাতু রৌপ্যমান-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

(২) ১৮৩৫-৯৩—একধাতু রৌপ্যমান (Silver Monometallic Standard) : একধাতু রৌপ্যমান-ব্যবস্থা ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকে। ইহার অধীনে রৌপ্যের সহিত স্বর্ণের নির্দিষ্ট সরকারী হার ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই হার বজায় রাখায় অসুবিধা দেখা দেয়। তখন দেশের সর্বত্র, বিশেষত ব্যবসায়ী মহলে, স্বর্ণমান (Gold Standard) প্রবর্তনের দাবি করা হয়। এই দাবি তখন মিটানো হয় নাই। ফলে অস্থায়ী রৌপ্যমূল্য সমন্বিত একধাতু রৌপ্যমান উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চলে।

(৩) রূপান্তরের সময় (Period of Transition) : কিভাবে রৌপ্য মুদ্রা-মূল্যের অস্থায়িত্ব দূর করা যায় তাহা নির্দেশ করিবার জন্য সরকার ১৮৯৮ সালে ফাউলার কমিটি (Fowler Committee) নিযুক্ত করে। কমিটি স্বর্ণমান গ্রহণের সপক্ষে অভিমত. প্রকাশ করিয়া পর্যায়ক্রমে উহা প্রবর্তনের জন্য কতকগুলি পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করে।

(৪) ১৮৯৮-১৯১৭—স্বর্ণ-বিনিময় মান (Gold Exchange Standard : সরকার ফাউলার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্বর্ণমান প্রবর্তনের নীতিকে গ্রহণ করিলেও ঐ কমিটি নির্দেশিত পন্থাগুলি পুরাপুরিভাবে অবলম্বন না করায় ভারতে এক অভূতপূর্ব মুদ্রা-ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়। ইহা স্বর্ণ-বিনিময় মান নামে পরিচিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ইহা হইল 'স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত স্বর্ণমান'। স্বর্ণ-বিনিময় মানের অধীনে ১ টাকা=১ শি. ৪ পে.—এই হারে টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে বিনিময়-হার ধার্য করা হয়।

স্বর্ণ-বিনিময় মান দৈবক্রমে উদ্ভূত হয়

১৯১৭ সালে স্বর্ণ-বিনিময় মানের পতন ঘটে। ইহার মূলে ছিল স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধি। রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে গ্রেসামের বিধি কার্যকর হয়। অর্থাৎ, আইনগত বাধা সত্ত্বেও লোকে ভারতীয় রৌপ্য-নির্মিত মুদ্রা গলাইয়া ফেলিতে থাকে।

অপরদিকে আবার ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল হওয়ায় ভারতীয় টাকার চাহিদাও বাড়িয়া যায়। উভয় কারণে শেষ পর্যন্ত টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে নির্দিষ্ট বিনিময়-হার (১ টাকা=১ শি. ৪ পে.) রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; এবং সরকার স্বর্ণপিণ্ড মান প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(৫) ১৯২৭-৩১—স্বর্ণপিণ্ড মান (The Gold Bullion Standard) : স্বর্ণপিণ্ড মান গৃহীত হয় ১৯২৭ সালে। এই মুদ্রামানের অধীনে ১ টাকা=১ শি. ৬ পে.—এই বিনিময়-হার ধার্য করা হয়।

(৬) ১৯৩১-৪৭—ষ্টার্লিং-বিনিময় মান (Sterling Exchange Standard) : বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের কবলে পড়িয়া ব্রিটেন ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বর্ণমান হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হয়। তখন ভারতকেও স্বর্ণের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া সরাসরি ষ্টার্লিং-এর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। ফলে ভারতে যে মুদ্রামান উদ্ভূত হয় তাহাকে ষ্টার্লিং-বিনিময় মান বলিয়া অভিহিত করা হয়।

১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইনের দ্বারা ষ্টার্লিং-বিনিময় মানকে আইনসিদ্ধ

করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের উপর টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে উপরি-উক্ত বিনিময়-হার (১ টাকা=১ শি. ৬ পে.) বজায় রাখিবার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

ভারতের বর্তমান মুদ্রামান—আন্তর্জাতিক মান (Present Monetary Standard of India—the International Standard): ১৯৪৭ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (International Monetary Fund) সভ্যপদভুক্ত হয়। অর্থভাণ্ডারের প্রত্যেক সভ্যকেই তাহার মুদ্রার স্বর্ণ-বিনিময় হার (rate in terms of gold) ঘোষণা করিতে ও বজায় রাখিতে হয়। স্বতই ভারতকেও ইহা করিতে হইয়াছে। সভ্যপদভুক্ত হওয়ার সময় ভারতীয় টাকার ঘোষিত স্বর্ণমূল্য ছিল ০·২৬৮৬৯১ গ্রেন বিশুদ্ধ স্বর্ণ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩০·২২৫ সেণ্ট। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামানহ্রাসের (devaluation) পর ইহা কমিয়া ০·১৮৬৬১ গ্রেন স্বর্ণ বা ২১ সেণ্ট মার্কিন ডলারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ষ্টার্লিং-এর মূল্যও সমপরিমাণ হ্রাস পাওয়ার জন্য টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে বিনিময়-হার অপরিবর্তিতই আছে। এই অপরিবর্তিত হার হইল ১ টাকা=১ শি. ৬ পে.।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অধীনস্থ এই যে বিনিময়-ব্যবস্থা তাহাকে সংক্ষেপে ভাণ্ডার-ব্যবস্থা (Fund System) বা স্বর্ণসমতামান (Gold Parity Standard) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার পুরা নাম হইল আন্তর্জাতিক বহু মুদ্রায় পরিবর্তনশীল স্বর্ণ-বিনিময় মান (International Multi-lateral Gold Exchange Standard)। সুতরাং ভারতের বর্তমান মুদ্রামান হইল আন্তর্জাতিক মান।

স্বর্ণসমতা মান বা আন্তর্জাতিকতা মান

বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থা (Present Currency System): টাকা (Rupee) ও নয়া পয়সা বর্তমানে ভারতে হিসাবনিকাশের মাধ্যম (units of account)। সুতরাং ভারতীয় মুদ্রাকে টাকা ও নয়া পয়সার হিসাবেই ব্যক্ত করা হয়। অপরাপর সভ্য দেশের ন্যায় ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থাতেও দুই প্রকারের মুদ্রা আছে: (ক) ধাতব মুদ্রা (coins), এবং (খ) কাগজী মুদ্রা (paper notes)।

(ক) **ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থা (Metallic Coinage System):** ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতে দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু আছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রামাণিক মুদ্রা ১ টাকাকে ১০০ নয়া পয়সায় ভাগ করা হইয়াছে। বর্তমানে ১ টাকার ধাতব মুদ্রা ছাড়াও ৫০, ২৫, ১০, ৫, ২ ও ১ নয়া পয়সার ধাতব মুদ্রা আছে। এই মুদ্রাগুলিকে আনুষংগিক মুদ্রা বলা হয় এবং ইহা ভারত সরকার নিজেই প্রচলন করে।

(খ) **কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা (Paper Currency System):** ১৮৬১ সালে কাগজী মুদ্রা আইন (Paper Currency Act, 1861) দ্বারা সরকার বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ব্যাংকের নিকট হইতে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করে। ইহার পর আবার ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইন দ্বারা

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপিত হইলে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৩৪ সালের আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক যে-পদ্ধতিতে নোট প্রচলন করিত বর্তমানে তাহার পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে। নিম্নে মূল ও পরিবর্তিত উভয় প্রকার নোট প্রচলন পদ্ধতিরই আলোচনা করা হইতেছে।

১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইন অনুসারে নোট প্রচলন পদ্ধতি (The System of Note Issue under Reserve Bank Act, 1934): ১ টাকার নোট ছাড়া আর সকল নোটই প্রচলন করে রিজার্ভ ব্যাংক। নোট প্রচলন ব্যাপারে ১৯৩৪ সালের মূল আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতি (proportional reserve system) অনুসরণ করিত। ঐ আইনের ৩৩ ধারা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংককে প্রচলিত নোটের মোট মূল্যের অন্যূন দুই-পঞ্চমাংশ বা শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণপিণ্ড ও বৈদেশিক ঋণপত্র বা মুদ্রায় জমা রাখিতে হইত।* বাকী অনধিক তিন-পঞ্চমাংশ বা শতকরা ৬০ ভাগ জমা রাখিতে হইত ভারতের প্রামাণিক মুদ্রায় বা টাকায়, ভারত সরকারের ঋণপত্রে এবং হুণ্ডি প্রভৃতিতে। পদ্ধতিটি বুঝাইবার জন্য নিম্নে ছকটি দেওয়া গেল:

আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতি

নোটের বিরুদ্ধে জমা

অন্যূন শতকরা ৪০ ভাগ জমা রাখিতে হইত
(১) স্বর্ণমুদ্রায়
(২) স্বর্ণপিণ্ডে
(৩) বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্রে
(স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ডের মূল্য কিন্তু মোট ৪০ কোটি টাকার কম হইতে পারিত না।)

বাকী অনধিক শতকরা ৬০ ভাগ রাখিতে হইত
ভারতের প্রামাণিক মুদ্রা ও টাকায় — ভারত সরকারের ঋণপত্রে — হুণ্ডি প্রভৃতিতে

নানা দিক দিয়া ভারতের নোট প্রচলনের এই আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতির সমর্থন করা হইয়াছিল। প্রথমত, প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণপত্র প্রভৃতি জমা রাখিবার ব্যবস্থা থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-ব্যবস্থা (foreign exchange operations) পরিচালনায় সুবিধা হইত। প্রয়োজনমত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার দ্বারা সহসা উদ্ভূত লেনদেন-উদ্‌বৃত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইত। দ্বিতীয়ত, অপরিবর্তনীয়ভাবে

মূল্যায়ন

* ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সভ্যপদভুক্ত হইবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংককে বৈদেশিক ঋণপত্রের বিনিময়ে ষ্টার্লিং ঋণপত্র বা মুদ্রা জমা রাখিয়া নোট প্রচলন করিতে হইত।

দুই-পঞ্চমাংশ স্বর্ণ এবং বৈদেশিক মুদ্রায় জমা রাখিতে হইত বলিয়া যথেচ্ছ নোট ছাপা যাইত না। ফলে একদিক দিয়া পদ্ধতিটি মুদ্রাস্ফীতির আশংকামুক্ত ছিল। অপরদিকে কিন্তু হুণ্ডি প্রভৃতি জমা রাখিয়া নোট ছাপার ব্যবস্থা থাকায় সাময়িক প্রয়োজনমত বাজারে অধিক নোট প্রচলন করা যাইত। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য সুগঠিত বিল বাজারের অভাবে হুণ্ডি জমা রাখিয়া কখনই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নোট ছাপা হয় নাই।*

সুবিধা

উপরি-বর্ণিত নোট প্রচলন পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি ছিল যে ইহাতে ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাতে না হইলেও ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে অকাম্যভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারিত। ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য হইবার পূর্বে নিয়মানুসারে প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে জমার অন্যূন শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ ও ষ্টার্লিং ঋণপত্রে জমা রাখিতে হইত। ইহার মধ্যে অবশ্য মোট স্বর্ণের মূল্য ৪০ কোটি টাকার কম হইতে পারিত না। ইহাতে মোট ৪০ কোটি টাকার স্বর্ণ রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন বিভাগে জমা রাখিয়া খাতাকলমে ষ্টার্লিং পাওনার বিরুদ্ধে যথেচ্ছভাবে নোট ছাপা চলিত। কারণ, ব্যবস্থা ছিল যে 'অন্যূন' শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণও ষ্টার্লিং-এ জমা রাখিতে হইবে; সর্বাধিক এইরূপ জমার পরিমাণ কত হইবে সে-সম্বন্ধে কোন বাধানিষেধই ছিল না। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থার সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত ভারত সরকার একরূপ বাধাবিহীনভাবেই নোট ছাপাইয়া গিয়াছিল। ফলে ইংল্যাণ্ডে সঞ্চিত হইয়াছিল বিরাট অংকের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত (Sterling Balance) এবং এ-দেশে দেখা দিয়াছিল অভাবনীয় মুদ্রাস্ফীতি। এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে করা হইতেছে।

বিপদ : মুদ্রাস্ফীতির আশংকা

যুদ্ধের সময় আশংকা কার্যে পরিণত হইয়াছিল

বর্তমান কাগজী মুদ্রা প্রচলন পদ্ধতি (The Present Note Issue System): দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংক (সংশোধন) আইন [Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1956] দ্বারা উক্ত ১৯৩৪ সালের নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন করা হয়। পরিবর্তন দ্বারা অনুপাত সংরক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার জমাকে অনাপেক্ষিক (absolute) করা হয়। এই নূতন ব্যবস্থার নাম 'ন্যূনতম অনাপেক্ষিক রিজার্ভ প্রথা' (Minimum Absolute Reserve System)। এই ব্যবস্থা করা হয় যে পূর্বের মত আর সকল সময় মোট জমার দুই-পঞ্চমাংশ বা শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রায় না রাখিয়া ন্যূনতম ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ এবং ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্র—এই মোট ৫১৫ কোটি টাকা জমা রাখিলেই চলিবে। উপরন্তু, প্রয়োজন-বোধে স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি লইয়া বৈদেশিক

১৯৫৬ সালে নোট প্রচলন পদ্ধতির প্রথম পরিবর্তন

ক। আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতির বিদায়

* Reserve Bank of India—Functions and Working

মুদ্রা ও ঋণপত্রের মূল্যের পরিমাণ কমাইয়া ৩০০ কোটি টাকা, এবং ফলে মোট জমার পরিমাণ ৪১৫ কোটি টাকাতেও লইয়া আসা যাইবে।

১৯৫৬ সালে নোট প্রচলন সংক্রান্ত ব্যাপারে আর একটি পরিবর্তন হইল রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মজুত স্বর্ণের পুনর্মূল্যনির্ধারণ (revaluation) লইয়া। ১৯৩৫ সালের মূল রিজার্ভ ব্যাংক আইনে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মজুত স্বর্ণের মূল্য প্রতি টাকায় ৮'৪৭৫১২ গ্রেন বা প্রতি তোলা ২১'২৪ টাকা হিসাবে ধরা হইয়াছিল। ১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া প্রতি টাকায় ২'৮৮ গ্রেন বা প্রতি তোলা ৬২'৫০ টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ১৯৫৬ সাল (১লা সেপ্টেম্বর) হইতে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মজুত স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করা হয় প্রতি টাকায় ২'৮৮ গ্রেন বিশুদ্ধ স্বর্ণ বা তোলা প্রতি ৬২'৫০ টাকা দামের হিসাবে। ইহার ফলে রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন বিভাগে মজুত স্বর্ণের মূল্য দাঁড়ায় মোট ১১৫ কোটি টাকার কিছু উপরে। এই ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ ও ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণপত্র—অর্থাৎ, মোট ৫১৫ কোটি টাকা জমা হিসাবে রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাংক বাধাহীনভাবে নোট ছাপাইয়া যাইতে পারিত।

খ। মজুত স্বর্ণের পুনর্মূল্যনির্ধারণ

১৯৫৬ সালে পরিবর্তিত নোট প্রচলন পদ্ধতি কার্যকর করা হয় ঐ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে। তাহার পর হইতেই রিজার্ভ ব্যাংকের বৈদেশিক পাওনা (foreign assets) এরূপ কমিতে থাকে যে ১৯৫৭ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের দ্বিতীয় সংশোধন [Reserve Bank (Second Amendment) Act, 1957] দ্বারা নোট প্রচলন পদ্ধতির আর এক দফা পরিবর্তনসাধন করিতে হয়। এই দ্বিতীয় পরিবর্তনের ফলে যে-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাই বর্তমান নোট প্রচলন পদ্ধতি।

১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় পরিবর্তন ও বর্তমান পদ্ধতি

এই বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে মাত্র অন্যূন ২০০ কোটি টাকার স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণপত্র (foreign securities) জমা রাখিলেই চলে। ইহার বিরুদ্ধে রিজার্ভ ব্যাংক যে-কোন পরিমাণ নোট ছাপাইতে পারে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন বিভাগে ৬২'৫০ টাকা তোলা প্রতি দামের হিসাবে ১১৫ কোটি টাকার মত স্বর্ণ জমা আছে ; স্মৃতরাং মোট ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণপত্র থাকিলেই হইল। উপরন্তু, রিজার্ভ ব্যাংককে বর্তমানে এই ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে যে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি লইয়া কোন বৈদেশিক ঋণপত্র জমা না রাখিয়াও নোট প্রচলন করিতে পারে ; তবে সকল সময় উহাকে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ জমা রাখিতেই হইবে।

এই পরিবর্তিত নোট প্রচলন পদ্ধতির সমালোচনা নানাভাবে করা হইয়াছে। ভারতের সংযুক্ত বণিক ও শিল্পসংঘের (Federation of the Indian Chamber

of Commerce and Industry) মতে, আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতি হইতে বিদায় লইয়া নূতন বিপজ্জনক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে। বৈদেশিক ঋণপত্রজনিত বাধা তুলিয়া দেওয়ায় এবং জমার পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস করায় বিপদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। "অবশ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতির অনুসরণে আইনগত বাধা দূর করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে ভারতীয় মুদ্রার উপর দেশবিদেশে লোকের বিশ্বাস অনেকাংশে শিথিল হইয়া পড়িবে।"

সমালোচনা :

১। ইহাতে ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক মর্যাদা হ্রাস পাইবে

প্রকৃতপক্ষে, নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মুদ্রাসৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক দূর করা। মূল পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়। ইহাকে কার্যকর করিবার জন্যই রিজার্ভ ব্যাংক আইনের নোট প্রচলন সংক্রান্ত ধারাগুলি উপরি-উক্তভাবে পরিবর্তন করা হইয়াছিল। এই প্রসংগে অধ্যাপক সরোজকুমার বসু বলিয়াছিলেন, "পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় নোট প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে নূতন ক্ষমতা দেওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল।

নূতন পদ্ধতির উদ্দেশ্য : রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন

কিন্তু বক্তব্য হইল যে অন্যভাবেও রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করা যাইতে পারিত। এ-বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অধিক পরিমাণে কাগজী মুদ্রা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতিতে এই দেশকেও প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ ইত্যাদিতে জমা রাখিতে হইত। স্বর্ণের পরিমাণ বাড়াইতে না পারিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিহিত সংরক্ষণের অনুপাত (proportion of statutory reserve) ৪০ হইতে কমাইয়া ২৫-এ লইয়া আসে। ফলে কর্তৃপক্ষের নোট প্রচলনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতিও বজায় থাকে। ভারতে কিন্তু মার্কিন দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া সরাসরি আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতি হইতে বিদায় লওয়া হয়।

কিন্তু অন্যভাবেও এই ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করা যাইত

সরকারী পক্ষ হইতে অবশ্য এই সমালোচনার উত্তরে বলা হইয়াছিল যে, বর্তমান যুগে আর নোট প্রচলনের বিরুদ্ধে জমার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। বস্তুত, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইসরায়েল, সিংহল, ফিলিপাইন প্রভৃতি রাষ্ট্র তাহাদের প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার পদ্ধতি তুলিয়াই দিয়াছে। মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য সংরক্ষণকল্পে বর্তমানে অর্থ, কর ও মুদ্রা নীতির উপরেই অধিকতর নির্ভর করা হইতেছে, প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে জমার উপর নহে।**

এই সমালোচনার উত্তর

---

* Prof. S. K. Basu, *Currency and Credit during the Second Five Year Plan.*

** Reserve Bank Bulletin, September, 1957

বলা হইয়াছে, পদ্ধতির দিক দিয়া ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের সঞ্চয় ভারতের মুদ্রাস্ফীতির সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। যুদ্ধের সময় ভারতের বিদেশী সরকার ভারত হইতে ব্রিটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তির পক্ষে বিরাট পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। এই সকল যুদ্ধোপকরণের মূল্য প্রদান করা হইয়াছিল নোট ছাপাইয়া; এবং নোট ছাপানো হইয়াছিল রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে খাতাকলমে ষ্টার্লিং জমা রাখিয়া। ফলে একদিকে যেমন ভারতে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়াছিল, অপরদিকে তেমনি রিজার্ভ ব্যাংকের খাতে দিন দিন ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের কারণ:

১। ষ্টার্লিং ঋণপত্রের বিরুদ্ধে কাগজী মুদ্রার প্রচলন

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের সময় ভারতের ছিল অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ফলে ভারত যে ডলার ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অর্জন করিয়াছিল ব্রিটিশ সরকার তাহার সমগ্রটাই অধিগ্রহণ করিয়াছিল। ইহার পরিবর্তে ভারতকে দেওয়া হইয়াছিল ষ্টার্লিং ঋণপত্র। অর্থাৎ, এই ষ্টার্লিংও রিজার্ভ ব্যাংকের খাতে ইংল্যাণ্ডে জমা রাখা হইয়াছিল, নগদ দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়ত, ষ্টার্লিং জমা রাখিয়া আবার সকল ভারতীয়ের ডলার-সম্পত্তিরও (Dollar Assets) অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল। চতুর্থত, প্রতিরক্ষা ব্যাপারে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি* ছিল। চুক্তিটি এইরূপ: ভারতের প্রকৃত প্রতিরক্ষার জন্য যে-ব্যয় তাহা ভারতকে বহন করিতে হইবে; কিন্তু ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় নহে এইরূপ কোন ব্যয় ভারত প্রাথমিকভাবে নির্বাহ করিলেও তাহা শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনকেই বহন করিতে হইবে। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, ভারত তাহার নিজস্ব প্রতিরক্ষার জন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করিল। পরে এই সৈন্যদলকে ইয়োরোপ বা আফ্রিকার কোন যুদ্ধক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হইল—যে-যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত ভারতের প্রতিরক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। এ-ক্ষেত্রে সৈন্যদলটির জন্য ব্যয় ভারত প্রাথমিকভাবে নির্বাহ করিলেও ইহা শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনই বহন করিত। ব্রিটেন কিন্তু নগদ টাকায় ভারতের এই পাওনা মিটাইয়া দিত না। পাওনা মিটাইত পূর্বোক্ত ঐ একই পদ্ধতিতে—অর্থাৎ, ভারতের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাংকের খাতে ষ্টার্লিং জমা রাখিয়া।

২। ষ্টার্লিং-এর বিরুদ্ধে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার অধিগ্রহণ

৩। ভারতীয়গণের ডলার-সম্পত্তির অধিগ্রহণ

৪। প্রতিরক্ষার ব্যয় সংক্রান্ত চুক্তি

এইভাবে বিভিন্ন সূত্র হইতে ভারতের পক্ষে ষ্টার্লিং জমা হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই জমার পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায় যে ৪৬৪ কোটি টাকার মত দেনা মিটাইয়াও ইহা ১৯৪৫-৪৬ সালে ১৭৩৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

* Share of Defence Expenditure Agreement

যুদ্ধের পর ভারতের এই ষ্টার্লিং পাওনা ব্রিটেন কিভাবে প্রদান করিবে তাহা লইয়া জল্পনাকল্পনা চলিতে থাকে। ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল (Conservative Party) দাবি করে যে ভারতের মোট ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে, কারণ রক্ষণশীল দলের মতে, ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে ব্রিটেন যে-ব্যয় করিয়াছে তাহাই মূলত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে একটা মোটা অংশ বাদ দিতে হইবে। উপরন্তু, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বহু পরিমাণ বর্ধিত মূল্যে ব্রিটেন ভারত হইতে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। এই দিক দিয়াও ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের পরিমাণহ্রাসের যৌক্তিকতা আছে।

ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত প্রদানে রক্ষণশীল দলের বাধার প্রচেষ্টা

ভারত রক্ষণশীল দলের এই দাবির তীব্র প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদে বলা হয় যে, ভারতকে প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার কি পরিমাণ বহন করিতে হইবে তাহা ব্রিটেনের সহিত চুক্তি অনুসারে পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট ছিল। ভারত এই চুক্তি অনুসারেই প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে। সুতরাং এখন আর কোন ব্যয়ভার বহনের প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র ভারত তাহার সংগতিকে ছাড়াইয়া প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে। সুতরাং তাহার উপর নূতন কোন ব্যয়ভার চাপানো শুধু অযৌক্তিক নহে, অন্যায়ও বটে। তৃতীয়ত, ব্রিটেন ভারত হইতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার ফলে ভারতের যে-পরিমাণ পাওনা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। চতুর্থত, পরাধীন ভারতকে জোর করিয়া যুদ্ধে নামানো হইয়াছিল। ফলে তাহাকে ভোগ পরিহার ও অশ্রু বিসর্জন করিতে হইয়াছিল—তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহার অর্থ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এই ভগ্ন অর্থ-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য ব্রিটেনের পক্ষে সমগ্র ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তই বিনা ওজর-আপত্তিতে ভারতকে প্রদান করা উচিত।

ইহার বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন শ্রমিক সরকার ভারতের দাবিকে মানিয়া লয় এবং ঘোষণা করে যে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা পুরাপুরি পরিশোধ করা হইবে।

শেষ পর্যন্ত ভারতের দাবি স্বীকার

কিন্তু ভারতের প্রয়োজন ও ইচ্ছামত পদ্ধতিতে ষ্টার্লিং দেনা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বে এই ক্ষমতার প্রশ্ন বিশেষ উঠে নাই, কারণ ব্রিটিশ সরকারই তখন ভারতের অর্থ সংক্রান্ত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে এই নিয়ন্ত্রণভার ভারতীয়দের হস্তে চলিয়া আসে। ফলে ব্রিটেনের পক্ষে প্রয়োজন হয় ষ্টার্লিং দেনা পরিশোধ ব্যাপারে বা ষ্টার্লিং মুক্তির (Sterling Release) ব্যাপারে ভারতের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার। ইহার পূর্বেই অবশ্য ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী

ব্রিটেনের ষ্টার্লিং দেনা পরিশোধের পদ্ধতির প্রশ্ন

মাসে ব্রিটিশ সরকার তাহার অধীনস্থ ভারত সরকারের সহিত এই বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল।

ষ্টার্লিং পাওনা সংক্রান্ত চুক্তি (Sterling Agreements) : ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের চুক্তির পূর্বে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনার মুক্তি অন্তত তত্ত্বগতভাবে বাধাবিহীন ছিল ; ভারত ইচ্ছা করিলে ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত উঠাইয়া ষ্টার্লিং ও ডলার অঞ্চল হইতে মালপত্র আমদানি করিতে পারিত। তবে ডলার অঞ্চল হইতে মালপত্র আমদানি করিবার জন্য ষ্টার্লিংকে ডলারে রূপান্তরিত করিতে হইলে কতকগুলি নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হইত।* কিন্তু দুইটি কারণে ষ্টার্লিং পাওনার এই বাধাবিহীন মুক্তি ও ডলার পরিবর্তন যোগ্যতাকে বেশীদিন বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই—যথা, (ক) ব্রিটেনে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির অপ্রাচুর্য, (খ) ইংগ-মার্কিন ঋণচুক্তি সম্পাদন। এই চুক্তির একটি সর্ত ছিল যে, ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গৃহীত ঋণের কোন অংশ তাহার ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করিতে পারিবে না। ফলে ব্রিটেনকে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে তদানীন্তন ভারত সরকারের সহিত একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদন করিতে হয়। এই চুক্তি অনুসারে ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের কিছু অংশকে ১নং হিসাবে (Account I), এবং অবশিষ্টাংশকে ২নং হিসাবে (Account II) রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১নং হিসাব হইল চলতি হিসাবে (Current or Operative Account)। ব্যাংকের চলতি হিসাবের মত ইহা হইতে ইচ্ছামত ষ্টার্লিং উঠাইয়া ব্যবহার করা চলিত। উপরন্তু, এই হিসাবে যে-ষ্টার্লিং রাখা হইয়াছিল তাহা ছিল বহুমুদ্রায় পরিবর্তনশীল (multilaterally convertible)। কিন্তু ২নং হিসাবের প্রকৃতি স্থায়ী আমানতের মত। ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে ইহা হইতে কোন ষ্টার্লিং উঠানো যাইত না। এই ২নং হিসাবকে আটক বা জমানো হিসাব (Blocked or Frozen Account) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ক্ষমতা-হস্তান্তরেব ঠিক পূর্বে অনুরূপ আর একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা কিছু ষ্টার্লিং আটক হিসাব হইতে চলতি হিসাবে স্থানান্তরিত করা হয়।

১। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের চুক্তি

২। ক্ষমতা-হস্তান্তরের ঠিক পূর্বে দ্বিতীয় চুক্তি

ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত সম্পর্কে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে স্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৪৮ সালের জুন মাসে। চুক্তির প্রধান সর্তগুলি ছিল এইরূপ : (১) ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের আটক হিসাব হইতে ১৩৩ কোটি টাকার কিছু উপর ভারতে ব্রিটিশ সরকার যে-সকল সামরিক সাজসরঞ্জাম রাখিয়া গিয়াছিল তাহার জন্য বাদ দিতে হইবে।

৩। ১৯৪৮ সালের স্থায়ী চুক্তি

(২) আবার ঐ আটক হিসাব হইতেই ২২৪ কোটি টাকা বাদ দিতে হইবে

* এই নিয়মকানুনগুলি সাম্রাজ্যের ডলার তহবিল (Empire Dollar Pool) কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল। যুদ্ধের ডলার-দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা মিটাইবার জন্য এই তহবিল খোলা হইয়াছিল।

পূর্ববর্তী ভারত সরকারের ব্রিটিশ কর্মচারীদের পেনসন্ বাবদ। পাউণ্ডের হিসাবে এই দুই খাতে মোট বাদ যাইবে ২২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড।

(৩) মোট ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে পাকিস্তান পাইবে ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং এই তিন খাতে মোট বাদ দেওয়ার পরিমাণ হইল ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড।

(৪) আটক হিসাব হইতে চলতি হিসাবে ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে মোট ১৬ কোটি পাউণ্ড স্থানান্তরিত করা হইবে।

৪। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসের চুক্তি

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে এই চুক্তির সময় অতিক্রান্ত হইলে আবার নূতন করিয়া চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হয়। এই নূতন চুক্তির সর্তগুলি হইল :

(১) ৩১ কোটি পাউণ্ড ২নং বা আটক হিসাব হইতে ১নং বা চলতি হিসাবে স্থানান্তরিত করা হইবে। এই টাকা অবশ্য রিজার্ভ ব্যাংকে তাহার মুদ্রার বিরুদ্ধে জমা (Currency Reserve) হিসাবে ধরিয়া রাখিবে এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে ব্যয় করিবে না। আবার ব্যয়ও করিতে হইবে ব্রিটিশ সরকারের পূর্বানুমতি লইয়া।

(২) ব্যয়ের জন্য প্রতি বৎসর ৩.৫ কোটি পাউণ্ড করিয়া ২নং হিসাব হইতে ১নং হিসাবে স্থানান্তরিত করা হইবে। এইরূপ মুক্ত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের শেষ অংশ যদি কোন বৎসর ব্যয় করা না হয় তবে উঁহাকে পরবর্তী যে-কোন বৎসর ব্যয়ের জন্য উঠানো যাইবে। অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার ব্রিটেনের সম্মতি ব্যতিরেকেই উক্ত বাৎসরিক মুক্তির (৩.৫ কোটি পাউণ্ড) উপর ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত—১নং হিসাবে স্থানান্তরিকরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কিন্তু প্রয়োজন ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের অতিরিক্ত হইলে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা দ্বারা ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হইবে।

(৩) এই চুক্তি ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত প্রবর্তিত থাকিবে। ঐ তারিখে যে-ষ্টার্লিং আটক হিসাবে থাকিবে তাহা আপনা হইতেই ১নং হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে। সুতরাং সমস্ত ষ্টার্লিং পাওনা বর্তমানে চলতি হিসাবে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

এখন আদায়ীকৃত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত কিভাবে ব্যয়িত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। হিসাবে দেখা যায়, যুদ্ধকালীন সময়ে ১৭০০ কোটি টাকার উপর

আদায়ীকৃত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত কিভাবে ব্যয়িত হইয়াছে

ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইলেও স্বাধীন ভারতের হাতে আসিয়াছিল ১০১০ কোটি টাকার মত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে ইহা কমিয়া ৮৮৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সুতরাং অন্তর্বর্তী সময়ে (১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৫০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত) ভারত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে ১১৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল; এবং ব্যয় করা হইয়াছিল প্রধানত খাদ্য আমদানি করিবার জন্য।

কিন্তু খাদ্য আমদানিতে আদায়ীকৃত ষ্টার্লিং পাওনা ব্যয় অপরিহার্য হইলেও কাম্য বিবেচিত হয় নাই। সংগঠনমূলক কার্যেই ভারত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তকে নিয়োজিত করিবার আশা করিয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনার শেষে ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিয়া ৭১৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সুতরাং ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে ১৭০ কোটি টাকার (৮৮৪ কোটি টাকা — ৭১৪ কোটি টাকা) মত ব্যয় করা হইয়াছিল। মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ৭১৪ কোটি টাকা হইতে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়।* কিন্তু অকল্পিত লেনদেনের ঘাটতি ও তজ্জনিত বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের জন্য ঐ পরিকল্পনায় ব্যয় করিতে হয় ৫৭৯ কোটি টাকা। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাতে (এপ্রিল, ১৯৬১ সাল) ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিয়া গিয়া দাঁড়ায় মাত্র ১৩৫ কোটি টাকায়। সম্প্রতি (ডিসেম্বর, ১৯৬২ সাল) ইহার পরিমাণ আরও হ্রাস পাইয়া মাত্র ৯৭ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। নোটের বিরুদ্ধে জমা ও অন্যান্য কারণে এই পরিমাণ ষ্টার্লিং ন্যূনতম বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তির সম্ভাবনার হিসাব ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তকে বাদ দিয়াই করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুমিত ও প্রকৃত ব্যয়

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ভারতীয় বিনিময়-ব্যবস্থা

(I. M. F. and the Indian Exchange System): আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সহিত ভারতীয় বিনিময়-ব্যবস্থার সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে।** এখন এই সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ ইহার সহিত যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের বিনিময়-ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন—মুদ্রামানহ্রাস (devaluation) ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে। অর্থভাণ্ডারের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হইল: (ক) অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ সুগম করা; (খ) বিনিময়-ব্যবস্থার দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া মুদ্রার অপচয় (currency depreciation) পরিহার করা; (গ) আন্তর্জাতিক বিনিময়-ব্যবস্থার বহুমুদ্রায় পরিবর্তনশীলতা (multilateral system of payments) আনয়ন করা; (ঘ) বহুমুদ্রায় পরিবর্তনশীল বিনিময়-ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া; এবং (ঙ) সদস্য-রাষ্ট্রসমূহকে স্বল্পস্থায়ী প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অসুবিধা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঋণপ্রদান করা। ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অন্যতম বৃহৎ অংশীদার।

অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদভুক্ত হইবার সংগে সংগে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তাহার স্বর্ণমূল্য অথবা মার্কিন ডলারের হিসাবে মুদ্রামূল্য ঘোষণা করিতে হয়। একবার মুদ্রামূল্য ঘোষণা করিলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে ঐ মূল্য বা সমতা (parity) বজায় রাখিতে হয়। তবে

সদস্য-রাষ্ট্রের দায়িত্ব: মুদ্রামূল্য ঘোষণা

---

* Second Five Year Plan ৮২ এবং ৮৫ পৃষ্ঠা

** ৭৫ পৃষ্ঠা।

প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র তাহার ঘোষিত মুদ্রামূল্যের শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অনুমতি ব্যতিরেকেই করিতে পারে। ইহার অধিক পরিবর্তন করিতে হইলে অর্থভাণ্ডারের সম্মতির প্রয়োজন হয়। শতকরা ১০ ভাগের অধিক পরিবর্তন একমাত্র মৌলিক অসমতা (Fundamental Disequilibrium) দূরিকরণের জন্যই করা চলে।

আমদানি-রপ্তানির প্রতিকূল উদ্বৃত্তের জন্য কোন সদস্য-রাষ্ট্রের পক্ষে কোন বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ভাণ্ডার হইতে তাহার নিজস্ব মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অবধি ঐ প্রয়োজনীয় মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে যে-সকল মুদ্রার চাহিদা এত অধিক যে ভাণ্ডারের পক্ষে সমগ্র চাহিদা মিটানো সম্ভব নহে, সে-সকল মুদ্রাকে ভাণ্ডার 'দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা' (Scarce Currencies) বলিয়া ঘোষণা করে ; এবং ইহাদের ক্ষেত্রে বরাদ্দ-ব্যবস্থা (system of rationing) প্রবর্তিত করে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভাণ্ডার হইতে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা চাহিদামত পাওয়া যায় না—বরাদ্দমতই পাওয়া যায়।

সদস্য-রাষ্ট্রের অধিকার

চলতি লেনদেন ব্যাপারে ধীরে ধীরে সকল প্রতিবন্ধকের অপসারণ করা অর্থভাণ্ডারের আর একটি দায়িত্ব।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্যে ঋণদান করিয়া সহায়তা করিবার জন্য যে-ব্যাংক আছে (International Bank for Reconstruction and Development) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে যোগদান না করিয়া তাহার সদস্য হওয়া যায় না। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদ হইল বিশ্বব্যাংকের সদস্যপদের অন্যতম অপরিহার্য সর্ত।

অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদ বিশ্বব্যাংকের সদস্য-পদের অন্যতম সর্ত

তত্ত্বগতভাবে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। স্বর্ণমান ব্যতিরেকেও যে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের বাজারে স্থায়িত্ব আনয়ন করা যায়, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে। অপরদিকে কিন্তু স্বর্ণমানের ন্যায় ইহার অধীনে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের জন্য নির্দিষ্ট বিনিময় হার (fixed exchange rate), মুদ্রাসংকোচ (deflation) প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয় না। ভাণ্ডার-ব্যবস্থার (Fund System) অধীনে সাধারণত স্থায়ী বিনিময়ের হার বজায় রাখিতে হইলেও প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই হারের পরিবর্তনসাধন করা চলে। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত যদি অস্থায়ীভাবে প্রতিকূল হয় তবে অর্থভাণ্ডারের কোন সদস্য-রাষ্ট্রের পক্ষে মুদ্রাসংকোচের ব্যবস্থা করিতে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তাহার বিনিময়-ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে।

ইহা স্বর্ণমান ব্যতি-রেকেও আন্তর্জাতিক বিনিময়-ব্যবস্থা প্রশস্ত করার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের তত্ত্বগত উপযোগিতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। ইহার অন্যতম কারণ হইল সোবিয়েত ইউনিয়ন ইহাতে যোগদান করে নাই। ফলে ইহার কার্যক্ষেত্র হইয়াছে কতকাংশে সংকীর্ণ। দ্বিতীয়ত, অর্থভাণ্ডার যখন স্থাপিত হয় তখন সমগ্র বিশ্বই ছিল ডলার অ-পর্যাপ্তির সম্মুখীন। সুতরাং প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রপীড়িত দেশসমূহের ডলারের চাহিদা মিটানো অর্থভাণ্ডারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তৃতীয়ত, যুদ্ধোত্তর যুগের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র এখনও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপসারণ করিতে পারে নাই। ফলে অর্থভাণ্ডারের অন্যতম উদ্দেশ্যও সাধিত হয় নাই। তবুও বলা যায়, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হারের স্থায়িত্ব আনয়ন করিয়া বিশ্বের বৃহত্তর অংশে আর্থিক সহযোগিতা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র বহুলাংশে প্রসার করিয়াছে।

কার্যক্ষেত্রে অর্থভাণ্ডার পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে নাই

ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে সরাসরি কি প্রকার সহায়তা লাভ করিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারত কয়েকবার ভাণ্ডার হইতে ডলার সংগ্রহ করিয়া তাহার বুভুক্ষু জনসাধারণকে খাদ্য যোগাইয়াছে। শুধু যে খাদ্য আমদানির জন্যই ডলারের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা নহে, উৎপাদনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও শিল্পগত কাঁচামাল আমদানির জন্যও ঐ মুদ্রার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এককথায় বলা যায়, প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রপীড়িত ভারত বারবার অর্থভাণ্ডার হইতে ডলার সংগ্রহ দ্বারা অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করিয়া তাহার অর্থ-ব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে ভারতের পক্ষে অর্থভাণ্ডারের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। উহার পর মুদ্রামানহ্রাস ও তৎপরবর্তী কোরিয়া-যুদ্ধের ফলে তাহার প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত কমিতে কমিতে অনুকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তে পরিণত হয়। ফলে অর্থভাণ্ডারের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও আর থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই আবার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়।

ভারত ভাণ্ডার হইতে কি প্রকার সহায়তা লাভ করিয়াছে :

১। ভারত তাহার অর্থ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে

সাময়িক ঋণদান ছাড়াও অর্থভাণ্ডার অন্যান্য সদস্যের মত ভারতকে ডলার ক্রয়ের সুবিধা দান করে। অর্থভাণ্ডারের সংবিধান অনুসারে ভারত ৭০ কোটি ডলার-মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ভারতীয় টাকার বিনিময়ে ক্রয় করিতে পারে। এ-সুযোগও ভারত প্রয়োজনমত ব্যবহার করিয়াছে।

২। ডলার ক্রয়ের সুবিধা

তৃতীয়ত, বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদ হইল বিশ্ব-ব্যাংকের (World Bank) সদস্যপদভুক্তির অন্যতম সর্ত। বিশ্বব্যাংকের সদস্য

হিসাবে ভারত তাহার গঠনমূলক কার্যে বহু পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, কয়না পরিকল্পনা, টাটা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা, ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, রেলপথ, ভারতীয় ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন (ICIC) প্রভৃতিতে এবং ট্রাক্টর ক্রয় প্রভৃতির জন্য ঋণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৩। উন্নয়নকার্যে বিশ্বব্যাংক হইতে ঋণ করিয়াছে

৪। ভারতের ঋণ ও অর্থ ব্যবস্থার পর্যালোচনা

পরিশেষে, ভারত সরকারের অনুরোধক্রমে অর্থভাণ্ডার ভারতের ঋণ ও অর্থ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিয়া কয়েকটি মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে।

মুদ্রামানহ্রাস (Devaluation): ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৯ তারিখে মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য শতকরা ৩০.৫ ভাগ হ্রাস করা হয়। শুধু যে ভারতীয় মুদ্রার মান হ্রাস পাইয়াছিল তাহা নহে, পাকিস্তান ব্যতীত ষ্টার্লিং অঞ্চলের সকল মুদ্রার মানই ঐ পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছিল।

সংক্ষেপে, ১৯৪৯ সালের মুদ্রামানহ্রাসের কারণ ছিল ডলার-সংকট (Dollar Crisis)—সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চলের ডলার-সংকট। এই সংকটে আবার বিশেষভাবে পতিত হইয়াছিল গ্রেট ব্রিটেন। যুদ্ধোত্তর যুগে ব্রিটিশ অর্থ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে অসংগঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। ডলার অঞ্চলে তাহার রপ্তানি অভূতপূর্বভাবে কমিয়া গিয়াছিল এবং খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানি অকল্পনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে যে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল ব্রিটেন তাহা বারবার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দ্বারস্থ হইয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণসংগ্রহ করিয়া মিটাইয়াছিল। ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশও অনুরূপ সংকটে পতিত হইয়া অল্পবিস্তর ব্রিটেনেরই পদাংক অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু এভাবে যে বেশীদিন চলিতে পারে না, ষ্টার্লিং অঞ্চলের বিনিময়-ব্যবস্থায় এই যে অসমতা (disequilibrium) ইহা যে স্বল্পস্থায়ী নহে, ইহা অনুধাবন করিয়াই ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ্‌ অর্থসচিবদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে ডলার অঞ্চল হইতে আমদানির পরিমাণকে শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ক্যানাডার প্রতিনিধিবর্গের আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার আমদানি-শুল্ক কমাইয়া ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে আরও মাল আমদানি করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই অনুরোধ পরীক্ষিত হইবার পূর্বেই ওয়াশিংটন হইতে তৎকালীন ব্রিটিশ অর্থসচিব স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্‌ (Sir Stafford Cripps) ঘোষণা করেন যে, মার্কিন ডলারের তুলনায় পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর মূল্য শতকরা ৩০.৫ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। সংগে সংগে ষ্টার্লিং অঞ্চলের প্রায় সকল দেশই ব্রিটেনকে অনুসরণ করে। ক্যানাডার

মুদ্রামানহ্রাসের প্রধান কারণ: ডলার-সংকট

কোন ডলার-সংকট না থাকিলেও ক্যানাডা মার্কিন ডলারের তুলনায় তাহার মুদ্রামান শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করে। পাকিস্তান কিন্তু ঘোষণা করে যে, সে তাহার মুদ্রামান হ্রাস করিবে না।*

ডলার-সংকট হইতে ষ্টার্লিং অঞ্চলের প্রায় সকল দেশেরই মুদ্রামানহ্রাসের কারণকে অধ্যাপক প্যাটারসন্ তাঁহার 'বিশ্ব অর্থবিদ্যা' গ্রন্থে** এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:

ষ্টার্লিং ও ডলারের মধ্যে মৌলিক অসমতাই মুদ্রামানহ্রাসের কারণ

ডলার ও ষ্টার্লিং হইল বিশ্বের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রা। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই রহিয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ষ্টার্লিং কোনমতেই ডলারের সহিত ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারিতেছিল না। উভয় মুদ্রার মধ্যে যে-অসমতা তাহা মৌলিক বা স্থায়ী বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। সুতরাং স্থায়ী ভারসাম্য আনয়নকল্পে একটিমাত্র অবলম্বনীয় পন্থা ছিল ; ইহা হইল ডলারের তুলনায় ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাস করা ; এবং এই পন্থাই অনুসরণ করা হইয়াছিল।

ষ্টার্লিং-এর অনুসরণে সমপরিমাণে ভারতীয় মুদ্রামানহ্রাসের কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ডলার অঞ্চলের সহিত ভারতেরও বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ক্রমাগতই প্রতিকূল হইতেছিল। প্রথম প্রথম ভারত এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা আদায় করিয়া মিটাইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের অধিকাংশই আটক হিসাবে (Blocked Account) জমা থাকায় ভারতের পক্ষে ডলার-ঘাটতি মিটাইবার জন্য বারবার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। সুতরাং বুঝা গিয়াছিল, ডলারের সহিত ভারতীয় মুদ্রার যে-অসমতা (disequilibrium) তাহা হইল স্থায়ী বা মৌলিক (fundamental)। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারও এ-সম্বন্ধে ইংগিত দিয়াছিল। ফলে একরূপ ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতেই ভারতের মুদ্রামানহ্রাসের কথা চলিতেছিল।

ভারতের মুদ্রামানহ্রাসের কারণ :

কিন্তু ভারত সরকার তখন প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও ডলার-ঘাটতি মিটাইবার জন্য মুদ্রামানহ্রাসের প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রকৃতি। ঐ সময় ভারত প্রধানত পাটজাত দ্রব্য, কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ রপ্তানি এবং খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করিত। মুদ্রামানহ্রাসের দ্বারা রপ্তানির পরিমাণবৃদ্ধি এবং আমদানির পরিমাণহ্রাসের বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ডলার-ঘাটতি মিটানোর জন্য বেসরকারী মহল হইতে মুদ্রামানহ্রাসের প্রস্তাব করা হইলেও সরকার ইহাতে সম্মত হইতে পারে নাই। কিন্তু ব্রিটেন ও ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশ যখন

বাধ্য হইয়াই ভারতের পক্ষে ব্রিটেনকে অনুসরণ করিতে হইয়াছিল

* পাকিস্তান ১৯৫৫ সালের ৩১শে জুলাই শতকরা ৩০.৫ ভাগ তাহার মুদ্রামানহ্রাস ঘোষণা করে।

** Patterson, *World Economics*

তাহাদের মুদ্রামানহ্রাস করিল ভারতের পক্ষে তখন আর তাহাদের অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সরকারী বিবৃতিতে ভারতীয় মুদ্রামানহ্রাসের কারণকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ঃ ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের মুদ্রামানহ্রাস ভারতের পক্ষে ঐ পথ অবলম্বন করা একরূপ অপরিহার্য করিয়া তুলে। ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশ ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত হওয়ায় এবং ভারতের মূল্যস্তর (price level) অতি উচ্চে থাকায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, ভারতীয় মুদ্রার মানহ্রাস ব্যতিরেকে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যকে ব্যাহত করা হইবে; এবং ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত অপরিহার্যভাবে আমদানিহ্রাসের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। উপরন্তু, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশ তাহাদের মুদ্রামানহ্রাস করার ফলে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, ভারতও তাহার মুদ্রামান ঐ পরিমাণই হ্রাস করিবে।

এই সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি

এই কারণে পুরাতন বিনিময় হারে ক্রয়বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিশেষ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা (as a defensive measure) হিসাবে ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সহিত ভারতীয় মুদ্রারও মানহ্রাস ছাড়া ভারতের পক্ষে গত্যন্তর ছিল না।

প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা

মুদ্রামানহ্রাসের পরিমাণ (শতকরা ৩০.৫ ভাগ) সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে, ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য ইহার কম পরিমাণ হ্রাস করিলে রপ্তানি বাজারের প্রয়োজনীয়তা মিটানো যাইত না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সরকারী মতে ভারতীয় মুদ্রার মান শতকরা ৩০.৫ ভাগের কম হ্রাস করিলে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য ব্যাহত হইতই।

মুদ্রামানহ্রাসের পরিমাণ সম্বন্ধে বিতর্ক

মুদ্রামানহ্রাসের ফলাফল (Effects of Devaluation)ঃ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বহির্বাণিজ্যের দিক দিয়া মুদ্রামানহ্রাসের ফলাফল সম্বন্ধে একরূপ বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।* এখন মুদ্রা-ব্যবস্থার দিক দিয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের উপর মুদ্রামানহ্রাসের প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে অভিমত প্রদান করা কঠিন। মুদ্রামানহ্রাসের ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের সহসা বৃদ্ধি আশংকা করিয়া সরকার অষ্টপর্যায়ী কার্যক্রম (Eight-point programme) দ্বারা মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়।** ইহার ফলে মূল্যস্তর কিছুদিনের জন্য নিম্নগ হইলেও, ১৯৫০ সালের সুরু হইতেই আবার ঊর্ধ্বগামী হইতে সুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যে-সকল

ক। আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের উপর প্রভাব

* ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

** দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

দেশ তাহাদের মুদ্রামানহ্রাস করে নাই সেই সকল দেশ হইতে পণ্য আমদানির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য-সংকটের ফলে পাট ও তুলার আমদানি কমিয়া যাওয়ায় এই দুই প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে আবার অধিক পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানি হইবার ফলে তুলাজাত বস্ত্রের মূল্যও ক্রমশ বাড়িতে থাকে। ইহার উপর আসামে ভূমিকম্প, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতিতে বন্যা সরকারের পক্ষে মূল্যস্তরকে নিয়ন্ত্রিত রাখা একরূপ অসম্ভব করিয়া তুলে। অবশ্য মূল্যবৃদ্ধির জন্য কোন্ উপাদান কতখানি দায়ী ছিল তাহা পৃথকভাবে নিরূপণ করা যায় না, কারণ উহাদের ফলাফল পরস্পরের সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল।

খ। অন্যান্য প্রভাব

মুদ্রামানহ্রাসের অন্যান্য ফলাফল হইল ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত ও আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার দিক দিয়া। মুদ্রামানহ্রাসের ফলে ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের ডলার-মূল্য (Dollar Value) শতকরা ৩০.৫ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের সমগ্রটাই অনতিবিলম্বে ডলারে পরিবর্তনশীল না হওয়ায় কার্যক্ষেত্রে ভারতকে ঐ পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। পাকিস্তানের কাছে ভারতের ৩০০ কোটি টাকার মত পাওনা ছিল। মুদ্রামানহ্রাসের ফলে তাহা হইতে সরাসরি ৩০.৫ ভাগ বাদ দেওয়া হয়। অপরদিকে কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংকে ভারতের পক্ষে দেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়।

ভারতীয় মুদ্রার পুনর্মাননির্ধারণের প্রশ্ন (Question of Revaluation of the Indian Rupee): দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রার মানবৃদ্ধির দাবি করা হইতেছিল। ১৯৪৯ সালে মুদ্রামানহ্রাসের পর কোরিয়ার যুদ্ধজনিত কারণে যে আন্তর্জাতিক মালমজুতের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে ভারতের রপ্তানি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় লেনদেন-উদ্বৃত্ত ভারতের অনুকূলে থাকে; এই অনুকূল গতির জন্যই ভারতীয় মুদ্রার মানবৃদ্ধির দাবি উত্থিত হয়। দাবির সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

পূর্বে দাবি ছিল মুদ্রার মানবৃদ্ধির

(ক) ইহাতে খাদ্য ও যন্ত্রপাতির ন্যায় প্রয়োজনীয় আমদানি দ্রব্যের ব্যয় হ্রাস পাইবে; (খ) ইহাতে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর নিম্নাভিমুখী হইবে; (গ) ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের অধিকাংশের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হওয়ায় পুনর্মাননির্ধারণ সত্ত্বেও রপ্তানির পরিমাণ প্রায় একই থাকিবে। ফলে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষ করিয়া ডলার আহরণ করা সম্ভব হইবে। এই বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা বুভুক্ষু জনসাধারণের জন্য খাদ্য, শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হইয়াছিল যে ভারতের অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য; আন্তর্জাতিক মালমজুতের হিড়িক কাটিয়া গেলেই ইহা বিপরীতমুখী হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ঘটিয়াছিল।

যাহা হউক, মুদ্রামানের পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত সকল জল্পনাকল্পনার অবসান করিয়া ১৯৫১ সালে সরকার ঘোষণা করে যে, সকল দিক বিবেচনা করিয়া ভারতীয় মুদ্রামানকে পুনর্নির্ধারিত না করিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইহার পরও অবশ্য কোন কোন মহল হইতে মুদ্রামান পুনর্নির্ধারণের দাবি করা হইতে থাকে। তবে ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান তাহার মুদ্রার মানহ্রাস করিলে এ-দাবি বিশেষ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগ হইতে মূল্যস্তর ঊর্ধ্বগতি হইতে থাকিলে এবং ক্রমে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দিলে এই দাবি বিপরীতমুখী হয়। অর্থাৎ, নির্দেশ দেওয়া হইতে থাকে যে ভারতীয় মুদ্রার পুনরায় মান-হ্রাসের (further devaluation) দ্বারা প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের গতি বন্ধ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত সংকট হইতে পরিত্রাণ লাভের প্রচেষ্টা করা হউক।

বর্তমান দাবি হইতেছে মুদ্রার পুনর্মানহ্রাসের

সরকার অবশ্য এই দাবি বা নির্দেশের কোন মূল্য দেয় নাই; আজও দিতেছে না। বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের প্রতিবিধানকল্পে পুনর্মানহ্রাসের কোনই সম্ভাবনা নাই বলিয়া অর্থমন্ত্রী ১৯৫৮ সালের আগষ্ট ও ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, মুদ্রার পুনরায় মান-হ্রাসের ফলে খাদ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল আমদানির ব্যয় এত বৃদ্ধি পাইবে যে তাহা বহন করা ভারতের পক্ষে সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়ত, মুদ্রার মান আরও হ্রাস করিলে রপ্তানি কতটা বৃদ্ধি পাইবে সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ কম দামে মাল যোগানো সম্ভব হইবে না। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই মূল্যস্তর আশংকাজনকভাবে বাড়িতে সুরু করিয়াছে। ইহার উপর মুদ্রার মান আরও হ্রাস করিলে মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণের বাহিরে গিয়া সমগ্র পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দিতে পারে। চতুর্থত, পরিকল্পনার কার্যে সরকার যে বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করিতেছে মুদ্রামান পুনর্হ্রাসের ফলে তাহাদেরও ভার বৃদ্ধি পাইবে। ভবিষ্যতে হয়ত এ-ভার বহন করাই সম্ভব হইবে না।

পুনর্মানহ্রাসে সরকারের বিরোধিতা

অতএব, লেনদেন-ঘাটতি মিটানোর পন্থা হইল রপ্তানি-প্রসার ও আমদানি-নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার পুনর্মানহ্রাস নহে।

বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ। (Foreign Exchange Crisis and Exchange Control): বৈদেশিক মুদ্রাসংকট

(foreign exchange crisis) দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের ঘটনা হইলেও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের কার্য চলিতেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু হইতেই। যুদ্ধের সময় ডলার, ইয়েন (Yen) এবং মহাদেশীয় অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার ক্রমাগত অপচয় (depreciation) ঘটিতে থাকে। ফলে ব্রিটেনের অনুসরণে ভারতকেও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। প্রতিরক্ষা নিয়মাবলীর (Defence of India Rules) অধীনে রিজার্ভ ব্যাংককে দেশ হইতে মূলধনের স্থানান্তরিতকরণ রহিত ও যুদ্ধকার্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের বিপুল ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

যুদ্ধের সময় বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ

এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাধীনে বৈদেশিক মুদ্রার সকল প্রকার ক্রয়বিক্রয় রিজার্ভ ব্যাংক বা ইহার অনুমোদিত ব্যবসায়িগণের মাধ্যমে করিতে হইত। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দিক দিয়া সমগ্র কমনওয়েলথ্‌কে একটিমাত্র মুদ্রা সংস্থা (a single currency unit) হিসাবে গণ্য করিয়া ইহাকে ষ্টার্লিং অঞ্চল (the Sterling Area) বলিয়া অভিহিত করা হইত। ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলির মুদ্রা-বিনিময়ে কোন বাধা ছিল না বলা চলে। কিন্তু ইহার বাহিরে কোন দেশের সহিত বিনিময় কঠিন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাধীন ছিল।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার রূপ

ষ্টার্লিং অঞ্চলস্থ দেশগুলির ডলার এবং অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় সাম্রাজ্যের ডলার তহবিল (Empire Dollar Pool) নামে অভিহিত একটি তহ্‌বিলে আবশ্যকীয়ভাবে জমা দিতে হইত। কয়েকটি নির্ধারিত বিষয় ছাড়া এই ডলার তহবিলে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করা যাইত না।* তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রিটেনই ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহার্থে ব্যয় করিত।

যুদ্ধের পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত অবস্থাতেও মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে বজায় রাখা হয়; এবং বর্তমানে ইহা আমাদের বিনিময়-ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই আবার এই গুরুত্ব সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে চলতি হিসাবের খাতে মোট লেনদেন-ঘাটতি হয় ১৯২০ কোটি টাকা। এই ঘাটতি মিটানোর জন্য ভারতকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে, বৈদেশিক সাহায্য 'ভিক্ষা' করিতে হইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় (Foreign Exchange Reserves) হইতে প্রায় ৫৯৫ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া মোট ৩১৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।** তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট

* ৮৪ পৃষ্ঠার পদটীকা দেখ।

** Reserve Bank Bulletin, April 1961

লেনদেন ঘাটতি হইবে ২৬০০ কোটি টাকা। এই ঘাটতি বৈদেশিক সাহায্য হইতে মিটাইতে হইবে। এই কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে আরও কঠোরতর করা হইয়াছে। এ-সম্পর্কে পরিকল্পনার প্রসংগে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Analyse the main features of the present Currency System of India. What changes have been recently introduced in the law relating to the paper currency reserve ? (C. U. B. A. 1958)

[ইংগিত: প্রশ্নটি দুই অংশে বিভক্ত—(ক) বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থা, এবং (খ) নোট প্রচলন-পদ্ধতির সাম্প্রতিক পরিবর্তন।

প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ভারতের বর্তমান মুদ্রামান (আন্তর্জাতিক মান) এবং কাগজী ও ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থার বর্ণনা করিতে হইবে:

দ্বিতীয় অংশের উত্তরের জন্য ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে নোট প্রচলন-পদ্ধতির যে যে পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে।......৭৫-৭৮ পৃষ্ঠা]

2. Describe the present monetary standard of India (C. U. B. A. 1963) (৭৫ এবং ৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা)

3. Critically discuss the changed system of Note-issue. (৭৬-৮০ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the objectives of the I. M. F. and indicate how far its membership has been beneficial or otherwise to India. (C. U. B. A. 1955) (৮৬-৮৯ পৃষ্ঠা)

5. Explain the circumstances that led to the Devaluation of the Indian Rupee in September, 1949. What have been the effects of Devaluation ? (C. U. B. A. 1952, '62)

[ইংগিত: ভারতের মুদ্রামানহ্রাসের মূল কারণ হইল সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চলের (Sterling Area) ডলার-সংকট এবং ভারতের নিয়মিত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। অবশ্য প্রাথমিকভাবে ভারতকে মুদ্রামানহ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় ব্রিটেন ও ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের অনুরূপ সিদ্ধান্তের জন্য।......৮৯-৯২ পৃষ্ঠা]

6. Write notes on ?

(a) Sterling Balances, (C. U. B. Com. 1963) (b) Exchange Control (৮১-৮৪ এবং ৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার

(Indian Banking and Money Market)

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্যের ন্যায়ই প্রাচীন। মনুসংহিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় যুগের বহু পূর্ব হইতেই ভারতে ব্যাংক-ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছিল। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে ব্যাংক-ব্যবসায়ী বা শ্রেষ্ঠীদের কথা উল্লেখ আছে। এই সকল শ্রেষ্ঠী আমানত গ্রহণ করিত, ঋণ ও হুণ্ডি প্রদান করিত, এবং সাধারণ বীমাকার্য সম্পাদন করিত।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

মুসলমান আক্রমণ ও অধিকারের ফলে ভারতের ব্যাংক-ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কয়েকটি পারিবারিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান রক্ষা পাইয়া যায়। এই সকল প্রতিষ্ঠান ক্রমে রাজদরবারের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। মুসলমান রাজত্বের শেষের দিকে বাংলার ইতিহাসে জগৎশেঠের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও প্রথমদিকে হিন্দু ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর ইংরাজ বণিকরাও ক্রমে ব্যাংক-ব্যবসায় সুরু করে। এই ব্যাংক-ব্যবসায় এজেন্সী হাউস (Agency Houses) নামে অভিহিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হইত। ইহার পর বিদেশী বণিকদের দ্বারা যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে নূতন নূতন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ইহার ফলে কিন্তু দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অপসারিত হয় না। তাহারা গতানুগতিক পদ্ধতিতেই তাহাদের ব্যাংক-ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে থাকে। পরে ইয়োরোপীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণের অনুসরণে ভারতীয়গণও যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে ব্যাংক-ব্যবসায় সুরু করে।

ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় টাকার বাজার অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে

উপরি-উক্ত ঐতিহাসিক কারণে ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে ইহা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত। নানা প্রকারের মালিকানাধীনে এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া থাকে।

ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও আংগিক উপাদান

(Characteristics and Constituent Elements of the Indian Money Market) : ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ইহার দোষত্রুটির সন্ধান পাওয়া যাইবে। বর্তমানে কিন্তু এই সকল দোষত্রুটি পর্যালোচনা না করিয়া মাত্র প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিরই উল্লেখ করা হইল।

১। সংগঠিত ও অসংগঠিত বাজার

ভারতের টাকার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত—সংগঠিত ও অসংগঠিত অংশ। বাজারের সংগঠিত অংশ আধুনিক ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত দেশীবিদেশী সকল প্রতিষ্ঠানকে লইয়া গঠিত। ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত বলিয়া ইহাকে 'ভারতে ইয়োরোপীয় টাকার বাজার'ও (European Money Market in India) বলা হয়। অপরদিকে সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে লইয়া গঠিত যে টাকার বাজার তাহাই অসংগঠিত বাজার বা 'ভারতীয় বাজার' নামে অভিহিত।

দ্বিতীয়ত, ভারতের টাকার বাজার লণ্ডন বা নিউইয়র্কের ন্যায় একস্থানে কেন্দ্রীভূত নহে, ইহা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে। ভারতে কলিকাতা ও

বোম্বাই হইল টাকাকড়ির লেনদেনের দুইটি বৃহৎ কেন্দ্র। এই কেন্দ্র দুইটিকে টাকাকড়ির জাতীয় বাজার (National Money Market) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই জাতীয় বাজার দুইটি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক বাজারের (Local Money Markets) সহিত সংযুক্ত।

২। ভারতীয় টাকার বাজার একস্থানে কেন্দ্রীভূত নহে

ভারতীয় টাকার বাজারের সংগঠন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহা নিম্নলিখিত আংগিক উপাদান লইয়া গঠিত :

(ক) দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী (Indigenous Bankers): মহাজন, সাউকর, স্রফ, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি নামে অভিহিত ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ এই পর্যায়ভুক্ত। ইহারা ইংরাজদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল। পরিমাণের দিক দিয়া ইহারা এখনও ভারতের টাকার বাজারের শতকরা ৫০ ভাগ অধিকার করিয়া আছে বলিয়া অনুমান করা হয়।* পদ্ধতির দিক দিয়া ইহারা টাকাকড়ির ভারতীয় বা অসংগঠিত বাজারের (Indian or Unorganised Sector of the Money Market) সংগঠক।

টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের লইয়া গঠিত

(খ) টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বা সংগঠিত বাজার ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, রিজার্ভ ব্যাংক—এবং সমবায় ব্যাংক, জমিবন্ধকী ব্যাংক, শিল্প-ব্যাংক, পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাংক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত।

ইয়োরোপীয় বাজার বিভিন্ন ধরনের সংস্থার সমবায়ে গঠিত

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের বিশদ আলোচনা

(Detailed Study of the Different Kinds of Banking Institutions) : ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন-প্রকৃতি বিশ্লেষণের পর ইহার দোষত্রুটি ও সমস্যার পর্যালোচনা করিতে হয়। কিন্তু ইহা করিবার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক। দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী (Indigenous Bankers) : দেখা গিয়াছে, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে লইয়া গঠিত ভারতের টাকাকড়ির বাজারের অসংগঠিত অংশ মোট ঋণ ও ব্যাংক ব্যবস্থায় এখনও শতকরা ৫০ ভাগ স্থানাধিকার করিয়া আছে।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের প্রধান কার্য হইল ঋণপ্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মূলধন সরবরাহ করা। অনেক ক্ষেত্রেই এই ঋণ

* Dr. B. K. Madan, Role of Monetary Policy in a Developing Economy

সরাসরি ব্যক্তিগত জামিনে প্রদান করা হয়; এবং প্রদান-পদ্ধতি যৌথ পুঁজি ব্যাংকের পদ্ধতি হইতে অনেক সরল এবং সংক্ষিপ্ত। দ্বিতীয়ত, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী হুণ্ডি লইয়া কারবার করে। হুণ্ডি ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণপ্রদান ছাড়াও টাকাকড়ির স্থানান্তরিকরণ সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে। অধিকাংশ সময় অবশ্য ব্যাংক-ব্যবসায়ী সাধারণের নিকট হইতে আমানত অপেক্ষা নিজস্ব সংগতির উপরই অধিক নির্ভর করে। পরিশেষে, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে বহু ক্ষেত্রে ব্যাংকিং-এর সহিত অন্যান্য ব্যবসায়ও মিশাইয়া ফেলিতে দেখা যায়। সোনা-রূপার ব্যবসায়, কৃষিজ পণ্যে আগাম কারবারে, ফটকা বাজারে যাতায়াত প্রভৃতি দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের একরূপ অংগীভূত বলা যায়।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর কার্যাবলী

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, এই ব্যবস্থা বর্তমানের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিবিহীনভাবে সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এখনও ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে চেক ও আমানত ব্যবস্থা মোটেই গড়িয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ব্যাংক-ব্যবসায়ীই ব্যাংক-ব্যবসায়ের সহিত অন্যান্য প্রকার ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করিয়া থাকে। ব্যাংকিং নীতির দিক দিয়া ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক পদ্ধতি। তৃতীয়ত, এই ব্যাংক-ব্যবসায়ীর লেনদেন ব্যাপারে হুণ্ডি এখনও উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। ফলে বিলের বাজারও (bill market) বিশেষ গড়িয়া উঠে নাই; ডিস্কাউণ্ট বাজার (discount market) বলিয়াও কিছু নাই।* চতুর্থত, ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ নিজেদের মধ্যেই সংগঠিত নয়; ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবও বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে, এই ব্যাংক-ব্যবস্থার সহিত টাকাকড়ির সংগঠিত বাজার একরূপ সম্পর্কবিহীন বলিলেই চলে।

দোষত্রুটি

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবস্থা ভারতের আধুনিক বা সংগঠিত টাকার বাজার হইতে সম্পর্কচ্যুত হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে ঋণ-ব্যবস্থার পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ বিশেষ সম্ভব হয় না। ভারতীয় টাকার বাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থার ইহা একটি বিশেষ ত্রুটি। তবে বলা হয়, বর্তমানে টাকাকড়ির সংগঠিত ও অসংগঠিত বাজারের মধ্যে সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইতেছে।**

রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের অভাব

টাকাকড়ির অসংগঠিত বাজার ও সংগঠিত বাজারের মধ্যে সংহতি-সাধন (Coordination between Unorganised and Organised Money Markets): উক্ত ত্রুটি দূর করিবার ও টাকাকড়ির অসংগঠিত

---

* Reserve Bank—Functions and Working

** Madan, *Role of Monetary Policy in a Developing Economy*

বাজারকে সুসংগঠিত করিবার জন্য প্রয়োজন হইল টাকাকড়ির এই দুই বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনের। ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি (Central Banking Enquiry Committee) কয়েকটি বিশেষ সর্তাধীনে প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত এই সকল দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর সংযুক্ত হওয়ার সুপারিশ করে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৩৭ সালে এই সংযুক্তির প্রস্তাব করিয়া একটি খসড়া প্রস্তুত করে। প্রস্তাবের ধারার মধ্যে প্রধানতম ছিল যে, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ কয়েকটি সর্ত পালন করিলে তাহারা রিজার্ভ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হইয়া এই ব্যাংক-প্রদত্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। আরোপিত সর্তাবলীর মধ্যে ছিল: দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অন্যান্য সকল প্রকার ব্যবসাবাণিজ্য পরিহার করিয়া চলিবে; আমানত ব্যবস্থার প্রসারসাধন করিবে; আধুনিক হিসাবরক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবে; নির্দিষ্ট সময়ান্তরে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হিসাবনিকাশ দাখিল করিবে; ইত্যাদি। দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অবশ্য এই প্রস্তাব ও সর্তাবলীকে সুনজরে দেখে নাই। ফলে ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার দুইটি অংশের মধ্যে কাম্য সংহতিসাধন সম্ভব হয় নাই।

সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা

ইহার পর বিভিন্ন প্রদেশের মহাজনী আইন পাস হওয়ায় অনেক দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী তাহাদের প্রতিষ্ঠানকে যৌথ পুঁজি ব্যাংকে পরিণত করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের সময় এই নবসৃষ্ট যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি বিশেষ মুনাফা করিলেও যুদ্ধোত্তর যুগে ইহাদের অনেকগুলি ফেল পড়ে।

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করিয়া ব্যাপক ব্যাংক-ফেল রোধ করিবার জন্য ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস করা হয়। এই আইনের ফলে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অবশ্য ব্যাংক, ব্যাংকিং, ব্যাংকার প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবে না; কিন্তু ঐ সকল শব্দ ব্যবহার না করিয়া তাহারা পূর্বের মতই ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে পারে।

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন

ইহার পর ১৯৫১ সালে নিখিল ভারত স্রফ সম্মেলন (All-India Shroff Conference) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে একটি কেন্দ্রীয় স্রফ সংঘ (Central Shroff Association) প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবকে এখনও অবশ্য কার্যকর করা হয় নাই।

স্রফ সম্মেলন

আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির বিভিন্ন বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনের এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে

অতিরঞ্জিত করিয়া দেখানো একরূপ অসম্ভব। সুতরাং পূর্বে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ ভিন্ন পথে চলিলেও এখন আর তাহাদিগকে টাকাকড়ির আধুনিক বাজারের বাহিরে রাখা যাইতে পারে না। বর্তমানে টাকাকড়ির সংগঠিত ও অসংগঠিত বাজারের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা ঘনিষ্ঠ হইলেও উহাকে আরও ঘনিষ্ঠতর করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। এই নূতন ব্যবস্থায় দেশীয় ব্যাংকসমূহ যৌথ পুঁজি ব্যাংক বা সমবায় ব্যাংকে পরিণত হইতে পারে।

সংহতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা

খ। ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক (Indian Joint Stock Banks) ঃ ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এবং রিজার্ভ ব্যাংক লইয়া ভারতের ইয়োরোপীয় বা আধুনিক টাকার বাজার গঠিত। যে-সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে ভারতে সংগঠিত হইয়া আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাহাদিগকেই ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক বলা হয়। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) তপশীলভুক্ত (scheduled) এবং (খ) তপশীল-বহির্ভূত (non-scheduled)। তপশীলভুক্ত বলিতে বুঝায় রিজার্ভ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত। রিজার্ভ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংকসমূহের একটি তালিকা রক্ষা করে; এবং এই তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলিই তপশীলভুক্ত বা তপশীলী ব্যাংক নামে পরিচিত। যে-সকল ব্যাংকের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ অন্তত ৫ লক্ষ টাকা মাত্র তাহারাই আরও কয়েকটি সাধারণ সর্ত পূরণ করিতে পারিলে তপশীলভুক্ত হইতে পারে। তপশীলী ব্যাংকগুলিকে বর্তমানে তাহাদের গৃহীত মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের (demand and time deposits) শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়।* ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন অনুসারে তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকেও গৃহীত আমানতের অনুরূপ অংশ নগদ টাকায় হয় নিজেদের কাছে, না-হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়।

তপশীলভুক্ত ও তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট খবরাখবর প্রদানকারী যৌথ পুঁজি ব্যাংকের (reporting banks including foreign banks) সংখ্যা ২৯৭ ছিল। ইহার মধ্যে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাংক ছিল সংখ্যায় ৬৭, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক ১৪ এবং তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক ২১৬।**

বর্তমান অবস্থা

প্রতিষ্ঠান হিসাবে তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও তপশীলী ব্যাংকগুলির কার্যালয়ের সংখ্যা ও গৃহীত আমানতের পরিমাণ

* Reserve Bank (Amendment) Act, 1962

** Reserve Bank Bulletin, March 1963

তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলির কার্যালয়ের সংখ্যা ও গৃহীত আমানতের পরিমাণ হইতে অনেক অধিক।

কার্যাবলী

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রায় সমুদয় কার্যই সম্পাদন করে। তাহারা চলতি ও মেয়াদী উভয় আমানতই গ্রহণ করে, ব্যক্তিবিশেষ ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে স্বল্পকালীন ঋণদান করে, অন্তর্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থ সরবরাহ করে, ব্যবসায়ীদের উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে, ইত্যাদি। কিন্তু তাহারা বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ কোন ভূমিকা গ্রহণ করে না। মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকারের কার্য বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের একরূপ একচেটিয়া কারবার। ব্যাংক-ব্যবসায়ের এই ক্ষেত্রে ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি অনুপ্রবেশের বিশেষ চেষ্টা করিলেও সমর্থ হয় নাই।

কার্যক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা

ত্রুটি ও অসুবিধা: ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক-ব্যবসায়ের বয়স মাত্র ৭০ বৎসরের কিছু অধিক। এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহা বেশ প্রসারলাভ করিয়াছে বলা চলে। কিন্তু উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতেই যৌথ পুঁজি ব্যাংক-ব্যবস্থা এখনও অকিঞ্চিৎকর। প্রথমত, দেশের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় মোট ব্যাংক-কার্যালয়ের সংখ্যা হইল অত্যল্প। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি অতিমাত্রায় নগরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। গ্রামময় ভারতের গ্রামাঞ্চলে যৌথ পুঁজি ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারের অভাব ভারতের সামগ্রিক ব্যাংক-ব্যবস্থার দুর্বলতারই পরিচায়ক। তৃতীয়ত, যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় সবিশেষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যৎসামান্য মূলধন লইয়া কার্যারম্ভ, রিজার্ভ সংগঠনের পরিবর্তে লভ্যাংশ বিতরণে আগ্রহ, অযথা শাখাপ্রশাখা বিস্তার, অযৌক্তিকভাবে ঋণদান, অনভিজ্ঞ কর্মচারী লইয়া পরিচালনা, বেআইনীভাবে হিসাবরক্ষণ প্রভৃতিকে ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের একরূপ বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করা চলে। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস হইবার পূর্বে এই বৈশিষ্ট্য বা ত্রুটিগুলি আরও সুস্পষ্ট ছিল। বর্তমানে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানের ফলে ইহারা বহুমাত্রায় নিয়মিত হইয়াছে। কিন্তু তবু এখনও ব্যাংক ফেল পড়া বন্ধ হয় নাই। চতুর্থত, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক ও দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের পথে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। এই সম্পর্কে ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্তকারী কমিটি উক্তি করে যে একদিকে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলিকে তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করে, অপরদিকে

ত্রুটি ও অসুবিধা:
১। এই ব্যাংক-ব্যবস্থা পর্যাপ্তভাবে প্রসারলাভ করে নাই
২। গ্রামাঞ্চলে ইহার প্রসার ঘটে নাই
৩। আভ্যন্তরীণ পরিচালনা ত্রুটিপূর্ণ

যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলিকে বিনিময় ব্যাংকগুলির সহিতও পদে পদে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। উভয় দিকে এইরূপ নিষ্পেষণের মধ্যে পড়িয়া ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক কোনমতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। পঞ্চমত, যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহ সরকার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রয়োজনমত সহায়তা লাভ করে নাই। ব্রিটিশ শাসনাধীনে সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাজকর্ম সম্পাদন করা হইত ইম্পিরিয়াল ও বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে। পরাধীন ভারতে দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকাংশ বৈদেশিকগণের হস্তে থাকায় বণিক মহল হইতেও যৌথ পুঁজি ব্যাংক বিশেষ কোন সহায়তা লাভ করে নাই। স্বাধীনতার পর এই দৃষ্টিভংগির কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও ব্যবসায়ী ও বণিক মহলে বৈদেশিক ব্যাংকের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ষষ্ঠত, ভারতের বিলের বাজার (bill market) ভালভাবে গড়িয়া না উঠায় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি কাম্যভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহাদের মোট বিনিয়োগের মাত্র সামান্য অংশই বিলে আবদ্ধ থাকে ; ফলে তাহারা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে প্রয়োজনমত ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে না। সপ্তমত, যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবও বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ইহার ফলে ইহাদের অসুবিধা ও প্রতিযোগী বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের বিশেষ সুবিধা হয়। যৌথ পুঁজি ব্যাংক-ব্যবস্থার এই ত্রুটি দূরিকরণের অন্যতম প্রধান উপায় হইল সংযুক্তিসাধনের মাধ্যমে বৃহৎ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা। সম্প্রতি অনেক ক্ষেত্রে এই পন্থাই অবলম্বিত হইতেছে।

৪। বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের প্রতিযোগিতা অন্যতম প্রতিবন্ধক

৫। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

৬। অসংগঠিত বিলের বাজার

৭। ব্যাংকগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব

পরিশেষে, সেদিন পর্যন্ত তপশীলী ব্যাংকগুলির মধ্যে আমানতগ্রহণের জন্য বিশেষ প্রতিযোগিতা ছিল। ইহার ফলে গৃহীত আমানতের উপর সুদের হার অনেক ক্ষেত্রেই অতি উচ্চ হইত। কিন্তু বর্তমানে ব্যাংকগুলি (বিনিময় ব্যাংক সমেত) নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া সুদের হার নির্দিষ্ট করায় এই ত্রুটি কতকটা দূর হইয়াছে।

৮। আমানতগ্রহণ লইয়া প্রতিযোগিতা

উক্ত দোষত্রুটি ও অসুবিধার প্রতিবিধানের জন্যই ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস এবং পরবর্তী সময়ে কয়েকবার ইহার সংশোধন করা হয়। এ-সম্বন্ধে ব্যাংক পতন ও ব্যাংক আইন (bank failures and bank legislation) প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

গ। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক (Foreign Exchange Banks) : বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকারের কার্য করিবার জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যাংকের প্রয়োজন হয়।

এইরূপ ব্যাংক বিনিময় ব্যাংক নামে অভিহিত। ইহারা মুদ্রা বিনিময়ে সহায়তা ও আমদানি-রপ্তানিতে অর্থ সরবরাহ করে।

ভারতীয় বিনিময় ব্যাংকগুলি হইল বৈদেশিক

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ব্যাংক-ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ একচেটিয়া কারবার হিসাবে গিয়া পড়িয়াছে কতকগুলি বৈদেশিক ব্যাংকের হস্তে। সম্প্রতি কয়েকটি ভারতীয় ব্যাংক ব্যবসায় এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা এখনও বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

১৯৬২ সালের শেষ শুক্রবারে এইরূপ বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১৪। মোটামুটিভাবে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলি মোট আমানতের শতকরা ১২-১৩ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের কার্যাবলী নিম্নলিখিত রূপ ঃ

কার্যাবলী ঃ বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্য ভারতের বহির্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থ সরবরাহ করা। এই অর্থ সরবরাহের কার্য হইল

১। প্রধান কার্য বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসাহায্য করা

প্রধানত দুই প্রকারের ঃ (ক) ভারতীয় বন্দর হইতে বিদেশের বন্দরে এবং বিদেশের বন্দর হইতে ভারতীয় বন্দরে মাল লইয়া যাওয়া ও আনয়নে অর্থ সরবরাহ করা; (খ) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত রপ্তানি পণ্যকে বন্দরে লইয়া যাওয়া এবং বন্দর হইতে আমদানিকৃত পণ্যকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লইয়া যাওয়া। এই দুই কার্যের মধ্যে প্রথমটি একরূপ সমগ্রভাবেই সম্পাদিত হয় বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলির দ্বারা। দ্বিতীয়টিতে অবশ্য ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের কিছুটা ভূমিকা দেখা যায়।

২। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও উত্তরোত্তর অংশগ্রহণ করিতেছে। বর্তমানে ইহারা পাট শিল্পজাত দ্রব্য, চর্মদ্রব্য, বস্ত্রাদি প্রভৃতির অন্তর্বাণিজ্যে অর্থ সরবরাহকারীদের মোটা অংশীদার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রধানত, এই উদ্দেশ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাদের কার্যালয়সমূহ স্থাপিত হইয়াছে।

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কার্য সম্পাদন

তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কার্যও এই সকল বিনিময় ব্যাংক সম্পাদন করে—যথা, আমানত গ্রহণ, ঋণপ্রদান এজেন্সীর কার্য পরিচালনা, ইত্যাদি।

৪। মুদ্রা বিনিময়

চতুর্থত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের সময় হইতে ইহারা বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভ ব্যাংকের 'অনুমোদিত কারবারী' (authorised agents) হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইহারা বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও উহাদের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করিয়া থাকে।

বিনিময় ব্যাংকসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগঃ বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একরূপ একচেটিয়া অধিকার সমন্বিত বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের অস্তিত্ব ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার একটি অকাম্য অংগ। ইহাদের বিশেষ কার্যপদ্ধতির জন্য লণ্ডনের টাকার বাজারের স্বল্প-কালীন মূলধনে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা মোটা অংশ পরিচালিত হয়। বহুদিন পূর্বেই লর্ড কেইনস্ (Lord Keynes) উক্তি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার ইহা অন্যতম প্রধান বিপদস্থল।*

১। বিনিময় ব্যাংকগুলি ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থার অন্যতম বিপদস্থল

দ্বিতীয়ত, ইহাও বলা হইয়াছে যে, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ উত্তরোত্তর দেশের অন্তর্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ও আমানত গ্রহণের দ্বারা ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতেছে। বস্তুত, বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সরবরাহ বিনিময় ব্যাংকসমূহের বর্তমানে আর প্রধান কার্য নহে; বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কার্য সম্পাদনই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ আমানত গ্রহণের পরিমাণও যে সামান্য নহে তাহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

২। ইহারা ভারতীয় ব্যাংকসমূহের প্রতিযোগী

তৃতীয়ত, বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতার কার্যই করিয়া আসিতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির সম্মুখে অনেকে এইরূপ সাক্ষ্যই দিয়াছিল যে, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ ভারতীয় ব্যবসায়িগণ সম্পর্কে অধিকাংশ সময় বিরুদ্ধ ব্যাংক-অভিমত (bank reference) প্রদান করে। আমদানির ক্ষেত্রে তাহারা ইয়োরোপীয় আমদানিকারীদের যে-সুবিধা প্রদান করে ভারতীয় আমদানিকারীদের তাহা করে না। উপরন্তু, তাহারা ভারতীয় আমদানিকারককে বৈদেশিক বীমা কোম্পানী, বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানী, বিদেশী দালাল প্রভৃতির জন্য কারবার করিতে বাধ্য করিয়া এই প্রকারের সকল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানেরও বিরোধিতা করে। উপরন্তু দেখা যায়, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের উচ্চপদাধিকারী কর্মচারিগণের অধিকাংশই বৈদেশিক।

৩। ইহারা জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে

পরিশেষে, বৈদেশিক মূলধনের ন্যায় বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের বেলাতেও লভ্যাংশ দেশের বাহিরে চলিয়া যায়।

৪। লভ্যাংশ দেশের বাহিরে চলিয়া যায়

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস হইবার পূর্বে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ একরূপ রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল।

উক্ত আইনে বিনিময় ব্যাংকসমূহের উপর যে-সকল অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রযুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ (ক) ইহাদিগের প্রাপ্ত মূলধন (paid-up capital) এবং রিজার্ভের পরিমাণ ভারতীয়

* **Keynes, Indian Currency and Exchange**

যৌথ পুঁজি ব্যাংক হইতে অধিক হইবে; (খ) প্রতি বৎসরের শেষে ইহাদের ভারতীয় আমানতের অন্তত শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতেই রাখিতে হইবে; (গ) এই সকল ব্যাংক তাহাদের ভারতীয় শাখাসমূহের কারবারের স্বতন্ত্র হিসাব প্রকাশ করিবে; (ঘ) এইরূপ কোন ব্যাংক ফেল পড়িলে সম্পত্তির (assets) উপর ভারতীয় আমানতকারীদের দাবিই সর্বাগ্রগণ্য হইবে।

১৯৪৯ সালের আইন ও রিজার্ভ ব্যাংকের বর্তমান নিয়ন্ত্রণ

ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ফলে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইলেও এখনও কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকে; এখনও ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার এই বিপদস্থলকে জাতীয় স্বার্থের অনুপন্থী করিয়া তোলা সম্ভব হয় নাই।

উপসংহারে বলা যায়, ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি ধীরে ধীরে বিনিময় ব্যাংকের কার্যে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশে নূতন নূতন শাখাও খোলা হইতেছে। বর্তমানে ৫০টি ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকের ১০১টি শাখা বিদেশে কাজকারবার করিতেছে।* কিন্তু প্রত্যক্ষ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে এই গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হইবে না; ফলে ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থাও সুসংগঠিত হইয়া উঠিবে না।

উপসংহার

ঘ। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India): ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণের দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে। এই ইম্পিরিয়াল ব্যাংক আবার ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ব্যাংক (Presidency Banks) তিনটির সংযুক্তিসাধনের দ্বারা।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা: ইম্পিরিয়াল ব্যাংক

রিজার্ভ ব্যাংক গঠনের পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুইটি কার্য সম্পাদন করিত—যথা, (ক) সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করা, এবং (খ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করা। অন্যান্য দিকে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ছিল ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক। মোটকথা, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মর্যাদা পায় নাই বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সকল করণীয় কার্য সম্পাদন করে নাই। তবুও ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপরি-উক্ত কার্য দুইটি সম্পাদন করিত বলিয়া ইহার কার্যাবলীর উপর কয়েকটি বাধানিষেধ অর্পিত হইয়াছিল—যথা, ইহা মুদ্রা বিনিময়ের কার্য বা জমিবন্ধকের কারবার করিতে পারিত না, ইত্যাদি।

ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের প্রকৃতি

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংক্রান্ত কার্যাবলীর পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত এক চুক্তিবলে ইহা যে-সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাংকের কোন শাখা ছিল না সেই

* Trend and Progress of Banking in India during 1961

সকল স্থানে এই ব্যাংকের এজেন্ট হিসাবে কার্য করিতে থাকে। ইহার ফলে এবং নিজস্ব সংগতির জন্য ইহা ভারতীয় টাকার বাজারে একরূপ বেসরকারী নেতৃত্বের অধিকারী হয়। জাতীয়করণের সময় ইহার কার্যালয়ের সংখ্যা ছিল চারি শতেরও অধিক।

বিরুদ্ধে অভিযোগ

ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ বহুদিন যাবৎই অভিযোগ করিয়া আসিতেছিল। এই অভিযোগ ছিল বৈদেশিক মালিকানা, বৈদেশিক পরিচালনা এবং ভারতীয় টাকার বাজারে বৈদেশিক 'একচেটিয়া কর্তৃত্বের' বিরুদ্ধে।

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থায় ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের দান

অপরদিকে অবশ্য ইহার দানকেও অস্বীকার করা যায় না। এই ব্যাংক ভারতীয় টাকার বাজারকে অনেকটা সুসংগঠিত করিয়াছিল। চারি শতাধিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ইহা দেশের বিভিন্ন অংশের সুদের হারে সাম্য আনয়নকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা ভারতীয়গণের মধ্যে ব্যাংকিং স্বভাবও কতকটা গড়িয়া তুলিয়াছিল। সমবায় আন্দোলনকে ইহা কিছু পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ ও উহার কারণ বিশ্লেষণ

স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালে রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয়করণ করা হইলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণের দাবি আরও প্রবল হয়। অবশেষে, ইহা জাতীয়করণ করা হয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৫ সালে। ভারতের গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিয়া জরিপ কমিটি উহার সুপারিশে বলে যে, গ্রামময় ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করিতে হইলে সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার একটি পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (Integrated Scheme of Rural Credit) প্রস্তুত করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলের এই পূর্ণাংগ ঋণ-পরিকল্পনার প্রতি স্তরে থাকিবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ। অন্যান্যের মধ্যে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ কার্যকর হইবে রাষ্ট্রের অংশীদারভুক্ত এমন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে যাহার শাখাপ্রশাখা দেশের সর্বত্র বিস্তৃত থাকিবে এবং যাহার উপর অনেকাংশে গ্রামীণ ঋণ ও সমবায় ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত থাকিবে। ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ ও উহার সহিত বিভিন্ন সরকার সম্পর্কিত ব্যাংকগুলিকে (State-associated Banks) সংযুক্ত করিয়াই এই ব্যাংক সৃষ্টি করা হইবে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের গঠন ও কার্যাবলী (Constitution and Functions of the State Bank of India): ১৯৫৫ সালের মে মাসে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আইন পাস করিয়া ঐ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ ও ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সৃষ্টি করা হয়। ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের সকল দেনাপাওনা এবং নবসৃষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

ভারতের রাষ্ট্রীয়

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের পরিচালনার ভার একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত। বোর্ড সরকার, রিজার্ভ, বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থ প্রভৃতি মনোনীত পরিচালকগণকে লইয়া গঠিত। বোর্ডের সভাপতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন; বোর্ডের দুইজন কর্মাধ্যক্ষ আছেন। আঞ্চলিক কার্য সুপরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সমগ্র কার্যক্ষেত্র বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লী—এই চারিটি সার্কেল-এ (circles) বিভক্ত।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের গঠন

চারিটি সার্কেল

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে:

(১) বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্য (Commercial Banking Functions): পূর্বতন ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজগুলি করিয়া থাকে। ইহা ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক। বর্তমানে ইহার নিজস্ব ১০০০-এর কিছু বেশী শাখা আছে। ইহার মোট আমানত প্রায় ৪৮৭ কোটি টাকা এবং ইহার নিকট ভারতীয় তপশীলী ব্যাংকগুলির মোট আমানতের শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ জমা আছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে ইহা শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদিতে স্বল্পমেয়াদী ঋণের যোগান দেয়। সম্প্রতি ইহা সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাংকিং সংক্রান্ত কাজ করিতেছে। ইহাকে অধিক পরিমাণে সরকারের কাজও করিতে হইতেছে।

(২) রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও গ্রামীণ ঋণ (State Bank and Rural Credit):* পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থার সর্বাংগীণ উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার অংগ হিসাবে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধনই ইহার প্রধান কার্য। এই উদ্দেশ্যে ইহা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিয়াছে:

(ক) শাখাবিস্তার: গ্রামাঞ্চলে ঋণ-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য ইহার প্রধান দায়িত্ব ছিল ৫ বৎসরের মধ্যে ৪০০টি নূতন শাখা স্থাপন করা। উহা সম্পূর্ণরূপে পালিত হয়। প্রথম ৫ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬০ সালের জুন মাসের মধ্যে ইহা ৪১৬টি নূতন শাখা স্থাপন করে। শাখাবিস্তারের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থির হয় যে, ১৯৬৫ সালের জুন মাসের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও উহার অধীনস্থ ব্যাংকসমূহ আরও ৩০০টি শাখা খুলিবে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। জুলাই ১৯৬০ ও সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও উহার অধীনস্থ ব্যাংকসমূহ যথাক্রমে ৪১টি ও ৮৬টি শাখা স্থাপন করিয়াছে। এই শাখাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোলা হইয়াছে জিলা সদর-কার্যালয় ও সাব্-ট্রেজারী কেন্দ্রে। ১৯৫৪ সালের পূর্বে ১০৫টি জিলা সদর কার্যালয়ে ও ১৫৩০টি সাব্-ট্রেজারী কেন্দ্রে ইম্পিরিয়াল বা রাজ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের

* Reserve Bank Bulletin, Nov. 1962

কোন শাখা ছিল না। কিন্তু ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপ শাখাবিহীন জিলা সদর-কার্যালয় ও সাব্-ট্রেজারী কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫ ও ১১৫৭। এই শাখাগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থায় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারিতেছে।

(খ) সমবায় ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণ সুযোগসুবিধা: গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইহার দ্বিতীয় কাজ হইতেছে সমবায় ব্যাংকগুলিকে অর্থ স্থানান্তরের ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা। পূর্বে রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও উহার অধীনস্থ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সপ্তাহে একবার বিনা ব্যয়ে অর্থ স্থানান্তর করিতে পারিত, কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক উহাদিগকে সপ্তাহে তিনবার বিনা ব্যয়ে অর্থ স্থানান্তরের সুবিধা দিতেছে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির নিকট অর্থ স্থানান্তর করিতে পারে। উপরন্তু, ইহা সরকারী ঋণপত্রের বিরুদ্ধে ইহার সুদের হার অপেক্ষা শতকরা ½ কম হারে সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণ দিতেছে। আবার, সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠান-গুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে দ্রব্য পুনর্জামিনের (repledge of goods) সর্তে ঋণগ্রহণ করিতে পারে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সমবায় ব্যাংকগুলির বিল সুবিধা হারে ভাঙাইয়া দেয়। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক যে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা দিতেছে তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের হিসাব হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। যেমন, ১৯৬০ সালের জুন মাসে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির নিকট রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের বাকী ঋণের (outstanding loans) পরিমাণ ছিল ১৮৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু ১৯৬২ সালের জুন মাসে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ২৯১ লক্ষ টাকায়।

অর্থ স্থানান্তরের সুবিধা প্রদান

(গ) বিক্রয়করণ ও বিক্রয়যোগ্যকরণ সমবায় সমিতিকে ঋণদান: গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থার সংগে জড়িত রহিয়াছে দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সুবিধা সর্তে উপরি-উক্ত সমিতিগুলিকে সরাসরি ঋণ দিতেছে। বিক্রয়যোগ্যকরণ সমিতিসমূহের মধ্যে সমবায় চিনির কারখানাগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে বিশেষ সুবিধা পাইতেছে। সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিলে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(ঘ) জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে অর্থপ্রদান: রাষ্ট্রীয় ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যাংক-গুলির উন্নয়নের জন্য উহাদের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতেছে এবং উহার বিরুদ্ধে ঋণ দিতেছে।

(ঙ) গুদামঘর উন্নয়নের জন্য অর্থপ্রদান: কৃষিজাত পণ্যের সমবায় বাজার ব্যবস্থা ও গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিতে হইলে গুদামঘরের উন্নয়নের প্রয়োজন। এই কারণেই সূচনা হইতেই রাষ্ট্রীয় ব্যাংক পণ্য সংরক্ষণের উন্নয়নের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে। ইহা কেন্দ্রীয় পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশনের শেয়ার ক্রয়

করিয়াছে। যে-সকল স্থানে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ সংস্থা আছে সেই সকল স্থানে ইহা যতদূর সম্ভব একটি করিয়া শাখা খুলিবার প্রচেষ্টা করিতেছে। আবার, গুদামঘরের রসিদের (warehouse receipt) বিরুদ্ধেও ইহা কিঞ্চিৎ অধিক সুদের হারে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে।

অতএব দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থার প্রসারের প্রচেষ্টা করিতেছে। অবশ্য ইহার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। যেমন, ইহাকে এই একই সংগে বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংকের পরস্পরবিরোধী দ্বৈত ভূমিকায় অংশগ্রহণ করিতে হইতেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে ইহাকে দিতে হয় মূলত স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং কৃষি ব্যাংক হিসাবে দিতে হয় মূলত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ। একই সংগে একই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া বিশেষ অসুবিধাজনক। ইহা সত্ত্বেও গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্য প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

(৩) রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও ক্ষুদ্র শিল্প (State Bank and Small Industries) : ক্ষুদ্র শিল্পের ঋণ যোগানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্থসাহায্য দেওয়ার জন্য ইহা ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে কয়েকটি নির্বাচিত শাখাতে একটি 'পথ-প্রদর্শনমূলক পরিকল্পনা' (Pilot Scheme) প্রবর্তন করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যাবতীয় ঋণের জন্য কোন ক্ষুদ্র শিল্পকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের 'এজেন্ট' বা স্থানীয় সমবায় ব্যাংকের নিকট আবেদনপত্র পেশ করিতে হয়। তারপর রাষ্ট্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ঋণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা করে। এই ঋণ হয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সরাসরি প্রদান করে, না-হয় রাজ্য অর্থ-করপোরেশন ইত্যাদির মাধ্যমে দিয়া থাকে। এই পরিকল্পনার ফলে বিভিন্ন ঋণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং উহার ফলে ক্ষুদ্র শিল্প অতি সহজেই ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে। বর্তমানে এই পরিকল্পনা রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সবগুলি শাখাতে প্রবর্তন করা হইয়াছে।

পথ-প্রদর্শমমূলক পরিকল্পনা

ইহা ছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ক্ষুদ্র শিল্পকে ঋণ দেওয়ার জন্য একটি 'উদারনীতিমূলক ঋণ পরিকল্পনা' (Liberalised Credit Scheme) চালু করিয়াছে। ইহার দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ক্ষুদ্র শিল্পকে ঋণ দেওয়ার জন্য নিয়মাবলী কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াছে। উপরন্তু, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সম্প্রসারণমূলক কাজের জন্য অনধিক সাত বৎসরের জন্য মধ্যমেয়াদী ঋণ প্রদান করিতেছে। সম্প্রতি ইহা কয়েকটি রাজ্য অর্থ-করপোরেশনের সংগে 'এজেন্সী' চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। উপরি-উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ২৯১টি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে ১০ কোটি টাকার কিছু বেশী ঋণ বরাদ্দ করে।* ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের এই ভূমিকাকে অনেকেই

অর্থ-করপোরেশন-সমূহের এজেন্সী কার্য

* Report on Currency and Finance, 1961-62

'জাপানের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাংকে'র (Industrial Bank of Japan) সংগে তুলনা করিয়া থাকেন। জাপানের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাংকের ন্যায় রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের একটি পৃথক 'ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগ' থাকিলে ইহার কার্য আরও সম্প্রসারিত হইবে।

(৪) রিজার্ভ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবে কার্য (State Bank as an Agent of the Reserve Bank of India) : রিজার্ভ ব্যাংকের যে-সব স্থানে শাখা নাই অথচ রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের শাখা আছে সেই সব স্থানে ইহা রিজার্ভ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবে ব্যাংকিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করিয়া থাকে।

স্থতরাং দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কাজ নানা প্রকারের; ইহা একই সংগে বাণিজ্যিক, কৃষি, শিল্প ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু কিছু কার্য করিয়া থাকে।

উপসংহার

ভারতীয় টাকাকড়ির বাজারে রিজার্ভ ব্যাংকের পরেই ইহার স্থান। ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকাকড়ির বাজারের উন্নয়নের আংশিক দায়িত্ব ইহার উপর ন্যস্ত। গত কয়েক বৎসরের কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ক্রমশ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাংক (The Reserve Bank of India) : রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১৯৩৪ সালের আইন দ্বারা ১৯৩৫ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না; ১৯২১ সাল হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুইটি কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল মাত্র।

আদিতে রিজার্ভ ব্যাংক ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে, ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড এবং ব্যাংক অফ ফ্রান্সের জাতীয়করণের পরই, ইহার জাতীয়করণ করা হয়।

রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ

সেই সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল, রিজার্ভ ব্যাংক সকল সময়ই সরকারের নির্দেশমত চলিয়াছে, সকল সময়ে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে; স্থতরাং ইহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া পরিচালনাগত কোন লাভই হয় নাই। দ্বিতীয়ত, একদল অংশীদারের অস্তিত্ব সরকারী কার্যের উপর স্বয়ংস্থাপিত তত্ত্বাবধানের কার্যই করিয়া আসিতেছিল। এইরূপ তত্ত্বাবধানে না থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পূর্ণভাবে দলীয় সরকারের খেয়ালখুশি মতই চলিবে।

সমালোচনার উত্তরে বলা হইয়াছিল যে, ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডও সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছিল, তবুও ইহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। বিত্তশালী শ্রেণী হইতে একদল অংশীদার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা যে কিছু পরিমাণও নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। স্থতরাং রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণে অন্যায় কিছুই করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, দলীয় সরকারের যে প্রভাবের কথা বলা হয় তাহা রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীন সকল উদ্যোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই বলিয়া

এগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখা হয় নাই। দেশের সর্বাংগীণ আর্থিক উন্নয়নের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়াই এই কার্য সম্পাদন করা হইয়াছে।

সংগঠন ও পরিচালনা : রিজার্ভ ব্যাংক যখন অংশীদারগণের ব্যাংক ছিল তখন ইহার মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা। জাতীয়করণের পর অবস্থা ঐ একই আছে, তবে মূলধনের সমগ্রটাই এখন রাষ্ট্রের।

রিজার্ভ ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ডের (Central Board of Directors) হস্তে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১ জন গভর্নর, ৩ জন সহকারী গভর্নর, চারিটি স্থানীয় বোর্ড হইতে মনোনীত ৪ জন পরিচালক, মনোনীত ৬ জন অন্যান্য পরিচালক এবং ১ জন সরকারী কর্মচারী—এই ১৫ জন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড গঠিত।

দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোর্ড

বোর্ডের গভর্নরই মুখ্য কাযনির্বাহক (Chief Executive) এবং পরিচালক বোর্ডের সভাপতি। স্থানীয় বোর্ড (Local Board) চারিটি বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও নয়া দিল্লীতে অবস্থিত। যৌথ পুঁজি ব্যাংক, দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী, সমবায় প্রভৃতি আর্থিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে ৫ জন করিয়া সদস্য মনোনীত করিয়া প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড গঠন করা হয়।

ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ করে সম্পূর্ণভাবে সরকার। সরকারী নির্দেশ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোর্ডকে মানিয়া লইতে হয়।

বিভাগ ও কর্মদপ্তর

ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের মত রিজার্ভ ব্যাংকের মূল বিভাগ দুইটি—(ক) নোট প্রচলন বিভাগ (Issue Department), (খ) ব্যাংকিং বিভাগ (Banking Department)। ব্যাংকিং বিভাগের আবার কয়েকটি উপবিভাগ আছে—যথা, কৃষি ঋণ বিভাগ (Agriculture Credit Department), বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Exchange Control Department), ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ (Department of Banking Operations), ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ (Department of Banking Development), পরিদর্শন বিভাগ (Inspection Department) এবং শিল্প-মূলধন বিভাগ (Industrial Finance Department)। ইহাদের মধ্যে ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ এবং পরিদর্শন বিভাগ অন্যান্য ব্যাংকের পরিচালনা সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এবং উহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। অপ্রধান কর্মদপ্তরসমূহের মধ্যে গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগই (Department of Research and Statistics) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ইহা প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাযাবলী সম্পাদন করিয়া থাকে

কার্যাবলী : রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলিয়া ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। উপরন্তু, উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থাতে ইহার উপর অন্যান্য কয়েকটি

কার্যভারও অর্পিত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের এই কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে:

(১) নোট প্রচলন সংক্রান্ত কার্য: রিজার্ভ ব্যাংক নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকারী—ইহা এক টাকার নোট ছাড়া অন্য সকল মূল্যের নোটই প্রচলন করিয়া থাকে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নোট প্রচলন পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা করা হইয়াছে।*

(২) সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য: সরকারের ব্যাংক সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদন করে রিজার্ভ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল অর্থ ইহার নিকট জমা রাখা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক সরকারী ঋণ-ব্যবস্থা (public debt) পরিচালনা করে ও ঋণপত্রের মাধ্যমে সরকারের নির্দেশমত বাজার হইতে অর্থসংগ্রহ করে। আবার ইহা সরকারের প্রয়োজনমত অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে। সরকারকে ইহা স্বল্পকালীন (চাহিদামাত্র দিবার সর্তে বা সর্বাধিক ৯০ দিনের জন্য) ঋণপ্রদানও করিয়া থাকে। ব্যাংকিং সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শপ্রদান করা ইহার কর্তব্য। রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে বৈদেশিক সরকারের এজেন্ট হিসাবেও কার্য করিতে পারে। প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে সম্প্রতি ইহা কেন্দ্রীয় সরকারকে নানারূপ পরামর্শ দিতেছে।

(৩) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য: প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করে। ইহা তাহাদের আমানতের একাংশ জমা রাখে, তাহাদের অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ করে, তাহাদের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে এবং প্রয়োজনমত তাহাদের ঋণপ্রদান করে। আমাদের রিজার্ভ ব্যাংকও এই সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্বে মাত্র তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট উহাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখিতে হইত। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ফলে বর্তমানে তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক-গুলিও অনুরূপ জমা না রাখিয়া ঐ টাকা নগদে নিজেদের কাছে রাখিতে পারে।** ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের যে সংশোধন পাস করা হয় তাহার দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংককে প্রয়োজনবোধে তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে চলতি আমানতের শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ হইতে ৮ ভাগ পর্যন্ত—অর্থাৎ, উভয় ক্ষেত্রেই চার গুণ পর্যন্ত বেশী জমা দাবি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৬২ সালে আবার রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন দ্বারা ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, তপশীলী ব্যাংকসমূহকে তাহাদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের প্রাত্যহিক ব্যালান্সের মোট শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে এই শতকরা ৩ ভাগকে শতকরা ১৫ ভাগ—অর্থাৎ, পাঁচ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইতে

* ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

** তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলি গৃহীত আমানতের ঐ অংশ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট না রাখিয়া নগদ অবস্থায় (in cash) নিজেদের কাছেও রাখিতে পারে।...১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

পারে। তপশীলী ব্যাংকগুলিকে অবশ্য আরও কয়েকটি দায়িত্ব পালন করিতে হয়; ইহার ফলে তাহারা কয়েকটি সুবিধাও ভোগ করে। তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সাপ্তাহিক হিসাবনিকাশ দাখিল করিতে হয়। ইহার পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাংক বিনা খরচে তাহাদের টাকা স্থানান্তরে প্রেরণ করে (free remittance facilities) এবং বিল অথবা সরকারী ঋণপত্রের জামিনে তাহাদের ঋণও প্রদান করে। উপরন্তু, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, তপশীলী ব্যাংকসমূহের মধ্যে যেগুলি 'অনুমোদিত ব্যবসায়ী' রিজার্ভ ব্যাংক তাহাদের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে।

তপশীলী ব্যাংক ও রিজার্ভ ব্যাংকের মধ্যে সম্বন্ধ

(৪) টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষার কার্য: রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ভারতীয় টাকার বিনিময়-মূল্য বা মানরক্ষার ভার অর্পিত আছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। মূল আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক টাকায় ১ শি. ৬$\frac{3}{16}$ পে. হইতে ১ শি. ৫$\frac{49}{64}$ পেন্সের মধ্যে তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট ষ্টার্লিং ক্রয়বিক্রয় করিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সভ্য হওয়ার পর হইতে (১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ) ব্যাংককে অনুমোদিত সকল বৈদেশিক মুদ্রাই ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়। বিনিময় নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাংক মাত্র অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের (authorised dealers) নিকটই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে, সকল ব্যাংকের নিকট নহে।

(৫) ঋণ ও ব্যাংক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ কার্য: বর্তমানে প্রত্যেক উন্নত দেশেই টাকাকড়ি অল্পবিস্তর রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত (managed money)। রাষ্ট্র এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (credit control) করিয়া। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য বা ক্রয়শক্তি নিয়ন্ত্রিত থাকিলে তবেই শেষ পর্যন্ত ইহার বিনিময়-মূল্য সংরক্ষিত হয়। অপরদিকে আবার আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া ব্যাংক-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হইলে তবেই অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্যকভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাংককে ব্যাংক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও আনুষংগিক কার্যাদি সম্পাদন করিতে হয়।

(৬) কৃষিঋণ-ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্য: কৃষিঋণ-ব্যবস্থাতেও রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা রহিয়াছে। ইহা ইহার কৃষিঋণ বিভাগের (Agricultural Credit Department) মাধ্যমে কৃষিঋণ-ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সমবায় আন্দোলন অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

(৭) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা দ্বারা ন্যস্ত দায়িত্ব: রিজার্ভ ব্যাংকের উপরি-উক্ত ছয়টি কার্যের প্রথম পাঁচটি যে-কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহার উপর স্বল্পোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য আছে। সম্প্রসারণই (growth) এই সকল দেশের মূল অর্থনৈতিক সমস্যা। পরিকল্পিত

অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে সাহায্য করা স্বল্পোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।*

পরিকল্পনাকে সহায়তা করিবার যে-সকল দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল তিনটি: (ক) ঘাটতি ব্যয়ের (deficit financing) সাহায্যে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে সহায়তা করা, (খ) সংগে সংগে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করা, এবং (গ) বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্পবাণিজ্য যাহাতে মূলধনের সমস্যায় প্রপীড়িত না হয় তাহা দেখা।**

তিনটি দায়িত্ব

ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি দায়িত্ব পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মূল্যস্তর আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দিতে পারে। এইজন্য ঘাটতি ব্যয় বৃদ্ধির সংগে সংগে যাহাতে ব্যাংক-ঋণ অকাম্যভাবে বৃদ্ধি না পায় রিজার্ভ ব্যাংককেই তাহা দেখিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তনের সংগে সংগে ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতারও বৃদ্ধিসাধন করা হইয়াছে।

উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যাংক-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প-মূলধন সরবরাহের কার্য সম্যকরূপে সম্পাদন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ খোলা হয়। পরে এই বিভাগকে ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ এবং শিল্প-মূলধন বিভাগ—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগের কার্য ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন ও সম্প্রসারণ এবং শিল্প-মূলধন বিভাগের কার্য বিভিন্ন শিল্প-অর্থ করপোরেশনকে সহায়তা করা।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহায়তার উদাহরণ হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংকের বিল বাজার পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

টাকাকড়ির বাজারের উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ (Control of the Reserve Bank of India over the Money Market): এখন রিজার্ভ ব্যাংক টাকাকড়ির বাজারকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

টাকাকড়ির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্ব সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকাকড়ির বাজারে পরিব্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাংকের এই কর্তৃত্ব পূর্বে ছিল বিশেষ সংকীর্ণ। ১৯৪৯

* "Some Reflections on our Domestic Economy" by H. V. R. Iengar, Ex-Governor of the Reserve Bank

** "Role of the Reserve Bank of India in the Development of Credit Institutions." B. Venkatappiah, Deputy Governor of the Reserve Bank

সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের দ্বারা ইহাকে কতকটা ব্যাপক করা হয়। ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইন এবং পরবর্তীকালে ঐ আইনের বিবিধ সংশোধন দ্বারা ইহাকে ব্যাপকতর করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাও এইদিকে সহায়তা করিয়াছে। তবুও ব্যাপকতা কাম্যভাবে প্রসারিত হয় নাই; ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজারের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ এই কর্তৃত্বের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে।

নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্ব পরিব্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন

প্রথমে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের এই কর্তৃত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করা প্রয়োজন।

রিজার্ভ ব্যাংক ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (Reserve Bank and Credit Control)ঃ 'ঋণ-নিয়ন্ত্রণ' বলিতে বুঝায় 'ব্যবসাবাণিজ্যের পরিমাণের সহিত ঋণের পরিমাণের সংগতিসাধন' (adjustment of the volume of credit to the volume of business)। মোটামুটিভাবে দেশে ঋণের পরিমাণ ব্যাংকসমূহের ঋণনীতির (lending policy) উপর নির্ভর করে বলিয়া ঋণ-নিয়ন্ত্রণের (control of credit) জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে ঋণনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ (control of credit policy) প্রয়োজন হয়। এই নিয়ন্ত্রণকার্যের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তে কয়েকটি অস্ত্রশস্ত্র (weapons) থাকে—যথা, ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন (variation of the bank rate), খোলা বাজারে কারবার (open market operations), কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট সদস্য-ব্যাংকসমূহের জমা রাখার অনুপাতের পরিবর্তন (variation of the reserve ratio) ও আমানতের পরিমাণ আবদ্ধ করা (impounding of deposits), নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (selective credit control), নৈতিক প্রণোদন (moral suasion), ইত্যাদি। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি অস্ত্রশস্ত্রকে সাধারণ বা পরিমাণমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রশস্ত্র (instruments of general or quantitative credit control) বলা হয়—অর্থাৎ, ব্যাংকের বাট্টাহার ইত্যাদি দ্বারা ঋণের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধিসাধন করা হয়। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্বাচনমূলক এবং প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার (power of selective and direct credit regulation) অধিকারী হইতে পারে। নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায়, সমগ্র ঋণনীতি নিয়ন্ত্রণ না করিয়া ব্যাংকগুলি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঋণপ্রদান সংকুচিত করিবে এবং উহা কিভাবে করিবে তাহা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া।*

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রশস্ত্র

দুই প্রকারের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ—
ক। পরিমাণমূলক,
খ। নির্বাচনমূলক

* "The regulation of credit for specific purposes or branches of economic activity is termed selective or qualitative credit control." *Reserve Rank—Functions and Working*

আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উভয় প্রকার ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই আছে। ইহার মধ্যে পরিমাণমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মূল রিজার্ভ ব্যাংক আইন ও উহার ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংশোধন হইতে প্রাপ্ত। মূল আইন রিজার্ভ ব্যাংককে বাট্টাহারের পরিবর্তন এবং খোলা বাজারে কারবার—এই দুইটি ক্ষমতা প্রদান করে। তারপর ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংশোধন দ্বারা তপশীলী ব্যাংকগুলির জমার অনুপাতের পরিবর্তনসাধনের ক্ষমতাও ন্যস্ত করা হয়। অপরদিকে নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করে ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন ও উহার বিভিন্ন সংশোধন। এখন ঋণ-নিয়ন্ত্রণের এই বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র বর্তমান পরিকল্পনাধীন সময়ে (plan period) কতদূর কার্যকর হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা :

রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রশস্ত্রগুলির আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় বাট্টাহার-নীতির। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এ-পর্যন্ত চারবার ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন করা হইয়াছে। প্রথমবার করা হয় ১৯৩৫ সালে। তখন বাট্টাহার শতকরা ৩½ হইতে কমাইয়া শতকরা ৩ করা হয়। ইহার ১৬ বৎসর পরে ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে বাট্টাহারকে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৩½-এ লইয়া যাওয়া হয়। তারপর ১৯৫৭ সালের মে মাসে বাট্টাহার পুনরায় বৃদ্ধি করিয়া উহাকে শতকরা ৪-এ পরিণত করা হয়। শেষবার পরিবর্তন করা হয় ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে ; ঐ সময় বাট্টাহার আরও বৃদ্ধি করিয়া উহাকে শতকরা ৪½-এ ধার্য করা হয়।* বাট্টাহারের বৃদ্ধি প্রত্যেকবারই সংগঠিত টাকার বাজারের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯৫২ সালে 'বিল বাজার পরিকল্পনা' (Bill Market Scheme) প্রবর্তনের পূর্বে তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলি ঋণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের বিশেষ দ্বারস্থ না হওয়ায় ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন যতটা কার্যকর হইতে পারিত ততটা হয় নাই। বিল বাজার পরিকল্পনা অবশ্য প্রসারিত হয় ১৯৫৭ সাল হইতে। ঐ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৫ই মে পর্যন্ত বাট্টাহার অপরিবর্তিত রাখিয়া সরকারী ঋণপত্রের জামিনে ঋণগ্রহণের সুদের হার শতকরা ½ ভাগ বৃদ্ধি (শতকরা ৩½ হইতে ৪) করা হয়। ইহাও টাকার বাজারে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইহার মূল কারণ হইল, বিল পুনর্বাট্টার পদ্ধতি (rediscounting bills) রিজার্ভ ব্যাংক সেদিন পর্যন্ত বিশেষ অনুসরণ করে নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী ঋণপত্রের জামিনেই তপশীলী ব্যাংকগুলিকে ঋণপ্রদান করিয়াছে। বস্তুত, ভারতে ব্যাংকের বাট্টাহার বলিতে রিজার্ভ ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের সুদের এই হারকেই বুঝাইত।** সম্প্রতি ব্যাংক-রেট

১। বাট্টাহারের মাধ্যমে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

* Reserve Bank Bulletin, Dec. 1962

** *Reserve Bank—Functions and Working*

যে বাড়ানো হইয়াছে তাহারও বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। কারণ, এখনও রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংক-রেটে অতি সামান্য পরিমাণ ঋণ দেয়। যাহা হউক দেখা যায় যে, অন্তত সুসংগঠিত টাকার বাজারে ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন কার্যকর অস্ত্র হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। ভারতের টাকাকড়ির বাজার দিন দিন সুসংগঠিত হইতেছে বলিয়া বাট্টাহারের কার্যকারিতা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইবে, আশা করা যায়।* কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি প্লুতগতিসম্পন্ন (galloping) হইলে বা মুদ্রাসংকোচ (deflation) দ্রুত ঘটিলে ব্যাংকের বাট্টাহারের সামান্য পরিবর্তনে গতি বিশেষ অবরুদ্ধ হয় না। এইজন্য অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রকেও কাজে লাগাইবার প্রয়োজন হয়।

২। খোলা বাজারে কারবারের মাধ্যমে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

দ্বিতীয়ত, খোলা বাজারে কারবার—অর্থাৎ, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি বা সংকোচের উদ্দেশ্যে সাধারণ বাজারে সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয়, রিজার্ভ ব্যাংক ইহার প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই করিয়া আসিতেছে। এই পদ্ধতির দ্বারা অতীতে রিজার্ভ ব্যাংক বাজারে প্রয়োজনমত অর্থ সরবরাহ করিতে এবং বাজার হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ টানিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। যেমন, ১৯৪৮-৫১ সালের মধ্যে ঋণ-সম্প্রসারণের জন্য ইহা ঋণপত্র ক্রয়নীতি অনুসরণ করে; কিন্তু ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাস হইতে ইহা প্রায় ধারাবাহিকভাবে ঋণ-সংকোচনের জন্য বিক্রয়নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। অবশ্য ১৯৫৬-৫৭ সালে কিছু সময়ের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক 'বিভেদমূলক ক্রয়নীতি' (discriminating purchase) অনুসরণ করিয়াছিল। বর্তমানে অবশ্য এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বেশ কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে।**

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপরি-উক্ত দুইটি অস্ত্রশস্ত্র—যথা, ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন ও খোলা বাজারে কারবার—পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের অনুমান করা হইয়াছিল। আশংকা করা হইয়াছিল যে, ঋণ-সম্প্রসারণ যদি এই অনুপাতেই ঘটে তবে উহাকে উক্ত গতানুগতিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে না। ফলে আইনের সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংককে নোট প্রচলনের ক্ষমতাবৃদ্ধির সংগে সংগে জমা বা রিজার্ভের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতাও প্রদান করা হয়।† বস্তুত, স্বল্পোন্নত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ব্যাংকসমূহের জমা বা রিজার্ভের হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অস্ত্রাগারের অন্যতম অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্য এই সকল দেশের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক-আইনেই মুদ্রাস্ফীতি ও

---

* Presidential Address by H. V. R. Iengar at the Indian Institute of Bankers

** *Reserve Bank—Functions and Working*

† ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

মুদ্রাসংকোচের প্রতিবিধানকল্পে জমা বা রিজার্ভের পরিমাণ শতকরা ১০ হইতে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনাকারী কর্তৃত্বের (monetary authority) হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। পূর্বে আমাদের রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তপশীলভুক্ত ব্যাংকসমূহকে চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ ও স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ মাত্র জমা রাখিতে হইত; প্রয়োজনবোধে ইহার হ্রাসবৃদ্ধি করা যাইত না। রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন দ্বারা এই হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতাই দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলী ব্যাংকের ক্ষেত্রে চলতি ও স্থায়ী আমানত উভয় ক্ষেত্রে জমা ৪ গুণ পর্যন্ত (৫ হইতে ২০ এবং ২ হইতে ৮) বৃদ্ধি করিতে পারিত। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত আমানতের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অতিরিক্ত জমা দাবি করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৬২ সালের সংশোধন অনুসারে বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক এই রিজার্ভের পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পর্যন্ত—অর্থাৎ, ৫ গুণ বর্ধিত করিতে পারে।

৩। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে জমার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান

রিজার্ভ ব্যাংকের এই ক্ষমতাবৃদ্ধির সমালোচনা প্রথমত দুই দিক দিয়া করা হইয়াছে। প্রথমত দেখা গিয়াছে, জমা বা রিজার্ভের অনুপাতের এত অধিক পরিবর্তনের ফলে বৃহৎ বৃহৎ ব্যাংক অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংকই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়—কারণ বৃহৎ ব্যাংকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় অর্থ অলস অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই অলস অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা দিলে বৃহৎ ব্যাংকের কোনই অসুবিধা হয় না—উহার ঋণপ্রদানকার্য পূর্বমতই চলিতে থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয় ঋণপ্রদানকার্য সংকুচিত করিয়া। সুতরাং দেখা যায়, এই ব্যবস্থার দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকের প্রতি প্রভেদাত্মক ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই ক্ষমতা প্রদানের বিরুদ্ধে সমালোচনা:

দ্বিতীয়ত, পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া না দিয়া সহসা জমার অনুপাতবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে অনেক ব্যাংকের পতন ঘটিতে পারে। এইজন্য অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আইনে সতর্ক করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। উদাহরণ-স্বরূপ, ফিলিপাইন ও গোয়াটেমালার (Guatemala) কেন্দ্রীয় ব্যাংক আইনে এইরূপ ধারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, ব্যাংকসমূহের জমা বা রিজার্ভের পরিমাণ ধীরে ধীরে ও গতিশীল হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ব্যাংকসমূহকে পূর্বাহ্লেই এই বৃদ্ধির পরিমাণ ও সময় জানাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধনী আইনে এই সময়োচিত সতর্কের ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট করা হয় নাই। ইহার ফলে সহসা ব্যাংক-ব্যবস্থায় বিশেষ বিশৃংখলা ঘটিতে পারে।

পরিশেষে, ইহাও বলা যায় যে, ব্যাংক রিজার্ভের অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতির—যথা, ব্যাংকের বাট্টাহার,

খোলা বাজারে কারবার প্রভৃতির সহিত সতর্কভাবে সংহতিসাধন করিতে হইবে। অন্যথায় ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে বিশৃংখল হইয়া সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরাইতে পারে।

এই সকল সমালোচনা, বিশেষত প্রথম সমালোচনার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক বর্তমানে জমার অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধির (variation of the reserve ratio) নীতি অনুসরণ না করিয়া, অতিরিক্ত জমা আবদ্ধ করার (impounding of additional deposits) নীতিই অনুসরণ করিতেছে। অবশ্য কর্তৃপক্ষ-মহল হইতে এই জমা আবদ্ধ করাকেই রিজার্ভের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।* যাহা হউক, এই নীতির অনুসরণে রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৬০ সালে তপশীলী ব্যাংক-গুলিকে প্রথমে অতিরিক্ত আমানতের শতকরা ২৫ ভাগ ও পরে শতকরা ৫০ ভাগ জমা রাখিতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে (১৯৫৯-৬০) ব্যাংক-আমানত ও ব্যাংক-ঋণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দ্রব্যমূল্য বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। ইহা প্রতিরোধ করার জন্যই ১৯৬০ সালে এইরূপ ঋণের অতিসংকোচন (Credit Squeeze of 1960) ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে উহার বিলোপসাধন করা হয়।**

অতিরিক্ত আমানত আবদ্ধ করা

রিজার্ভের অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা এবং অতিরিক্ত আমানত আবদ্ধ করার নীতি অনুসরণের ফলে সমগ্র ঋণ-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্ব অনেক পরিমাণে ব্যাপকতর হইয়াছে এবং ইহার ফলে ভারতে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত টাকাকড়ির (managed money) ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইয়াছে। অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির আশংকাযুক্ত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষমতার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাংকের নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিভিন্ন সংশোধনসহ ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন হইতে প্রাপ্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বা অর্থ-ব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ। যেমন, মুদ্রাস্ফীতির সময় খাদ্যশস্যের বিরুদ্ধে দেয়-ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হ্রাস করা যায়। ইহার উদ্দেশ্য হইল, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণের সম্প্রসারণ এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণের নিয়ন্ত্রণ। রিজার্ভ ব্যাংক নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে ১৯৫৬ সালের

৪। নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

Trend and Progress of Banking in India during 1960 & 1961

Reserve Bank Bulletin, January 1961

মধ্যভাগ হইতে। ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল খাদ্যশস্য ও কৃষিজ কাঁচামালের ফটকা কারবার (speculative holding) নিয়ন্ত্রণ করা। ইহার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন কালে বিভিন্ন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কার্যকর করে। ধান, চাউল, চিনি, তুলাবস্ত্র, তৈলবীজ, গম, পাট ইত্যাদির জমার বিরুদ্ধে ব্যাংকগুলি যে ঋণ দেয় বিভিন্ন সময়ে তাহার জন্য উচ্চতর জামিন (Higher Margin) রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে এই ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিশেষ তাৎপর্য থাকা সত্ত্বেও অনেকের মতে ইহার কার্যকারিতা অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও খুবই সীমাবদ্ধ এবং এই ব্যাপারে ভারতের ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা একই প্রকারের। দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সহযোগে ইহা ব্যবহার না করিলে ইহার কার্যকারিতা আশানুরূপ হয় না।*

৫। প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

পঞ্চমত, আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবেও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছে—লাইসেন্সভুক্ত ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর ঋণপ্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এইরূপ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণকে ঋণ-বরাদ্দ (rationing of credit) বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই ঋণ-বরাদ্দ নীতির আর একটি দিক হইল রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক তপশীলী ব্যাংকগুলিকে প্রদত্ত ঋণের 'কোটা' (quota) ব্যবস্থা। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলী ব্যাংকগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে 'কোটা' নির্ধারণ করিয়া দেয়। তপশীলী ব্যাংকগুলি ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ বা 'কোটা' পর্যন্ত ঋণ ব্যাংকের বাট্টাহারেই (শতকরা ৪ ভাগ) পাইয়া থাকে। 'কোটা'র অতিরিক্ত শতকরা ২০০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করিলে বাট্টাহারের অতিরিক্ত শতকরা ১ ভাগ (অর্থাৎ ৫ টাকা হারে) এবং শতকরা ২০০ ভাগের উপর ঋণ গ্রহণ করিলে বাট্টাহারের অতিরিক্ত শতকরা ২ ভাগ (অর্থাৎ শতকরা ৬ টাকা হারে) সুদ দিতে হয়। এই তিন-পর্যায়ের সুদ-ব্যবস্থাকে (three-tier borrowing rates) সমবায় ও ক্ষুদ্র শিল্পকে ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়।

তপশীলী ব্যাংকগুলিতে প্রদত্ত ঋণের কোটা

এই 'কোটা' ও সুদ-ব্যবস্থার আংশিক পরিবর্তন করা হয় ১৯৬২ সালের জুলাই ও নভেম্বর মাসে; এবং শেষ পরিবর্তন করা হয় ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে। ঐ সময় ঋণ-পদ্ধতির জটিলতা দূর করিবার জন্য দুই-পর্যায়ের সুদ-ব্যবস্থা চালু করা হয়। ইহা স্থির হয় যে, রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তপশীলী ব্যাংকগুলির যে 'আইনানুগ জমা' থাকে উহার শতকরা ৫০ ভাগ পরিমাণ ঋণ ব্যাংক-রেটে—অর্থাৎ, শতকরা ৪½ টাকায় পাওয়া যাইবে, এবং উহার পরবর্তী শতকরা ৫০ ভাগ ঋণের উপর সুদের হার হইবে শতকরা ৬ টাকা। রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ইহার অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করা

* Dr. S. N. Sen, *Central Banking in Underdeveloped Money Markets* (Chap. 9); Dr B. Dutta, *Essays in Plan Economics (1963)*

হইলে 'শাস্তিমূলক সুদের হার' (penal rates of interest) প্রয়োগ করা হইবে। অবশ্য পূর্বের ন্যায় সমবায় ও ক্ষুদ্র শিল্পকে যে ঋণ দেওয়া হয় সেখানে এই ব্যবস্থা আংশিক শিথিল করা হইবে। প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের প্রয়োজনের জন্যই এই পরিবর্তন করা হইয়াছে।

৬। নৈতিক প্রণোদন

ষষ্ঠত, ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য 'নৈতিক প্রণোদন' (moral suasion) ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের বিভিন্ন সময় ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতির বিপদ, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর বিভিন্ন ব্যাংকের নিকট লিখিত বার্তা প্রেরণ করেন।

যাহা হউক, মোটামুটিভাবে বলা যায়, নূতন নূতন ব্যবস্থা সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণ এখন পর্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠে নাই। কারণ, টাকাকড়ির অসংগঠিত বাজার ইহার বিশেষ কর্তৃত্বাধীন নহে। তবে সংগঠিত টাকাকড়ির বাজারের পরিধি দিন দিন বিস্তৃততর হইতেছে এবং অসংগঠিত বাজারও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিতেছে বলিয়া এই প্রকার ঋণ-নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।*

পরিকল্পনাধীন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ নীতি

(Credit Control Policy of the Reserve Bank during the Plan Period) : উপরি-বর্ণিত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, প্রথম দুইটি পরিকল্পনাধীন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের চিরন্তন অর্থসংক্রান্ত ও ঋণনীতির (monetary and credit policy) আমূল পরিবর্তন ঘটে। পরিকল্পনার পূর্বে ভারতের অর্থসংক্রান্ত নীতির দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল : আইনানুগ বিনিময়-হার রক্ষা করা এবং টাকার চাহিদার ঋতুগত উঠানামা (seasonal fluctuation) প্রতিহত করা। কিন্তু পরিকল্পনার কার্য সুরু হইতেই প্রয়োজন দেখা দিল উন্নয়নমূলক অর্থসংক্রান্ত নীতির। পরিকল্পনাধীন সময়ে বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় রিজার্ভ ব্যাংক যে-ঋণনীতি গ্রহণ করে তাহাকে 'নিয়ন্ত্রণমূলক সম্প্রসারণ' (controlled expansion) বা 'স্থায়িত্ব রক্ষা করিয়া উন্নয়ন' (development with stability) নীতিরূপে অভিহিত করা হয়। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পরিকল্পনাধীন সময়ে একদিকে যেমন প্রয়োজন পড়ে মুদ্রাস্ফীতি দমনের জন্য ফটকা-ঋণের (speculative credit) সংকোচন, অন্যদিকে তেমনি আবশ্যক হয় পরিকল্পনার কার্যের জন্য 'উন্নয়নমূলক ঋণের (development credit) সম্প্রসারণ। অত্যাবশ্যকীয় বস্তু ও শেয়ার লইয়া যাহাতে ফটকা-কারবার না চলে এবং ঐ সমস্ত অবাঞ্ছিত ক্ষেত্রে যাহাতে ক্রেডিট না যাইতে পারে, তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হয় ঋণ-সংকোচনের। আবার কৃষি, সমবায়, ক্ষুদ্রশিল্প, বাণিজ্য

নিয়ন্ত্রণমূলক সম্প্রসারণ নীতি

* Dr. B. K. Madan, *The Role of Monetary Policy in a Developing Economy*

ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ-ঘাটতির জন্য যেন উন্নয়নকার্য যাহাতে ব্যাহত না হয় তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক এই সব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করে ঋণ-প্রসারের। এই উদ্দেশ্য দ্বারাই পরিচালিত হইয়া রিজার্ভ ব্যাংক পরিকল্পনাধীন সময়ে উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলি দ্বারা ঋণ ও অর্থ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেছে।

রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ (Control of the Banking System by the Reserve Bank): এখন ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

ব্যাংক-ব্যবস্থার অন্যান্য দিক নিয়ন্ত্রণ

পূর্বে এই নিয়ন্ত্রণ ছিল অতি সংকীর্ণ। বিভিন্ন সংশোধন সহ ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন দ্বারা ইহাকে ব্যাপকতর করা হইয়াছে এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সৃষ্টি এইদিকে সহায়তা করিয়াছে। অবশ্য এই প্রসংগে ব্যাংক-ব্যবস্থা বলিতে টাকাকড়ির সংগঠিত বাজারের (Organised Sector ot the Money Market) ব্যাংকসমূহকেই বুঝায়। বর্তমানে এই সকল ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে হয় অনুমোদন না-হয় লাইসেন্স লইয়া ব্যবসায় করিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে উহার কোন শাখা স্থাপন, শাখা স্থানান্তরিকরণ বা শাখা বন্ধ করিতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাংকের সম্মতি ব্যতিরেকে দুই বা ততোধিক ব্যাংক-কোম্পানীর মধ্যে আবার সংযুক্তিসাধন করাও চলিতে পারে না।

আবার তপশীলী ব্যাংকসমূহকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট বর্তমানে তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হয়। তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকে তাহাদের গৃহীত আমানতের অনুরূপ অনুপাত হয় নগদ টাকায় রাখিতে হয়, না-হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাংক যে-কোন ব্যাংকিং কোম্পানীর পরিচালনার বিষয়ে তদন্ত করিতে পারে, নিয়োগ ও পরিচালনা সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে এবং প্রয়োজনবোধ করিলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবসায় বন্ধ রাখিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাংকের এই কর্তৃত্বের আলোচনা ব্যাংক-পতন (bank failures) এবং ব্যাংকিং আইন (banking legislation) প্রসংগে পরে আরও করা হইতেছে।

উপসংহার হিসাবে বলা যায়, সম্প্রতি টাকাকড়ির সংগঠিত বাজর ও ঋণ-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ব্যাপক হইয়া উঠিলেও টাকাকড়ির অসংগঠিত

রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ আংশিক মাত্র

বাজারের (Unorganised Sector of the Money Market) সহিত ইহার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। তবে পরোক্ষভাবে উহা রিজার্ভ ব্যাংকের উত্তরোত্তর নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিতেছে। ফলে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত টাকাকড়ির ক্ষেত্রও (the sphere of managed money) ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকার মূল্যায়ন (Evaluation of the Part played by the Reserve Bank): রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়। ইহার ২৮ বৎসরের কিছু অধিক জীবনকাল হইল নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনায় পরিপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের (Worldwide Trade Depression) অব্যবহিত পরেই মুদ্রামানে দৃঢ়তা আনয়ন ও টাকার বাজারের সংহতিসাধনের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া ইহা আবির্ভূত হয়। এই দায়িত্ব পালনের পক্ষে প্রয়োজনমত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আসিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এবং রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত হইল অকল্পনীয় অর্থসরবরাহের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন পদ্ধতিতে দেখা দিল অভাবনীয় মুদ্রাস্ফীতি। তাহার পর ঘটিল দেশবিভাগ এবং ঘটিতে লাগিল নিয়মিত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। বলা যায়, প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের জন্যই করা হইল ভারতীয় মুদ্রার মানহ্রাস (Devaluation)। মুদ্রাস্ফীতির প্রথম যুগ হইতে মুদ্রামানহ্রাস পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংককে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইল যোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বনে। অপরদিকে আবার দায়িত্ব পড়িল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা কার্যকরকরণের জন্য অর্থসরবরাহের। বর্তমানে—অর্থাৎ, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার তৃতীয় পর্যায়ে (third phase of planned economy) অর্থসরবরাহের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের (price stabilisation) দায়িত্ব।* সুতরাং প্রকৃতপক্ষেই রিজার্ভ ব্যাংকের নাতিদীর্ঘ জীবনকে দায়িত্বপূর্ণ ও সমস্যাবহুল বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

রিজার্ভ ব্যাংকের স্বল্পকালীন বৈচিত্র্যময় জীবন

রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব

উক্ত দায়িত্বসমূহ পালন ও সমস্যাসমূহের সমাধানে রিজার্ভ ব্যাংক কি পরিমাণে সমর্থ হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, ইহা টাকার বাজারে স্বল্পকালীন সুদের হারে সংকোচ-প্রসার বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের পূর্বে স্বল্পকালীন সুদের হার শতকরা ৭ হইতে ৯ এর মধ্যে উঠানামা করিত। বর্তমানে ইহা শতকরা ৩½ হইতে ৫-এর মধ্যে উঠানামা করে। দ্বিতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংক অর্থ স্থানান্তরিকরণের ব্যয়হ্রাসে বহু পরিমাণে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুদের হারে অনেকটা সমতা আসিয়াছে। তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা সরকারী ঋণের (Public Debt) পরিচালনা বিশেষ সার্থক হইয়াছে। খোলা বাজারে কারবার পদ্ধতিতে ইহা সরকারী ঋণপত্রের বাজারের সুসংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে। চতুর্থত, অতীতে না হইলেও বর্তমানে টাকাকড়ির সংগঠিত বাজারের উপর ইহার

রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক দায়িত্ব পালন :

সফলতার বিভিন্ন ক্ষেত্র

* পরবর্তী অধ্যায় দেখ।

কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাট্টাহার, নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (selective credit control), আমানত আবদ্ধ করা (impounding of deposits) বা জমার অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি, নূতন ঋণ-বরাদ্দ ব্যবস্থা এবং ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (বিভিন্ন সংশোধনসহ) প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতাবলে ইহা ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাংক-ব্যবস্থায় দৃঢ়তা আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আবার, বর্তমানে ইহা 'নিয়ন্ত্রণমূলক সম্প্রসারণ' ঋণনীতির দ্বারা ব্যাংক-ঋণের যথাযোগ্য বণ্টন ও ব্যবহারের প্রচেষ্টা করিতেছে। প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনার জন্য যাহাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায় তাহার জন্য ইহা সরকারকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেছে। পঞ্চমত, কৃষিঋণের ক্ষেত্রেও রিজার্ভ ব্যাংকের অবদান আছে। অতীতে ইহা নানাভাবে সমবায় আন্দোলনকে সহায়তা করিয়াছে। সম্প্রতি আবার এই বিষয়ে ব্যাপকতর প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে। ষষ্ঠত, রিজার্ভ ব্যাংক শিল্প-অর্থ করপোরেশন, রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন, পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়া শিল্পোদ্যোগেও ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই অর্থসরবরাহ করপোরেশনগুলিকে ইহা ঋণপ্রদানও করিতেছে। সপ্তমত, সরকারকে ইহা ঘাটতি ব্যয়জনিত বিরাট 'ঋণ'* সরবরাহ করিয়াও মূল্যস্তরকে আয়ত্তের বাইরে যাইতে দেয় নাই। পরিশেষে, ১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক এক 'বিল বাজার পরিকল্পনা' (Bill Market Scheme) গ্রহণ করিয়া ইহাকে কার্যকর করিয়াছে। ইহার ফলে ভারতে বিলের বাজার কতকাংশে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার নিয়মিত গবেষণা চালাইয়া এবং গবেষণাকার্যের ফলাফল প্রচার করিয়া রিজার্ভ ব্যাংক সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে বলা যায়।

অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাংকের বিরুদ্ধে সমালোচনাও না করিলে চলে না। প্রথম বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল, রিজার্ভ ব্যাংক দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে কর্তৃত্বাধীনে আনিতে পারে নাই; ফলে টাকাকড়ির অসংগঠিত বাজার এবং সংগঠিত বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনও সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ১৯৫২ সালের পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংক ভারতে বিল বাজার গঠনের কোন প্রচেষ্টা করে নাই। ফলে ইহা শিল্পবাণিজ্যকে কাম্যভাবে অর্থসরবরাহ করিতে সমর্থ হয় নাই। তৃতীয়ত, ভারতের মুদ্রাস্ফীতির জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে অনেকাংশে দায়ী করা চলে। যুদ্ধের সময় ইহা সরকারী যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং সরকারী নির্দেশমত ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলির প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে রক্ষা করিতে বিশেষ প্রচেষ্টা করে নাই। অবশ্য ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ফলে এই সকল

ব্যর্থতার বিভিন্ন ক্ষেত্র

* ঘাটতি ব্যয়কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণও বলা হয়।

বিনিময় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছে ; কিন্তু ইহাতে ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। পঞ্চমত, ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর হইতে রিজার্ভ ব্যাংক অন্তত তপশীলী ব্যাংক-পতনের দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে সংক্রামক হারে ব্যাংক ফেল পড়ে, এবং এখন ব্যাংক ফেল পড়া অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই। ইহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক যে একাংশে দায়ী, সে-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নাই। ব্যাংকিং কোম্পানী আইনবলে রিজার্ভ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের প্রভৃত ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যাংক ফেল পড়িতেছে, ইহাই বিশেষ পরিতাপের বিষয়। পরিশেষে, রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগের কিছু অবদান থাকিলেও ইহা এখনও পর্যন্ত কৃষিঋণ-ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ভারতের সমবায় আন্দোলন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহার জন্য আংশিকভাবে রিজার্ভ ব্যাংককেই দায়ী করা চলে। তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৃষিঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, ত্রুটিবিচ্যুতি এবং অসফলতার বিষয় ধরিলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে রিজার্ভ ব্যাংক ইহার ২৮ বৎসরের জীবনকালের মধ্যে অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। যদি ইহাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ প্রভৃতি বিরাট প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা বহুগুণ অধিক সার্থকতায় রূপায়িত হইত। সুতরাং অন্তত অধ্যাপক জাথার ও বেরীর উক্তির প্রতিধ্বনি স্বচ্ছন্দেই করা চলে যে, "কার্যক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক আর্থিক স্থায়িত্ব, ব্যাংক-ব্যবস্থার সংস্কার, টাকার বাজারের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন ব্যাপারে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।" এইভাবে সূচিত অধ্যায় যাহাতে সুসংগঠিত হয় আমানত-বীমা (Deposit Insurance) প্রভৃতি নূতন নূতন ব্যবস্থার মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাংক সে-প্রচেষ্টাও করিয়া চলিয়াছে। উপরন্তু, ইহাকে স্বল্লোন্নত দেশের উন্নয়নমুলক অর্থ-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজনীয় কার্য করিতে হইতেছে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ইহাকে স্থায়িত্ব রক্ষা করিয়া উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ইহাকে যে-অর্থসংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে উহাকে আরও প্রসারিত করিতে হইবে এবং উহার পরিপূরক হিসাবে নানা প্রকারের প্রত্যক্ষ ও রাজস্বসংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিতে হইবে।* অবশ্য ইতিমধ্যেই, রিজার্ভ ব্যাংকের ভূতপূর্ব গভর্নরের মতে, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন উভয় প্রকার কার্যের এজেন্সী হিসাবে ইহার ভূমিকা বিশেষ সার্থক হইয়াছে।**

* Dr. B. Dutta, ***Essays in Plan Economics*** (1968) P. 190

** Iengar, ***Some Reflections on our Domestic Economy***

ব্যাংক-পতন এবং ব্যাংকিং আইন (Bank Failures and Banking Legislation) : ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পতনের হার অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস হইবার পূর্বে ব্যাংক-পতন একরূপ সংক্রামকই ছিল। বর্তমানে ইহা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইলেও ইহার এখনও অবসান ঘটে নাই। বস্তুত, ব্যাংক-পতনের হার ১৯৬০ সাল অবধি আশংকাজনক ছিল। ঐ ১৯৬০ সালে লক্ষ্মী ব্যাংক ও পালাই ব্যাংক—এই দুইটি তপশীলী ব্যাংকের পতন বিশেষ আতংকের সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে সুরু করিলে দেখা যায় ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৪ সালের মধ্যে ১৬১টি ব্যাংক ফেল পড়িয়াছিল ; ১৯৩৮-৪০ সালের মধ্যে ব্যাংকের পতনসংখ্যার বাৎসরিক গড় ছিল ৬৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন ১৯৪০ সাল হইতে পতন বেশ কিছুটা প্রশমিত হইয়াছিল ; কিন্তু যুদ্ধের পর ইহা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়।

কারণ : যুদ্ধোত্তর যুগে সর্বাধিক ব্যাংকের পতন ঘটে পশ্চিমবংগ ও পাঞ্জাবে। পশ্চিমবংগে ১৯৪৮-৫১ সাল—এই চারি বৎসরের মধ্যে ৮৬টি ব্যাংকের পতন ঘটিয়াছিল। ভারতে অস্বাভাবিক ব্যাংক-পতনের কারণসমূহকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, (ক) আভ্যন্তরীণ কারণ (internal causes), এবং (খ) অকল্পিত কারণ (adventitious causes)।

আভ্যন্তরীণ কারণসমূহ যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির ত্রুটিপূর্ণ কার্যপরিচালনার মধ্যেই অল্পবিস্তর নিহিত। যৎসামান্য মূলধন লইয়া কার্যারম্ভ, লভ্যাংশ বিতরণে উৎসাহ কিন্তু রিজার্ভ সংগঠনে অনাগ্রহ, অযথা শাখাপ্রশাখা বিস্তার, অযৌক্তিকভাবে

ক। আভ্যন্তরীণ কারণ

ঋণপ্রদান ও বিনিয়োগ, অনভিজ্ঞ কর্মচারী লইয়া পরিচালনা, বেআইনীভাবে হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির একরূপ বৈশিষ্ট্য হিসাবেই পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের জন্য অনেক ব্যাংক সামান্য আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা পতনের সম্মুখীন হয়। ১৯৬০ সালে উক্ত দুইটি তপশীলী ব্যাংকেরই পতনের কারণ ছিল মূলত আভ্যন্তরীণ।

অকল্পিত কারণ বলিতে এমন ঘটনাবলীকে বুঝায় যাহাদের আশংকা মোটেই বা বিশেষ করা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, দেশবিভাগ ও ১৯৪৬ সালে

খ। অকল্পিত কারণ

কলিকাতার শেয়ার বাজারের সংকটের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের আশংকা স্বাভাবিক সময়ে করিতে পারা যায় নাই ; অথচ ইহাদের জন্য ছোট ছোট ব্যাংককে জীবনসংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

পশ্চিমবংগে ব্যাংক-পতনের কারণানুসন্ধান করিবার জন্য পশ্চিমবংগ সরকার একটি কমিটি (N. N. Law Committee) নিয়োগ করে। কমিটির রিপোর্টে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, অকল্পিত কারণ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ

পরিচালনাগত ত্রুটিই পশ্চিমবংগের সংক্রামক ব্যাংক-পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এই অভিমত অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি বহু পূর্বেই প্রদান করিয়াছিল। ফলে প্রচেষ্টা চলিতেছিল একটি ব্যাংক-আইন প্রণয়নের। ১৯৪৯ সালে এই ব্যাংক-আইন বা ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস করা হয়। ইহার পর বারবার সংশোধন দ্বারা এই আইনের পরিধিকে বহু পরিমাণে ব্যাপকতর করা হইয়াছে।

ব্যাংকিং আইন (Banking Legislation) : কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাংক সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টা করা হয় ১৯৩৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন (Indian Companies Act, 1936) সংশোধন করিয়া। এই সংশোধনে নিবদ্ধ করা হয় যে, ব্যাংকিং কোম্পানীগুলি শুধু ব্যাংক-ব্যবসায়েই লিপ্ত থাকিবে এবং ব্যাংকিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী নিয়োগ নিষিদ্ধ হইবে। ইহা ছাড়া আদায়ীকৃত মূলধন (paid-up capital), রিজার্ভ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আরও কতকগুলি ধারা লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল, ভারতীয় কোম্পানী আইনের উক্ত ধারাগুলি পর্যাপ্ত ও কার্যকর নহে। ফলে প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল এক ব্যাপক ব্যাংকিং আইন প্রণয়নের। কিন্তু যুদ্ধের দরুন এ-প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। অবশেষে ১৯৪৪ সালে একটি ব্যাপক ব্যাংকিং বিল পার্লামেণ্টে আনয়ন করা হয়। নানা বাধাবিপত্তির পর এই বিলই ১৯৪৯ সালে পাস হইয়া ব্যাংকিং কোম্পানী আইন নামে অভিহিত হয়।

১৯৩৬ সালে কোম্পানী আইনে ধারা নিবদ্ধ-করণ

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) : ব্যাংকিং কোম্পানী আইন হইল ব্যাংক-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ব্যাপকতম বিধি। ইহাতে এই বিষয় সংক্রান্ত সকল আইন ও অর্ডিন্যান্স—যথা, কোম্পানী আইনের ধারা, ১৯৪৬ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী (পরিদর্শন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৮ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের প্রথমেই ব্যাংকিং কোম্পানী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য 'ব্যাংকিং' শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ঋণপ্রদান বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণই 'ব্যাংকিং' বলিয়া অভিহিত। যে-প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং-এর কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে তাহাই 'ব্যাংকিং কোম্পানী'।

আইনের বিবিধ বিধান

কয়েকটি অনুমোদিত ব্যাংক (Certain Approved Banks) ব্যতীত প্রত্যেক ব্যাংকিং কোম্পানীকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়া ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইবে। এইভাবে অনুমোদিত অথবা লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইলে কোন প্রতিষ্ঠান 'ব্যাংক', 'ব্যাংকার' অথবা 'ব্যাংকিং' শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবে না।

তারপর আছে ব্যাংকিং কোম্পানীগুলি কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যবসায় করিতে পারিবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে পারিবে না সে-সম্বন্ধে ব্যবস্থা। যথা, ইহারা ঋণগ্রহণ করিতে পারিবে, হুণ্ডি লইয়া কারবার করিতে পারিবে, এজেন্সীর কার্য

করিতে পারিবে কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া প্রত্যক্ষ ব্যবসায় (direct trading) করিতে পারিবে না, ইত্যাদি।

ব্যাংকিং কোম্পানীর পরিচালনা সম্পর্কে কয়েকটি সুস্পষ্ট বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। যথা, ব্যাংকিং কোম্পানীকে ম্যানেজিং এজেন্সীর হস্তে দেওয়া চলিবে না, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ব্যাংকের পরিচালক অথবা চাকরিয়া দ্বারা পরিচালিত হইবে না, ইত্যাদি।

প্রত্যেক ব্যাংকিং কোম্পানীর পক্ষে অন্যূন ৫০ হাজার টাকার মূলধন থাকিতে হইবে। ১৯৬২ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী (সংশোধন) আইনে ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ বর্ধিত করা হইয়াছে। ঐ সংশোধন আইন কার্যকর হওয়ার পর যে-সব ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম ব্যাংকিং ব্যবসায় সুরু করিবে উহাদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম আদায়ীকৃত মূলধন হইবে ৫ লক্ষ টাকা। কোন ব্যাংক যদি ভারতের বাহিরে সংঘবদ্ধ (incorporated) হয় তবে ইহার পক্ষে মোট ভারতে আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ অন্তত ১৫ লক্ষ টাকা হইতে হইবে। এইরূপ ব্যাংকের আবার কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে শাখা থাকিলে মোট মূলধনের পরিমাণ হইবে ২০ লক্ষ টাকা। মূল আইনে ভারতে সংঘবদ্ধ ব্যাংকিং কোম্পানীগুলির মূলধনের নিম্নতন মাত্রা সম্বন্ধেও নির্দেশ দেওয়া আছে। নিম্নের ছকটি হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাংকের মূলধনের নিম্নতন মাত্রা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে :

ব্যাংকিং কোম্পানীর ধরন	আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের ন্যূনতম পরিমাণ
(১) ভারতের বাহিরে সংঘবদ্ধ ব্যাংক	১৫-২০ লক্ষ টাকা (কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে শাখা থাকিলে ২০ লক্ষ টাকা, নচেৎ ১৫ লক্ষ টাকা)
(২) কলিকাতা বা বোম্বাই শহর সমেত একাধিক রাজ্যে শাখাসমন্বিত ভারতে সংঘবদ্ধ ব্যাংক	১০ লক্ষ টাকা
(৩) কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে একটি করিয়া শাখা সমেত পশ্চিমবংগ অথবা বোম্বাই রাজ্যে (একাধিক রাজ্য নহে) সকল শাখাসমন্বিত ব্যাংক	৫ লক্ষ টাকা এবং কালকাতা বা বোম্বাই শহরের বাহিরে প্রতিটি শাখার জন্য ২৫ হাজার টাকা করিয়া
(৪) কলিকাতা বা বোম্বাই শহর ছাড়া একাধিক রাজ্যে শাখাসমন্বিত ব্যাংক	৫ লক্ষ টাকা
(৫) একই রাজ্যে সকল শাখা-সমন্বিত কিন্তু কলিকাতা বা বোম্বাই-এ শাখা নাই এইরূপ ব্যাংক	১ লক্ষ টাকা হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা (রাজ্যের বিভিন্ন জিলায় শাখা থাকিলে ১ লক্ষের উপর ৩৫ হাজার টাকা)

প্রত্যেক ব্যাংকের বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ অনুমোদিত মূলধনের অন্তত অর্ধেক হইবে; এবং আদায়ীকৃত মূলধন বিলিকৃত মূলধনের অন্তত অর্ধেক হইবে।

মূল আইনানুযায়ী প্রত্যেক তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তাহার চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ জমা রাখিতে হইত। কিন্তু বর্তমানে রাখিতে হয় চলতি ও স্থায়ী মোট আমানতের শতকরা ৩ ভাগ। তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকেও তাহাদের আমানতের অনুরূপ অংশ হয় নগদে না-হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়।

প্রত্যেক ব্যাংককে দিনের শেষে বর্তমানে তাহার চলতি ও স্থায়ী আমানতের অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ নগদ টাকায়, স্বর্ণে ও অনুমোদিত ঋণপত্রে নিজের কাছে রাখিতে হইবে। পূর্বে রাখিতে হইত শতকরা ২০ ভাগ।* অন্যদিকে ভারতে গৃহীত আমানতের তিন-চতুর্থাংশ ভারতেই রাখিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত ব্যাংকিং কোম্পানীগুলি ব্যাংকিং-এর আনুষংগিক কার্য ছাড়া কোন ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিবে না।

আইনে রিজার্ভ ব্যাংককে প্রদত্ত ক্ষমতা

তারপর আছে রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারাবলী। এই সকল ধারায় রিজার্ভ ব্যাংককে ব্যাংকিং কোম্পানীগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মূল আইনের ৫৫টি ধারার মধ্যে ২৭টি ছিল রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বের সহিত সম্পর্কিত। এই সকল ধারার বলে রিজার্ভ ব্যাংক জরুরী অবস্থায় ব্যাংকিং কোম্পানী আইন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে, কোন ব্যাংককে মূলধন সংক্রান্ত বাধানিষেধ হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিতে পারে। কোন ব্যাংকের কার্যপরিচালনা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া উহার ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করিতে পারে, ইত্যাদি। অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত নূতন শাখা স্থাপন বা কার্যালয় স্থানান্তরিকরণ করা চলে না, বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সংযুক্তিসাধন করা চলে না, ব্যাংকিং-এর আনুষংগিক ছাড়া অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্য সুরু করা যায় না। প্রত্যেক ব্যাংককে নিয়মিতভাবে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হিসাবনিকাশ ও রিপোর্ট দাখিল করিতে হয়। হিসাব-নিকাশ ও রিপোর্ট বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে রিজার্ভ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং কোম্পানীকে সতর্ক করিয়া দিতে পারে—এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করিয়া ব্যাংকের আমানত গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকিং কোম্পানীগুলির ঋণপ্রদান নীতিকে বহু পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ।

ব্যাংক বন্ধকরণ

পরিশেষে, ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে আদালতের আদেশক্রমে ব্যবসায় স্থগিত রাখা, ব্যাংক উঠাইয়া দেওয়া বা বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সংযুক্তিসাধন সম্বন্ধে কতকগুলি ধারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে।

---

* ব্যাংকিং কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ১৯৬২

আদালতকে এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংকের মতামত গ্রহণ করিতে হয়।

ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের সংশোধন

এ পর্যন্ত ব্যাংকিং কোম্পানী আইন বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের সংশোধন দ্বারা সংযুক্তিসাধনের পদ্ধতির মধ্যে সরলতা আনয়ন করা হয় এবং আদালতের মাধ্যমে ছাড়াও সংযুক্তি-সাধনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৩ সালের সংশোধন দ্বারা দেউলিয়া-পদ্ধতিকে সরল করা হয়। দেউলিয়া হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ আদায়কার্য এখন অনেক সরল ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যায়।

১৯৫৬ সালে ব্যাপক সংশোধন

ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ব্যাপক সংশোধন পাস করা হয় ১৯৫৬ সালে। এই ব্যাপক সংশোধন দ্বারা কয়েকজনের হস্তে শেয়ার কেন্দ্রীভূতকরণের মাধ্যমে পূর্বে ভোটাধিকারের যে-অপব্যবহার করা হইত তাহা রহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, মূল আইনে ব্যবস্থা ছিল যে একই ব্যক্তি একাধিক ব্যাংকিং কোম্পানীর পরিচালক হইতে পারিবে না। ১৯৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কয়েকটি বা কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যদি কোন ব্যাংকের শতকরা ২০ ভাগ ভোটদানে অধিকারী হয় তবে ঐ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে ঐ ব্যাংকের পরিচালক নিযুক্ত করা চলিবে না, এবং কোন ব্যাংকের মুখ্য পরিচালক (Managing Director) অথবা মুখ্য কার্যনির্বাহক (Chief Executive Officer) নিযুক্ত করিবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বানুমতি লইতে হইবে। সংশোধনী আইনে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের পারিশ্রমিক অত্যধিক বলিয়া মনে করিলে রিজার্ভ ব্যাংক ঐ পারিশ্রমিক প্রদান রহিত করিতে বা কমাইয়া দিতে পারে। ইহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকিং কোম্পানীর কার্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়া রিপোর্ট প্রকাশের জন্য নিরীক্ষক (observers) নিয়োগ করিতে পারে। নিরীক্ষকের রিপোর্টের ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাংক লাইসেন্সভুক্ত যে-কোন ব্যাংককে পরিচালনায় পরিবর্তন সংঘটিত করিতে নির্দেশ দিতে পারে।

১৯৫৯, '৬০ ও '৬১ সালের সংশোধনসমূহ

পরবর্তী ১৯৫৯ সালের সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংককে ভারতীয় ব্যাংক-সমূহের বৈদেশিক শাখাগুলি পরিদর্শনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সংশোধন দ্বারা ব্যাংক ফেল পড়িলে আমানতকারীদের অর্থ দ্রুত প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সংশোধন যখন পাস করা হইতেছিল তখনই পালাই ব্যাংকের পতন ঘটে। ইহার কয়েক মাস পূর্বেই লক্ষ্মী ব্যাংকের পতন ঘটিয়াছিল। এইভাবে ব্যাংক-পতন যাহাতে ব্যাংক-ব্যবস্থায় বিশৃংখলা আনয়ন না করে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ৪৫ ধারা (Sec. 45) বলে ব্যাংকগুলির পুনর্গঠন এবং আবশ্যিক সংযুক্তিকরণের

(compulsory amalgamation) এক কার্যক্রম প্রস্তুত করে। এই কার্যক্রম অনুসরণে আইনগত অসুবিধা দেখা দেওয়াতেই ১৯৬১ সালের সংশোধন পাস করা হয়। এই সংশোধন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক যে-কোন ব্যাংকিং কোম্পানীকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বা উহার অধীনস্থ ব্যাংকের (State Bank and its Subsidiaries) অন্তর্ভুক্ত করিবার এবং দুই-এর অধিক ব্যাংকিং কোম্পানীর সংযুক্তিসাধন করিবার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে।*

সর্বশেষ সংশোধন করা হয় ১৯৬২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে। এই সংশোধনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, স্থির করা হয় যে, সংশোধনটি কার্যকর হওয়ার পর কোন ব্যাংকিং কোম্পানী সর্বপ্রথম কার্য সুরু করিলে উহার ন্যূনতম আদায়ীকৃত মূলধন হইতে হইবে ৫ লক্ষ টাকা। পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ব্যাংকিং কোম্পানী দিনের শেষে তাহাদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ (পূর্বে ছিল শতকরা ২০ ভাগ) নগদ টাকায়, স্বর্ণে ও অনুমোদিত ঋণপত্রে নিজের কাছে জমা রাখিবে। ইহার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হইবে। তৃতীয়ত, দেখা গিয়াছে যে, ১৯৫০ ও ১৯৬০ সালের মধ্যে আমানত যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে মূলধন তহবিল সে-পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। ব্যাংক-ব্যবস্থার সুসংগঠনের দিক দিয়া ইহা অকাম্য বিবেচিত হওয়ায় সংশোধন দ্বারা স্থির করা হয় যে, ভারতীয় ব্যাংকিং কোম্পানীসমূহকে তাহাদের রিজার্ভের পরিমাণ প্রাপ্ত মূলধনের সমান হইলেও মুনাফার অন্তত শতকরা ২০ ভাগ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখিতে হইবে। বৈদেশিক ব্যাংকসমূহকে তাহাদের ভারতীয় শাখাসমূহের মাধ্যমে লব্ধ মুনাফার অন্তত শতকরা ২০ ভাগ রিজার্ভ ফাণ্ডে স্থানান্তরিত করিবার পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ব্যাংক-ব্যবস্থা সুগঠিত করার জন্যই এই সংশোধন করা হয়।

১৯৬২ সালে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন

সমালোচনাঃ ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের তিনটি সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, অনেকের মতে, রিজার্ভ ব্যাংকের হস্তে যে-ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে তাহা অযৌক্তিক। ইহার অপব্যবহার ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। ইহার ফলে দেশে ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদ্যোগ ব্যাহত হইবে। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংকের হস্তে উক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যখন যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির প্রধানত আভ্যন্তরীণ পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য পতন ঘটিতেছিল এবং যখন ইহার ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর লোক বিশ্বাস ক্রমেই হারাইয়া ফেলিতেছিল তখন রাষ্ট্রায়ত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বতই ব্যাংক-ব্যবস্থার সতর্ক প্রহরী (watchdog of the banking system) হিসাবে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

রিজার্ভ ব্যাংককে অযৌক্তিকভাবে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে

---
* Trend and Progress of Banking in India during 1961

ইহাও বলা হয় যে, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংক তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার মোটেই করে নাই; বরং অনেক ক্ষেত্রে উহা ব্যাংকিং কোম্পানীগুলিকে আইনের কঠিন সর্তাবলীর দায় হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিয়া পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই

দ্বিতীয়ত, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই বলিয়াও সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ভারতে টাকাকড়ির অসংগঠিত বাজার ও সংগঠিত বাজারের মধ্যে সংগতিসাধন না করিয়া দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের আওতায় আনিলে আইনকেই কার্যকর করা দুষ্কর হইত। ফলে সমগ্র টাকার বাজারেই বিশৃংখলা দেখা দিত। সুতরাং অযৌক্তিক কিছু করা হয় নাই; অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আইনের অসফলতা

তৃতীয়ত, বলা হয় যে, ব্যাংকিং কোম্পানী আইন-প্রদত্ত প্রভূত ক্ষমতা সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংক-পতন রোধ করা সম্ভব হয় নাই। এ-সম্পর্কে ব্যাংক-কর্তৃপক্ষের অভিমত হইল যে, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব নহে। "রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সুপরিচালনা নিশ্চিত করিতে পারে না।"* তবে ব্যাংক ফেল পড়িলে যাহাতে আমানতকারিগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তাহাদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। এই অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান হইল আমানত-বীমা (Deposit Insurance)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণে বর্তমানে ভারতে এই আমানত-বীমা প্রবর্তিত হইয়াছে।

অন্যান্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

আমানত-বীমা পরিকল্পনা (Deposit Insurance Scheme)ঃ বলা হইয়াছে, আমানত-বীমা প্রবর্তিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক-ব্যবস্থা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংক লইয়া গঠিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রামক হারে ব্যাংক ফেল পড়িতে থাকে এবং পতনের সংখ্যা আতংকজনক হইয়া দাঁড়ায় বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের পর। এই আতংক দূর করিয়া ব্যাংক-ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করিবার জন্য ১৯৩৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় আমানত-বীমা করপোরেশন (Federal Deposit Insurance Corporation) গঠন করা হয়। ক্রমশ করপোরেশনের পরিধি ব্যাপকতর করিয়া শতকরা ৯৮ জন আমানতকারীকে ইহার অধীনে আনয়ন করা হয়। এই বীমা-ব্যবস্থার ফলে ১৯৩৪-৪৯—এই ১৫ বৎসরে ব্যাংক ফেল পড়ার দরুন আমানতকারীদের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত

* Presidential Address by Iengar at the Indian Institute of Bankers, 1960

মোট আমানতের শতকরা ১ ভাগের ⅘ অংশ মাত্র নষ্ট হয় এবং ব্যাংক-পতনের হার বহু পরিমাণে রুদ্ধ হইয়া ব্যাংক-ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়। সুসভ্য দেশসমূহের মধ্যে মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। ভারতে আমানত বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বেশ কিছুদিন হইতেই চলিতেছিল। ১৯৫০ সালে গ্রামীণ ব্যাংক-ব্যবস্থা তদন্ত কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee) এবং ১৯৫৪ সালে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের জন্য অর্থসরবরাহ কমিটি (বা শ্রফ কমিটি) পরপর দুইটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া উহা প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করে। রিজার্ভ ব্যাংক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ অবশ্য তখন এই সুপারিশ কার্যকরকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। কিন্তু ১৯৬০ সালে পরপর দুইটি তপশীলী ব্যাংকের পতন ঘটায় ব্যাংক-ব্যবস্থায় যে অস্থায়িত্ব ও বিপদের সূচনা দেখা দেয় তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে অন্যান্য ব্যবস্থার সংগে আমানত-বীমার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়।

ভারতের আমানত বীমা-ব্যবস্থা

পরিকল্পনা অনুসারে পার্লামেন্টের আইনবলে একটি আমানত-বীমা করপোরেশন (Deposit Insurance Corporation) ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে গঠিত হয়। করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। ইহার সমগ্রটাই বিলি করা হইয়াছে এবং ক্রয় করিয়াছে রিজার্ভ ব্যাংক। করপোরেশনের পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর হইলেন এই পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক নিযুক্ত একটি কার্যকরী কমিটি (Executive Committee) আছে। নীতি-নির্ধারণ ব্যাপারে পরিচালকমণ্ডলী কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন।

আমানত-বীমা করপোরেশন গঠন

আমানত বীমা-ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ও প্রধান উদ্দেশ্য হইল ব্যাংক ফেল পড়িলে যাহাতে আমানতকারিগণের, বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্র আমানতকারিগণের, সঞ্চয় যেন নষ্ট না হয় তাহা দেখা। ফেল পড়া ব্যাংক আমানতকারীদের পাওনা মিটাইতে সমর্থ না হইলেও ঐ টাকা বীমা তহবিল হইতে পাওয়া যায়। ইহা সহজেই অনুমেয় যে ইহাতে আমানতকারিগণের বিশ্বাস ফিরিয়া আসে এবং সঞ্চয় ও ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পথে চলে। এই ব্যবস্থার ফলে, কোন ব্যাংক ফেল পড়িলে স্বতই অন্য ব্যাংকের উপর আমানত তুলিয়া নেওয়ার যে-চাপ ('run') পড়ে তাহা আর পড়িবে না। অবশ্য আমানত-বীমার ফলে বীমাকারী ব্যাংকসমূহের পরিচালন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, কারণ তাহাদের প্রিমিয়াম দিতে হইবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহাদের লাভ হইবে, কারণ ভবিষ্যতে তাহাদের আমানত বৃদ্ধি পাইবে। ইহাই এই ব্যবস্থার পরোক্ষ সুফল।

উদ্দেশ্য

প্রবর্তিত ব্যবস্থায় ব্যাংকিং কোম্পানী আইন অনুসারে ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে 'বাণিজ্যিক ব্যাংক' বলিয়া অভিহিত সকল ব্যাংককেই রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়া বীমা-পরিকল্পনাভুক্ত হইতে হইবে। ভবিষ্যতে যে-সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠিত হইবে তাহারাও এই পরিকল্পনাধীনে আসিবে।

কার্যপরিধি

বর্তমানে প্রত্যেক ব্যাংকের প্রত্যেক আমানতকারীর জন্য ১৫০০ টাকা পর্যন্ত বীমা-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন সরকারী আমানত বা ব্যাংকের আমানত অবশ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। অনুমান করা হইয়াছে যে, এই ব্যবস্থার ফলে মোট আমানতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সংরক্ষিত হইবে। আইনে ব্যবস্থা আছে যে প্রয়োজনবোধে এবং সংগতি অনুসারে করপোরেশন বীমার পরিধি বৃদ্ধি করিতে পারিবে। ইহাতে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতির প্রয়োজন হইবে। আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া সম্পর্কে ঠিক করা হইয়াছে যে, কোন বীমাকারী ব্যাংকের পতন ঘটিলে উক্ত ব্যাংক উহার আমানতকারীদের একটি হিসাব তিন মাসের মধ্যেই করপোরেশনের নিকট পেশ করিবে। করপোরেশন হিসাব পাওয়ার দুই মাসের মধ্যেই আমানতকারীদের বীমাযুক্ত টাকা ফেরত দিয়া দিবে।

বীমার প্রিমিয়ামের সর্বোচ্চ হার হইল বাৎসরিক প্রতি শত টাকার আমানতে ১৫ নয়া পয়সা করিয়া। বর্তমানে কিন্তু মাত্র ৫ নয়া পয়সা হারে প্রিমিয়াম ধার্য করা হইয়াছে। করপোরেশন রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাইতে পারে।

অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা

প্রিমিয়াম হইতে সংগৃহীত অর্থ আমানত-বীমা তহবিলে (Deposit Insurance Fund) জমা হয় এবং তহবিল হইতেই ব্যাংক ফেল পড়িলে আমানতকারীদের পাওনা মিটানো হয়। ইহা ছাড়া একটি সাধারণ তহবিলও (General Fund) আছে। মূলধন বিনিয়োগ করিয়া যে-আয় হয় তাহা এই সাধারণ তহবিলে জমা হয়। প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে এই সাধারণ তহবিল হইতে বীমা তহবিলে অর্থ স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংকই করপোরেশনের ব্যাংকার। করপোরেশনের অনুরোধক্রমে রিজার্ভ ব্যাংককে বীমা-ব্যবস্থাভুক্ত যে-কোন ব্যাংকের কার্যপরিচালনার তদন্ত করিতে এবং ঐ তদন্তের রিপোর্ট করপোরেশনকে প্রেরণ করিতে হয়।

রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সম্বন্ধ

আমানত বীমা-ব্যবস্থা ভারতে ব্যাংক-পতন রোধ করিতে কতখানি সমর্থ হইবে সে-বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে ব্যাংক-পতনের কারণ বহুবিধ এবং উহাদের প্রকৃতি এখনও সম্যক উপলব্ধি করা যায় নাই। এ-অবস্থায় আমানত-বীমার উপযোগিতা খুবই সীমাবদ্ধ হইবে। অনেকের মতে, ভারতীয় শিল্পপতিদের সংগে অধিকাংশ ব্যাংকগুলির মালিকানা বা পরিচালনার ব্যাপারে যে অবাঞ্ছিত যোগাযোগ থাকে তাহা হইতে

উপসংহার

ব্যাংক-ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে হইবে। ইহাদের মতে, ভারতে ব্যাংক-পতনকে অতীতের বস্তু করিতে হইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের জাতীয়করণ (nationalisation of commercial banks) প্রয়োজন।

বিল বাজার পরিকল্পনা (The Bill Market Scheme): একটি সুসংগঠিত বিল বাজারের অভাব ভারতের টাকার বাজারের অন্যতম দুর্বলতা বলিয়া গণ্য। ইহার জন্য ব্যাংকসমূহ তাহাদের স্বল্পকালীন বিনিয়োগ্য অর্থ ঠিকমত বিনিয়োগ করিতে পারিত না; এবং ইহার ফলে দেশের ঋণ-ব্যবস্থা কাম্যভাবে সংকোচন-প্রসারণশীল হইয়া উঠে নাই। সুতরাং কৃষিপ্রধান ভারতে দেখা যাইত কৃষিকার্যের সময়ে ঋণ সরবরাহের অপ্রাচুর্য এবং বাকী সময়ে বহু পরিমাণ অলস অর্থ।

বিল বাজারের গুরুত্ব

ভারতে বিল বাজার না গড়িয়া উঠার কারণানুসন্ধানে বেশীদূর যাইতে হয় না। এদেশে নগদ টাকা এবং ওভারড্রাফটের (overdrafts) মাধ্যমেই ঋণ-প্রদানের দিকে অধিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ হুণ্ডির কারবার করে বটে, কিন্তু ইহার পরিমাণ অতি সামান্য এবং প্রকৃতি বিশেষভাবে আঞ্চলিক। বিভিন্ন অঞ্চলে হুণ্ডির বাট্টা, সময় প্রভৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত আছে। ফলে যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের পক্ষে ইহাদের পুনর্বাট্টা করিতে বিশেষ অসুবিধা হয়। উপরন্তু, ভারতে কোন 'গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান'ও (Accepting Houses) নাই। ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে তাহাদের মূলধন ও গৃহীত আমানতের একটা মোটা অংশকে নগদ (liquid) অবস্থায় রাখিতে হয়। ফলে তাহারা প্রধানত সরকারী ঋণপত্রেই বিনিযোগ করে। পরিশেষে, ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সরকারীভাবে ভারতে বিল বাজার গঠনের কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই।

বিল বাজার গড়িয়া না উঠার কারণ

রিজার্ভ ব্যাংকের পরিকল্পনা (**The Reserve Bank Scheme**): ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ব্যাংকের বাট্টাহার শতকরা ৩ হইতে ৩½এ বৃদ্ধির সংগে সংগেই রিজার্ভ ব্যাংক ঘোষণা করে যে উহা আর তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে সরাসরি ঋণপত্র ক্রয় করিবে না, ঋণপত্রের জামিনে উহাদিগকে ঋণপ্রদান করিবে মাত্র। রিজার্ভ ব্যাংকের এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে ঋণ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়া পড়ার আশংকা থাকায় রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে একটি বিল বাজার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইহা হইল, বিল বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতে ঋণ-ব্যবস্থা ও টাকার বাজারের একটি প্রধান ত্রুটি দূর করা।

১৯৫২ সালের মূল পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইভাবে করা যাইতে পারে: ইহার অধীনে তপশীলী ব্যাংকসমূহ তাহাদের খাতকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত

চলতি প্রতিশ্রুতিপত্রের (demand promissory notes) একাংশকে ৯০ দিনের মধ্যে দেয় প্রতিশ্রুতিপত্রে (usance promissory notes) রূপান্তরিত করিতে পারিত। তারপর তাহারা তাহাদের নিজেদের প্রতিশ্রুতিপত্র এবং ইহার সমর্থনে ঐ রূপান্তরিত প্রতিশ্রুতিপত্র জামিন রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ব্যাংক বাট্টাহার অপেক্ষা শতকরা ½ কমে—অর্থাৎ, শতকরা ৩ টাকা সুদে (তখন বাট্টাহার ছিল শতকরা ৩½ টাকা) স্বল্পকালীন ঋণগ্রহণ করিতে পারিত। রিজার্ভ ব্যাংক আইনের ১৭ (৪) (গ) ধারা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলী ও সমবায় ব্যাংক-গুলিকে এইরূপ ঋণপ্রদান করিতে সমর্থ ছিল। অন্যভাবে বলিতে গেলে, উক্ত বিল বাজার পরিকল্পনার অধীনে বিল জামিন রাখিয়া তপশীলী ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিত, বিল পুনর্বাট্টা (rediscount) করিতে পারিত না।*

মূল পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রথমে এই বিল বাজার পরিকল্পনার সুবিধা সকল ব্যাংককে দেওয়া হয় নাই। যে-সকল ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ অন্তত ১০ কোটি টাকা মাত্র তাহারাই এই পরিকল্পনাধীনে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিত। আবার ২৫ লক্ষ টাকার কম ঋণগ্রহণ করা চলিত না, এবং প্রত্যেক বিলের অর্থের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার কম হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৫৪ সাল হইতে কিন্তু পরিকল্পনার সুযোগসুবিধা সকল তপশীলী ব্যাংককেই দেওয়া হইতেছে।** এই সালেই শ্রফ কমিটি সুপারিশ করে যে, ন্যূনতম ঋণগ্রহণের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া ১০ লক্ষ টাকায় লইয়া আসিতে হইবে এবং বিলপ্রতি ন্যূনতম অর্থের পরিমাণ হইবে ৫০ হাজার টাকা—১ লক্ষ টাকা নহে। কমিটির এই সুপারিশ গৃহীত হয়, এবং ফলে, বিল বাজার পরিকল্পনা পূর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

পরিকল্পনার প্রসার

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে বিলের বিরুদ্ধে রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণপ্রদানের সুদের হার ৩ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৩½ টাকায় করা হয়। ইহার উপর শতকরা ½ হারে ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হইত বলিয়া কার্যক্ষেত্রে বিল পরিকল্পনার অধীনে সুদের হার শতকরা ৪ টাকা হইয়া উঠে। এই কারণে প্রথমে সরকারী ঋণপত্রের বিরুদ্ধে ঋণগ্রহণের সুদের হার শতকরা ৪ টাকা এবং পরে ১৯৫৭ সালের মে মাসে ব্যাংকের বাট্টাহারও শতকরা ৪ টাকায় লইয়া যাওয়া হয়।† তবুও বিল পরিকল্পনার অধীনে সুদের হার ও বাট্টাহারের মধ্যে সমতা আসে নাই। কারণ, বিলের ক্ষেত্রে শতকরা '২ হারে

পরিকল্পনার পরিবর্তন

* *Reserve Bank—Functions and Working*

** Bill Market Scheme in Operation—Reserve Bank Bulletin, May 1958

† ১১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় এবং ফলে কার্যক্ষেত্রে সুদের হার হইয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪.২ টাকা। সম্প্রতি ব্যাংক-রেট শতকরা ৪½ টাকা হওয়াতে এই সুদের হার আরও অধিক হইয়াছে।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ১ বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে রপ্তানি বিলসমূহকেও (export bills) এই পরিকল্পনার অধীনে আনয়ন করা হয়। ক্রমশ এই পরিকল্পনার সময় বৃদ্ধি করিয়া অবশেষে ইহাকে একরূপ স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রিদপ্তর নিযুক্ত পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার (Study Team) সুপারিশ অনুসারে বর্তমানে এইরূপ বিলের মেয়াদ ৯০ দিন হইতে ১৮০ দিনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, জামিনের (security) পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে এবং কলিকাতা ও বোম্বাই-এর কার্যালয় ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি কার্যালয় হইতে পুনর্বাট্টার সুবিধা দেওয়া হইতেছে।* ১৯৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন দ্বারা রপ্তানি বিলের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার আরও প্রসার করা হয়। বর্তমানে রপ্তানিকার্য সংগঠনের জন্য ঋণপ্রদানের সময় ৯০ দিন হইতে বর্ধিত করিয়া ১৮০ দিনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংককে যে-কোন তপশীলী ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংকের একক প্রতিশ্রুতিপত্রের বিরুদ্ধেই ঋণপ্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

রপ্তানি বিলের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রসার

১৯৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন

১৯৫২ সালে বিল বাজার পরিকল্পনাধীনে তপশীলী ব্যাংকসমূহের ঋণ-গ্রহণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮১ কোটি টাকা। ১৯৫৫ সালে ইহা বাড়িয়া ২২৬ কোটি টাকায় পরিণত হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস হইতে পরিকল্পনার পরিবর্তন এবং ঋণ-নিয়ন্ত্রণের নীতি অবলম্বনের ফলে বিলের বিরুদ্ধে ঋণগ্রহণের পরিমাণ কমিয়া আসে। ১৯৬০ সালে ১২টি ব্যাংক এই পরিকল্পনাধীনে ঋণগ্রহণের সুবিধা গ্রহণ করে। ঐ সালে মোট ৫৪ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করা হইলেও কোন সময়েই তাহাদের মোট গৃহীত ঋণের পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা অতিক্রম করে নাই। ১৯৬১ সালে গৃহীত ঋণের পরিমাণ আরও কম হয়।** অতএব, বিল বাজার পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা যে পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

জনপ্রিয়তার হ্রাস ছাড়াও বিল বাজার পরিকল্পনার অন্যান্য ত্রুটির দিকে নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, বলা যায় প্রকৃত বাণিজ্যিক বিলের পরিবর্তে রূপান্তরিত প্রতিশ্রুতিপত্রের বিরুদ্ধে ঋণপ্রদান করা হয় বলিয়া এই বিল বাজার প্রকৃত বিল বাজার নহে। দ্বিতীয়ত, ইহাতে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই বলিয়া পরিকল্পনা কখনও সার্থক হইতে পারে না। তৃতীয়ত, ঋণপ্রদান করিবার সময় রিজার্ভ ব্যাংক

সমালোচনা

* Trend and Progress of Banking in India during 1961 ৩০, ১০৭ পৃষ্ঠা

** „ „ „ „ „ ১৪ পৃষ্ঠা

নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করে, যাহা ব্যাংকগুলি সকল সময় পছন্দ করে না। অনুসন্ধানের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইলে রিজার্ভ ব্যাংক ঋণপ্রদানে অস্বীকারও করে। ফলে, কার্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংকের প্রতি রিজার্ভ ব্যাংকের প্রভেদাত্মক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে, রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ-সংকোচনের নীতিকেও বিল বাজার সংকোচনের জন্য কতকটা দায়ী করা চলে।

যাহা হউক, সূচনা শুভ হইয়াছে বলা যায়। তবে ইহার পরিধি আরও বৃদ্ধি করিয়া শিল্পবাণিজ্যের একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার (Development of Banking in Rural Areas) : ভারত গ্রামময় হইলেও গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার বিশেষ প্রসার এখনও ঘটে নাই। ইহা ভারতের টাকার বাজারের অন্যতম দুর্বলতা। ভারতের গ্রামাঞ্চলে যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের শাখার সন্ধা একরূপ মিলে না বলিলেই চলে। ১৯৪৯ সালের গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা তদন্তকারী কমিটির (Rural Banking Enquiry Committee) রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতে ৫০০-এর মত জিলা বা তালুকের সদরে যৌথ পুঁজি ব্যাংকের কোন কার্যালয় ছিল না। গ্রামাঞ্চলে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকের সংখ্যা যে নগণ্য এবং সমবায় ঋণদান সমিতির সংখ্যাও যে পর্যাপ্ত নহে, কমিটি রিপোর্টে তাহারও উল্লেখ করে। অপরদিকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে, মহাজনগণ মোট গ্রামীণ ঋণের শতকরা ৭০ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। গ্রামীণ মহাজনের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে, সে-সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।*

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা কতদূর প্রসারিত

নানা দিক দিয়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। প্রথমত, কৃষি ভারতের প্রধানতম উপজীবিকা, অথচ অন্যান্যের মধ্যে মূলধনের সমস্যার জন্য কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া আছে। কৃষিকার্যে ও কৃষিজ পণ্যের বাজারিকরণে পর্যাপ্ত মূলধন যোগান দেওয়া কৃষির উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য সর্ত। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের স্বভাব গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। তাহা না হইলে দেশের আর্থিক উন্নয়নে প্রয়োজনমত অর্থ পাওয়া যাইবে না। তৃতীয়ত, নগরাঞ্চলের তুলনায় বর্তমান গ্রামাঞ্চলের আয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধন না ঘটিলে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে সঞ্চয়-সংগ্রহের পরিমাণ কমিয়াই যাইবে ; এবং স্বতই আর্থিক উন্নয়ন ব্যাহত হইবে।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রসার-সাধনে গুরুত্ব

* প্রথম খণ্ডের ১০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

এইভাবে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯ সালের শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া ইহার উপর গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার দেয়। এই কমিটি উপরি-উক্ত গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা তদন্তকারী কমিটি। ইহার পূর্বেই অবশ্য গ্যাড্গিল কমিটি

অবলম্বনীয় পন্থা সম্পর্কে সুপারিশ

(Gadgil Committee on Rural Finance), সারাইয়া কমিটি (Saraiya Committee on Cooperative Planning) প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও পন্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করিয়াছিল। এই সকল কমিটির মূল সুপারিশগুলি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল:

(ক) গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক-ব্যবস্থা শুধু ব্যাংকিং-এর সাধারণ সুযোগসুবিধাই প্রদান করিবে না; ইহাকে কৃষির ক্ষেত্রেও অর্থ সরবরাহ করিতে হইবে।

(খ) নূতন শাখা উদ্বোধন, চেক-পদ্ধতির প্রবর্তন প্রভৃতির দ্বারা পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকের উপকারিতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অনেক স্থলে ভ্রাম্যমাণ সেভিংস ব্যাংকেরও প্রচলন করা যাইতে পারে।

(গ) ধীরে ধীরে বর্তমান ট্রেজারী-ব্যবস্থার (treasury system) বিলোপ-সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ, বর্তমানে সরকারী ট্রেজারীর মাধ্যমে যে-সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তাহাদের ভার ক্রমবর্ধমান হারে রিজার্ভ ব্যাংক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের শাখাগুলির উপর অর্পণ করিতে হইবে। ইহার ফলে নগদ টাকা লইয়া কারবার কমিয়া যাইবে এবং চেকের প্রচলন বৃদ্ধি পাইবে।

(ঘ) সরকারের পক্ষে কিছু সুযোগসুবিধা প্রদান দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপনে উৎসাহিত করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি মোটামুটি কার্যকর করা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে নাই। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপনের জন্য কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এ-বিষয়ে

উপরি-উক্ত পন্থাসকল বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই

তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। মূলত ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণের স্বল্পতা, সহজ বিক্রয়যোগ্য জামিন-পত্রের অভাব এবং কৃষিঋণে অধিকতর ঝুঁকির জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পক্ষে ছোট ছোট শহরে শাখা-স্থাপন লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।* ফলে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ-

নূতন পন্থার প্রয়োজনীয়তা

ভাবে অনুভূত হইতে থাকে যাহা অংশীদারগণের নিকট দায়িত্ব অপেক্ষা দেশের বৃহত্তম স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই পথে অগ্রসর হইবে। সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি বলিল যে, এই প্রতিষ্ঠান হইবে রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত, রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ভারতের

* Report on Currency and Finance for the year 1954-55 ৪১-৪২ পৃষ্ঠা

রাষ্ট্রীয় ব্যাংক। এই ব্যাংক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রসারের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।* অনেক ক্ষেত্রে ট্রেজারীর বিলোপসাধন করিয়া উহার কার্যাবলী এই রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের উপরই অর্পণ করা হইয়াছে। ফলে চেকের প্রচলন বেশ কিছুটা বাড়িয়াছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের শাখা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় এই সকল কার্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে 'গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা'র অন্যান্য ব্যবস্থাও কার্যকর হইয়াছে।**

এইভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে কেন্দ্র করিয়া গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। তবে এই কার্য সুসম্পন্ন হইতে বহুদিন সময় লাগিবে, কারণ ভারতের গ্রামাঞ্চল আয়তনে বিশাল এবং সমবায়ের উন্নয়ন সময়-সাপেক্ষ।

ভারতীয় টাকার বাজারের ত্রুটি ও অভাবের সংক্ষিপ্তসার (Summary of the Defects and Deficiencies of the Indian Money Market) ঃ ভারতের টাকার বাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থার বিশেষ আলোচনার পর এখন ইহার ত্রুটি ও অভাব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে ঃ

প্রথমত, ভারতের টাকার বাজার সমজাতীয় উপাদানে গঠিত নয়। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ, ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহ, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্যের অভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ফলে ইহাদের সমবায়ে এক সুসংগঠিত টাকার বাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাও সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, ভারতের ব্যাংক ও ঋণ ব্যবস্থা মোটেই পর্যাপ্ত নহে। ভারতে প্রায় ১ লক্ষ লোকপিছু ১·৫টি করিয়া ব্যাংক-কার্যালয় ও ঋণ-প্রতিষ্ঠান আছে। ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই পরিমাণ হইল যথাক্রমে ২৩ এবং ৪৫।

তৃতীয়ত, মাথাপিছু যে ব্যাংক ও ঋণ-প্রতিষ্ঠান আছে তাহাও গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত নহে। বস্তুত, ভারতের গ্রামাঞ্চল এখনও একরূপ ব্যাংকিং-এর সুযোগসুবিধাবিহীন।

চতুর্থত, সুদের হারে বিশৃংখলা (chaos in money rates) ভারতের টাকার বাজারের আর এক ত্রুটি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি দেখিয়াছিল সুদের হার শতকরা ৪ টাকা হইতে শতকরা ১৫ টাকার মধ্যে উঠানামা করে। সেদিন পর্যন্ত তপশীলী ব্যাংকগুলির গৃহীত আমানতের উপর প্রদত্ত সুদের হারেও বিশেষ

* ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

** ১ম খণ্ডের ১০৬-১০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

তারতম্য ছিল। ১৯৫৮ সাল হইতে নিয়মিত আন্তঃব্যাংক চুক্তির (inter-bank agreement) ফলে সুদের এই হারে কতকটা সমতা আসিয়াছে।*

পঞ্চমত, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের অস্তিত্বকে ভারতীয় টাকার বাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থার অন্যতম দুর্বলতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই সকল প্রতিষ্ঠান বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংকের কতকটা নিয়ন্ত্রণে ; ইহারা ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক-গুলির সম্প্রসারণের পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক রহিয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠত, বিল বাজার সুসংগঠিত না হওয়ার দরুন অন্যান্যের মধ্যে প্রয়োজনের সময় টাকার অভাব বিশেষ অনুভূত হয়, এবং অন্য সময় টাকা অলস অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

সপ্তমত, ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার পরিবর্তে নিজের কাছে মূল্যবান ধাতু জমাইয়া রাখাই ভারতীয়গণের স্বভাব বলা চলে। রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে আন্তর্জাতিক মূল্যে (international price) ভারতে ব্যক্তি-গত সঞ্চিত স্বর্ণের মূল্য ২০০০ কোটি টাকার মত হইবে।** এইজন্য ভারতকে মূল্যবান ধাতুর অতলগর্ভ গহ্বর (bottomless sink of precious metals) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার ফলে আমানতের পরিমাণ কাম্যভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না ; এবং স্বতই ব্যাংক-ব্যবস্থা ও আর্থিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

পরিশেষে, ভারতীয় টাকার বাজারের বিশেষ প্রকৃতির জন্য ইহার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বও ব্যাপক ও সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। সম্প্রতি অবশ্য এইদিকে গঠনকার্য চলিতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the chief constituents of the Indian Money Market.
(C. U. B. Com. 1968) (৯৬-৯৮, ১০০-১০১, ১০২-১০৩ এবং ১০৬-১১২ পৃষ্ঠা)

2. Account for the large number of bank failures in India in recent years. What measures have been adopted for preventing such failures in future ?
(C. U. B. Com. 1968) (১২৬-১৩১ এবং ১৩২-১৩৫ পৃষ্ঠা)

3. Give an account of the activities of the State Bank of India with reference to the financing of small industries and provision for agricultural credit. (C. U. B. A. 1961) (১০৭-১১০ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the part played by the State Bank of India in providing credit to (a) small industries, (b) agriculture. (C. U. B. A. 1968) (১০৭-১১০ পৃষ্ঠা)

* Reserve Bank Bulletin, March 1961

** বর্তমানে স্বর্ণের আন্তর্জাতিক মূল্য হইল প্রতি তোলা ৬২.৫০ টাকা ; কিন্তু ভারতে প্রতি তোলা স্বর্ণ ১৪০ টাকার কাছাকাছি বিক্রয় হইত। ভারতীয় মূল্যে হিসাব করিলে উক্ত ২০০০ কোটি টাকা ৪০০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।...১৯৬২ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে লোকসভায় অর্থমন্ত্রীর বিবৃতি।

5. Discuss the present position of rural banking facility in India. How far do you think the State Bank of India might solve the problem of rural banking ?

(B. U. (M) 1968) (১৩৮-১৪০ এবং ১০৭-১০৯ পৃষ্ঠা)

Discuss the methods through which the Reserve Bank of India can control the credit situation. (C. U. B. Com. 1961 ; B. Com. (P.I) 1962 ; B. A. (P.II) 1968) What new powers have been given to the Reserve Bank for controlling currency and credit during the Second Plan Period ? (C. U. B. A. 1959)

[ইংগিত : বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক (১) ব্যাংকের বাট্টাহারেব পরিবর্তন, (২) খোলা বাজারে কারবার, (৩) নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (selective and direct credit control), (৪) জমার অনুপাতে পরিবর্তন, (৫) অতিরিক্ত আমানত আবদ্ধ করা, এবং (৬) নৈতিক প্রণোদনের মাধ্যমে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংককে জমার অনুপাত পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং উহার নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের যে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে তাহার ফলে মূল্যস্তর (price level) আয়ত্তের বাহিরে যাইতে পারে। এই আশংকা দূর কবিবার জন্যই রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা উপরি-উক্তভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১১৫-১২১ পৃষ্ঠা]

7. Write a short note on the credit policy of the Reserve Bank of India, with particular reference to the control of inflation.

(C. U. B. Com. 1960 ; B. U. 1961) (১১৫-১২২ পৃষ্ঠা)

8. Indicate the main features of the scheme of insurance of bank deposits recently adopted in India. How far do you think it will provide a remedy for bank failures in this country ? (C. U. B. A. 1962 ; B. A. (P. II) 1968) (১৩২-১৩৫ পৃষ্ঠা)

9. "The Reserve Bank of India's monetary policy has been a policy of controlled expansion during the Plan Period." Explain the main features of this policy. (C. U. B. A. 1962) (১১৩-১১৪ এবং ১১৫-১২২ পৃষ্ঠা)

10. Describe the various measures adopted by the Reserve Bank of India for controlling the credit situation during the Plan Period.

(C. U. B. A. 1961) (১১৬-১২১ পৃষ্ঠা)

11. Give a critical estimate of the monetary and credit policy of the Reserve Bank of India during the Second Plan Period. (C. U. B. A. 1968)

(১১৩-১১৪ এবং ১১৫-১২২ পৃষ্ঠা)

12. Discuss how far the Reserve Bank of India has succeeded in exercising the functions of a true Central Bank. (C. U. B. Com. 1962) (১২৩-১২৫ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে দ্রব্যমূল্য

(Prices in India)

মুদ্রাস্ফীতিকেই বোধ হয় যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগের মুদ্রা-ব্যবস্থায় পরিবর্তনসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহার ফলে একসময় সমগ্র মুদ্রা-ব্যবস্থা একরূপ ভাঙিয়া পড়িবার মত হইয়াছিল। বর্তমানে ইহা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রপীড়িত করিতেছে। দ্রব্যমূল্যের সম্ভাব্য স্থায়িত্বকে তৃতীয় পরিকল্পনার সফলতার অন্যতম সর্ত বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে টাকার ক্রয়শক্তি ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত শতকরা ২৯ ভাগ হ্রাস পাইয়াছিল।* পরবর্তী সময়েও উহা যে আরও বেশ কিছু হ্রাস পাইয়াছে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য (internal value) বা ক্রয়শক্তি বহিঃমূল্যের (external value) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলিয়া এইভাবে টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য হ্রাস পাইয়া চলিলে আবার মুদ্রামানহ্রাসের (devaluation) প্রয়োজন হইবে। সুতরাং ভারতে দ্রব্যমূল্যের গতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনা তিনটি পর্যায়ে করা হইবে—(ক) যুদ্ধকালীন মূল্যের গতি, (খ) যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি, এবং (গ) দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যের গতি।

মুদ্রাস্ফীতিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

(ক) যুদ্ধকালীন মূল্যের গতি (Trend in Prices during the War Period): যুদ্ধ সুরু হইবার সংগে সংগে ভারতে দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগামী হইতে থাকে। ১৯৪০ সালের কয়েক মাস ব্যতীত দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতি ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি অবধি একরূপ অব্যাহতই ছিল। পাইকারী দামের সূচকসংখ্যা (wholesale prices index) ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালের শেষে ১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮২'২-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, জীবনযাত্রার সূচকসংখ্যা (cost of living index) ইহা অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধিকেই যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসাবে দুইটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে—যথা, (ক) টাকাকড়ির অস্বাভাবিক যোগান-বৃদ্ধি, এবং (খ) ভোগ্যপণ্যের অভূতপূর্ব যোগানহ্রাস।

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির দুইটি কারণ:

---

* ১৯৫৯ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী সংস্থায় শ্রীআয়েংগারের বক্তৃতা

টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি নানাভাবে ঘটে। প্রথমত, কাগজী মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস এবং ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ১৬৯ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১৪২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১। টাকাকড়ির অভূতপূর্ব যোগানবৃদ্ধি —ইহার কারণ

কাগজী মুদ্রার এইরূপ পরিমাণবৃদ্ধির কারণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ যুদ্ধব্যয় পরিচালনার নীতি (defective war finance policy) অনুসরণ। ভারতে তৎকালীন বিদেশী সরকার নিজের ও অন্যান্য মিত্রশক্তির পক্ষে এদেশ হইতে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিত। এই যুদ্ধোপকরণের মূল্য প্রদান করা হইত নোট ছাপাইয়া; এবং নোট ছাপানো হইত রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে ইংল্যাণ্ডে ষ্টার্লিং জমা রাখিয়া। ফলে প্রতিটি ক্রয়ের দরুন ইংল্যাণ্ডে ভারতের অনুকূলে ষ্টার্লিং জমা হইতে থাকে এবং এদেশে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়িতে থাকে। এ-বিষয়ে ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত সঞ্চয় প্রসংগে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।*

সাধারণত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ভারতে ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালের চলতি আমানতের (demand deposits) পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৫০০ কোটি টাকার উপর। স্থায়ী আমানত ইহা অপেক্ষা অল্প হইলেও অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

যুদ্ধকালীন কর্মপ্রচেষ্টাবৃদ্ধির দরুন টাকাকড়ির প্রচলনবেগও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

উক্ত তিনটি কারণের সম্মিলিত ফল দাঁড়াইয়াছিল মোট অর্থসরবরাহ বা মোট ক্রয়শক্তির বহুপরিমাণ বৃদ্ধি। অপরদিকে কিন্তু ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ নিম্নলিখিত কারণে অভূতপূর্বভাবে হ্রাস পাইয়াছিল:

(ক) প্রথমত, মোট উৎপাদনের একটা মোটা অংশকে যুদ্ধাভিমুখী করা হইয়াছিল; ইহাতে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের এক বিরাট ঘাটতি পড়িয়াছিল। (খ) যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রমিকের অভাব প্রভৃতি কারণে মোট উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছিল। (গ) যুদ্ধরত দেশগুলি হইতে এবং মালবাহী জাহাজে স্থানের অভাবে আমদানির পরিমাণও বিশেষ কমিয়াছিল। (ঘ) দেশের অভ্যন্তরে পরিবহণের উপর অভাবনীয় চাপের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে মালপত্র চলাচলের সুব্যবস্থাও ছিল না। (ঙ) মুনাফাখোর, কালোবাজারী প্রভৃতিদের জন্য ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ আরও ব্যাহত হইয়াছিল। (চ) পরিশেষে, সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিও (system of price control) ত্রুটিহীন ছিল না। অনেকটা ইহার জন্যই বহু ভোগ্যপণ্য বাজার হইতে অপসৃত হইয়াছিল।

২। ভোগ্যপণ্যের যোগানহ্রাস—ইহার কারণ

---

* ৮২ পৃষ্ঠা দেখ।

এইভাবে টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি ও ভোগ্যপণ্যের যোগানহ্রাসের ফলে ঘটিয়াছিল অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও সাধারণ লোকের তজ্জনিত অকল্পনীয় দুর্দশা। এই মূল্যবৃদ্ধির দরুন একমাত্র ১৯৪৩ সালের বংগীয় দুর্ভিক্ষেই ১৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছিল।

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রতিবিধান

বংগীয় দুর্ভিক্ষের পর সরকার মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া মূল্যবৃদ্ধিকে কতকটা দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

(ক) কর-পদ্ধতি ও ঋণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার অতিরিক্ত ক্রয়শক্তিকে বাজার হইতে বিদায় করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিল। (খ) রিজার্ভ ব্যাংক, ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন সরকারের পক্ষে এদেশে প্রায় ৬০ কোটি টাকার স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছিল। (গ) তৃতীয়ত, ব্যাপক দ্রব্য-নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ-ব্যবস্থারও প্রবর্তন করা হইয়াছিল। (ঘ) নূতন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকেও নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছিল। সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠানের মূলধন বৃদ্ধি বা নূতন কোন প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা যাইত না। (ঙ) স্বর্ণ, রৌপ্য, তুলা, জোয়ার প্রভৃতিতে আগাম কারবার (forward trading) নিষিদ্ধ করিয়া ইহাদের ক্ষেত্রে ফটকা কারবার-জনিত মূল্যবৃদ্ধি রহিত করা হইয়াছিল। (চ) যুদ্ধের শেষ দিকে আমদানি-নিয়ন্ত্রণ নীতিকে কিছুটা শিথিল করিয়া ভোগ্যদ্রব্যের আমদানিকে কতক পরিমাণে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল। (ছ) যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কালোবাজারী, করপ্রবঞ্চক (tax dodgers) প্রভৃতিদের লুকানো আয় বাহির করিবার জন্য ৫০০, ১০০০, ১০,০০০ প্রভৃতি উচ্চমূল্যের নোটকে বিহিত মুদ্রা-বহির্ভূত (demonetised) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল।

(খ) যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি (Trend in Prices during the Post-war Period): আশা করা হইয়াছিল, উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহের জন্য এবং স্বাভাবিক কারণে যুদ্ধোত্তর যুগে মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য ক্রমশ কমিয়া আসিবে। কিন্তু এই আশা পূর্ণ হয় নাই। কারণ, যুদ্ধোত্তর যুগেও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ও দ্রব্যাদির পরিমাণ হ্রাস একরূপ সমান তালেই চলিয়াছিল। ইহার সহিত আবার যুক্ত হইয়াছিল বিনিয়ন্ত্রণ নীতি লইয়া সরকারের পরীক্ষা।

যুদ্ধোত্তর যুগে মুদ্রাস্ফীতির কারণ

যুদ্ধোত্তর যুগে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ মাত্র ৮৫ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু ইহার সহিত মাগ্‌গি-ভাতা ও মজুরি বৃদ্ধি, পাকিস্তান হইতে আগত বাস্তুহারাদের হস্তে নগদ মুদ্রা প্রভৃতি যুক্ত হওয়ায় মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তির পরিমাণ (total available purchasing power) বিরাটভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল।

অপরদিকে কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে নাই; বরং দেশকে উৎপাদন-সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রমিক-বিক্ষোভ,

সাম্প্রদায়িক দাংগাহাংগামা, পরিবহণের অব্যবস্থা, দেশবিভাগের দরুন কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের সরবরাহ হ্রাস প্রভৃতি মোট দ্রব্যাদির পরিমাণকে যুদ্ধকালীন অবস্থা হইতে আরও সংকুচিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমদানি-নিয়ন্ত্রণ নীতিকে শিথিল করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই। এইভাবে লোকের যুদ্ধকালীন সঞ্চিত ভোগেচ্ছা (pent up wartime demand for consumers' goods) অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে সরকার আবার বিনিয়ন্ত্রণ নীতি লইয়া পরীক্ষা করিতে মনস্থ করে। ইহার ফলে খাদ্যশস্য ও বস্ত্রাদির মূল্য বেগে উর্ধ্বগামী হইতে থাকে। কয়েক মাসের মধ্যেই দ্রব্যমূল্যের সাধারণ সূচক (general index of prices) বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৮ সালে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত প্রতিবিধান

স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে প্রতিবিধান অবলম্বনে সরকারকে যত্নবান হইতে হয়। অনেক শলা-পরামর্শের পর ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে যে-কার্যক্রম অবলম্বিত হয় তাহা ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

(ক) সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ঘাটতি বাজেট পদ্ধতি হইতে বিদায় লওয়ার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। (খ) সরকারী আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যে-সকল রাজ্যে কৃষি-আয়কর (agricultural income tax) ছিল না সেখানে ইহা এবং কেন্দ্রীয় কর-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৃত্যু বা সম্পত্তি কর (death or estate duty) অনতিবিলম্বে ধার্য করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। (গ) ঋণের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের ব্যাপকতর প্রচেষ্টাও করা হইয়াছিল। (ঘ) লভ্যাংশ বণ্টনের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ, অতিরিক্ত মুনাফা করা খাতে জমা প্রত্যর্পণ স্থগিত রাখা প্রভৃতি দ্বারা মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তির পরিমাণকে কমাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। (ঙ) উৎপাদনবৃদ্ধিকল্পেও বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল—যথা, আয়কর নির্ধারণের জন্য অবপূর্তি নিয়মের (depreciation rules) পরিবর্তনসাধন, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করা, ইত্যাদি। ইহার উপর যাহাতে উৎপাদন-ব্যবস্থা বিলাসসামগ্রী অভিমুখী হইয়া প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ব্যাহত না করে তাহার জন্য এইরূপ দ্রব্যাদির উপর অন্তঃশুল্কের (excise duties) হার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের আমদানির সুব্যবস্থার জন্য বিলাসসামগ্রীর উপর আমদানি শুল্কের হারও বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। (চ) মূল্যহ্রাস ও ন্যায্য বণ্টনের উদ্দেশ্যে খাদ্য ও বস্ত্রকে পুনরায় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা হইয়াছিল। এইবার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে অনেকটা পরিমার্জিত আকারে প্রবর্তিত করা হইয়াছিল।

১৯৪৭-৪৮ সালের মূল্যবৃদ্ধিকে দ্রুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি (galloping inflation) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ অনতি-

বিলম্বেই ইহাকে বেশ খানিকটা রোধ করিতে সমর্থ হয়। মোট প্রচলিত নোটের পরিমাণ না কমিলেও ইহার সম্প্রসারণ স্থগিত রাখা হয়। মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, ১৯৪৮ সালের অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহের ফলে ১৯৪৯ সালের প্রথম দিক হইতে মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে সামান্য পরিমাণে মূল্যহ্রাসই ঘটিতে থাকে; এবং ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের তুলনায় সাধারণ সূচক (General Index) ৩৯০ হইতে নামিয়া ৩৭০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহার পর হইতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ভারতের প্রতিকূল হওয়ায় আমদানির পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয়। আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণও আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না। ফলে, আবার সূচকসংখ্যা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

প্রতিবিধানগুলি কতটা ফলপ্রসূ হয়

ইহার পর ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামানহ্রাস (devaluation) করা হইলে আবার প্লুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতির আশংকা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে আর একটি কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়। ইহা অষ্টপর্যায়ী কার্যক্রম (8-Point Programme) নামে অভিহিত। এই কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই হইল প্রধান: (ক) খাদ্যশস্য, বস্ত্র ও সূতা, লৌহপিণ্ড ও ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতির মূল্য হ্রাস করা; (খ) কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে আগাম কারবার (forward trading) নিষিদ্ধ করা; (গ) সরকারী ব্যয়হ্রাসের অধিকতর প্রচেষ্টা করা; (ঘ) ঋণ-ব্যবস্থাকে বিস্তৃততর করিয়া স্বল্পসঞ্চয়ীদের সুবিধা প্রদান করা; (ঙ) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কঠিনতর করা; ইত্যাদি।

মুদ্রামানহ্রাস ও মুদ্রাস্ফীতির আশংকা

অষ্টপর্যায়ী কার্যক্রম

এই সকল প্রতিবিধানের ফলে মুদ্রামানহ্রাসের পর হইতে বৎসরাধিক কাল সাধারণ মূল্য একরূপ স্থিতিশীলই ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে মহাচীন কোরিয়া-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে দ্রব্যমূল্য আবার বাড়িতে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে সাধারণ সূচক ৪৬২-তে (ভিত্তি: আগষ্ট, ১৯৩৯) গিয়া পৌছায়।

(গ) প্রথম পরিকল্পনা ও মূল্যের গতি (First Plan and Price Trends): প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে সরকার আর এক দফা প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে মনস্থ করে। ইহার মধ্যে প্রধান হইল রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ-সংকোচন (credit contraction)। ঋণ-সংকোচনের জন্য প্রথমে ব্যাংকের বাট্টাহার (Bank Rate) শতকরা ৩ হইতে ৩½-এ লইয়া যাওয়া হয়। পরে ইহা ঘোষণা করা হয় যে, রিজার্ভ ব্যাংক আর তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিবে না—ইহাদের জামিনে ঋণপ্রদান করিবে মাত্র। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের উদ্বৃত্ত বাজেটনীতি এই সময় হইতে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতে এবং সরকার বাজারে বহুল পরিমাণে মাল ছাড়িতে

১৯৫১ সালের প্রতিবিধান

থাকে। ইহা ছাড়া বিদেশের বাজারেও যোগানের অবস্থা কতকটা সহজ হয়। এই সকলের ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। সরকারও মূল্যে স্থায়িত্ব আনিবার জন্য নানাপ্রকার পন্থা অবলম্বন করে। রপ্তানিকে উৎসাহিত করিবার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ধার্য রপ্তানি শুল্ক হ্রাস এবং রপ্তানির উপর অন্যান্য বাধানিষেধ শিথিল করা হয়। ফলে ১৯৫২-৫৩ সালে দ্রব্যমূল্যে বেশ কিছু পরিমাণ স্থায়িত্ব আসে। সকলের ধারণা হয় যে অবশেষে দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আসিয়াছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই স্থায়িত্ব সাময়িক হয়। ইতিমধ্যেই দ্রব্যমূল্যে মন্দাগতি (recession) দেখা দেয়। ১৯৫৩ সালের মধ্যভাগ হইতে প্রায় ২ বৎসরের মধ্যে সাধারণ মূল্যসূচক (ভিত্তি: ১৯৫২-৫৩=১০০) ১১০ হইতে হ্রাস পাইয়া ৯০-এ দাঁড়ায়। খাদ্যশস্যের দামই অপেক্ষাকৃত অধিক হ্রাস পায়। খাদ্যশস্যের মূল্যসূচক ১৯৫৪ সালের মধ্যভাগে ছিল ১০৮, উহা ১৯৫৫ সালের মধ্যভাগে হয় ৬৭।* এইভাবে মূল্যহ্রাসের অন্যতম কারণ ছিল অনুকূল আবহাওয়ার দরুন আশাতীত কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি। বাজারে যোগানবৃদ্ধির সংগে সংগে এই ধারণা হয় যে উৎপাদন ও যোগান আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্রব্যমূল্য আরও হ্রাস পাইবে। ফলে ব্যবসাদাররা মজুত মাল বাজারে ছাড়িতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই মূল্যস্তর দ্রুত হ্রাস পাইতে সুরু করে।

১৯৫২-৫৩ সালে মূল্যের স্থায়িত্ব

তারপর মূল্যের নিম্নগতি

ইহার পর ১৯৫৫ সালের মধ্যভাগ হইতেই দ্রব্যমূল্য আবার উর্ধ্বগামী হয় এবং পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে সাধারণ মূল্যসূচক (ভিত্তি: ১৯৫২-৫৩=১০০) ৯০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯৫-এর উপর দাঁড়ায়। বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পায় সর্বাধিক। ইহার পরই মূল্যবৃদ্ধি পায় কাঁচামাল ও অর্ধনির্মিত শিল্পজাত দ্রব্যের। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও বিনিয়োগ-বৃদ্ধি এবং অধিক পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়, দেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের অভাবে উৎপাদন হ্রাস, আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা ইত্যাদির ফলে চাহিদার তুলনায় যোগানের অভাবের দরুনই এই মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। প্রতিবিধান হিসাবে খাদ্যশস্যের আমদানি, রপ্তানির উপর বাধানিষেধ, সরকারের হাতে জমা খাদ্যশস্য বাজারে যোগান দেওয়া, রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।**

পুনরায় উর্ধ্বগতি

প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে মূল্যবৃদ্ধি ও উহার প্রতিবিধান

* 'Index Number of Wholesale Prices in India' issued by the office of the Economic Adviser to the Government of India

** Report on Currency and Finance, 1955-56

(ঘ) দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও মূল্যের গতি (Second Plan and Price Trends) ঃ উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহের ফলে সাময়িকভাবে সামান্য সুফল ফলিলেও মূল্যের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহতই থাকিয়া যায়। ফলে পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই সাধারণ মূল্যসূচক ৭ শতাংশের মত বৃদ্ধি পায়।*

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে মূল্যবৃদ্ধি

এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল বেসরকারী ও সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-কার্যের (investment) ক্রমাগত সম্প্রসারণ। প্রথম পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসরেই পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে (১৯৫৬-৫৭ সাল) ঐ ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ৬৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। লোকের স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর হওয়ায় সরকার অধিক মাত্রায় ঘাটতি ব্যয়ের (deficit financing) আশ্রয় গ্রহণ করে। বেসরকারী ক্ষেত্রেও ব্যাংকের ঋণদানের মাত্রা বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে জিনিসপত্রের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ১৯৫৩-৫৫—এই দুই বৎসরের তুলনায় কৃষিজ উৎপাদন বিশেষত খাদ্যশস্যের উৎপাদন কতকটা হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত ব্যবসাদাররা মাল মজুত করিয়া কৃত্রিম ঘাটতির সৃষ্টি করে। উপরন্তু, অবস্থাপন্ন কৃষকরা তাহাদের উৎপাদনের একটা বড় অংশ মজুত করিয়া খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে।

এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ

এই অবস্থায় সরকার একদিকে জিনিসপত্রের যোগানবৃদ্ধি এবং অপরদিকে চাহিদার অতিরিক্ত চাপকে হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। যোগানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী পন্থা হিসাবে সরকার বিদেশ হইতে চাউল আটা প্রভৃতি দ্রব্য আমদানির ব্যবস্থা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্যশস্য বণ্টনের জন্য দেশের নানাস্থানে ন্যায্য-মূল্যের দোকান (fair price shops) খোলা হয়। এই সকল স্বল্পমেয়াদী পন্থা ব্যতীত উৎপাদনবৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য 'অধিক খাদ্য ফলাও কর্মসূচী'কে (Grow More Food Programme) কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। চাহিদার অত্যধিক চাপকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাজস্ব ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত নীতিকে (fiscal and monetary policies) পরিচালিত করা হয়। কর-পদ্ধতির এরূপ পরিবর্তনসাধন করা হয় যাহাতে চাহিদা ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়। টাকাকড়ির ক্ষেত্রে নীতিকে এমনভাবে পরিচালিত করা হয় যাহাতে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কাজকর্ম অব্যাহত থাকে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। রিজার্ভ ব্যাংক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সাধারণ এবং নির্বাচনমূলক (general and selective) উভয় প্রকার ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে। ব্যাংকিং কোম্পানী আইন প্রদত্ত নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাবলে রিজার্ভ

অবলম্বিত প্রতিবিধান

* Report on Currency and Finance for 1958-59

ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংককে ধান চাউল গম ডাল সুতাবস্ত্রের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিতে নির্দেশ প্রদান করে।

এই সকল পন্থা অবলম্বন করার ফলে এবং কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটায় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরের (১৯৫৭-৫৮ সাল) শেষের দিক হইতে দ্রব্যমূল্যের কিছুটা নিম্নগতি দেখা দেয়। দ্রব্যমূল্যের এইরূপ অস্থায়িত্ব পরিকল্পনা কার্যকরকরণে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিতে থাকে। একবার খাদ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাস ঘটিলে কৃষিজ উৎপাদন ব্যাহত হয়, ফলে পরবর্তী বৎসরে আবার ইহার জন্যই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত হইয়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইতে থাকে। এই কারণে কর্তৃপক্ষকে মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নে বিশেষ মনোযোগী হইতে হয়। আমাদের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের প্রাথমিক পদ্ধতি হইল খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন। ইহার জন্য ঋণ-নিয়ন্ত্রণ, আমদানি, বণ্টনের সুব্যবস্থা প্রভৃতি ছাড়াও পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে (১৯৫৭ সালের জুন মাস) পূর্বোল্লিখিত খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) নিয়োগ করা হয়।* এই কমিটি খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করে। সুপারিশসমূহ সম্যকভাবে আলোচিত হইবার পূর্বেই পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে (১৯৫৮-৫৯ সাল) দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সুরু হয়। ইহার পর দ্রব্যমূল্য অবিচ্ছিন্ন গতিতে বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং দেখা যায় যে ১৯৫৮-৫৯ সালে সাধারণ মূল্যসূচক (সাপ্তাহিক মূল্যের মাসিক গড়) বাড়িয়া বৎসরের শেষে দাঁড়ায় প্রায় ১১৩-তে। পূর্ববর্তী বৎসরে ঐ সূচক-সংখ্যা ছিল ১০৫.৪। সুতরাং পূর্বের বৎসরের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে মূল্য শতকরা ৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিই সর্বাধিক হয়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ১১ ভাগের উপর। ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ঘাটতিই ছিল এই মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে মূল্যের গতি

মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের নূতন প্রচেষ্টা

পরিকল্পনার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে মূল্যের গতি

সরকার এই মূল্যবৃদ্ধিকে দমন করিবার জন্য অধিক সচেষ্ট হয়। বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যাহাতে রোধ হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। অধিক পরিমাণে খাদ্য-আমদানি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও ন্যায্যমূল্য দোকানের মারফত খাদ্যশস্য বণ্টন, মালমজুত ও অতিরিক্ত মুনাফা শিকার নিষিদ্ধকরণ, সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি পন্থা সরকার অবলম্বন করে। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক খাদ্য-শস্য মজুত এবং ফটকা কারবার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের

* ১ম খণ্ডের 'ভারতে খাদ্য-সমস্যা' সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রয়োগ করিতে থাকে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে সরকার দীর্ঘমেয়াদী পন্থা হিসাবে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State trading) প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত করে। যাহাতে উৎপাদকেরা ন্যায্যমূল্য পায় এবং ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে খাদ্য ক্রয় করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করাই এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্য। এই সকলের ফলে সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসর হইতে নিয়মিত মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে, এবং পরিকল্পনার শেষে সাধারণ মূল্যসূচক দাঁড়ায় ১২৭'৫-এ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে সাধারণ মূল্যসূচক ছিল ৯৫ (ভিত্তি : ১৯৫২-৫৩=১০০)। সুতরাং পরিকল্পনাধীন সময়ে ৩০ শতাংশের মত নীট মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।*

তৃতীয় পরিকল্পনায় মূল্য স্থায়িত্বকরণ এবং মূল্যের গতি (Price Stabilisation and Price Trends in the Third Plan) : এইভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগের অধিক বর্ধিত মূল্যস্তর লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনা সুরু হওয়ায় দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণকে (price stabilisation) এই পরিকল্পনার সফলতার অন্যতম অপরিহার্য সর্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই বৃহত্তর পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগের বৃদ্ধি যে লোকের আয় এবং ফলে চাহিদার বৃদ্ধিসাধন করিবে তাহা ধরিয়া লইয়াই মূল্য স্থিতিকরণের কার্যক্রম প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই কার্যক্রমের মধ্যে আছে অপরিহার্য ছাড়া অন্যান্য সকল চাহিদার সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণ। দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণ ছাড়া প্রয়োজনীয় সঞ্চয়সংগ্রহের জন্যও ইহা প্রয়োজন। উপরন্তু, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ানোর ফলে আমদানির উপর বিশেষ নির্ভর করা চলিবে না। সুতরাং ভোগ নিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে।**

মূল্য স্থিতিকরণের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যক্রম

সংগে সংগে অবশ্য ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির দিকেও প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশন এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উৎপাদন-লক্ষ্যসমূহ স্থির করা হইয়াছে বলিয়া দাবি করে।

দ্রব্যমূল্যে সম্পূর্ণ স্থায়িত্ব আনয়ন আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে সম্পূর্ণ সম্ভব নহে। কোন বৎসর অনাবৃষ্টি হেতু শস্যহানি ঘটিলে উহা মূল্যস্তরকে বিশেষ ঊর্ধ্বমুখী করিবেই। উপরন্তু, সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় মূল্যের গতি অর্থনৈতিক কাজকর্মের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে কয়েক ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবেই, তবুও মূল্য স্থিতিকরণ তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের অপরিহার্য সর্ত বলিয়া মূল্যের গতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার কথা বলা হইয়াছে, এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ ও রাজস্ব সম্পর্কিত পদ্ধতির সহিত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সংযুক্ত করা হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।†

---

* India—1962

** Third Five Year Plan ১২৫-১২৮ পৃষ্ঠা

† P. C. Jain, ***Stabilising the Price Level***

এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রধানত কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইবে। প্রয়োজনমত খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তন করা হইবে, এবং কালোবাজার ও মালমজুতের ফলে যাহাতে খাদ্যমূল্য প্রভাবান্বিত না হয় সেদিকে আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইবে।

জরুরী অবস্থাকালীন মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

ইতিমধ্যে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে মূল্য-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দেয়। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে জরুরী অবস্থাকালীন মূল্য-নিয়ন্ত্রণের এক ব্যাপক কার্যক্রম গৃহীত হয়। এই কার্যক্রমে খাদ্যদ্রব্য, তুলাবস্ত্র, ঔষধপত্র ইত্যাদি দ্রব্যগুলির মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। মূল্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে ২০০টি কেন্দ্রীয় ও পাইকারী ভাণ্ডার (central and wholesale stores) এবং বৃহৎ সহরগুলিতে কতকগুলি ভোগকারীর ভাণ্ডার (consumers' stores) খোলা হইবে। সরকার নানারূপ সংস্থার মাধ্যমে (যেমন, price vigilance cell) দ্রব্যমূল্যের গতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রচেষ্টা করিবে। আবার কেন্দ্রীয় বাজেটে 'বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা' (compulsory savings scheme) প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া আংশিক-ভাবে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার চেষ্টা চলিতেছে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জরুরী অবস্থার প্রথম কয়েক মাসে কোনরূপ দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে নাই। কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে দ্রব্যমূল্যের বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের উর্ধ্বগতি সুরু হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Account for the rise in prices of essential consumer goods in India over the last decade. What steps would you suggest to hold the price line ?

(B. U. (M) 1968) (১৪৭-১৫২ পৃষ্ঠা)

2. What are the causes of the recent increase in the volume of note-issue in India ? What measures would you suggest to control any inflationary effect the increase may have on the price-level ? (C. U. B. A. 1961) (৭৯ এবং ১৪৯-১৫২ পৃষ্ঠা)

3. Examine the main causes explaining the continuous rise in prices. What steps would you suggest for checking this rise ? (B. U. (O) 1962)

[উত্তরের কাঠামো: অবিচ্ছিন্ন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ অপেক্ষা আর্থিক আয় ও টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি। সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় আর্থিক আয় ও টাকাকড়ির পরিমাণ যেরূপ বাড়িতেছে সেই অনুপাতে ভোগ্যদ্রব্যের যোগানবৃদ্ধি ঘটিতেছে না। ইহার উপর আছে অভূতপূর্ব জনসংখ্যাবৃদ্ধি, কালোবাজার, মালমজুত প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রসার, ইত্যাদি। মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার মত নির্বাচিত মূল্যনীতি কার্যকরকরণের সকল প্রচেষ্টাই করিতে হইবে।......১৪৯-১৫২ পৃষ্ঠা।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেকার-সমস্যা

(Unemployment Problem)

বর্তমান সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হইল বেকার-সমস্যা। পূর্বে এই সমস্যা যে ছিল না তাহা নয়। বহুদিন পূর্ব হইতেই মানুষ এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে এবং ইহার সমাধান খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে উহার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা পূর্বাপেক্ষা অধিক। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পশ্চিমী দেশগুলিতে যে অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহার একটি বৈশিষ্ট্য হইল শিল্প-শ্রমিকের একাংশের মধ্যে স্থায়ী বেকারত্ব ও দুর্দশা। এই অর্থ-ব্যবস্থা যত ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর হয় আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য তত প্রকট হইতে থাকে; এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উহার দুর্বলতা আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তখন হইতে মানুষ বেকার-সমস্যা, অর্ধ-নিয়োগ ও আর্থিক দুর্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে (U. N. Charter) পূর্ণ নিয়োগের (full employment) এবং ১৯৪৮ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত মানব অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় (Universal Declaration of Human Rights) কর্মের অধিকার, পছন্দমত চাকরি গ্রহণের অধিকার, কার্যের ন্যায্য ও অনুকূল সর্তের অধিকার, বেকারাবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অধিকার প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রও আজ আর নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া নাই। ইহারা বেকারাবস্থার অবসান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকিয়াছে। ভারতও পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত উদ্দেশ্যসাধনে সচেষ্ট হইয়াছে।

বেকার-সমস্যার গুরুত্ব

শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় ভারতের বেকার-সমস্যায় কিছুটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে সময়ান্তরে ব্যবসায়ের তেজী-মন্দার ফলে শিল্প-শ্রমিকদের নিয়োগের তারতম্য (cyclical unemployment) দেখা দেয়, অথবা শিল্পের সংগঠনগত পরিবর্তন বা দ্রব্য উৎপাদনে পরিবর্তন-কালে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব (frictional unemployment) দেখা দেয়। ভারতে কিন্তু সকল সময়ই জনসংখ্যার বেশ কিছু অংশ বেকারাবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করে ও কাজকর্মের সন্ধানে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা ব্যতীত ব্যাপক আকারের অর্ধ-নিয়োগ (underemployment) ভারতের বেকার-সমস্যার আর একটি প্রধান দিক। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো কৃষিপ্রধান। এখানে

ভারতের বেকার-সমস্যার প্রকৃতি

শতকরা প্রায় ৬৫ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। অনন্যোপায় হইয়াই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা জমিতে আসিয়া ভিড় করিয়াছে এবং জমির উপর চাপ অত্যধিক করিয়া তুলিয়াছে। ফলে কৃষি আর আর্থিক দিক হইতে লাভজনক নাই; এবং মাথাপিছু আয়ও হয় সামান্য। উপরন্তু, কৃষক সারা বৎসর ধরিয়াই কৃষিকার্য করে না; বৎসরে ৫ মাস হইতে ৯ মাস পর্যন্ত তাহাকে প্রায় বেকার জীবনযাপন করিতে হয়। কৃষিতে এই অর্ধ-নিয়োগ বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের (invisible unemployment) অবস্থা সহরাঞ্চলের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক শিল্পাঞ্চলে আসিয়া ভিড় করে; এবং ফলে মজুরির হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অপরদিকে আবার শিল্পাঞ্চলে বেকার-সমস্যা দেখা দিলে শিল্প-শ্রমিকরা গ্রামাঞ্চলে ফিরিয়া যাইয়া কৃষিতে ভিড় জমায়।

শিল্পগত ও কৃষিগত বেকার-সমস্যা ব্যতীত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যাও রহিয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে এই সম্প্রদায়ের সম্ভাবনা বা গুরুত্ব অধিক হওয়ায় সম্প্রতি ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। বস্তুত, ভারতের বেকার-সমস্যার বৈশিষ্ট্য হিসাবে কৃষিগত বেকার-সমস্যা এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যারই উল্লেখ করা হয়।* যাহা হউক, ভারতের বেকার-সমস্যা মোটামুটিভাবে তিন ধরনের: (১) কৃষিগত বেকার-সমস্যা, (২) শিল্পগত বেকার-সমস্যা, এবং (৩) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা। এই তিন প্রকার সমস্যারই মূলে রহিয়াছে দুইটি প্রধান কারণ: জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, এবং অর্থ-ব্যবস্থায় সম্প্রসারণের অভাব।

ভারতে তিন প্রকারের বেকার-সমস্যা

কৃষিগত বেকার-সমস্যা (Problem of Agriculturai Unemployment): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কৃষিগত বেকার-সমস্যা প্রধানত অর্ধ-নিয়োগ (underemployment) এবং বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে কর্মবিহীনতার (seasonal unemployment) সমস্যা। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে কৃষক ছাড়া অন্যান্যদের এবং ভূমিহীন কৃষকদেরও বেকার-সমস্যা রহিয়াছে।

প্রকৃতি

গ্রামাঞ্চলে অর্ধ-নিয়োগ ও সাময়িক কর্মবিহীনতার কারণ কি তাহার ইংগিত পূর্বেই দিয়াছি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও কৃষির অনগ্রসরতা এই অবস্থার জন্য দায়ী। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে জমির উপর চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে জমি হইতে যে-আয় হয় তাঁহা জীবিকানির্বাহের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতে যখন

* "The most distressing aspect of the unemployment problem in India is the state of chronic involuntary idleness among two important sectors of the populations *viz.* • the agricultural class and the educated middle class." Dr. N. Das, *Unemployment—its many facets in India*

৩৬০০ লক্ষ একর জমিতে ৭৩০ লক্ষ কৃষক কার্য করে তখন ঐ দেশে ৬৩০০ লক্ষ একর জমিতে মাত্র ৮০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। উৎপাদনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতের একর প্রতি গম উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের অর্ধেকের বেশী হইবে না, এবং একর প্রতি তুলা উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না। জমির উর্বরতা ও অনুন্নত কৃষি-পদ্ধতির কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা অনস্বীকার্য যে জনসংখ্যার চাপের ফলেই জমিতে খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে। উৎপাদনের নিম্ন হারের অন্যান্য কারণের মধ্যে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা, কৃষকের মূলধনের অভাব ও ঋণ, কৃষিগত সংগঠনের অভাব, বিক্রয়করণ-ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বৎসরের কয়েক মাস ধরিয়া মাত্র কৃষিকার্য চলে, অন্যান্য সময়ে কৃষককে অলস জীবনযাপন করিতে হয়। একটি সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে ভারতের গ্রামাঞ্চলে লাভজনক কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ২৮ জনের কাজ সাপ্তাহিক ২৮ ঘণ্টার কম।* ইহাও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের একটি দিক। গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্প ধ্বংস পাওয়ায় কৃষক অবসর সময়ে উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া আয়বৃদ্ধির সুযোগ পায় না।

জনসংখ্যার চাপ ও কৃষির অনগ্রসরতাই কৃষিগত বেকার-সমস্যার মূল কারণ

গ্রামাঞ্চলে বেকার ও অর্ধ-নিয়োগ সমস্যার সমাধান করিতে প্রথমেই সর্বতোভাবে কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। কৃষিকার্যে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ, সেচের উন্নতি, উন্নত ধরনের বীজ ও সার ব্যবহার, পাল্টি শস্য উৎপাদন (rotation of crops), জোতের সংহতিসাধন ও আয়তনবৃদ্ধি, বিক্রয়করণ-ব্যবস্থার উন্নতি, গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের প্রসার প্রভৃতির সাহায্যে কৃষক ও গ্রামবাসীর অবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই সমস্ত দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। আত্যন্তিক চাষের (intensive cultivation) ফলে হয়ত কৃষির উৎপাদন বাড়িবে; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। অতএব, অগণিত জনসংখ্যার জীবিকার সমস্যা মাত্র কৃষির দ্বারা সমাধান করা যাইবে না। ব্যাপক চাষের (extensive cultivation) সম্ভাবনাও খুব বেশী নাই, কারণ অতিরিক্ত জমির পরিমাণ অত্যল্প। এই অবস্থায় শিল্পপ্রসার ভিন্ন নূতন নিয়োগ-সৃষ্টির অন্য কোন পন্থা নাই। শিল্পপ্রসারের সাহায্যেই জমির উপর জনসংখ্যার চাপকে হ্রাস করা সম্ভব হইবে।

কৃষিগত বেকার-সমস্যার সমাধানের পন্থা

শিল্পগত বেকার-সমস্যা (Problem of Industrial Unemployment): কিছুদিন পূর্বেও শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিক সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। কিন্তু ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ অধিক

* **Surveys conducted by the National Sample Survey Organisation in 1958**

হওয়ায় ও কৃষিক্ষেত্রে দুরবস্থা দেখা দেওয়ায় অধিকসংখ্যক লোক বর্তমানে শিল্পাঞ্চলে চাকরির সন্ধানে আসিয়া ভিড় করিতেছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাবে বেকারের সংখ্যা কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন; তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা কার্যকর করা সত্ত্বেও গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নগরাঞ্চলে নিয়োগের অবস্থায় অবনতিই ঘটিয়াছে। নিয়োগ-কেন্দ্রগুলির (Employment Exchanges) হিসাবে ত্রুটি থাকিলেও উহাদের তথ্যাদি হইতে নগরাঞ্চলে বেকার-সমস্যার গতির কতকটা ইংগিত পাওয়া যায়। ১৯৫১ সালে নিয়োগ-কেন্দ্রগুলির চলতি রেজিষ্ট্রারী খাতায় বিভিন্ন নিয়োগপ্রার্থীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩'২৯ লক্ষ। ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে ২৪'৬ লক্ষের কাছাকাছি দাঁড়ায়।* এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, মোট বেকারের একটা সামান্য অংশই নিয়োগ-কেন্দ্রে নাম লেখায়। সুতরাং নিয়োগাবস্থার যে দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিল্পগত বেকার-সমস্যার ক্রমবর্ধমান প্রকৃতি

শিল্প-শ্রমিকের বেকার-সমস্যার মূলে রহিয়াছে নিম্নলিখিত কারণগুলি। প্রথমত, ভারতের শিল্প এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রসারলাভ করে নাই, সুতরাং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নিয়োগের যথেষ্ট সুযোগসুবিধার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্যাদি ক্রমশ মন্দা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে। সুতরাং রপ্তানি শিল্পের উৎপাদন কতকটা সংকুচিত হইয়াছে এবং অনেক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রভাব সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্পেও পড়িয়াছে। তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য আর্থিক কারণে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়াছে। চতুর্থত, পরিবর্তিত অবস্থায় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়া শিল্পদ্রব্যের মূল্যহ্রাস করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নাই। ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহে পরিবর্তিত বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। পঞ্চমত, পরিকল্পনার দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও কৃষিজীবীদের আয় বা ক্রয়শক্তির বিশেষ তারতম্য ঘটে নাই। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। ষষ্ঠত, অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প নিয়োগ ব্যবস্থা না করিয়া শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন (rationalisation) করিবার ফলে অনেক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। কাঁচামালের অভাবেও অনেক সময় উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। পশ্চিমবংগের পাটকল শিল্প ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শিল্পগত বেকারত্বের কারণ

শিল্প-শ্রমিকদের বেকার-সমস্যা সমাধান করিতে হইলে দ্রুত শিল্পপ্রসারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান শিল্পগুলির ক্ষেত্রে শিল্পগত শিক্ষার

* Reserve Bank Bulletin, March 1963

প্রসার, উৎকৃষ্ট ধরনের কাঁচামাল সরবরাহ, মূলধনের অভাবপূরণ, পরিচালনার দক্ষতা, সংগঠনের উন্নতিসাধন প্রভৃতির দিকে অধিক নজর দিতে হইবে।

শিল্পগত বেকার-সমস্যার সমাধান

ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ধরনের নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। নিয়োগবৃদ্ধির জন্য শিল্পের প্রসার কিভাবে ত্বরান্বিত করিতে হইবে তাহা পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রসংগে আর একটি বিষয়ের বিচার প্রয়োজন। ভারতের পুঁজি যেমন স্বল্প ক্রয়শক্তির সংগতিও তেমনি অপ্রচুর। এই অবস্থায় যে-সমস্ত শিল্পে মূলধন অপেক্ষা শ্রম অধিক নিয়োজিত হয় (labour-intensive industries) তাহাদেরই প্রসার করা সংগত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মূল বা ভারী শিল্পগুলি না গড়িয়া তুলিতে পারিলে শিল্প-প্রসারের পথ প্রশস্ত হইবে না। এইজন্য মূলধন প্রয়োজন হইলেও উহাদের প্রসার করিতে হইবে। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের বেলায় বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পরিবর্তে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রসারের উপর সাময়িকভাবে অধিক জোর দেওয়া যাইতে পারে, কারণ ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন অপেক্ষা শ্রমিকই অধিক নিয়োজিত হয়। ইহাতে সত্বর বেকার-সমস্যার কতকটা সুরাহা হইবে। অনেকে অবশ্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। শিল্পপ্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারকে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। রপ্তানি-প্রসারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

শিল্পগঠন ও শিল্পপ্রসার হইল দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা। যে-পর্যন্ত-না দেশ শিল্পোন্নত হইতে পারিবে সে-পর্যন্ত বেকার-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যেভাবে দ্রুত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজন। রাস্তা ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি জনসেবামূলক কার্যাদির সাহায্যে সাময়িকভাবে নিয়োগের (relief type employment) ব্যবস্থা করিয়া বেকারাবস্থার দুর্দশা কতকটা দূরীভূত করা সম্ভব হইবে।

পরিশেষে, বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থায় জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না করিতে পারিলে বেকারের সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই চলিবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা (Problem of Unemployment amongst the Educated Class) : বর্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। সরকারী ও অন্যান্য মহলে ইহাতে উদ্বেগেরও সৃষ্টি হইয়াছে যথেষ্ট। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি

বেকার-সমস্যা সাধারণ বেকার-সমস্যা হইতে মূলত ভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও শিক্ষিত বেকার রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে অধিক চেতনাসম্পন্ন। সুতরাং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে শিক্ষিত বেকারকে অধিক বিপজ্জনক বলিয়া মনে করা হয়।

দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত তাহা নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তবে সম্প্রতি যে উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯৫৫ সালে নিযুক্ত অনুসন্ধান দলের (Study Group) মতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ৫·৫ লক্ষের মত হইবে। বেসরকারী মহল হইতে অনুমান করা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার সূচনায় এই সংখ্যা ২০ লক্ষে আসিয়া পৌছায়।* এই অনুমান অতিরঞ্জিত মনে করা হইলেও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যে দিন দিন বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরকারী হিসাব অনুসারেই তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে নিয়োগের সম্প্রসারণ সত্ত্বেও 'পূর্ণ' শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৭·৫ লক্ষ দাঁড়াইবে।** অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবংগ, উত্তরপ্রদেশ, তৎকালীন বোম্বাই এবং দিল্লীতেই গ্রাজুয়েট বেকারদের সংখ্যা যে অধিক এ-তথ্যও সরকারী মহল হইতে প্রচার করা হইয়াছে।†

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারের কারণ সম্পর্কে সর্বপ্রথম দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই দায়ী করা হয়। বলা হয়, দেশের শিক্ষা অতিমাত্রায় সাহিত্যাশ্রয়ী এবং বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কচ্যুত। ইহা ছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত হউক বা না-হউক ছাত্রছাত্রীরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাইয়া ভিড় জমায় এবং প্রত্যেক বৎসর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়নের জন্য যে-সমস্ত শিল্পগত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন তাহা তাহারা মিটাইতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় সরকারী চাকরি আর না-হয় কেরাণিগিরির দিকে তাহারা ধাবিত হয়। ফলে দেখা দেয় শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যাপক বেকার-সমস্যা। এই অভিযোগের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা থাকিলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে অগণিত জনসংখ্যার এক অতি ক্ষুদ্রাংশই শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। যে-দেশে শতকরা প্রায় ৭৬ জন নিরক্ষর সে-দেশে শিক্ষিত বেকার-সমস্যার জন্য শিক্ষাধিক্যের অভিযোগ আনয়ন করা নিজেদের দুর্বলতা ও অসামর্থ্যকে ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। যে-পর্যন্ত-না নিয়োগের যথেষ্ট সুযোগসুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় সে-পর্যন্ত পেশাগত বা শিল্পগত শিক্ষাই হউক বা অন্য শিক্ষাই হউক কোনটাতেই সুবিধা হইবে না। শিল্পগত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। শিক্ষাপ্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়াও কোন লাভ নাই, কারণ বর্তমান যুগে অশিক্ষিত বেকার শিক্ষিত বেকারের মতই সমানভাবে

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যার কারণ

* Dr. N. Das, Unemployment, Full Employment and India

** Unemployment in Urban Areas, Manpower Division of the Ministry of Labour

† The pattern of Graduate Unemployment, published by the same authority

বিপজ্জনক। যাহাই বলা হউক-না কেন, শিক্ষিত বেকার-সমস্যার আসল কারণ হইল অর্থনৈতিক। শিল্পপ্রসারের অভাব ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ফলেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য নিয়োগের যথেষ্ট সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই শিক্ষিত বা মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার-সমস্যার সমাধানের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইবে। পাঠ্যসূচীর মধ্যে বিভিন্নতা আনয়ন করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। পেশাগত কারিগরী শিক্ষার প্রসার বিস্তার করিতে হইবে। সম্প্রতি সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় পাঠ্যবস্তুর বিভিন্নতা এবং পেশাগত বা শিল্পগত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যাহারা উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে যায় তাহারা তিন বৎসর অধ্যয়নের পর ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে পারে।

এই বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার

কিন্তু যে একমাত্র শিক্ষা-সংস্কারের সাহায্যে সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যাপক শিল্পপ্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্তুত, ইহার সাহায্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়োগের সুযোগসুবিধার সৃষ্টি করা যাইতে পারে।*

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যার প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালে যে অনুসন্ধান দল (Study Group) নিযুক্ত হয় তাহা কয়েকটি পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করে। প্রথম সুপারিশ হইল যে ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি নির্মাণ, আসবাব তৈয়ারি, ঢালাই-এর কাজ, যন্ত্রপাতি, গাড়ী প্রভৃতি মেরামতের কাজের জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, যাহাতে শিক্ষিতদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও সবল দৃষ্টিভংগি প্রসারলাভ করে এবং হাতের কাজ করিতে অনিচ্ছা অপসারিত হয় তাহার জন্য কতকগুলি ক্যাম্পের (Orientation Camps) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ক্যাম্পগুলি আবার শিক্ষিত ব্যক্তি ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিবে। তৃতীয়ত, সমবায়িক দ্রব্য পরিবহণ-ব্যবস্থা (cooperative goods transport) প্রবর্তনের সাহায্যে শিক্ষিতদের নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত শিক্ষিত যুবকশ্রেণী চাকরির সন্ধানে যে দুর্দশা ভোগ করে তাহা অপসারণের জন্য অনুসন্ধান দল সরকারী চাকরির নিয়োগ-পদ্ধতির উন্নতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ব্যুরোর (University Employment Bureau) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়।

অনুসন্ধান দলের সুপারিশ

এই সকল সুপারিশের অধিকাংশই কার্যকর করা হইয়াছে এবং যাহাতে শিক্ষিত বেকাররা সহজেই চাকরি খুঁজিয়া পায় তাহার জন্য ১৯৪৫ সালে গঠিত

* Dr. N. Das, Unemployment, Full Employment and India

জাতীয় কর্মসংস্থান সেবাকে (National Employment Service) সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। বর্তমানে এই সেবার অধীনে ৩২৫টির মত নিয়োগ-সংস্থা (Employment. Exchanges) আছে। জাতীয় কর্মসংস্থান সেবাকে পরামর্শ দিবার জন্য ১৯৫৮ সালে একটি 'কর্মসংস্থা কমিটি' (Central Committee on Employment) গঠন করা হইয়াছে।

অবলম্বিত অন্যান্য ব্যবস্থা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নিয়োগ (Five Year Plans and Employment): প্রথম পরিকল্পনার সময় নিয়োগবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন ১১ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল (১) কার্য ও শিক্ষাকেন্দ্র; (২) ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়কে বিশেষ সাহায্যদান; (৩) যে-সকল ক্ষেত্রে লোকবলের অভাব সে-সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার; (৪) রাজ্য সরকার ও অন্যান্য সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের দ্রব্য ক্রয়; (৫) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য; (৬) জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার প্রতিষ্ঠা; (৭) পথবাট্টী যানবাহনের প্রসার; (৮) ঘরবাড়ী নির্মাণ; (৯) ব্যক্তিগত বাড়ীনির্মাণ কার্যকে উৎসাহ প্রদান; (১০) বাস্তুহারাদের সহরনির্মাণে সাহায্য; (১১) ব্যক্তিগত মূলধনে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রসারের পরিকল্পনাকে উৎসাহপ্রদান। যাহাতে নিয়োগ বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনার কার্যকে সম্প্রসারিত করা হয়। ইহা সত্ত্বেও দেশের বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রথম পরিকল্পনার ফলে মাত্র ৪৫ লক্ষের মত অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ নিয়োগের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই হিসাবের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত নিয়োগের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ধরা হয় নাই। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলেই পরিকল্পনার ফল অধিক ফলে। পুরাপুরিভাবে নিয়োগ সৃষ্টি ছাড়াও অর্ধ-নিয়োগ (under-employment) সমস্যার কতকটা সমাধান হয়। কিন্তু তাহা হইলেও প্রথম পরিকল্পনায় প্রয়োজনের তুলনায় নিয়োগ সৃষ্টি পরিমাণ ছিল সামান্যই। ইহার প্রধান কারণ হইল শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি।

প্রথম পরিকল্পনা

নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নিয়োগ বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ভারতের শ্রমিকসংখ্যা প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপ ধরা হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১ কোটি নূতন শ্রমিক শ্রমিকদলে যোগদান করিবে অনুমান করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সহরাঞ্চলের শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৩৮ লক্ষ এবং গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধির পরিমাণ ৬২ লক্ষ। নূতন শ্রমিকসংখ্যার নিয়োগের সমস্যা ব্যতীত ৫৩ লক্ষের

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

মত পুরাতন নিয়োগপ্রার্থী ছিল। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ১ কোটি ৫৩ লক্ষ নিয়োগের সুযোগসুবিধার সৃষ্টি করা প্রয়োজন বিবেচিত হইয়াছিল। এই হিসাবের মধ্যে অবশ্য গ্রামাঞ্চলের অর্ধ-নিয়োগের পরিমাণ ধরা হয় নাই। অতএব দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সমস্যাকে তিন দিক হইতে বিবেচনা করা হইয়াছিল। প্রথমত, নূতন কর্মপ্রার্থীদের জন্য নিয়োগ সৃষ্টি; দ্বিতীয়ত, পুরাতন বেকারদের জন্য কার্যের ব্যবস্থা; এবং তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের অর্ধ-বেকারদের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থান। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার অনুরূপ কার্যক্রম অনুসরণের দ্বারা ১ কোটি অতিরিক্ত মোট নিয়োগের আশা করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ২০ লক্ষের এবং কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে ৮০ লক্ষের নিয়োগের অনুমান করা হইয়াছিল। অবশ্য এই অতিরিক্ত নিয়োগের মধ্যে কতখানি স্তরীভূত বা স্থায়ী নিয়োগ (sedimentary employment) ও কতখানি আবর্তনমূলক বা অস্থায়ী নিয়োগ (revolving employment) তাহা পৃথক করিয়া দেখানো হয় নাই। ফলে, নিয়োগের নীটবৃদ্ধির পরিমাণ কত হইবে তাহা পরিমাপ করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, অতিরিক্ত নিয়োগ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর দেশে ৫০ লক্ষের উপর বেকার থাকিয়া যাইবে, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা সম্পর্কে ১৯৫৫ সালের অনুসন্ধান দল হিসাব করিয়াছিল যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষের মত এইরূপ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে। ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে মোটামুটি ১৪.৪ লক্ষ লোক নিয়োগের সুযোগ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। অতএব, বাকী লোকের নিয়োগের জন্য অনুসন্ধান দল কতকগুলি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছিল। এই সমস্ত সুপারিশের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। সরকার পরীক্ষামূলকভাবে অনুসন্ধান দলের সুপারিশ কার্যকর করার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কিন্তু নিয়োগ সম্প্রসারণ মোটেই আশানুরূপ হয় নাই। মোটামুটি হিসাব অনুসারে ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে ৮০ লক্ষের মত অতিরিক্ত নিয়োগের সৃষ্টি সম্ভব হয়। কিন্তু ঐ পরিকল্পনায় কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় অনুমান অপেক্ষা ১৭ লক্ষ বেশী। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনাকে সুরু করিতে হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষাও ৩৭ লক্ষ বেশী বা মোট ৯০ লক্ষের উপর কর্মপ্রার্থী লইয়া।

ইহার উপর ১৯৬১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে অনুমান করা হইয়াছে যে, মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ নূতন কর্মপ্রার্থী আসিয়া যুক্ত হইবে। অতএব, তৃতীয় পরিকল্পনায় যদি বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হয় তবে ২ কোটি ৬০ লক্ষ (৯০ লক্ষ+১ কোটি ৭০ লক্ষ) নিয়োগপ্রার্থীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ এবং কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে মাত্র ১ কোটি ৫ লক্ষ—মোট এই ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা

করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় নূতন কর্মপ্রার্থীদের (১ কোটি ৭০ লক্ষ) জন্যও নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না—পুরাতন কর্মপ্রার্থীদের জন্য ব্যবস্থা করা ত দূরের কথা। স্বাভাবিকভাবেই, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১ কোটি ২০ লক্ষের মত কর্মপ্রার্থী থাকিয়া যাইবে

তৃতীয় পরিকল্পনা

নিয়োগসৃষ্টির ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার আর একটি ব্যবস্থা হইল গ্রামাঞ্চলে নিয়োগ সম্প্রসারণ। ইহা প্রধানত সংঘটিত হইবে গ্রামীণ শিল্প সংগঠন ও গ্রামীণ নির্মাণকার্যের (rural works) মাধ্যমে। গ্রামীণ নির্মাণ-কার্যের ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ২৫ লক্ষ লোক বৎসরে ১০০ দিনের মত অতিরিক্ত কাজ পাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ফলে অর্ধ-বেকারত্বের পরিমাণ কিছুটা ঘুচিবে।

গ্রামাঞ্চলে নিয়োগবৃদ্ধি

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, নিয়োগের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও প্রত্যেক পরিকল্পনার শেষে নিয়োগপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। উপরন্তু, দেখা গিয়াছে যে, নিয়োগবৃদ্ধির অধিকাংশই হইতেছে স্বল্প-মেয়াদী বা ত্রাণমূলক (relief type); দীর্ঘমেয়াদী বা অর্থনৈতিক ধরনের (economic type) নিয়োগবৃদ্ধির পরিমাণ অতি সামান্যই। আবার, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার অধিকাংশ করা হইতেছে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে। ইহাকে অবশ্য কাম্য বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে এবং আশা করা হইয়াছে যে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে (১৯৭৬ সালে) কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা কমিয়া শতকরা ৬০ ভাগে দাঁড়াইবে।

উপসংহার

প্রশ্নোত্তর

1. What is the nature of the Unemployment Problem in India? What measures should be taken to solve it? (১৫৩-১৬০ পৃষ্ঠা)

2. Examine the causes of the recent increase in Unemployment in India. How far did the Second Five Year Plan help to solve the problem?

(১৫৪-১৫৫, ১৫৬, ১৫৮-১৫৯ এবং ১৬০-১৬১ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the steps taken by the Government during the Plan to increase the employment opportunities in this Country.

(C. U. B. Com. (P. I) 1962) (১৬০-১৬২ পৃষ্ঠা)

* Third Five Year Plan এবং India—1962

সপ্তম অধ্যায়

সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা

(Public Finance)

বর্তমান জগতে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও রাষ্ট্রের আয়ব্যয় সম্পর্কে মানুষের ধারণা বিশেষ উচ্চ ছিল না। তখনকার দিনের প্রচলিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে ধারণা ছিল যে রাষ্ট্রের কার্য যত সীমাবদ্ধ করা যাইবে ততই মানুষের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। সুতরাং এই নিষ্ক্রিয় পুলিসী রাষ্ট্রের কর ও ব্যয় যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করা হইত। বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে আর কেহ বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্র এখন সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র, পুলিসী রাষ্ট্র নয়; সমাজের সর্বাংগীণ মংগলসাধন ইহার অন্যতম কর্তব্য। তাই প্রায় প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা চলিয়াছে পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মানের উন্নতিসাধন করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের পথ প্রশস্ত করিবার। এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ব্যয়ভার বহনের জন্য চাই প্রচুর অর্থ। সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হইল কিভাবে জনসাধারণের অসুবিধা না করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা যায়। অন্য আর একটি দিক হইতেও রাজস্ব-ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়। আর্থিক বা ধনগত বৈষম্য অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি। আয়ব্যয়-ব্যবস্থার সাহায্যে এই ধনবৈষম্য অপসারণের প্রচেষ্টা চলিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

অর্থনৈতিক জীবনে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার গুরুত্ব

ভারতের সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ (Evolution of India's Financial System): বর্তমানে ভারতে আমরা যে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা দেখিতে পাই তাহা বিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থার আলোচনার পূর্বে এই বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত এবং ফলে প্রাদেশিক সরকারগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার রূপ জে. বি. নর্টনের (J. B. Norton) বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। তিনি বর্ণনা প্রসংগে এক স্থানে মন্তব্য করিয়াছেন: "এমনকি দুইজন ঝাড়ুদারের এক টাকা করিয়া মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হইত।"

কেন্দ্রীভূত আয়ব্যয়-ব্যবস্থা

এই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষের ফলে ও শাসনকার্যে নানারূপ অসুবিধার জন্য আয়ব্যয়-ব্যবস্থার ক্রমবিকেন্দ্রিকরণের নীতি গৃহীত হয়, এবং এই শতাব্দীর প্রায় দ্বিতীয় দশক অবধি একপ্রকার আধা-বিকেন্দ্রিকৃত ব্যবস্থা চলিতে থাকে। তারপর ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কারে রাজস্বের উৎসগুলিকে কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের মধ্যে পরিষ্কারভাবে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়।

আয়ব্যয়-ব্যবস্থার ক্রমবিকেন্দ্রিকরণ :

এই রাজস্ব ভাগাভাগির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বে ৯ কোটি টাকার মত ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতিপূরণের জন্য প্রয়োজন হয় প্রদেশগুলি কর্তৃক কেন্দ্রকে অর্থপ্রদানের। মেষ্টন কমিটি নামক একটি কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রদেশগুলির অর্থ-প্রদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। ক্রমশ কেন্দ্রীয় রাজস্বের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় প্রদেশগুলির অর্থসাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া অবশেষে ১৯২৭ সালে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১। ১৯১৯ সালের ব্যবস্থা ও মেষ্টন রোয়েদাদ

ভারতীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হইল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। এই আইনে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়। আংশিকভাবে ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল প্রবর্তিত করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির রাজস্বসংগ্রহ ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের আইনে রাজস্ব বণ্টন সম্পর্কে যে-ব্যবস্থা করা হয় তাহাকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যায় :

২। ১৯৩৫ সালের আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থা :

(১) কতকগুলি রাজস্বকে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়—অর্থাৎ, ঐ সম্পর্কে করস্থাপনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় কেন্দ্রীয় আইনসভার হস্তে। উদাহরণস্বরূপ, বাণিজ্যশুল্ক, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, কোম্পানী আয়কর, লবণকর, আয়কর (কৃষি-আয় বাদ দিয়া), রেলপথের ভাড়া বা মাসুলের উপর কর, ষ্ট্যাম্পকর, অ-কৃষি-সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, অ-কৃষিজমি ব্যতীত মূলধনের উপর কর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(২) কতকগুলি রাজস্বপ্রাপ্তির উৎসকে প্রাদেশিক তালিকার (Provincial List) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রাদেশিক রাজস্বের মধ্যে ভূমিরাজস্ব, অহিফেন, গাঁজা, সুরা ইত্যাদির উপর অন্তঃশুল্ক, কৃষি-আয়ের উপর কর, বাড়ী জমি ইত্যাদির উপর কর, পেশা ব্যবসায় বৃত্তি ইত্যাদির উপর কর, বিক্রয় কর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কতকগুলি করের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করা হয় যে, উহাদের ধার্য ও আদায় করিবে কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু ভোগ করিবে প্রাদেশিক সরকার। অ-কৃষি-সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, বাণিজ্যিক ষ্ট্যাম্পের উপর কর প্রভৃতি এই

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে কর হইতে প্রাপ্ত অর্থকে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, আয়কর, পাটের উপর রপ্তানি শুল্ক, তামাক ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, লবণকর হইতে প্রাপ্ত অর্থকে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিবার ব্যবস্থা হয়। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদেশগুলিকে সাধারণ এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য অর্থসাহায্যের বিধান ছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হইবার পর প্রদেশগুলিকে আয়কর ও পাটের উপর রপ্তানি শুল্কের অংশ বণ্টন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্থসাহায্য বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য স্যর অটো নিমেয়ারকে (Sir Otto Niemeyer) নিয়োগ করা হয়। নিমেয়ারের সুপারিশ মোটামুটিভাবে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। ইহাকে নিমেয়ার রোয়েদাদ বলা হয়। সংক্ষেপে নিমেয়ার রোয়েদাদ ছিল এইরূপ: আয়করের শতকরা ৫০ ভাগ প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। বণ্টনযোগ্য অর্থের শতকরা ২০ ভাগ করিয়া পাইবে বাংলা ও বোম্বাই। পাট-রপ্তানি শুল্কের শতকরা ৬২½ ভাগ পাট-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত ঘাটতিপূরণের জন্য কয়েকটি প্রদেশকে অর্থসাহায্য করিবার সুপারিশ করা হয়।

৩। নিমেয়ার রোয়েদাদ

১৯৪০ সালে যুদ্ধাবস্থায় আয়কর বণ্টন সম্পর্কে নিমেয়ার-ব্যবস্থার কিছুটা সংশোধন করা হয়। ইহার পর দেশবিভাগের ফলে নিমেয়ার রোয়েদাদের একপ্রকার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালের ভারত সরকারের (রাজস্ব বণ্টন) নির্দেশ দ্বারা নিমেয়ার রোয়েদাদের অস্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হয় এবং প্রদেশগুলির মধ্যে আয়কর ও পাটের উপর রপ্তানি শুল্কের বণ্টনযোগ্য অংশের ভাগাভাগির রদবদল করা হয়। পরে ১৯৪৯ সালে প্রদেশগুলির মধ্যে আয়কর ও পাটের উপর রপ্তানি শুল্কের অংশ বণ্টন নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার শ্রীচিন্তামন দেশমুখকে নিয়োগ করে। তাঁহার রিপোর্ট দেশমুখ রোয়েদাদ (Deshmukh Award) নামে পরিচিত। সরকার দেশমুখের সুপারিশ গ্রহণ করে এবং উহা ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

৪। দেশবিভাগের পর নিমেয়ার রোয়েদাদের পরিবর্তন

৫। দেশমুখ রোয়েদাদ

দেশমুখ রোয়েদাদের ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয় পশ্চিমবংগের। অবিভক্ত বংগদেশ আয়করের বণ্টনযোগ্য অংশের শতকরা ২০ ভাগ পাইত; দেশমুখ রোয়েদাদে উহা কমাইয়া পশ্চিমবংগকে মাত্র শতকরা ১২ ভাগ প্রদান করা হয়। ইহার পূর্বেই আবার ১৯৪৮ সালের রদবদলের ফলে পাট-রপ্তানির শুল্কের যে-অংশ পাট-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলি পাইত তাহা শতকরা ৬২½ ভাগ হইতে কমিয়া ২০ ভাগে দাঁড়াইয়াছিল। দেশমুখ রোয়েদাদে পাট-রপ্তানি

শুল্কের ভাগাভাগির প্রশ্ন তুলিয়া দিয়া প্রদেশগুলিকে নির্দিষ্ট অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে পশ্চিমবংগের অংশে পড়ে বাৎসরিক ১০৫ লক্ষ টাকা।

৬। বর্তমান ব্যবস্থা

দেশমুখ রোয়েদাদের পর সংবিধানের (Constitution of India) নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নিযুক্ত ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে আয়কর প্রভৃতির পুনর্বণ্টন এবং কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলিকে অনুদানের পরিমাণ নির্ধারিত হইতেছে। এ-পর্যন্ত তিনটি ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। অতএব, তৃতীয় কমিশনের সুপারিশক্রমেই বর্তমানের আয়কর বণ্টন ইত্যাদি কার্য চলিতেছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের মূলসূত্রগুলি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মতই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার কয়েকটি সাধারণ নীতি (General Principles of Federal Finance) : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে নিজস্ব ক্ষেত্রে একে অপরের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকে। অর্থাৎ,

অংগরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও রাজস্ব বণ্টন

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং অংগরাজ্য উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় হইল স্বাধীন। এই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে উভয় সরকারকেই নিজস্ব কর্তব্যপালনের জন্য পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা এবং ঐ আয়ের উপর সংশ্লিষ্ট সরকারের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। অতএব, দায়িত্বপালনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় এমনভাবে প্রত্যেক সরকারের জন্য রাজস্বপ্রাপ্তির পৃথক সূত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এইভাবে রাজস্বপ্রাপ্তির সূত্র ও কর্তব্যের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্যবিধান করা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব। ইহা ব্যতীত শাসনতান্ত্রিক সুবিধার (administrative expediency) প্রশ্নও রহিয়াছে। যাহাতে সাধারণ করদাতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়, যাহাতে কর আদায়ে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং যাহাতে কর স্থাপনে সমতা রক্ষিত হয় তাহার জন্য আয়করের মত কতকগুলি কর আদায়ের ভার দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর, কিন্তু কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ হয় দুই সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়, না-হয় উহাকে আঞ্চলিক

স্বাতন্ত্র্যনীতির সহিত পর্যাপ্তি ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধার নীতির সামঞ্জস্যবিধান

সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পর্যাপ্তি (adequacy) এবং শাসনতান্ত্রিক সুবিধার (administrative expediency) স্বার্থে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যনীতিকে (principle of independence) কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিতে হয়। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় যাহা করা হয় তাহা হইল এইরূপ : প্রথমত, রাজস্বপ্রাপ্তির কতকগুলি সূত্রকে দুই

অনুদান-ব্যবস্থা

সরকারের মধ্যে পৃথকভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি সূত্রকে যুগ্ম কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। ইহা ছাড়া রাজস্ব বণ্টন ও অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্ত

করার সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যনীতিকে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, অর্থসাহায্যের (grants) কথা উল্লেখ করা যায়। প্রায় সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অর্থ-সাহায্য করা বাধ্যতামূলক (obligatory) নয়, সেখানে আঞ্চলিক সরকারের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট আশংকা থাকে।

রাজস্বসূত্র বণ্টনের সময় দুই সরকারের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের প্রকৃতির দিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সম্প্রসারণশীল কার্যের দায়িত্ব যাহার উপর ন্যস্ত থাকে তাহার হাতে প্রসারণশীল রাজস্বসূত্র দেওয়া প্রয়োজন। অপরপক্ষে অনতি-পরিবর্তনশীল কার্যাদির জন্য অনতিপরিবর্তনশীল (inelastic) রাজস্বসূত্র নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত। তবে এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান জগতে প্রায় সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছে এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য প্রায় বিলুপ্তিলাভ করিতেছে। এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার মূলে রহিয়াছে শিল্পগত কলাকৌশল ও পরিবহণের উন্নতি, বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট, রাষ্ট্রের সমাজ-কল্যাণকর কার্য এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এই সকল কার্য কেন্দ্রীয় শক্তির সাহায্য ব্যতীত অংগরাজ্যের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

বর্তমান জগতে কেন্দ্রের দিকে ঝোঁক অতি প্রবল

বর্তমান সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থা

(Federal Finance under the Present Constitution): যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার সাধারণ নীতির আলোচনার পর দেখা যাউক বর্তমান সংবিধানের বণ্টন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সংবিধান ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যবস্থাকেই মোটামুটিভাবে বজায় রাখিয়াছে। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে ইউনিয়ন তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List) ও যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) এই তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের গুরুত্ব অতি সামান্য।

রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতার তিনটি তালিকা

ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল: বাণিজ্য-শুল্ক; আয়কর (কৃষি-আয়কর ব্যতীত);* কোম্পানী আয়কর;** বিভিন্ন দ্রব্যের (মানুষের উপভোগের কোহল পানীয়, অহিফেন, ভারতীয় গাঁজা ও নিদ্রাবহ পদার্থ ব্যতীত) উপর অন্তঃশুল্ক; ব্যক্তিসমূহের এবং কোম্পানীসমূহের (কৃষিভূমি ভিন্ন অন্য) পরিসম্পদের মূলধন-মূল্যের উপর কর; কোম্পানীসমূহের মূলধনের উপর কর; কৃষিজমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কিত সম্পত্তি-শুল্ক;

ক। ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

* মূলধন-লাভ কর আয়করেরই অন্তর্ভুক্ত।

** অতিরিক্ত মুনাফা কর (super-profit tax) কোম্পানী আয়করের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষিজমি ছাড়া অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত শুল্কসমূহ; রেলপথে, বিমানপথে বা সমুদ্রপথে বাহিত দ্রব্যসমূহ ও যাত্রীদের উপর সীমাকর (terminal taxes); রেলপথে বাহিত যাত্রী ও বস্তুর উপর কর; বিনিময় পত্র, চেক, প্রমিসরি নোটসমূহ, বহনপত্র (bills of lading), প্রত্যয়পত্র, বীমা-পলিসি, অংশ হস্তান্তর ইত্যাদি সম্পর্কিত ষ্ট্যাম্প-শুল্কের হার; ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও ভাবী বাজারে লেনদেনের উপর ষ্ট্যাম্প কর ব্যতীত অন্য কর। ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট বিষয় (residuary subjects)—অর্থাৎ, উপরি-উক্ত তিনটি তালিকার বহির্ভূত কর ইউনিয়নের এক্তিয়ারভুক্ত।

খ। রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

রাজ্যের রাজস্বপ্রাপ্তির প্রধান সূত্রগুলি হইল: ভূমিরাজস্ব; কৃষিগত আয়ের উপর কর; কৃষিজমির উপর উত্তরাধিকার কর; কৃষিজমির সম্পর্কিত সম্পত্তি-কর (Estate Duty); ভূমি ও বাড়ীর উপর কর; খনিজ অধিকারসমূহের উপর কর; রাজ্যে নির্মিত বা উৎপাদিত নিম্নলিখিত দ্রব্য-সমূহের উপর অন্তঃশুল্ক (Excise Duties) এবং অনুরূপ দ্রব্যসমূহ ভারতের অন্যত্র নির্মিত বা উৎপাদিত হইলে একই হারে অথবা নিম্নতর হারে তাহার উপর প্রতিশুল্ক। বিদ্যুৎ ব্যবহার বা বিক্রয়ের উপর কর; সংবাদপত্র ভিন্ন অন্য দ্রব্যের ক্রয় বা বিক্রয়ের উপর কর; রাজপথ বা অন্তর্দেশীয় জলপথে বাহিত দ্রব্য ও যাত্রীদের উপর কর; রাজপথে ব্যবহারযোগ্য যানবাহনের উপর কর; পথকর (tolls); বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা ও চাকরির উপর কর; বিলাসদ্রব্যের উপর কর (প্রমোদ, আমোদ, পণক্রিয়া ও জুয়াখেলার উপর কর ইহার অন্তর্ভুক্ত); ইত্যাদি।

গ। ইউনিয়ন কর্তৃক ধার্য কিন্তু রাজ্য কর্তৃক সংগৃহীত ও ভোগ্য কর

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে বর্তমান সংবিধানে পর্যাপ্তি ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধার স্বার্থে কতকগুলি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থাগুলি নিম্নলিখিত রূপ: (১) কতকগুলি শুল্ক আছে যাহা কেন্দ্র স্থাপন করে কিন্তু উহা সংগ্রহ ও ভোগ করে রাজ্যসমূহ। ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত ষ্ট্যাম্প কর এবং ঔষধপত্র ও প্রসাধনসামগ্রীর উপর অন্তঃশুল্ক এই পর্যায়ে পড়ে।

ঘ। ইউনিয়ন কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত কিন্তু রাজ্যের মধ্যে বণ্টিত কর

(২) অ-কৃষি-সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, সীমাকর (terminal taxes), রেলপথে যাত্রীদের বস্তুর উপর কর প্রভৃতি কতকগুলি কর আছে যাহা ইউনিয়ন স্থাপন ও সংগ্রহ করে, কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব রাজ্যসমূহকে সমর্পণ করা হয়। (৩) কৃষি-আয় ব্যতীত অন্য আয়ের উপর কর ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত ও সংগৃহীত হয় কিন্তু উহা ইউনিয়ন ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে করপোরেশন কর (Corporation Tax) বণ্টিত হয় না। ইহা ছাড়া ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহে (Union Territories) উৎপন্ন আয়কর এবং কেন্দ্রীয় সরকার-প্রদত্ত বেতনাদির উপর দেয় করও বণ্টনযোগ্য আয়করের মধ্যে পড়ে না। এই সকল কর বাবদ সংগৃহীত অর্থ বাদ দিয়া প্রতি

আর্থিক বৎসরে আয়কর হইতে যে নীট অর্থ পাওয়া যায় তাহার একটা অংশ রাজ্যসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। মোট আয়করের শতকরা কত ভাগ রাজ্যগুলি পাইবে এবং রাজ্যগুলির মোট অংশ কিভাবে বণ্টিত হইবে তাহা রাষ্ট্রপতি ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নির্ধারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং আয়কর হইতে রাজ্যের আয় অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

৬। ইউনিয়ন ও রাজ্যের মধ্যে বণ্টিত কর

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য করার ব্যবস্থা থাকে। ভারতীয় সংবিধানেও অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই অর্থসাহায্য দুই প্রকারের —নির্দিষ্ট ধরনের অর্থসাহায্য (specific grants) এবং সাধারণ অর্থসাহায্য (general grants)। নির্দিষ্ট ধরনের অর্থসাহায্য সম্পর্কে সংবিধানের ব্যবস্থা হইল যে প্রতি বৎসর পাট বা পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক হইতে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবংগ রাজ্যকে অংশ সমর্পণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করা হইবে। যতদিন পর্যন্ত পাট বা পাটজাত শিল্পের উপর শুল্ক ধার্য থাকিবে ততদিন পর্যন্ত এই অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা চালু থাকিবে; তবে দশ বৎসরের অধিককাল—অর্থাৎ, ১৯৬০-৬১ সালের পর ঐ ব্যবস্থা চলিবে না।* অর্থসাহায্যের পরিমাণ ফিনান্স কমিশনের সুপারিশসহ বিচারবিবেচনার পর রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করিবেন। নির্দিষ্ট ধরনের অর্থসাহায্য করিবার অন্যান্য ব্যবস্থাও আছে। তপশীলী জনজাতি (Scheduled Tribes) ও তপশীলী অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থার উন্নয়নসাধনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার ব্যয় মিটাইবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে অর্থসাহায্য করা যাইতে পারে। তবে এইরূপ পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ অর্থসাহায্য সম্পর্কে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট যে-সকল রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে সেই সকল রাজ্যকে পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করা হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট হইতে পারে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল সাধারণ অর্থসাহায্যের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন, রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন, অর্থসাহায্যের নীতি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি ফিনান্স কমিশন গঠন করিতে হয়। অবশ্য ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ বাধ্যতামূলক নয়।

অনুদান:

নির্দিষ্ট ধরনের অনুদান

সাধারণ অনুদান

* ১৯৬০-৬১ সাল হইতে এই অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা রহিত করিয়া পাট-উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিকে দেয় সাধারণ অর্থসাহায্য বা অনুদানের (general grants-in-aid) পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, ভারতীয় সরকারী আয়ব্যয় সম্পর্কিত ব্যবস্থা অত্যন্ত কেন্দ্রপ্রবণ; আকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের হইলেও আসলে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিবার দিকে ঝোঁক অতিমাত্রায় প্রবল। রাজ্যের এলাকাধীন রাজস্ব-সমূহ মোটামুটি অস্থিতিস্থাপক (inelastic)। উপরন্তু, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাদিকে পরিবর্তন করিতে বা বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। যাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এবং রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যের সমর্থক তাঁহারা ভারতীয় সংবিধানের কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করিবার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পূর্বেকার ধারণা বর্তমান জগতে একপ্রকার অচল হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেশের মত ভারত জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। পরিকল্পনার কার্যকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সংগতি ও পরিচালনক্ষমতাকে প্রসারিত করিতে হইবে। যাহাতে বিভিন্ন রাজ্য সমতালে দেশের কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার তদারক করিবার ভার কেন্দ্রের উপর অর্পিত করিতে হইবে। ইহার দ্বারা রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ত হইবেই না বরং উহা প্রসারলাভ করিবে।

ভারতীয় সংবিধান কেন্দ্রপ্রবণ

এই যুক্তির ভিতর যে যথেষ্ট সত্য রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে মনে রাখিতে হইবে, কেন্দ্রিকরণ তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন সামাজিক সম্পর্ককে সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠন করা হয়। বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ প্রাধান্যলাভ করিলে কেন্দ্রিকরণ সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়।

ফিনান্স কমিশনসমূহ ও উহাদের সুপারিশ (Finance Commissions and their recommendations): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এ-পর্যন্ত তিনটি ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। উহাদের সুপারিশগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

প্রথম ফিনান্স কমিশন (The First Finance Commission): সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রী কে. সি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে প্রথম ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হয় ১৯৫১ সালে এবং উহার সুপারিশ কার্যকর করা হয় ১৯৫২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে। এই সুপারিশ অনুসারে অবলম্বিত ব্যবস্থা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল:

(১) আয়করের বণ্টন: কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নীট আয়করে রাজ্যসমূহের অংশ শতকরা ৫০ ভাগ হইতে ৫৫ ভাগে লইয়া যাওয়া হয়। এই অংশের শতকরা ৮০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ২০ ভাগ বণ্টন করা হয়

আয়করের বণ্টন

সংগ্রহনীতির ভিত্তিতে। এই দুই ভিত্তিতে বণ্টনের ফলে বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশ পায় যথাক্রমে ১৭·৫০% এবং ১৫·৭৫% করিয়া, কিন্তু পশ্চিমবংগ পায় ১১·২৫%।

(২) ইউনিয়ন অন্তঃশুল্কের (Union Excises) বণ্টনঃ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যগুলিকে তামাক, দিয়াশলাই ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপর ইউনিয়ন অন্তঃশুল্ক হইতে আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ দেওয়া হয়। এই তিনটি দ্রব্য নির্বাচন করিবার যুক্তি হইল যে, ইহাদের ব্যবহার ব্যাপক এবং ইহার স্থায়ী রাজস্ব আয়ের অন্যতম সূত্র। রাজ্যগুলিকে প্রদেয় অংশকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজের অংশে পড়ে যথাক্রমে ১৮·২৩% ও ১৬·৪৪% এবং পশ্চিমবংগের অংশে পড়ে ৭·১৬%।

অন্তঃশুল্কের বণ্টন

(৩) পাট-রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে অর্থসাহায্যঃ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে কিভাবে দেশমুখ রোয়েদাদে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ ধার্য করা হয়। ফিনান্স কমিশন অর্থ-সাহায্য কিছুটা বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করে। ফলে পশ্চিমবংগের বার্ষিক প্রাপ্তির পরিমাণ ১০৫ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

পাট-উৎপাদনকারী ... অর্থসাহায্য

(৪) সাহায্যস্বরূপ অনুদানের (Grants-in-aid) নীতি ও পরিমাণঃ অর্থসাহায্য সম্পর্কে কমিশন কতকগুলি নীতি অনুসরণের কথা উল্লেখ করে। প্রথমত, বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যগুলি করসংগ্রহের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তৃতীয়ত, যে-সকল রাজ্য ব্যয়সংক্ষেপের দিকে লক্ষ্য রাখে তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্তির অধিক উপযোগী বলিয়া মনে করিতে হইবে। চতুর্থত, সাহায্যপ্রদানের সময় বিভিন্ন রাজ্যের অত্যাবশ্যকীয় সমাজসেবামূলক কার্যাদির (social services) অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। যে-সকল রাজ্যের অত্যাবশ্যকীয় সমাজসেবার মান নিম্ন সে-সকল রাজ্যকে অধিকমাত্রায় সাহায্য-প্রদানের অবকাশ রহিয়াছে। পঞ্চমত, যে-সকল রাজ্যের উপর বিশেষ ধরনের দায়িত্ব পড়িয়াছে সে-সকল রাজ্যকে অর্থসাহায্য করিতে হইবে। যেমন, ভারত-বিভাগের ফলে পশ্চিমবংগের উপর সীমান্ত রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব পড়িয়াছে। ষষ্ঠত, সমগ্র জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এমন সমস্ত উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলিকে অর্থসাহায্য করার প্রয়োজন হইতে পারে।

অনুদানের সাধারণ নীতি

উপরি-উক্ত নীতিগুলি প্রয়োগ করিয়া ফিনান্স কমিশন পশ্চিমবংগ উড়িষ্যা পাঞ্জাব আসাম প্রভৃতিকে যথাক্রমে বার্ষিক ৮০ লক্ষ, ৭৫ লক্ষ, ১২৫ লক্ষ, ১০০ লক্ষ করিয়া অর্থপ্রদানের সুপারিশ করে এবং ঐ সুপারিশ অনুসারেই অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।

কেন্দ্র হইতে অর্থসাহায্য

উল্লিখিত ধরনের অর্থসাহায্য প্রদান ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের জন্য বিহার, হায়দরাবাদ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পেপ্‌সু, পাঞ্জাব ও রাজস্থানকে ক্রমবর্ধমান হারে চার বৎসর পর্যন্ত অর্থসাহায্য করিবার ব্যবস্থা ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অনুদান

আশা করা হইয়াছিল, ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে অবলম্বিত এই সকল ব্যবস্থার ফলে রাজ্যগুলির বার্ষিক আয় ২১ কোটি টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। ফলে উহাদের কেন্দ্র হইতে অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ ৬৫ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। ইহার মধ্যে আয়কর ও ইউনিয়ন অন্তঃশুল্কের অংশ হইবে ৭½ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন প্রকার অনুদানের পরিমাণ হইবে ১৪½ কোটি টাকা।

প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের ফলাফল

প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছিল। আশা করা হইয়াছিল, কমিশন রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের কথা বিচারবিবেচনা করিয়া রাজ্যগুলির হাতে অধিকতর পরিমাণ অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু কমিশন রাজ্যগুলির দাবির ন্যায্য বিচার করে নাই। বোম্বাই ও পশ্চিমবংগের দিক হইতে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে আয়করের অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের যে-ভিত্তি কমিশন গ্রহণ করিয়াছে তাহা সমুচিত হয় নাই, সংগ্রহস্থলের (place of collection) উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল। জনসংখ্যার উপর জোর দেওয়ার ফলে বোম্বাই ও পশ্চিমবংগের প্রতি অবিচার করা হইয়াছিল, কারণ এই দুইটি রাজ্যের অভ্যন্তরে আয়কর সংগ্রহের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহা ব্যতীত শিল্পপ্রধান বলিয়া কল্যাণকর কার্য এবং আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য ইহাদের ব্যয়ও অধিক। অন্তঃশুল্কের বণ্টন ব্যাপারে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে জনসংখ্যার পরিবর্তে বিভিন্ন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহার ও উহাদের সংগ্রহস্থলের উপরই ভিত্তি করা সমীচীন ছিল। অনুদান বা অর্থসাহায্য (grants) সম্পর্কে বক্তব্য হইল যে, বাজেট অবস্থার প্রতি অধিক দৃষ্টি না দিয়া বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। আর একটি অভিযোগ ছিল যে সাহায্যস্বরূপ অনুদান-ব্যবস্থা প্রসারের ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে এবং অংগরাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগে পূর্বেকার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা সম্ভব নয়।

প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের সমালোচনা

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন (The Second Finance Commission) : ইহার পর, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রাজ্য পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্বের বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫৬ সালে শ্রী কে. শান্তানম্‌-এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন নিয়োগ করা হয়। প্রথম কমিশনের তুলনায়

দ্বিতীয় কমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল ব্যাপকতর। কমিশনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুপারিশ করিবার ভার ছিল: (১) কেন্দ্র ও পুনর্গঠিত রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য কেন্দ্রীয় করগুলির বণ্টন ও রাজ্যগুলির অংশ নিরূপণ; (২) দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন ও রাজ্যগুলির নিজস্ব রাজস্বসূত্র হইতে অতিরিক্ত করসংগ্রহের প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে-সকল রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন তাহাদিগকে সাহায্যস্বরূপ অনুদান; (৩) রাজ্যসমূহকে দেয় সাহায্যস্বরূপ অনুদানের নীতি-নির্ধারণ; (৪) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকারের ঋণের যথোপযুক্ত সর্ত ও সুদের হার নির্ধারণ।

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশ ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে কমিশন আয়কর, সম্পত্তিকর এবং ইউনিয়ন অন্তঃশুল্কের বণ্টন এবং সাহায্যস্বরূপ অনুদান প্রদান সম্পর্কে প্রধানত প্রথম কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই অন্তর্বর্তীকালের জন্য সুপারিশ (Interim Recommendations) করে। এই অন্তর্বর্তী সুপারিশের ভিত্তিতে কর-বণ্টন ও অনুদান-ব্যবস্থা এক আর্থিক বৎসর বা ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্যই প্রযুক্ত ছিল। এই ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল: অন্তর্বর্তী সময়ে নীট আয়করের শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হইয়াছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে বোম্বাই পাইয়াছিল ১৮·৯১%, উত্তরপ্রদেশ ১৫·৫৯% এবং পশ্চিমবংগ ১১·৪৮%। অ-কৃষি-সম্পত্তির উপর ধার্য সম্পত্তিকর রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর বণ্টনের অনুপাতে বণ্টিত হইয়াছিল।

১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা

ইউনিয়ন অন্তঃশুল্কের মধ্যে দিয়াশলাই, তামাক ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপর ধার্য করের পূর্বের মত শতকরা ৪০ ভাগই রাজ্যগুলিকে দেওয়া হইয়াছিল। জনসংখ্যার ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশ পাইয়াছিল ১৮% এবং পশ্চিমবংগ ৭·৪৯%।

পাটের রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি যে অর্থসাহায্য পাইত তাহার কিছুটা রদবদল করা হইয়াছিল। পুরুলিয়া অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পশ্চিমবংগের প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাইয়া ১৫২·৬৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

তপশীলী জাতির (Scheduled Tribes) কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে গৃহীত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহনের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, মহীশূর, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি রাজ্যকে সাহায্যস্বরূপ অনুদান প্রদান করা হইয়াছিল।

১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হয়। কমিশন প্রথমেই মন্তব্য করে যে অনেক রাজ্যই করসংগ্রহে যথেষ্ট চেষ্টা করে নাই; সম্যক চেষ্টা করা হইলে অনেক রাজ্যই ঘাটতির হাত হইতে রেহাই পাইতে পারিত। আবার কতিপয় রাজ্যে বাকী রাজস্ব ও অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ অত্যধিক এবং অনতিবিলম্বে উহা আদায় করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ-অবস্থায় রাজ্যগুলি যাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক ব্যয়সংকুলানের মত অর্থ পায়

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশ

অনুমান করা হইয়াছিল যে এই নূতন রাজস্ব-বণ্টন ব্যবস্থার ফলে রাজ্য সরকার-গুলি কেন্দ্রীয় কর (Union Taxes) এবং কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য হইতে গড়ে বার্ষিক ১৪০ কোটি টাকা করিয়া পাইবে। ইহা ছাড়া, রেলমাসুলের উপর কর, বিক্রয়করের পরিবর্তে কাপড় চিনি ও তামাকের উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক এবং ইউনিয়ন-প্রদত্ত ঋণের সুদ হ্রাসের ফলে রাজ্যগুলির হাতে বার্ষিক ৩০ কোটি টাকা আসিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। প্রথম কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বণ্টনের ফলে কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলির বার্ষিক অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৯৩ কোটি টাকা।

নূতন রাজস্ব-বণ্টন ব্যবস্থার ফলে রাজ্য-গুলির অধিক অর্থপ্রাপ্তি

প্রথম কমিশনের মত দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল। পশ্চিমবংগের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, আয়কর বণ্টনের ভিত্তি সংগ্রহস্থলের পরিবর্তে জনসংখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা অযৌক্তিক। জন-সংখ্যাকেই বণ্টনের মূলভিত্তি করায় পশ্চিমবংগ, বোম্বাই প্রভৃতি শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির প্রতি অবিচার করা হয়। প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বোম্বাই ও পশ্চিমবংগ যথাক্রমে বণ্টনযোগ্য আয়কর অংশের ১৭·৫০% ও ১১·২৫% পাইয়াছিল। দ্বিতীয় কমিশন উহাদিগকে হ্রাস করিয়া যথাক্রমে ১৫·৯৭% ও ১০·০৮% করে। অন্তঃশুল্ক সম্পর্কে বলা হইয়াছিল যে, রাজ্যগুলির অংশ আরও অধিক হওয়া উচিত ছিল। পশ্চিমবংগের দাবি ছিল যে, অন্তঃশুল্কের বণ্টনের জন্য ব্যাপক ব্যবহারের দ্রব্যকে মনোনীত করিতে হইবে এবং অন্তঃশুল্কের বণ্টন জনসংখ্যার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহার বা উহাদের সংগ্রহস্থানের উপর ভিত্তিতেই করিতে হইবে। রেলমাসুলের উপর কর বণ্টন সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে রাজ্যে অবস্থিত রেলপথের পরিমাণের উপর নির্ভর না করিয়া কোন্ রাজ্যে কত মাসুল আদায় হয় তাহার উপর ভিত্তি করা উচিত ছিল। এদিক হইতে পশ্চিমবংগ ও বোম্বাই-এর প্রতি সবচেয়ে বেশী অবিচার করা হইয়াছিল, কারণ এই দুই রাজ্যে সর্বাধিক রেলমাসুল আদায় হইয়া থাকে।

কমিশনের সুপারিশের সমালোচনা

তৃতীয় ফিনান্স কমিশন ও বর্তমান ব্যবস্থা (The Third Finance Commission and the present position) : আয়কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, কেন্দ্র হইতে সাহায্যস্বরূপ অনুদান প্রভৃতি সংক্রান্ত বর্তমান ব্যবস্থা তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে নির্ধারিত। এই তৃতীয় ফিনান্স কমিশন উহার সভাপতি শ্রীঅশোককুমার চন্দের নামানুসারে 'চন্দ কমিশন' বলিয়াও অভিহিত। ইহার রিপোর্ট ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

(১) আয়করের বণ্টন : তৃতীয় ফিনান্স কমিশন বা চন্দ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আয়কর হইতে লব্ধ নীট রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ৬৬২/৩ ভাগ বর্তমানে রাজ্যসমূহকে দেওয়া হয়, এবং ইউনিয়ন অঞ্চলগুলিকে দেওয়া হয় শতকরা ২১/৩ ভাগ। রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন-নীতি হইল প্রথম ফিনান্স কমিশন নির্দেশিত ফরমূলা বা শতকরা ৮০ ভাগ

আয়কর বণ্টন

জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ২০ ভাগ সংগ্রহের ভিত্তিতে বণ্টন। ফলে বণ্টন-যোগ্য রাজস্বে পশ্চিমবংগের অংশ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ১২.০৯ ভাগে।

আয়কর-রাজস্ব হইতে রাজ্যগুলির এই প্রাপ্তিবৃদ্ধিকে প্রকৃত বৃদ্ধি বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ, কোম্পানীসমূহ যে-আয়কর দেয় তাহা ১৯৬০-৬১ সাল হইতে আর রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় না। ফলে আয়কর হইতে রাজ্যগুলির প্রাপ্তির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং উহাদের ক্ষতি হয়। নীট আয়করে রাজ্যসমূহের অংশ শতকরা ৬৬⅔ ভাগে লইয়া গিয়া এই ক্ষতিপূরণেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবুও পুরাপুরি ক্ষতিপূরণ করিতে পারা যায় নাই। নূতন ব্যবস্থা সত্ত্বেও রাজ্যগুলি আয়কর হইতে বৎসরে ১০ কোটি টাকার মত কম পাইবে।

ইহার নীট ফল

(২) ইউনিয়ন অন্তঃশুল্কের বণ্টন : তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ৮টির পরিবর্তে ৩৫টি দ্রব্যের উপর ধার্য কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কে রাজ্যসমূহকে অংশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু রাজ্যসমূহের অংশ শতকরা ২৫ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া শতকরা ২০ ভাগ করা হইয়াছে। তবুও অনুমান করা হইয়াছে যে এই সূত্র হইতে রাজ্যসমূহের প্রাপ্ত প্রায় দ্বিগুণ হইবে।

অন্তঃশুল্কের বণ্টন

রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তঃশুল্কের অংশ বণ্টনে জনসংখ্যা, উহাদের আর্থিক দুর্বলতা, (financial weakness) এবং অনগ্রসরতা ইত্যাদিকে ভিত্তি করা হইয়াছে। এই নীতিসমূহের প্রয়োগের ফলে বিহারই পাইয়াছে সর্বাধিক অংশ—শতকরা ১১.৫৬ ভাগ ; তুলনায় পশ্চিমবংগকে দেওয়া হইয়াছে শতকরা ৫.০৭ ভাগ।

বিক্রয়করের পরিবর্ত হিসাবে ধার্য 'অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক' (additional excise duties) হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্যগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে ; এবং বস্ত্র চিনি ও তামাক ছাড়াও সিল্কের উপর এইপ্রকার অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হইয়াছে।

অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক

(৩) সম্পত্তিকর বণ্টন : সম্পত্তিকরের বণ্টন ব্যাপারে অনুসৃত নীতির কোনরূপ পরিবর্তন করা হয় নাই। তবে ১৯৬১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে রাজ্যসমূহের অংশের প্রয়োজনীয় রদবদল করা হইয়াছে। ফলে পশ্চিমবংগ পূর্বের শতকরা ৭.৩৭ ভাগের তুলনায় এখন পাইতেছে শতকরা ৮.১১ ভাগ।

সম্পত্তিকর

(৪) রেলযাত্রীর মাসুলের উপর করের পরিবর্তে অনুদান : ১৯৬১-৬২ সালে রেলযাত্রীর মাসুলের উপর কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বকে রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রহিত করিয়া রাজ্যসমূহকে নির্দিষ্ট ১২.৫ কোটি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সেই ব্যবস্থাই প্রবর্তিত রাখা হইয়াছে। এই সূত্র হইতে পশ্চিমবংগের বর্তমানে প্রাপ্তি হইল ৭৯ লক্ষ টাকা।

রেলযাত্রীর মাসুলের উপর করের পরিবর্তে অনুদান

(৫) সাহায্যস্বরূপ অনুদান : দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১১টি রাজ্য মোট ৩৯.৫ কোটি টাকা সাধারণ অনুদান (general grants-in-aid) পাইত। তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উহাকে ১১০.২৫ কোটি টাকায়

লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫২ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি মিটাইবার জন্য এবং ৫৮.২৫ কোটি টাকা রাজ্যসমূহের পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য প্রদান করা হয়।* এই দুই সূত্রের মধ্যে প্রথমটি হইতে পশ্চিমবংগের জন্য কিছুই বরাদ্দ করা হয় নাই; দ্বিতীয়টি হইতে পশ্চিমবংগকে দেওয়া হইয়াছিল বাৎসরিক ৮.৫ কোটি টাকা। পশ্চিমবংগের ন্যায় মাদ্রাজ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্র প্রথম সূত্র হইতে কোনরূপ অনুদান পাইবে না। একমাত্র মহারাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সকল রাজ্যের জন্য পরিকল্পনার আংশিক ব্যয়নির্বাহকল্পে অনুদানের সুপারিশ করা হইয়াছিল। পরিশেষে, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবংগ ছাড়া অপর সকল রাজ্যের মধ্যে সংসরণ-ব্যবস্থার উন্নয়নসাধনের জন্য বৎসরে ৯ কোটি টাকা বণ্টন করা হয়।

সাধারণ অনুদান

নির্দিষ্ট অনুদান

ইহা ছাড়া কমিশন শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ মন্তব্য করিয়াছে। ইহার মতে পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ফিনান্স কমিশনের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যাইতেছে না। কারণ ফিনান্স কমিশনে কিছু কিছু কাজ, যেমন রাজ্য-পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য বরাদ্দ, পরিকল্পন কমিশনই করিয়া আসিতেছে। এই কমিশনের মতে, হয় ফিনান্স কমিশনের কার্যের পরিধি বিস্তৃততর করিতে হইবে, না-হয় ফিনান্স কমিশনের কার্যসমূহ পরিকল্পনা কমিশনের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। কমিশন আরও কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, যেমন কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর রাজ্যের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যয়-সংকোচন, রাজ্যগুলির করবৃদ্ধির সম্ভাব্য ক্ষমতার পরীক্ষা, ইত্যাদি।

কমিশনের সাধারণ মন্তব্য

তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে অনুসৃত বর্তমান বণ্টন-ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত—অর্থাৎ, ১৯৬২-৬৬ সাল—এই চার বৎসর প্রবর্তিত থাকিবে। কমিশনের সবগুলি সুপারিশ সম্পর্কে উহার সদস্যরা একমত ছিলেন না। রাজ্য-পরিকল্পনার ও সংসরণ-ব্যবস্থার উন্নয়নসাধনের জন্য যে-অনুদানের সুপারিশ করা হইয়াছিল সে-সম্পর্কে একজন সদস্য বিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে একটি ছাড়া অন্য সবগুলিই ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছে; রাজ্য-পরিকল্পনার জন্য যে-অনুদানের সুপারিশ করা হইয়াছিল শুধু তাহাই গ্রহণ করা হয় নাই। অবশ্য পরিকল্পনার জন্য রাজ্যগুলিকে পূর্বের ন্যায় কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য দেওয়া হইবে, শুধু উহা অনুদান হিসাবে দেওয়া হইবে না মাত্র। যাহা হউক কমিশনের সুপারিশের ফলে, কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে রাজ্যগুলির প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় উহাদের পক্ষে নানারূপ কার্যনির্বাহ করা সুবিধা হইবে। আয়কর হইতে রাজস্ব বণ্টন ব্যাপারে প্রথম ফিনান্স কমিশন নির্ধারিত নীতিতে ফিরিয়া যাওয়ায় মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি শিল্পপ্রধান রাজ্যের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু আয়কর-রাজস্বে রাজ্যসমূহের অংশবৃদ্ধি করিয়াও করপোরেশন করের বণ্টন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের দরুন রাজ্যসমূহের ক্ষতি সম্পূর্ণ পূরণ করা হয় নাই।

* দ্বিতীয় প্রকারের অনুদান সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশটি সরকার গ্রহণ করে নাই।

অন্তঃশুল্কের বণ্টন ব্যাপারেও রাজ্যসমূহের প্রতি সমবিচার করা হয় নাই। সংসরণ-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অনুদান হইতে পশ্চিমবংগ সহ পাঁচটি রাজ্যকে বাদ রাখার সপক্ষেও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আরও দেখা যায় যে, কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশ স্বল্পোন্নত রাজ্যসমূহকে (যেমন, উড়িষ্যা, রাজস্থান ইত্যাদি) উপকৃত করিবে, কিন্তু উন্নত রাজ্যগুলিকে ততটা সাহায্য করিবে না। পরিশেষে বলা যায়, যে-ব্যাপক অনুদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার পরিবর্তে সরাসরি কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করিলে আয়ব্যয়-ব্যবস্থার কেন্দ্রপ্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পাইত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই।

বর্তমান ব্যবস্থার সমালোচনা

তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আয়করের, ইউনিয়ন অন্তঃশুল্ক ও সাহায্যস্বরূপ অনুদানের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির অংশ এখানে দেওয়া হইল:*

	আয়করের অংশ	ইউনিয়ন অন্তঃশুল্কের অংশ	সাহায্যস্বরূপ অনুদান (বাজেট ঘাটতি মিটাইবার জন্য)
রাজ্যসমূহের অংশ	৬৬২/৩%	২০%	
বণ্টন	%	%	কোটি টাকা
অন্ধ্রপ্রদেশ	৭·৭১	৮·২৩	৯
আসাম	২·৪৪	৪·৭৩	৫·২৫
বিহার	৯·৩৩	১১·৫৬	—
গুজরাট	৪·৭৮	৬·৪৫	৪·২৫
জম্মু ও কাশ্মীর	০·৭০	২·০২	১·৫০
কেরল	৩·৫৫	৫·৪৬	৫·৫০
মধ্যপ্রদেশ	৬·৪১	৮·৪৬	১·২৫
মাদ্রাজ	৮·১৩	৬·০৮	৩
মহারাষ্ট্র	১৩·৪১	৫·৭৩	—
মহীশূর	৫·১৩	৫·৮২	৬·২৫
উড়িষ্যা	৩·৪৪	৭·০৭	১১·৫০
পাঞ্জাব	৪·৪৯	৬·৭১	—
রাজস্থান	৩·৯৭	৫·৯৩	৪·৫০
উত্তরপ্রদেশ	১৪·৪২	১০·৬৮	—
পশ্চিমবংগ	১২·০৯	৫·০৭	—
			৫২

* Report on Currency and Finance, 1961-62

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট (Budget of the Union Government): কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট দুই অংশে বিভক্ত: রাজস্ব খাত (Revenue Account), এবং মূলধন খাত (Capital Account)। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণের পর হইতে বাজেটের উভয় অংশেরই আকার বৃদ্ধি পাইতেছে এবং উভয় অংশেরই গতি ও নীতি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অর্থাৎ, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য সরকারী আয়ব্যয় ও প্রাপ্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মাত্রা ক্রমবর্ধমান বলিয়া অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে সরকারকে উত্তরোত্তর অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। ফলে ঘাটতি ব্যয় এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে অবশ্য ঘাটতি ব্যয়ের পরিবর্তে কর সংগ্রহ ও ঋণের উপর অধিক আস্থাস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বাজেটের গতি ও প্রকৃতি পরিকল্পনার প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে

প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য পরিমিত ছিল বলিয়া সরকারী বাজেটের সামান্য পরিবর্তন করা হইলেও মোটামুটিভাবে গতানুগতিক ধারাই বজায় রাখা হইয়াছিল। কর-ব্যবস্থাকে পরিকল্পনাভিমুখী করার দিকে বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে পরিকল্পনার ব্যয় বিশেষ মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়ায় সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঐ পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫২ কোটি টাকা। যাহা হউক, প্রথম পরিকল্পনার সময় কৃষিজ উৎপাদন আশানুরূপ হওয়ায় ঘাটতি ব্যয় সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা প্রকট হইয়া দাঁড়ায় নাই।

প্রথম পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আসিয়া দেখা যায় যে ব্যাপকতর আকারের জন্য পরিকল্পনার ব্যয় দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার মোট ব্যয় ছিল ২০০০ কোটি টাকার মত, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই পরিকল্পনার ব্যয়সংকুলানের জন্য আভ্যন্তরীণ ও বহিঃসূত্র হইতে অর্থসংগ্রহের বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। ইহার সহিত মুদ্রাস্ফীতির আশংকাও প্রকাশ পায়। অতএব, কর-ব্যবস্থাকে সুসমন্বিত ও শক্তিশালী করিয়া অধিক অর্থসংগ্রহের দিকে সরকারকে ঝুঁকিতে হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে সরকার কর অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কতকগুলি পরিবর্তনসাধন এবং মূলধন কর পুনঃ-প্রবর্তিত করে। ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে কর-ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। কর-ব্যবস্থার ভিত্তিকে ব্যাপকতর করা হয়, কর-প্রবঞ্চনার পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়, সম্পদকর ও ব্যয়কর স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। সরকারের মূল লক্ষ্য থাকে কি করিয়া মুদ্রাস্ফীতি ব্যতীত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে কার্যকর করা যায় এবং কি করিয়া দেশরক্ষা খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয় বহন করা

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

যায়। ইহার পরবর্তী বৎসরসমূহে দানকর প্রবর্তন, সম্পদ কর, অন্তঃশুল্ক প্রভৃতির হারবৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থা ঐ সকল উদ্দেশ্যেই অবলম্বন করা হয়। সংগে সংগে যাহাতে বিনিয়োগ ব্যাহত না হয় তাহার জন্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে কয়েকটি সুবিধা প্রদান করা হয়।

এই সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঘাটতি ব্যয় এবং বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পায় নাই। ৪৮০০ কোটি টাকার মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের অনুমান করা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঘাটতি ব্যয় হইয়াছিল ৯৪৮ কোটি টাকা। অপরদিকে কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় ১০৬ কোটি টাকার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হয় ৭৫২ কোটি টাকা।*

তৃতীয় পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনা আকারে আরও বৃহত্তর। কিন্তু পরিকল্পনায় মাত্র ৫৫০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় ধরা হইয়াছে। ঘাটতি ব্যয়ের ঐ স্তরকে অতিক্রম না করিয়া যদি পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে হয় তবে করভারবৃদ্ধি ও ঋণের উপর অধিক নির্ভরশীলতা ছাড়া গত্যন্তর নাই। পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ১৭১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর-রাজস্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (১১০০ কোটি টাকা) সংগ্রহের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পড়িয়াছে। ইহার উপর যুক্ত হয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজন। ফলে, প্রথম তিন বৎসরে (১৯৬১-৬৪) যেভাবে প্রধানত পরোক্ষ করের মাধ্যমে ঘাটতি মিটাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে অনেকেই আশংকিত হইয়া উঠিয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে রাজস্ব খাতে ঘাটতি মিটানোর জন্য ১০০ কোটি টাকার অধিক অন্তঃশুল্ক ও বাণিজ্যশুল্কের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয় এবং তৃতীয় বৎসরে (১৯৬৩-৬৪ সালে) প্রস্তাব করা হয় ২৭৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর-রাজস্বের। ১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৩-৬৪ সালে অবশ্য প্রত্যক্ষ করেরও রদবদল করা হয়। তবুও বলা যায়, রাজস্ব বাজেটের এই গতি অব্যাহত থাকিলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে এবং সাধারণের দুঃখদুর্দশার অন্ত থাকিবে না, এবং দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণ (price stabilisation), যাহা পরিকল্পনার সফলতার অন্যতম সর্ত, তাহা কোনমতেই পূরিত হইবে না।

মূলধন খাতে ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২-৬৩ সালে মোট বৈদেশিক ঋণ পাওয়া যায় যথাক্রমে ৩১৪ কোটি ও ৩৭৬ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালে ইহার পরিমাণ ৪৬২ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। বৈদেশিক ঋণের হার এইভাবে চলিতে থাকিলে পরিকল্পনার অবস্থা কোথায় দাঁড়াইবে বা পরিকল্পনার ফল কে ভোগ করিবে, তাহাও

* Budget of the Government of India, 1961-62

ভাবিবার বিষয়। যাহা হউক, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগে ভারত সরকারের বাজেটের গতি বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি ছক দেওয়া হইল :

(হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসর (১৯৬১-৬৪)
ক। রাজস্ব খাত			
১। রাজস্ব	২২৩২·৪৫	৩৫৬২·৮৭	৪০৭৬·০২
২। ব্যয়	১৯৮২·৯৭	৩৩৪২·৮৭	৩৯৭৪·০০
৩। ঘাটতি (−) বা উদ্বৃত্ত (+)	+২৪৯·৪৮	+২২০·০০	+১০২·০২
খ। মূলধন খাত			
১। প্রাপ্তি	১০৫৩·৫৮	৩০৭৫·৮২	৩৮১৫·৬৬
২। বণ্টন (Disbursement)	১৬৯৮·০৬	৪২৩১·৮২	৪৪৬৫·৮০
৩। ঘাটতি (−) বা উদ্বৃত্ত (+)	−৬৪৪·৪৮	−১১৫৬·০০	−৬৫০·১৪
গ। বিবিধ	−৮·১১	+১৮·০০	−৬·২২
ঘ। মোট ঘাটতি (−) বা উদ্বৃত্ত (+)	−৪০৩·১১	−৯১৮	−৫৫৪·৩৪

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান কর-রাজস্ব (Principal Tax-Revenues of the Union Government) : কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের সূত্রসমূহের মধ্যে আয়কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, বাণিজ্যশুল্ক, মূলধন-লাভ কর, অধ্যাপক ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে প্রবর্তিত সম্পদকর, দানকর এবং রেলপথ ইত্যাদি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে আয় প্রভৃতিই প্রধান। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইতেছে :

ক। আয়কর (Tax on Income) : কেন্দ্রীয় সরকারের কর-রাজস্বের (tax-revenue) অন্যতম প্রধান সূত্র হইল আয়কর। উপরন্তু, সেদিন পর্যন্ত ভারতের কর-ব্যবস্থার যতটুকু গতিশীলতা দেখা যাইত তাহা ছিল আয়করের জন্যই। সম্প্রতি অবশ্য ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে সম্পদকর, দানকর প্রভৃতি প্রবর্তিত করিয়া সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আরও কিছুটা করভার চাপানো হইয়াছে। তবুও বলা যায়, বর্তমান পর্যন্ত আয়করই ভারতীয় কর-ব্যবস্থার গতিশীলতার নির্দেশক।

আয়করের গুরুত্ব

ভারতে আয়কর প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৮৬০ সালে। ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহে'র ফলে যে আর্থিক অসুবিধা দেখা দেয় তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্যই ঐ কর স্থাপন করা হয়। ইহার পর বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া আয়কর বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এই পরিবর্তনের মূলে একদিকে যেমন রহিয়াছে অধিক রাজস্ব আদায়ের তাগিদ, অপরদিকে তেমনি আছে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক অবস্থা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ।

আয়কর ব্যক্তি, একান্নবর্তী হিন্দু পরিবার, রেজিষ্টারীভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের আয় এবং যৌথ কোম্পানীর (Joint Stock Companies) মুনাফার উভয়ের উপরই ধার্য করা হয়। সাধারণ আয়কর ব্যতীত উপরিস্থ কর (Super Tax) স্থাপনের ব্যবস্থাও আছে। যৌথ কোম্পানীর উপর স্থাপিত উপরিস্থ করকে বলা হয় 'করপোরেশন কর' (Corporation Tax) বা 'নিগম কর'। ইহা ছাড়া ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে কোম্পানীর মুনাফার উপর অতিরিক্ত মুনাফা কর (Super Profits Tax) ধার্য করা হইয়াছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয় ২০ হাজার টাকার অধিক হইলে তবেই উপরিস্থ কর দিতে হয়। এই করের ন্যূনতম হার ৫% এবং সর্বাধিক হার ৪৫%। ১৯৫১-৫২ সাল হইতে আবার আয়কর ও উপরিস্থ করের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে সারচার্জ (surcharge) বসানো হইয়াছে। এই সারচার্জ ধার্যের ব্যাপারে উপার্জিত ও অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া প্রথমশ্রেণীর আয়কে কতকটা সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৬২-৬৩ সাল হইতে মাহিনা, পেনসন্ ইত্যাদি বেতন আয়ের ক্ষেত্রে সারচার্জের হার ৫% হইতে ২·৫% করা হইয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে আয়করের ক্ষেত্রে সারচার্জ-ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন করা হইয়াছে। পূর্বে ব্যক্তির ক্ষেত্রে বার্ষিক আয় ৭৫০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব হইলে দেয়-আয়করের উপর সারচার্জ ধার্য করা হইত। বর্তমানে এই সারচার্জ অব্যাহতির সীমা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ, প্রত্যেক আয়কর-প্রদানকারীকেই এই সারচার্জ দিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সারচার্জও (additional surcharge) বসানো হইয়াছে। অতিরিক্ত সারচার্জ ধার্য করা হইবে 'অবশিষ্ট আয়ের' উপর—অর্থাৎ, মোট আয় হইতে মোট আয়কর, উপরিস্থ কর ইত্যাদি বাদ দিলে যে অবশিষ্ট আয় পাওয়া যাইবে তাহার উপর এই অতিরিক্ত সারচার্জ বসিবে। ৬০০০ টাকা 'অবশিষ্ট আয়' পর্যন্ত এই সারচার্জের হার হইবে শতকরা ৪ টাকা, পরে ইহা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া হইবে শতকরা ১০ টাকা।*

আয়কর ও করপোরেশন কর

১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে সারচার্জ সম্পর্কে পরিবর্তন

ব্যক্তিগত আয়করের বেলায় কতক পরিমাণ আয় পর্যন্ত আয়কর হইতে অব্যাহতি (exemption) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই অব্যাহতির সীমা

* অবশ্য অতিরিক্ত সারচার্জ-দায়ের একাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের দ্বারা মিটানো যাইবে।

বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে ব্যক্তির (individual) বেলায় ৩০০০ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় এবং একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের বেলায় ৬০০০ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় হইল এই অব্যাহতির সীমা।

অব্যাহতি

আবার পূর্বে আয়কর ধার্যের ব্যাপারে বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যক্তির কোন পার্থক্য করা হইত না ; কিন্তু বর্তমানে উহা করা হয়। অবিবাহিত ও বিবাহিত ব্যক্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই ৩০০০ টাকা আয়কর অব্যাহতির সীমা হইলেও অবিবাহিত ব্যক্তির বেলায় শুধুমাত্র প্রথম ১০০০ টাকা করমুক্ত রাখা হয়। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তির বেলায় প্রথম ৩০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কোন কর বসে না। আবার একটি সন্তানের পিতার ক্ষেত্রে ৩৩০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের পিতার ক্ষেত্রে ৩৬০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কোনরূপ কর ধার্য করা হয় না।

২২। ছ।৩। অন্যান্য প্রকারের অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থাও আছে। জীবনবীমার প্রিমিয়াম ও স্বীকৃত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে অর্থপ্রদানের জন্য আয়ের এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

১৯৩৯ সাল হইতে ধাপ-পদ্ধতির (Step System) পরিবর্তে স্ল্যাব-পদ্ধতিতে (Slab System) আয়কর নির্ধারিত হয়। উভয় পদ্ধতিতেই বিভিন্ন পরিমাণ আয়ের উপর ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর ধার্য করা হয়। কিন্তু দুইটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, ধাপ-পদ্ধতিতে আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী যে-হার প্রযোজ্য সেই হারে সমস্ত আয় হইতে কর আদায় করা হয়।

গতিশীলতা

অপরপক্ষে স্ল্যাব-পদ্ধতি অনুসারে পৃথক পৃথক স্ল্যাবের কর পৃথক পৃথক ভাবে হিসাব করিয়া পরে যোগ করা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হইল, ইহার ফলে কর হইতে অধিক আয় হয়, অপেক্ষাকৃত ধনীদের নিকট হইতে অধিক আদায় করা যায় এবং দরিদ্র শ্রেণীর উপর করভার লাঘব করা সম্ভব হয়।

উপার্জিত ও অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য

বলা হইয়াছে যে, পূর্বে উপার্জিত আয় অপেক্ষা অনুপার্জিত আয়ের উপর অধিক হারে কর ধার্য করা হইত। বর্তমানে ইহা না করিয়া উচ্চ উপার্জিত আয়ের (earned income) উপর ১০% হারে* এবং উচ্চ অনুপার্জিত আয়ের (unearned income) উপর ২০% হারে সারচার্জ ধার্য করা হয়।

পূর্বেই উপরিস্থ করের (Super Tax) কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যক্তি, একান্নবর্তী পরিবার ও রেজিষ্টারীভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের বেলায় ২০,০০০ টাকার অধিক বার্ষিক আয়ের উপর উপরিস্থ কর প্রদান করিতে হয়।

ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে যৌথ কোম্পানীগুলিকেও আয়কর ও উপরিস্থ কর দিতে হয় এবং যৌথ কোম্পানীর উপরিস্থ করকে করপোরেশন

* ১৯৬১-৬২ সালের পূর্বে এই হার ছিল ৫%।

কর বলা হয়। পূর্বে করপোরেশন করের হার ছিল ২০% এবং কোম্পানী আয়করের হার ৩১.৫%। উভয়কে এখন মিলাইয়া কোম্পানী কর-এ (Company Tax) পরিণত করা হইয়াছে এবং ১৯৬২-৬৩ সাল হইতে উহার হার ধার্য করা হইয়াছে ৫০%-এ। ইহা ছাড়া বর্তমান বৎসর (১৯৬৩-৬৪) হইতে যৌথ কোম্পানীকে অতিরিক্ত মুনাফা কর দিতে হইবে। এই সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

কোম্পানী কর

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের দিক হইতে দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে আয়কর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। বর্তমানে শতকরা ২০ ভাগের মত কর-রাজস্ব এই সূত্র হইতে আসে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে করপোরেশন কর ধরিয়া আয়কর হইতে রাজস্বের পরিমাণ (রাজ্যের অংশ সমেত) গড়ে ছিল বার্ষিক ১৬০ কোটি টাকা করিয়া। ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা প্রায় ৩৪৭ কোটি টাকা হইবে।*

আয়কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ

আয়কর-ব্যবস্থার যে ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল তাহা দূরিকরণের জন্য ১৯৫৩-৫৪ সালের কর অনুসন্ধানকারী কমিশন (Taxation Enquiry Commission, 1953-54) ও অধ্যাপক ক্যালডোর বহু মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছেন। এই সকল সুপারিশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। এই সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। তবে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে মূলধন-লাভ করকে (Capital Gains Tax) আয়করের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সর্বোচ্চ স্ল্যাব শতকরা ৯২ হইতে শতকরা ৭৩-এ লইয়া যাওয়া হইয়াছে, পরিচালনার সুবিধার জন্য আয়কর-ব্যবস্থার কিছুটা সংস্কার করা হইয়াছে এবং সম্পদকর (Wealth Tax) ও সাধারণ দানকর (General Gift Tax) ধার্য করা হইয়াছে। মধ্যে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পদকর এবং ব্যয়কর (Expenditure Tax) ধার্য করা হইয়াছিল। বর্তমানে উভয়েরই বিলোপসাধন করা হইয়াছে।

ত্রুটির প্রতিবিধানের সুপারিশ

মূলধন-লাভ কর

খ। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক (Union Excise Duties): কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বপ্রাপ্তির আর একটি প্রধান সূত্র হইল অন্তঃশুল্ক। বর্তমানে ইহাকে সর্বপ্রধান সূত্র বলিয়া বর্ণনা করা যায়। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যাদির উপর এই শুল্ক ধার্য করা হয়। শুল্ক মূল্যানুপাতিক (*ad valorem*) বা নির্দিষ্ট হইতে পারে। মদ্যজাতীয় পানীয় এবং নিদ্রাবহ দ্রব্যাদি ব্যতীত ভারতে উৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার অন্তঃশুল্ক স্থাপন করিতে পারে।

* বাজেট প্রস্তাব, ১৯৬৩-৬৪

ঐরূপ পানীয় ইত্যাদির উপর অন্তঃশুল্ক ধার্যের ক্ষমতা হইল রাজ্য সরকারের। ১৮৯৪ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বসানো হয় সূতার উপর। তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে কিন্তু ক্রমবর্ধমান হারে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। বর্তমানে তামাক, সূতীবস্ত্র, মোটর স্পিরিট, দিয়াশলাই, টায়ার-টিউব, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, কেরোসিন তৈল, কফি, চা, কৃত্রিম রেশম, রেয়ন, সিমেণ্ট, সাবান, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, বৈদ্যুতিক দ্রব্য, গ্রামোফোন রেকর্ড, পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি সকল কিছুর উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হইয়াছে; এবং বাজেট ঘাটতি পড়িলেই অন্তঃশুল্কের অধীন দ্রব্যের সংখ্যাবৃদ্ধি, অন্তঃশুল্কের হারবৃদ্ধি ও অন্তঃশুল্কের উপর সারচার্জ ধার্য করা হইতেছে। যেমন, ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে যে ২৭৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর-রাজস্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্কেরই পরিমাণ হইবে ১১৬ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদি

অন্তঃশুল্কের গুরুত্ব

এইভাবে যে কেন্দ্রীয় কর-ব্যবস্থায় অন্তঃশুল্কের উপর উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভর করা হইতেছে, তাহা একদিক দিয়া নিশ্চয়ই সমর্থনীয়। শিল্পপ্রসারের সংগে সংগে স্থায়ী রাজস্বের উৎস হিসাবে বাণিজ্যশুল্কের গুরুত্ব কমিয়া যাইতে বাধ্য। সুতরাং ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহনের জন্য বাণিজ্যশুল্কের বিকল্প হিসাবে অন্তঃশুল্কের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। উপরন্তু, যে-সকল শিল্প সংরক্ষণ নীতির সুযোগসুবিধা লইয়া প্রসারলাভ করিয়াছে তাহাদের এখন সময় আসিয়াছে দেশের উন্নয়নকার্যে সাহায্য করিবার। কিন্তু এই প্রসংগে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাজস্বের উৎস হিসাবে অন্তঃশুল্ক বিশেষ স্থিতিস্থাপক (elastic) হইলেও অনেক ক্ষেত্রে উহা অধোগতিসম্পন্ন (regressive)। অর্থাৎ, উহাদের চাপ দরিদ্র শ্রেণীর উপর অধিক পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, চা চিনি কেরোসিন তৈল ও দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর অন্তঃশুল্কের কথা উল্লেখ করা যায়।

অন্তঃশুল্কের প্রকৃতি

অন্তঃশুল্ক হইতে রাজস্ব আয় কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝা যায়:

(হিসাব কোটি টাকায়)

১৯২০-২১—২'৮৫	১৯৫০-৫১—৬৭'৫৪	১৯৬১-৬২—৪৮৯'৩১
১৯৩৮-৩৯—৮'৭২	১৯৫৫-৫৬—১৪৫'২৫	১৯৬২-৬৩—৫৫৩'৬৯

১৯৬৩-৬৪(বাজেট)—৭০০'১৭

কেন্দ্রীয় সরকারের মোট কর-রাজস্বের মধ্যে অন্তঃশুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ভাগ ১৯২০-২১ সালে ছিল ৪'৭ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ১০'৭; দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে গড়ে ইহা প্রায় শতকরা ৪৭ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যান্য সূত্র হইতে আয়বৃদ্ধি ও তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক হইতে রাজ্যসমূহের প্রাপ্তিবৃদ্ধির দরুন বর্তমানে

অন্তঃশুল্ক সর্বপ্রধান সূত্র

এই অনুপাত হ্রাস পাইয়া শতকরা ৩৩ ভাগের মত দাঁড়াইলেও অন্তঃশুল্ক কেন্দ্রীয় রাজস্বের সর্বপ্রধান সূত্র রহিয়া গিয়াছে। কর অনুসন্ধানকারী কমিশন (১৯৫৩-৫৪) প্রচলিত অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি ও নূতন নূতন দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিবার সুপারিশ করে। সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে কতকগুলি ক্ষেত্রে শুল্কের হার বৃদ্ধি ও কতকগুলি নূতন দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক বসাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে আবার ৩০টির মত নূতন দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয় এবং ২০টির মত দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে কেরোসিন, তামাক, সাবান, চা ইত্যাদি ১৩টি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়। ইহা ছাড়া কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দেয়-অন্তঃশুল্কের উপর সারচার্জ ধার্য করা হয়। ইহার ফলে অতিরিক্ত কর-রাজস্ব পাওয়া যাইবে প্রায় ১১৭ কোটি টাকা।

এই প্রসংগে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্কের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর বিক্রয়করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়। বর্তমানে ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে সিল্ক। এই সূত্র হইতে মোটামুটি ৪৮ কোটি টাকা পাওয়া যায়। ইহা রাজ্যসমূহের প্রাপ্য বলিয়া রাজ্য-সমূহের মধ্যেই বণ্টিত হয়।

গ। **বাণিজ্যশুল্ক (Customs)**ঃ বাণিজ্যশুল্ক বলিতে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ককে বুঝায়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের মোটামুটি এক-ষষ্ঠাংশ এই সূত্র হইতে পাওয়া যায়। ১৯২২ সালের পূর্বে বাণিজ্যশুল্কের উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করা। ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের সুপারিশ করিবার পর লৌহ ও ইস্পাত, চিনি, তুলা, শিল্পজাত দ্রব্য, দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক (protective duties) ধার্য করা হয়।

বাণিজ্যশুল্ক ধার্যের উদ্দেশ্য

বর্তমানে রাজস্ব সংগ্রহ, শিল্প-সংরক্ষণ এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন—প্রধানত এই তিনটি উদ্দেশ্যে বাণিজ্যশুল্ক ধার্য করা হয়। পরিকল্পনার প্রয়োজন বলিতে বুঝায় লেনদেন-ঘাটতি নিবারণ, দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণ (price stabilisation) প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে অত্যুচ্চ আমদানি শুল্ক ধার্যের মাধ্যমে আমদানিকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে; অপরদিকে কিন্তু রপ্তানি প্রসারের জন্য রপ্তানি শুল্কের যথাসম্ভব হ্রাসের নীতিই গ্রহণ করা হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই রপ্তানি শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব প্রায় অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে মোট বাণিজ্যশুল্ক ৩০৮ কোটি টাকার মধ্যে রপ্তানি শুল্ক হইতে মাত্র ৪ কোটি টাকার মত প্রাপ্তির আশা করা হইয়াছে। বর্তমানে চা-এর উপর হইতে রপ্তানি শুল্ক সম্পূর্ণ বিলোপ করা হইয়াছে।

কর-রাজস্বের সূত্র হিসাবে বাণিজ্যশুল্কের স্থান অন্তঃশুল্ক ও আয়কর ইত্যাদির পরই। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে (১৯৬১-৬৩) এই সূত্র হইতে প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৪৪৩ কোটি টাকা, এবং আয়কর ইত্যাদি হইতে প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৪৯৩ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে আমদানি শুল্কের হার ইত্যাদি বৃদ্ধি করার ফলে এই সূত্র হইতে রাজস্বের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যশুল্ক হইতে আয়ের পরিমাণ

তবুও দেখা যায়, বাণিজ্যশুল্কের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহাই স্বাভাবিক। ভারত যতই শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হইবে ততই বাণিজ্যশুল্কের তুলনায় অন্তঃশুল্কের গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে। ১৯৫৩-৫৪ সালের কর অনুসন্ধানকারী কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে, আমদানি শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া আয়বৃদ্ধির খুব সামান্যই সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেরোসিন তৈল ও মোটর স্পিরিট আমদানি হ্রাস পাইবার ফলে যে রাজস্ব কমিয়া গিয়াছে তাহা পূরণের জন্য কমিশন ঐ দুই দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক বসাইবার পরামর্শ দেয়; তবে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ভবিষ্যতে রপ্তানি শুল্ক স্থাপনের অধিক সুযোগ ঘটিবে।

বাণিজ্যশুল্কের গুরুত্বহ্রাস

ঘ। **মূলধন-লাভ কর (Capital Gains Tax):** মূলধন-লাভের উপর কর হইল কেন্দ্রীয় রাজস্বের একরূপ নূতনতম সূত্র। একরূপ নূতনতম সূত্র বলা হইয়াছে, কারণ ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ কর্তৃক ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয় কিন্তু দুই বৎসর পরে—অর্থাৎ, ১৯৪৯-৫০ সালে ইহার বিলোপসাধন করা হয়।

পূর্বতন ইতিহাস

বিলোপসাধনের সপক্ষে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই এইভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন: মূলধন-লাভের উপর ধার্য কর হইতে আশানুরূপ রাজস্ব সংগৃহীত হয় নাই; অপরদিকে কিন্তু ইহা বিনিয়োগকে বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। সুতরাং সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহার বিলোপসাধনের ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত।

তাহার পর ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বেসরকারী মহল হইতে মাঝে মাঝে মূলধন-লাভের উপর কর ধার্যের দাবি করা হইলেও কর্তৃপক্ষ-মহল হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯৫৬ সালের জুন মাসে অধ্যাপক ক্যালডোর তাঁহার রিপোর্টে* মূলধন-লাভ কর পুনঃপ্রবর্তিত করিবার সপক্ষে সম্পূর্ণ অভিমত প্রদান করিলে পর সরকার এ-বিষয়ে চিন্তা করিতে সুরু করে; এবং ১৯৫৬ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে (বাজেট অধিবেশনের পূর্বেই) অন্যান্যের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে একটি বিল আনয়ন করে, ঐ ডিসেম্বরেই বিলটি পাস হইলে মূলধন-লাভ কর ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় পুনঃপ্রবেশ করে।

বর্তমানে এই কর ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে প্রবর্তিত

---

* এই অধ্যায়ের শেষে কর-পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে ক্যালডোরের রিপোর্ট দেখ।

মূলধন-লাভ কর ধার্যের ব্যাপারে কমনওয়েলথ্ দেশসমূহের মধ্যে ভারত পথিকৃৎ হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহা প্রবর্তিত আছে। ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য কমনওয়েলথ্ দেশে এই কর ধার্য না করিবার প্রধান কারণ হইল গতানুগতিক ধারণা যে, (ক) আয়ই (income) হইল করপ্রদান ক্ষমতার (taxable capacity) সর্বপ্রধান সূচক; এবং (খ) নিয়মিতভাবে যাহা অর্জিত হয় তাহাই আয়। বর্তমানে কিন্তু এ-ধারণার বিশেষ সমর্থন করা হয় না। বর্তমানের ধারণা হইল, সম্পদের মালিকানা ও হস্তান্তর হইতে যে অনিয়মিত লাভ হয় তাহা করপ্রদান ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে।

এই করের বিপক্ষে ও সপক্ষে যুক্তি

এখন 'মূলধন-লাভ' বলিতে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাউক। সম্পত্তির বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলেই মালিকের মূলধন-লাভ হয়। এইভাবে মালিকের মূলধন-লাভ হউক আর সাধারণভাবে আয়বৃদ্ধি ঘটুক উভয় ক্ষেত্রেই তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে; উভয় ক্ষেত্রেই সে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ভোগ্যপণ্য ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। অবশ্য নিয়মিত আয় ও মূলধন-লাভের মধ্যে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে—যথা প্রথমত, মূলধন-লাভ সকল সময় হস্তান্তর দ্বারা অনুভব নাও করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হইলেই মালিক যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবে এরূপ কোন কথা নাই; এবং নিয়মিত মূলধন-লাভের দ্বারা যাহা লাভ হয় তাহার অধিকাংশই সঞ্চিত হয়—বর্তমান আয়ের মত ব্যয়িত হয় না। এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তবুও বলা যাইতে পারে যে মূলধন-লাভকে কর-বহির্ভূত রাখার সপক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নাই। বস্তুত, আয়কর ধার্য ব্যাপারে যখন আয়ের যে-অংশ ব্যয়িত হয় এবং যে-অংশ সঞ্চিত হয় তাহার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না, তখন মূলধন-লাভ হইতে অধিকাংশ অর্থই সঞ্চিত হয় বলিয়া উহাকে কর-বহির্ভূত রাখা যুক্তিযুক্ত নহে।

উপরন্তু, মূলধন-লাভকে কর-বহির্ভূত রাখিলে মাত্র মুষ্টিমেয়ের হস্তে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। ভারতে ইহা সংবিধানবিরোধী। সুতরাং, এই করের সপক্ষে প্রবল যুক্তি রহিয়াছে। পরিশেষে, সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় মূলধন-লাভ কর ধার্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ প্রথমত, এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় অন্যান্যের তুলনায় মূলধনের মূল্য ক্রমশই বাড়িয়া চলে; এবং দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান হিসাবেও ইহা প্রয়োজনীয়।

সুতরাং সকল দিক দিয়াই ভারতে মূলধন-লাভ কর ধার্যের সপক্ষে যুক্তি রহিয়াছে বলা যায়। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থার দিক হইতেই উহার প্রবর্তন দাবি করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণমাচারী এ-বিষয়ে অধ্যাপক ক্যালডোরের নিকট ঋণী এই সম্পর্কে ইতিমধ্যেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৫

ভারতের সপক্ষে যুক্তি বিশেষ প্রবল

সালের কর অনুসন্ধান কমিশন মূলধন-লাভ করধার্যের বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করে। ক্যালডোরের মতে, এই অভিমত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হইয়াছিল।

ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে বর্তমানে (ক) বাধ্যতামূলকভাবে সম্পত্তি অধিগ্রহণ (compulsory acquisition), (খ) কোম্পানী ভাঙিয়া গেলে অংশীদারগণের মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন, এবং (গ) বসবাসগৃহাদির ন্যায় সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য যে মূলধন-লাভ হয় তাহার উপর কর ধার্য করা হইয়াছে। কোন বৎসরে ৫০০০ টাকার কম মূলধন-লাভ হইলে উহার উপর এই কর ধার্য করা হইবে না।* কৃষি-সম্পত্তি বা ব্যবহারিক আসবাবপত্র বিক্রয় হইতে যে মূলধন-লাভ হয় তাহা বাদ দেওয়া হয়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, প্রকৃত মূলধন-লাভের (capital appreciation) উপর কর ধার্য করা হয় নাই—হস্তান্তর দ্বারা মূলধন-লাভ অনুভূত হইলে তবেই করধার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মূলধন-লাভ কতটা হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য করপ্রদানকারীকে সম্পত্তির মূল ব্যয় (original cost) অথবা ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের মূল্যে হিসাবের সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৬২-৬৩ সাল হইতে মূলধন-লাভকে স্বল্পকালীন মূলধন-লাভ (short-term gains) এবং অন্যান্য মূলধন-লাভ—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথম শ্রেণীর মূলধন-লাভের উপর করহার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার ফলে এই শ্রেণীর করপ্রদানকারীদের মধ্যে যে বিভেদাচরণের অভিযোগ ছিল তাহা দূর হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে।**

মূলধন-লাভ করের ব্যবস্থাসমূহ

মূলধন-লাভ করের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ছিল যে, দানপত্র শ্রেণীর হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূলধন-লাভের উপর কর ধার্য করা হইত না। ইহাতে সম্পত্তির মালিকরা মূলধন-লাভ নিজে ভোগ না করিয়া উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করিয়া কর এড়াইয়া যাইত। ফলে রাজস্বের উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইত। ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে সাধারণ দানকর ধার্যের ফলে এই ত্রুটি অনেকাংশে দূর হইয়াছে।

সমালোচনা

পরিশেষে ইহা বলা প্রয়োজন যে, মূলধন-লাভ কর স্বতন্ত্র কর হইলেও বাজেটে উহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো হয় না; আইনের দিক দিয়া উহা আয়করেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, মূলধন-লাভ হইতে যে-আয় তাহা মোট আয়েরই অংশ।

৬। সম্পদকর (Tax on Wealth): ১৯৫৭-৫৮ সালের মূল বাজেটে যে-দুইটি করধার্যের প্রস্তাব করা হয় তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল সম্পদকর এবং দ্বিতীয়টি ব্যয়কর (Tax on Expenditure)। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই দুইটি করধার্যের ফলে কর-পদ্ধতিতে এরূপ সংস্কার সাধিত হইবে যে ন্যায় (equity) ও দক্ষতা (efficiency) উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে।

* বর্তমানে কর-অব্যাহতির এই সীমা স্বল্পমেয়াদী মূলধন-লাভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

** অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা—২৩শে এপ্রিল, ১৯৬২

মূলধন-লাভ করের ন্যায় এই দুইটি করধার্য ব্যাপারেও ভারত সরকার অধ্যাপক ক্যালডোরের সুপারিশমত কার্য করিয়াছে। ক্যালডোরের মতে, ভারতে প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর-পদ্ধতিতে দক্ষতা বা ন্যায় কোনটাই নাই। ইহা অন্যায্য, কারণ বর্তমানে আয়ের (income) যে-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা সংকীর্ণ ও কর-প্রবঞ্চনাকারীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। ইহা দক্ষতাবিহীন যেহেতু পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য কর-প্রবঞ্চনা করা বিশেষ সহজসাধ্য কার্য। উপরন্তু, 'আয়করের বর্তমান সর্বাধিক হার (প্রায় ৯২%) উদ্যোগকে ব্যাহত করে।'

এই করও ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে প্রবর্তিত হইয়াছে

সুতরাং প্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধে ক্যালডোরের প্রস্তাব ছিল যে, সম্পদের উপর বার্ষিক করধার্য (an annual tax on wealth), মূলধন-লাভের উপর করধার্য, দানপত্রের উপর সাধারণ করধার্য (a general gift tax),, এবং ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর করধার্য (a personal expenditure tax) করিয়া প্রত্যক্ষ করের ভিত্তিকে প্রশস্ততর করিতে হইবে। এই সুপারিশ অনুসারে মূলধন-লাভকে প্রথমে (১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে) করভুক্ত করা হয় এবং পরে ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে সম্পদকর ও ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে ব্যয়কর ধার্য করা হয়।

প্রত্যক্ষ করের ভিত্তিকে প্রশস্ততর করার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে সম্পদকর ধার্যের সুপারিশ করিবার সময় ক্যালডোর ইহার সপক্ষে ন্যায় (equity), অর্থনৈতিক ফলাফল (economic effects) এবং পরিচালনাগত দক্ষতার (administrative efficiency) দিক দিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।*

সম্পদকরের সপক্ষে ক্যালডোরের যুক্তি :

ন্যায়ের দিক দিয়া যুক্তি হইল যে, বিভিন্ন সূত্র হইতে আয় এবং বিভিন্ন প্রকার সম্পদের মালিকানার কথা ধরিলে একমাত্র আয়কেই করপ্রদান-ক্ষমতার (taxable capacity) মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। করপ্রদান-ক্ষমতার দিক দিয়া ১ লক্ষ টাকা মূল্যের অলংকার ও স্বর্ণের মালিক নিশ্চয়ই একজন ভিক্ষুকের সহিত তুলনীয় নহে। আয়ের দিক দিয়া অবশ্য উভয়েরই করপ্রদান-ক্ষমতা শূন্য। কিন্তু ভিক্ষুকের ন্যায় ১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও অলংকারের মালিককে সম্পূর্ণভাবে কর হইতে অব্যাহতি দিলে ন্যায় ব্যাহত হইতে বাধ্য। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, ক ও খ উভয়েরই সম্পত্তি হইতে ৫০ হাজার টাকা করিয়া আয় হয়। ক-এর সম্পত্তির মূল্য হইল ২০ লক্ষ টাকা এবং খ-এর ৫০ লক্ষ টাকা। উভয়েরই করপ্রদান-ক্ষমতা সমান হইতে পারে না। সুতরাং ন্যায়ের খাতিরে আয় ও সম্পত্তি উভয়কেই করপ্রদান-ক্ষমতার নির্ধারক করিতে হইবে।

১। ইহা ন্যায়সংগত

অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক দিয়া আয়কর অপেক্ষা সম্পদকরের সুবিধা

* **Nicholas Kaldor, Indian Tax Reform** ২০ পৃষ্ঠা

রহিয়াছে। সম্পদকর আয়করের মত ঝুঁকির (risk) বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করে না। একশত টাকা সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিলে মাত্র ৩ টাকা আয় হয় কিন্তু ঝুঁকি লইয়া বিনিয়োগ করিলে ১০ টাকা আয়ও হইতে পারে। আয়কর এই ঝুঁকির মূল্য না দিয়া ঐ ১০ টাকার উপর করধার্য করে। সুতরাং লোককে ঝুঁকি লইতে নিরুৎসাহিত করিয়া বিনিয়োগ ব্যাহত করে।

২। ইহা অর্থ নৈতিক ফলাফলের দিক দিয়া সমর্থনীয়

পরিচালনাগত সুবিধার দিক দিয়া বলা যায় যে, আয়করের সহিত সম্পদকরও ধার্য করিলে কর-প্রবঞ্চনা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, আয় সম্বন্ধে সংবাদাদি সম্পত্তি সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করিয়া দিতে পারে এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে তথ্যাদি লুকানো আয়ের সন্ধান দিতে পারে।

৩। ইহার পরিচালনা সুবিধাজনক

সম্পদকরের বিরোধিতা করিয়া বলা হয় যে, এই করের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল সম্পদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। ফলে অনুৎপাদনশীল সম্পদের মালিকরা এই কর দিতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ইহা ছাড়া সম্পদকর পরিচালনারও কিছু অসুবিধা আছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি হইল প্রধান—যথা, (ক) সম্পদের প্রকৃত মালিককে আবিষ্কার করা, এবং (খ) সম্পত্তির মূল্য-নির্ধারণ করা। কিন্তু সকল পরিচালনা কার্যেই কিছু-না-কিছু অসুবিধা আছে। সুতরাং অসুবিধার ভয়ে ভীত হইয়া পিছাইয়া গেলে চলিবে না —ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় প্রয়োজন ও কর-সংস্কারের উদ্দেশ্যে সম্পদকর ধার্য করিবার পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। প্রসংগত উল্লেযোগ্য যে, সম্পদকর এদেশে সম্পূর্ণ নূতন হইলেও বার-তেরটি দেশের কর-ব্যবস্থায় ইহার সন্ধান মিলে।

এই করের ত্রুটি

বাজেট বক্তৃতায় সম্পদকরের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনাকালে অর্থমন্ত্রী একরূপ ক্যালডোরকে উদ্ধৃত করিয়াই বলেন, "ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, বর্তমানে আয়ের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা করপ্রদান-ক্ষমতার প্রকৃত মাপকাঠি নহে এবং সম্পদকরকে আয়করের অনুপূরক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।" ইহার পর অর্থমন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধারণার দিক হইতে সম্পদকরের সমর্থনে বলেন যে, এমন সকল কর ধার্য করিতে হইবে যাহা "সাম্যের প্রসার করে কিন্তু উদ্যোগ ব্যাহত করে না।" সম্পদকর হইল এইরূপ অন্যতম কর।

ক্যালডোরকে সমর্থন

ভারতে সম্পদকর ধার্য করা হইয়াছিল ব্যক্তি, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার (Hindu Undivided Families) এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সকলেরই উপর। বর্তমানে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাঁকা এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা হইল কর-অব্যাহতির সীমা (tax exemption limit)। ইহার পর করহার হইল গতিশীল (progressive)—১% হইতে ২.৫ % পর্যন্ত *।

ভারতীয় সম্পদকরের মূল ব্যবস্থা

* পূর্বে সর্বাধিক হার ছিল ২% ; ১৯৬২-৬৩ সাল হইতে উহাকে ২.৫% করা হইয়াছে।

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বেলায় ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পর্যন্ত সম্পদকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। তদুপরিস্থ সকল সম্পত্তির উপর অপরিবর্তিত ½% হারে (flat rate) কর ধার্য করা হইত।

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির (assets) উপর করধার্য সম্বন্ধে অর্থমন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, যদিও সম্পদকর হইল অন্যতম ব্যক্তিগত কর তথাপি ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইহার আওতায় না আনিয়া উপায় নাই। কিন্তু ক্যালডোর মাত্র ব্যক্তিগত সম্পদের উপরই কর-ধার্যের সুপারিশ করিয়াছিলেন। পরে ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে কোম্পানীর উপর সম্পদকরের বিলোপসাধন করা হইয়াছে।

পূর্বে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান-সমূহকে রেহাই না দেওয়ার কারণ

ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে কয়েক প্রকারের সম্পদকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে—যথা, কৃষি-সম্পত্তি, এরূপ শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব-মূলক সংগ্রহ যাহা বিক্রয়ের জন্য নহে, স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও বীমা তহবিলে জমা অর্থ, ২৫ হাজার টাকার মূল্যের অবধি মোটরগাড়ী, আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পদ* এবং বিক্রয়ের জন্য নহে এরূপ পুস্তকাদি। ভারতে বসবাসকারী বিদেশীয়দের বৈদেশিক সম্পদকে সম্পদকর হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম বৎসর বা ১৯৫৭-৫৮ সালে সম্পদকর হইতে ৭ কোটি টাকা আয় হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে উহা বাড়িয়া ১২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঐ কর হইতে রেহাই দেওয়ায় সংগ্রহের পরিমাণ কমিয়া ৮-৯ কোটি টাকার মত দাঁড়াইয়াছে।

[**ব্যয়কর (Expenditure Tax):** পাঁচ বৎসর প্রবর্তিত থাকার পর ১৯৬২-৬৩ সাল হইতে ব্যয়কর ভারতের কর-ব্যবস্থা হইতে বিদায় লইয়াছে। সুতরাং ইহা অন্যতম ঐতিহাসিক করের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। তবুও নানা কারণে ইহার সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ব্যয়কর ভারতেই প্রথম প্রবর্তিত হয়। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, "এই করের পশ্চাতে এখন পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক সমর্থনের সন্ধান পাওয়া যায় না।" ১৯৫৫ সালে অধ্যাপক ক্যালডোরই প্রথমে ন্যায় (equity) এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার (economic expediency) দিক দিয়া ব্যয়করকে সমর্থন করিয়া এক পুস্তক ** প্রকাশ করেন। পরে তিনি এই করকে ভারতীয় কর-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিতে বলেন। ব্যয়করের বিরুদ্ধে, বিশেষত ভারতীয় কর-পদ্ধতিতে ইহার অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে, যে-সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হইল প্রধান:

বিরুদ্ধে যুক্তি

* ১৯৬৩-৬৪ সালের পূর্বে এই অব্যাহতির মধ্যে গহনাকেও ধরা হইত।

** Nicholas Kaldor, An Expenditure Tax (1955)

(ক) ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় আয়করের উপর আর ব্যয়কর চাপানো উচিত হইবে না, কারণ উহার ফলে করভার একরূপ দুঃসহ হইয়া উঠিবে।

(খ) আয়করের পরিবর্তে ব্যয়কর ধার্য করিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বিত্তশালীদের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে। ইহার প্রতিবিধানকল্পে যদি সম্পত্তিকর স্থাপন করা হয় তবে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ব্যাহত হইয়া ব্যয়করের প্রধান উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করিবে।

(গ) আয়কর অপেক্ষা ব্যয়করের পরিচালনা কঠিন।

(ঘ) ভারতে কৃষিগত আয় হইতে ব্যয়কে এই কর হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে; ইহার ফলে লোকে কৃষিগত আয় হইতেই তাহাদের ব্যয় যথাসম্ভব করিতে বা দেখাইতে চেষ্টা করিবে।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে ক্যালডোর বলিয়াছিলেন যে, করপ্রদান ক্ষমতার যোগ্যতর মাপকাঠি বলিয়া তুলনামূলকভাবে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়কর কাম্য হইলেও ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় উভয়েরই উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে। উপরন্তু, আয়করের সহিত সম্পদকর ধার্যের ব্যবস্থা হওয়ায় ব্যয়কর প্রবর্তনও অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, ব্যয়কর না থাকিলে পুঁজিপতিরা সম্পদ ও বিনিয়োগের পরিমাণ না বাড়াইয়া যথেচ্ছ ব্যয় করিয়া যাইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত করের পরিপূরক হিসাবেই ব্যয়কর ধার্য করা প্রয়োজন।

ক্যালডোর কর্তৃক বিরুদ্ধ যুক্তি অস্বীকার

ক্যালডোরের যুক্তি মানিয়া লইয়া তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ব্যয়করকে ভারতীয় কর-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবকালে তিনি বলেন যে, ঐতিহাসিক সমর্থনের অভাবে অতি সামান্যভাবেই ইহার সূত্রপাত করিতে হইবে।

ভারতীয় ব্যয়করের প্রকৃতি

১৯৫৭ সালের ব্যয়কর আইন (The Expenditure Act, 1957) কার্যকর হয় ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে। ঐ আইন অনুসারে ব্যক্তি ও অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বার্ষিক নীট আয় (সকল প্রকার করপ্রদানের পর) ৩৬ হাজার টাকার অধিক হইলে তবেই তাহাদিগকে ব্যয়কর প্রদান করিতে হইত। ব্যয়করের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের উপর কর ধার্য করা (to tax primarily expenditure on personal consumption)। এই কারণে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যয় প্রভৃতি ব্যয়কে কর হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল। ব্যক্তির বেলায় মূল কর-অব্যাহতির পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার টাকা। অর্থাৎ, ৩০ হাজার টাকা অবধি ব্যয়ের উপর ব্যক্তিকে কোন ব্যয়কর দিতে হইত না। অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বেলায় কর-অব্যাহতির সীমা ছিল ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত। উপরন্ত বিবাহ, পিতামাতার ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য ব্যয়ও সীমাবদ্ধভাবে করমুক্ত ছিল।

উপরি-উক্ত করমুক্ত ব্যয়গুলি ছাড়া অন্যান্য ব্যয়ের উপর স্ল্যাব-পদ্ধতিতে গতিশীল হারে করপ্রদান করিতে হইত। নিম্নতন স্ল্যাবে করহার ছিল ১০% এবং সর্বোচ্চ স্ল্যাবে ১০০%।

কর-ব্যবস্থার অংগ হিসাবে ব্যয়করের গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন, রাজস্ব-সংগ্রহের দিক দিয়া ইহা মোটেই উল্লেখযোগ্য হয় নাই। এই কর হইতে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭০-৮০ লক্ষ টাকা। উপরন্তু, ইহার পরিচালনা ব্যাপারেও নানা অসুবিধা দেখা দিয়াছিল। এই দুই কারণেই ইহার বিলোপসাধন করা হইয়াছে।]

চ। দানকর (Gift Tax): দানকর প্রবর্তিত করা হয় ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে। অধ্যাপক ক্যালডোরই সুসমন্বিত রাজস্ব-ব্যবস্থার অংগ হিসাবে এই কর প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।* অবশ্য তাঁহার সুপারিশ ছিল যে সম্পত্তিকরকে (Estate Duty) উঠাইয়া দিয়া সকল প্রকার দানের উপর সাধারণ দানকর ধার্য করিতে হইবে। অর্থাৎ, উত্তরাধিকারসূত্রে বা দানপত্রের মারফতই প্রাপ্ত হউক অথবা অন্যভাবে দানের মারফতই প্রাপ্ত হউক সকল প্রকার দান বা প্রদত্ত সম্পত্তির উপরই সাধারণ দানকর প্রযোজ্য হইবে। এই সুপারিশ মানিয়া লওয়া হয় নাই—মৃত্যুকরকে বজায় রাখিয়া অন্যান্য দানের উপর পৃথকভাবে কর স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও সম্পত্তিকর বা মৃত্যুকর (Death Duty) ব্যতীত দানকর প্রবর্তিত রহিয়াছে।

ক্যালডোরের প্রস্তাব ও ভারতীয় দানকর

দানকরের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহাতে বলা হয় যে সম্পত্তি হস্তান্তর করার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সমাজের রহিয়াছে। যদি উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রদানের উপরও কর স্থাপনের যৌক্তিকতা থাকে তবে অন্য প্রকার দানের উপরও করধার্য করা যুক্তিযুক্ত। অন্য একটি কারণেও দানকর স্থাপন করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই দানের মারফত সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া মৃত্যুকর ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা হয়। এই কর ফাঁকিকে বন্ধ করিতে দানের উপর উপযুক্ত করধার্য করা প্রয়োজন। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই ভারতে দানকর প্রবর্তন করা হইয়াছে।

সপক্ষে যুক্তি

ভারতীয় দানকর আইন অনুসারে পূর্ববর্তী বৎসরে প্রদত্ত সকল দানের উপর দানকর প্রযোজ্য। কর-অব্যাহতির সীমা হইল দশ হাজার টাকা। অর্থাৎ, দশ হাজার টাকা পর্যন্ত দানে কোন করপ্রদান করিতে হয় না। দানের পরিমাণ ইহার অধিক হইলে দানকর দিতে হয়। স্ল্যাব-পদ্ধতিতে গতিশীল হারে করপ্রদান করিতে হয়। করের হার প্রথম স্ল্যাবে শতকরা

বৈশিষ্ট্য

* Nicholas Kaldor, Indian Tax Reform—Report of a Survey

৪ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বাধিক শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত। সাধারণত এই কর-দাতাকেই (donor) দিতে হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা দানগ্রহণকারীর (donee) নিকট হইতেও আদায় করা যায়। নির্দিষ্ট ধরনের কতকগুলি দানের বেলায় দানকর প্রযোজ্য নয়। যেমন, ভূদান বা সম্পত্তিদান আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নয়। আয়কর হইতে অব্যাহতি ভোগ করে এরূপ দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত দানের উপর দানকর ধার্য হয় না। আবার কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় সরকার এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে দান করা হইলে উক্ত দানের উপর কর দিতে হয় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দান কর হইতে মুক্ত।

ব্যয়করের ন্যায় দানকর হইতেও সংগ্রহের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই। নীট সংগ্রহের পরিমাণ ১ কোটি টাকাতেও পৌছায় নাই।

বিরুদ্ধ সমালোচনা

দানকরের বিরুদ্ধ সমালোচনাও করা হইয়াছে। অনেকে দানকর প্রবর্তনকে ভারতের ঐতিহ্যবিরুদ্ধ কার্য বলিয়া মনে করেন। ইহাদের মতে, ভারতীয়দের মধ্যে দানধ্যান ও ত্যাগের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। দানকর এই অতিকাম্য প্রবণতাকে আঘাত করে। আবার বলা হয় যে এত প্রকারের অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে দানকর হইতে সরকার বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবে এরূপ আশা করা যায় না। অনেকে আবার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ক্যালডোরের সুপারিশ অনুযায়ী সম্পত্তিকর উঠাইয়া দিয়া সকল প্রকার দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ দানকর প্রবর্তন করা উচিত ছিল।

ছ। অতিরিক্ত মুনাফা কর (Super Profits Tax): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৬৩-৬৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে কোম্পানীর আয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফা করের প্রবর্তন করা হয়। মূলত বর্তমান জরুরী অবস্থায় প্রতিরক্ষার

১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে প্রবর্তন

প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এই করের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশগুলিতে যুদ্ধকালীন অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হিসাবে অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর ধার্য করা হয়। ভারতেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনুরূপ করের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উহা Excess Profits Tax বা E. P. T. নামে পরিচিত ছিল। ১৯৪০-৪৬ —এই ছয় বৎসর E. P. T. বলবৎ ছিল। পরে উহা 'ব্যবসায় মুনাফা কর' (Business Profits Tax বা B. P. T.) নামে কয়েক বৎসর চালু ছিল।

যুদ্ধকালীন E. P. T. ও বর্তমান S. P. T.-এর মধ্যে পার্থক্য

কিন্তু যুদ্ধকালীন ও বর্তমান অতিরিক্ত মুনাফা করের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়—বিশেষত অতিরিক্ত মুনাফা সম্পর্কে ধারণাটির ক্ষেত্রে। যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মুনাফা কর-ব্যবস্থায় অতিরিক্ত মুনাফা নির্ধারণ করিবার জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরের মুনাফাকে প্রামাণিক মুনাফা (Standard Profits) ধরিয়া লওয়া হইত। ঐ প্রামাণিক মুনাফা অপেক্ষা যে-অধিক মুনাফা হইত উহাকেই

অতিরিক্ত মুনাফা বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট প্রামাণিক হার বা পরিমাণ (কোন নির্দিষ্ট বৎসরের নহে) অপেক্ষা যে-অধিক মুনাফা হইবে উহাকেই অতিরিক্ত মুনাফা হিসাবে ধরা হইবে এবং উহার উপর করধার্য করা হইবে।

অতিরিক্ত মুনাফা করের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ১৯৬৩ সালের আইন (Super Profits Tax Act, 1963) দ্বারা। ঐ আইনে বলা হইয়াছে যে, কোম্পানীর অতিরিক্ত মুনাফা নির্ধারণ করিতে হইলে প্রথমে 'করধার্যযোগ্য মুনাফা' (Chargeable Profits) বাহির করিতে হইবে। উহা বাহির করিতে হইলে কোম্পানীর মোট আয় হইতে মূলধন লাভ, ঋণ পরিশোধ বা মূলধন-সম্পদ গ্রহণের জন্য মোট আয়ের দশ শতাংশ, আয়কর, অতিরিক্ত আয়কর (Super Tax) ইত্যাদি বাদ দিতে হইবে। এইরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ও স্বীকৃত রিজার্ভ ফাণ্ডের শতকরা ৬ ভাগের বেশী হইলে উহার উপর এই কর ধার্য করা হইবে। এইরূপ আয়ের পরিমাণ আদায়ীকৃত মূলধন ও স্বীকৃত রিজার্ভ ফাণ্ডের ৬ শতাংশের বেশী কিন্তু দশ শতাংশের কম হইলে করের হার হইবে শতকরা ৫০ ভাগ এবং দশ শতাংশের বেশী হইলে উহার উপর করের হার হইবে শতকরা ৬০ ভাগ। ছোট ছোট কোম্পানীর সুবিধার্থে বলা হইয়াছে যে, নীট মুনাফার পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত (উহা উপরি-উক্ত ৬ শতাংশের অধিক হইলেও) এই কর ধার্য করা হইবে না।

অতিরিক্ত মুনাফার অর্থ ও করের হার

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই করের সমর্থনে বলেন যে, প্রতিরক্ষার জন্য জনসাধারণের যেরূপ কর্তব্য রহিয়াছে যৌথ কোম্পানীগুলিরও সেইরূপ দায়িত্ব আছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহার সমর্থনে আরও বলা হয় যে, এই করের ফলে কোম্পানীর মুনাফার হার ও করের সংগে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা যাইবে এবং ন্যায়নীতির ভিত্তিতে করের বোঝা কোম্পানীগুলির মধ্যে বণ্টন করা সহজ হইবে। পরিশেষে বলা যায় যে, এই করের ফলে কোম্পানীর অতিরিক্ত মুনাফা হ্রাস পাইবে বলিয়া উহারা ফটকা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে আর উৎসাহিত বোধ করিবে না ; ফলে, ফটকা কারবারজনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বন্ধ হইবে।

করের স্বপক্ষে যুক্তি

হিকস্ (Hicks), রস্তোস্ (Rostos) এবং অন্যান্য লেখক অতিরিক্ত মুনাফা করের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ইহা সঞ্চয় ও মূলধন-সংগঠনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। করের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কোম্পানীর পরিচালকরা নানারূপে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মুনাফা কম দেখাইতে চেষ্টা করে। শ্রমিকদিগকে অতিরিক্ত মজুরি প্রদান, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি, ইত্যাদির দ্বারা অপচয়মূলক ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। ভারতেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ফলে, মূলধন-সংগঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইবে। এই কর সম্পর্কে আরও বলা হইয়াছে যে, ৬ শতাংশ মুনাফাকে প্রামাণিক

করের বিপক্ষে যুক্তি

হার ধরা হইলে কোম্পানীগুলি আর পূর্বের ন্যায় চড়াহারে ডিভিডেণ্ড্ দিতে পারিবে না। ইহার ফলে জনসাধারণ কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিতে বিশেষ ইচ্ছুক হইবে না। কোম্পানীগুলিও বাজার হইতে প্রয়োজনীয় শেয়ার মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবে না এবং উহারা অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। বিদেশী লগ্নিকারীরাও ভারতে অর্থ বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত বোধ করিবে না। সুতরাং দেখা যায় যে, এই করের ফলে বিনিয়োগ বাজারে বিরাট 'অচলায়তন'-এর সৃষ্টি হইতে পারে।

এই কর হইতে ১৯৬৩-৬৪ সালে ২০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় (Expenditure of the Union Government)ঃ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে মোট ব্যয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের বিশদ আলোচনা করা যাইতেছে।

ক। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় (Defence Services)ঃ বর্তমানে রাজস্ব খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩০-৩২ ভাগের মত যায় প্রতিরক্ষা খাতে। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হয়। ১৯৫১-৫২ সালে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭০'৯৬ কোটি টাকা। ১৯৬১-৬২ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৬২-৬৩ সালের সংশোধিত বাজেটে ইহার পরিমাণ ছিল ৫০৫ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই খাতে ব্যয় হইবে ৮৬৭ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক বিশৃংখলা, ভারতের সীমান্ত লইয়া গোলযোগ, সাম্প্রতিক চৈনিক আক্রমণ প্রভৃতি কারণে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার যে-প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে তাহার জন্যই প্রতিরক্ষা খাতে উপরি-উক্তভাবে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধি

খ। বেসামরিক শাসন পরিচালনা (Civil Administration)ঃ এই খাতেও সরকারী ব্যয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে এই খাতে ৮৮ কোটি টাকার উপর ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে কিন্তু এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৪ কোটি টাকা। এই ব্যয়বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে সরকারী দপ্তরের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিদেশে অত্যধিক ব্যয়ে দূতাবাসের ব্যবস্থা, বিদেশে নানা ধরনের প্রতিনিধি প্রেরণ, দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি, প্রভৃতি। ব্যয়সংক্ষেপের যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও ব্যয়হ্রাস করিবার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা হয় নাই।

গ। রাজস্বসংগ্রহের প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Demand on Revenue)ঃ রাজস্বসংগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের পরিমাণও নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে উহা ছিল ১৩ কোটি টাকা। বর্তমানে উহা ২৩ কোটি টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে।

ঘ। ঋণজনিত ব্যয় (Debt Services): বিভিন্ন সময়ে সরকার যে ঋণগ্রহণ করিয়াছে প্রধানত তাহার সুদ বাবদ সরকারী ব্যয়কে ঋণজনিত ব্যয় বলা হয়। ইহা রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত। ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয় মূলধন খাতের হিসাবে ধরা হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ঋণজনিত ব্যয় ছিল ৮৩ কোটি টাকা; ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে উহা বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ২৮০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ঙ। উন্নয়নমূলক ব্যয় (Development Services): উন্নয়নমূলক ব্যয়ের বৃহদংশ মূলধন খাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে রাজস্ব খাত হইতে বড় কম উন্নয়নমূলক ব্যয় করা হয় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায় গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতির জন্য ব্যয় রাজস্ব খাতেই ধরা হয়। ১৯৫১-৫২ সালে এই ব্যয় ছিল ৪২·৬৯ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে এই ব্যয় ১৮৬ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। তবুও বলা যায়, ভারতের মত অনগ্রসর দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যয় অত্যন্ত অল্প।

চ। বিবিধ ব্যয় (Miscellaneous): শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য ও অপর কতকগুলি উন্নয়নমূলক ব্যয় এই বিবিধ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬১-৬২ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে উহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৮৯ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ব্যয়

উপরি-উক্ত ব্যয় ব্যতীত পেনসন্, বিশেষ ব্যয় ও অপরাপর ব্যয়ও রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকেও অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট ধরনের এবং সাধারণ অনুদান দিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যগুলির সচ্ছলতা সৃষ্টি করার মূলে রহিয়াছে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য। রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত এইরূপ অর্থপ্রদানের পরিমাণ ১৯৫১-৫২ সালে ছিল ১৭·৩১ কোটি টাকা; ১৯৬১-৬২ সালে উহা ১৯৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ২২১ কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ব্যয়ের প্রকৃতি

ব্যয় সংক্রান্ত উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের মধ্যে দেশরক্ষা ও শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়ই অধিক। সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক খাতে যতটা ব্যয় করা প্রয়োজন তাহা হইতেছে না। তবে সম্প্রতি এই খাতেও ব্যয়বৃদ্ধির দিকে সরকার অধিক নজর দিতেছে।

রাজ্য সরকারসমূহের আয়ব্যয়-ব্যবস্থা (Finances of State Governments): দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই কেন্দ্র হইতে

রাজ্যগুলির অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে—অর্থাৎ, ১৯৫৬-৫৭ সালে রাজ্যগুলি কেন্দ্র হইতে ঋণ, সাহায্যপ্রাপ্তি ও করের অংশ হিসাবে মোট ৩৭৩ কোটি টাকা পাইয়াছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই প্রাপ্তির পরিমাণ হইবে ১০০৮ কোটি টাকা। পূর্বে কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ রাজ্যগুলি তাহাদের মোট ব্যয়ের শতকরা ২৯ ভাগ নির্বাহ করিত; এখন ৫০ ভাগের উপর নির্বাহ করে। কেন্দ্র হইতে অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধির মূলে আছে নূতন ও পুরাতন কর হইতে অধিকতর রাজস্ব হস্তান্তর, অধিকতর অনুদান এবং রাজ্য বিক্রয়করের পরিবর্তে চিনি তামাক বস্ত্র ও সিল্কের উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক (Additional Excise Duties) স্থাপন। উপরন্তু, কেন্দ্রের বিবেচনামূলক অর্থসাহায্যের (discretionary grants) পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেন্দ্র হইতে অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি

প্রথম পরিকল্পনাধীন (১৯৫১-৫৬) সময়ে রাজ্যসমূহের (রাজস্ব ও মূলধন) বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পাধীন (১৯৫৬-৬১) সময়ে এই সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১১৪ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে ৭২ কোটি টাকার মত ঘাটতি দেখা দেয়। প্রসংগত, উল্লেখযোগ্য যে রাজস্বের বিশেষ বৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজ্যগুলির ঘাটতি বাজেটের দিন শেষ হয় নাই। উন্নয়নমূলক ব্যয়বৃদ্ধিই ইহার কারণ। উন্নয়নমূলক ব্যয়বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত তহবিলও ব্যয়িত হইয়াছে।

আয়ব্যয়ের মোটামুটি অবস্থা

রাজস্ব খাতে রাজ্যসমূহের আয় (Incomes of the States on Revenue Account): ১৯৬২-৬৩ সালে রাজস্ব খাতে (on revenue account) সকল রাজ্যের আয়ের পরিমাণ ছিল ১২৬০ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৩৫৪ কোটি টাকা।

রাজ্যসমূহের মোট রাজস্ব

রাজ্যসমূহের রাজস্বের প্রধান সূত্রগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা, কর-রাজস্ব (tax revenue), এবং কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (non-tax revenue)। 'কর-নিরপেক্ষ রাজস্বে'র মধ্যে আছে বনবিভাগ, সেচ-ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকল্পনা, রাজপথ ও নদীপথ পরিবহণ এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন শিল্পসমূহ হইতে আয়। অপরদিকে 'কর-রাজস্ব' বিভিন্ন কর লইয়া গঠিত। এই করগুলিকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, (ক) আয়ের উপর কর (taxes on income), (খ) সম্পত্তি ও মূলধন হস্তান্তরের উপর কর (taxes on property and capital transactions) এবং (গ) সামগ্রী ও সেবার উপর কর (taxes on commodities and services)। এখন এই তিন শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন কর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

কর-রাজস্ব ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব

তিন শ্রেণীর কর-রাজস্ব

(ক) আয়ের উপর কর বলিতে তিনটি করকে বুঝায়—যথা, ভারতীয় আয়করের অংশ, কৃষি-আয়কর এবং বৃত্তিকর।

ক। বিভিন্ন প্রকার আয়ের উপর কর

১। ভারতীয় আয়করের অংশ (Share of Indian Income Tax): ভারতীয় আয়করের অংশকে রাজ্যসমূহের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব-সূত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। এই বিষয়ে বর্তমানে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকার করিয়া আছে বিক্রয়কর ও ভূমি-রাজস্ব। ১৯৬৩-৬৪ সালে আয়করের অংশ হিসাবে রাজ্যগুলি পাইবে ৯৮ কোটি টাকার মত।

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতীয় আয়কর (করপোরেশন কর বাদে) হইতে প্রাপ্ত নীট আয়ের (net proceeds) শতকরা ৬০ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইত। তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে শতকরা ৬৬⅔ ভাগ বণ্টিত হয়। তবুও আমরা দেখিয়াছি যে করপোরেশনের সংজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া আয়কর হইতে রাজ্যসমূহের প্রাপ্তির যে হ্রাস ঘটানো হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ পূরণ হয় নাই।*

২। কৃষি-আয়কর (Agricultural Income Tax): আয়ের পরিমাণের দিক দিয়া এই সূত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। ১৯৬২-৬৩ সালে ইহা হইতে রাজ্যগুলি মোট ৯½ কোটি টাকা পাইয়াছিল। একদিক দিয়া অবশ্য কৃষি-আয়কর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর। ইহা কর-পদ্ধতির এক বিরাট অসংগতি দূর করিয়াছে—ইহা বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ভোগকারীদের মধ্যে কিছুটা সমতা আনয়ন করিয়াছে।

এই সমতা আনয়ন ও প্রদেশসমূহের আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাইমন কমিশনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্যর ওয়াল্টার লেটন (Sir Walter Layton) কৃষি-আয়কর ধার্যের সুপারিশ করিয়াছিলেন। ফলে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশসমূহকে এই করধার্যের ক্ষমতা প্রদান করা হয়; এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও উত্তরপ্রদেশ ইহা ধার্য করে। পরে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যও অনুবর্তী হয়।

কৃষি-আয়করের বৈশিষ্ট্য

কৃষি-আয়কর ভারতীয় আয়করের ন্যায় স্ল্যাব-পদ্ধতিতে গতিশীল (progressive on the slab system)। কিন্তু ইহার সর্বোচ্চ হার ভারতীয় আয়করের সর্বোচ্চ হার হইতে অনেক কম। এই কারণে কর তদন্তকারী কমিশন কৃষি-আয়করকে সাধারণ আয়করের অন্তর্ভুক্ত করিতে সুপারিশ করিয়াছে। এ-সম্বন্ধে পরে অনেক আলোচনা করা হইতেছে।

৩। বৃত্তির উপর কর (Profession Tax): বৃত্তির উপর করকে রাজস্বের সূত্র হিসাবে সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর বলিলেই চলে। এই সূত্র হইতে

রাজ্যসমূহের বৎসরে মাত্র ৫০-৬০ লক্ষ টাকা আয় হয়। ইহা সকল রাজ্যে প্রবর্তিতও নহে।

১৯৬২-৬৩ সালে উপরি-উক্ত তিন শ্রেণীর আয়ের উপর কর হইতে রাজ্যসমূহের মোট আয় হয় ১০৫ কোটি টাকা।

খ। সম্পত্তি ও মূলধন হস্তান্তরের উপর কর

(খ) সম্পত্তি ও মূলধন হস্তান্তরের উপর কর বলিতে বুঝায় সম্পত্তিকর (Estate Duty), ভূমিরাজস্ব, স্ট্যাম্পকর ও রেজিষ্ট্রেশন এবং নগরাঞ্চলের স্থাবর সম্পত্তির উপর কর (Urban Immovable Property Tax)।

১। **সম্পত্তিকর (Estate Duty)*** : সম্পত্তিকর বা মৃত্যুকর (Death Duty) দুই অংশে বিভক্ত—অ-কৃষি সম্পত্তির উপর কর এবং কৃষিগত সম্পত্তির উপর কর। কৃষিগত সম্পত্তি বা কৃষিজমি রাজ্যের আইনসভার এলাকাধীন বিষয়। সুতরাং আইন পাস করিয়া ইহার উপর করধার্যের ক্ষমতা পার্লামেণ্টের ছিল না। কিন্তু এই করধার্যের ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংগতির প্রয়োজনে বিভিন্ন রাজ্য পার্লামেণ্টকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

সপক্ষে যুক্তি

ইতিহাসের দিক দিয়া বহুদিন হইতেই আমাদের দেশে মৃত্যুকর বসাইবার সপক্ষে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল। ১৯৫২ সালে কর অনুসন্ধানকারী কমিটি (Taxation Enquiry Committee) সম্পত্তিকর ধার্যের সুপারিশ করে। তখন হইতে এই কর স্থাপনের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: (১) রাজ্যগুলির প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অর্থাভাব রহিয়াছে। সুতরাং এই কর রাজ্যগুলির রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিবে। (২) এই করের চাপ ধনী ব্যক্তিদের উপরই পড়ে। (৩) কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগও কম। (৪) সমাজে যে আর্থিক বৈষম্য রহিয়াছে তাহা কতক পরিমাণে এই করের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। (৫) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কর্মবিমুখতাও রোধ হইবে। (৬) সামর্থ্য অনুযায়ী করপ্রদান নীতি প্রযুক্ত করিতে হইলে আয়কর এবং সম্পত্তিকর একই সংগে স্থাপন করা প্রয়োজন। অবশেষে ১৯৫৩ সালে সম্পত্তিকর আইন পাস হয়।

সম্পত্তিকর আইন

১৯৫৩ সালের সম্পত্তিকর আইনে (Estate Duty Act, 1953) বলা হইয়াছে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য হইল: (ক) সমাজে বৈষম্যমূলক সম্পদ-বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করা, এবং (খ) রাজ্যগুলিকে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা।

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলে ইহার উপর

---

* সংবিধান অনুসারে (২৬৯ অনুচ্ছেদ) সম্পত্তিকর কেন্দ্রীয় রাজস্বের সূত্র নহে; কিন্তু ইউনিয়ন অঞ্চলগুলি ইহার অংশ পায় বলিয়া অনেক সময় ইহাকে কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখানো হয়।

সম্পত্তিকর প্রযুক্ত হয়। সম্পত্তির মূল্য অনুসারে কর নির্ধারিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে দুই বৎসরের মধ্যে কোন সম্পত্তি দান করা হইলেও উহার উপর কর বর্তিবে।

বলা হইয়াছে, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কৃষি-সম্পত্তি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং রাজ্যসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু একই প্রকার কর প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় সকল রাজ্যই কেন্দ্রের হস্তে কৃষি-সম্পত্তি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছে।

১৯৫৩ সালের মূল আইন অনুসারে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত কোন হিন্দুর বেলায় ৫০,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের সম্পত্তি না হইলে এবং অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য ১ লক্ষ টাকা বা তাহার বেশী না হইলে সম্পত্তিকর বসিত না। ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে অব্যাহতির সীমা ১ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া ৫০ হাজার টাকায় লইয়া আসা হইয়াছে।

ব্যবস্থা

সম্পত্তির উপর স্ল্যাব-পদ্ধতিতে গতিশীল হারে ধার্য করা হয়। যে-সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তিকর প্রদান হইতে রেহাই দেওয়া হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান: (১) মৃত্যুর ছয় বা ততোধিক মাসের পূর্বে জনস্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে দান; (২) মৃত্যুর দুই বা ততোধিক বৎসর পূর্বে অন্যান্য উদ্দেশ্যে দান; (৩) সম্পত্তিকর প্রদানের জন্য বীমা হইতে প্রাপ্ত অর্থের কিছু অংশ; (৪) মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলা কোন আত্মীয়ার বিবাহের জন্য ৫০০০ টাকা পর্যন্ত নির্দিষ্ট অর্থ; ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সম্পত্তিকর হইতে প্রাপ্ত অর্থ নিম্নলিখিতভাবে রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়: ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির জন্য মোট সংগৃহীত অর্থের শতকরা ১ ভাগ রাখিয়া বাকিটা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। স্থাবর সম্পত্তি হইতে যে-যে পরিমাণে কর সংগৃহীত হয় রাজ্যগুলি সেই সেই পরিমাণেই—অর্থাৎ, উদ্ভব অনুসারে (according to origin) পাইয়া থাকে। অস্থাবর সম্পত্তি হইতে সংগৃহীত অর্থ জনসংখ্যা অনুসারে বণ্টিত হয়। তৃতীয় ফিনান্স কমিশন এ-বিষয়ে কোন পরিবর্তন সুপারিশ করে নাই। অস্থাবর সম্পত্তি হইতে পশ্চিমবংগের প্রাপ্য শতকরা ৮·১১ ভাগ।

এই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের বণ্টন

রাজ্যসমূহ সম্পত্তিকর হইতে বর্তমানে অতি সামান্য টাকাই পাইয়া থাকে। ১৯৬২-৬৩ সালে এই সূত্র হইতে প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা।

২। ভূমিরাজস্ব (Land Revenue): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভূমিরাজস্ব ছিল বাংলা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের রাজস্বের সর্বপ্রধান সূত্র। এই সূত্র হইতে মোট প্রাদেশিক রাজস্বের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ সংগৃহীত হইত। বর্তমানে শতকরা অত ভাগ রাজস্ব সংগৃহীত না হইলেও জমিদারী বিলোপসাধনের দরুন পরিমাণে অনেক বেশী রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ১৯৫১-৫২ সালে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪৮ কোটি টাকা; ১৯৬২-৬৩ সালে উহা বাড়িয়া ১০৮½ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৬৩-৬৪ সালে ইহা হইবে ১২০ কোটি টাকা।

ভূমিরাজস্বকে অন্যতম স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় কর (static and inelastic tax) বলিয়া অভিহিত করা হয়। জমিদারি বিলোপের ফলে ইহা হইতে আয়ের পরিমাণ বর্তমানে বাড়িলেও, একটি স্তরে পৌছানোর পর ইহা আর বাড়িবে না। অপরদিকে বরং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ভূমিনীতি অনুসারে খাজনাহ্রাসের প্রচেষ্টার দরুন ইহা কমিয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যৎ উন্নয়নকার্যে রাজস্বের এই সূত্রের উপর অধিক পরিমাণে আস্থা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নহে।

ভূমিরাজস্বের বৈশিষ্ট্য

ভূমিরাজস্বের পরিচালনা ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা মোটেই কাম্য নহে। এই উদ্দেশ্যে কর অনুসন্ধানকারী কমিশন কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছে। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

৩। **স্ট্যাম্পকর ও রেজিস্ট্রেশন** (Stamps and Registration) : এই সূত্র হইতে রাজ্যসমূহের আয় বিশেষ অল্প নহে। ১৯৬২-৬৩ সালে এই সূত্র হইতে আয় ছিল ৫০ কোটি টাকার উপর।

৪। **নগরাঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তির উপর কর** (Urban Immovable Property Tax) : এই সূত্র হইতে রাজ্যসমূহের বৎসরে ২ কোটি টাকার মত আয় হয়।

১৯৬২-৬৩ সালে সম্পত্তি ও মূলধনের উপর উক্ত চারিটি কর হইতে ১৬৬ কোটি টাকার মত আয় হয়।

(গ) সামগ্রী ও সেবার উপর কর বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অংশ, রাজ্য অন্তঃশুল্ক, সাধারণ বিক্রয়কর, মোটরের তৈলের উপর বিক্রয়কর, প্রমোদকর, বিদ্যুৎশুল্ক, মোটরযানের উপর ধার্য কর, রেলযাত্রীব মাসুলের উপর ধার্য কর ইত্যাদি।

গ। সামগ্রী ও সেবার উপর কর

১। **কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অংশ** (Share of Union Excise Duties) : তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক সংগৃহীত হয় এরূপ সকল কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের নীট আয়ের শতকরা ২০ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে রাজ্যসমূহের এই সূত্র হইতে ১২৩ কোটি টাকার মত আয় হইয়াছিল।

২। **রাজ্য অন্তঃশুল্ক** (State Excise Duties) : মাদক দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারসমূহের। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধ করা। এইরূপ করকে প্রতিরোধকারী বা নিষিদ্ধকারী অন্তঃশুল্ক (prohibitive excises) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্য মাদক বর্জনের নীতি গ্রহণ করায় রাজ্য অন্তঃশুল্ক হইতে আয় দিন দিন কমিতেছে। বর্তমান আয় ৬০ কোটি টাকার মত।

মাদক দ্রব্য বর্জন সরকারের অন্যতম গৃহীত নীতি হইলেও বর্তমান অবস্থায় রাজ্যসমূহ এই পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকারও এই বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার পরামর্শ দিয়াছে। তাই আরও কিছুদিন রাজ্যসমূহের রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে এই সূত্র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া থাকিবে।

৩। **বিক্রয়কর (Sales Tax):** ১৯৩৮ সালের পূর্বে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়-ব্যবস্থায় বিক্রয়কর বলিয়া কিছুই ছিল না। ঐ বৎসর তৎকালীন মধ্য-প্রদেশ ও বেরার মোটর তৈল ও তৈলাক্ত করিবার দ্রব্যাদির (lubricants) উপর বিক্রয়কর ধার্য করে। পরবর্তী বৎসরে মাদ্রাজ সাধারণ বিক্রয়করের (General Sales Tax) প্রবর্তন করে, এবং বংগদেশ ও পাঞ্জাব শীঘ্রই মাদ্রাজের অনুবর্তী হয়। অপরাপর প্রদেশও এই পথে পদসঞ্চার করিতে বিলম্ব করে না। এবং শীঘ্রই এই কর প্রাদেশিক (পরে রাজ্যসমূহের) কর-রাজস্বের প্রধান সূত্র হইয়া দাঁড়ায়।

বিক্রয়কর কর-রাজস্বের প্রধান সূত্র

১৯৫১-৫২ সালে রাজ্যসমূহের কর-রাজস্ব ২৮১ কোটি টাকার মধ্যে বিক্রয়কর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল ৫৪ কোটি টাকা। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট ১২৬০ কোটি টাকার মধ্যে বিক্রয়কর হইতে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি টাকা। বস্ত্র, তামাক ও চিনির উপর বিক্রয়করের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক স্থাপিত না হইলে প্রাপ্তির পরিমাণ আরও অধিক হইত।

ভারতে প্রবর্তিত বিক্রয়কর দুই প্রকারের—রাজ্য বিক্রয়কর (State Sales Tax) এবং কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর (Central Sales Tax)। ভারতীয় সংবিধানের (Constitution of India) সংশোধিত ২৬৯ এবং ২৮৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যের বাহিরে ক্রয়বিক্রয় বা আমদানি-রপ্তানির উদ্দেশ্যে ক্রয়বিক্রয়ের উপর কোন রাজ্য বিক্রয়কর ধার্য করিতে পারে না। যে-সকল দ্রব্য আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাদের ক্ষেত্রে কোন বিক্রয়কর ধার্য করিতে হইলে রাজ্যসমূহকে পার্লামেণ্ট নির্দিষ্ট বাধানিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। মোটকথা, এই সকল ক্ষেত্রে বিক্রয়কর ধার্য করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইন (Central Sales Tax Act) পাস করে এবং পরে উহার কিছু রদবদল করা হয়। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক ব্যবসায়ী আন্তঃরাজ্য ব্যবসাবাণিজ্য-ব্যপদেশে দ্রব্যের সকল প্রকার বিক্রয়ের উপর কর দিতে বাধ্য। এইরূপ ব্যবসায়ীকে রেজিস্ট্রীভুক্ত হইতে হইবে। রেজিস্ট্রীভুক্ত ব্যবসায়ীদের আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়করের হার বিক্রয়লব্ধ অর্থের (turnover) শতকরা এক ভাগ। অবশ্য যেখানে কোন দ্রব্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিক্রয়কর আইনে অব্যাহতি পায় অথবা কোন দ্রব্য উপরি-উক্ত হারের কম হারে কর প্রদান করে সেখানে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের

কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর

বেলায় দ্রব্যকে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর দিতে হয় না এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কম হারে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর দিতে হয়। ইহা ছাড়া রাজ্য সরকার জনস্বার্থে সমীচীন মনে করিলে কোন ব্যবসায়ীকে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর হইতে মুক্তি দিতে পারে।

রাজ্যের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর হইতে যে-আয় সংগৃহীত হয় উহা হইতে ইউনিয়ন অঞ্চলের অংশ বাদ দিয়া বাকিটা রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

কয়লা, তুলা, তুলাজাত সুতা, লৌহ ও ইস্পাত, চর্ম প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যকে আন্তঃরাজ্য ব্যবসাবাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাদের সম্পর্কে রাজ্যের বিক্রয়করের উপর বাধানিষেধের ব্যবস্থা আইনে রহিয়াছে।

রাজ্য বিক্রয়কর

অন্যান্য ক্ষেত্রে বিক্রয়কর ধার্য করিবার ক্ষমতা হইল রাজ্য সরকারের। তবে বর্তমানে বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর রাজ্যসমূহ বিক্রয়কর বসাইতে পারে না। বিক্রয়করের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের উপর অন্তঃশুল্ক স্থাপন করে। এই অন্তঃশুল্ক হইতে যে-আয় হয় তাহা হইতে রাজ্যগুলিকে প্রথমত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ইহার পর যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকে অংশত জনসংখ্যা অনুযায়ী এবং অংশত ভোগ অনুযায়ী (consumption) বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

রাজ্য বিক্রয়করের বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি

ভারতে প্রবর্তিত বিক্রয়করের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় যে, ইহা অন্যতম অধোগতিশীল কর (regressive tax)। ইহার ভার ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের উপরই অধিক পড়ে। ফলে বিক্রয়কর এখনও জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। ইতিহাসও ইহার সাক্ষ্য দেয়। বিশ্বের অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, বিক্রয়কর প্রবর্তনের প্রচেষ্টা সকল ক্ষেত্রেই বিফল হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবর্তিত বিক্রয়করের মধ্যে হার ও প্রকৃতির কোন সংগতি নাই। করের হার কোথাও শতকরা ১২ টাকা কোথাও শতকরা ৫ টাকা। আবার অধিকাংশ রাজ্যে বিক্রয়কর একপর্যায়ী (single-point) হইলেও অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রে ইহা হইল বহুপর্যায়ী (multi-point)। অর্থাৎ, এই তিন রাজ্যে একই সামগ্রী যতবার হস্তান্তরিত হইবে ততবারই বিক্রয়কর লাগিবে। কিছুদিন পূর্ব হইতে বিহারও কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বহুপর্যায়ী কর স্থাপন করিয়াছে। আবার পশ্চিমবংগে কতকগুলি বস্তুর ক্ষেত্রে বিক্রয়ের প্রথম পর্যায়ে ও কতকগুলি বস্তুর ক্ষেত্রে বিক্রয়ের শেষ পর্যায়ে এই কর ধার্য করা হয়।

বিহার, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে আবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও বিলাস-সামগ্রীর উপর তারতম্যমূলক হার (differential rates) ধার্য করা হয়। যেমন, পশ্চিমবংগে কতিপয় বিলাস-দ্রব্যের উপর অধিক হারে কর দিতে হয়।

বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয়করের হার বিভিন্ন হওয়ার দরুন আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য ব্যাহত হইতেছিল। এইজন্যই ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় বিক্রয়-কর আইন পাস করা হয়; এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষের দিকে বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর রাজ্য বিক্রয়করের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়। বর্তমানে সিল্ককেও এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

ত্রুটির বিরুদ্ধে অবলম্বিত ও অবলম্বনীয় প্রতিবিধান

বিক্রয়কর রাজ্যসমূহের রাজস্বের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হইলেও ইহার পরিচালনা-পদ্ধতিতে বিশেষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ফলে অনেকেই এই কর ফাঁকি দেয়। পরিচালনা-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিতে পারিলে এই সূত্র হইতে আরও বহু পরিমাণ অধিক রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। উপরন্তু, ইহার বিস্তৃতিও (coverage) ব্যাপকতর করিয়া অধিকসংখ্যক লোককে কর-প্রদানকারী গোষ্ঠীর (group of tax payers) অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে কর অনুসন্ধানকারী কমিশন যে সুপারিশগুলি করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা পরে হইতেছে।

৪। **মোটরের তৈলের উপর বিক্রয়কর (Sales Tax on Motor-spirit)**ঃ মোটরের তৈলের উপর ধার্য বিক্রয়কর একটি বিশেষ বিক্রয়কর। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এ-বিষয়ে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারই পথিকৃৎ। ১৯৬২-৬৩ সালে এই সূত্র হইতে রাজ্যসমূহের মোট ২২ কোটি টাকার উপর আয় হয়।

৫। **প্রমোদকর (Entertainment Tax)**ঃ আমোদ-প্রমোদের উপর ধার্য কর হইতে রাজ্যসমূহের কিছুটা আয় হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি টাকার উপর।

৬। **বিদ্যুৎ শুল্ক (Electricity Duties)**ঃ ১৯৬২-৬৩ সালে এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮ কোটি টাকা।

৭। **মোটরযানের উপর কর (Motor Vehicles Taxes)**ঃ মোটরযানের উপর করকে রাজ্যসমূহের রাজস্বের উল্লেখযোগ্য সূত্র বলিয়া গণ্য করা যায়। ১৯৬২-৬৩ সালে ইহা হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি টাকার কাছাকাছি। উপরন্তু, দেশের আর্থিক উন্নয়নের সংগে সংগে এই সূত্র হইতে আয়বৃদ্ধির আশাও করা যায়।

৮। **রেলযাত্রীর মাসুলের উপর কর (Tax on Railway Fares)**ঃ কর-রাজস্বের এই সূত্রটি মাত্র চার বৎসর (১৯৫৭-৫৮—১৯৬০-৬১) বর্তমান ছিল। ১৯৬১-৬২ সাল হইতে রেল মাসুলের উপর কর মাসুলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ক্ষতিপূরণস্বরূপ ১২·৫ কোটি টাকা রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়।

৯। **অন্যান্য কর ও শুল্ক (Other Taxes and Duties)**ঃ অন্যান্য কর ও শুল্ক হইতে ১৯৬২-৬৩ সালে রাজ্যসমূহের প্রায় ২৯ কোটি টাকা আয় হয়।

কর-নিরপেক্ষ রাজস্বসমূহের মধ্যে বনসম্পদ হইতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি টাকা; ১৯৬২-৬৩ সালে ইহা বাড়িয়া প্রায় ৩৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অরণ্যজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিই এই আয়বৃদ্ধির কারণ। জলসেচ-ব্যবস্থা হইতেও আয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে এই সূত্র হইতে ১০-১২ কোটি টাকার মত আয় হয়। ভবিষ্যতে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব-সমূহ

ইহার পর আছে রাজ্য সরকারসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, রাজপথ ও জলপথ পরিবহণ এবং কিছু কিছু শিল্প। এই সকল সূত্র হহতে রাজ্যগুলির ৭-৮ কোটি টাকার মত আয় হয়।

নানা সূত্রে রাজ্যসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বরাদ্দ অর্থ বা অনুদান ও নিয়মিত অর্থসাহায্যও পাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আছে সাধারণ অনুদান, সংসরণ-ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য অনুদান, তপশীলী জাতিসমূহের উন্নয়নের অনুদান প্রভৃতি। তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এই সকল অনুদানের মোট পরিমাণ হইল ১২২.৭৫ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য

রাজস্ব খাতে রাজ্যসমূহের ব্যয় (Expenditure of the States on Revenue Account): রাজস্ব খাতে রাজ্যসমূহের ব্যয়কে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—যথা, উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অনুন্নয়ন-মূলক ব্যয় (Development Expenditute and Non-development Expenditure)। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে আছে শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও সেচকার্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, গ্রামীণ ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Rural and Community Development Projects), পূর্ত (Civil Works), শিল্প প্রভৃতি। অপরদিকে অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল রাজস্বের উপর ধার্য প্রত্যক্ষ দাবি (Direct Demands on Revenue), রাজ্য সরকারের ঋণজনিত ব্যয়, বেসামরিক শাসন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি।

উন্নয়নমূলক ও অনুন্নয়নমূলক ব্যয়

উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে সর্বাধিক হইল শিক্ষা খাতে। এই ব্যয়ের পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকার উপর। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয় বৎসরে ১০০ কোটি টাকার উপর। তারপর আছে কৃষি ও সমবায়। এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৯০ কোটি টাকার কাছাকাছি। পরবর্তী স্থানাধিকারী হইল সরকারী পূর্ত বিভাগ। এই খাতে ৮৭ কোটি টাকার মতই ব্যয় হয়। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য রাজ্যগুলি বৎসরে ৬০ কোটি টাকার মত ব্যয় করে। জল-সেচের জন্যও রাজ্যসমূহের ব্যয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যয়ের পরিমাণ ৪০ কোটি টাকার মত। শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন খাতে ১৯৬২-৬৩ সালে মোট ৯০ কোটি টাকার মত ব্যয় করা হইয়াছিল।

অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থানাধিকার করিয়া আছে বেসামরিক শাসন (Civil Administration)। বস্তুত, এই খাতে যত ব্যয় হয় তাহা উন্নয়নমূলক বা অনুন্নয়নমূলক আর কোন খাতেই হয় না। ১৯৬২-৬৩ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০২ কোটি টাকা। তাহার উপর আছে রাজস্বসংগ্রহ করিবার জন্য ব্যয়। উক্ত বৎসরে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি টাকার কাছাকাছি। অন্যান্য অনুন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় বিশেষ পরিবর্তনশীল—যেমন, দুর্ভিক্ষজনিত ব্যয়ের বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। তবে রাজ্য সরকারসমূহের ঋণ-জনিত ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই খাতে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৮·৫ কোটি টাকা। ১৯৬২-৬৩ সালে ইহা বাড়িয়া ১৬৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য রাজ্য সরকারসমূহের ঋণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ঋণজনিত ব্যয়ের পরিমাণ ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাইবে।

সরকারী ঋণ (Public Debt): সরকারী ঋণকে একরূপ অপরিহার্য বলিয়াই বর্ণনা করা চলে। রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-পদ্ধতিতে আয়ে ব্যয় সংকুলান না হইলেই সরকারকে হয় ঋণ করিতে হয়, না-হয় নোট ছাপাইতে হয়। অনেক সময় আবার উভয় পদ্ধতিই 'অনুসরণ করিতে হয়। স্বাভাবিক সময়ে বাজেটের ঘাটতি মিটাইবার জন্য সরকার ঋণসংগ্রহই করে। অস্বাভাবিক সময়ে উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করে।

স্বাধীনতার পর হইতে আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন। পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও ভারতের সরকারী ঋণ দুই ভাগে বিভক্ত—ভারত সরকারের ঋণ, এবং রাজ্য সরকারসমূহের ঋণ। ভারত সরকারের ঋণ আবার অনুৎপাদনশীল (unproductive) এবং উৎপাদনশীল বা সুদ উৎপাদনকারী (interest-yielding) এই দুই শ্রেণীতে পড়ে। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৭৬৯১ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঋণ (internal debt) ছিল ৬৩৩২ কোটি টাকা, এবং বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত ঋণ (external debt) ১৩৫৯ কোটি টাকা। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের শেষে উক্ত ৭৬৯১ কোটি টাকা মোট ঋণ ৯০৫৬ কোটি টাকায় পরিণত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।. পরবর্তী পৃষ্ঠায় ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অনুমিত ভারত সরকারের ঋণের গঠন ও প্রকৃতি দেওয়া হইল।

ঋণের শ্রেণীবিভাগ ও পরিমাণ

ঋণ :	(হিসাব কোটি টাকায়)
১। সাধারণ ঋণ (Loans)	৩০৬৮·২৭
২। ট্রেজারী বিল ইত্যাদি স্বল্পকালীন ঋণ	১৮৬৮·৯৮
৩। স্বল্প সঞ্চয় (Small Savings)*	১২৫২·০৪
৪। অবপূর্তি এবং রিজার্ভ ফাণ্ড (Depreciation and Reserve Funds).	১৭৭·৪৩
৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমানত তহবিল বিনিয়োগ	৪৪৪·৫৪
৬। অন্যান্য আমানত	৪৭৪·৮৩
মোট	৭২৮৬·০৯
বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত ঋণ :	
১। স্টার্লিং ঋণ	১৯২·৮৯
২। ডলার ঋণ	১০৬৯·৯১
৩। সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে ঋণ	১৬৪·৩০
৪। পশ্চিম জার্মানী হইতে ঋণ	১৪৯·৯৪
৫। অন্যান্য দেশ হইতে ঋণ	১৯২·৫০
মোট (ক+খ)	৯০৫৫·৬৩

উক্ত ৯০৫৫·৬৩ কোটি টাকা ঋণের বিরুদ্ধে উৎপাদনশীল বা সুদ প্রদানকারী পাওনা বা সম্পত্তির (assets) পরিমাণ হইবে ৭৩৮০·০৭ কোটি টাকা। ইহারও গঠন ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হইল :

ঋণের বিরুদ্ধে পাওনা

ক।	(হিসাব কোটি টাকায়)
১। রেলপথসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	২১০৪·৪৮
২। অন্যান্য বাণিজ্যিক বিভাগকে প্রদত্ত ঋণ	৩০৩·২১
৩। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ	৮৬৫·৮২
৪। রাজ্যসমূহকে প্রদত্ত ও অন্যান্য সুদপ্রদানকারী ঋণ	৩৭৮৯·০২
৫। পাকিস্তান হইতে প্রাপ্য ঋণ	৩০০·০০
৬। ষ্টার্লিং পেনসন্ হেতু জমা	১৭·৫৪
সুদপ্রদানকারী সম্পত্তির মোট পরিমাণ	৭৩৮০·০৭
খ। ট্রেজারী খাতে নগদ ও ঋণপত্রে জমা	১১৫·৯০
গ। সরকারী ঋণের বাকী অংশ যাহার বিরুদ্ধে কোন জমা নাই	১৫৫৯·৬৬
মোট (ক+খ+গ)	৯০৫৫·৬৩

উপরি-উক্ত বর্ণনা ও ছক দুইটি হইতে দেখা যাইবে যে, ভারত সরকারের মোট ঋণের শতকরা ৮০ ভাগের মত আভ্যন্তরীণ ঋণ। সুতরাং সরকারী ঋণের

* প্রাইজ-বণ্ড প্রভৃতি স্বল্প সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত।

পরিমাণ অত্যধিক হইলেও ভার (burden) তদনুপাতে কম। দ্বিতীয়ত, মোট ঋণের মাত্র শতকরা ১৮-১৯ ভাগের বিরুদ্ধে কোন পাওনা বা সম্পত্তি নাই। বাকী ৮০ ভাগ হইল সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনশীল ঋণ। তৃতীয়ত, দেখা যায় যে, ছোটখাট অংকের ঋণসংগ্রহের ব্যাপারে ভারত সরকারকে মোটেই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ঋণপত্র বাজারে ছাড়িবার সংগে সংগেই ইহা একরূপ বিক্রীত হইয়া যায়। চতুর্থত, ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিকল্পনাধীন বিগত ১০ বৎসরে বৃদ্ধির পরিমাণ হইল ৩৭১৮ কোটি টাকা।*

সরকারী ঋণের বৈশিষ্ট্য

রাজ্য সরকারসমূহের ঋণঃ ১৯৬৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সরকারসমূহের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৫৩৯ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণই ছিল ২৬৪০ কোটি টাকা এবং স্থায়ী ঋণ (permanent debt) ছিল ৬৫৮ কোটি টাকা। বাকী অংশ ছিল অস্থায়ী (unfunded) ঋণ।

কেন্দ্রীয় সরকারের মত রাজ্য সরকারসমূহের ক্ষেত্রেও ঋণসংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় না। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হইল সরকারের সুষ্ঠু ঋণ-পরিচালনা পদ্ধতি।

ভারতীয় কর-পদ্ধতির ত্রুটি ও প্রতিবিধান (Defects of the Indian Tax System and their Remedies) : ভারতীয় কর-পদ্ধতির প্রধান ত্রুটিগুলি হইল নিম্নলিখিত রূপঃ প্রথমত, ভারতীয় কর-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নহে; ১৯৫৩ সালের পূর্বে ইহার সর্বাংগীণ সংস্কার করিয়া ইহাকে কাম্যভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয় নাই। কর-পদ্ধতির দুইটি লক্ষ্য থাকে—যথা, প্রয়োজনমত রাজস্বসংগ্রহ ও সামাজিক উদ্দেশ্যসাধন। ভারতের কর-ব্যবস্থা কিন্তু এই দুইটির মধ্যে প্রথমটি অভিমুখেই সর্বদা চলিয়াছে। ফলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়মিত ব্যাহত হইয়াছে।

ত্রুটিঃ
১। কর-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নহে

দ্বিতীয়ত, ভারতে বহুপ্রকার কর প্রবর্তিত থাকিলেও ভারতীয় কর-পদ্ধতি হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কর সংগৃহীত হয় না। ক্যালডোরের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতে কর-রাজস্বের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের (National Income) শতকরা ৭ ভাগ মাত্র।** বর্তমানে শতকরা ৯.৫ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। মধ্যে দু'এক বৎসর অবশ্য করসংগ্রহের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগের মত। তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য করের পরিমাণকে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১.৪ ভাগে লইয়া যাইবার আশা করা হইয়াছে।

২। ইহা পর্যাপ্ত নহে

* Reserve Bank Bulletin, March 1968

** Kaldor's Report ১ পৃষ্ঠা

তৃতীয়ত, ভারতের কর-রাজস্ব বিশেষভাবে অনতিপরিবর্তনশীলও (inelastic) বটে। উপরি-উক্ত রিপোর্টে দেখানো হইয়াছে যে, বিগত ৫-৬ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয়বৃদ্ধির অনুপাতে কর-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই; অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এইরূপ বৃদ্ধিই হইল স্বাভাবিক। তৃতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতে অবশ্য এইদিকে গতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

৩। কর-রাজস্ব অনতিপরিবর্তনশীল

চতুর্থত, ভারতীয় কর-পদ্ধতিতে পরোক্ষ করের বিশেষ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। কর তদন্তকারী কমিশন (Taxation Enquiry Commission) দেখিয়াছিল, মোট কর-রাজস্বের শতকরা ৪৫ ভাগ সাধারণের ভোগ্যপণ্যের উপর ধার্য কর হইতে সংগৃহীত হয়। অপরদিকে প্রত্যক্ষ কর-রাজস্বের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৪-৪৫ সালে শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও, ১৯৫৩-৫৪ সালে শতকরা ২৪ ভাগে নামিয়া আসে। বর্তমানে কর-রাজস্বের শতকরা ৩০ ভাগ আসে প্রত্যক্ষ কর হইতে; পরোক্ষ কর হইতে আসে শতকরা ৭০ ভাগ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের কর-পদ্ধতি হইল প্রকৃতিতে অধোগতিশীল (regressive)। এই অধোগতিশীলতার ধারণা ক্যালডোরের রিপোর্ট হইতেও পাওয়া যাইবে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছিল, ভারতে মাত্র শতকরা ১ জন লোক আয়কর প্রদান করিয়া থাকে। তুলনামূলকভাবে ব্রিটেনে ইহার শতকরা ভাগ হইল ৭০। সম্প্রতি অবশ্য আয়কর অব্যাহতির সীমা ৪২০০ টাকা হইতে কমাইয়া ৩০০০ টাকা করায় ভারতে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা ৫ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ১১-১২ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য বলা যাইতে পারে, স্বল্পোন্নত দেশসমূহে এইরূপই ঘটে। যে-দেশে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকে সে-দেশে পরোক্ষ করেরই ভারাধিক্য দেখা যায়।

৪। কর-পদ্ধতি অধোগতিশীল

পঞ্চমত, কর-ব্যবস্থার পরিচালনা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া কর-প্রবঞ্চনার পরিমাণও অত্যন্ত অধিক। ক্যালডোর অনুমান করিয়াছিলেন যে ভারতে বৎসরে লোকে ১০০ কোটি টাকার উপর আয়কর ফাঁকি দিয়া থাকে। কর-পরিচালনা কমিটির রিপোর্টেও ইহা স্বীকার করা হইয়াছিল। কর-প্রবঞ্চনার জন্য কর-পদ্ধতি আরও অধোগতিশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, ধনী ব্যক্তিরা কর ফাঁকি দিয়া যে করভার এড়াইয়া যায় তাহা দরিদ্রদেরই বহন করিতে হয়। ক্যালডোরকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, ভারতের কর-পদ্ধতি ধনীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট।

৫। কর-ব্যবস্থার পরিচালনা ত্রুটিপূর্ণ

ষষ্ঠত, ভারতের কর-পদ্ধতি গতানুগতিক ও রক্ষণশীল। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত

ভারতে কোন মৃত্যুকর বা সম্পত্তিকর ছিল না। অনিশ্চিত আয়ের উপর কর (Capital Gains Tax) করার ব্যবস্থাও ছিল না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে (Interim Government) এই কর প্রথম ধার্য করা হইয়াছিল ; কিন্তু দুই বৎসর পরেই ইহার বিলোপসাধন করা হয়।*

৬। ইহা গতানুগতিক ও রক্ষণশীল

পরিশেষে, কর-পদ্ধতির কোন সংস্কার নির্দেশ করিবার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে, সংগৃহীত কর-রাজস্ব ন্যায্যভাবে ব্যয়িত হইতেছে কি না। এই সম্পর্কে কর অনুসন্ধানকারী কমিশন বলিয়াছিল, সাধারণের উপর আরও করভার চাপানোর পূর্বে বর্তমান কর-সম্পদের ন্যায্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু সরকারী ব্যয়-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে কাম্য বলিয়া বর্ণনা করা কঠিন। দেখা যায়, মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় রাজস্ব খাতে ব্যয়ের (revenue expenditure) শতকরা ৭৫ ভাগ ব্যয়িত হয় অনুন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যে (non-development purposes) এবং শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয়িত হয় সমাজসেবামূলক কাজকর্মে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে। অনুন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যের মধ্যে আবার সর্বপ্রধান স্থানাধিকার করিয়া আছে প্রতিরক্ষা। ইহার জন্য মোট রাজস্বের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগের উপর ব্যয়িত হয়। রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুলিস, শাসন বিভাগ ও জেল খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হইল শতকরা ১৮ ভাগের কাছাকাছি। এইরূপ ব্যয়-পদ্ধতিকে কোনরূপেই সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের সূচক হিসাবে গণ্য করা যায় না। তবে আশার কথা হইল যে ইহার পরিবর্তন ঘটিতেছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, প্রতিরক্ষার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্যয় করা হইত মোট রাজস্বের শতকরা ৫৪ ভাগ ; বর্তমানে ইহা নামিয়া ৩০-৩২ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে শতকরা ৫০ ভাগের কিছু বেশী। ঐ একই সময়ের মধ্যে শাসন বিভাগের জন্যও ব্যয় (expenditure on administrative services) শতকরা ১৩ ভাগ হইতে কমিয়া ৫ ভাগের মত হইয়াছে।

৭। ব্যয়-পদ্ধতি সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের সূচক নহে

প্রতিবিধান (Remedies) : ভারতীয় কর-পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতিবিধান নির্দেশে অধিকদূর যাইতে হয় না। মতদ্বৈধতার আশংকা না করিয়াই বলিতে পারা যায়, সংস্কার এমনভাবে করিতে হইবে যে, (ক) কর-পদ্ধতি যেন বিজ্ঞানসম্মত, গতিশীল (progressive) ও উন্নয়নশীল অর্থ-ব্যবস্থার সহায়ক হয়, (খ) কর-রাজস্ব অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয় এবং (গ) ব্যয়-পদ্ধতি যেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের সূচক হয়। ইহাদের মধ্যে আবার অধিক প্রয়োজন হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় অর্থসরবরাহের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে কর-রাজস্ব সংগ্রহের। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের কাম্য বণ্টন ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য

উন্নয়নশীল অর্থ-ব্যবস্থায় কর-ব্যবস্থার সংস্কার

* ১৮৮ পৃষ্ঠা দেখ।

কর-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করিতে হয়। বস্তুত, ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে কর-ব্যবস্থাকে আর্থিক নীতির যন্ত্র (instrument of economic policy) হিসাবে পরিচালিত করিতে হইবে।* মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ, আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন, প্রাকৃতিক সম্পদের কাম্য বণ্টন ও পূর্ণ ব্যবহার ইত্যাদি আর্থিকনীতির উদ্দেশ্যগুলি উপলব্ধি করার জন্য কর-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়। সংগে সংগে সামাজিক উদ্দেশ্যও যাহাতে ব্যাহত না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দুইটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক রিপোর্টে ভারতীয় কর-পদ্ধতির সংস্কারের সুপারিশ করা হইয়াছে এবং কিছু কিছু কার্যকরও করা হইয়াছে। রিপোর্ট দুইটি হইল: কর তদন্তকারী কমিশনের রিপোর্ট ও অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডোরের রিপোর্ট। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রতিবিধান সম্বন্ধে করতদন্তকারী কমিশন ও অধ্যাপক ক্যালডোর

কর তদন্তকারী কমিশনের রিপোর্ট (The Report of the Taxation Enquiry Commission): কর তদন্তকারী কমিশনের উপর কর-পদ্ধতির বিভিন্ন দিকের বিচারবিশ্লেষণ ও পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতিবিধান নির্দেশের ভারার্পণ করা হয়। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

কমিশনের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ

রিপোর্টের প্রথমেই যে পট-ভূমিকায় বর্তমান কর-পদ্ধতির সমস্যা আলোচনা করিতে হইবে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রসংগে অন্যান্যের মধ্যে কমিশনের বক্তব্য হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বে রাজ্য সরকারসমূহের স্বার্থ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্ধিত হওয়ায় ভারতের রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন সামগ্রিকভাবেই করিতে হইবে।

ক। সামগ্রিক সংস্কারসাধন

দ্বিতীয়ত, বর্তমান কর-সম্পদের (tax resources) যথাযোগ্য ব্যবহার না করিয়া সাধারণের উপর নূতন অধিক করভার চাপানো উচিত হইবে না। কমিশন এই অভিমত পোষণ করে যে, সামগ্রিকভাবে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে আয়গত বৈষম্যের দূরিকরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্ভব হয় নাই। তবে কিছুটা পরিমাণে আঞ্চলিক বৈষম্য অপসারিত হইয়াছে।

খ। কর-সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার

তৃতীয়ত, করভার (incidence of taxation) ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্ত হইল:

গ। করভার

(১) যদিও গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা নগরাঞ্চলের লোকে অধিক করপ্রদান করিয়া থাকে তবুও সামগ্রিকভাবে মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই;

* **Third Five Year Plan** ১৫ পৃষ্ঠা

(২) নগরাঞ্চলের পরোক্ষ কর গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা অধিক গতিশীল ;

(৩) উভয় অঞ্চলেই করভার বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে ;

(৪) ভূমি-রাজস্বের ভার বর্তমানে আর উল্লেখযোগ্য নহে ;

(৫) কর নির্ধারণের ভিত্তি (base for taxation) প্রশস্ততর করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কিছু পরিমাণে পরোক্ষ করের সাহায্যে কর-পদ্ধতিকে গতিশীল করা যাইতে পারে।

ঘ। কর ও ঋণের উপর নির্ভরশীলতা

কমিশন পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ঘাটতি বাজেট (deficit financing) নীতি অপেক্ষা করধার্য ও ঋণ-সংগ্রহের উপরেই অধিকতর নির্ভরশীল হইতে পরামর্শ দিয়াছে।

ঙ। গ্রহণযোগ্য কর-নীতি :

ইহার পর আছে গ্রহণযোগ্য কর-নীতি (tax policy) সম্বন্ধে কমিশন প্রদত্ত ধারণা। এই সম্পর্কে কমিশনের প্রথম বক্তব্য হইল যে, বৈষম্যের কয়েকটি মৌলিক সূত্রের অপসারণ দ্বারা সম্পদ ও উপার্জনে বর্তমানের দৃষ্টিকটু বৈষম্যের দূরিকরণ বহু পরিমাণে সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ কর-পদ্ধতিতে গতিশীলতার বৃদ্ধি ও ইহার অনুপূরক হিসাবে পরিচালনাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আবার ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, গতিশীলতার প্রয়োজন যেন জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে কর-পদ্ধতির এলাকার বাহিরে রাখা না হয়। কর-পদ্ধতি সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছে যে, ইহা দেশের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনের সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে। অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনের সহিত সংগতিপূর্ণ বলিতে বুঝানো হইয়াছে যে, ইহার দ্বারা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের পরিমাণ সামান্য হ্রাস করিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে এইরূপ সম্পদের পরিমাণের বিশেষ বৃদ্ধি সম্ভব হইবে। স্বাভাবিকভাবেই এইরূপ ব্যবস্থা সংঘটিত হইবে সকল শ্রেণীর লোকের ভোগের পরিমাণ হ্রাসের দ্বারা। অবশ্য নির্ধন অপেক্ষা ধনিক শ্রেণীর ভোগই অধিক হ্রাস করিতে হইবে।

কমিশনের মতে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভোগের ব্যাপারে যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে তাহা সাধারণ শ্রমিককে কার্যে বিশেষ নিরুৎসাহিত করে ; অপরদিকে কিন্তু উচ্চ করহার উচ্চ আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তিদের নিরুদ্যোগী করে বলিয়া যে প্রচার করা হয় তাহা অনেকাংশে অতিরঞ্জিত। অতএব, প্রয়োজন হইল

নীট আয়ের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ

নীট আয়ের (net income) উর্ধ্বতন মাত্রা (ceiling) নির্ধারণ করা। দেখিতে হইবে যে, করপ্রদানের পর সর্বাধিক আয় যেন গড় পারিবারিক আয়ের ৩০ গুণের অধিক না হয়। কিন্তু এই লক্ষ্যে ধীরে ধীরে পৌছিতে হইবে এবং ইহার জন্য কর-পদ্ধতির সংস্কার ছাড়া অন্যান্য পন্থাও অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে। সংগে সংগে যাহাতে কর-পদ্ধতির দ্বারা সঞ্চয়েচ্ছা ও বিনিয়োগের বৃদ্ধি ঘটে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কিভাবে কর-পদ্ধতির সংস্কার দ্বারা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থ-সরবরাহ বৃদ্ধি করা হইবে? কমিশনের মতে, ইহা করা হইবে প্রধানত আয়কর, অন্তঃশুল্ক ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (non-tax revenue) বৃদ্ধি করিয়া, ভূমি-রাজস্বের উপর সামান্য পরিমাণে সারচার্য (surcharges) ধার্য করিয়া এবং কৃষি-আয়কর ও বিক্রয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া। ইহার উপর সম্পত্তির উপর ধার্য করকে ব্যাপকতর করিতে হইবে।

কিভাবে কর-পদ্ধতির সংস্কার করিতে হইবে

কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত হইল যে, যোগ্য মূল্যায়ন নীতির (pricing policy) দ্বারা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে মুনাফা লাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিশেষ বিশেষ কর সম্বন্ধে কর তদন্তকারী কমিটির সুপারিশ (Recommendations of the Taxation Enquiry Commission regarding Individual Taxes) : (ক) আয়কর (Income Tax) : আয়করের সংস্কার সম্পর্কে কর তদন্তকারী কমিটির প্রধান সুপারিশগুলি হইল নিম্নলিখিত রূপ :

(১) করধার্যযোগ্য আয়ের (taxable income) ব্যাপকতর সংজ্ঞা দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রাপ্তিকে—যথা, ম্যানেজিং এজেন্সীর অপসারণজনিত ক্ষতিপূরণ, পেটেন্ট অধিকারের (patent rights) বিক্রয় প্রভৃতি আয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ২৪ হাজার টাকা বা তদূর্ধ্ব বেতন ও ভাতাপ্রাপ্ত কর্মচারী ও কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের বিশেষ সুবিধার (benefits) উপর কর ধার্য করিতে হইবে। তৃতীয়ত, সাধারণ আয় ও কৃষিগত আয়ের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপসাধন দ্বারা উভয়কেই আয়করের উদ্দেশ্যে একই বলিয়া ধরিতে হইবে।

আয়করের সংস্কার

(২) যন্ত্রপাতির অবপূর্তির দরুন প্রাথমিক বাদ (initial depreciation allowance) 'বর্তমানে'র শতকরা ২০ হইতে ২৫-এ বাড়াইতে হইবে।

(৩) বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করিবার জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন রেয়াতের (development rebates) প্রবর্তন করিতে হইবে।

(৪) করের কাঠামোরও (rates structure) পরিবর্তন সংঘটিত করিতে হইবে। এই দিকে প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হইল আয়কর ও অতিরিক্ত করের স্ল্যাবের (slabs) সংখ্যাবৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, কর হইতে অব্যাহতির সীমা (tax exemption limit) 'বর্তমানে'র ৪২০০ টাকা হইতে কমাইয়া ৩০০০ টাকায় লইয়া যাইতে হইবে। তৃতীয়ত, পরিবারের জন্য রেয়াৎ (family allowance) দেওয়ার পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে হইবে। চতুর্থত, বীমা প্রিমিয়াম, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতির জন্য যে-বাদ (abatement) দেওয়া হয় তাহা বর্তমানে এক-ষষ্ঠাংশ হইতে এক-পঞ্চমাংশে লইয়া আসিতে হইবে।

(৫) পরিশেষে, অন্তত সৎ করপ্রদানকারীর (honest tax-payer) ভার

লাঘব করিবার জন্য পরিচালনাগত উন্নয়নের দ্বারা আয়কর প্রবঞ্চনার পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে।

(খ) সম্পত্তিকর (Estate Duty): সম্পত্তিকর সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ হইল যে, এই সূত্র হইতে আয়বৃদ্ধির জন্য কিছুদিন পরে ইহার হারের পরিবর্তন করিতে হইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সম্পত্তি দানপত্র করিলে যে-কর দিতে হয় না তাহাকে বৃদ্ধি করিয়া ৫ বৎসরে লইয়া যাইতে হইবে।

(গ) আগম বা আমদানি শুল্ক (Import Duties): আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে শুল্কহার বৃদ্ধির দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা নাই। অপরদিকে বরং মোটর তৈল, কেরোসিন তৈল প্রভৃতির আমদানি হ্রাস পাওয়ায় আমদানি শুল্কের হারও হ্রাস পাইয়াছে। এই হ্রাস ঐ দুই দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক হইতে পূরণ করিতে হইবে।

(ঘ) নিগম বা রপ্তানি শুল্ক (Export Duties): রপ্তানি শুল্কের ক্ষেত্রে কিন্তু রাজস্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে—কারণ, ভারতের রপ্তানি পণ্যে পূর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্য আসিয়াছে। কমিশনের মতে, আমদানি শুল্ক ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ একই সংগে আভ্যন্তরীণ মূল্যে দৃঢ়তা আনয়নকার্যে (price stabilisation) ব্যবহৃত হইবে।

(ঙ) অন্তঃশুল্ক (Excise Duties): অন্তঃশুল্ক সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ তামাক, তুলাবস্ত্র, চিনি, দিয়াশলাই, সিগারেট, কেরোসিন, চা, পশমবস্ত্র, বৈদ্যুতিক বাতি, কাগজ প্রভৃতি নানাবিধ পণ্যের সহিত সম্পর্কিত। ইহাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর শুল্কবৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার ফলে অন্তঃশুল্ক হইতে কেন্দ্রীয় রাজস্ব শতকরা ৪০-৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

অন্তঃশুল্ক হইতে কেন্দ্রীয় রাজস্ববৃদ্ধি

(চ) বিক্রয়কর (Sales Tax): বিক্রয়কর সম্পর্কে কমিশন ব্যাপক সুপারিশ করিয়াছে। কমিশনের মতে, (১) সেবামূলক কার্যের (services) উপর বিক্রয়কর ধার্য করিলে পরিচালনাগত বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে; (২) আগাম বাজারের ক্রয়বিক্রয়ের উপর করধার্যের জন্য বিক্রয়কর অপেক্ষা স্ট্যাম্প-শুল্ক বা স্ট্যাম্প ডিউটি প্রশস্ততর পদ্ধতি; (৩) সংবাদপত্রের উপর বিক্রয়কর ধার্য করা লাভজনক হইবে না; (৪) একপর্যায়ী (single-point) বিক্রয়কর সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে; (৫) নিম্ন হারে বহুপর্যায়ী (multi-point) করধার্য করিলে হিসাবনিকাশের সুবিধা হয় বটে তবে হারের স্বল্পতার জন্য রাজ্যসমূহের মোট সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া যাইবে; (৬) ক্রয়কর (purchase tax) পরিচালনা বিশেষ দুঃসাধ্য—সুতরাং এই সূত্র হইতে বিশেষ রাজস্বসংগ্রহেরও সম্ভাবনা নাই; (৭) রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে অন্তঃশুল্ক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ও চুংগির (octroi) সমন্বয় বিক্রয়করের কোন পরিবর্ত নহে।

বিক্রয়করের সংস্কার

কমিশন এই সুপারিশ করিয়াছে যে, বিক্রয়কর অন্যতম রাজ্যকর (State Tax) হিসাবেই প্রবর্তিত থাকিবে। কিন্তু আন্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয় হইবে কেন্দ্রীয় বিষয়। আন্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয়ের উপর কেন্দ্র যে-কর ধার্য করিবে তাহার হার নিম্ন হইবে। এই সূত্র হইতে সংগৃহীত রাজস্ব পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনানুসারে রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে। এই বণ্টনকার্য প্রস্তাবিত আন্তঃরাজ্য করধার্যকরণ পরিষদের (Inter-State Taxation Council) সহিত পরামর্শ করিয়াই করা হইবে।

আন্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে সুপারিশ

(ছ) স্ট্যাম্পশুল্ক ইত্যাদি (Stamp Duties, etc.): কমিশনের মতে, আন্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে স্ট্যাম্পশুল্কের হারে সমতার প্রয়োজন নাই; বর্তমানেই ব্যাংকের চেকের উপর স্ট্যাম্পশুল্ক ধার্য করা হইবে না; কিন্তু আগাম কারবারের (forward transactions) উপর মহারাষ্ট্রের ন্যায় স্ট্যাম্পশুল্ক ধার্য করা উচিত।

(জ) ভূমি-রাজস্ব প্রভৃতি (Land Revenue and Agricultural Income Tax): কমিশনের মতে, ভূমি-রাজস্ব আর পূর্বের মত রাজস্বসংগ্রহের মূল সূত্র নহে। পূর্বের মত কৃষকের উপর ইহার ভারও অধিক নহে। ভবিষ্যৎ ভূমি-রাজস্ব ও কৃষি-আয়কর সম্বন্ধে কমিশন এই সুপারিশ করিয়াছে যে, বিভিন্ন রাজ্যের ভূমি-রাজস্ব পদ্ধতিতে কিছুটা সমতা আনয়ন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে (১) রাজস্ব-সংস্কার আঞ্চলিক ভিত্তিতে না করিয়া সামগ্রিকভাবে সকল রাজ্যের ভিত্তিতেই করিতে হইবে, (২) রাজস্ব-নির্ধারণ নির্দিষ্ট মান অনুসারে করিতে হইবে, (৩) যে-সকল অঞ্চলে এখনও জরিপ, শ্রেণীবিভাগ, বন্দোবস্ত করা হয় নাই সেই সকল অঞ্চলে অবিলম্বেই এই কার্য সমাধা করিতে হইবে, (৪) নির্দিষ্ট মান অনুসারে রাজস্ব-নির্ধারণ করার পর বিভিন্ন রাজ্যে নির্ধারিত রাজস্বের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে, (৫) প্রতি দশ বৎসর অন্তর মূল্যান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত রাজস্বের পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে, (৬) যে-যে রাজ্যে কৃষি-আয়কর এখনও প্রবর্তিত হয় নাই—সেখানে ইহা অনতিবিলম্বেই প্রবর্তিত করিতে হইবে, (৭) চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হইবে কৃষি-আয়করকে সাধারণ আয়করের অংগীভূত করিয়া একটিমাত্র আয়করের প্রবর্তন করা, (৮) কৃষিগত আয় ৩ হাজার টাকার অধিক হইলে ইহার উপর কৃষি-আয়কর ধার্য করিতে হইবে।

ভূমি-রাজস্ব ও কৃষি-আয়করের সংস্কার

কর-পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে ক্যালডোরের রিপোর্ট (Kaldor's Report on Tax Reform): ক্যালডোরের রিপোর্টের উল্লেখ ইতিমধ্যে করা হইয়াছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডোর (Nicolas Kaldor) ভারতে আসিয়াছিলেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। তাঁহার ভারতে অবস্থানকালীন সময়ে ভারতীয়

পরিসংখ্যান সংস্থা (the Indian Statistical Institute) তাঁহাকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজস্বের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কর-পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ইহার সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে অনুরোধ করে। অধ্যাপক ক্যালডোর ১৯৫৬ সালের জুন মাসে তাঁহার রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে তিনি প্রধানত ব্যক্তিগত (personal) এবং ব্যবসায় (business) কর সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন।

ক্যালডোর আলোচিত কর—ব্যক্তিগত ও ব্যবসায় কর

ক্যালডোরের রিপোর্টে প্রথমেই দেখানো হইয়াছে যে, ভারতে সংগৃহীত কর-রাজস্বের পরিমাণ অতি সামান্য। ইহা জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ মাত্র। উপরন্তু, ইহা পরিবর্তনশীল নহে—অন্যান্য দেশের ন্যায় জাতীয় আয়-বৃদ্ধির সংগে সংগে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।* সুতরাং ভারতীয় কর-পদ্ধতি উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার সহায়ক নহে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫৬-৫৭—১৯৬০-৬১) ৪৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর-রাজস্ব সংগ্রহের আশা করা হইয়াছিল। ইহার উপর প্রস্তাবিত ১২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি-ব্যয় (deficit financing) করিয়াও ৪০০ কোটি টাকার মত অভাব থাকিয়া যাইবে। অধ্যাপক ক্যালডোর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরিকল্পনাধীন ৫ বৎসরে মোট ৮০০ কোটি টাকার অধিক ঘাটতি-ব্যয় যুক্তিযুক্ত হইবে না। অর্থাৎ, ইহার অধিক ঘাটতি-ব্যয় করিলে মুদ্রাস্ফীতি আশংকাজনক রূপ ধারণ করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। অথচ দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা প্রয়োজন। ক্যালডোরের অভিমত ছিল যে, ঐ পরিকল্পনাধীন ৫ বৎসরে মোট ১২৫০ (৪৫০+৪০০+৪০০) কোটি টাকা অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন হইবে না। আংশিকভাবে ইহা প্রত্যক্ষ করসমূহের সংস্কারসাধনের দ্বারাই করা যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ করের বর্তমান ত্রুটি সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য হইল যে ইহাতে দক্ষতা বা ন্যায় (equity) কোনটাই নাই। ইহা অন্যায্য, যেহেতু বর্তমানে আয়ের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা সংকীর্ণ ও কর-প্রবঞ্চনা-কারীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। ইহা দক্ষতাবিহীন, যেহেতু পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য কর-প্রবঞ্চনা বিশেষ সহজসাধ্য কার্য।

কর-ব্যবস্থার ত্রুটি ও সংস্কারের প্রস্তাব

সুতরাং প্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধে ক্যালডোরের প্রস্তাব হইল যে, ইহার ভিত্তিকে প্রশস্ততর করিতে হইবে। ভিত্তিকে প্রশস্ততর করিবার মাধ্যম হইল—(১) সম্পদের উপর বার্ষিক করধার্য (annual tax on wealth) করা; (২) মূলধন-লাভকে (capital gains) করভুক্ত করা; (৩) দানপত্রের উপর সাধারণ করধার্য (a general

ক। ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ করের সংস্কার

---

* ২১১ পৃষ্ঠা দেখ।

gift tax) করা ; এবং (৪) ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর করধার্য (a personal expenditure tax) করা।

এই সকল কর প্রবর্তিত হইলে আয়কর, মূলধন-লাভ কর, বার্ষিক সম্পদকর, দানপত্রের উপর সাধারণ কর এবং ব্যক্তিগত আয়কর—এই পাঁচটি প্রত্যক্ষ করের জরিপ একই সংগে করা হইবে, এবং করদাতৃগণকে ইহাদের সম্পর্কে খবরাখবর একই রিটার্ণভুক্ত করিয়া দিতে হইবে। ফলে কর-প্রবঞ্চনা কঠিন হইয়া পড়িবে।

আয়করের সর্বাধিক হার

ক্যালডোরের মতে, আয়করের সর্বাধিক হার শতকরা ৪৫ ভাগের অধিক হওয়া উচিত নহে। বর্তমানে যে সর্বাধিক হার ৯২ তাহা উদ্যোগ ব্যাহত করে এবং কর-প্রবঞ্চনা করিতে উৎসাহিত করে। সুতরাং, আয়করের সর্বাধিক হার যদি ৪৫-এ নামাইয়া আনা হয় এবং উপরি-উক্ত করগুলি ধার্য করা হয় তবে কর-রাজস্ব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু উদ্যোগ ব্যাহত হইবে না বা কর-প্রবঞ্চনা সহজসাধ্য হইবে না।

বাৎসরিক সম্পদকর, ব্যয়কর ও দানের উপর কর বিত্তশালী ব্যক্তিদের উপরই ধার্য করা হইবে। তবে ইহাদের হার যেন অধিক না হয়। সম্পদকরের সর্বাধিক হার হইবে শতকরা ১·৫ ভাগ, ব্যক্তিগত ব্যয়করের সর্বাধিক হার শতকরা ৩০০ ভাগ এবং দানের উপর করের সর্বাধিক হার হইবে শতকরা ৮০ ভাগ।

খ। ব্যবসায়ের উপর করের সংস্কার

ব্যবসায়ের উপর কর সম্বন্ধে ক্যালডোরের প্রধান সুপারিশটি হইল : বর্তমানে যে মূলধন-ব্যয়ের (capital expenditure) জন্য নানারূপ রেয়াৎ দেওয়া হয়—যথা, স্বাভাবিক অপচয় (normal depreciation), অতিরিক্ত অপচয় (additional depreciation), উন্নয়ন রেয়াৎ (development rebate) প্রভৃতি—তাহার পরিবর্তে মূলধন-ব্যয়ের অনুপাতে একটিমাত্র রেয়াৎ দিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর বর্তমানে যে নানারূপ করধার্য করা হয় তাহার পরিবর্তে টাকায় ৭ আনা বা মোটামুটি ৪৫% হারে প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের উপর একটিমাত্র কর ধার্য করিতে হইবে। অংশীদারদের ডিভিডেণ্ডের উপরও ঐ একই হারে কর ধার্য করা প্রয়োজন। এই কর ডিভিডেণ্ডপ্রাপ্ত অংশীদারদের খাতে জমা করা হইবে—অর্থাৎ, তাহার মোট কর হইতে বাদ যাইবে।

ব্যবসায়-আয়করের প্রবঞ্চনার প্রতিবিধান

ব্যবসায়-আয়করের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্যালডোরের নির্দেশমত প্রতিবিধান হইল বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়ের হিসাব পরীক্ষা করানো এবং পরিচালনাগত অন্যান্য উন্নয়নসাধন করা—কর-প্রবঞ্চনার শাস্তি কঠিনতর করা, আয়কর পরিচালকদের মাহিনা বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি কার্যকর করা হইলে একমাত্র প্রত্যক্ষ কর হইতে বৎসরে ১২৫ কোটি টাকা করিয়া আগামী ৫ বৎসরে ৬২৫ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহ করা মোটেই অসম্ভব হইবে না—ইহাই ছিল অধ্যাপক ক্যালডোরের অভিমত। বাকী ৬২৫ কোটি টাকা (প্রয়োজনীয় ১২৫০ কোটি টাকার কর-রাজস্বের অর্ধেক) কিভাবে সংগ্রহ করা হইবে সে-সম্বন্ধে ক্যালডোর সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলেন নাই। তবে ইংগিত দিয়াছিলেন যে, ঐ টাকা পরোক্ষ কর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

সংস্কারের অনুমিত ফল

সুপারিশ কার্যকরকরণ (Implementation of the Recommendations): মোটামুটিভাবে দেখা যায়, কর তদন্তকারী কমিশন ও অধ্যাপক ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে বর্তমানে ভারতীয় কর-পদ্ধতির সংস্কারকার্য চলিতেছে। তবে অধিকাংশ সুপারিশই এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। যে-যে প্রধান প্রধান সুপারিশকে কার্যকর করা হইয়াছে বা হইতেছে তাহার তালিকা নিম্নলিখিতভাবেই দেওয়া যাইতে পারে।

(ক) কর তদন্তকারী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আয়করের হারের গঠনে পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে—যথা, কর অব্যাহতির সীমা ৪২০০ টাকা হইতে কমাইয়া ৩০০০ টাকায় লইয়া আসা হইয়াছে। পরিবারের জন্য রেয়াৎ দেওয়ার পদ্ধতি (system of family allowance) প্রবর্তন করা হইয়াছে। অর্জিত আয়ের রেয়াৎ সম্বন্ধে পরিবর্তন করা হইয়াছে, ইত্যাদি। (খ) আমদানি শুল্কবৃদ্ধির দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অন্তঃশুল্কের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তবে আমদানি শুল্ককেও বাদ দেওয়া হয় নাই। ফলে ভারতের কর-ব্যবস্থা মধ্যে গতিশীলতার দিকে ঝুঁকিলেও আবার অধোগতিশীল হইতে চলিয়াছে।* (গ) বিক্রয়কর ও ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত সুপারিশগুলিকে অনেকটা কার্যকর করা হইয়াছে। (ঘ) কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর ধার্য করিয়া এবং বস্ত্র, চিনি, তামাক ও সিল্ক বস্ত্রের বেলায় অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক দ্বারা বিক্রয়করের অনেকটা সংস্কারসাধন করা হইয়াছে।

কর তদন্তকারী কমিশনের সুপারিশ কার্যকরকরণ

ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে মূলধন-লাভকর, ব্যয়কর ও সাধারণ দানকর ধার্য করা হইয়াছে এবং আয়করের সর্বোচ্চ হার কিছুটা কমাইয়া বর্তমানে শতকরা ৭২·৫ ভাগে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অবশ্য ক্যালডোরের সুপারিশ ছিল সর্বাধিক হার টাকায় ৭ আনায় লইয়া যাওয়া। অপরদিকে আবার ব্যয়কর ধার্য করা হইলেও বর্তমানে উহার বিলোপসাধন করা হইয়াছে।

ক্যালডোরের সুপারিশ কার্যকরকরণ

* Budget of the Government of India for 1961-62

উপসংহারে বলা যায়, সরকার কর অনুসন্ধানকারী কমিশন ও ক্যালডোরের সুপারিশ মূলত গ্রহণ করিলেও বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহাদিগকে সামগ্রিকভাবে কার্যকর করিতে পারিতেছে না। পরিকল্পনা কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে করসংস্কার কার্য আরও দ্রুত অগ্রসর হইলে রাজস্বহ্রাসের ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। প্রধানত এইজন্যই সম্যক সংস্কারসাধন সম্ভব হয় নাই।

উপসংহার

এই প্রসংগে আলোচনা করা প্রয়োজন যে কর-পদ্ধতির সংস্কারসাধন দ্বারা কি পরিমাণ কর-রাজস্বের বৃদ্ধি করা সম্ভব। ক্যালডোরের মতে, কর-পদ্ধতির কাম্য সংস্কারসাধন দ্বারা বৎসরে ২৫০ কোটি টাকা করিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব। ইহা সত্য যে ক্যালডোরের সুপারিশসমূহ পুরাপুরি কার্যকর করা হয় নাই, তবুও উক্ত সংগ্রহবৃদ্ধির লক্ষ্য অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে অতিরিক্ত কর হইতে ২৭৭ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে অবশ্য পাওয়া যায় ১০৪১ কোটি টাকা। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অংশ ছিল অতি সামান্য, এবং অপ্রত্যক্ষ করের অংশই অধিক। পরোক্ষ করের অংশ যে কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ধারণা করা যায় মোট কেন্দ্রীয় কর-রাজস্বের সহিত প্রধান প্রত্যক্ষ কর আয়করের তুলনা করিলে। প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে মোট কেন্দ্রীয় রাজস্বের ক্ষেত্রে আয়-করের অংশ ছিল শতকরা ৩১ ভাগ; দশ বৎসর পরে বা তৃতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাতে উহা শতকরা ২২ ভাগে নামিয়া আসে। তবুও বিভিন্ন মহল হইতে প্রত্যক্ষ করের আধিক্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছে। বলা হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণবৃদ্ধির (অনুপাত নহে) ফলে আমাদের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় বেসরকারী উদ্যোগ ব্যাহত হইয়া উন্নয়নের গতি শ্লথ করিয়া তুলিতেছে। অপর-দিকে পরোক্ষ করের ভারাধিক্যের বিরুদ্ধে একরূপ আন্দোলনই সুরু হইয়াছে বলা চলে। তবুও অতিরিক্ত কর-রাজস্বের জন্য সরকার পরোক্ষ করের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। এই প্রসংগে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলিয়াছেন, পরিকল্পিত উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কর-সংগ্রহের ভিত্তিকে প্রশস্ততর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই কারণে প্রত্যক্ষ কর হইতে যথাসম্ভব রাজস্বসংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৬০-৬১ সাল হইতে অতিরিক্ত কর-রাজস্বের অধিকাংশই সংগৃহীত হইতেছে পরোক্ষ কর হইতে।

আর কতটা কর-রাজস্বের বৃদ্ধিসাধন সম্ভব

প্রত্যক্ষ করভার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

এইভাবে পরিকল্পনার ব্যয়নির্বাহের জন্য পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ আর কতদূর বাড়ানো যাইতে পারে তাহা বিবেচ্য, এবং এই নির্ভর-শীলতা কতদূর সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক ন্যায়ের দ্যোতক

তাহাও বিশ্লেষণযোগ্য। অতএব, তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করভার বৃদ্ধি করিয়া কর-রাজস্বের পরিমাণবৃদ্ধির সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অভিমত প্রদান করা কঠিন। তবে পরিচালনাগত ত্রুটি দূর করিয়া কর-রাজস্বের বেশ কিছুটা বৃদ্ধিসাধন সম্ভব। ভারতে লোক শুধু প্রত্যক্ষ করই ফাঁকি দেয় না, পরোক্ষ করও ফাঁকি দেয়। উপরন্তু, করপ্রদান ও হিসাব দাখিলের জটিলতার জন্যও ঠিকমত কর সংগৃহীত হয় না। এই দিক দিয়া কর-পরিচালনা অনুসন্ধানকারী কমিটির (Tax Administration Enquiry Committee) সুপারিশসমূহ বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

পরোক্ষ করভার বৃদ্ধি সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা

তবে পরিচালনাগত উন্নয়ন দ্বারা কর-রাজস্বের বৃদ্ধি সম্ভব

প্রশ্নোত্তর

1. Critically examine the present system of allocation of tax resources between the Centre and the States in India.

(C. U. B. Com. 1962 ; C. U. B. Com. (P.I) 1962 ; B. U. (O) 1961, '62)

[ইংগিত : সমালোচনা প্রধানত পশ্চিমবংগ রাজ্যের দৃষ্টিভংগি হইতেই করা যাইতে পারে। (১৬৭-১৭০ এবং ১৭৬-১৭৯ পৃষ্ঠা)]

2. Indicate the scope and importance of the Indian Income Tax.

(C. U. B. Com. 1956 ; B. A. 1949) (১৮২-১৮৫ পৃষ্ঠা)

3. Discuss in the light of incidence and effects the justifiability or otherwise of the Union Excise Duties. Examine their role in the Indian Tax System.

(১৮৫-১৮৭ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the main features of the Estate Duty levied in India.

(C. U. B. Com. 1958, '54 ; B. A. 1952, '58, '54) (২০২-২০৩ পৃষ্ঠা)

5. Examine critically Kaldor's proposals for tax reform in the context of the needs of India's developing economy. (C. U. B. A. 1962) (২১৮-২২১ পৃষ্ঠা)

6. Examine the case for and against the imposition of the Expenditure Tax and Wealth Tax in India. Discuss the main features of the two taxes.

(C. U. B. Com. 1958, '61 ; B. A. 1959, '61) (১৯০-১৯৫ এবং ২১৯-২২০ পৃষ্ঠা)

7. State the case for and against the introduction of the. Capital Gains Tax in India. (C. U. B. A. 1961 ; B. Com. (P. I) 1968) (১৮৮-১৯০ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the merits and demerits of the Sales Tax and indicate their importance in the revenue of the States. Indicate the reforms that have been made in respect of this tax. (২০৫-২০৭ এবং ২১৭-২১৮ পৃষ্ঠা)

9. Give a short description of India's tax structure. Do you think that it is still possible to increase substantially the tax revenue of the Government? How? (C. U. B. Com. 1960) (১৮২, ২০০ এবং ২২২-২২৩ পৃষ্ঠা)

10. "In a developing economy, taxation is one of the main instruments of economic policy." Justify this with reference to the Indian context.

(C. U. B. Com. 1968) (২১১-২১৩ পৃষ্ঠা)

11. "The Indian Tax System is regressive." Examine the statement.

(C. U. B. Com. 1957) (২১১-২১২ পৃষ্ঠা)

12. Write a short note on Public Debts in India and give reasons for their increase since Independence. (C. U. B. Com (P. I) 1968) (২০৯-২১১ পৃষ্ঠা)

অষ্টম অধ্যায়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

(Economic Planning)

পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায়? (What is Planning ?) : নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সম্পদকে সংগঠিত করাকেই সাধারণভাবে পরিকল্পনা আখ্যা প্রদান করা যায়।* সংক্ষেপে অন্যভাবে বলা যায় যে উদ্দেশ্যমূলক যে-কোন কার্যই হইল পরিকল্পনা।

উদ্দেশ্যমূলক যে-কোন কার্যেই সাধারণত পরিকল্পনা বলা হয়

পরিকল্পনার এই ব্যাখ্যা অতি ব্যাপক, কারণ এই অর্থে যে-কোন ব্যবসায়ী এমনকি যে-কোন ব্যক্তি পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও জমি, শ্রম, মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদ নির্দিষ্ট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থাতেও পরিকল্পনা রহিয়াছে। অবশ্য এই পরিকল্পনা বাজারের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাজারে দ্রব্যমূল্য স্থির করিয়া দেয় কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপাদকেরা উৎপাদন করিবে। আবার বাজারের মাধ্যমেই সঞ্চয়ের বিনিয়োগ, শ্রমের নিয়োগ, উৎপাদনযন্ত্রের সংগঠন প্রভৃতি কার্যাদি সম্পাদিত হয়। কিন্তু বর্তমানে পরিকল্পনা কথাটির দ্বারা উৎপাদনের উপকরণের অধিকতর নির্দিষ্ট ও ইচ্ছাকৃত সংগঠনকে বুঝায়। সামগ্রিকভাবে দেশে কি কি করা হইবে এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে তাহার লক্ষ্য স্থির করা হয়। এই সকল লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য রাষ্ট্র শ্রম মূলধন ও অন্যান্য সম্পদের নিয়োগ এবং অর্থ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণও পরিচালনা করে। এই অর্থে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে দেশের সম্পদের যথোপযুক্ত নিয়োগ-পদ্ধতিকে পরিকল্পনা বলা হয়। স্বতই এইরূপ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় শৃংখলা আনয়ন এবং উহার দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণসাধন করা।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণই হইল পরিকল্পনা

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Economic Planning) : জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করাই সরকারের প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বর্তমানে অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে ঝুঁকিয়াছে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের এই পরিকল্পনা-প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

* "Planning in general may be sufficiently defined as any attempt to organise resources for the attainment of a chosen end or ends : it is, in other words, purposeful action." Sir Theodore Gregory, India on the eve of the Third Five Year Plan

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি আকর্ষণের মূলে আছে অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতা। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থা স্বাতন্ত্র্যবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা নামেও অভিহিত। অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ দেখিয়াছে যে এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশকে কর্মহীন অবস্থায় জীবনযাপন করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, আর্থিক সম্পদ কয়েকজনের হস্তে পুঞ্জীভূত হওয়ায় সমাজে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

পরিকল্পনার প্রতি আকর্ষণের কারণ—অপরিকল্পিত ব্যবস্থার ত্রুটি

তৃতীয়ত, পরিকল্পনা না থাকায় অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেমন, শিল্পক্ষেত্রে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প, এবং ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের মধ্যে এক অংগাংগি সম্পর্ক রহিয়াছে। ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের (consumers) ক্রয়শক্তির (ক্রয়শক্তি তাহাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল) উপর নির্ভর করে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রসার। আবার মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রসার নির্ভর করে সকল প্রকার শিল্পে নূতন মূলধন বিনিয়োগের হার ও পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের উপর। অতএব, আর্থিক কাজকর্ম অবিচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সম্পর্ক সুনিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। ধনতন্ত্রে এইরূপ নিয়ন্ত্রণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। একমাত্র বাজারের মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চতুর্থত, ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফার অংশ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে মজুরির হার স্বল্প করিয়া রাখায় জনসাধারণের ক্রয়শক্তি হ্রাস পায়। ইহার ফলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কম এবং ঐ প্রকার শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়। আবার ভোগ্যদ্রব্যশিল্পে মন্দা দেখা দিলে মূলধন বিনিয়োগের গতি শ্লথ হয় এবং মূলধন উৎপাদনকারী শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। প্রধানত এই কারণে তথাকথিত অত্যুৎপাদন, মন্দাবাজার, ব্যাপক কর্মহীনতা, দুঃখদুর্দশা প্রভৃতির উদ্ভব হয়। মোটকথা, ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় দারিদ্র্য, আর্থিক বৈষম্য, বেকার-সমস্যা, সম্পদের অপচয় প্রভৃতি হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধিই পায়।

এইরূপ অকাম্য অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিহার করিবার দাবির ফলেই উদ্ভব হইয়াছে পরিকল্পনা-প্রবণতার। বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার, সোবিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পনার সাফল্য প্রভৃতি ইহাতে বিশেষভাবে প্রেরণা যোগাইয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রকারভেদ (variation) দেখা যায়। কাম্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, জাতীয় আয়ের কাম্য বণ্টন, অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি সকলই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইলেও সকল ক্ষেত্রে ইহাদের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। যে-দেশ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল সংরক্ষণ। অর্থাৎ, কিভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা যায় তাহাই ইহার প্রধান সমস্যা। অপরদিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রধান

পরিকল্পনার প্রকারভেদ :

লক্ষ্য হইল উন্নয়ন—জাতীয় আয় বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। অনুরূপভাবে, যেখানে আর্থিক বৈষম্য অতি প্রকট সেখানে ইহার হ্রাসই অর্থ-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যাহা হউক বলা যায় যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মোটামুটি দুই প্রকারের—(ক) সংরক্ষণ পরিকল্পনা (maintenance planning), এবং (খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা (development planning); কারণ এই দুই প্রাথমিক উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়। স্বল্পোন্নত দেশ ভারতের পরিকল্পনা যে উন্নয়নমূলক তাহা সহজেই অনুমেয়।

সংরক্ষণ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

পরিকল্পনার আবার পরিমাণভেদও (degrees of planning) থাকে। কোন কোন দেশে সকল ক্ষেত্রে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর হইতে ব্যক্তিগত মালিকানা অপসারিত করিয়া সামাজিক বা সমবায়িক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থনৈতিক জীবনকে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাধীন করা হয়। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয়সাধন করা হয় যাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারলাভ করিয়া সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করিতে পারে। এইরূপ পরিকল্পনাকে আমরা পূর্ণাংগ পরিকল্পনা বলিতে পারি। সোবিয়েত ইউনিয়ন পূর্ণাংগ পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আবার কতকগুলি দেশ আছে যেখানে পরিকল্পনা পূর্ণাংগ নয়; সেখানে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণভাবে লোপ করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন রাষ্ট্র বা করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়, আর বাকিটা বেসরকারী উদ্যোগাধীন করা হয়। অবশ্য বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে অল্পবিস্তর রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও ব্যক্তিগত মূলধন-মালিকানা পাশাপাশি অবস্থান করে। ভারতীয় পরিকল্পনা এই শেষোক্ত ধরনের।

পরিকল্পনার পরিমাণ-ভেদ :

পূর্ণাংগ পরিকল্পনা

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা

উন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ (Nature of Development Planning) : দেখা গিয়াছে, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনা সকল সময়ই উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ করে। এই সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এরূপ কয়েকটি অন্তরায় রহিয়াছে যাহা সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত দূরীভূত হইতে পারে না। উন্নত দেশসমূহে দেখা যায় যে সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীতও জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিশ্চল অবস্থায় থাকিতে অথবা ক্রমাবনতির পথে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।* ইহার কারণ,

ভারতের ন্যায় দেশের পরিকল্পনা উন্নয়ন পরিকল্পনা

---

* Lewis, *Principles of Economic Planning*

স্বল্পোন্নত দেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনসাধারণের কাছে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিশেষ মুনাফা করিতে পারা যায় না বলিয়া শিল্পপতিগণ শিল্পবাণিজ্য প্রসারে আগ্রহান্বিত হয় না।* এ-অবস্থায় স্বতই প্রগতিশীল সরকারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হইতে হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে অনুন্নত ও গতিহীন অবস্থা হইতে অর্থনৈতিক প্রসার ও উন্নয়নের পথে পরিচালিত করিতে হয়। এই অর্থনৈতিক প্রসারের সূচক হইল উৎপাদন বা আয়ের নিয়মিত বৃদ্ধি। অধ্যাপক রস্তোর ভাষায় অর্থনৈতিক প্রসার বলিতে একদিকে মূলধন ও শ্রমের বৃদ্ধির হার এবং অপরদিকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের মধ্যে এমন সম্পর্ককে বুঝায় যেখানে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।** তবে এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক দেশে পরিকল্পনার পক্ষে উচ্চ হারে অর্থনৈতিক প্রসার করাই যথেষ্ট নয়, যাহাতে জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হয় তাহার দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়।

পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক প্রসার

এ-কথা ঠিক যে জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ব্যতীত জনসাধারণের কল্যাণ-সাধন সম্ভব নয়; কিন্তু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইলেই যে কল্যাণ সাধিত হইবে এ-কথা বলা যায় না। যেমন, দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইলেও বণ্টন-ব্যবস্থা এমন হইতে পারে যে ধনীদের হাতে জাতীয় আয়ের অধিকাংশ চলিয়া যায়। সুতরাং যাহাতে কল্যাণ সাধিত হয় তাহার দিকেও কতকটা নজর রাখিতে হয়। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক প্রসারের গতি ও কল্যাণের মধ্যে কতকটা সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়।

অর্থনৈতিক প্রসার ও জনকল্যাণ

এখন আবার ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশকে স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক প্রসার ও উন্নয়নের পথে পরিচালিত করিতে হইলে স্বল্প সময়ের মধ্যে উহার অর্থনৈতিক কাঠামোকে অনুন্নত অবস্থা হইতে এমনভাবে রূপান্তর করা প্রয়োজন যে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বয়ং-নিভরশীল (self-reliant) এবং অর্থনৈতিক প্রসার স্বয়ং-পরিচালিত (self-sustained growth) হইয়া দাঁড়ায়। যে-সময় অর্থনৈতিক কাঠামো এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যে অর্থনৈতিক প্রসার স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায় সেই অন্তর্বর্তী সময় বা সংকটকালকে অধ্যাপক রস্তোর ভাষায় উত্তোলন পর্যায় (take-off stage) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই অন্তর্বর্তী সময়ে বিনিয়োগের হার এমন-ভাবে বৃদ্ধি পায় যে মাথাপিছু প্রকৃত আয় (real output per capita) বৃদ্ধি পায় এবং এই বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-পদ্ধতিতে এমন আমূল পরিবর্তন আসে ও আয় এমনভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে যে নূতন বিনিয়োগের স্তর ও মাথাপিছু উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান গতি অব্যাহত থাকে।† তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে উত্তোলন

স্বয়ং-পরিচালিত অর্থনৈতিক প্রসার

* Nurkse, *Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries*

** W. W. Rostow, *The Process of Economic Growth*

† "The take-off is defined as the interval during which the rate of invest-

পর্যায়ের পথ ধরিয়াই স্বল্পোন্নত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা স্বয়ং-পরিচালিত প্রসারের পর্যায়ে গিয়া পৌছায়। এ-পর্যায়ে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার পর্যাপ্ত হয় এবং উহা এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে জাতীয় আয় ক্রমবর্ধমান হইতে থাকে এবং জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হারকে ছাড়াইয়া যায়।*

এখন অনুন্নত অর্থ-ব্যবস্থাকে স্বয়ং-পরিচালিত, স্বয়ং-নির্ভরশীল ও গতিশীল অবস্থায় উত্তোলন করিতে হইলে বিভিন্ন বিষয়ের দিকে নজর দিতে হইবে। স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া থাকে কৃষি-ব্যবস্থা। কৃষিই এই সকল দেশের প্রধান উপজীবিকা; কিন্তু কৃষিই সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ। সুতরাং কৃষিগত সমস্যার সমাধান ব্যতীত কৃষির উপর নির্ভরশীল স্বল্পোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের চিন্তা করা যায় না। এই কার্য যে সরকারকেই করিতে হইবে তাহাও অন্যতম স্বীকৃত নীতি। কিন্তু একমাত্র কৃষির সুসংগঠনের দ্বারাই উন্নয়নের পথ নির্মাণ করা যায় না।

১। স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনায় প্রথমেই কৃষিকে সুসংগঠিত করিতে হইবে

বৃহদায়তনে যান্ত্রিক কৃষিকার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হইলে বহুসংখ্যক কৃষক কর্মহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই এই নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব। অতএব, কৃষির সুসংগঠনের সংগে সংগে শিল্পোন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

২। তারপর প্রয়োজন শিল্পোন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া

অন্যান্য কারণেও শিল্পোন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে। প্রথমত, একমাত্র কৃষির উন্নয়নের দ্বারা জাতীয় আয় পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়ানো যায় না। দ্বিতীয়ত, কৃষিকার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিশেষভাবে কার্যকর বলিয়া ইহার উপর অধিক পরিমাণে নিভর করা যায় না। তৃতীয়ত, কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশের বহির্বাণিজ্য ঔপনিবেশিক ধরনেরই হয়।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল মূলধন-গঠনের সমস্যা। গতিশীল অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জাতীয় আয়কে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না যদি-না পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করা না যায়। অন্যভাবে বলা যায়, জাতীয় আয়ের একটা অংশ যদি সঞ্চয় করা না হয় তাহা হইলে অর্থ নৈতিক প্রসার সম্ভব হয় না। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক যে, দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির বাৎসরিক হার হইল শতকরা

মূলধন-গঠন

ment increases in such a way that real output *per capita* rises and this initial increase carries with it radical changes in production techniques and disposition of income flows which perpetuate the new scale of investment and perpetuate thereby the rising trend in *per capita* output." Rostow

* "Self-sustained development refers to a situation in which the rate of domestic savings and investment is sufficient, and so utilised, as to induce a cumulative increase in national income, exceeding the rate of population growth." Dr. Vera Anstey

২ ভাগ। এ-অবস্থায় বর্তমান জীবনযাত্রার মানও যদি কোন রকমে বজায় রাখিতে হয় তাহা হইলে ঐ দেশের জাতীয় আয়কেও শতকরা ২ ভাগ করিয়া প্রতি বৎসর বৃদ্ধি করিতে হইবে ; অন্যথায় বর্তমান ভোগও সম্ভব হইবে না। এখন যদি আমরা চাই যে মাথাপিছু আয়কে ৩ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি করা হউক তাহা হইলে জাতীয় আয়কে শতকরা ৫ ভাগ করিয়া প্রতি বৎসর বাড়াইতে হইবে। জাতীয় আয়ের এই বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না যদি-না মূলধন বিনিয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে হয়। যদি ধরা হয় যে ১ একক জাতীয় আয় বাড়াইবার জন্য ৩ একক মূলধন বাড়ানো প্রয়োজন তাহা হইলে মূলধন ও উৎপন্নের অনুপাত (capital-output ratio) হইল ৩ : ১। এ-অবস্থায় জাতীয় আয়কে শতকরা ৫ ভাগ করিয়া প্রতি বৎসর বাড়াইতে হইলে নীট বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উচ্চ হারে বিনিয়োগ ব্যতীত অর্থনৈতিক প্রসারকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হইল, উচ্চ হারে বিনিয়োগ বা মূলধন-গঠনের উপায় কি ? মূলধন-গঠনকে বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশের প্রকৃত সঞ্চয়কেও বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত স্বয়ং-পরিচালিত অর্থনৈতিক প্রসারের (self-sustained growth) প্রধান সর্ত হইল যে মূলধন-গঠনের প্রয়োজন প্রধানত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়বৃদ্ধির সাহায্যে মিটাইতে হইবে। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের সূত্র হইল স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়, সরকারী সঞ্চয় ও মুদ্রাস্ফীতি। এই সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াও দেখা যায় যে স্বল্পোন্নত দেশে মূলধন-গঠনের প্রয়োজন মিটানো সম্ভব নয় ; বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যের উপর কতকাংশে নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রসারের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্পোন্নত দেশকে বৈদেশিক সঞ্চয়ের সাহায্য লইতে হয়। তাহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় পর্যাপ্ত হইলেও মূলধন-দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আনিবার জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু স্বয়ং-নির্ভরশীল সম্প্রসারণ বা প্রসার নিশ্চিত করিতে হইলে শেষ পর্যন্ত মূলধন, কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির সরবরাহের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতাকে দূর করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে।

আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের সাহায্যে মূলধন-গঠন

কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আবার সুদৃঢ় মুদ্রা-ব্যবস্থা, ন্যায্য কর-পদ্ধতি এবং জনকল্যাণকর আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন। এগুলির জন্য সরকারকে শক্তিশালীও হইতে হইবে। সরকার শক্তিশালী না হইলে জমিদারী প্রথার বিলোপ, শিল্পবাণিজ্যকে প্রয়োজনমত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন, গতিশীল কর-ব্যবস্থা (progressive tax system) প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে না। ফলে পরিকল্পনাও ব্যাহত হইবে।

৩। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়

অবশ্য স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পোন্নয়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধক রহিয়াছে—যথা, মূলধন ও শিল্পদক্ষতার অভাব, পরিবহণের অব্যবস্থা, মূল শিল্পের অ-প্রাচুর্য, জনসাধারণের স্বল্প ক্রয়শক্তি ইত্যাদি। এগুলিকে দূর করিয়াই শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

শিল্পোন্নয়নের প্রতিবন্ধক

পরিশেষে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে না পারিলে উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না।

উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান (Factors of Development Planning): উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি চারি প্রকার উপাদান বা ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য: (ক) কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য কৃষির সুসংগঠন, (খ) সুষম শিল্পোন্নয়ন (balanced industrial development), (গ) পরিবহণ শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ, এবং (ঘ) সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি।

চারিটি উপাদান

(ক) কৃষির সুসংগঠন: কৃষির সুসংগঠনের জন্য সরকারকে যে-যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে রাষ্ট্র ও কৃষি অধ্যায়ে সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।* সুতরাং এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(খ) সুষম শিল্পোন্নয়ন: স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নব্রতী সরকারকে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উহাকে দেখিতে হইবে যে—(ক) ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প এবং বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্প-ব্যবস্থা যেন পরস্পরের সহিত সংগতিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে, এবং (খ) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প-ব্যবস্থাতেও যেন সামঞ্জস্য থাকে।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য উহাদিগকে বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পগুলির প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইতে হইবে, কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া এবং মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নয়নসাধন করিতে হইবে, বিক্রয়বাজারের প্রসার করিতে হইবে।

উন্নয়নমূলক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে মূল শিল্পসমূহ গঠন করিতে হইবে। খনিজ শিল্পের বেলাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। যে-শিল্প বেসরকারী মালিকানায় ঠিকমত গঠিত হয় না তাহাদের স্থাপনের দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে।** প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নবগঠিত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে এবং শিল্পগত পরিচালনার উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

(গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ: উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যকে 'সামাজিক মূলধন' (social capital) বলিয়া অভিহিত করা হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন-গঠন ব্যতিরেকে যেমন উৎপাদন-ব্যবস্থার কাম্য

সামাজিক মূলধন

* প্রথম খণ্ডের ২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

** পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবশ্য বেসরকারী মালিকানা বলিয়া কিছু থাকে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সরকারকে সকল প্রকার শিল্প-গঠনেরই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না, তেমনি সামাজিক মূলধনের সম্প্রসারণ ছাড়াও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর হয় না।

এই সামাজিক মূলধনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাসস্থান-ব্যবস্থা, মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা ইত্যাদি। সুতরাং উন্নয়নব্রতী সরকারকে কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের আনুষংগিক উপাদান হিসাবেই এগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে।

(ঘ) সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি: সামাজিক উৎসাহ সামাজিক মূলধনের একাংশ মাত্র। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইহার গুরুত্বের জন্য ইহাকে পৃথক করিয়া দেখানো হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে সামাজিক উৎসাহ সৃষ্ট না হইলে উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। ইহার জন্য প্রয়োজন সম্প্রসারণ সেবার (extension service)। সম্প্রসারণ সেবার দ্বারা গ্রাম ও নগরাঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হইবে—উন্নয়ন পরিকল্পনা যে সকলেরই জন্য ব্যাপক প্রচারকার্যের দ্বারা এই ধারণা জনসাধারণের মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে।

সম্প্রসারণ সেবা

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা। স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অত্যধিক, উন্নয়নকার্যের ফলে প্রথম প্রথম এই হার আরও বৃদ্ধি পায়।* সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করিলে উন্নয়ন পরিকল্পনার ফল জীবনযাত্রার মানে প্রতিফলিত হইবে না—যাহা কিছু অতিরিক্ত উৎপন্ন হইবে তাহা অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভোগে নিয়োগ করিতে হইবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Planning in India):

ভারত অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ। সুতরাং ভারতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু, ধ্বংসাত্মক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এবং দেশবিভাগের আঘাত ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনকে পংগু করিয়া ফেলে। এ-অবস্থা হইতেও মুক্তির পথ যে উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই।

ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

বহুদিন হইতেই ভারতে পরিকল্পনার জল্পনাকল্পনা চলিয়া আসিতেছিল। ১৯৩৪ সালে স্যর এম. বিশ্বেশ্বরায়া 'ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতি'** নামক এক পুস্তকে পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। ইহার পর ১৯৩৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার জন্য শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' গঠন করেন। যুদ্ধের ফলে কমিটির কার্য বিশেষ অগ্রসর

পরিকল্পনার জল্পনাকল্পনা:

* প্রথম খণ্ডের ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

** Planned Economy for India

হয় না। তবে কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কে. টি. শাহ্-এর সম্পাদনায় কতকগুলি মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৪১ সালে ভারত সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে। পরে এই কমিটির স্থান অধিকার করে পুনর্গঠন কমিটি (Reconstruction Committee)। ১৯৪৪ সালে স্যর আর্দেশীর দালালের পরিচালনায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ (Planning and Development Department) গঠন করা হয়। প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যগুলির সরকারকে পরিকল্পনা বিভাগ গঠন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রাদেশিক সরকারগুলি যে-সকল পরিকল্পনা রচনা করে তাহা কতকগুলি জনহিতকর ও সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যের (Public Works and Social Service) ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অপরদিকে ভারত সরকার কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট তৈয়ারি করে এবং শিল্পপ্রসারের পরিকল্পনার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের লইয়া ৩১টি প্যানেল (Panels) গঠন করে। পুনর্গঠনের এই সমস্ত পরিকল্পনা যেমন ছিল আংশিক তেমনি ছিল সমন্বয়বিহীন। মূল সমস্যার সমাধানের সন্ধান ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। বেসরকারী তরফ হইতেও একাধিক পরিকল্পনা পেশ করা হয়। বৃহৎ শিল্পপতিগণের পক্ষ হইতে ১০,০০০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা রচনা করা হয়। ইহা 'বোম্বাই পরিকল্পনা' (Bombay Plan) নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনায় ১৫ বৎসরের মধ্যে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব করা হয় এবং শিল্পপ্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পনার রচয়িতৃগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রশস্ত রাখিবার পরামর্শ দেন। বিশিষ্ট অর্থবিদ্যাবিদ হ্যারিশ (Harris) এই পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ইহা 'অর্থনৈতিক গণিতের মারপ্যাচ ভিন্ন কিছুই নয়।' ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশন স্বর্গত এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে 'গণ পরিকল্পনা' (People's Plan) নামে অভিহিত দশ বৎসরের জন্য ১৫,০০০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা পেশ করে। এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের খাদ্য বস্ত্র আশ্রয় স্বাস্থ্য ও শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করা। উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ও রাষ্ট্রকে প্রকৃতভাবে লোকায়ত্ত করিবার প্রস্তাব করা হয়।

বোম্বাই পরিকল্পনা

গণ পরিকল্পনা

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি পরিকল্পনা হইল শ্রী এম. এন. আগরওয়ালের 'গান্ধীবাদী পরিকল্পনা' (Gandhian Plan)। পরিকল্পনায় ৩৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়। 'সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা' (plain living and high thinking) এই আদর্শ গান্ধীবাদী পরিকল্পনার মূল সুর। পরিকল্পনায় বিকেন্দ্রিকরণ নীতির ভিত্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করা হয় ; এবং শিল্পক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যে উৎপাদনপ্রসারের সুপারিশ করা হয়। যন্ত্রশিল্পের আধিক্যের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হয়, শিল্পোৎপাদন কেন্দ্রীভূত ও বৃহদায়তন হইয়া উৎপাদন-

গান্ধীবাদী পরিকল্পনা

পদ্ধতির সরলতা নষ্ট করে, ব্যক্তিত্বকে পংগু করে এবং স্থানীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার অবসান ঘটায়। যাহা হউক, বর্তমান শিল্পযুগে এইরূপ পরিকল্পনার খুব বেশী গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। আর যন্ত্রশিল্পের যে-সকল ত্রুটিবিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্রশিল্পের নিজস্ব কোন ত্রুটি নয়; ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংগঠনের ফলেই উহাদের উদ্ভব হয়। সামাজিক সম্পর্ককে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে পারিলে উপরি-উক্ত ত্রুটিবিচ্যুতি আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে।

১৯৪৬ সালে উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ড গঠন

১৯৪৬ সালে যখন কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠিত হয়, পরিকল্পনা সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য শ্রী কে. সি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে একটি উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ড (an Advisory Planning Board) গঠন করা হয়। কমিটি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নিয়োগের সংস্থান করাই হইবে পরিকল্পনার লক্ষ্য। প্রতিরক্ষা শিল্প এবং খাদ্য বস্ত্র বাসগৃহ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। সেচ জলবিদ্যুৎ ইস্পাত এবং রাসায়নিক দ্রব্যকে সমগুরুত্ব দিতে হইবে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কি হইবে তাহার উল্লেখ ইহা করে নাই। কমিটি কেন্দ্রে একটি পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিসংখ্যান দপ্তর গঠন করিবার সুপারিশ করে।

১৯৪৮ সালে শিল্পনীতি ঘোষণা

ইহার পর ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ, খাদ্য তুলা ও পাট উৎপাদনে অবনতি, পাকিস্তান হইতে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুর ভারতে আগমন, বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার উদ্ভবের ফলে নূতন করিয়া পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে ভারত সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। অন্যত্র এই শিল্পনীতির বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই শিল্পনীতিতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন এবং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৫০ সালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) গঠিত হয়। কমিশন ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করে। খসড়া পরিকল্পনার যে-সমস্ত সমালোচনা হয় তাহার বিচারবিবেচনা করিয়া অবশেষে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্ত আকারে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার্লামেন্টের নিকট পেশ করে। ইতিমধ্যে যে-সকল ছোটখাটো উন্নয়ন পরিকল্পনা চলিতেছিল তাহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিকল্পনার সময় নির্দিষ্ট করা হয় ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত—এই পাঁচ বৎসর।

১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠন

এই সময় অতিক্রান্ত হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় শেষ হইলে প্রবর্তন করা হইয়াছে তৃতীয় পরিকল্পনার।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature of Developmental Planning and indicate its importance in an underdeveloped country like our own. (২২৫-২২৮ পৃষ্ঠা)

2. What is Developmental Planning? Indicate its main factors. (২২৬-২৩১ পৃষ্ঠা)

3 Trace the developmental planning of India. (২৩১-২৩৩ এবং পরবর্তী অধ্যায়সমূহ)

নবম অধ্যায়

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

(The First Five Year Plan)

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of the Plan): প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫১-৫৬ সাল) মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুইটি: (ক) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে অর্থ-ব্যবস্থার যে-অসমতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা, এবং (খ) উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির সাহায্যে জীবন-যাত্রার মানের উন্নতিসাধন ও জনসাধারণের জন্য পূর্ণতর ও অধিকতর বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের সুযোগসুবিধা প্রদান।*

দুইটি উদ্দেশ্য

পরিকল্পনার অর্থনৈতিক লক্ষ্য: ভারতের পরিকল্পনার অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইল যথাসম্ভব শীঘ্র মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করা। ইহার জন্য একাধিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে। মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির উপর তিনটি জিনিসের প্রভাব রহিয়াছে: (১) জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার, (২) বিনিয়োগ ও জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে (Investment) সম্পর্ক, (৩) বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনের বিনিয়োগের হার। জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে ইহার বার্ষিক হার হইবে ১.২৫ শতকরা ভাগ। বিনিয়োগ ও জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে জাতীয় উৎপাদন একগুণ বাড়াইতে হইলে উহার তিনগুণ পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন; অর্থাৎ, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মধ্যে আনুপাতিক হার হইল ৩ : ১। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের জাতীয় আয় ৯০০০ কোটি টাকার মত ছিল। হিসাব করিয়া বলা হইয়াছিল যে প্রত্যেক বৎসর বর্ধিত জাতীয় আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ যদি বিনিয়োগ করা যায় তাহা হইলেই ২২ বৎসরের ভিতর মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব। এত অধিক পরিমাণ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সমীচীন নয় বলিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ পরিমাণ

অর্থনৈতিক লক্ষ্য মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি

* Review of the First Five Year Plan ১ পৃষ্ঠা

মূলধন-গঠনে নিয়োজিত হইবে বলিয়া হিসাব ধরা হয়। ইহার ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ১০,০০০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ, জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ সম্প্রসারিত হইবে। ইহার পর ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে যদি বর্ধিত জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ করিয়া প্রতি বৎসর বিনিয়োগ করা যায় তাহা হইলে ১৯৭৭ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবে।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) : পরিকল্পনা কমিশন মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার সুপারিশ করে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও বেসরকারী মালিকানার অবস্থিতির ভিত্তিতে আর্থিক উন্নয়নকার্য পরিচালিত হইবে। মূলধন-গঠন উৎপাদনের কলাকৌশলের উন্নতিসাধন, উৎপাদিকাশক্তির সম্প্রসারণ, শ্রেণীসম্পর্কের পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রকে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার দ্বারা বুঝায় না যে উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা বা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবসান করা হইবে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ উভয়কেই একই উদ্দেশ্যে কার্য করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা

ব্যয়-বরাদ্দ (Outlay) : উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ও উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় নির্দিষ্ট করা হয়। পরে ১৯৫৩-৫৪ সালে বেকার-সমস্যার অবস্থা দেখিয়া কতকগুলি অধিক শ্রমনিয়োগকারী কর্মসূচী (labour-intensive schemes) গ্রহণ করা হয় এবং পরিকল্পনার ব্যয় বর্ধিত করিয়া ২৩৭৮ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। বিভিন্ন খাতে মোট ব্যয় যেভাবে বণ্টন করা হয় তাহা পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটি হইতে বুঝা যাইবে।

মূল ও পরিবর্তিত ব্যয়-বরাদ্দ

উক্ত ২৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে ১৩৯০ কোটি টাকা কেন্দ্রের এবং ৯৮৮ কোটি টাকা রাজ্যগুলির ব্যয় করিবার কথা ছিল।

পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটি হইতে দেখা যায় যে, কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির উপর সবাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদানের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল : প্রথমত, খাদ্য ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদনপ্রসার ব্যতীত শিল্পোন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের উৎপাদনবৃদ্ধির সাহায্যে মূলভিত্তি সুদৃঢ় না করা পর্যন্ত কোন উন্নয়নের কথাই চিন্তা করা যায় না।

কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান ও ইহার কারণ

দ্বিতীয়ত, ভারতের কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বিশেষ স্বল্প। ইহাতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদনের দ্রুত প্রসার এবং অনতিবিলম্বে জাতীয় আয়বৃদ্ধি সহজসাধ্য কার্য। এদিক হইতে কৃষিকে অগ্রগণ্য করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতি একরূপ অকিঞ্চিৎকর। অতএব, যে-সকল দিকে

বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন কম প্রথমে সে-সকল দিকের উপর অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে। তৃতীয়ত, কৃষিজীবীরা অত্যন্ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট এবং মূলধনবিহীন, অথচ কৃষি হইতে শতকরা ৭০ ভাগ লোক জীবিকার্জন্ করে। রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদের উন্নয়নের কোন আশাই নাই। অপরদিকে শিল্পের অবস্থা এতটা সহায়সম্বলহীন নয়; ব্যক্তিগত উদ্যোগও মূলধন শিল্পের অগ্রগতিকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে সমর্থ।

(হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রাথমিক হিসাব* (Original Estimate)		পরিমার্জিত হিসাব** (Revised Estimate)	
	পরিমাণ	শতকরা ভাগ	পরিমাণ	শতকরা ভাগ
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৬১	১৭.৫	৩৫৪	১৪.৯
জলসেচ ও বিদ্যুৎ	৫৬১	২৭.১	৬৪৭	২৭.২
শিল্প ও খনিজ	১৭৩	৮.৪	১৮৮	৭.৯
পরিবহণ ও সংসরণ	৪৯৭	২৪.০	৫৭১	২৪.০
সমাজসেবা	৪২৫	২০.৫	৫৩২	২২.৪
বিবিধ	৫২	২.৫	৮৬	৩.৬
মোট	২০৬৯	১০০.০	২৩৭৮	১০০.০

উৎপাদনের লক্ষ্য (Targets of Production): পরিমার্জিত প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির নিম্নলিখিত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল: খাদ্য-শস্যের শতকরা ১৪ ভাগ, তুলা ও পাটের যথাক্রমে শতকরা ৪৫ ও ৬৪ ভাগ, ইক্ষু ও তৈলবীজের যথাক্রমে শতকরা ১৩ ও ৮ ভাগ।

কৃষিজ পণ্য

উক্ত লক্ষ্যগুলিতে পৌছিবার জন্য পরিকল্পনায় নানাবিধ পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাদের মধ্যে সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, চাষের জন্য জমির পুনরুদ্ধার, উন্নত ধরনের পদ্ধতির সাহায্যে কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধি, ভূমিসংস্কার, বন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম পরিকল্পনায় ১৩ লক্ষ কিলোওয়াটের মত অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার প্রস্তাব হয়। ভূমিনীতি সম্পর্কে পরিকল্পনায় প্রথমেই বলা হয় যে জাতীয় উন্নয়নে জমি ও কৃষিকার্যের মালিকানাকে মৌলিকতম সমস্যা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

* First Five Year Plan ৭০ পৃষ্ঠা

** Review of the First Five Year Plan ২-৩ পৃষ্ঠা

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাপারে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার (Community Development Projects) প্রবর্তন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার (National Extension Service) সম্প্রসারণ ছিল পরিকল্পনা কমিশনের আর একটি সুপারিশ। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা ও গ্রামীণ জীবনের ত্রুটি দূর করা হইল ইহাদের উদ্দেশ্য।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পপ্রসারের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় বেসরকারী উদ্যোগের উপর। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় সরকারী নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। অস্ত্রশস্ত্রাদির উৎপাদন, আণবিক শক্তির গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ, রেলপথ রাষ্ট্রের একচেটিয়া এলাকাধীন থাকে। কয়লাখনি, লৌহ ও ইস্পাত, বিমানপোত, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতারের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন প্রতিষ্ঠান সংগঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়। উপরি-উক্ত দুই পর্যায়ের শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের প্রসারের ভার বেসরকারী উদ্যোগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরিকল্পনার পরিবর্তিত হিসাবে সরকারী ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্প, খনিজ ও শিল্প সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ১৩৯ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। অপরদিকে বেসরকারী ক্ষেত্রে ২৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২টি বৃহৎ শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা হয়।*

শিল্পপ্রসার

দেশের শিল্প-কাঠামোকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রাধান্যের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই কারণে সরকারী ক্ষেত্রে প্রধানত মূলধন ও মূল শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগের মত মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইবে বলিয়া ধরা হয়।

যাহাতে পরিকল্পনানুযায়ী শিল্পপ্রসার হয় তাহার জন্য ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে সরকারের হস্তে বেসরকারী ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই আইনে নূতন শিল্প সংগঠনের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত কোন শিল্প দক্ষতার সহিত পরিচালিত না হইলে সরকার উহাকে নিজ হস্তে তুলিয়া লইতে পারে।

বৃহৎ শিল্প ব্যতীত পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়; এবং এই খাতে প্রথমে ৩০ কোটি টাকা এবং পরে পরিবর্তিত হিসাবে ৪৯ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়।

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প

পরিবহণ ও সংসরণের উন্নতিসাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। পরিবহণ ও সংসরণের খাতে পরিবর্তিত বরাদ্দ ৫৭১ কোটি টাকার মধ্যে রেলপথের জন্য থাকে ২৬৭ কোটি টাকা, এবং রাজপথ ও পথ পরিবহণ পরিকল্পনার জন্য ১৪৭ কোটি টাকা।

পরিবহণ ও সংসরণ

* Second Five Year Plan ৩৮৯ পৃষ্ঠা

সমাজ-কল্যাণকর কার্যাদি সম্পর্কে পরিকল্পনায় বলা হয় যে, এইরূপ কার্যের প্রসারের প্রয়োজন অধিক হইলেও বর্তমান আর্থিক সংগতির অপ্রতুলতা হেতু সরকারী প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। প্রথম পরিকল্পনায় সমাজসেবা, বাসগৃহ ও পুনর্বাসনের জন্য মোট ৫৩২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়।

সমাজ-কল্যাণ

ভারতের বেকার-সমস্যার যেমন একদিকে রহিয়াছে কর্মহীনতার সমস্যা, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে ব্যাপক অর্ধ-নিয়োগের (underemployment) সমস্যা। প্রথম পরিকল্পনা কার্যকর করার ফলে কতটা অতিরিক্ত নিয়োগের সংস্থান হইবে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যাদির অভাবে সঠিকভাবে বলা হয় নাই। তবে মোটামুটি যে-হিসাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে শিল্প, সেচ, নির্মাণকার্য, রাস্তাঘাট, কুটির শিল্পের কয়েকটি ক্ষেত্রে ৫৭'৫ লক্ষ লোকের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হইবে ধরা হয়। আরও আশা করা হইয়াছিল যে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে ৩৬ লক্ষ লোক পূর্ণতর নিয়োগের (fuller employment) সুবিধা পাইবে। ইহা ব্যতীত পরোক্ষভাবে এবং স্থানীয় কার্যে নিয়োগের অনেক সুযোগসুবিধা ঘটিবে।

বেকার-সমস্যা ও কর্মসংস্থান

পরিকল্পনার প্রকৃত ব্যয় ও এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ (Expenditure and Financing) : পরিকল্পনার বরাদ্দ ব্যয় ২০৬৯ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৩৭৮ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইলেও প্রকৃতপক্ষে মোট ব্যয় হয় ১৯৬০ কোটি টাকা। বিভিন্ন খাতে মোট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে অনুপাত বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত ছকটি দেওয়া হইল :

(হিসাব কোটি টাকায়)

	মোট বরাদ্দ		মোট ব্যয়	
	পরিমাণ	শতকরা ভাগ	পরিমাণ	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৫৪	১৪'৯	২৯১	১৫
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৬৪৭	২৭'২	৫৭০	২৯
৩। শিল্প ও খনিজ	১৮৮	৭'৯	১১৭	৬
৪। পরিবহণ ও সংসরণ	৫৭১	২৪'০	৫২৩	২৭
৫। সমাজসেবা ও বিবিধ	৬১৮	২৬'০	৪৫৯	২৩
	২৩৭৮	১০০'০	১৯৬০	১০০

এই ১৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় নিম্নলিখিতভাবে অর্থসংগ্রহ দ্বারা করা হয়:

(ক)	চলতি রাজস্ব হইতে সঞ্চয়	৬৩৭ কোটি টাকা
(খ)	রেলপথের অতিরিক্ত আয়	১১৫ ,, ,,
(গ)	দীর্ঘকালীন ঋণ সংগ্রহ	২০৫ ,, ,,
(ঘ)	স্বল্পসঞ্চয় ও স্বল্পকালীন ঋণ	৩০৪ ,, ,,
(ঙ)	আমানত, ফাণ্ড ও বিবিধ সূত্র	৯১ ,, ,,
(চ)	বৈদেশিক সাহায্য	১৮৮ ,, ,,
(ছ)	ঘাটতি-ব্যয়	৪২০ ,, ,,
	মোট	১৯৬০ কোটি টাকা

আমরা দেখিয়াছি যে মূল পরিকল্পনায় ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছিল।* অনুমান করা হইয়াছিল যে ইহার মধ্যে ১২৫৮ কোটি টাকা কর, ঋণ, স্বল্পসঞ্চয় ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ সূত্র (domestic resources) হইতে সংগ্রহ করা হইবে, বাকী ৮১১ কোটি টাকার জন্য প্রয়োজন ও সম্ভাবনামত কর, আভ্যন্তরীণ ঋণ, বৈদেশিক সাহায্য এবং ঘাটতি-ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তবে ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হইতে যে ২৯০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে ঘাটতি-ব্যয় তাহার অধিক করা হইবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে ১৯৬০ কোটি টাকার মধ্যেই ঘাটতি-ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২০ কোটি টাকা।** ইহার কারণ, আশামত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

ঘাটতি-ব্যয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি ও ইহার কারণ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল (Achievements of the First Five Year Plan): ফলাফল আলোচনার পূর্বে প্রথম পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটিকে স্মরণ করা যাইতে পারে। উদ্দেশ্য ছিল দুইটি: (ক) আর্থিক কাঠামোর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া ভবিষ্যতের অর্থ নৈতিক জীবনের দ্রুত প্রসারে সাহায্য করা, এবং (খ) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে যে-সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার সমাধান করা। এই দুই দিক হইতেই পরিকল্পনা বহুলাংশে সফল হইয়াছিল।

প্রথমত, পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষিজ উৎপাদনের সূচকসংখ্যা (Index of Agricultural Production) বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শতকরা ১৯ ভাগ এবং খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্য (target) অপেক্ষা ৩৪ লক্ষ টন অধিক বা শতকরা ২৯.৬ ভাগ।

কৃষির উন্নয়ন

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির মূলে যেমন ছিল

* ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

** ঘাটতি-ব্যয় সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্যাদি, তেমনি আবার ছিল আবহাওয়ার অনুকূল অবস্থার প্রভাব।

উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়া কৃষির ক্ষেত্রে অন্যান্য অগ্রগতিও দেখা যায়। পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ১·৬৩ কোটি একর জমি সেচসমন্বিত হয়। ভূমি-সংস্কারের কার্য বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়, পরীক্ষামূলকভাবে সমবায় কৃষি ও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের মোট গ্রামবাসীর এক-চতুর্থাংশ সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে আসে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াটে আসিয়া দাঁড়ায়।

শিল্পোন্নয়ন

শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের কাজকর্ম সমভাবে সন্তোষজনক না হইলেও মোটামুটি-ভাবে শিল্পপ্রসার ভালই হয়। শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩৮ ভাগ এবং শুধু মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৭০ ভাগ। ইহা ছাড়া বহু নূতন নূতন শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং তৈল শোধন, জাহাজ নির্মাণ, বিমানপোত নির্মাণ, পেনিসিলিন উৎপাদন প্রভৃতি নূতন নূতন শিল্প স্থাপিত হয়। পরিকল্পনার শেষের দিকে তিনটি ইস্পাত কারখানার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন বিশেষ প্রসারলাভ করে। বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতির ক্ষেত্রে উৎপাদনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়।

পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন

পরিবহণ-ব্যবস্থাতেও বেশ কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়। রেলপথসমূহ শতকরা ২৫ ভাগ অধিক মালপত্র বহন করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধের সময় যে ৪৩০ মাইল লাইন তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল তাহা পুনঃস্থাপন এবং ৩৮০ মাইল নূতন লাইন নির্মাণ করা হয়।

উপরি-উক্ত ফলাফল ব্যতীত সমাজসেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রভৃতি অন্যান্য দিকেও দেশ কতকটা অগ্রসর হয়।

জাতীয় আয় ও মাথা-পিছু আয়ের বৃদ্ধি

পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় যথাক্রমে শতকরা ১৮ এবং ১১ ভাগের মত বৃদ্ধি পায়।* বিনিয়োগের (investment) হার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪·৯ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ ভাগে দাঁড়ায়। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে প্রথম পরিকল্পনায় অধিকতর নিয়োগের সুযোগসুবিধা সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা ছিল নিতান্ত অপ্রচুর। যাহা হউক, ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে প্রত্যক্ষ-ভাবে ৪৫ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের কর্মসংস্থান করা হয়। ইহা ব্যতীত উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে গ্রামাঞ্চলে অর্ধ-নিয়োগের (under-employment) সমস্যারও অনেকটা সমাধান সম্ভব হয়। নগরাঞ্চলের কর্মহীনতার সমস্যা অবশ্য ব্যাপকতর আকার ধারণ করে। নিয়োগ সংস্থাসমূহের (employment

কর্মসংস্থানের অবস্থা

* Review of the First Five Year Plan ৩-৮ পৃষ্ঠা এবং ৩৭৪ পৃষ্ঠা।

exchanges) নিকট নাম রেজিস্ট্রী করা কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার হইতে ৭ লক্ষের উপর গিয়া পৌছায়।*

আভ্যন্তরীণ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রভাব ভারতের বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের (balance of payments) ক্ষেত্রেও দেখা যায়। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বৎসরে ১৮০-২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু মোট ঘাটতি হয় ৩০ কোটি টাকা। ইহার সহিত অবশ্য প্রাপ্ত সরকারী দান (official donations) ৯৬ কোটি টাকা যোগ করিতে হইবে। আরও হিসাব করা হইয়াছিল যে ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হইতে ২৯০ কোটি টাকার মত উঠাইতে হইবে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোট ১৩৮ কোটি টাকার মত উঠানো প্রয়োজন হয়। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের অবস্থার এই উন্নতির অন্যতম কারণ ছিল দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনে উন্নতি।**

লেনদেনের অবস্থায় উন্নতি

যুদ্ধোত্তর যুগে বিশেষত কোরিয়ার যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি আশংকাজনক রূপ ধারণ করে। এই মুদ্রাস্ফীতিকে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা করা হয়। অবশ্য পরিকল্পনার শেষ বৎসরে—অর্থাৎ, ১৯৫৫-৫৬ সালে দ্রব্যমূল্য এবং টাকাকড়ির যোগান পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের তুলনায় বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ইহার মূলে ছিল ঘাটতি-ব্যয়ের পরিমাণবৃদ্ধি। মোট ৪২০ কোটি টাকা ঘাটতি-ব্যয়ের মধ্যে ১৮০ কোটি টাকা সংঘটিত হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে।

দ্রব্যমূল্যের উপর পরিকল্পনার প্রভাব

প্রশ্নোত্তর

1. Briefly describe the objectives and targets of the First Five Year Plan.
(২৩৪-২৩৫ এবং ২৩৬-২৩৮ পৃষ্ঠা)

2. Indicate briefly the targets and achievements of the First Five Year Plan.
(২৩৬-২৩৮ এবং ২৩৯-২৪১ পৃষ্ঠা)

3. "The Indian Economy had made remarkable progress under the First Five Year Plan." Examine the statement noting the progress of the First Five Year Plan (C. U. B. Com. 1956 ; B. A. 1957) (২৩৯-২৪১ পৃষ্ঠা)

4. The First Five Year Plan accorded the highest priority to agriculture. How far do you think this emphasis was justified ? (C. U. B. A. 1959)
(২২৭-২২৮ এবং ২৩৫ পৃষ্ঠা)

* Review of the First Five Year Plan ১০ পৃষ্ঠা

** Report on Currency and Finance, 1955-56 ৭০-৮১ পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

(The Second Five Year Plan)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পরিমিত। ভবিষ্যতে যাহাতে অধিকতর প্রগতিশীল ও বিভিন্নমুখী অর্থ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহার ভিত্তি স্থাপন করাই ছিল উহার লক্ষ্য। ইহা ছাড়া যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে দেশের সম্মুখে যে খাদ্যাভাব, অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয় তাহার আশু সমাধান করাও অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জনসাধারণের দুর্দশার লাঘব বিশেষ হয় নাই। জনসাধারণের জীবনযাত্রার অতি নিম্ন মান মোটেই উন্নত হয় নাই, বলা চলে। "অধিকাংশের ভাগ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য এখনও জুটে না; বাসগৃহাদির অবস্থাও সম্পূর্ণ শোচনীয়; এ-দেশে বৎসরে মাথাপিছু ১৬ গজের অধিক বস্ত্র ব্যবহৃত হয় না; এখনও অধিকাংশ বালকবালিকা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত; সফল প্রথম পরিকল্পনার পরও জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ লোক ভোগ্যবস্তুর জন্য মাসিক ১৩ টাকার অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ হয় না। ইহার পর আছে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মহীনতা; বৎসরের পর বৎসর যেভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বেকার-সমস্যা আরও গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিবে।" এই সমস্ত সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বৃহত্তর দ্বিতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

বৃহত্তর পরিকল্পনা

কিন্তু পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর হইতেই বৈদেশিক মুদ্রাসংকটজনিত কারণ ও বিভিন্ন খাতে অনুমান অপেক্ষা ব্যয়বৃদ্ধি হেতু প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। ইহার ফলে ১৯৫৮ সালের মে ও সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনার কিছু ছাঁটকাট এবং বেশ কিছু পরিবর্তনসাধন করিতে হয়। পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের অনুমিত ব্যয় কমিয়া ৪৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পরে আবার উহাকে ৪৬০০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। যাহা হউক, পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচনা দুই পর্যায়ে করা প্রয়োজন—(ক) মূল পরিকল্পনা, এবং (খ) পরিবর্তিত পরিকল্পনা। আলোচনা এইভাবেই করা হইতেছে।

পরিকল্পনার সংশোধন

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of the Second Five Year Plan) **:** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (মূল এবং পরিবর্তিত উভয়েরই) চারিটি মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়: (ক) উন্নয়নের দ্রুততর গতি

(quicker pace of development), (খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি (wider industrial base), (গ) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ (accent on employment), এবং (ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত (socialistic bias)। উদ্দেশ্যগুলি পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

চারিটি পরস্পর সম্পর্কিত মূল উদ্দেশ্য

(ক) উন্নয়নের দ্রুততর গতি : প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধিসাধনের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল।

(খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি : ইতিপূর্বেই পর্যালোচনা করা হইয়াছে যে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে শক্তিশালী করিবার জন্য উহার উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল এবং শিল্পের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। ইহা ছাড়া শিল্পপ্রসারের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাও কার্যত ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, প্রথম পরিকল্পনা কার্যকর করার ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো কতকটা শক্তি অর্জন করে এবং জাতীয় আয়ও কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। খাদ্যাভাব, কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা ও মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের মধ্যে আনা হয়। ফলে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পপ্রসারের দিকে পদসঞ্চার করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। উপরন্তু, কৃষি এবং শিল্প পরস্পরের অনুপূরক হিসাবেই কার্য করে।* শিল্পোন্নয়ন কৃষির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ হ্রাস করিয়া কৃষির উৎপাদন ও কৃষিজীবীদের আয়বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। এই সকল দিকের বিচারবিবেচনা করিয়াই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পপ্রসারের প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পপ্রসারের ব্যবস্থা করিবার কারণ

কিন্তু শিল্পপ্রসারের গতি দ্রুত করিতে হইলে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য মূল ও ভারী শিল্পগুলির সম্প্রসারণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বতই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল শিল্প গঠনের প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(গ) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ : মূল শিল্প অবশ্য ভোগ্যদ্রব্যের যোগান দ্রুত বৃদ্ধি করে না, অথচ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। তাহা ছাড়া মূল শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে খুব বেশী কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও নাই, কারণ উহাতে শ্রমের তুলনায় মূলধন অধিক ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সুসমঞ্জস শিল্পপ্রসারের স্বার্থে চেষ্টা করিতে হইবে কি করিয়া কম মূলধন এবং অধিক শ্রম নিয়োগের সাহায্যে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ, অধিক শ্রমনিয়োগকারী শিল্প-পদ্ধতির (labour-intensive techniques) মাধ্যমে আপাতত ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহাতে একদিকে যেমন মূল শিল্পে মূলধন নিয়োগের সুবিধা

শ্রমনিয়োগকারী শিল্প-পদ্ধতি

* Second Five Year Plan—The Framework ১২৯ পৃষ্ঠা

হইবে, অপরদিকে তেমনি অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রমনিয়োগকারী পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে শ্রমনিয়োগকারী পদ্ধতির উৎপাদন-ব্যয় অধিক হয়। ইহার সমর্থনে পরিকল্পনায় বলা হয় যে, অর্থ-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিতে হইলে ভোগ্যদ্রব্য সম্পর্কে আমাদের কতকটা ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। ক্রমশ যখন উৎকৃষ্ট ধরনের উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, উন্নত পরিবহণ ও অধিক বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে, স্বল্পব্যয়ে অধিক ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপাদন করা তখন সম্ভব হইবে; এবং সমাজ বর্তমান ত্যাগের জন্য ভবিষ্যতে বহুগুণে উপকৃত হইবে।

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত: জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতি বা অর্থনৈতিক কল্যাণকে চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। আসলে উহা হইল এক উন্নততর মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পৌঁছাইয়া দিবার সোপান মাত্র। অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে এমন সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার মধ্যে থাকিয়া প্রত্যেকটি মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণবিকাশ করিতে পারে, তাহার আশা-আকাংক্ষা ও প্রেরণাকে রূপায়িত করিতে পারে। এই মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত প্রথম হইতে উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইবে। পার্লামেণ্ট এইজন্যই সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ (Socialist Pattern of Society) প্রতিষ্ঠা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তনের আদর্শ গ্রহণ

'সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা' কথাটির আসল তাৎপর্য হইল যে, উন্নয়নমূলক কার্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এমনভাবে পরিবর্তিত করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সংগে সংগে যেন আয় ও ধনসম্পদের ক্ষেত্রে অধিকতর সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়। উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ এবং বিনিয়োগ—অর্থাৎ, প্রধান প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের হস্তেই ন্যস্ত করিতে হইবে। যাহারা এতদিন সমাজে উপেক্ষিত ছিল তাহারা যাহাতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুযোগসুবিধা ভোগ করিতে পারে, যাহাতে অর্থনৈতিক সম্পদ ও ক্ষমতা মুষ্টিমেয়ের করতলগত না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নতির যে অপরিমেয় সম্ভাবনা রহিয়াছে এতদিন পর্যন্ত তাহা উপলব্ধি করিবার সুযোগ সাধারণ লোকের অতি সামান্যই ঘটিয়াছে। আজ যাহাতে তাহারা নিজেদের জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক কল্যাণ সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে সেজন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে। সমগ্র সমাজের পক্ষ হইতে তাই আজ রাষ্ট্রের উপর মহান্ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগাধীন ক্ষেত্রকে দ্রুত প্রসারিত করিতে হইবে; বেসরকারী উদ্যোগকে সমাজানুমোদিত পরিকল্পনার মধ্যে থাকিয়া কার্য করিতে হইবে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তনে রাষ্ট্রের ভূমিকা

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণ: দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে পার্লামেণ্ট পরিমার্জিত শিল্পনীতি গ্রহণ করে। পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্রুততর গতি, দ্রুত শিল্পায়ন, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রাসরণ, ব্যাপকতর সমবায়িক ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সংগে সংগে ধনগত বৈষম্য ও আয়গত পার্থক্যের অপসারণ, ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবার ও কয়েকজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রতিরোধ প্রভৃতির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বতই রাষ্ট্রকে অধিকতর মাত্রায় সক্রিয় হইতে হইবে এবং সরকারী ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করিতে হইবে। সমস্ত মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং সাধারণের সেবামূলক কার্যসমূহ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রেই থাকিবে। অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্প এবং যে-সকল শিল্পে বর্তমান অবস্থায় বিনিয়োগ একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্ভব তাহারাও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিবে। তবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নকার্যে বেসরকারী ক্ষেত্রেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিবে। কিন্তু ক্রমশ সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সংকোচন ঘটিতে থাকিবে।

পরিমার্জিত শিল্পনীতি

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে সংগে বৈষম্যের হ্রাসকল্পে দুইটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে: একদিকে যেমন যাহাদের আয় ন্যূনতম তাহাদের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে, অপরদিকে যাহাদের আয় অত্যুচ্চ তাহাদের আয় কমাইয়া দিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে প্রথম পন্থা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইলেও দ্বিতীয় পন্থাটিকেও কার্যকর করা প্রয়োজন। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে বিনিয়োগের প্রকৃতি, রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থ নৈতিক কার্যের পরিচালনা, সমাজসেবার প্রসার, জমির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার গঠনগত পরিবর্তন, যৌথ কোম্পানী ও ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমবায়িক ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, রাজস্ব-পদ্ধতি প্রভৃতি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গৃহীত পন্থাগুলির মাধ্যমেই আয়গত ও ধনগত বৈষম্য দূর করা সম্ভব। কারণ, ইহারাই নির্দিষ্ট করিয়া দেয় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আয় সৃষ্ট হইবে এবং ঐ আয় কিভাবে বণ্টিত হইবে। বৈষম্য দূরিকরণের কার্যে রাজস্ব-পদ্ধতির (fiscal policy) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে, তবে দেখিতে হইবে অবলম্বিত পদ্ধতি যেন বেসরকারী উদ্যোগ ও প্রেরণাকে ব্যাহত না করে। এইজন্য কি করিয়া কর-ব্যবস্থাকে উন্নয়নকার্যের অনুগামী করা যায় তাহার বিচারবিবেচনা করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত আয়ের ঊর্ধ্বতন মাত্রা (ceiling) ধার্য করিবার মত সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিবে।

অন্যান্য অবলম্বনীয় পন্থা

উপরি-উক্ত ধরনের অসাম্য ব্যতীত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির মধ্যে অসমতা রহিয়াছে। যাহাতে বিভিন্ন অঞ্চল উন্নতির পথে সমভাবে অগ্রসর হইতে পারে

তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিশেষত অনুন্নত অঞ্চলগুলির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিকেন্দ্রিকৃত শিল্পগত উৎপাদন, শিল্পস্থাপনের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে যথোপযুক্ত নীতি-নির্ধারণ, শ্রমের গতিশীলতার প্রসার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আঞ্চলিক বৈষম্য দূরিকরণ

আর্থিক নীতি ও পদ্ধতি (Economic Policy and Techniques) : পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত আর্থিক নীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন করা প্রয়োজন। পরিকল্পনায় মোটামুটি দুইটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয় : (১) অর্থ নৈতিক কার্যকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব ও অর্থ সম্বন্ধীয় নীতি (fiscal and monetary policy), এবং (২) অর্থ-ব্যবস্থার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মূল্য ও আমদানি-রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতি। ক্রমোন্নতিশীল অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী কাজকর্মের গতি সম্প্রসারণশীলই হয়। বিভিন্ন সম্পদের চাহিদাও যেমন থাকে প্রভূত পরিমাণে, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যথা, বৈদেশিক মুদ্রার্জন, কৃষিজ উৎপাদন প্রভৃতিতে অ-পর্যাপ্তি দেখা দিবার সম্ভাবনাও থাকে যথেষ্ট। এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকিতে বাধ্য। সুতরাং প্রধান সমস্যা হইল কি করিয়া আভ্যন্তরীণ উৎপাদনবৃদ্ধি, নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি এবং জিনিসপত্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের সহায়তায় মুদ্রাস্ফীতিকে প্রতিরোধ করা যায় তাহা নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে করা হয়।

মূল পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ ও বণ্টন (Outlay and Allocation in the Original Plan) : মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা উন্নয়নমূলক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০৭৮ কোটি টাকা—যদিও কার্যক্ষেত্রে ২০০০ কোটি টাকার কিছু কম ব্যয় করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ ব্যয় প্রথম পরিকল্পনার দ্বিগুণেরও অধিক। উপরন্তু, বিভিন্ন খাতে ব্যয় বণ্টনের ব্যাপারেও পার্থক্য ছিল। মোট বরাদ্দ ৪৮০০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ব্যয়ের ভার ছিল ২৫৫৯ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলির উপর ২২৪১ কোটি টাকা। বিভিন্ন খাতে মোট সরকারী ব্যয়ের বণ্টন পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার ছকটি হইতে বুঝা যাইবে।

সরকারী খাতে বরাদ্দ ব্যয়

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপ্রদান ব্যাপারে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। মোটামুটিভাবে প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ খাতে (ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প ধরিয়া) বরাদ্দ করা হয় শতকরা ৭'৫ ভাগ ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয় শতকরা ১৮'৫ ভাগ। এই খাতে প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয়

ব্যয় বরাদ্দের ধারা

বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বণ্টন (হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনা		দ্বিতীয় পরিকল্পনা	
	মোট বরাদ্দ (পরিবর্তিত হিঃ)	শতকরা ভাগ	মোট বরাদ্দ (প্রাথমিক হিঃ)	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৫৪	১৪.৯	৫৬৮	১১.৮
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৬৪৭	২৭.২	৯১৩	১৯.০
৩। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প	৪৯	২.১	২০০	৪.১
৪। বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ	১৩৯	৫.৪	৬৯০	১৪.৪
৫। পরিবহণ ও সংসরণ	৫৭১	২৪.৪	১৩৮৫	২৮.৯
৬। সমাজসেবা	৫৩২	২২.৪	৯৪৫	১৯.৭
৭। বিবিধ	৮৬	৩.৬	৯৯	২.১
মোট	২৩৭৮	১০০.০	৪৮০০	১০০.০

পরিকল্পনায় শতকরা ৩৯৭ ভাগ অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।* পরিবহণ ও সংসরণ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয় শতকরা ১৪৯ ভাগ বা প্রায় ১½ গুণ। কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির উপর গুরুত্ব হ্রাস করা হইলেও পূর্বের তুলনায় ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৫৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সমাজসেবার ক্ষেত্রে ঐ একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ-ব্যবস্থা (Investment in the Original Second Plan) ঃ আমরা দেখিয়াছি, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়। এই ব্যয়ের মধ্যে বিনিয়োগের (investment) পরিমাণ ৩৮০০ কোটি টাকা—অর্থাৎ, এই ব্যয়ের সাহায্যে উৎপাদনশীল সম্পদ (Productive Assets) সৃষ্টি হইবে। বাকী ১০০০ কোটি টাকা হইল চলতি উন্নয়নমূলক কার্যের ব্যয়।

সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ

মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের সহিত বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ দিতে হইবে। এই উভয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মূল পরিকল্পনার উৎপাদন-লক্ষ্য (targets of production) ধার্য করা হয়। বেসরকারী বিনিয়োগ কতটা হইবে তাহা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তবে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে বিনিয়োগের গতি ও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কর্মসূচীর পদ্ধতি পর্যালোচনা করিয়া অনুমান করা হয় যে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ২৪০০ কোটি টাকার মত হইবে। এই ২৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের বণ্টন নিম্নলিখিতভাবে হইবে অনুমান করা হয়।

বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ

* India—1961

(হিসাব কোটি টাকায়)

১।	সংগঠিত শিল্প ও খনিজ	৫৭৫
২।	রোপণ শিল্প, পরিবহণ ও বৈদ্যুতিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান	১২৫
৩	নির্মাণকার্য (Construction)	১০০০
৪।	কৃষি এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩০০
৫।	পুঁজিপাটা (Stocks)	৪০০
	মোট	২৪০০

অতএব দেখা যায় যে, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ৬২০০ (৩৮০০+২৪০০) কোটি টাকা 'বিনিয়োগের ব্যবস্থা' করা হইয়াছিল।

মূল পরিকল্পনায় উৎপাদন ও উন্নয়নের লক্ষ্য (Targets of Production and Development of the Original Plan) : শিল্প ও খনিজ উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারী ক্ষেত্রের প্রাধান্যকেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা যায়। মূল পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্প ও খনিজ খাতে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৯০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করা হয়। অপরপক্ষে বে-সরকারী ক্ষেত্রে এই খাতে নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৭৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। সরকারী ক্ষেত্রের ৬৯০ কোটি টাকার সমস্তটাই লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল শিল্পগুলির প্রসারের জন্য ব্যয় করার কথা ছিল। রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুর—এই তিনটি স্থানে তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন এবং মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার ইস্পাত উৎপাদনবৃদ্ধি দ্বারা সরকারী ক্ষেত্রে (public sector) নির্মিত ইস্পাতের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ২০ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল।

সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য

লৌহ ও ইস্পাত কারখানার প্রসারের সহিত ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রসার অংগাংগিভাবে জড়িত ; এবং ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সাহায্যেই শিল্পের যন্ত্রপাতি ও মূলধন দ্রব্যাদি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করা সম্ভব। এইজন্য মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী ইস্পাত ফাউণ্ড্রী (a heavy steel foundry), ভারী ঢালাই কারখানা (foundries), হাপর (forge shops), বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা প্রভৃতি স্থাপন করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়। ইহা ছাড়া রেল-ইঞ্জিন, রেল কোচ প্রভৃতির উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হয়।

পরিকল্পনাধীন সময়ে লৌহ-আকর উৎপাদন প্রায় শতকরা ২০০ ভাগ এবং কয়লার উৎপাদন শতকরা ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হয়। সিন্ধ্রির কারখানার সম্প্রসারণ, নূতন কারখানা স্থাপনের দ্বারা সার উৎপাদনের বহু পরিমাণ বর্ধিত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার সময় ডি. ডি. টি. কারখানা, টেলিফোন যন্ত্রপাতির কারখানা, পেনিসিলিন কারখানা প্রভৃতি যে-সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের

সম্প্রসারণের এবং কেরলে আর একটি ডি. ডি. টি. কারখানা খুলিবার প্রস্তাব করা হয়। পশ্চিমবংগে দুর্গাপুরে কোক-চুল্লী (coke-oven plant) প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনাও থাকে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদন লক্ষ্য

বেসরকারী ক্ষেত্রেও মূল শিল্পগুলির প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৫৮ সালের মধ্যে নির্মিত ইস্পাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উহাকে ১২·৫ লক্ষ টন হইতে ২৩ লক্ষ টনে, সিমেন্টের উৎপাদন ৪৩ লক্ষ টন হইতে ১৩০ লক্ষ টনে লইয়া আসিবার লক্ষ্য স্থির হয়। এ্যালুমিনিয়াম ম্যাংগানীজ প্রভৃতির উৎপাদনবৃদ্ধির কথাও থাকে। বেসরকারী ক্ষেত্রে তুলা, পাট, চিনি, কাগজ, সিমেণ্ট, কৃষি প্রভৃতি শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতির উৎপাদন এবং রসায়ন শিল্পের প্রসার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। ভোগ্যদ্রব্যের মধ্যে তুলাবস্ত্রের উৎপাদন শতকরা ২৪ ভাগ, চিনির উৎপাদন শতকরা ৩৫ ভাগ এবং কাগজ ও বোর্ড কাগজের উৎপাদন দ্বিগুণ হইবে বলিয়া আশা করা হয়।

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মূল পরিকল্পনায় ইহাদের প্রসারকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে ৬০ কোটি টাকা তাঁত শিল্প, ৫৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, ৫৫·৫ কোটি টাকা খাদি ও অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প, এবং বাকী অর্থ অপরাপর শিল্পপ্রসারের জন্য নির্দিষ্ট হয়।

নিম্নলিখিত হিসাবটি হইতে বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজের ক্ষেত্রে মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্যের কতকটা ইংগিত পাওয়া যাইবে :

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদনবৃদ্ধির শতকরা হার
বৃহদায়তন শিল্প				
১। নির্মিত ইস্পাত (দশ লক্ষ টন)	১·১	১·৩	৪·৩	২৩১
২। রেল-ইঞ্জিন (সংখ্যা)	৩	১৭৫	৪০০	১২৯
৩। সিমেণ্ট (দশ লক্ষ টন)	২·৭	৪·৩	১৩	২০২
৪। সার :				
(ক) এ্যামোনিয়াম সালফেট (হাজার টন)	৪৬	৩৮০	১৪৫০	২৮২
(খ) সুপারফস্ফেট (হাজার টন)	৫৫	১২০	৭২০	৫০০
৫। তুলাবস্ত্র (দশ লক্ষ গজ)	৪,৬১৮	৬৮৫০	৮৫০০	২৪
৬। চিনি (দশ লক্ষ টন)	১·১	১·৭	২·৩	৩৫
৭। কাগজ ও কাগজের বোর্ড (হাজার টন)	১১৪	২০০	৩৫০	৭৫
খনিজ				
১। লৌহ-আকর (দশ লক্ষ টন)	৩·০	৪·৩	১২·৫	১৯১
২। কয়লা (দশ লক্ষ টন)	৩২·৩	৩৮·০	৬০·০	৫৮

পরিবহণ ও সংসরণ

পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে ১৩৮৫ কোটি টাকার মধ্যে ৯০০ কোটি টাকা রেলপথের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ইহার উপর ২২৫ কোটি টাকা স্বাভাবিক পরিবর্তন কার্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় গমনাগমনের চাহিদাবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিবহণের উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। মোট যাত্রীবহনের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ এবং মালপত্রবহনের পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্য মূল পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট করা হয়।

রাজপথ ও পথ পরিবহণ, জাহাজ-চলাচল, বন্দর ও পোতাশ্রয়, বেসামরিক বিমান-চলাচল, বেতার, ডাক ও তার এবং অন্যান্য যোগাযোগের উন্নতিবিধানেরও সম্যক ব্যবস্থা পরিকল্পনায় করা হয়। ১৯৪৩ সালের নাগপুর পরিকল্পনায় রাজপথ উন্নয়নের যে-কর্মসূচী দেওয়া হয় তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনান্তে সম্পূর্ণ করা স্থির হয়। বৃহৎ বন্দরগুলির শক্তি শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা, জাহাজী শক্তিকে ৬ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৯ লক্ষ টনে লইয়া যাওয়া ছিল মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য।

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট কৃষিজ উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করা হয়। পরে অবশ্য খাদ্যসংকট পুনরায় দেখা দিলে এই দুই অনুপাতকে যথাক্রমে ২৮ এবং ২৫-এ লইয়া যাওয়া হয়।

কৃষি ও সমাজোন্নয়ন

সেচের অধিকতর সুযোগ, উন্নত ধরনের বীজ ও সার এবং কার্যপদ্ধতি উৎপাদনে অধিক মাত্রায় বৈচিত্র্য আনয়ন, ভূমিসংস্কার, সমবায়ের সুসংগঠন এবং গ্রামীণ ঋণ, বিক্রয়করণ ও উৎপাদনের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকে কার্যকরকরণ—এই কয়েকটিকেই কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রমের মূল বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

মূল পরিকল্পনায় দেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে লইয়া আসিবার কথা ছিল।

কৃষি ও সমাজোন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল পরিকল্পনার মোটামুটি লক্ষ্য ছিল নিম্নলিখিতরূপ :

কৃষি	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদনবৃদ্ধির শতকরা হার
১। খাদ্যশস্য (দশ লক্ষ টন)	৫৪·০	৬৫·০	৭৫·০	১৫
২। তুলা (দশ লক্ষ টন)	২·৯	৪·২	৫·৫	৩১
৩। ইক্ষু—কাঁচা গুড় (দশ লক্ষ টন)	৫·৬	৫·৮	৭·১	২২
৪। তৈলবীজ (দশ লক্ষ টন)	৫·১	৫·৫	৭·০	২৭
৫। পাট (দশ লক্ষ গাঁইট)	৩·৩	৪·০	৫·০	২৫
৬। চা (দশ লক্ষ পাউণ্ড)	৬১৩	৬৪৪	৭০০	৯
৭। জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক (সংখ্যা)	—	৫০০	৩৮০০	৬৬০
৮। সমাজোন্নয়ন ব্লক (সংখ্যা)	—	৬২২	১১২০	৮০

প্রথম পরিকল্পনার সময় সেচসমন্বিত জমির পরিমাণ ৫১০ লক্ষ একর হইতে বাড়িয়া ৬৭০ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ২১০ লক্ষ একর জমি সেচসমন্বিত করিবার প্রস্তাব হয়। প্রথম পরিকল্পনার ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াটে পরিণত হয়। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহাকে ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াটে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির করা হয়।

সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি

মূল পরিকল্পনায় সমাজসেবা খাতে ৯৪৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষাবিস্তার, চিকিৎসার উন্নতিসাধন, এবং শিল্প-শ্রমিক, উদ্বাস্তু ও অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতিবিধানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সমাজসেবা

জাতীয় আয়, ভোগ ও কর্মের সংস্থান (National Income, Consumption and Employment) : মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্যাদির ফলাফল যাহা দাঁড়াইবে আশা করা হইয়াছিল সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করা হইল। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হিসাব করা হইয়াছিল যে জাতীয় আয় প্রথম পরিকল্পনান্তে শতকরা ১৮ ভাগ বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহাকে আরও শতকরা ২৫ ভাগ (১০,৮০০ কোটি টাকা হইতে ১৩,৪৮০ কোটি টাকা) বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হয়। মাথাপিছু আয় প্রথম পরিকল্পনার ফলে শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পায় ; দ্বিতীয় পরিকল্পনান্তে উহাকে আরও শতকরা ১৮ ভাগ (২৮১ টাকা হইতে ৩৩০ টাকা) বর্ধিত করিবার লক্ষ্য স্থির হয়। ভোগ্যদ্রব্যের উপর মোট ব্যয় শতকরা ২১ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপ আশা করা হয়।

জাতীয় আয় ও মাথা-পিছু আয়বৃদ্ধির হিসাব

মূল পরিকল্পনায় বলা হয় যে, পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট ৬২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্ভব করিবার জন্য আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ। ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ১০ ভাগে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করা হয়। অবশ্য পরিকল্পনার সময় বিদেশ হইতে ১১০০ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করা যাইবে এই ভিত্তিতেই উপরি-উক্ত হিসাব করা হইয়াছিল।

সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি

কর্মসংস্থান সম্পর্কে পরিকল্পনায় বলা হয় কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ৮০ লক্ষ লোকের নিয়োগের সংস্থান করা যাইবে। ইহা ব্যতীত সেচ ও জমির পুনরুদ্ধারের যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে অর্ধ-বেকার সমস্যার সমাধান এবং অতিরিক্ত নিয়োগের সুযোগ হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে শ্রমোপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১ কোটির মত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। এই নবাগত শ্রমিকসংখ্যার জন্য নিয়োগের সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল।*

কর্মসংস্থানের হিসাব

* বেকার-সমস্যা সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

পরিকল্পনার জন্য অর্থের সংস্থান ও বিদেশী মুদ্রা (Financing and Foreign Exchange) : মূল পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, উভয়ই একই সঞ্চয় ভাণ্ডারের উপর নির্ভরশীল। আবার আভ্যন্তরীণ অর্থের পর্যাপ্তিই যথেষ্ট নয়, যথোপযুক্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান করাও প্রয়োজন, কারণ দ্রুত শিল্পপ্রসারের জন্য যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে।

সরকারী ক্ষেত্রের জন্য অর্থের সংস্থান (Financing for the Public Sector) :

অর্থসংগ্রহের সূত্র

সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এই অর্থসংগ্রহের সূত্রগুলির সন্ধান নিম্নের হিসাবটি হইতে পাওয়া যাইবে :

অর্থসংস্থানের হিসাব (কোটি টাকায়)

১।	বর্তমান রাজস্বের উদ্বৃত্ত (Surplus from Current Revenues) :		৮০০
	(ক) ১৯৫৫-৫৬ সালের করের হার	৩৫০	
	(খ) অতিরিক্ত করস্থাপন	৪৫০	
২।	জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ (Borrowing from the Public) :		১২০০
	(ক) বাজার হইতে ঋণসংগ্রহ	৭০০	
	(খ) স্বল্প সঞ্চয়	৫০০	
৩।	বাজেটের অন্যান্য সূত্র (Other Budgetary Sources) :		৪০০
	(ক) উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য রেলপথ কর্তৃক অর্থপ্রদান	১৫০	
	(খ) প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য জমা	২৫০	
৪।	বিদেশে অর্থসংগ্রহ (Resources to be raised externally) :		৮০০
৫।	ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing) :		১২০০
৬।	বাকী—আভ্যন্তরীণ অর্থসংগ্রহের অন্যান্য উপায়ের সাহায্যে পূরণ করা যাইবে (Gap—to be covered by additional measures to raise domestic resources) :		৪০০
		মোট	৪৮০০

দেখা যাইতেছে যে কর, ঋণ, অন্যান্য আয় ইত্যাদি বাজেটের সূত্র (budgetary resources) হইতে মোট ২৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছিল। অতিরিক্ত করস্থাপনের সাহায্যে ৪৫০ কোটি টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা কর অনুসন্ধানকারী কমিশনের (Taxation Enquiry Commission) সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই করা হয় এবং ঐ সকল সুপারিশ কার্যকর করারও ব্যবস্থা হয়। চলতি ও অতিরিক্ত

অতিরিক্ত করের সাহায্যে অর্থসংগ্রহ

কর মিলাইয়া বর্তমান রাজস্ব হইতে মোট ৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহ হইবে। কিন্তু কর হইতে প্রাপ্ত এই টাকা ছিল পরিকল্পনার প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রচুর। সুতরাং পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার এবং মুদ্রাস্ফীতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য করের সাহায্যে আরও অধিক অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। কারণ, হিসাবে যে বাকী ৪০০ কোটি টাকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল তাহাও আভ্যন্তরীণ সূত্র বা কর ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ হইতে সংগ্রহ করার কথা বলা হইয়াছিল।

জনসাধারণের নিকট ঋণগ্রহণের সাহায্যে অর্থসংগ্রহ

জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণগ্রহণের মাধ্যমে ১২০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাজারে ঋণ হইতে সংগ্রহযোগ্য অর্থের পরিমাণ ধরা হয় ৭০০ কোটি টাকা। স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে বাৎসরিক ১০০ কোটি টাকা করিয়া সংগ্রহের আশা করা হইয়াছিল।

রেলপথ কর্তৃক অর্থ-প্রদান

রেলপথের উন্নয়ন পরিকল্পনার ৯০০ কোটি টাকার মধ্যে আশা করা হইয়াছিল যে, ১৫০ কোটি টাকার মত অর্থ রেলপথ নিজেই সরবরাহ করিবে। এই টাকা যাত্রী ও মালের উপর ভাড়ার হার পরিবর্তন এবং যাতায়াতবৃদ্ধির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রাসংগ্রহ

বৈদেশিক সূত্র হইতে ৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া হিসাবে ধরা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার সময় যে পরিমাণ বিদেশী ঋণ ও দান পাওয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তাহার চার গুণের মত বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তির আশা করা হইয়াছিল। মোটামুটিভাবে হিসাব করা হইয়াছিল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বহির্বাণিজ্যের চলতি হিসাবের খাতে (Current Account) লেনদেনের ঘাটতি ১১০০ কোটি টাকার মত হইবে।* ইহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হইবে জমা ষ্টার্লিং হইতে। বাকী ৯০০ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা, বিদেশী বাজারে ঋণসংগ্রহ, বিশ্ব ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও দান, ব্যক্তিগত বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বিদেশী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও দানের সাহায্যে সংগ্রহ করা হইবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ৯০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার কথা ছিল। সুতরাং সরকারী ক্ষেত্রে ৮০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে, ধরা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রথম পরিকল্পনায় উদ্বৃত্ত ৯৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হাতে ছিল। সুতরাং সব অনুমানমত চলিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের জন্য ৭০৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কথা ছিল।

ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing) : দেখা গিয়াছে, মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় দ্বারা সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। পরে ইহাকে কমাইয়া

---

*৩৯-৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

১০৯২ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু ঘাটতি ব্যয় হয় ৯৪৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য এই পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত ছিল কি না, তাহার পর্যালোচনা করিবার পূর্বে ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিলে বিচার্য বিষয় সহজ হইয়া আসিবে।

ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে ?

সাধারণত কর, শুল্ক প্রভৃতি রাজস্ব-পদ্ধতির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ হইতে সরকারের যে চলতি আয় হয় তাহার অধিক ব্যয় করাকেই ঘাটতি ব্যয় (deficit financing) বলা হয়। ঋণ বা জমা অর্থ হইতে তুলিয়া কিংবা অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া সরকার এই ব্যয় মিটাইয়া থাকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তাহা হইল এইরূপ : কর, সরকারী প্রতিষ্ঠানের আয়, সাধারণের আমানত-তহবিল এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সরকারী আয়ের তুলনায় সরকারী ব্যয় যদি বেশী হয় তবে ঐ ব্যয়কে ঘাটতি ব্যয় বলা হইবে। সুতরাং এইরূপ ব্যয়নির্বাহের পদ্ধতি হইল দুইটি : (১) সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তোলা, এবং (২) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ করা। সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তুলিয়া ব্যয় করিলে ঐ টাকা ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে ; এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহা নোট ছাপাইয়া পূরণ করিয়া লয়। অতএব, উভয় ক্ষেত্রেই মোট টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পায়।

ঘাটতি ব্যয় বিচার করিবার সময় শুধু রাজস্ব খাতের ব্যয় দেখিলেই চলিবে না, মূলধন খাতের ব্যয়ও দেখিতে হইবে।

এ-দেশে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাপ-পদ্ধতি

এ-দেশে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাপ করিবার সময় দেখা হয় যে (ক) নগদ তহবিল হইতে সরকার কত টাকা উঠাইল, (খ) রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সরকারী স্বল্পমেয়াদী ঋণ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল।

ঘাটতি ব্যয়ের সপক্ষে যুক্তি

এখন ঘাটতি ব্যয় নীতি যুক্তিযুক্ত কি না এবং যুক্তিযুক্ত হইলে কতটা যুক্তিযুক্ত তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হইয়াছিল : (১) স্বল্পোন্নত দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা কর-রাজস্ব, ঋণগ্রহণ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় প্রভৃতি চিরাচরিত সূত্র হইতে মিটানো সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় দ্রুত উন্নয়নের জন্য ঘাটতি ব্যয় প্রয়োজন। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ফলে উৎপাদনও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ক্ষতিকর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। (২) অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্রের তুলনায় আর্থিক ক্ষেত্র যতই সম্প্রসারিত হয় টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধির ততই প্রয়োজন দেখা দেয়। (৩) প্রথম পরিকল্পনায় ৪২০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইয়াছিল। কিন্তু উহার ফলে বিশেষ কোন প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। অতএব, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের প্রস্তাব অযৌক্তিক হয় নাই।

ঘাটতি ব্যয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে উপরি-উক্ত ধারণা লর্ড কেইনস্ ও আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের তত্ত্ব হইতে গৃহীত। প্রাচীন ধারণা যে সরকার সকল সময়েই আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে এবং বাজেটে কোন ঘাটতি থাকিবে না, তাহার বিরোধিতা করিয়া কেইনস্ ও তাঁহার সমর্থকগণ বলেন, (১) একমাত্র ঘাটতি ব্যয় নীতির দ্বারাই পূর্ণনিয়োগ প্রবর্তিত রাখা যায়, (২) স্বল্পোন্নত দেশে আয় গুণিতকের (income multiplier) পরিমাণ বেশী হয় বলিয়া ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি দ্বারা আয়বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করা যায়, (৩) যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে উৎপাদনের অব্যবহৃত উপকরণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না, এবং (৪) স্বল্পোন্নত দেশে মাত্র ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করিয়া জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভবপর হয়।

কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন-পরিকল্পনায় উক্ত কেইনসীয় ধারণা অপরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা যায় না। এই সকল দেশে নানা প্রতিবন্ধকের (bottlenecks) জন্য কেইনসীয় নীতি পূর্ণ কার্যকর হইতে পারে না। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি করিলেও মূলধন-দ্রব্য ও কারিগরিদক্ষতার অভাবহেতু কাম্য উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে না। ফলে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির জন্য মূল্যবৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতিই ঘটে।

ঘাটতি ব্যয়ের বিপক্ষে যুক্তি

এই কারণে একদল আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ বলিয়াছেন যে, স্বল্পোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয় যুক্তিযুক্ত কি না তাহা দুইদিক দিয়া বিচার করিতে হইবে—(ক) ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ, এবং (খ) যে পরিপ্রেক্ষিতে ঘাটতি ব্যয় করা হইবে তাহা এবং ঐ ব্যয়ের সহিত সম্পর্কিত নীতি।

কতটা পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় সমর্থনীয়

এই দুই দিক বিচার করিয়াই অধ্যাপক ক্যালডোর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় অতিরিক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। একরূপ উহার জন্যই পরিকল্পনার ছাঁটকাটের সময় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণকে কমাইয়া ১০৯২ কোটি টাকায় আনা হয়। শেষ পর্যন্ত মোট ঘাটতি ব্যয় হয় ৯৪৮ কোটি টাকা।* এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ঘাটতি ব্যয় প্রকৃতপক্ষে অত কম হয় নাই। রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সরকারী স্বল্পকালীন ঋণের একাংশ স্থায়ী ঋণে (funded debt) পরিণত করিয়াই ঘাটতি ব্যয় অতটা কম দেখানো সম্ভব হয়।**

ঘাটতি ব্যয়ের ত্রুটি প্রতিবিধানের জন্য অবলম্বিত পন্থা: তবুও পরিকল্পনার আকারের তুলনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ কম হয় নাই। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ আরও অধিক হইবে আশংকা করিয়া উহার অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত প্রতিবিধানগুলি অবলম্বন করা হয়। প্রথমত, রিজার্ভ ব্যাংক ঋণ-নিয়ন্ত্রণে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সজাগ হয়। পরিমাণমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফটকা, আগাম বাজার

* Third Five Year Plan ৯৫ পৃষ্ঠা

** Economic classification of the Budget of the Govt. of India for 1961-62

প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল কার্যে ব্যাংক-ঋণের যোগান অনেকটা হ্রাস করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রতিরোধ করিবার জন্য খাদ্যশস্য মজুত রাখার ব্যবস্থাও করা হয়। তৃতীয়ত, রাজস্বনীতিরও (fiscal policy) পরিবর্তনসাধন করিয়া অতিরিক্ত ক্রয়শক্তিকে টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়। তবুও বলা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের অকাম্য প্রতিক্রিয়ার উপযুক্ত প্রতিবিধান অবলম্বিত হয় নাই—মূল্যস্তরকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায় নাই।

বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ (Investment in the Private Sector) : বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রয়োজন ঠিক কতটা হইবে মূল পরিকল্পনায় তাহা নির্ণয় করা হয় নাই। তবে ২৪০০ কোটি টাকার মত প্রয়োজন হইবে বলিয়া ধরা হয়। ইহার জন্য সুসংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রেই বরাদ্দ করা হয় ৫৭৫ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রের অর্থসংস্থানের সূত্র কি হইবে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নাই। তবে বলা হইয়াছিল, যাহারা বিনিয়োগ করে তাহাদের নিজস্ব সঞ্চয় এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঞ্চয় হইবে অর্থসংগ্রহের অন্যতম সূত্র। সংগঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের হার মোটামুটি উচ্চ ও মূলধন-সংগ্রহের বাজারও বেশ শক্তিশালী। এই অবস্থায় স্থায়ী বিনিয়োগের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে অসুবিধা হইবে না। রাষ্ট্র অকাম্য বিনিয়োগ বন্ধের জন্য মূলধনের উপর নিয়ন্ত্রণ, আমদানি-রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ, শিল্পকে লাইসেন্সভুক্তকরণ প্রভৃতি দ্বারা বেসরকারী ক্ষেত্রকে সাহায্য করিতে পারে। ইহা ব্যতীত করস্থাপন ব্যাপারে সুযোগসুবিধা দান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সাহায্যপ্রদানের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিতে পারে। মূল পরিকল্পনায় ২৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ অনুমান করা হইলেও শেষ পর্যন্ত ৩৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া প্রাথমিকভাবে হিসাব করা হইয়াছে।*

বেসরকারী ক্ষেত্রের অর্থসংগ্রহের সূত্র

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার (Reappraisal of the Second Five Year Plan) : ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রবর্তনের পর হইতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরকরণে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। অসুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ক্রমে উহা একরূপ সংকটে পরিণত হয়। ফলে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) এবং পরিকল্পনা কমিশনকে (Planning Commission) প্রথম দুই বৎসরের (১৯৫৬-৫৮ সাল) পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাবনিকাশ ও সম্ভাবনা বিচার করিতে হয়। এই কার্য সম্পাদন করা হয় ১৯৫৮ সালের মে মাসে। হিসাবনিকাশ ও সম্ভাবনা বিচারের ফলে পরিকল্পনার কিছু ছাঁটকাট ও রদবদল করিতে হয়। এই ছাঁটকাট ও রদবদলই পরিকল্পনার পুনর্বিচার (Reappraisal) নামে অভিহিত।

১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনার পুনর্বিচার

পুনর্বিচারের কারণ আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, ১৯৫৬ সালে যখন দ্বিতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল তখন ইহা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা হইয়াছিল যে নিম্নলিখিত

* Third Five Year Plan ১০৫ পৃষ্ঠা।

বিষয়গুলির উপর পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিবে—যথা, (১) পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি, (২) নিয়মিত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের বৃদ্ধি, (৩) পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য, (৪) ন্যায্য মূল্যস্তর, এবং (৫) উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা সৃষ্ট সম্পদের যথাযোগ্য বণ্টন ও ব্যবহার। ১৯৫৮ সালের মে মাসে হিসাবনিকাশ করিয়া দেখা যায় যে ইহার কোনটিই পূরিত হয় নাই।

পুনর্বিচারের কারণ

প্রথমত, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্য আবার বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। অনুমান করা হইয়াছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার বৎসরগুলিতে গড়ে বার্ষিক ৪৮ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে; কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরেই এই খাতে ব্যয় হয় ১২৫ কোটি টাকা।

দ্বিতীয়ত, আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। মূল পরিকল্পনায় আশা করা হইয়াছিল আভ্যন্তরীণ ঋণ এবং স্বল্প সঞ্চয় হইতে গড়ে বৎসরে ২৫০ কোটি (মোট ১২০০ কোটি টাকা) টাকা সংগৃহীত হইবে; কিন্তু প্রথম দুই বৎসরে সংগৃহীত হইয়াছিল মাত্র ৩২৭ কোটি টাকা। অবশ্য কর-রাজস্বের পরিমাণ মূল পরিকল্পনার হিসাব হইতে অধিক হয়। কিন্তু সংগে সংগে অনুৎপাদনশীল ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনার জন্য এই সূত্র হইতে অনুমিত অর্থসংগ্রহ করাও সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, মূল্যস্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিকল্পনা প্রবর্তনের সময় হইতে ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে দ্রব্যমূল্য শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহা মুদ্রাস্ফীতিরই সূচক। ইহার ফলে পরিকল্পনাভুক্ত কার্যক্রমের ব্যয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ইহার সহিত যুক্ত হয় সুয়েজখাল জনিত সংকট ও আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধি। এই দুইটি ঘটনার ফলে পরিকল্পনার ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের কার্যক্রম যে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পাদন করা যাইবে না তাহা সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায়।

চতুর্থত, শুধু মোট ব্যয়বৃদ্ধির প্রশ্নই নহে। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের ক্ষেত্রেই সংকট দেখা দেয়। পরিকল্পনার সুরু হইতেই লেনদেনের উদ্বৃত্তের প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুমান করা হইয়াছিল যে পরিকল্পনাকালে মোট প্রতিকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে ১১০০ কোটি টাকা; কিন্তু দেখা যায় প্রথম দুই বৎসরেই সামগ্রিক ঘাটতির (overall deficit balance) পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৪৯ কোটি টাকা। স্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে উত্তরোত্তর টাকা উঠাইয়া এবং বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিয়া এই ঘাটতি মিটাইতে হয়। কিন্তু স্টার্লিং-উদ্বৃত্ত কমিতে কমিতে শেষ পর্যন্ত কারেন্সী রিজার্ভের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতমে আসিয়া পৌছায় এবং বৈদেশিক ঋণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত হয় নাই।

এই অবস্থায় পরিকল্পনার ছাঁটকাট এবং রদবদল করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না এবং ১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪৮০০ কোটি

টাকাতে রাখিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমকে 'ক' ও 'খ' এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। 'ক' অংশে থাকে—(১) কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ কার্যক্রম, (২) কেন্দ্রস্থল অধিকারী কার্যক্রম (core projects), এবং (৩) যে-সমস্ত কার্যক্রম ও পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই 'ক' অংশের পরিকল্পনা কার্যকর করিতে ৪৫০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে। 'খ' অংশভুক্ত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, এবং স্থির হয় যদি সম্ভব না-হয় তবে 'খ' অংশভুক্ত পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইবে না।

পুনর্বিচারের ফলে পরিকল্পনার রদবদল ও ছাঁটকাট

পরিশেষে, ঐ বৎসরেরই সেপ্টেম্বর মাসে আবার পরিকল্পনার বিচারবিবেচনা করিয়া অনুমিত হয় যে মোট ৪৫০০ কোটি টাকার অধিক সংগ্রহ করা যাইবে, এবং ফলে ঠিক হয় যে উহার বেশী ব্যয় করার প্রচেষ্টা করা হইবে। স্বভাবিকভাবেই 'খ' অংশের কিছুটা কার্যকর করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিবর্তিত পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ কিভাবে বণ্টিত হয় তাহা নিম্নের ছকটি হইতে বুঝা যাইবে :

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	মূল পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ	কতকগুলি ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি হেতু ব্যয় বণ্টনের রদবদল	'ক' অংশের জন্য নির্ধারিত ব্যয়
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	৫৬৮	৫১০
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৯১৩	৮৬০	৮২০
৩। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২০০	২০০	১৬০
৪। শিল্প ও খনিজ	৬৯০	৮৮০	৭৯০
৫। পরিবহণ ও সংসরণ	১৩৮৫	১৩৪৫	১৩৪০
৬। সমাজসেবা	৯৪৫	৮৬৩	৮১০
৭। বিবিধ	৯৯	৮৪	৭০
মোট	৪৮০০	৪৮০০	৪৫০০

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুসারে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইলে শিল্প ও খনিজ খাতে মূল পরিকল্পনার বরাদ্দ অপেক্ষা ১৯০ কোটি টাকা অধিক এবং কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ অপেক্ষা কিছু কিছু কম ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়। ৪৮০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইলে শিল্প ও খনিজ খাতে মাত্র ১০০ কোটি টাকা অধিক ব্যয় করা এবং কৃষি খাতে ৫৮ কোটি টাকার মত ব্যয় হ্রাস করা ঠিক হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য

৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। তখন পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায়ঃ

উন্নয়ন ক্ষেত্র	৪৮০০ কোটি টাকার মধ্যে পরিবর্তিত ব্যয় বরাদ্দ	৪৬০০ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় বরাদ্দ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	৫৩০
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৮৬০	৮৬৫
৩। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২০০	১৭৫
৪। শিল্প ও খনিজ	৮৮০	৯০০
৫। পরিবহণ ও সংসরণ	১৩৪৫	১৩০০
৬। সমাজসেবা	৮৬৩	৮৩০
৭। বিবিধ	৮৪	
মোট	৪৮০০	৪৬০০

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট (Foreign Exchange Crisis during the Second Plan) ঃ বৈদেশিক মুদ্রাসংকটই ছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমস্যাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অ-পর্যাপ্ত কৃষিজ উৎপাদন, মুদ্রাস্ফীতি, অপরিমিত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়সংগ্রহ ইত্যাদি সকলই পরিকল্পনাকে ব্যাহত করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রাসংকটই যে মূল প্রতিবন্ধকের কার্য করিয়াছিল সে-সম্বন্ধে সাধারণ লোকেও ছিল সচেতন। ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচে দর্শক যেমন স্কোর বোর্ডের দিকে চাহিয়া থাকে, রিজার্ভ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের হ্রাসবৃদ্ধিও সেদিন পর্যন্ত দেশের লোক আগ্রহ ও আতংকের সহিত লক্ষ্য করিতেছিল। এই আগ্রহ ও আতংকই তাহাদিগকে পরিকল্পনা-সচেতন (plan conscious) করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া যখন বাহির হয় তখন অনেকের মুখেই প্রথম প্রশ্ন ছিল, পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা কত ?

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের উদ্ভব হয় অকল্পনীয় প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের জন্য। পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করিয়াছিল যে পাঁচ বৎসরে (১৯৫৬-৬১ সাল) বহির্বাণিজ্যের চলতি হিসাবের খাতে (current account) লেনদেনের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১১০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা হইবে জমা স্টার্লিং হইতে এবং বাকী ৯০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে বৈদেশিক বাজারে ঋণ সংগ্রহ, বিশ্ব ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও দান, ব্যক্তিগত বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বিদেশী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও

সংকটের প্রকৃতি

দানের মাধ্যমে। কিন্তু এই হিসাবকে ভুল প্রমাণিত করিয়া পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরেই (১৯৫৬-৫৮ সাল) মোট ঘাটতি (overall deficit balance) দেখা দেয় ৯৪৯ কোটি টাকা এবং এই ঘাটতি ৪৮১ কোটি টাকা জমা স্টার্লিং হইতে মিটানো হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাতে ভারতের মোট বৈদেশিক মুদ্রা-সঞ্চয়ের (foreign exchange reserves) পরিমাণ ছিল ৮১৮ কোটি টাকার মত। উহা হইতে ৪৮১ কোটি টাকা ব্যয়িত হওয়ায় উহা কমিয়া ৩৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের এইরূপ অকল্পিত হ্রাসের জন্য দেখা দেয় বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট। বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের জন্য সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। ফলে পুনর্বিচারের পর পরিকল্পনার কিছু ছাঁটকাট করিতে হয়; সংগে সংগে অবশ্য লেনদেন ঘাটতির বিরুদ্ধে প্রতিবিধানও অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল প্রতিবিধান ও বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণবৃদ্ধির ফলে পরবর্তী তিন বৎসরে বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ মোট ১১৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

সমগ্র পরিকল্পনাধীন সময় ধরিয়া অবস্থার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অনুমিত ১১০০ কোটি টাকার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে মোট লেনদেন ঘাটতি (total overall deficit balance) হয় ২১০০ কোটি টাকার মত এবং অনুমিত ২০০ কোটি টাকার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। বাকিটা মিটানো হয় বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য ভিক্ষা করিয়া। মোট বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় ১৪০০ কোটি টাকার উপর বা পরিকল্পনার অনুমান অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী।

সামগ্রিক ব্যবস্থা

উক্ত বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের মূলে ছিল বিবিধ কারণ—যথা, (১) আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাসের দরুন খাদ্যদ্রব্যের আমদানিবৃদ্ধি, (২) আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধি ও সুয়েজ-সংকট ইত্যাদি কারণে আমদানির মূল্যবৃদ্ধি, (৩) পাকিস্তানের সহিত মনোমালিন্যের ফলে প্রতিরক্ষার উপকরণের আমদানিবৃদ্ধি, (৪) আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনার ব্যয়বৃদ্ধি, (৫) পরিকল্পনায় নূতন নূতন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি, (৬) রপ্তানিবৃদ্ধির শ্লথগতি, এবং (৭) আমদানি সম্পর্কে কতকটা উদারনীতি অবলম্বন। অবশ্য, শুধু অকল্পিত কারণেই অভূতপূর্ব আমদানিবৃদ্ধি ঘটে নাই। পরিকল্পনা কমিশনও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে আমদানির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হিসাবে ভুল করিয়াছিল। "সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় আমদানির প্রয়োজনীয়তা কমিশন ঠিকমত উপলব্ধি করিতে পারে নাই।"*

সংকটের কারণ

উপসংহার : দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বৈদেশিক মুদ্রাসংকটকে 'স্বল্পকালীন মূল্যপ্রদান সংক্রান্ত সংকট' (short-term payments crisis) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।** এই সংকট হইতে পরিত্রাণের জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় করিতে হইয়াছিল এবং সাহায্য ও ঋণের জন্য বিভিন্ন মিত্র-ভাবাপন্ন দেশের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় কিন্তু ব্যবহারের মত বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় মোটেই থাকিবে না। সুতরাং ঐ পরিকল্পনায় যাহাতে এই ধরনের

* Third Five Year Plan ১০৯ পৃষ্ঠা

** Lokanathan, India's Foreign Exchange Problem

মূল্যপ্রদান সংক্রান্ত সংকটের উদ্ভব না ঘটে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এ-সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হইতেছে।

পরিকল্পনার দশ বৎসর (Ten Years of Planning): ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পিত উন্নয়ন-প্রচেষ্টার প্রথম দশক শেষ হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এই দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১ সাল) অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গতি, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের একটি প্রাথমিক হিসাব তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত হইয়াছে।*

এই দশ বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী উভয়প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১০,১১০ কোটি টাকায় হিসাব করা হইয়াছে। ইহার উপর আছে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা, বিভিন্ন প্রকার অর্থ-সাহায্য (subsidies) ইত্যাদির জন্য ১৩৫০ কোটি টাকার মত চলতি ব্যয় (current outlays)। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হইয়াছে ১১,৪৬০ কোটি টাকা। নিম্নে এই ব্যয়ের বণ্টন দেখানো হইল :

দশ বৎসরে পরিকল্পনার ব্যয়

(হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	মোট (১৯৫১-৬১)
ক। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয়	১৯৬০	৪৬০০	৬৫৬০
১। চলতি ব্যয়	৪০০	৯৫০	১৩৫০
২। বিনিয়োগ	১৫৬০	৩৬৫০	৫২১০
খ। বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ	১৮০০	৩১০০	৪৯০০
গ। উভয় ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ	৩৩৬০	৬৭৫০	১০১১০
ঘ। উভয় ক্ষেত্রে মোট ব্যয় (চলতি+বিনিয়োগ)	৩৭৬০	৭৭০০	১১৪৬০

উপরি-উক্ত সরকারী ক্ষেত্রের মোট ব্যয় ৬৫৬০ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখানো হইল :

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	ব্যয় বণ্টন
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৮২১
২। সেচ ও শক্তি উৎপাদন	১৪৩৫
৩। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২১৮
৪। শিল্প ও খনিজ	৯৭৪
৫। পরিবহণ ও সংসরণ	১৮২৩
৬। সমাজসেবা ও অন্যান্য	১২৮৯
মোট	৬৫৬০

* Third Five Year Plan Ch. III

পরিকল্পনার দশ বৎসরে সরকারী ক্ষেত্রের ব্যয় কিভাবে নির্বাহ করা হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নের ছকটি দেওয়া হইল :

(হিসাব কোটি টাকায়)

		শতকরা ভাগ
মোট ব্যয়	৬৫৬০	...
আভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫২৮২	৮০
বৈদেশিক সাহায্য	১২৭৮	২০

পরিকল্পনার দশ বৎসরে সম্প্রসারণ একভাবে ঘটে নাই। আন্তর্জাতিক কারণ ও পরিকল্পনা কার্যকরকরণে দোষত্রুটির জন্য কখনও কখনও সম্প্রসারণের গতি বিশেষ ব্যাহত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের অনুমিত বৃদ্ধি ঘটে; অপরদিকে কোন অভাবনীয় প্রতিবন্ধকও দেখা দেয় নাই। ফলে ঐ পরিকল্পনায় মোট জাতীয় আয় অনুমিত শতকরা ১২ ভাগের পরিবর্তে প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য উৎপাদন-লক্ষ্যে (targets of production) মোটামুটি পৌছানো সম্ভব হয়।

প্রথম পরিকল্পনার সফলতা

কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই দেখা দেয় বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যা যাহা ক্রমে সংকটে পরিণত হয়। ইহার উপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে ১৯৫৮ সালে পরিকল্পনার রদবদল ও ছাঁটকাট করিতে হয়।

ছাঁটকাটের দরুন সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মোট ব্যয় ৪৮০০ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৪৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য ৪৫০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়। রদবদল ও ব্যয়হ্রাসের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট জাতীয় আয় অনুমিত শতকরা ২৫ ভাগের পরিবর্তে ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার ১০ বৎসরে (১৯৫১-৬১ সাল) মোট জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় শতকরা ১৬ ভাগের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই।

দশ বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি

প্রথম পরিকল্পনায় অনুমিত কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কিন্তু এ-বিষয়ে লক্ষ্যে পৌছানো যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন; কিন্তু পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন পৌছায় মাত্র ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টনে। অনুরূপভাবে ইস্পাত পিণ্ডের ক্ষেত্রে উৎপাদনক্ষমতা অনুমানমত ৪৫ লক্ষ টনে

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আংশিক অসফলতা

পৌঁছাইলেও প্রকৃত উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টনের অধিক হয় নাই। কয়লার উৎপাদনও উৎপাদন-লক্ষ্য অপেক্ষা ৫৪ লক্ষ টন কম হইয়া মোট ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টনে দাঁড়ায়।

এইভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌঁছানো না গেলেও আশা করা হইতেছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার কিছুদিনের মধ্যেই এই সকল লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হইবে।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য অনুরূপ আশা পোষণ করিতে পারে নাই। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১ কোটি লোকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; পরে উহাকে কমাইয়া ৮০ লক্ষে আনা হয়। এই ৮০ লক্ষ লোকের জন্যই কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রাথমিকভাবে হিসাব করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা মোটেই পর্যাপ্ত নহে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে পরিকল্পনার শেষে ৯০ লক্ষ লোক বেকার থাকিয়া যায়।

পরিকল্পনা কমিশন সুস্পষ্টভাবে স্বীকার না করিলেও দ্রব্যমূল্যরোধে অক্ষমতা হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার অসফলতার আর একটি দিক, সন্দেহ নাই। সমগ্র প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাইকারী সূচকসংখ্যা পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরে শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার সূচকসংখ্যা (working class cost of living index) বৃদ্ধি পায় প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ।* ইহার ফলে পরিকল্পনা কার্যকরকরণে অসুবিধা ত হয়ই, উপরন্তু শিল্প-বিবাদ, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট ইত্যাদির নানারূপ সামাজিক বিক্ষোভও দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই। একথা অবশ্য কমিশন স্বীকার করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উপরি-উক্ত আংশিক অসফলতা সত্ত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা মিলাইয়া সম্প্রসারণের গতি সত্যই প্রশংসনীয়। এই দশ বৎসরে সামগ্রিক কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪১ ভাগ এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৬ ভাগ। ইহা ছাড়া সুসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়, মোট শিল্পোৎপাদনে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের অংশ ১.৫ শতাংশ হইতে ৮.৪ শতাংশে গিয়া দাঁড়ায়। সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে ২ কোটি একরের মত এবং বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে গিয়া দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ ৭৪ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০ কোটি গজে পরিণত হয়, খাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৬৬০ লক্ষ গজের মত এবং সিল্কের উৎপাদন ২৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৩৭ লক্ষ

তবে দশ বৎসরের সম্প্রসারণ সত্যই প্রশংসনীয়

* Third Five Year Plan ১২২-১২৩।

নিম্নে বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির তালিকা দেওয়া হইল :

	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	শতকরা বৃদ্ধি
ক। কৃষি			
খাদ্যশস্য	৫২২ লক্ষ টন	৭৯৩ লক্ষ টন	৫২
তুলা	২৯ " গাঁইট	৫১ " গাঁইট	
পাট	৩৩ " "	৪০ " "	
সেচ-সমন্বিত জমি	৫১৫ " একর	৭০০ " একর	৩৬
নাইট্রোজেন সার ব্যবহার	৫৫ হাজার টন	২৩০ হাজার টন	৩১৮
খ। সমাজোন্নয়ন ও সমবায়			
(কত সংখ্যক গ্রামে সম্প্রসারিত)	———	৩৬৮,০০০	
প্রাথমিক সমিতিসংখ্যা	১০৫,০০০	২১০,০০০	
গ। শিল্প ও খনিজ			
ইস্পাত পিণ্ড	১৪ লক্ষ টন	৩৫ লক্ষ টন	১৫০
কাগজ	১.১৪ " "	৩.৫ " "	
কয়লা	৩২৩ " "	৫৪৬ " "	৬৯
মিলবস্ত্র	৩৭২ কোটি গজ	৫১৩ কোটি গজ	
সিমেণ্ট	২৭ লক্ষ টন	৮৫ লক্ষ টন	
চিনি	১১ " "	৩০ " "	
ঘ। শক্তি			
উৎপাদনক্ষমতা	২৩ লক্ষ কিঃ ওঃ	৫৭ লক্ষ কিঃ ওঃ	১৪৮
কত সংখ্যক গ্রাম ও নগরে যোগান দেওয়া হয়	৩৬৮৭	২৩,০০০	
ঙ। পরিবহণ ও সংসরণ			
রেলপথের মালপত্র বহনের ক্ষমতা	৯১৫ লক্ষ টন	১৫৪০ লক্ষ টন	৬৮
বাণিজ্যিক যানের সংখ্যা	১১৬,০০০	২১০,০০০	৮১
উঁচু রাস্তার পরিমাণ	৯৭,৫০০ মাইল	১৪৪,০০০ মাইল	৪৮
চ : সমাজসেবা			
বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা	২.৩৫ কোটি	৪.৩৫ কোটি	৮৫
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রসংখ্যা	১০,০০০	৩৯,৪০০	
কৃষি-বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা	১৫০০	৫৮০০	
শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা	৫৬,০০০	৭০,০০০	২৫
পরিবার পরিকল্পনা-কেন্দ্র	১৪৭	১৬৪৯	

পাউণ্ডে গিয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭০০ ক্ষুদ্র কারখানা লইয়া ৬০টি শিল্প-উপনিবেশ (industrial estates) গড়িয়া উঠে এবং আরও ৬০টি শিল্প-উপনিবেশের গোড়াপত্তন করা হয়।

পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে উঁচু রাস্তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় প্রায় ৪৬ হাজার মাইল এবং বাণিজ্যিক যানের সংখ্যা হয় দ্বিগুণের কিছু কম; ১১৮০ মাইলের মত নূতন রেলপথ নির্মিত হয়, ১৩০০ মাইল রেলপথে দুইটি করিয়া লাইন পাতা হইবে এবং ৮৮০ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ সমাপ্ত হইবে। ইহাদের সমন্বিত ফলে রেলপথে মালপত্র বহনের ক্ষমতা শতকরা ৯.১৫ কোটি টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫.৪ কোটি টনে গিয়া দাঁড়ায়।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা বহুগুণ প্রসারলাভ করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। গত দশ বৎসরে লোকের গড় জীবনকাল ১০ বৎসরের মত বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the main experiences of the Second Five Year Plan of India. What are the main lessons would you draw from these experiences?

(B. U. (O) 1962) (২৫৬-২৫৭ এবং ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠা)

2. The Second Five Year Plan aimed at rapid industrialisation with particular emphasis on basic and heavy industries. How far do you think this emphasis was justified?

[ইংগিত: কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অতটা শিল্পপ্রসারের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত হয় নাই; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিগত ভিত্তিকে আরও সুসংগঠিত করা উচিত ছিল। কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ না করা যে কতটা ভুল হইয়াছিল তাহা পরিকল্পনা কমিশন শীঘ্রই অনুভব করে: এবং ফলে কৃষিজ উৎপাদনের লক্ষ্য, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য, নূতন করিয়া নির্দিষ্ট হয় এবং ২২৭-২২৮, ২৪৩, ২৫৬-২৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

3. Examine the justification for the relatively greater emphasis placed in the Second Five Year Plan on small-scale industries on the one hand and heavy basic industries on the other, than on the large-scale consumer's goods industries.

(C. U. B. A. 1957)

[ইংগিত: দ্বিতীয় পরিকল্পনার একদিকে মূল ও ভারী শিল্প এবং অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার কারণ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত। এই সকল উদ্দেশ্যের অন্যতম হইল অনুন্নত আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন।

পরিকল্পনা অনুসারে অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে অর্থনৈতিক কাঠামোতে বৈচিত্র্য আনিতে হইবে এবং দ্রুত শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। উপরন্তু, কৃষি ও শিল্প পরস্পরের পরিপূরক। এইজন্যও দ্রুত শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু দ্রুত শিল্পপ্রসার করিতে হইলে মূল ও ভারী শিল্পগুলি গড়িয়া তুলিতে হয়। প্রথম পরিকল্পনার ফলে অর্থ-ব্যবস্থার কৃষিগত কাঠামোতে কতকটা দৃঢ়তা আসায় এই মূল ও ভারী শিল্প গঠনের সময়

আসিয়াছে। অপরদিকে কিন্তু মূল ও ভারী শিল্পগুলিতে নিয়োগের সম্ভাবনা অধিক না থাকায় বর্তমান নিয়োগ-ব্যবস্থার জন্য অধিক শ্রম নিয়োগকারী ক্ষুদ্র পদ্ধতিরও পত্তন করিতে হইবে। মূল ও ভারী শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উপর দৃষ্টি দিলে আর ভোগ্যপণ্য শিল্পের গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।......

(২২৭-২২৯ এবং ২৪৩ পৃষ্ঠা)]

4. Analyse the main differences between India's First and Second Five Year Plans and explain why the Second Plan is facing difficulties which did not appear during the First Plan Period.

(C. U. B. Com. 1959) (২৩৪-২৩৫, ২৪২-২৪৪ এবং ২৪৬-২৫৭ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the scheme of financing the investment in the public sector under the Second Five Year Plan and give your views on the adequacy of the steps taken up till now. (C. U. B. Com. 1958) (২৫২-২৫৩ এবং ২৫৭-২৫৮ পৃষ্ঠা)

6. Indicate the factors which led to the development of a foreign exchange crisis in India during the Second Plan period

(C. U. B. Com. 1968) (৫৯-৪৩ এবং ২৫৯-২৬০ পৃষ্ঠা)

7. "Deficit financing is an effective instrument for financing the Country's economic development." Discuss with reference of India.

(C. U. B. A. 1961) (২৫৩-২৫৬ পৃষ্ঠা)

8. Give a brief estimate of the achievements of the Second Five Year Plan in India. (C. U. B. Com. 1962) (২৬১-২৬৫ পৃষ্ঠা)

9. Give a critical estimate of the achievements of India's First and Second Five Year Plans. (C. U. B. A. 1961 ; B. Com. (P. I) 1962) (২৬১-২৬৫ পৃষ্ঠা)

10. Give a critical estimate of the progress of industrialisation in India since the introduction of the First Five Year Plan. (C. U. B. A. 1962) (২৬৫-২৬৫ পৃষ্ঠা)

একাদশ অধ্যায়

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

(The Third Five Year Plan)

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যভাগ (১৯৫৮ সালের শেষের দিক) হইতেই তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নকার্য সুরু হয় এবং বিবেচনা-সাপেক্ষ খসড়াটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে। এই খসড়া বা পরিকল্পনার রূপরেখা (Draft Outline) পার্লামেণ্ট কর্তৃক সাধারণভাবে অনুমোদিত হয়।

ইহার পর খসড়াটি লইয়া বিভিন্ন মহলে আলাপ-আলোচনা চলে এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council), সঞ্চয়সংগ্রহ

নির্ধারণ কমিটি (Committee on Savings) প্রভৃতি তাহাদের সুপারিশসমূহ পেশ করে। এই সকল সুপারিশ ও অভিমতের ভিত্তিতে যে খসড়া রিপোর্ট (Draft Report) প্রণীত হয় তাহা ১৯৬১ সালের মে-জুন মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পরিকল্পনা-প্রণয়নকার্য পরিসমাপ্ত হয়। ইহার পর পরিকল্পনাটিকে পুস্তকাকারে পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করা হয় ঐ বৎসরেরই ৭ই আগস্ট তারিখে। পরিকল্পনাটি পার্লামেণ্ট কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় ঐ আগস্ট মাসেই।

পরিকল্পনার প্রণয়ন-কার্যের দুইটি দিক

তৃতীয় পরিকল্পনার এই প্রণয়নকার্য সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার দুইটি বিষয় আছে: (১) পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন ও উহার চূড়ান্ত রূপদানের মধ্যে বৎসরাধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছিল; (২) পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে পরিকল্পনাধীন সময় কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে।

প্রস্তাবনাঃ তৃতীয় পরিকল্পনার প্রস্তাবনায় পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য (Objectives of Planned Development) বর্ণনা করা হইয়াছে।

পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

ভারতীয় জনগণকে কাম্য জীবনযাত্রার সুযোগসুবিধা প্রদান করাই হইল উন্নয়ন-ব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য। অবশ্য অন্যান্য দেশও এই উদ্দেশ্যাভিমুখে পরিচালিত। বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এই উদ্দেশ্যসাধন বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু সেই সংগে স্বল্পোন্নত দেশ ও দারিদ্র-প্রপীড়িত জনগণের অস্তিত্বই যে বিশ্বশান্তির পরিপন্থী তাহাও ভুলিলে চলিবে না। অতএব, ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে, বিশ্বশান্তির এবং উহার উপর নির্ভরশীল উন্নয়ন-ব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্যের স্বার্থেই উন্নত দেশগুলিকে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়ন-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের ৪৩ কোটি লোকের জন্য কাম্য জীবনের সুযোগসুবিধা প্রদান করা মোটেই সহজ কাজ নহে, এবং লক্ষ্যে পৌছিতে স্বভাবিকভাবেই দীর্ঘ সময় লাগিবে। তবুও এই লক্ষ্যাভিমুখে চলা এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সংবিধানের নির্দেশ ও সমাজতান্ত্রিকতার ধারণা

ভারতের অর্থনৈতিক লক্ষ্য বহুদিন পূর্বেই নির্ধারিত হয় এবং ইহা স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতিসমূহের (Directive Principles of State Policy) রূপ গ্রহণ করে। এই নির্দেশমূলক নীতি অনুসারে ভারতীয় জনগণের কল্যাণসাধন করা, তাহাদিগকে জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা প্রদান করা, সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণে সম্পদ বণ্টন করা এবং সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহ কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভারত রাষ্ট্রের কর্তব্য। উহার উপর ১৯৫৪ সালে পার্লামেণ্ট

কর্তৃক 'সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা' গঠনের নীতি গৃহীত হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং শান্তির কার্যেই এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করা হইবে।

প্রথম পরিকল্পনার প্রকৃতি

অতি সামান্য উপকরণ ও তদপেক্ষা সামান্য তথ্য লইয়া প্রথম পরিকল্পনা এই লক্ষ্যের সম্মুখীন হয়। 'উহার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের দরুন অর্থ-ব্যবস্থার যে অসমতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা এবং উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির সূচনা করিয়া দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্যে কৃষি, সেচ ও সমাজোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিল্পের গোড়াপত্তন করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হয় এবং ফলে, জনসাধারণ পরিকল্পনায় বিশ্বাসী হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রকৃতি

এই সফলতা, অধিকতর অভিজ্ঞতা ও ব্যাপকতর তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয় ব্যাপকতর, সুদূরপ্রসারী এবং সমাজতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ইহাতে উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়াও কর্মসংস্থান, মূল ও বুনিয়াদি শিল্প গঠন, আর্থিক বৈষম্য হ্রাস প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মোট-কথা, সম্প্রসারণের (growth) গতিবৃদ্ধি ছাড়াও ইহা সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকে দ্বিতীয় পরিকল্পনারই ব্যাপকতর রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উন্নয়ন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ, কাম্য নিয়োগের সুযোগসুবিধার প্রসার এবং জীবন-যাত্রার মান ও কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নই ইহার উদ্দেশ্য। এই উন্নয়ন-ব্যবস্থায় স্বভাবিকভাবেই কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হয়। সংগে সংগেই আবার জনসম্পদের (human resources) পর্যাপ্ত ব্যবহার এবং শিল্পোন্নয়নের প্রতি সম্যক দৃষ্টি না দিলেও চলে না। মূল ও বুনিয়াদি শিল্পের উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ অপরিহার্য এবং সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শ অনুসরণে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র সমবায়িক ভিত্তিতেই গঠন করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া কর-ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে বৈষম্য হ্রাসের প্রচেষ্টাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নয়নের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

স্মরণ রাখিতে হইবে, সমাজতান্ত্রিকতার ধারণার সহিত জড়িত আছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির অনুসরণে গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণের গুরুত্ব অপরিমেয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি প্রভৃতি হইল এই বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যম।

বিকেন্দ্রিকরণের সংগে সংগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংহতিসাধনের

প্রতি দৃষ্টি না দিলে উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয় না। সুতরাং, ইহাও আমাদের পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার

বলা হইয়াছে, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা কাম্য সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের মাধ্যম মাত্র। এই মৌলিক নীতি স্মরণ রাখিয়াই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ রচিত হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of the Third Five Year Plan) : দশ বৎসরের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার ভিত্তিতে রচিত তৃতীয় পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত। বিগত দশ বৎসরে যে-পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনা আগামী ৫ বৎসরের মধ্যেই তাহা সম্ভব করিতে চায়। ইহা সম্ভব হইলে তবেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সার্থকতায় রূপায়িত হইবে।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ

ইহা অবশ্য অতি সহজ কার্য নহে। ইহা সম্ভব করিতে হইলে আমাদের শক্তি ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে, অতিরিক্ত ভার বহন করিতে হইবে। তবুও ক্ষুদ্রতর পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা যায় না, কারণ জনসাধারণকে জীবনযাত্রার সাধারণ উপকরণের জন্য আর অপেক্ষা করিতে বলা চলে না।

পরিকল্পনার বৃহত্তর আকার ও মহত্তর লক্ষ্য

বিগত ১০ বৎসরে বর্ধিত শতকরা ৪২ ভাগ জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় পরিকল্পনা কলাকৌশলগত পরিবর্তনকে (technological change) আরও দূরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা সমাজসেবা বা 'জনগণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে'রও (investment in man) যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছে। পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত পাঁচটি মুখ্য উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে।*

পাঁচটি মুখ্য উদ্দেশ্য

১। পরিকল্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক ৫% বা তাহার কিছু অধিক হারে (প্রায় ৬% হারে) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন করা এবং পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে যেন ঐ হার বজায় থাকে সেই পরিমাণ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা ;

২। খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং শিল্প ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজনমত কৃষিজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা ;

৩। যাহাতে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দেশের অভ্যন্তরেই পাওয়া যায় তাহার জন্য ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, শিল্প-যন্ত্রপাতি, শক্তি ও জ্বালানির উৎপাদন প্রয়োজনীয় পরিমাণে সম্প্রসারিত করা ;

৪। যথাসম্ভব দেশের জনশক্তির (manpower resources) সদ্ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধার (employment opportunities) বৃদ্ধিসাধন করা ;

* **Third Five Year Plan Ch. IV**

৫। আর্থিক বৈষম্য বেশ কিছুটা দূর করিয়া সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের পথে আরও একপদ অগ্রসর হওয়া।

মূল বৈশিষ্ট্য (Chief Features) : উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার জন্য সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় ৮০০০ কোটি টাকার অধিক এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় ৪১০০ কোটি টাকা* হইবে হিসাব করা হইয়াছে। সুতরাং মোট প্রয়োজনীয় ব্যয়ের (total cost) পরিমাণ হইল ১২,১০০ কোটি টাকার অধিক। কিন্তু বর্তমানের আর্থিক সংগতি অনুসারে বরাদ্দ করা হইয়াছে মাত্র ১১,৬০০ কোটি টাকা। সুতরাং মোট কার্যক্রমের ব্যয় এবং মোট বরাদ্দের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার উপর পার্থক্য রাখা হইয়াছে। পূর্ববর্তী পরিকল্পনা দুইটিতে এইরূপ করা হয় নাই।

১। মোট প্রয়োজনীয় ব্যয় ও ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে পার্থক্য

এইরূপ পার্থক্য রাখিবার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে উৎপাদন ও উন্নয়নের লক্ষ্যকে পরিকল্পনার সূচনায় অনুমিত অর্থসংস্থানের সম্ভাবনা দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা ভুল, কারণ দেখা গিয়াছে পরিকল্পনা চালু হইবার পর অনেক সময় অর্থসংস্থানের নূতন নূতন সুযোগসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়।**

উপরি-উক্ত বরাদ্দ ব্যয় ১১,৬০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০,৪০০ কোটি টাকা হইল বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure) এবং বাকী ১২০০ কোটি টাকা হইল চলতি-ব্যয় (current outlay)। সরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ৬৩০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের ৪১০০ কোটি টাকা (সরকারী ক্ষেত্রে হইল ২০০ কোটি টাকা হস্তান্তর বাদ দিয়া)।

তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হইল আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ (self-sustaining growth)। এই লক্ষ্যে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পৌছাইতে হইলে জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির হারকে ত্বরান্বিত করিতে হইবে। গত দশ বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে বাৎসরিক উৎপাদনবৃদ্ধির হার শতকরা ৪ ভাগের কিছুটা কম হইয়াছে। এই বৃদ্ধির হারকে বর্তমান প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া ধরা যায় না। জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিয়া জাতীয় আয় হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইলে

২। জাতীয় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন

* সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হইতে যে ২০০ কোটি টাকা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত হইবে তাহা বাদ দিয়া ৪১০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

** Third Five Year Plan ৫৭ পৃষ্ঠা

জাতীয় উৎপাদনকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই পন্থা অবলম্বন ব্যতীত আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ং-পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না। এই কারণেই বাৎসরিক শতকরা ৫ ভাগের অধিক হারে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির লক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এই হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগের বেশী বিনিয়োগ করিতে হইবে। জাতীয় আয় হইতে বর্তমান বিনিয়োগের হার হইল শতকরা ১১·৫ ভাগের মত। স্বাভাবিকভাবেই উহাকে বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়কেও বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরিকল্পনা অনুসারে সঞ্চয়ের হার বর্তমান শতকরা ৮·৫ ভাগ হইতে বৃদ্ধি করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনান্তে শতকরা প্রায় ১১·৫ ভাগে লইয়া যাইতে হইবে। এই আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের সহিত কিছুটা বৈদেশিক সাহায্য যোগ করিয়াই পরিকল্পনায় বিনিয়োগের প্রয়োজন মিটানো হইবে।

আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন-পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে

আবার আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ নিশ্চিত করিতে হইলে বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনার অগ্রাধিকার এমনভাবে স্থির করিতে হইবে যেন বর্তমান প্রয়োজন মিটাইয়া ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-প্রচেষ্টা বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীতই হইতে পারে। অর্থাৎ, আত্মনির্ভরশীল অর্থ-ব্যবস্থায় নিজস্ব সম্পদ হইতে সম্প্রসারণের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে।* এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও দুইটি লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। এই দুইটি লক্ষ্যের একটি হইল কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি—বিশেষত খাদ্যশস্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন। ইহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ শিল্পায়ন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি-বৃদ্ধির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য শিল্পজাত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শক্তিবৃদ্ধি।

৩। আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান

যে-দেশে প্রতি দশজন লোকের মধ্যে প্রায় সাতজন কৃষিকার্য করিয়া জীবনযাপন করে এবং যেখানে কৃষি ও অনুরূপ কার্য হইতে জাতীয় আয়ের অর্ধাংশ অর্জিত হয়, সে-দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষি যে অগ্রাধিকার পাইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। প্রথমেই খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা দেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

খাদ্যোৎপাদন শতকরা প্রায় ৪ ভাগের মত প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির হার ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নয়। গত ৫ বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর ভারতকে ৩০ লক্ষ টন করিয়া খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে। আগামী পাঁচ বৎসরে জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খাদ্যের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াই চলিবে। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মনে রাখিয়াই আগামী পাঁচ বৎসরে কৃষি-উৎপাদনের হারকে দ্বিগুণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

* "A self-reliant economy means one that can sustain an adequate rate of growth basically from its own resources." V. T. Krishnamachari

করা হইয়াছে। খাদ্যশস্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রাপ্ত হইলেও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধিও আশু প্রয়োজন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ভারতেকে ঐ সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইতেছে। যেমন, আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হইতে তুলার প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। ইহা ব্যতীত রপ্তানির সাহায্যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে হইলে চা পাট তৈলবীজ তুলা প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বস্তুত, আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের জন্যই কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা প্রয়োজন। ভারতের ন্যায় দেশে যদি জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য যোগাইতে না পারে তবে আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি কখনই প্রস্তুত হইতে পারে না।

অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি

আবার দ্রুত অর্থনৈতিক প্রসার সম্ভব করিতে হইলে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইলে এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিতে হইলে ভারতে মূল শিল্প—যেমন, ইস্পাত, জ্বালানি, বৈদ্যুতিক শক্তি, রসায়ন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পের প্রসার করিতে হইবে। মোটকথা, এই সকল শিল্পের প্রসার ভিন্ন ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থা স্বয়ং-পরিচালিত ও আত্মনির্ভরশীল অবস্থার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে না। এই কারণেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার মত তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সকল শিল্পের প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সংগে সংগে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যে যাহাতে ভোগ্যপণ্য ও সাধারণ মূলধন-দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে। গত কয়েক বৎসরে দেখা গিয়াছে যে ভারতকে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানির জন্য বেশ কিছু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় এবং বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যেমন ইস্পাত, রেল ও বৈদ্যুতিক শক্তির যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি বিশেষভাবে আমদানি করিতে হইয়াছে। আগামী পাঁচ বৎসরেও এই সকল দ্রব্যের আমদানির প্রয়োজন থাকিবে। কিন্তু দেশের মধ্যে উপরি-উক্ত শিল্পগুলি ক্রমশ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিতে থাকিবে। ইহার ফলে শুধু আভ্যন্তরীণ শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়সংক্ষেপই হইবে না, রপ্তানিযোগ্য শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হইবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেরও সুযোগ দেখা দিবে।

৪। আত্মনির্ভরশীল মূল শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান

তৃতীয় পরিকল্পনার অপর একটি লক্ষ্য হইল কর্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধি। দুইটি পরিকল্পনা কার্যকর করা সত্ত্বেও বেকারত্বের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। যখন দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয় তখন ৫৩ লক্ষের মত লোক বেকার ছিল। হিসাব করা হইয়াছে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে ৯০ লক্ষ লোক কর্মহীন অবস্থায় ছিল।

ইহা ব্যতীত বহু লোক অর্ধ-বেকার অবস্থায় জীবন কাটাইতেছে। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবের ভিত্তিতে ধরা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার সময় ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক নূতন করিয়া কর্মপ্রার্থী হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে তৃতীয় পরিকল্পনার সময় মোট ২ কোটি ৬০ লক্ষের মত লোক কর্মপ্রার্থী হইবে। পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে যাহাতে কর্মের সুযোগ সম্প্রসারিত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিকল্পনার কর্মসূচীকে কার্যকর করিতে হইবে। যে-সকল ক্ষেত্রে জনবল অধিক নিয়োগের সুযোগ রহিয়াছে সে-সকল দিকের প্রসার প্রথমেই করিতে হইবে। অধিক শ্রম-নিয়োগকারী প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকেও সম্প্রসারিত করিতে হইবে। ব্যাপকভাবে গ্রামীণ কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া কর্মের সুযোগ বাড়াইতে হইবে। বর্তমান হিসাব অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মারফত ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে। ইহা ছাড়া গ্রামীণ কর্মসূচীর গ্রহণের ফলে আরও ২৫ লক্ষের মত লোক গ্রামাঞ্চলে নিয়োগের সুযোগ পাইবে। যাহা হউক, তৃতীয় পরিকল্পনা অন্তেও বহুলোক বেকার অবস্থায় থাকিয়া যাইবে।

৫। নিয়োগবৃদ্ধি তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য

তৃতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে কি কি পরিমাণ উৎপাদন ও উন্নয়ন আশা করা যায়—তাহার মোটামুটি হিসাবও তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত হইয়াছে।*

৬। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য

জনসম্পদের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হইবে না। এইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষ অনুমান অনুসারে ১৯৬৬ সালে জনসংখ্যা ৪৯ কোটির উপরে এবং ১৯৭১ ও ১৯৭৬ সালে যথাক্রমে ৫৫·৫ কোটি এবং ৬২·৫ কোটিতে দাঁড়াইবে। জনসংখ্যার এইরূপ বৃদ্ধি কতকটা রোধ করিতে না পারিলে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা কোনমতেই সফল হইবে না। এইজন্যই তৃতীয় পরিকল্পনা হইতে পরিবার-পরিকল্পনার ব্যাপকতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

৭। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতর ব্যবস্থা

সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজগঠনের উদ্দেশ্য গতিশীল করের বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র শিল্পে সংগঠন, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি চিরাচরিত ব্যবস্থা ছাড়াও সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন (institutional changes) সাধন করা হইবে। ইহাদের মধ্যে পঞ্চায়েত ও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার পুনর্গঠনই হইল সর্বপ্রধান।

৮। সমাজতান্ত্রিকতার রূপায়ণ

* **Third Five Year Plan** ২৮-২৯ পৃষ্ঠা

সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজগঠনের আর একটি উপাদান হইল নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন। অর্থাৎ, গ্রামবাসীরা যাহাতে নগরবাসীদের মতই জীবন উপভোগ করিতে পারে তাহা দেখা। এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় ন্যূনতম সমাজসেবার (minimum social services) ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাদের মধ্যে আছে পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি। মোটামুটিভাবে কোন গ্রামই ইহাদের সুযোগসুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না। ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হইবে তাহা হইতেও গ্রামবাসীরা উপকৃত হইবে। এইভাবে শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত হইলে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

৯। নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য

তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও সমতা আনয়নের প্রচেষ্টা করা হইবে। যে-সকল অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত তাহাদের উন্নয়নের অধিক প্রচেষ্টা করা হইবে।

১০। আঞ্চলিক সমতা

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বিশেষ ব্যাহত করিয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও যাহাতে এইরূপ না ঘটে তাহার জন্য দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের (price stabilisation) ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে বাজেট-ঘাটতি যথাসম্ভব পরিহার করা ছাড়াও ঋণ-সৃজন (credit creation) নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় মাত্র ৫৫০ কোটি টাকা ঘাটতি-ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১১। দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণ

ব্যয় বরাদ্দ ও ব্যয় বণ্টন (Financial Provisions and Distribution of Outlay): পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১২,১০০ কোটি টাকার কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ১১,৬০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় হইল ৭৫০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৪১০০ কোটি টাকা (সরকারী ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ২০০ কোটি টাকা হস্তান্তর বাদ দিয়া)। সরকারী ক্ষেত্রের ব্যয় বণ্টন হইল নিম্নলিখিত রূপ:

সরকারী ক্ষেত্রের ব্যয় বণ্টন

কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	১০৬৮	কোটি	টাকা
সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১৬৬২	"	"
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪	"	"
সংগঠিত শিল্প ও খনিজ	১৫২০	"	"
পরিবহণ ও সংসরণ	১৪৮৬	"	"
সমাজসেবা	১৩০০	"	"
অন্যান্য	২০০	"	"
মোট	৭৫০০	কোটি	টাকা

বলা হইয়াছে এই ৭৫০০ কোটি টাকার মধ্যে বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure) এবং চলতি ব্যয় (current outlay) হইল যথাক্রমে ৬৩০০ কোটি এবং ১২০০ কোটি টাকা। এই ৭৫০০ কোটি টাকার মধ্য হইতেই বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২০০ কোটি টাকা হস্তান্তরিত হইবে। ফলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মোট ব্যয় দাঁড়াইবে ৪৩০০ (৪১০০+২০০) কোটি টাকা। এই ব্যয়ের সমস্তটাই হইল বিনিয়োগ-ব্যয়। নিম্নে ইহার বণ্টন প্রকৃতি দেখানো হইল :

বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যয় বণ্টন

কৃষি ও সেচ	৮৫০ কোটি টাকা
শক্তি	৫০ ” ”
পরিবহণ	২৫০ ” ”
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৩২৫ ” ”
সংগঠিত শিল্প ও খনিজ	১১০০ ” ”
গৃহনির্মাণ ইত্যাদি	১১২৫ ” ”
অন্যান্য	৬০০ ” ”
মোট	৪৩০০ ” ”

তিনটি পরিকল্পনার বরাদ্দের মধ্যে তুলনা (Comparison of the Three Plans in respect of Outlay) : নিম্নে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দের সহিত তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক ব্যয় বরাদ্দ দেখানো হইল।

(হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	মোট (প্রথম+দ্বিতীয় পরিকল্পনা)	তৃতীয় পরিকল্পনা
ক। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় (বিনিয়োগ-ব্যয়+চলতি ব্যয়)	১৯৬০	৪৬০০	৬৫৬০	৭৫০০
খ। বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় (বিনিয়োগ-ব্যয়)	১৮০০	৩৩০০	৫১০০	৪১০০*
গ। উভয় ক্ষেত্রে মোট ব্যয় (চলতি+বিনিয়োগ)	৩৭৬০	৭৯০০	১১,৬৬০	১১,৬০০

উন্নয়নের গতি ও উৎপাদনের লক্ষ্য (Development Trends and Targets of Production) : তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়ন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে-সকল লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

১। জাতীয় আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ এবং মাথাপিছু আয়ের শতকরা

* সরকারী ক্ষেত্র হইতে ২০০ কোটি টাকা হস্তান্তর বাদ দিয়া।

১৭ ভাগ বৃদ্ধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফলে জাতীয় আয় ১৪,৫০০ কোটি টাকা (১৯৬০-৬১ সালের দামের হিসাবে) হইতে ১৯,০০০ কোটি টাকায় এবং মাথা-পিছু আয় ৩৩০ টাকা হইতে ৩৮৫ টাকায় পরিণত হইবে।

২। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭·৬* কোটি টন হইতে ১০ কোটি টনে দাঁড়াইবে। শতাংশের হিসাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩২% এবং অন্যান্য শস্যের উৎপাদন ৩০% বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

৩। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইবে এবং পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষি-সম্প্রসারণের (agricultural extension) ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

৪। সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ ৭ কোটি একর হইতে ৯ কোটি একরে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ১ কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াটে পৌঁছিবে।

৫। শিল্পক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৭০% এবং বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের (public sector) অংশ সমগ্রের এক-দশমাংশ হইতে এক-চতুর্থাংশে দাঁড়াইবে।

৬। পরিকল্পনায় খনিজ উৎপাদনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কয়লার উৎপাদন ৭৬% বৃদ্ধি ছাড়াও লৌহ-আকর, তাম্র ও খনিজ তৈলের উৎপাদনের উপর যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

৭। পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে রেলপথের মালপত্র বহনের ক্ষমতার ৫৯% বৃদ্ধি এবং জাহাজী ক্ষমতার ২১% বৃদ্ধির আশা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ২০ বৎসরের (১৯৬১-৮১) পরিকল্পনানুযায়ী রাজপথেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

৮। সমাজসেবার ক্ষেত্রে ৬-১১ বৎসর বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন ও অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৪৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। জনসম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার এবং শিল্প ও কৃষির সম্যক উন্নয়নের জন্য কারিগরি শিক্ষারও যথেষ্ট প্রসার ঘটিবে। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হইবে এবং বসন্ত, যক্ষ্মা ও কলেরা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ এবং হাসপাতালে বিছানার সংখ্যা প্রায় ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

৯। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও নগরিকরণের (urbanisation) দরুন পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইবে। গ্রামীণ গৃহনির্মাণ পরিকল্পনাকে (rural housing scheme) সমাজোন্নয়নের সহিত সংযুক্ত করা হইবে এবং

* চূড়ান্ত হিসাব ১৯৬০-৬১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭·৯৭ কোটি টন বলিয়া ধরা হইয়াছে। ২৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

অনেকগুলি সহরে নগরোন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করা হইবে। কলিকাতা মহানগরীর উন্নয়নের জন্য ২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

১০। ব্যক্তিগত ভোগের ক্ষেত্রে বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ বাৎসরিক ১৫'৫ গজ হইতে ১৭'২ গজে দাঁড়াইবে এবং খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্য ২১০০ হইতে ২৩০০-এ পৌছাইবে।

১১। পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ এবং কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে ১ কোটি ৫ লক্ষ —এই মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

নিম্নে প্রধান প্রধান উৎপাদন ও উন্নয়ন লক্ষ্যের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল :

	হিসাবের একক	১৯৬০-৬১ সালের উৎপাদন	১৯৬৫-৬৬ সালের উৎপাদন	শতাংশ বৃদ্ধি
খাদ্যশস্য	লক্ষ টন	৭৬০*	১০০০	৩২
তৈলবীজ	" "	৭১	৯৮	৩৮
ইক্ষু (গুড়)	" "	৮০	১০০	২৫
তুলা	লক্ষ গাঁইট	৫১	৭০	৩৭
পাট	" "	৪০	৬২	৫৫
চা	লক্ষ পাউণ্ড	৭২৫০	৯০০০	২৪
ইস্পাত পিণ্ড	লক্ষ টন	৩৫	৯২	১৬৩
পেট্রোলিয়াম	" "	৫৭	৯৯	৭৪
সিমেণ্ট	" "	৮৫	১৩০	৫৩
কয়লা	" "	৫৪৬	৯৭০	৭৬
লৌহ-আকর	" "	১০৭	৩০০	১৮০
মিলবস্ত্র	কোটি গজ	৫১২	৫৮০	১৩
চিনি	লক্ষ টন	৩০	৩৫	১৭
কাগজ	" "	৩'৫	৭	১০০
রেলপথ কর্তৃক মালপত্র বহন	" "	১৫৪০	২৪৫০	৫৯
জাহাজী ক্ষমতা	" "	৯	১১	২১
মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যগ্রহণ ক্যালোরি-মূল্য		২১০০	২৩০০	১০
মাথাপিছু বাৎসরিক বস্ত্র ব্যবহার	গজ	১৫'৫	১৭'২	১১

কর্মসংস্থান, আয় ও ভোগ (Employment, Income and Consumption) : বলা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের আশা করা হইয়াছে। পরিকল্পনায় মোট নিয়োগপ্রার্থীর

* চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় উৎপাদন হইয়াছিল ৭৯৩ লক্ষ টন।

সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লক্ষের মত দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং পরিকল্পনার শেষেও ১ কোটি ২০ লক্ষের মত বেকার থাকিয়া যাইবে। ইহার উপর আছে বিপুল সংখ্যক (১'৫ কোটি হইতে ১'৮ কোটি) অর্ধনিযুক্ত (underemployed) ব্যক্তি। ইহাদের জন্য বিশেষ নির্মাণকার্যের (special works projects) প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার ফলে পরিকল্পনা শেষে ২৫ লক্ষের মত লোক বৎসরে ১০০ দিনের অতিরিক্ত কাজ পাইবে।

পরিকল্পনা কর্ম-সংস্থানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে পারে নাই

তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রণীত হইয়াছে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। আশা করা হইয়াছে, কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণের ফলে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগে পৌছিবে।*

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান

তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩০% জাতীয় আয় এবং ১৭% মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির আশা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে জাতীয় আয় ১৪,৫০০ কোটি টাকা হইতে ১৯,০০০ কোটি টাকায় এবং মাথাপিছু আয় ৩৩০ টাকা হইতে ৩৮৫ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। জাতীয় আয়ের এই পরিমাণবৃদ্ধি সংঘটিত করিবার জন্য নীট বিনিয়োগের হারকে বর্তমান (১৯৬০-৬১) ১১% হইতে ১৪-১৫%-এ লইয়া যাইতে হইবে, এবং ইহার জন্য জাতীয় আয়ের অনুপাতে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হারকে ৮'৫% হইতে ১১'৫%-এ এবং করপ্রদানের অনুপাতকে ৮'৯% হইতে ১১'৪%-এ লইয়া যাইতে হইবে। ফলে এই পরিকল্পনায় বিনিয়োগের কিছুটা অংশ বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা সংঘটিত হইলেও ভোগের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে না। বস্তুত, পরিকল্পনায় বিনিয়োগের প্রয়োজনে ভোগকে যে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে তাহা বারবার বলা হইয়াছে।**

আয় অপেক্ষা ভোগ কম বৃদ্ধি পাইবে

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় মাথাপিছু আয় আরও বৃদ্ধি পাইবে সত্য, কিন্তু বিনিয়োগ-ব্যবস্থার সমগ্রটাই মোটামুটি আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতেই করিতে হইবে। সুতরাং পঞ্চম পরিকল্পনাতেও ব্যক্তিগত ভোগের বিশেষ বৃদ্ধি আশা করা যায় না।

অর্থসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা (Financing and Foreign Exchange): তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ ব্যয় ৭৫০০ কোটি টাকার সংস্থান পরবর্তী পৃষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হইল:

* Third Five Year Plan ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠা

** Third Five Year Plan ৯১, ৯৯-১০০ প্রভৃতি পৃষ্ঠা

		দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা
১।	চলতি হারে বর্তমান কর-রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত	–৫০ কোটি টাকা	৫৫০ কোটি টাকা
২।	রেলপথ প্রদত্ত অর্থ	১৫০ ,, ,,	১০০ ,, ,,
৩।	অন্যান্য সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাভ	...	৪৫০ ,, ,,
৪।	সাধারণের নিকট হইতে ঋণ	৭৮০ ,, ,,	৮০০ ,, ,,
৫।	স্বল্প সঞ্চয়	৪০০ ,, ,,	৬০০ ,, ,,
৬।	প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি	২৩০ ,, ,,	৫৪০ ,, ,,
৭।	নূতন কর ইত্যাদি	১০৫২ ,, ,,	১৭১০ ,, ,,
৮।	বৈদেশিক সাহায্যের যে অংশ সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের কার্যক্রমের জন্য পাওয়া যাইবে	১০৯০ ,, ,,	২২০০ ,, ,,
৯।	ঘাটতি ব্যয়	৯৪৮ ,, ,,	৫৫০ ,, ,,
	মোট	৪৬০০ কোটি টাকা	৭৫০০ কোটি টাকা

হিসাবটি হইতে দেখা যাইবে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলপথ ও ঘাটতি ব্যয় ছাড়া অন্যান্য সকল সূত্র হইতেই অধিক অর্থসংস্থানের আশা করা হইয়াছে। রেলপথ হইতে অধিক অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে রেলপথের নিজস্ব সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হইত। এইজন্যই ইহা করা হয় নাই। তবে আশা করা হইয়াছে, যাত্রী ও মালপত্রের মাসুলের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা রেলপথসমূহ আরও কিছু অর্থ প্রদান করিতে সমর্থ হইতে পারে।

ঘাটতি ব্যয় দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় অত কম ধার্য করিবার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার ন্যায় বৈদেশিক মুদ্রাসংগতি আর না থাকায় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে দ্রব্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে ন্যূনতম ঘাটতি ব্যয়ের সিদ্ধান্তই করা হইয়াছে। তবে পরিকল্পনার প্রতি বৎসরেই ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক ঋণ-সৃজনের পরিমাণ ও অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণশীলতা বিচার করিয়া সম্ভব হইলে পরে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে।*

ঘাটতি ব্যয়

নূতন বা অতিরিক্ত করের পরিমাণ হইবে ১৭১০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ১১০০ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলিকে ৬১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার করেরই পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং রাজ্যসমূহকে বিক্রয়কর (Sales Tax) প্রভৃতির ন্যায় স্থিতিস্থাপক সূত্রের উপর নির্ভর

অতিরিক্ত কর

* **Third Five Year Plan** ১০০ পৃষ্ঠা

করা ছাড়াও গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। অতএব, গ্রামাঞ্চলের করভারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

আভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থানের কোন ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি পড়িলে অন্যান্য দিকে বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা তাহা পূরণ করা হয়ত কঠিন হইবে না। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রাসংস্থানের সমস্যাটি অত সহজ নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট লেনদেন ঘাটতি হয় ২১০০ কোটি টাকা বা অনুমিত ঘাটতির (১১০০ কোটি টাকা) প্রায় দ্বিগুণ।

বৈদেশিক মুদ্রা

এই ঘাটতি মিটাইতেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় একরূপ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সূত্র হইতে আর কিছু পাওয়া যাইবে না। সুতরাং পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে রপ্তানি প্রসার ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পরিকল্পনায়' ১০,৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ-ব্যয়ের জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ২১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আমদানির প্রয়োজন দাঁড়াইবে কমপক্ষে ৩৬৫০ কোটি টাকার মত। ইহা ছাড়া মূলধন খাতে ৫৫০ কোটি টাকা দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে। অতএব, পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ৬৩০০ (২১০০+৩৬৫০+৫৫০) কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের প্রয়োজন হইবে। আশা করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে রপ্তানি দ্বারা ৩৭০০ কোটি টাকা অর্জন করা হইবে এবং বাকী ২৬০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য হইতে মিটাইতে হইবে। মোট বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে ৩২০০ কোটি টাকার মত—৬০০ কোটি টাকা মার্কিন পাবলিক ল ৪৮০ (P. L. 480) অধীনে আমদানি হইতে এবং বাকী ২৬০০ কোটি টাকা অন্যান্য সূত্র হইতে।

পরিকল্পনার সফলতার সর্তাবলী (Conditions of Success of the Plan): উপরি-উক্ত সমালোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে ব্যাপকতর ও উচ্চাকাংক্ষাসম্পন্ন পরিকল্পনার সাফল্য কয়েকটি সর্ত পূরণের উপর নির্ভরশীল—যথা, লক্ষ্যমত বা তদপেক্ষা রপ্তানি প্রসার, মূল্য স্থিতিকরণ (price stabilisation), নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়সংগ্রহ, সরকারী ব্যবসাবাণিজ্য হইতে যথাসম্ভব মুনাফা করা, উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, নির্মাণকার্যের যথাসম্ভব ব্যয় হ্রাস এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। এইগুলির কোনটিই সহজসাধ্য কার্য নহে। সমালোচকদের মতে, এইগুলির কোনটির উপরই সম্যক দৃষ্টি পরিকল্পনায় দেওয়া হয় নাই।*

সমালোচনা: উপরি-উক্ত বিষয় ছাড়াও অন্যান্য দিক হইতে পরিকল্পনার সমালোচনা করা হইয়াছে। অনেকে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কি করিয়া এইরূপ উচ্চাকাংক্ষাসম্পন্ন ও ব্যাপক পরিকল্পনা রচিত হইল তাহা অনুধাবন করা কঠিন। আরও বলা হইয়াছে যে মোট প্রয়োজনীয় ব্যয় (total costs) এবং সম্ভাব্য

* K. N. Raj, The Third Plan

অর্থসংস্থানের মধ্যে যে ফাঁক রাখা হইয়াছে তাহা ঠিক হয় নাই। সম্ভাব্য অর্থসংস্থানের ভিত্তিতেই পরিকল্পনা রচিত হওয়া উচিত ছিল। তৃতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রাসংস্থানের যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা ত্রুটিপূর্ণ। বিগত দশকের (১৯৫০-৬০ সাল) মধ্যে যখন পৃথিবীর বাণিজ্যে ভারতের অংশ ২'১% হইতে কমিয়া ১'১%-এ দাঁড়াইয়াছে তখন ৩৭০০ কোটি টাকার মত রপ্তানির আশা করা যায় কিরূপে?* চতুর্থত, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের উপর যে-গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেখা গিয়াছে যে অনুমান অপেক্ষা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে 'বিনিয়োগ' হ্রাস এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে 'বিনিয়োগ' বৃদ্ধি পাইয়াছে। পঞ্চমত, করভার বৃদ্ধির যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা জনসাধারণ সহ্য করিতে পারিবে না। উপরন্তু, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার রূপায়ণ এবং পরোক্ষ ও গ্রামাঞ্চলের করবৃদ্ধি পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ নহে। পরিশেষে, মূল্য স্থিতিকরণ নীতি, যাহা পরিকল্পনার সাফল্যের অন্যতম অপরিহার্য সর্ত, মোটেই সুনির্ধারিত হয় নাই। হয়ত ইহার জন্যই পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে। কর্তৃপক্ষ মহল হইতে অন্যগুলি না হইলেও অন্তত এই শেষের অভিযোগটি স্বীকার করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসর (First Two Years of the Third Plan): ১৯৬৩ সালের মে মাসে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরের (১৯৬১-৬৩ সাল) অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হয়। বিবরণী অনুসারে প্রথম দুই বৎসরে পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৫৯২ (১১১২+১৪৮০) কোটি টাকা। ইহা ছাড়া প্রথম বৎসরে সমাজসেবা ইত্যাদি খাতে পরিকল্পনা-বহির্ভূত উন্নয়ন-ব্যয় (development outlays outside the Plan) হয় ১৪০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে (১৯৬৩-৬৪ সাল) শুধু পরিকল্পনারই ব্যয় (Plan Outlay) দ্বিতীয় বৎসরের তুলনায় ১৭০ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়া ১৬৫০ কোটি টাকার কিছু বেশী হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ব্যয়

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে মোট শিল্পজ দ্রব্য উৎপাদন ১৫% বৃদ্ধি পায়। ইহার মধ্যে নির্মিত ইস্পাতের উৎপাদন ২২ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। সিমেন্টের উৎপাদন হয় ৭৮ লক্ষ টন হইতে ৮৭ লক্ষ টন। কয়লার উৎপাদন প্রথম বৎসরে ৩ লক্ষ টনের মত (৫'৫৫ কোটি টন হইতে ৫'৫২ কোটি টনে) হ্রাস পাইলেও পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে (১৯৬২-৬৩ সাল) উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। তৃতীয় বৎসরে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

শিল্পজ উৎপাদন

এই প্রকৃত উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়াও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে

* **Asoka Mehta, A Socialist Critique of the Third Plan**

এ্যালুমিনিয়ম, শিল্প-যন্ত্রপাতি, সার, সিমেণ্ট প্রভৃতি শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা (installed capacity) বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনকার্য বহুদূর অগ্রসর হয়। সরকারী উদ্যোগাধীন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির নির্মাণকার্য শেষ হইয়া সম্প্রসারণের কার্য সুরু হয়। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা অধিক উদ্যম পরিলক্ষিত হয়।

পরিবহণ ও সংসরণ

পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রেলপথের বেলায় দেখা যায় যে বাৎসরিক ওয়াগন নির্মাণের সংখ্যা ১২ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ হাজারের উপরে দাঁড়াইয়াছে, মালপত্র বহনের পরিমাণ ১৫৪০ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৩০ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে এবং ৫২৪ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। পরিকল্পনার এই প্রথম দুই বৎসরেই রেলপথসমূহের উন্নয়নের জন্য ৪১৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। রেল পরিবহণের জন্য পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ১৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়। এই দুই বৎসরে পথ পরিবহণের উন্নয়নের জন্য ১৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে পশ্চিমবংগ, বিহার ও আসামের কয়েকটি জাতীয় সড়কের উন্নয়নের অতিরিক্ত কার্য সুরু হয়।

বৈদ্যুতিক শক্তি

শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ২২%। ইহার ফলে ৭৯০০-র মত নূতন গ্রাম ও সহরের বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব হয়। পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে আরও অধিকসংখ্যক গ্রাম ও সহর বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাইবে।

সেচ-ব্যবস্থা

বৃহৎ, মাঝারি ও ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার দ্বারা সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ প্রথম বৎসরে বৃদ্ধি পায় মোট ৩২ লক্ষ একরের মত। দ্বিতীয় বৎসরে বৃদ্ধির পরিমাণ ইহাকেও ছাড়াইয়া ৪৪ লক্ষ একরের মত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য কৃষিজ উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। প্রথম দুই বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় একরূপই ছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ টন। ১৯৬১-৬২ সালে উহা ৩ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। পরবর্তী বৎসরে আবার উহা ৪ লক্ষ টনে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

সমবায়

১৯৬০-৬১ সালে সমবায়িক ঋণপ্রদানের পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকা। ১৯৬১-৬২ সালে উহা ২৫৬ কোটি টাকায় পৌঁছায়। ১৯৬২-৬৩ সালে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৩০০ কোটি টাকা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

সমাজসেবা

শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীসংখ্যার বহু-পরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়াও জাতীয় বৃত্তি (national scholarships), কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতির অভূতপূর্ব প্রসার দেখা যায়।

পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে ৪০ লক্ষ নূতন কর্মপ্রার্থীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই গ্রামীণ অর্ধ-বেকারত্বের বিরুদ্ধে দুইটি নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। প্রথম ব্যবস্থাটি অনুসারে উন্নয়ন-ব্লকসমূহে ব্যাপক গ্রামীণ নির্মাণকার্য (rural works) সুরু হয়, এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি অনুসারে পাইলট কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পসমূহের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

কর্মসংস্থান

এইভাবে শিল্প, কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি সকলের সম্প্রসারণ ঘটিলেও জাতীয় আয়ের কিন্তু অনুমিত বৃদ্ধি ঘটে নাই। ১৯৬২-৬৩ সালের একটি সরকারী হিসাব অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটে মাত্র শতকরা ২'১ ভাগ।*

জাতীয় আয়

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে কোন্ কোন্ খাতে কত ব্যয় হইয়াছে এবং তৃতীয় বৎসরে (১৯৬৩-৬৪ সাল) উহাদের পরিমাণ কত হইবে তাহার একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :**

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়নের ক্ষেত্র	পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ	১৯৬১-৬২ প্রকৃত ব্যয়	১৯৬২-৬৩ অনুমিত ব্যয়	১৯৬৩-৬৪ পরিকল্পিত ব্যয়	প্রথম তিন বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	১০৬৮	১৪৭	১৮৮	২১৬	৫৫১
২। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৬৫০	১০৩	১৩২	১১২	৩৪৭
৩। বিদ্যুৎ	১০১২	১৩৬	১৮১	২৪৭	৫৭৪
৪। শিল্প ও খনিজ	১৯৮৪	২৩১	৩৪৬	৪১০	৯৮৭
৫। পরিবহণ ও সংসরণ	১৪৮৬	২৯০	৩৬৪	৪০০	১০৫৪
৬। সমাজসেবা ও বিবিধ	১৩০০	২০৫	২৬৯	২৬৮	৭৩২
মোট	৭৫০০	১১১২	১৪৮০	১৬৫৩	৪২৪৫

তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর চলাকালীন দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টাকে নিযুক্ত করা হয়। এইরূপ অবস্থায় অনেকেই তৃতীয় পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, দেশরক্ষা যেখানে সর্বাধিক আশু দায়িত্ব সেখানে শান্তিকালীন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা যায় না। এই প্রস্তাব অবশ্য গৃহীত হয় নাই, কারণ যুদ্ধ বা শান্তি যাহাই

জরুরী অবস্থা ও তৃতীয় পরিকল্পনা

* Advance Estimates of National Income, 1962-68

** India—1968

হউক, পরিকল্পনা আমাদের জাতীয় জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্থির হইয়াছে যে পরিকল্পনার মোট ব্যয় কোনরূপ হ্রাস করা হইবে না। তবে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে পরিকল্পনার ব্যয় বণ্টনের পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে। এই সম্পর্কে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ও পরিকল্পনা কমিশন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়াছে। অবশিষ্ট তিন বৎসরের রাজ্যপরিকল্পনাগুলিতে যাহাতে প্রতিরক্ষার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত শিল্পগুলির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতে হইবে; সমাজসেবামূলক ও সমষ্টি উন্নয়নের কাজ আপাতত স্থগিত রাখিতে হইবে, ইত্যাদি। এই নির্দেশের ভিত্তিতেই তৃতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে।

পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the objectives of India's planned development.

(২৬৭-২৬৯ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the main objectives of the Third Five Year Plan of India. In what respects do these objectives differ from those of the Second Plan?

(C. U. B. Com. (P.I) 1963) (২৬৯-২৭৪ পৃষ্ঠা)

3. Briefly discuss the principal objectives of the Third Five Year Plan, and show how the resources required to fulfil these objectives may be found.

(B. U. 1961) (২৬৯-২৭০ এবং ২৭৮-২৮০ পৃষ্ঠা)

4. Describe the main features of the Third Five Year Plan of India. What in your opinion are the main conditions on which the success of the Plan will depend? (B. U. 1962) (২৭০-২৭৪ এবং ২৮০ পৃষ্ঠা)

5. Indicate the main features and objectives of India's Third Five Year Plan. In what respects, if any, does it differ from the two previous plans?

(C. U. B. A. 1962; C. U. B. Com. 1963) (২৭০-২৭৪ এবং ২৬৮ পৃষ্ঠা)

6. Write a short note on the methods adopted to finance India's Third Five Year Plan. (C. U. B. Com. (P. I) 1962) (২৭৮-২৮০ পৃষ্ঠা)

7. Give in brief the trends of progress in the Third Five Year Plan period.

(২৮১-২৮৪ পৃষ্ঠা)

পরিশিষ্ট ক

পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহ (Mobilisation of Resources for the Plan and the Defence) : ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার বিরাট প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ নানারূপ প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ১৯৬২ সালে অক্টোবর মাসে চীনা আক্রমণের ফলে যে জটিল অবস্থার সূচনা হয় তাহার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে আরও অধিক অর্থের। বস্তুত, পরিকল্পনার প্রয়োজনের সংগে যুক্ত হয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজন। এই অবস্থায় সরকার গতানুগতিক কতকগুলি ব্যবস্থা—যেমন, করবৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা তহবিল গঠন, প্রতিরক্ষা বণ্ড ও সার্টিফিকেট বিক্রয় ইত্যাদি ছাড়া আরও কতকগুলি অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল : (১) স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ (Gold Control), এবং (২) বাধ্যতা-মূলক আমানত পরিকল্পনা (Compulsory Deposit Scheme)। ইহা ছাড়া রহিয়াছে বৈদেশিক সাহায্যের (Foreign Aid) জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা। এই তিনটি ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

(১) স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ (Gold Control) : স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ১৯৬৩ সালে ৯ই জানুয়ারী এক ব্যাপক বিধি ঘোষণা করা হয়। ইহার পূর্বে সোনার আগাম-ব্যবসা (forward trading) বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৯৬২ সালে নভেম্বর মাসে স্বর্ণ প্রতি তোলা ৬২·৫০ টাকা মূল্যে ১৫ বৎসরের মেয়াদী ৬½ শতাংশ সুদবিশিষ্ট স্বর্ণবণ্ড (Gold Bonds) চালু করা হয়। উহাদের ফল সন্তোষজনক না হওয়ার জন্য স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।*

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বলিতে স্বর্ণের চাহিদা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণকেই বুঝায়। বহুদিন যাবৎ এইরূপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা যাইতেছিল। বর্তমান অবস্থায় উহার প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পায়। নানা কারণে এই প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। প্রথমত, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে স্বর্ণের মূল্য খুব বেশী। স্বর্ণের আন্তর্জাতিক মূল্য প্রতি তোলা ৬২·৫০ টাকা ; কিন্তু নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী হওয়ার পূর্বে ভারতে উহার দাম ছিল প্রতি তোলা ১৩০-১৪০ টাকা। ইহার ফলে বিদেশ হইতে গোপন-পথে ভারতে সোনা বেআইনীভাবে আনা হইত। এইরূপ সোনা আমদানির ফলে প্রতি বৎসর বিরাট পরিমাণ (আনুমানিক ৩০-৪০ কোটি টাকা) বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটিত। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সোনা জাতীয় সম্পদ হিসাবে ধরা হয়। সেইজন্য আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সরকারের হাতেই সোনা মজুত থাকে ; জনসাধারণের হাতে মজুতের পরিমাণ খুবই নগণ্য। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতে জনসাধারণের হাতে আছে প্রায় ১৮০০

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন

* ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসের হিসাব অনুসারে জানা যায় যে মাত্র ৮·৭৩ কোটি টাকার স্বর্ণবণ্ড বিক্রয় হইয়াছে।

কোটি টাকার (আন্তর্জাতিক মূল্য অনুসারে) সোনা ; কিন্তু সরকারের হাতে আছে মাত্র ১৩০ কোটি টাকার সোনা। এইরূপ থাকার ফলে আমাদের গচ্ছিত সোনা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নিয়োগ করা যাইতেছে না। তৃতীয়ত, ভারতে ব্যবসায়ীরা তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ সোনাতে বিনিয়োগ করে। ইহা বন্ধ করিতে হইলে সোনার চাহিদা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। চতুর্থত, নানারূপ সামাজিক ও ধর্মীয় কারণের জন্য ভারতে সোনার চাহিদা খুব বেশী। প্রকৃতপক্ষে, সোনার প্রতি আমাদের এক বিরাট মোহ ও আকর্ষণ আছে। এই মোহের জন্য বংশপরম্পরায় আমাদের দেশে প্রায় প্রতি ঘরে সোনা সঞ্চয় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উন্নয়নশীল অর্থ-ব্যবস্থায় এইরূপ সঞ্চয় অর্থ নৈতিক সম্প্রসারণের সহায়ক হইতে পারে না।

উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করা হইয়াছে। এই নিষেধাজ্ঞার কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে: (১) সোনার চাহিদা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ;

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির উদ্দেশ্য

(২) ভারতে সোনার দাম আন্তর্জাতিক মূল্যস্তরে আনয়ন, যাহার ফলে সোনার গোপন আমদানি হ্রাস পাইবে ; (৩) সোনার মূল্য কমিলে স্বর্ণবণ্ডে সোনা বিনিয়োগ করা হইবে। সুতরাং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সোনা ব্যবহার করা যাইবে।

এই উদ্দেশ্যগুলির জন্য যে-নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে উহার কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য ধারা হইল: (১) দেশের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে স্বর্ণালংকার

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির ধারা

ছাড়া যদি অন্য কোন সোনা থাকে তাহা হইলে নির্দিষ্ট সময়ের (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩) মধ্যে তাহা সরকারকে জানাইতে হইবে। অবশ্য প্রতি ব্যক্তি ৫০ গ্রাম ও প্রতি নাবালক ২০ গ্রাম অলংকারবিহীন সোনা রাখিতে পারিবে ; ইহার জন্য কোন হিসাব দিতে হইবে না। (২) কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের হাতে যে-পরিমাণ স্বর্ণালংকার থাকুক না কেন তাহার কোন হিসাব দিতে হইবে না। (৩) ভবিষ্যতে ১৪-ক্যারেট বিশুদ্ধতার অধিক সোনা দ্বারা অলংকার তৈয়ারি করা বেআইনী হইবে। (৪) স্বর্ণ-ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নূতন করিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। (৫) সাধারণভাবে অলংকার ছাড়া সোনা দ্বারা অন্য কোন বস্তু তৈয়ারি করা আইনসংগত হইবে না। (৬) স্বর্ণ সম্পর্কে এইসব নিষেধাজ্ঞা কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করিবার জন্য একটি 'স্বর্ণ বোর্ড' (Gold Board) গঠিত হইবে।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের এই বিধিগুলি কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই 'স্বর্ণ বোর্ড' গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা

উপসংহার

দিয়াছে। অন্যান্যের মধ্যে স্বর্ণ-কারিগরদের মধ্যে বেকারত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য-সমূহ রহিয়াছে তাহা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা যথেষ্ট নহে। স্বর্ণবণ্ড পরিকল্পনার ব্যর্থতার দ্বারাই উহা প্রমাণিত হইয়াছে।

(২) বাধ্যতামূলক আমানত বা সঞ্চয় পরিকল্পনা (Compulsory Deposit or Savings Scheme): অর্থসংস্থানের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হইতেছে বাধ্যতামূলক আমানত বা সঞ্চয় পরিকল্পনার প্রবর্তন। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে ইহা সর্বপ্রথম চালু করার ব্যবস্থা করা হয়। এই সম্পর্কে বাধ্যতামূলক আমানত আইন (Compulsory Deposit Act, 1963) পাস করা হয়। উক্ত আইনে বলা হইয়াছে যে বাধ্যতামূলক আমানত-ব্যবস্থা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হইবে। ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই হইতে ইহা চালু হইয়াছে। ইহা আমাদের দেশে নূতন হইলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইয়োরোপের কয়েকটি দেশে ইহা প্রবর্তন করা হইয়াছিল।

লর্ড কেইন্‌স (Lord Keynes) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনের জন্য এই ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছিলেন।* তাঁহার প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল—

কেইন্‌সীয় পরিকল্পনা

(১) বিভিন্ন ব্যক্তির বেতন ও আয় হইতে একটি নির্ধারিত অংশ সরকার কাটিয়া রাখিবে এবং উহা যুদ্ধের পর ফেরত দেওয়া হইবে; (২) যুদ্ধকালীন আয়হ্রাসের জন্য জনসাধারণের যে-ভোগ হ্রাস পাইবে সেই স্থগিতভোগ তাহারা যুদ্ধের শেষে যাহাতে পূরণ করিতে পারে সে-সম্বন্ধে সরকারকে পূর্বেই ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং (৩) মূল্যবৃদ্ধি রোধের চেষ্টা করিতে হইবে। ভোগ্যদ্রব্য যে-পরিমাণ পাওয়া যাইবে তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া মজুরি বাড়ানো যাইতে পারে। নিম্ন আয়বিশিষ্ট বিবাহিত ব্যক্তির একাধিক সন্তান থাকিলে সে-সব ক্ষেত্রে ভোগবৃদ্ধির জন্য পরিবার-ভাতার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা কেইন্‌সের পরিকল্পনার ন্যায় সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। তবে এই পরিকল্পনার আওতায় সর্বশ্রেণীর লোককে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভূমি-রাজস্বপ্রদানকারী, সহরাঞ্চলে জমির মালিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যাঁহারা আয়কর দেন না, চাকুরিজীবী যাঁহারা আয়কর দেন না, চাকুরিজীবী যাঁহারা আয়কর দেন—প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে কি হারে প্রতিবৎসর বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করিতে হইবে তাহা এখানে দেওয়া হইল: (১) ভূমি-রাজস্ব (Land Revenue) প্রদানকারী ব্যক্তিদিগকে ভূমি-রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ জমা রাখিতে হইবে। অবশ্য বাৎসরিক ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ৫ টাকার কম হইলে এইরূপ জমা রাখিতে হইবে না। (২) পৌর এলাকার স্থাবর সম্পত্তির যে-সব মালিকরা আয়কর দেন না তাঁহাদিগকে সম্পত্তির জন্য দেয় খাজনার তিন ভাগাংশ সঞ্চয় করিতে হইবে। (৩) যে-সব ব্যবসায়ীরা রাজ্য বিক্রয়কর প্রদান করে অথচ আয়কর দেয় না সে-সব ক্ষেত্রে বাৎসরিক বিক্রয়ের পরিমাণ ১৫ হাজার

বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনার বিভিন্ন ধারা

* Keynes, *How to pay for war*

টাকার অধিক হইলে ব্যবসায়ীদিগকে পূর্ববর্তী বৎসরের মোট বিক্রয়মূল্যের এক শতাংশের ½ ভাগ আমানত রাখিতে হইবে। (৪) যে-সব ব্যক্তিদের আয়কর প্রদান করিতে হয় না তাহাদের বার্ষিক আয় ১৫০০ বা তদূর্ধ্ব হইলে এই পরিকল্পনা অনুসারে তাহাদিগকে বৎসরে ৬০ টাকা জমাইতে হইবে। অবশ্য এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা যদি তাহাদের আয়ের ১১ শতাংশ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, জীবনবীমা ইত্যাদিতে সঞ্চয় করে তাহা হইলে তাহারা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। (৫) আয়কর-প্রদানকারীদের বেলায় ৬০০০ টাকা 'অবশিষ্ট আয়' (মোট আয় হইতে আয়কর, সারচার্জ ইত্যাদি বাদ দিলে 'অবশিষ্ট আয়' পাওয়া যাইবে) পর্যন্ত এই সঞ্চয়ের হার হইবে শতকরা তিন টাকা এবং অবশিষ্ট আয় ৬০০০ টাকার বেশী হইলে সঞ্চয়ের হার হইবে প্রথম ৬০০০ টাকার উপর শতকরা তিন টাকা এবং অবশিষ্টাংশের উপর শতকরা দুই টাকা।

বাধ্যতামূলক আমানতের উপর শতকরা চার টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে এবং পাঁচ বৎসর পরে সুদসহ এই সঞ্চিত আমানত ফেরত দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনার আওতায় যাহারা সঞ্চয় করিতে বাধ্য তাহারা যদি এইরূপ সঞ্চয় না করে তাহা হইলে তাহাদিগকে নির্ধারিত হারে জরিমানা দিতে হইবে। বর্তমানে স্থির হইয়াছে যে পোস্টাফিস, কতকগুলি নির্ধারিত ব্যাংক ইত্যাদি স্থানে এই আমানত গৃহীত হইবে। সঞ্চয়কারীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঞ্চয় করিতে বাধ্য থাকিবে।

আমানতের মেয়াদ, সুদ, ইত্যাদি

বাধ্যতামূলক আমানত-ব্যবস্থা ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি অভিনব ব্যবস্থা। নীতিগতভাবে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই। কারণ, সঞ্চয় ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। বর্তমান অবস্থায় প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনার জন্য এই ব্যবস্থার যে আবশ্যক আছে সে-সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নাই। উপরন্তু অর্থমন্ত্রীর মতে, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় দ্বারা একদিকে যেমন ভোগব্যয় হ্রাস করিয়া মুদ্রাস্ফীতি দমন করা যাইবে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ লোকের সঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষে এই সঞ্চয় করা সম্ভব হইবে কি না এবং প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোকের সঞ্চয় করার ক্ষমতা আদৌ আছে কি না তাহা বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন হইবে। এই কারণেই এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। উহার ফলে সরকার পরিকল্পনা সামান্য সংশোধন করিতে বাধ্য হইয়াছে। সংশোধিত হিসাব অনুসারে এই সূত্র হইতে ১৯৬৩-৬৪ সালে গৃহীত হইবে ৬০ কোটি টাকা। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে বাধ্যতামূলক আমানতের পরিমাণ আশানুরূপ হইতেছে না। সুতরাং এই অবস্থায় এই পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। ইহার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে অনেকে 'বাধ্যতামূলক বীমা'র (compulsory insurance) প্রস্তাব করিতেছেন।

গুরুত্ব

(৩) **বৈদেশিক সাহায্য (Foreign Aid) :** পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের জন্য যেরূপ আভ্যন্তরীণ সূত্রগুলি হইতে অধিক অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা চলিতেছে সেইরূপ বহিঃসূত্রের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে। বস্তুত, স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে বৈদেশিক সাহায্য একরূপ অপরিহার্য। বৈদেশিক সাহায্য অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় প্রকারের হইতে পারে। এখানে অর্থনৈতিক বৈদেশিক সাহায্যেরই আলোচনা করা হইল।

বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ

বৈদেশিক সাহায্য বলিতে বিদেশী রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে যে অর্থকরী, কারিগরি, সেবামূলক, অনুদানমূলক ইত্যাদি সাহায্য পাওয়া যায় তাহাকেই বুঝায়। আধুনিককালের লেখকরা বৈদেশিক সাহায্যের আরও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেন। তাঁহাদের মতে 'বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ' (foreign capital inflow) এবং 'বৈদেশিক সাহায্য' (foreign aid) সমার্থবোধক বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে, বিদেশ হইতে আভ্যন্তরীণ বাজারের আকর্ষণের ফলে যে-পরিমাণ মূলধনের (মূলত স্বল্পমেয়াদী) অনুপ্রবেশ হয় তাহা অপেক্ষা যে-বাড়তি মূলধন বা সাহায্য আসে তাহাকেই বৈদেশিক সাহায্য বলা হইবে। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক দেশেই বাজারের আকর্ষণ বা বিনিয়োগের সুযোগসুবিধার জন্য বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণ মূলধন আসে, ইহা অপেক্ষা যে-বাড়তি মূলধন বা সাহায্য পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃত বৈদেশিক সাহায্য।*

বর্তমান যুগে অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বিভিন্নভাবে বৈদেশিক সাহায্য আসিতেছে। বস্তুত, বৈদেশিক সাহায্যের বিভিন্ন রূপ দেখা যাইতেছে।

বৈদেশিক সাহায্যের বিভিন্ন রূপ

(১) বৈদেশিক ঋণ (foreign loans) : বৈদেশিক সাহায্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রূপ হইতেছে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত ঋণ। এই প্রকার ঋণ সরকারী ও বে-সরকারী উভয় সূত্র হইতে পাওয়া যায়। আবার বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি কতকগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এইরূপ ঋণ দিয়া আসিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কতকগুলি রাষ্ট্র বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে সম্মিলিত হইয়া ঋণপ্রদান করিয়া থাকে—যেমন, Aid India Club। বৈদেশিক ঋণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। (ক) কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলিকে স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়া থাকে। এই ঋণ যখন বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হয় তখন উহাকে 'কঠিন পরিশোধ সাপেক্ষ ঋণ' (hard loan) বলিয়া অভিহিত করা হয়। আবার যে-সব দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক ঋণ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হয় তখন তাহাকে সাধারণত 'সহজ

* "Foreign capital inflow and 'aid' are not synonymous. Aid, properly speaking, refers only to those part of capital inflow which normal market incentives do not provide." P. Rosanstein-Rodan—International Aid for Underdeveloped Countries—Review of Economics and Statistics—May, 1961

পরিশোধ সাপেক্ষ ঋণ' (soft loan) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা ছাড়া বৈদেশিক ঋণ 'বাঁধা' (tied) ও 'অ-বাঁধা' (untied) উভয় প্রকারের হইতে পারে। 'বাঁধা ঋণ' কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বা কোন বিশেষ পরিকল্পনার (project) জন্য দেওয়া হয়। 'অ-বাঁধা ঋণ-এর' ক্ষেত্রে এ-রূপ কোন সর্ত থাকে না। (২) কারিগরি সাহায্য (technical assistance): আধুনিক কলাকৌশল, কারিগরি সাহায্য, বিদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি রূপে বৈদেশিক সাহায্যের একটি বিরাট অংশ আসিতেছে। উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলিতে সুদক্ষ ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান ইত্যাদি প্রেরণ করিয়া আধুনিক উপায়ে শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। আবার অনুন্নত দেশগুলি হইতে উন্নত দেশগুলিতে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও উচ্চতর জ্ঞানলাভের জন্য কর্মীদল পাঠানো হইতেছে। অনুন্নত দেশগুলিতে কারিগরি সাহায্য ও আধুনিক কলাকৌশল সংক্রান্ত জ্ঞান-প্রসারের-জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে কয়েকটি বিভাগও রহিয়াছে। (৩) অনুদান ও সরকারী দান (grants and official donations): অনুন্নত দেশসমূহ উন্নত দেশগুলি হইতে সাহায্য স্বরূপ অনুদান ও সরকারী দান পাইতেছে। অনুদান বা সরকারী দান পরিশোধ করিতে হয় না। আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, কলম্বো পরিকল্পনাভুক্ত দেশসমূহ এবং অন্যান্য উন্নত দেশের সরকারের নিকট হইতে এই অনুদান পাওয়া যাইতেছে। অর্থ, দ্রব্য, আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অনুদান হিসাবে পাওয়া যায়। (৪) শিল্পের শেয়ার-মূলধনে অংশগ্রহণ (participation in the share capital): বিদেশী শিল্পপতিরা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী সরকার দেশীয় শিল্পের শেয়ার-মূলধনে অংশগ্রহণ করিতেছে। ভারতের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এইরূপ অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। (৫) প্রয়োজনীয় দ্রব্য দ্বারা সাহায্য (assistance in the form goods): খাদ্যদ্রব্য, প্রয়োজনীয় মালমশলা, আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে পাওয়া যাইতেছে।

বৈদেশিক সাহায্যের বিভিন্ন রূপ পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছকের দ্বারা দেখানো হইল :

- বৈদেশিক সাহায্য (foreign aid)
  - অর্থ নৈতিক সাহায্য (economic aid)
    - বৈদেশিক ঋণ (foreign loans)
      - সহজ পরিশোধ সাপেক্ষ ঋণ (soft loan)
      - কঠিন পরিশোধ সাপেক্ষ ঋণ (hard loan)
      - বাঁধা ঋণ (tied loan)
      - অ-বাঁধা ঋণ (untied loan)
    - কারিগরি সাহায্য (technical assistance)
      - ১। আধুনিক কলাকৌশল সংক্রান্ত জ্ঞান প্রচার
      - ২। কারিগরি মিশন প্রেরণ
      - ৩। কারিগরি শিক্ষার সুযোগ
      - ৪। শিল্প সংগঠক ও পরিচালক দ্বারা সাহায্য, ইত্যাদি
    - অনুদান ও সরকারী দান (grants and official donations)
      - অর্থ
      - দ্রব্য
    - শেয়ার মূলধনে অংশগ্রহণ (participation in share capital)
      - সরকারী ক্ষেত্র (public sector)
      - বেসরকারী ক্ষেত্র (private sector)
    - নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সাহায্য (খাদ্যদ্রব্য, গম-ঋণ, পি-এল ৪৮০ ইত্যাদি)
  - সামরিক সাহায্য (military aid)

বৈদেশিক সাহায্য বিভিন্ন ধরনের পাওয়া গেলেও সকল দেশের পক্ষে সবরকম সাহায্য সুবিধাজনক হইবে না। যেমন, যে-সব দেশের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা কম সেইসব দেশের পক্ষে কঠিন পরিশোধ সাপেক্ষ ঋণ অপেক্ষা সহজ পরিশোধ সাপেক্ষ ঋণই অধিকতর কাম্য। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কোন দেশের পক্ষে কতখানি বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে তাহা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) বৈদেশিক সাহায্য পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করার ক্ষমতা (absorptive capacity), (২) বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য পরিশোধ করার ক্ষমতা (capacity of repay)। ইহার মধ্যে প্রথমটি নিরূপণ করে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কত হইবে এবং দ্বিতীয়টি নির্ধারণ করে বৈদেশিক সাহায্যের প্রকৃতি কিরূপ হইবে।

বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ

ভারত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য উপরি-উক্ত বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে প্রায় সর্বপ্রকার সাহায্যই পাইতেছে। পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার যুগ্ম প্রয়োজনে বৈদেশিক সাহায্যের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য ২৬০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রথম তিন বৎসরে প্রায় ৩২৮০ মিলিয়ন ডলার—অর্থাৎ, প্রায় ১৫৫০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে। এই সাহায্য নিম্নলিখিত দেশগুলি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ (Aid India Club) হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে:

তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য বৈদেশিক সাহায্য

(দশ লক্ষ আমেরিকান ডলারে)

দেশ ও প্রতিষ্ঠানের নাম	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
অষ্ট্রিয়া	—	৫	৩·৮৫
বেলজিয়াম	—	১০	১০·০০
ক্যানাডা	২৮	৩৩	৩০·৫০
ফ্রান্স	১৫	৪৫	২০·০০
জার্মেনী	২২৫	১৩৯	৬৫·৩৫
ইটালী	—	৫৩	৩৫·০০
জাপান	৫০	৫৫	৬০·০০
নেদারল্যাণ্ডস	—	১১	১১·১০
ইংল্যাণ্ড	১৮২	৮৪	৮৪·০০
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫৪৫	৪৩৫	৩৭৫·০০
বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান	২৫০	২০০	২২০·০০
	১২৯৫	১০৭০	৯১৪·৮০*

* Aid India Club তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরের জন্য আরও ১৩৭ মিলিয়ান ডলার বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছে। সুতরাং তৃতীয় বৎসরে মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হইবে প্রায় ১০৫২ মিলিয়ান ডলার।

বৈদেশিক সাহায্য যে-পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার (utilisation) করা সম্ভব হইতেছে না। যাহাতে উহা পরিপূর্ণভাবে পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যসূচীর জন্য (যেমন, বোকারোর ইস্পাত কারখানা নির্মাণ, জলসেচ পরিকল্পনা, ইত্যাদি) ব্যবহার করা যায় সে-সম্পর্কে ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। বৈদেশিক সাহায্যের পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে না পারিলে যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে না সে-বিষয়ে ইতিমধ্যেই আভাস পাওয়া গিয়াছে। ক্লে কমিটির (Clay Committee) রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বোকারোর ইস্পাত কারখানার জন্য প্রত্যাশিত আমেরিকান সাহায্য পাইতে বিলম্ব হইতেছে। সুতরাং বৈদেশিক সাহায্যের যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বৈদেশিক সাহায্যের পূর্ণ ব্যবহার

প্রশ্নোত্তর

• 1. Describe fully the objectives of the new Gold Policy of the Government of India. Comment on some of the provisions of the Gold Control. (২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the main features of Compulsory Deposit Scheme as introduced recently in India. Assess the significance of the Scheme in the light of the present requirement for defence and development. (২৮৭-২৮৮ পৃষ্ঠা)

3. What are the different forms in which foreign aid has been made available to India in implementing her development plans? Would you justify such aid? Give reasons for your view. (C. U. B. Com. 1968) (২৮৯-২৯১ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the case for using foreign aid for India's economic development. What are the form in which foreign aid may be available?

(C. U. B. Com. (P. I) 1968) (২৮৯-২৯১ পৃষ্ঠা)

পরিশিষ্ট খ

নির্বাচিত পরিসংখ্যান (Selected Statistics)

(১) কৃষিজাত উৎপাদনের সূচকসংখ্যা (জুন—১৯৫০=১০০)

(Index Numbers of Agricultural Production)*

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
সমগ্র কৃষিজাত পণ্য	৯৫·৬	১১৬·৮	১২৪·৩	১১৫·৯	১৩৩·৮	১২৮·৫	১৩৯·৯	১৩৯·৯
খাদ্যশস্য	৯০·৫	১১৫·৩	১২০·৮	১০৯·২	১৩১·০	১২৬·৮	১৩৫·৬	১৩৫·২
আঁশজাত পণ্য (তুলা, পাট ইত্যাদি)	১০৮·৬	১৪৯·৭	১৭০·৭	১৬৪·৪	১৭৫·৮	১৪১·২	১৭৫·৭	১৮২·৩

* কৃষি বৎসর—জুন-জুলাই। Report on Currency and Finance, 1962-63

(২) ভারতের কৃষির উৎপাদিকাশক্তির সূচকসংখ্যা

(Index Numbers of Agricultural Productivity in India)*

কৃষি বৎসর—১৯৪৯-৫০=১০০

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
সমগ্র কৃষিজাত পণ্য	৯৫·৭	১০১·৬	১০৭·২	১০১·১	১১২·২	১০৮·০	১১৮·১	১১৬·৬
খাদ্যশস্য	৯২·৪	১০৩·০	১০৭·৪	৯৮·৬	১১৩·০	১১০·০	১১৮·৪	১১৭·১
অন্যান্য শস্য	৯৫·৬	৯১·৭	৯৭·৮	৯৫·৯	১০২·১	৯৫·৯	১০৬·৯	১০৪·৪

* Reserve Bank Bulletin, February, 1963

(৩) শিল্পগত উৎপাদনের সূচকসংখ্যা *

(Index Numbers of Industrial Production

[সংশোধিত তালিকা : ১৯৫৬=১০০]

	১৯৫৫	১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬২†
সমগ্র শিল্পগত বস্তু	৯২·৩	১০৪·১	১০৮·১	১১৬·৯	১২৯·৮	১৩৯·৩	১৪৯·৫
খনিজ দ্রব্য	৯৭·১	১০৯·৬	১১৬·০	১২২·৭	১৩৭·১	১৪৭·২	১৬১·২
শিল্পজ দ্রব্য (Manufacturing)	৯২·০	১০৩·৩	১০৬·৬	১১৫·২	১২৭·৬	১৩৬·২	১৪৫·৫

* Report on Currency and Finance, 1962-63

† অনুমিত।

(৪) শিল্পজ উৎপাদনবৃদ্ধির হার *

(Rate of Growth of Industrial Production)

বৎসর		পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধির হার
১৯৫৫	...	৮·৪ শতাংশ
১৯৫৬	...	৮·৩ "
১৯৫৭	..	৩·৫ "
১৯৫৮	...	১·৭ "
১৯৫৯	...	৮·৭ "
১৯৬০	...	১২·১ "
১৯৬১	...	৭·২ "

* ৩নং তালিকার সংগে তুলনা করা যাইবে না। কারণ ইহা অন্য সূত্র হইতে গৃহীত।

(৫) পাইকারী মূল্যের সূচকসংখ্যা

(Index Numbers of Wholesale Prices)*

(১৯৫২-৫৩=১০০)

(মাসের গড়)	সমগ্র বস্তু	খাদ্যদ্রব্য	পানীয় ও তামাক	শিল্পগত কাঁচামাল	উৎপাদিত বস্তু
১৯৫০-৫১	১১১·৮	১১২·৫	৯৮·৪	১৩০·৯	১০৩·৩
১৯৫৫-৫৬	৯২·৫	৮৬·৬	৮১·০	৯৯·০	৯৯·৭
১৯৫৬-৫৭	১০৫·৩	১০২·৩	৮৪·৩	১১৬·০	১০৬·৩
১৯৫৭-৫৮	১০৮·৪	১০৬·৪	৯৪·০	১১৬·৫	১০৮·১
১৯৫৮-৫৯	১১২·৯	১১৫·২	৯৫·৪	১১৫·৬	১০৮·৪
১৯৫৯-৬০	১১৭·১	১১৯·০	৯৯·৫	১২৩·৭	১১১·৭
১৯৬০-৬১	১২৪·৯	১২০·০	১০৯·৯	১৪৫·৪	১২৩·৯
১৯৬১-৬২	১২৫·১	১২০·১	১০০·৩	১৪২·৬	১২৬·৬
১৯৬২-৬৩	১২৭·৯	১২৬·১	১০০·৬	১৩৬·৫	১২৮·৮

* **Report on Currency and Finance, 1962-68**

(৬) জনসাধারণের হাতে টাকাকড়ির যোগান
(Money Supply with the Public)*

(হিসাব কোটি টাকায়)

শেষ শুক্রবার	(১) জনসাধারণের হাতে মুদ্রার পরিমাণ	(২) জনসাধারণের হাতে আমানত অর্থের পরিমাণ	(৩) জনসাধারণের হাতে টাকাকড়ির পরিমাণ (১+২)
১৯৫০-৫১	১,৪০৬'৫২	৬১১'০৪	২,০১৭'৫৬
১৯৫৫-৫৬	১,৫৭১'০১	৬৪৮'৯১	২,২১৯'৯২
১৯৫৬-৫৭	১,৬২২'৭৩	৭২২'৫৭	২,৩৪৫'৩০
১৯৫৭-৫৮	১,৬৭৪'০৭	৭৪২'৯৩	২,৪১৭'০০
১৯৫৮-৫৯	১,৭৯২'০২	৭৩৮'২৫	২,৫৩০'২৭
১৯৫৯-৬০	১,৯৩০'৮৬	৭৯৪'১৮	২,৭২৫'০৪
১৯৬০-৬১	২,০৯৮'০৫	৭৭৬'০৬	২,৮৭৪'১১
১৯৬১-৬২	২,২০১'৭৯	৮৪৭'৬৬	৩,০৪৯'৪৫
১৯৬২-৬৩	২,৩৭৮'৩২	৯৩৬'৮২	৩,৩১৫'১৪

* Report on Currency and Finance, 1962-68

(৭) ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
(India's Foreign Exchange Reserves)*

(হিসাব কোটি টাকায়)

বৎসরের শেষে		মোট সম্পদ
১৯৫০-৫১	...	৯৫১'৪১
১৯৫৫-৫৬	...	৮২৪'৬১
১৯৫৬-৫৭	...	৬৮১'১০
১৯৫৭-৫৮	...	৪২১'২২
১৯৫৮-৫৯	...	৩৭৮'৯২
১৯৫৯-৬০	...	৩৬২'৮৬
১৯৬০-৬১	...	৩০৩'৬১
১৯৬১-৬২	...	২৯৭'৩১
১৯৬২-৬৩	...	২৯৫'১০

* Report on Currency and Finance, 1962-68

(৮) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য
(India's Foreign Trade)*

(হিসাব কোটি টাকায়)

বৎসর	আমদানি (−)	রপ্তানি (+)	বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত
১৯৫০-৫১	৬৫০'৪৩	৬০০'৬৮	−৪৯'৭৫
১৯৫৫-৫৬	৭৭৪'৩৫	৬০৮'৯১	−১৬৫'৪৪
১৯৫৬-৫৭	৯০২'৯১	৬১৯'৬২	−২৮৩'২৯
১৯৫৭-৫৮	১,০৩৬'৪০	৬৩৫'১৪	−৪০১'২৬
১৯৫৮-৫৯	৯০৩'৬৪	৫৭২'৬৪	−৩৩১'০০
১৯৫৯-৬০	৯৬১'৪৫	৬৩৯'৬৫	−৩২১'৮০
১৯৬০-৬১	১,০৮৬'৭৬	৬৪২'৭৮	−৪৪৩'৯৮
১৯৬১-৬২	৯৫৭'৫৯	৬৭৬'৮৯	−২৮০'৭০
১৯৬২-৬৩	৯৮১'২৭	৭০৯'৪২	−২৭১'৮৫

* Report on Currency and Finance, 1962-68

(৯) ভারতে সঞ্চয় ও আয়ের গড় অনুপাত
(Average Saving—Income Ratios in India)*

(বিভিন্ন ক্ষেত্রের আয়ের শতাংশ হিসাবে)

ক্ষেত্র	১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৮-৫৯
১। সরকারী ক্ষেত্র	৯'৭
২। আভ্যন্তরীণ কোম্পানী ক্ষেত্র	৩৫'৮
৩। পারিবারিক ক্ষেত্র	৫'৮
৪। মোট সঞ্চয়	৭'১†

* Reserve Bank Bulletin, Aug. 1961

† মোট জাতীয় আয়ের

(১০) ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ
(The Five Year Plans of India)

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়নের ক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনা ১৯৫১-৫২—১৯৫৫-৫৬ প্রকৃত ব্যয়	দ্বিতীয় পরিকল্পনা ১৯৫৫-৫৬—১৯৬০-৬১ অনুমিত ব্যয়	তৃতীয় পরিকল্পনা ১৯৬০-৬১—১৯৬৫-৬৬ বরাদ্দ ব্যয়
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১ (১৫%)	৫৩০ (১১%)	১০৬৮ (১৪%)
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৫৭০ (২৯%)	৮৬৫ (১৯%)	১৬৬২ (২২%)
৩। শিল্প ও খনি	১১৭ (৬%)	১০৭৫ (২৪%)	১৭৮৪ (২৪%)
৪। পরিবহণ ও সংসরণ	৫২৩ (২৭%)	১৩০০ (২৮%)	১৪৮৬ (২০%)
৫। সমাজসেবা ও বিবিধ	৪৫৯ (২৩%)	৮৩০ (১৮%)	১৩০০ (১৭%)
৬। মজুত	—	—	২০০ (৩%)
মোট	১৯৬০	৪৬০০	৭৫০০

বিঃ দ্রঃ : ব্র্যাকেটে মোট ব্যয়ের শতাংশ।